উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মাঘ ১৩৮৭

৮৩ তম বর্ষ

১ম সংখ্যা

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

৮৩তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

ভগবানের সহিত যাহার আত্মা এক হইয়া গিয়াছে, তিনিই শক্তিমান্; তাছাড়া আর কেহই শক্তিমান্ নয়। নাজারাথের যীশুর যে-শক্তির কথা তোমাদের বাইবেলে আছে, যে প্রচণ্ড শক্তিবলে বিশ্বাসঘাতককে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে যাহারা হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদেরও তিনি আশীর্বাদ করিয়াছেন, সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল—তোমরা মনে কর? এই শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল এই বোধ হইতে—'আমি ও আমার পিতা এক'।···সর্বনিম্ন জীবকোষ হইতে সর্বোচ্চ দেবদূত পর্যন্ত প্রত্যেকের অন্তরেই তিনি বাস করিতেছেন এবং চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন, 'আমিই তিনি—সোঽহম্, সোঽহম্।' অন্তরে চিরবিদ্যমান এই বাণী যখন আমাদের বোধগম্য হইবে, উহার শিক্ষা গ্রহণ করিব, তখন দেখিব—সমগ্র বিশ্বের রহস্য প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, দেখিব—প্রকৃতি আমাদের নিকট রহস্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। আমরা দেখিব, সমস্ত ধর্ম যে-সত্যের সন্ধানে রত, যে-সত্যের তুলনায় জড়বিজ্ঞানের সব জ্ঞানই গৌণ মাত্র, আমরা সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছি; ইহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান, যাহা আমাদিগকে বিশ্বের এই বিশ্বজনীন ঈশ্বরের সঙ্গে এক করিয়া দেয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৩।১৪৭-৪৮]

কথাপ্রসঙ্গে

নববর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকা এই মাঘে ৮৩তম বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ষের সূচনায় 'উদ্বোধনে'র লেখক-লেখিকা, গ্রাহকবর্গ, পাঠকবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমাদের সাদর অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই এবং শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। অতীতে তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই এবং বিশ্বাস রাখি যে, সেই স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা বর্তমান বর্ষে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকিবে।

'উদ্বোধন' পত্রিকাটির জন্ম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি। প্রথমে উহা পাক্ষিক পত্রিকা ছিল, দশম বর্ষ হইতে মাসিক পত্রিকা হয়। প্রথম বর্ষের প্রথম একাধিক সংখ্যার প্রচ্ছদে বড় বড় অক্ষরে তির্যক্‌ভাবে উপস্থাপিত 'উদ্বোধন' নামটির দুই পার্শ্বে পত্রিকাটির আদর্শবাণী (motto) হিসাবে ছান্দোগ্য উপনিষদের 'তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!' কথাগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল। স্বামীজী তখন বৈদ্যনাথধামে বা বেলুড়ে ছিলেন।* সুতরাং ঐ আদর্শবাণী যে তাঁহার অনুমোদিত ছিল, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করিবার পূর্বেই ঐ আদর্শবাণীটির পরিবর্তে পূর্বোক্ত স্থানে কঠোপনিষদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' বাণীটি মুদ্রিত হয়। (তদবধি আজ প্রায় ৮২ বৎসর যাবৎ উহাই 'উদ্বোধনে'র আদর্শ-বাণীরূপে প্রতি সংখ্যায় মুদ্রিত হইতেছে।) এই পরিবর্তনও নিঃসন্দেহে স্বামীজীর অনুমোদিত। মনে হয় 'তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!' অপেক্ষা 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি বাণীটি সর্বসাধারণের সহজবোধ্য হইবে বলিয়াই এই পরিবর্তন সংসাধিত হয়। স্বামীজী 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' এই বাণীর যে-ইংরেজী রূপান্তর করিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ হইল: 'উঠ, জাগো, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততক্ষণ থামিও না।' বলা বাহুল্য, এই কথাগুলি স্বামীজী লিখিত 'উদ্বোধনে'র প্রথম সংখ্যার 'প্রস্তাবনা'র সহিত এক সুরে বাঁধা। কিন্তু এই পরিবর্তনের দ্বারা 'তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!' এই আদর্শবাণীটি বাতিল হইয়া যায় নাই। কারণ, স্বামীজী 'লক্ষ্যে' পৌঁছিবার কথা বলিয়াছেন। সেই 'লক্ষ্য'—অদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে—'তত্ত্বমসি' এই মহা-বাক্যের তাৎপর্য অপরোক্ষভাবে অনুভূতি করা। আমরা যে-কোন কাজ করি না কেন, 'লক্ষ্য' আমাদের সর্বদাই—স্বামীজীর ভাষায়—"অদ্বৈত-বাদের শেষ কথা 'তত্ত্বমসি'।"

নববর্ষের প্রারম্ভে 'উদ্বোধনে'র প্রাণপুরুষ স্বামীজীকে স্মরণ করিয়া, প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে স্মরণ করিয়া এবং স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ পরবর্তী সম্পাদকগণকে স্মরণ করিয়া 'তত্ত্বমসি'র তাৎপর্য যথাশক্তি সহজবোধ্য করিয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত করা হইল।

---

* প্রথম সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন স্বামীজী বৈদ্যনাথধামে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা যখন প্রকাশিত হয়, তখন স্বামীজী বেলুড় মঠে।

'তত্ত্বমসি'

১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "তোমরা কখনই সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পূর্ণ একত্বের বেশি অগ্রসর হইতে পার না। বেদ অনেক দিন পূর্বেই এই পূর্ণ একত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহার চেয়ে বেশি অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যখনই 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল; এই 'তত্ত্বমসি' বেদে রহিয়াছে।" ঐ সালেই কলিকাতায় 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "...সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈতে 'তত্ত্বমসি'তে পর্যবসিত, ইহা দেখানোই আমার জীবনব্রত।" ১৮৯৫ সালে আমেরিকার থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর মন যখন অত্যুচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করিত, তখন 'The Song of the Sannyasin' ('সন্ন্যাসীর গীতি') নামে যে অপূর্ব কবিতাটি তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও বিভিন্ন স্তবকে 'Thou art That' ('তত্ত্বমসি') কথাটি চারবার উল্লিখিত দেখা যায়। ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে প্রদত্ত 'আত্মার মুক্তস্বভাব' শীর্ষক বক্তৃতাতেও 'ঈশ্বরের সগুণ ধারণা দূর হইয়া' কিভাবে ক্রমশঃ 'নির্গুণ ধারণা উপস্থিত হয়' তাহার ব্যাখ্যান্তে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক উপনিষদের শেষ বাণী—'তত্ত্বমসি'। একমাত্র নিত্য আনন্দময় পুরুষই আছেন, এবং সেই পরমতত্ত্বই এই জগৎরূপে—বহুভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।"

"প্রত্যেক উপনিষদের শেষ বাণী—'তত্ত্বমসি'"—ইহার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি উপনিষদেই হুবহু 'তত্ত্বমসি' কথাটি আছে। 'তত্ত্বমসি' কথাটি ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে উদ্দালক-শ্বেতকেতু-সংবাদেই আছে। কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে 'তত্ত্বমসি'র যে-তাৎপর্য, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য, তাহা প্রত্যেকটি উপনিষদেরই চরম সিদ্ধান্ত—ইহাই স্বামীজীর কথার মর্ম।

"প্রত্যেক উপনিষদের শেষ বাণী—'তত্ত্বমসি'" এবং "যখনই 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল"—স্বামীজীর এই-জাতীয় বিভিন্ন উক্তি হইতে আমরা 'তত্ত্বমসি' কথাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। বেদান্তে পরিনিষ্ণাত বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন 'তত্ত্বমসি'—এই 'মহাবাক্য'টিকে[১] বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ সেই সকল ব্যাখ্যা সর্বসাধারণের ধরাছোঁয়ার বাহিরে। এদিকে স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, কঠিন সংস্কৃত ভাষার 'দুর্ভেদ্য পেটিকা'য় যে-সকল তত্ত্ব আবদ্ধ রহিয়াছে, সেগুলিকে বাহির করিয়া সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে; অবশ্য 'সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষাও চলিবে, কারণ সংস্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃত-শব্দগুলির

১ উপনিষদের যে-সকল বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেগুলিকে 'মহাবাক্য' বলে। চারিটি বেদে চারিটি মহাবাক্য আছে: (১) 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদ্), (২) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্), (৩) 'তত্ত্বমসি' (সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ্) এবং (৪) 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (অথর্ববেদীয় মাণ্ডূক্য উপনিষদ্)। 'মহাবাক্যে'র সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, উপরি-উক্ত চারিটি বাক্যই 'মহাবাক্য'। অন্যেরা বলেন, ঐ চারিটি 'মহাবাক্য'ই প্রধান বা প্রসিদ্ধ, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক আরও অনেক বাক্য আছে, সেগুলিও নিঃসন্দেহে 'মহাবাক্য'। Col. Jacob-এর মতে মহাবাক্য ১২টি (তাঁহার সম্পাদিত 'বেদান্তসার' গ্রন্থের পৃঃ ১৫৫ দ্রষ্টব্য)।

উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে।'

স্বামীজীর নির্দেশ স্মরণ করিয়া 'কথাপ্রসঙ্গে' প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে আমরা সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ ভারতের প্রাচীন জ্ঞানরাশির কিছু কিছু যথাসম্ভব সহজবোধ্য করিয়া মধ্যে মধ্যে সাধারণ পাঠকবর্গের জন্য উপস্থাপিত করিয়া থাকি। বর্তমান ক্ষেত্রেও আমরা যতদূর সম্ভব জটিলতা পরিহার করিয়া 'তত্ত্বমসি'—এই 'মহাবাক্য'টির তাৎপর্য আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব

'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বেদান্তের আচার্যগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, যাঁহাদের জন্য তাঁহারা ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই উপনিষদ্‌গুলি পড়িয়াছেন। যেমন, শংকরাচার্য তাঁহার রচিত 'বাক্যবৃত্তি'[২] নামক পুস্তিকায় কে 'তত্ত্বমসি' বলিতেছেন, কাহাকে বলিতেছেন, ইত্যাদি কথার অবতারণা করেন নাই; সরাসরি 'তত্ত্বমসি' বাক্যটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রসঙ্গ-বহির্ভূতভাবে আলোচনা না করিয়া প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াই আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করিব, কারণ আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, সম্ভবতঃ অনেকেই মূল উপনিষদ্‌টি (ছান্দোগ্য) পড়েন নাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ড হইতে ষোড়শ খণ্ড পর্যন্ত—নয়টি খণ্ডের প্রত্যেকটির শেষাংশে 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—এই কথাগুলি আছে। কথাগুলি বলিয়াছিলেন ঋষি উদ্দালক তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে। যতবারই শ্বেতকেতু কথাগুলি শুনিয়াছিলেন, ততবারই তাঁহার মনে কিছু-না-কিছু সংশয় জাগিয়াছিল, এবং তাহার সমাধানকল্পে উদ্দালককে প্রতিবারই অনেক কথা বলিয়া শেষে পূর্বোক্ত কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। এইভাবে শ্বেতকেতু নয়বার 'তত্ত্বমসি' কথাটি শুনিয়াছিলেন এবং নবম বারের পর তাঁহার আর কোন প্রশ্ন ছিল না, তিনি 'তত্ত্বমসি'র তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্বেতকেতু নয়বার পিতৃমুখ হইতে 'তত্ত্বমসি' শুনিলেন, এবং তাহার ফলেই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইল; 'তত্ত্বমসি' শুনিয়া তাঁহাকে ধ্যানাদি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইল না। এইজন্যই অদ্বৈতবেদান্তের একটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বলেন যে, বেদান্তশ্রবণই মুখ্য; বেদান্তবাক্য হইতেই জ্ঞান হয়—এমনকি 'তত্ত্বমসি' একবারমাত্র শুনিলেও জ্ঞান হইতে পারে, শ্রোতা যদি যোগ্য অধিকারী হন। অর্থাৎ তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, আত্মদর্শনের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিনটি উপায়ের মধ্যে শ্রবণই অঙ্গী—মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গমাত্র; শ্রবণ হইতে সরাসরি জ্ঞান না হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন করণীয়। অবশ্য ইহার বিপরীত-মতাবলম্বী অদ্বৈতবেদান্তবাদীরাও আছেন। তাঁহারা বলেন, নিদিধ্যাসনই মুখ্য; উহাই অঙ্গী—শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের অঙ্গমাত্র; নিদিধ্যাসন ব্যতীত জ্ঞান হয় না—শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের সহায়কমাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এই অঙ্গ-অঙ্গী-সম্বন্ধীয় মতদ্বৈধের উল্লেখ করিলাম। এখন মূল বাক্যটি আমাদের আলোচ্য। 'তত্ত্বমসি' বাক্যটির বহু ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাগুলি যে কতদূর পরস্পর-বিরোধী হইতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা সুবিদিত যে, পূর্বে সংস্কৃতে দাঁড়ি ভিন্ন অন্য কোনও যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হইত না—কোথাও এক দাঁড়ি

২ 'বাক্য'টি হইল 'তত্ত্বমসি' (তৎ ত্বম্ অসি)। 'বৃত্তি'=ব্যাখ্যা

(তাহাও যথাস্থানে সর্বত্র নহে), কোথাও বা দুই দাঁড়ি, এইমাত্র ব্যবহৃত হইত। (বর্তমানে অবশ্য বুঝিবার সুবিধার জন্য 'কমা', 'সেমিকোলন', 'কোলন', 'হাইফেন', 'ড্যাশ' ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহৃত হইতেছে)। ফলে খুশিমতো ব্যাখ্যা করিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকিত। 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো'—এই কথাগুলি যদি আজ আমরা যতিচিহ্নসমেত লিখি, তাহা হইলে দাঁড়াইবে—'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্। তৎ সত্যম্। স আত্মা। তৎ ত্বম্ অসি, শ্বেতকেতো!' এবং অর্থ হইবে—'এই সব এতদাত্মক।' (নিখিল জগৎ সদাত্মক, সৎস্বরূপ)। 'তাহাই সত্য।' (ঐ সৎ-ই সত্য)। 'তিনিই আত্মা (ব্রহ্ম[৩])।' "হে শ্বেতকেতু! তুমি সেই 'তৎ' (ব্রহ্ম)।" কিন্তু উপনিষদের কথাগুলিতে এইরূপ পূর্ণ বিরতির চিহ্ন না থাকায় নৈয়ায়িকগণের পক্ষে বলিতে কোনই অসুবিধা হইল না যে, 'স আত্মা তৎ ত্বম্ অসি'—এই অংশে 'তৎ' বলিয়া কোনও শব্দ নাই; উহার পরিবর্তে আছে 'অতৎ' শব্দটি, এবং 'আত্মা' ও 'অতৎ' এই দুইটি শব্দ সন্ধিবদ্ধ হইয়া 'আত্মাতৎ' হইয়াছে।[৪] সুতরাং নৈয়ায়িকগণের মতে উপনিষদের কথাগুলি হইল—'স আত্মা। অতৎ ত্বম্ অসি' এবং উহার ব্যাখ্যা হইল—'তিনি আত্মা (ব্রহ্ম)।' হে শ্বেতকেতু! তুমি 'অতৎ'—অব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম নও।' যদি 'স আত্মা'র পর দাঁড়ি থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হইত না।

বলা বাহুল্য, নৈয়ায়িকগণের এই ব্যাখ্যা শংকরাচার্যের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। মধ্বাচার্য-প্রমুখ বেদান্তসম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্যগণ 'তৎ ত্বম্ অসি'র যে-সব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেগুলির ভিতর প্রবেশ করিলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে এবং যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং আমরাও তাঁহার অনুগামী, সেইহেতু আমরা এখন 'তত্ত্বমসি'র অদ্বৈতপর ব্যাখ্যার আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

কিন্তু এখানেও অসুবিধা এই যে, অদ্বৈতবাদীরাও 'তত্ত্বমসি' বাক্যটিকে নানা ভাবে ও নানা পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করিয়া সর্বসাধারণের দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা এই দুর্বোধ্যতার কিছুটা ইঙ্গিত দিয়া পরিশেষে 'বাক্যবৃত্তি' পুস্তিকায় শংকরাচার্য মাত্র ৫৩টি শ্লোকে যে সহজ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার সার-সংক্ষেপ উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইব।

---

৩ উপনিষদে আত্মা, ভূমা, আকাশ, প্রাণ ইত্যাদি শব্দ স্থলবিশেষে 'ব্রহ্ম' অর্থে ব্যবহৃত। ইহা সমস্ত বেদান্তবাদীদেরই স্বীকৃত। অদ্বৈতবেদান্তীরা আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে পরমার্থতঃ কোনও পার্থক্য স্বীকার করেন না। উপনিষদ্‌গুলিতে আত্মা কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি রূপে যখন বর্ণিত দেখা যায়, তখন তাঁহারা জীব বা জীবাত্মার কথা বলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সর্বদাই স্মরণ করাইয়া দেন যে, অন্তঃকরণ-উপাধিযোগেই ব্রহ্মের জীবত্ব। 'তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ', ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।২৯, ইত্যাদির শাংকরভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৪ আজকাল আমরা সংস্কৃত শব্দগুলি পৃথক্ পৃথক্ লিখি, কিন্তু পূর্বে শব্দগুলি টানা (ফাঁক না দিয়া) লেখা হইত—যেখানে সন্ধি নাই, সমাস নাই, সেখানেও শব্দগুলি জুড়িয়াই লেখা হইত। যথা, 'ঐতদাত্ম্যমিদংসর্বংসআত্মাতত্ত্বমসি'; শুধু 'তত্ত্বমসি' কথাটিই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—উহাতে সন্ধি-সমাস-হীন তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক্ শব্দ—তৎ, ত্বম্, অসি—রহিয়াছে। এখনও অনেক পুরাতন পুস্তকে এইরূপ টানা লেখা বা জুড়িয়া লেখা মুদ্রিত দেখা যায়। মনে রাখিতে হইবে, এইগুলি 'শ্রুতি'—গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে মুখে মুখে বহুকাল চলিতে থাকে এবং পরে লিপিবদ্ধ হয়। (যেগুলি শ্রুতি নহে, সেগুলিতে পর্যন্ত এইরূপ জুড়িয়া লেখা মুদ্রিত দেখা যায়)।

উদ্দালক যখন শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন, 'তুমি ব্রহ্ম', তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি বলিতেছেন যে, জীবমাত্রেই ব্রহ্ম ; কারণ শ্বেতকেতুই কেবলমাত্র ব্রহ্ম, অন্যেরা নহে—উদ্দালকের এইরূপ অযৌক্তিক অভিপ্রায় হইতেই পারে না। কিন্তু জীব কি করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারে ? ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, নির্বিকার অখণ্ড চৈতন্য আর জীব সসীম, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, এক দেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রমণশীল খণ্ড চৈতন্য মাত্র। সুতরাং 'জীব ব্রহ্ম'—এই বাক্যটির অন্তর্গত 'জীব' ও 'ব্রহ্ম'—এই দুইটি পদের বাচ্যার্থ অর্থাৎ মুখ্যার্থ (direct or primary meaning) গ্রহণ করিলে বাক্যটির অর্থ করা যায় না। যখন কোন বাক্যের অন্তর্গত এক বা একাধিক পদের মুখ্যার্থের দ্বারা ঐ বাক্যের কোন অর্থ করা যায় না, তখন লাক্ষণিক অর্থ (implied or secondary meaning) গ্রহণ করিতে হয়। 'জীব ব্রহ্ম'—এই বাক্যে 'ব্রহ্ম' শব্দের বাচ্যার্থ যদি উল্লিখিত শুদ্ধচৈতন্য হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র 'জীব' শব্দটির লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, শুদ্ধচৈতন্যই অন্তঃকরণরূপ উপাধিহেতু 'জীব'নামে অভিহিত হন—অদ্বৈতবেদান্তের প্রচলিত ভাষায়, অন্তঃকরণ-উপহিত চৈতন্যই জীব। সুতরাং অন্তঃকরণরূপ উপাধিটি বাদ দিলে জীব যে ব্রহ্ম ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।[৫]

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, 'তৎ ত্বম্ অসি'—এই বাক্যে 'তৎ' শব্দের বাচ্যার্থ কি শুদ্ধব্রহ্ম ? এ-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। শংকরাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন, 'এষ ব্যাবৃত্ত-সর্ব-সংসার-ধর্মকঃ অনুভবাত্মকঃ ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ তৎ-পদার্থঃ বেদান্তাভিযুক্তানাং প্রসিদ্ধঃ।' (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।২, ভাষ্য)। তাৎপর্য এই যে, উপনিষদে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জন্মরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত ('অজম্ অজরম্ অমরম্'), স্থূলতারহিত, অণুত্বরহিত, হ্রস্বত্বরহিত, দীর্ঘত্বরহিত ('অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্') ইত্যাদি, অর্থাৎ সমস্ত-সংসারধর্মরহিত ; সেই শুদ্ধব্রহ্ম অনুভবাত্মক অর্থাৎ তাঁহাকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করা যায়, এবং বেদান্তের আচার্যগণের নিকট এইরূপ শুদ্ধব্রহ্মই 'তৎ ত্বম্ অসি' এই বাক্যের অন্তর্গত 'তৎ' পদের অর্থরূপে (বাচ্যার্থরূপে) প্রসিদ্ধ। এখানে লক্ষ্যার্থের কোনও উল্লেখ না থাকায় 'অর্থরূপে' বলিতে কেহ কেহ 'বাচ্যার্থরূপে'ই গ্রহণ করিয়া থাকেন।[৬]

---

৫ এইরূপ লক্ষণা (implication)-কে 'ভাগলক্ষণা' বা 'ভাগত্যাগলক্ষণা' বলে। ইহাতে বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হয়, অবিরুদ্ধ অংশ গৃহীত হয়। অর্থাৎ এক ভাগ গ্রহণ করা হয়, অন্যভাগ ত্যাগ করা হয়। জীব=অন্তঃকরণ+শুদ্ধচৈতন্য। শুদ্ধচৈতন্য-অংশটি গৃহীত হইল, অন্তঃকরণ-অংশটি পরিত্যক্ত হইল। লক্ষণীয় যে,'জীব ব্রহ্ম'—এই বাক্যে আমরা 'ব্রহ্ম' শব্দে লক্ষণা প্রয়োগ করিলাম না।

৬ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এবং অন্যত্রও শংকরাচার্য বারংবার একই সঙ্গে লিখিয়াছেন, ব্রহ্ম (১) সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ এবং (২) অজ, অজর, অমর, অস্থূল, অনণু ইত্যাদি। আলোচ্য ৪।১।২ সূত্রের ভাষ্যেও এই ব্যাপার দেখা যায়। ফলে অনেক বেদান্তবাদী শুদ্ধব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলেন। (অপ্পয় দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহঃ', ১।৪।১ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শংকরাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের অন্যত্র (২।১।১৪) ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব, জগৎকারণত্বাদি ধর্ম পারমার্থিক নহে বলিয়াছেন। 'কথামৃতে'ও আমরা লক্ষ্য করি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাজরাকে বলিতেছেন, 'তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন ? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য ভাবি, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি।' (১।১৩।৭)। বলা বাহুল্য, এখানে 'শুদ্ধাত্মা'র অর্থ 'শুদ্ধব্রহ্ম'—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি কিছুই করেন না। তাই শুদ্ধব্রহ্মকে আমরা 'তৎ'-পদের বাচ্যার্থ বলি না।

কিন্তু শংকরাচার্য তাঁহার 'বাক্যবৃত্তি' গ্রন্থে 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ হিসাবে মায়া-উপাধি-যুক্ত, জগৎ-কারণ, সর্বজ্ঞত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকেই অর্থাৎ ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়াছেন—শুদ্ধব্রহ্মকে নহে ('মায়োপাধির্জগদ্‌যোনিঃ সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ', ৪৫) আর 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ হিসাবে অন্তঃকরণ-উপাধিযুক্ত অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি জীবকে গ্রহণ করিয়াছেন ('অন্তঃকরণসংভিন্নবোধঃ স ত্বংপদাভিধঃ', ৪৪)। সুতরাং 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থের দ্বারা উহাদের ঐক্য সিদ্ধ হইতে পারে না। লক্ষণার দ্বারাই ঐক্য সিদ্ধ হইতে পারে। আর ঐ লক্ষণা শুধু জীবে নহে, মায়োপাধি ব্রহ্ম, যাঁহার অপর নাম ঈশ্বর, তাঁহাতেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ জীবের যেমন অন্তঃকরণ-উপাধি বাদ দিতে হইবে, ঈশ্বরেরও তেমনই মায়া-উপাধি বাদ দিতে হইবে। তাহা হইলেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধ হইবে। শংকরাচার্য তাঁহার 'তত্ত্বোপদেশ' নামক গ্রন্থেও অবিকল এইভাবেই 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৭]

অদ্বৈতবেদান্তীদের মধ্যে 'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এই শেষোক্ত মতটিই বিপুলভাবে সমর্থিত দেখা যায়। বিদ্যারণ্যমুনি পঞ্চদশীতে লিখিয়াছেন:

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥ (১।৪৮)

অর্থাৎ, ঈশ্বরের [শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান] মায়া-উপাধি এবং জীবের [মলিনসত্ত্বপ্রধান] অবিদ্যা[৮]-উপাধি—এই দুইটি বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যক্ত হইলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই (শুদ্ধব্রহ্মই) লক্ষিত হন। এই ভাগলক্ষণার লৌকিক দৃষ্টান্ত: দেবদত্ত নামক এক ব্যক্তিকে আমি বিশ বৎসর পূর্বে কাশীতে দেখিয়াছিলাম। এখন তাহাকেই কলিকাতায় দেখিয়া আমি বলিলাম, 'সেই এই দেবদত্ত।' কিন্তু 'সেই' শব্দের বাচ্যার্থ এবং 'এই' শব্দের বাচ্যার্থ এক নহে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, লক্ষণার দ্বারাই বাক্যটি অর্থবহ হইতে পারে। 'সেই' হইতে অতীতকালত্ব ও দূরদেশত্ব পরিত্যাগ করিলে এবং 'এই' হইতে বর্তমানকালত্ব ও সমীপদেশত্ব পরিত্যাগ করিলে 'দেবদত্ত' নামক ব্যক্তিটিকেই আমরা পাই; অর্থাৎ, বিরুদ্ধাংশ পরিত্যক্ত হইলে 'সেই এই দেবদত্ত' বাক্যটি অর্থবহ হয়। 'তৎ ত্বম্ অসি'র ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। তবেই 'তৎ ত্বম্ অসি' অর্থবহ হয়। লক্ষণীয় যে, যদিও

৭ সতি দেহাদ্যুপাধৌ স্যাজ্জীবস্তস্য নিয়ামকঃ। ঈশ্বরঃ শক্ত্যুপাধিত্বাদ্ দ্বয়োর্বাধে স্বয়ংপ্রভঃ॥
—তত্ত্বোপদেশ, শ্লোক ১৯

অর্থাৎ, দেহাদি উপাধি থাকিলে ব্রহ্মই 'জীব' নামে এবং [মায়া] শক্তিরূপ উপাধিহেতু ব্রহ্মই জীবের নিয়ন্তা 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত হন। উভয়ের উপাধি বাধিত (অপনোদিত) হইলে স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

৮ আমরা শংকরাচার্যের 'বাক্যবৃত্তি' হইতে দেখাইয়াছি যে, জীবের উপাধি 'অন্তঃকরণ'। পঞ্চদশীকার এখানে বলিতেছেন, জীবের উপাধি 'অবিদ্যা'। এ-বিষয়ে অনেক কথা আছে; সংক্ষেপে বলা যায়, জীবের যাবতীয় ব্যবহার অন্তঃকরণের সাহায্যেই হয় এবং অন্তঃকরণ ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যারই পরিণাম। কারণ হইতে কার্য অভিন্ন বলিয়া অবিদ্যারূপ কারণ হইতে অন্তঃকরণরূপ কার্য অভিন্ন। সুতরাং অবিদ্যাকে জীবের উপাধি বলা আর অন্তঃকরণকে জীবের উপাধি বলা—একই কথা। (যদিও আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য 'জীবের উপাধি' শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলাম, সর্বদাই এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখা দরকার যে, উপাধিটি ব্রহ্মেরই। ব্রহ্মের উপাধি যখন অবিদ্যা বা অন্তঃকরণ হয়, তখন ব্রহ্ম জীবরূপী হন, এবং তাঁহার উপাধি যখন মায়া হয়, তখন তিনি ঈশ্বররূপী হন।)

'অসি' পদটি একটি ক্রিয়াপদ (অদাদি-গণীয় অস্ ধাতু, লট্, মধ্যমপুরুষ, একবচন), তথাপি উহা যে কোনও ক্রিয়ার বোধক নহে, ইহা সহজেই বুঝা যায়—'অসি' পদটি বস্তুতঃ ঐক্যের সূচক মাত্র।

আমরা পঞ্চদশীর 'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রথম পরিচ্ছেদের একটিমাত্র শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ শ্লোকটির অব্যবহিত পূর্বে এবং পরেও এই-বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক আছে। পঞ্চদশীর 'মহাবাক্যবিবেক' নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকে নামরূপবিবর্জিত, এক, অদ্বিতীয়, সৎ-বস্তুই যে 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ (রামকৃষ্ণের টীকা দ্রষ্টব্য), তাহা বলা হইয়াছে। 'তৃপ্তিদীপ' নামক সপ্তম পরিচ্ছেদেও বিদ্যারণ্যমুনি 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং শংকরাচার্যের 'বাক্যবৃত্তি' হইতে চারিটি শ্লোক (৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮) উদ্ধৃত করিয়াছেন (৭।৭১-৭৪)। এই চারিটি শ্লোকের মধ্যে দুইটি শ্লোক (৪৪, ৪৫) সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।[৯] এই সকল কথার অবতারণা এইজন্য যে, আমরা ইহাই পরিস্ফুট করিতে চাই যে, পঞ্চদশীকারও 'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যায় শংকরাচার্য-রচিত 'বাক্যবৃত্তি'র পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন।

প্রখ্যাত অদ্বৈতবেদান্তী মধুসূদন সরস্বতীর মতে সমগ্র গীতাই 'বাক্যবৃত্তি'—অর্থাৎ, 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা। তাঁহার গীতাটীকার উপক্রমণিকা-শ্লোকাবলীতে তিনি লিখিয়াছেন যে, গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'ত্বং'-পদার্থের কথা, সপ্তম হইতে দ্বাদশ—এই ছয় অধ্যায়ে 'তৎ'-পদার্থের কথা এবং অবশিষ্ট ছয় অধ্যায়ে 'তৎ' ও 'ত্বং'-পদের ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে। 'তৎ'-পদের বাচ্যার্থ যে ঈশ্বর এবং লক্ষ্যার্থ যে সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত শুদ্ধচৈতন্য, ইহা তিনি সুস্পষ্টভাষায় বিবৃত করিয়াছেন।[১০]

মহাত্মা নিশ্চলদাস হিন্দী ভাষায় রচিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বিচারসাগর'[১১] গ্রন্থের ষষ্ঠ তরঙ্গে 'তত্ত্বমসি'র যে-ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাও 'বাক্য-বৃত্তি'রই অনুরূপ। তিনি বলেন, 'তৎ ত্বম্ অসি' এই বাক্যের বিচার ভাগত্যাগ-লক্ষণার দ্বারাই করিতে হয়। ঈশ্বর 'তৎ'-পদবাচ্য, জীব 'ত্বং'-পদবাচ্য ; উভয়ের পরস্পরবিরোধী ধর্মসমূহ অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি এবং জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম-সমূহ ত্যাগ করিলে উভয়ের অধিষ্ঠানভূত এক অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যই অবশিষ্ট থাকেন। উভয়ের চৈতন্যভাগে একতায় কোনও বাধা নাই।

'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ পণ্ডিতদের 'বাচ্যার্থ', 'লক্ষ্যার্থ', 'ভাগত্যাগ-লক্ষণা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার না করিয়া একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি সহজবোধ্য করিয়াছেন। 'যুক্তি ও ধর্ম' বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "বেদান্ত যখন বলেন, 'তুমি আমি ব্রহ্ম', তখন সেই ব্রহ্ম বলিতে সাকার ঈশ্বর বুঝায় না। একটি উদাহরণ দিতেছি। একতাল কাদা লইয়া একটি প্রকাণ্ড মাটির হাতি গড়া হইল ; আবার সেই কাদার সামান্য অংশ লইয়া ছোট

---

৯ ৪৬ ও ৪৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, 'তত্ত্বমসি'তে ভাগলক্ষণার দ্বারা অর্থ করিতে হয় ; 'তৎ' ও 'ত্বং'-এর মুখ্যার্থের দ্বারা বাক্যটির অর্থ করিতে গেলে বিরোধ উপস্থিত হয়।

১০ 'ব্রহ্মণঃ তৎপদবাচ্যস্য সোপাধিকস্য জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতোঃ প্রতিষ্ঠা পারমার্থিকং নির্বিকল্পকং সচ্চিদানন্দাত্মকং নিরুপাধিকং তৎপদলক্ষ্যম্—অহং নির্বিকল্পকঃ বাসুদেবঃ প্রতিতিষ্ঠতি অত্র ইতি প্রতিষ্ঠা—কল্পিতরূপরহিতম্ অকল্পিতং রূপম্...।' (গীতা, ১৪।২৭, 'গূঢ়ার্থদীপিকা' টীকা)

১১ 'বিচারসাগর' গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি (১৮৯৪ সালে) : 'ভারতে গত তিন শতাব্দী ধরিয়া যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিচারসাগর-গ্রন্থের প্রভাব ভারতীয় জনসমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক।' (বাণী ও রচনা, ৫।৪৪৯)

একটি মাটির ইঁদুরও গড়া হইল। ঐ মাটির ইঁদুরটি কি কখনও মাটির হাতি হইতে পারিবে? কিন্তু দুটিকে জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে দুইটিই কাদা হইয়া যায়। কাদা বা মাটি হিসাবে দুইটিই এক; কিন্তু ইঁদুর ও হাতি হিসাবে তাহাদের মধ্যে চিরদিন পার্থক্য থাকিবে। অসীম, নিরাকার ব্রহ্ম যেন পূর্বোক্ত উদাহরণের মাটির মতো। স্বরূপের দিক দিয়া আমরা ও বিশ্বনিয়ন্তা এক, কিন্তু অভিব্যক্ত জীবরূপে—মানুষরূপে আমরা তাঁহার চিরদাস, তাঁহার পূজক।"

স্বামীজীর এই উদাহরণে আমাদের আলোচিত শৈলী প্রযুক্ত হইলে, উহা এইরূপ দাঁড়াইবে: 'ইঁদুরও যা হাতিও তা'—এই বাক্যে যেহেতু 'ইঁদুর' ও 'হাতি'র বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে বাক্যটি অর্থহীন হয়, সেইহেতু ভাগলক্ষণার দ্বারা উভয় পদের লক্ষ্যার্থ 'মাটি'কে গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে ইঁদুরের ক্ষুদ্রাকারত্ব-রূপ উপাধি ও হাতির বৃহদাকারত্ব-রূপ উপাধির ভাগ পরিত্যাগ করিলে উভয়ের একই উপাদান মাটিই অবশিষ্ট থাকে। ফলে বাক্যটি অর্থবহ হয়।

পরিশেষে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। অদ্বৈতবেদান্তের সকল ব্যাখ্যাকারই যে ভাগ-লক্ষণার দ্বারা 'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নহে। বাচস্পতি মিশ্র, ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র[১২] প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারগণ 'তৎ' ও 'ত্বং' পদে লক্ষণা না করিয়াই উভয় পদের একতা সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মত অদ্বৈত-বেদান্তসম্প্রদায়ে তেমন সমাদৃত হয় নাই; এইজন্য বর্তমান প্রবন্ধে উহা পল্লবিত করা নিষ্প্রয়োজন।

১২ 'বেদান্তপরিভাষা'য় ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র অবশ্য প্রথমে অদ্বৈতবেদান্তের সাম্প্রদায়িক মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন: "যথা বা 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদৌ তৎ-পদবাচ্যস্য সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টস্য ত্বং-পদবাচ্যেন অন্তঃকরণবিশিষ্টেন ঐক্যাযোগাৎ ঐক্যসিদ্ধ্যর্থং স্বরূপে লক্ষণা ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ।" এবং পরে 'বয়ং তু ব্রূমঃ' বলিয়া স্বমত উপস্থাপিত করিয়াছেন। (বেদান্তপরিভাষা, চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'মহাবাক্যে লক্ষণাখণ্ডন' দ্রষ্টব্য)

এই বহুত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্তনশীল জগতের অন্তরে অবস্থিত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন—নিজের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাখো যে, তুমিই তিনি···—'তত্ত্বমসি'; আর এই যে আমাদের বিভিন্ন ধারণা—যথা, আমি পুরুষ বা স্ত্রী, দুর্বল বা সবল, সুস্থ বা অসুস্থ, আমি অমুককে ঘৃণা করি বা অমুককে ভালবাসি, আমার ক্ষমতা অল্প বা আমার শক্তি অনেক—এগুলি ভ্রমমাত্র। এই-সব ভাব ছাড়িয়া দাও। কিসে তোমাকে দুর্বল করিতে পারে? কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? একমাত্র তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? অতএব উঠ, মুক্ত হও।

—স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন মহাসম্মেলন (১৯৮০)

উদ্বোধনী ভাষণ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আজ থেকে প্রায় চুয়ান্ন বছর আগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য ও তদানীন্তন সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখানেই এই বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অপর একজন সাক্ষাৎ শিষ্য এবং মঠ ও মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ। সেই মহা-সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল "পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়ীকরণ, আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে নূতন উদ্যমের সঞ্চার এবং সঙ্ঘের অঙ্গসমূহের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা ও সৌহার্দ সংস্থাপন"। বর্তমান মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্যও একই অর্থাৎ প্রাগুক্ত উপায়ে সঙ্ঘকে সুসংহত করা। আমি এখানে 'সঙ্ঘ' শব্দটি বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করছি। সাধারণতঃ সন্ন্যাসীদের সংস্থা প্রসঙ্গেই 'সঙ্ঘ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমি এখানে গৃহী ও অন্যান্য অ-সন্ন্যাসী ভক্তদেরও অন্তর্ভুক্ত করছি।

প্রথম মহাসম্মেলনের সময় আমরা ছিলাম বিদেশী শাসনাধীনে। সে সময়কার সমাজের অবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্ন, যদিচ তা বিশেষ প্রশংসনীয় নয়। বিগত তেত্রিশ বছর ধরে আমরা একটি স্বাধীন জাতি। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য-জনক যে, কোন কোন বিষয়ে আমাদের অবস্থা অনেক উন্নত হলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে আমাদের অধঃপতন ঘটেছে প্রচুর। দেশের সর্বাংশে, সকল সমাজে আদর্শগত ও নৈতিক মূল্যায়নের দিক থেকে অবস্থার অবনতি ঘটেছে ভীষণভাবে। এবিষয়ে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই, আপনারা সকলেই এবিষয়ে যথেষ্ট অবহিত আছেন।

এই বিরুদ্ধ পরিমণ্ডলের মধ্যে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ কোনও মানুষের পক্ষেই বসবাস করা কঠিন। মনে হয় বর্তমানের এই দুরবস্থা অপরিহার্য, কারণ কোন সভ্যতার অধঃপতন ও ভাঙন একবার শুরু হলে তা চরম পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায়, এই ভয়াবহ পরিণামের পূর্বে আমরা বিপদ-উত্তীর্ণ হতে পারি না। এইরূপ অবস্থা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বব্যাপীই আজ এই সভ্যতার সঙ্কট। এর কারণ হ'ল ধর্মকে অবহেলা করে জড়বাদী ভাবধারার অনুকরণ। এই জড়বাদ হয়েছে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জীবনাদর্শ। তাদের মাধ্যমেই এই ভাবধারার প্লাবন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, ভারতবর্ষও রেহাই পায়নি। ভারতবর্ষ যদি ধর্মত্যাগ করে, তাহলে সে অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কারণ যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনের মূল ভিত্তিভূমি এই ধর্ম। সে কারণে বর্তমানে এই আদর্শ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। প্রায়ই শোনা যায় যে, আমাদের বর্তমান অবক্ষয়ের জন্য দায়ী ধর্ম, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন এর বিপরীত কথা। তিনি বলেছেন যে, ধর্মকে সঠিকভাবে অনুসরণ না করার জন্যই আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থা।

আমাদের কতকগুলি কুসংস্কার ও দেশাচার অনুকরণ করলেই হবে না, পুনরায় সুস্থ হওয়ার জন্য আমাদের আবার সঠিক অর্থে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমাদের সঠিকভাবে জানতে হবে ধর্মের

তাৎপর্য কি। ধর্মচ্যুত আমাদের আবার যথার্থ ধর্মপথে ফিরিয়ে আনার জন্য বিগত শতাব্দীতে এই দেশেই আবির্ভূত হয়েছিলেন দুজন মহান্ অধ্যাত্মপুরুষ—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করলেন যে, মানবজীবনের লক্ষ্য ভগবানলাভ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রভাবিত সন্দিগ্ধ মানবসমাজের সম্মুখে তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে, ঈশ্বর বাস্তব সত্য। তিনি নিজে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন এবং সঠিক পথ অনুসরণ করলে যে-কেউ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবেন। এই দৃপ্ত ঘোষণা সকল সন্দেহ দূর করে দিল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান-জগতের সকল সন্দেহ দূর করে দিল, নস্যাৎ করে দিল সকল প্রকার ওজর-আপত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ধর্ম হচ্ছে উপলব্ধি, পরম সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভব। ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ লোকে ভুলে গিয়েছিল অথবা বিকৃতভাবে প্রচারিত হচ্ছিল; শ্রীরামকৃষ্ণ এসে দেখালেন ধর্মশাস্ত্রের সত্য তাৎপর্য। এছাড়াও তিনি বললেন যে, সকল ধর্মমতই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথে ঈশ্বর-উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রত্যক্ষ অনুভবই একমাত্র অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ। ত্যাগের আত্যন্তিক আদর্শে প্রবুদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ সোনা ও মাটিকে সমজ্ঞান করেছিলেন এবং বর্তমানে স্বার্থসর্বস্ব সমাজকে দেখিয়েছিলেন যে, যাবতীয় ধন আহরণ ও অপরের জমি দখল করা কত অকিঞ্চিৎকর, অলীক অর্থহীনতা! তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান। ধনী নির্ধন, উঁচু নীচু, মূর্খ বিদ্বান সকল জাতির প্রত্যেক নর ও নারীর মধ্যে একই আত্মা বিদ্যমান। এই সকল বিভেদ কল্পিত ও মানুষেরই সৃষ্ট। তারা যেন সমুদ্রের উপরিভাগের ঢেউয়ের মত; কিন্তু গভীর তলদেশে শুধুমাত্র জল। ঠিক তেমনি, এই সকল ভেদবৈচিত্র্য নেহাৎই মামুলি বাইরের ব্যাপারমাত্র, এই সকলের পশ্চাতে নিত্য স্থিত রয়েছেন সেই একই আত্মা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র মানবসমাজ একই সত্তা। জাতিতে জাতিতে সমাজে সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে পৃথিবীব্যাপী যে দ্বন্দ্ব আমরা দেখছি তা থাকা অনুচিত। এই শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে তিনি ঘোষণা করলেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ। তিনি বললেন যে, এভাবে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে মানুষের সেবা করলে মানুষ পরিণামে ঈশ্বর উপলব্ধি করতে পারবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে কর্ম ও উপাসনার মধ্যে বহুশতাব্দী-প্রচলিত সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে একটি সমন্বয় নিয়ে এলেন। তিনি দেখালেন যে, যথার্থ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্ম করলে তা উপাসনায় পরিণত হয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই সার্বিক সুসমাচার শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্য। আমরা নিশ্চয়ই বহির্বিশ্বের সকলের সঙ্গে সমভাবে এই সুসমাচারের অংশভাক্ হব, কারণ এইভাবেই আমরা নিজেদেরকে সত্যিকারের সাহায্য করতে পারব। যেহেতু সম্প্রসারণই জীবন আর সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। "আমরা পূর্বেও এরূপ বহুবার করেছি, আবার বর্তমানকালেও আমাদের আরও একবার করতে হবে।" জগতের যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পৌঁছেছে সেখানেই সকলে একে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। এই তথ্য থেকে ধারণা হয় যে সমগ্র জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষমাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উপর স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি মঠ ও মিশনের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আদর্শ (অর্থাৎ নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ)। জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য এই আদর্শের একান্ত

প্রয়োজন ছিল। বনের নিভৃত কুটীরে ও মঠে সীমাবদ্ধ অদ্বৈতবেদান্তকে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি মৌল তত্ত্বটি গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শের মধ্যে

স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, জাতীয় জীবনের পরম আদর্শ মোক্ষলাভ থেকে বিচ্যুত না হয়েও দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে এই আদর্শ অবলম্বনে দেশের নবনির্মাণের কাজে নিয়োগ করা যায়। স্বামীজীর মতে দেশের নবনির্মাণের কাজে এগোবার পথে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে নারীসমাজ ও জনগণের শিক্ষার দিকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁর মতে জনসাধারণ ও নারীগণের অবহেলাই ভারতের অধঃপতনের দুটি প্রধান কারণ। তিনি বলতেন, "আমি মনে করি আমাদের জাতীয় মহাপাপ হচ্ছে জনসাধারণের অবহেলা, এবং ভারতের অধঃপতনের এটাই অন্যতম কারণ। যতদিন পর্যন্ত না ভারতের জনসাধারণ সুশিক্ষিত হচ্ছে, খেতে পরতে পারছে, এবং তাদের যথাযোগ্য যত্ন নেওয়া হচ্ছে, হাজার রাজনীতি করেও তাদের কোনও স্থায়ী কল্যাণ করা সম্ভব হবে না···ভারতকে যদি আমরা জাগাতে চাই তবে জনসাধারণের জাগরণের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।" অনুন্নত জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি করতেই হবে। আমরা যেন মনে না করি যে 'তাদের স্পর্শ করলে বা তাদের সঙ্গে বসলে' আমরা অপবিত্র হয়ে যাব। যে বেদান্ত সম্বন্ধে আমরা এত গৌরবান্বিত বোধ করি তার শিক্ষা এরূপ নয়। এর ফলে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছি এবং জাতির সর্বনাশ ঘটিয়েছি। উচ্চবর্ণের ও ধনীদের তাদের কৃত দুষ্কর্মের নিরাকরণ করতে হবে, এই সকল অনুন্নত ও দরিদ্র লোকের ওপর তারা যে অত্যাচার করেছে তার সংশোধন করতে হবে। এদের সেবা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। একমাত্র এই উপায়ে আমরা দেশের পুনর্গঠন করতে পারব। তাদেরকে দিতে হবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে আমাদের অধ্যাত্ম সত্যসকল এবং কৃষি, কুটিরশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের অর্থনৈতিক মানের উন্নতি করতে হবে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে প্রত্যেকের কর্তব্য দেশের সকল অংশে ও সমাজের সকল স্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বিক বাণী প্রচার করা। প্রত্যেকের কর্তব্য কম ভাগ্যবান, অনুন্নত ও উপজাতি মানবগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করা; প্রত্যেকের কর্তব্য তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা; প্রত্যেকের কর্তব্য সমাজজীবনে আদর্শ ও নীতিবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাতে করে, সারা দেশে, বিশেষতঃ সমগ্র জাতির সর্বনাশের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত যে জঘন্য স্বার্থপরতা, তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়।

নারীদেরও সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা পুরুষের ব্যতিচার ছাড়াই নিজেদের সমস্যার নিজেরাই সমাধান করতে পারে। স্বাধীনতা-উত্তর দেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি লক্ষণীয়, কিন্তু আরও অনেক করতে হবে। স্বামীজী বলেছেন, "শক্তি ভিন্ন জগতের কোন কল্যাণই সম্ভবপর নয়।···ভারতবর্ষে সেই মহতী শক্তির পুনর্জাগরণের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই পুনরায় সংসারে গার্গী মৈত্রেয়ী সকল আবির্ভূত হবে।" স্বামীজী চেয়েছিলেন যে, কিছুসংখ্যক শিক্ষিতা নারী সন্ন্যাসের ব্রত গ্রহণ করে মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যাতে তারা আদর্শ নারীরূপে গড়ে উঠতে পারে;

তিনি চেয়েছিলেন যে, সন্ন্যাসিনীরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এ-ধরনের কাজ করবে, যার ফলে সমগ্র দেশবাসী, বিশেষতঃ অনুন্নত মানুষেরা উপকৃত হতে পারে। আপনারা সকলে জানেন যে, স্বামীজীর পরিকল্পিত এরূপ একটি সংস্থা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নারী-উন্নয়নের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করে চলেছে।

আমি আপনাদের বলতে চাই যে, ভারতবর্ষ শুধুমাত্র তার বহু শতাব্দীব্যাপী অনুসৃত নিজস্ব জাতীয় প্রতিভার অনুসরণ করেই অগ্রসর হতে পারবে। ধর্মের একটি মূলভিত্তি না থাকলে কোন কিছুই এদেশে সাফল্যলাভ করতে পারবে না। ধর্মের ক্ষেত্রেও ভারতীয় বিশ্বজনীন আদর্শের বিরোধী চিন্তা-ভাবনা বেসুরো ঠেকবে, সে-সকল ভারতবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমি যা কিছু বললাম তার সবকিছুই সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণ বর্তমানকাল পর্যন্ত অল্পবিস্তর অনুসরণ করে চলেছেন। গৃহী ব্যক্তিগণ অথবা যৌথভাবে তাঁদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে লক্ষ্য করে আমি গৃহী ভক্তদের কথা বিশেষভাবে বলতে চাই, যাতে তাঁরা এই মহাসম্মেলন ও তার কার্যবিবরণীর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত অনুসরণকারীদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি; আপনারা ব্যক্তিগতভাবে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে অনুরূপ আরও প্রতিষ্ঠান সংগঠনের মাধ্যমে জাতির পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন। সন্ন্যাসীরা এ পর্যন্ত যা করেছেন তা তাঁদের সাধ্যানুসারে যথেষ্ট হলেও দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যমাত্র। দেশের বর্তমান প্রয়োজন এবং সে-বিষয়ে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমি আপনাদের কাছে সাধারণভাবে বলেছি। এই মহাসম্মেলনের অন্যান্য বক্তাগণ আপনাদের কাছে এ-সকল ভাবাদর্শ আরও বুঝিয়ে বলবেন, সংগঠিতভাবে সমাজে সে-সকল আদর্শ রূপায়ণের জন্য বাস্তবধর্মী যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন তারও দিঙ্‌নির্দেশ করবেন।

পরিশেষে আমি আপনাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে দেখতে বলছি যে, প্রত্যেক মহৎ সভ্যতার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছেন এক একজন সুমহান অধ্যাত্মপুরুষ। তাঁর জীবন ও বাণী প্রয়োজনীয় প্রেরণা সঞ্চার করে এক একটি নতুন সভ্যতার জন্মলগ্নের সূচনা করেছে। ফলতঃ সৃষ্টি হয়েছে এক একটি নতুন ভাবতরঙ্গের, বিরচিত হয়ে উঠেছে এক একটি নতুন সমাজব্যবস্থা। খ্রীষ্টীয় সভ্যতা, ইসলামীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধ সভ্যতা সম্বন্ধে একথা সত্য, এমন কি হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-বাণীর মধ্যে নতুন একটি সভ্যতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা রয়েছে, জগতের বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্বপৃথিবী জুড়ে আমরা তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বের চিন্তানায়কগণের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও ভারতীয় জীবনপদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এই আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন ও তাঁর বাণী প্রসারিত করে দেবার মহৎ দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত রয়েছে; এর ফলশ্রুতিস্বরূপ একটি নতুন সভ্যতা, একটি নতুন ভাবধারা অনতিবিলম্বে উন্মীলিত এবং তাতে করে এমন একটি সমাজের সৃষ্টি হবে যেখানে সংঘাত ও ঘৃণা থাকবে না, থাকবে সাম্য, সমন্বয় ও প্রীতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাদের নামে আমি আপনাদের বেলুড় মঠের এই পুণ্যভূমিতে স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক, এই প্রার্থনা। আমার স্থির প্রত্যয় যে তাঁদের

কৃপায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সকল সমস্যার সমাধান করতে পারব এবং বিগত চুয়াত্ন বছরে যা কিছু দোষত্রুটি সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করেছে সেগুলি দূর করতে পারব, এবং ফলতঃ আমাদের শুভ ও জগতের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সঙ্ঘ অধিকতর সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। সর্বশেষে, আমি প্রার্থনা করি,

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি
জানতাম্।

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

(লক্ষ্যাভিমুখে তোমরা সংযুক্ত হও, একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর, তোমাদের মনসমূহ সমানভাবে পরিজ্ঞাত হোক্…তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া ফলপ্রসূ হোক্, তোমাদের হৃদয়সমূহ সহমর্মিতাযুক্ত হোক্ ও তোমাদের সঙ্কল্পসমূহ একমুখী হোক্, এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে পরম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক্)

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ*

* ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ প্রান্তে বেলুড় মঠে মহাসম্মেলন-সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ইংরেজী ভাষণের স্বামী প্রভানন্দ-কৃত অনুবাদ।—সঃ

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

স্বামী ভূতেশানন্দ*

[পৌষ, ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

ঠাকুরের সন্তানেরা মাকে ঠাকুর থেকে পৃথক্‌রূপে দেখতেন না, ঠাকুরেরই মাতৃরূপে আর একটি অভিব্যক্তি দেখতেন। এবং সেই মাতৃরূপে যে অভিব্যক্তি, তাতে কোন আড়ম্বর নেই, ঐশ্বর্য নেই; বিদ্যার ঐশ্বর্য অর্থাৎ পরা বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত মা ঢেকে রেখেছেন। এই হ'ল মায়ের বৈশিষ্ট্য। যাঁরা মায়ের কাছে যেতেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁদের সকলেরই এই অভিজ্ঞতা। তিনি মা—স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সকল সন্তানেরই মা। এ বিষয়ে তাঁর কোন পক্ষপাত ছিল না। তবে মেয়েরা যেন আরো একটু বেশী ক'রে তাঁর সান্নিধ্য পেত। পুরুষদের তিনি একটু দূরে রাখতেন। বলতেন যে, এই মর্যাদাটুকু রাখতে হয়। মেয়েদের কাছে তিনি একেবারে উন্মুক্ত। তাঁর সন্তান, তাঁর শিষ্যা, তাঁকে ইষ্ট ব'লে মনে করেন, এমন মেয়েকে তিনি বলছেন, তুমি এখানেই শোও। পাশে শুইয়ে, কতরকমে নিজে তার সেবা ক'রে, পরিচর্যা ক'রে, স্নেহের ভিতর দিয়ে আপন ক'রে কিভাবে যে তিনি তাকে আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তা তিনিই জানেন। সন্তানদের খুব বড় বড় কথা ব'লে তিনি ভয় পাইয়ে দিতেন না। তিনি বলতেন, জেনো আমি তোমাদের মা। এই 'মা' কোনও ধর্ম-মা নন, পাতানো মা নন, আপনার মা, সত্যিকারের মা—যে মা সৃষ্টি করেন, যে মা পোষণ করেন, আবার যে মা অন্তে নিজের ভিতরে সংবরণ ক'রে নেন, সেই মা। কিন্তু এই মা ব্যক্তিত্বের ভীতি সৃষ্টি করতেন না, আপনার ক'রে নিতেন। কেউ তাঁর কাছে সংকোচবোধ করত না, দূরত্ববোধ করত না।

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ।

এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, তাঁর পুরুষ-সন্তানদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতির মাধ্যমে উত্তর দিতেন। সেই মা আবার দরকার হ'লে কোন সন্তানকে যেমন নাগমশাইকে নিজ হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন। সন্তানের ব্যাকুলতা দেখে যেখানে মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে, সেখানে সব আবরণ আপনিই খসে পড়ে। অবগুণ্ঠন দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখা আর সম্ভব হয় না। এরকমের মা। সেই মায়ের মাহাত্ম্য-কথা আলোচনায় সন্তানের বিশেষ আগ্রহ হয় না—মাকে মা ব'লে জানলেই যথেষ্ট মনে হয়। মা-ও এই কথাই বলতেন—আমাকে জানবার দরকার নেই, জানবে আমি তোমাদের মা, তাহলেই হবে।

একজন ভক্ত বলছেন—মা, এতদিন ধ'রে সাধনভজন ক'রেও বুঝতে পারছি না এগোচ্ছি কিনা। মা বলছেন, বাবা তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাকো, আর কেউ যদি খাটসুদ্ধ তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে তুমি কি টের পাও?

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের ভরসা দিয়ে বলছেন: 'তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।' —যারা সমস্ত কর্মফল আমাতে সমর্পণ ক'রে একমনে আমার উপাসনা করে, তাদের আমি মৃত্যুময় সংসারসাগর থেকে উদ্ধার করি। মা-ও তাঁর সন্তানদের ভরসা দিয়ে বলছেন, জানবে তোমাদের মা আছেন, আর কোন ভয় নেই। এখন যদি কিছুও না বুঝতে পারো, তোমাদের যখন জ্ঞান হবে দেখবে কোথায় এসেছো। এ-ই মায়ের অভয়বাণী। অথচ এই অভয়বাণী দেওয়ার পিছনে নিজের মাহাত্ম্যখ্যাপন নেই। অতি সহজ, সাদাসিধে কথা—আমি যে মা।

এই মাতৃত্বের বিকাশ দেখবার জন্য, মায়ের মাতৃত্বকে উদ্বোধিত করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মাতৃভাবে পূজা করলেন, যা ষোড়শীপূজা নামে প্রসিদ্ধ। এটি একটি সাধারণ ঘটনা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের কোন ঘটনাই সাধারণ ঘটনা নয়। আর এটি তো তাঁর জীবনের একটি অতি মহত্বপূর্ণ ঘটনা! শাস্ত্রের নিয়মরক্ষার জন্য নয়, ষোড়শীপূজার দ্বারা তিনি মায়ের ভিতরে দেবীর বোধন করলেন। ঠাকুর দেখলেন যে, দেবীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখে তবে তিনি লীলা-সংবরণ করতে পারবেন। তাই তাঁর ষোড়শীপূজা করার উদ্দেশ্য মাকে মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এর আগে এবং পরেও নানাভাবে মায়ের মাতৃত্ব বিকাশে ঠাকুর সহায় হয়েছেন আবরণ ঠাকুর চেয়েছিলেন প্রথমে। মাকে লোক-চক্ষুর সামনে আসতে দেননি। এ কিরকম? না, শিল্পী যেমন নিভৃতে একটি চিত্র অঙ্কন করে যতক্ষণ না তার পরিপূর্ণ সন্তোষ হয়, ততক্ষণ তার সেই শিল্পকীর্তি কাউকে দেখতে দেয় না। সম্পূর্ণ হলে সেটিকে প্রকাশ করে। মাকে এত ক'রে আবৃত ক'রে রাখা, যেন এই কারণে যে, জগতের হাওয়ায় সেই চিত্র যেন কোনরকমে দোষগ্রস্ত না হয়। শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর সযত্নে তৈরী করেছেন এইভাবে। এই 'তৈরী করা' ব্যাপারটি কি? না, মায়েরই অন্তর্নিহিত মাতৃত্বকে প্রকট করা। আগেই বলেছি, ঠাকুর আর মা অভিন্ন—ঠাকুরের সন্তানেরা মাকে ঠাকুর থেকে পৃথকরূপে দেখতেন না। মায়ের ভিতর ঠাকুরের মাতৃত্ব পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত দেখতেন। এইভাবেই মাকে বিশেষ ক'রে দেখতে হবে। এই অনন্ত মাতৃশক্তি ঠাকুরের লীলা-সংবরণের পরও কাজ করেছে, এখন করছে এবং যুগ যুগ ধ'রে কাজ ক'রে যাবে। এই হ'ল ঠাকুরের সযত্নে নির্মিত তাঁরই অন্তরের মাতৃ-প্রতিমা। মাকে এইভাবেই দেখতে হবে।

প্রকাশিত জীবনী-গ্রন্থাদি থেকে এখন আমরা মায়ের জীবনের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত হচ্ছি।

কিন্তু সেই পরিচয় যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ না তাঁর সেই স্নেহের স্বাদ নিজেরা জীবনে অনুভব করতে পারছি, যতক্ষণ না সেই অমৃত পান ক'রে আমরা অমর হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা মাকে পুরোপুরি ধরতে পারছি না। তবে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে আমরা তাঁকে যতটুকু পারি বোঝবার চেষ্টা করি। যেমন স্বামীজী বলছেন, 'দোর্ভ্যাং বিধর্তুমিব যামি জগদ্বিধাত্রীম্।' ছোট্ট ছেলে তার ছোট্ট ছুটি হাত বাড়িয়ে যেমন মাকে ধরতে চেষ্টা করে, তেমনি জগতের বিধাত্রীকে আমরা যেন আমাদের ছুটি হাত দিয়ে ধরতে যাচ্ছি। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে মাকে বোঝবার চেষ্টা করাও সেইরকম।

কিন্তু এই চেষ্টারও সার্থকতা আছে। সার্থকতা এই যে, আমরা তাঁকে ধরতে না পারলেও আমাদের এই প্রয়াস বৃথা হবে না। তিনিই আমাদের ধারণ করবেন। যেমন শিশু যখন হাত বাড়ায়, সে মাকে ধরতে পারে না; মা-ই তাকে ধরেন। সেইরকম আমরা তাঁকে না ধরতে পারলেও তিনি আমাদের ধরবেন, এই ভরসা।

[ক্রমশঃ]

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন মহাসম্মেলন (১৯৮০)

স্বাগত-ভাষণ—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

প্রায় আড়াই হাজার বছরের সামান্য কিছু বেশি আগে ভারতবর্ষে সংঘবদ্ধ এক ধর্মের উদ্ভব হয়। সত্যান্বেষী ছোট একটি দল থেকে এই ধর্ম এক বিরাট আন্দোলনের রূপ নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানসহ উত্তর-পূর্ব এশিয়া এবং ব্রহ্মদেশ ও সিংহল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করে। আন্দোলনটির এই বিস্তার সম্ভব হয়েছিল একটি সংঘের জন্য, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ধর্মের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধের দ্বারা। কিন্তু এই সংঘকে কখনো কেন্দ্রিকীকৃত করা হয়নি এবং এটি কখনো কেন্দ্রিকীভূত ছিল না। এই কারণে এই সংঘের বল ও প্রাণশক্তি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই সংঘ এমন এক মহাশক্তিকে উন্মোচিত করেছিল, যা মানবজাতির একটা বড় অংশের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বিস্ময়কর কাজ করেছিল।

কিন্তু ভগবান বুদ্ধের উপদেশবাণী সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক মতপার্থক্যরূপে সংঘের মধ্যে যে বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়, তা মেটাতে সংঘের প্রয়োজন হয়েছিল মধ্যে মধ্যে ভিক্ষুসম্মেলনের আয়োজন করার। শ্রীবুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরেই প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। তারপর আরও চারটি সম্মেলন হয়; সর্বশেষ সম্মেলনটি ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শিলাদিত্যের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সব সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ভগবান বুদ্ধের উপদেশগুলির সমন্বয়সাধন—যে-কথা আগেই বলা হয়েছে এবং তুলনামূলক বিচারের জন্য সেগুলিকে একত্র সংগৃহীত করা। ভগবান বুদ্ধের অনুগামীদের মধ্যে ধর্মগত বিষয়ে বিভেদপ্রবণতা ছিল এবং তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর কালক্রমে এই সংঘের মধ্যে অনেক বিরোধী উপদলের উৎপত্তি হয়। তাই বৌদ্ধধর্মের অনুগামীদের মতবিরোধের মীমাংসা ক'রে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন-গুলি মধ্যে মধ্যে আহূত হ'ত। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম অনেক সম্প্রদায়ে ও মত-গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষ ছুই দশকে ভারতবর্ষ

দ্বিতীয়বার দেখল আরেকটি ধর্মীয় সংঘের আবির্ভাব। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে রোগশায়িত। আর তাঁর চারপাশে একত্রিত, ঈশ্বরলাভের জন্য আন্তরিকভাবে ব্যাকুল একদল যুবক নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিনরাত তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁকে সেবাশুশ্রূষারত। এটা কি একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র অথবা দৈববিধান? কারণ, এই যুবকবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর সম্মিলিত হয়ে সংঘজীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। আজকের দিনে পশ্চাৎদৃষ্টিসহায়ে আমরা জানি যে, এটা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য ইচ্ছা; তিনি তাঁর ব্যাধিকে একটা উপলক্ষ করে এই সব উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন যুবকদের তাঁর চারপাশে একত্রিত করেছিলেন; তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের দেহধারণ, তা সার্থক করার জন্য আন্দোলনের সূচনা করতে। সেই উদ্যান-বাটীতেই তিনি তাদের অধ্যাত্মসাধনার গভীরে নিমগ্ন হতে এবং যে-কাজ সম্পন্ন করার জন্য তারা বিধিনির্দিষ্ট, তার যোগ্য হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই যুবকদের নেতা হিসাবে তিনি নির্বাচিত করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে, যিনি পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত। তিনি একমাত্র তাঁকেই বিশেষভাবে শিক্ষা দেন এইসব যুবক সাধকদের পরিচালনা করতে এবং রামকৃষ্ণ সংঘের বীজরূপী এই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে সংগঠিত করতে। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং, পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিরাট আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার বীজ বপন করেছিলেন।

ভারতবর্ষে ধর্ম কখনও সংঘবদ্ধ হয় নি। ব্যতিক্রম শুধু বৌদ্ধধর্ম। এমন কি মহান শংকর পর্যন্ত কয়েকটি মঠই স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু কখনও সংঘ গঠন করেন নি। বুদ্ধের সংঘও একটি সংহত সংঘ ছিল না এবং প্রশাসনেও তা কেন্দ্রিকীকৃত ছিল না। ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় এই সংঘের আধ্যাত্মিক শক্তি অপচিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সংঘের সূচনা করেন, তাকে একটি সংহত দল ক'রে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম ক'রে। সম্ভবতঃ তিনি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি খুব ভাল ক'রেই জানতেন যে, সংঘমাত্রেরই ত্রুটি থাকে। ১৮৯৫ সালে মিসেস বুলকে তিনি লিখেছিলেন: 'সংঘের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ছাড়া কিছু হবার জো নেই।' আবার ১৮৯৬ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন: 'আমরা সংঘ চাই। সংঘই শক্তি, আর আজ্ঞাবহতাই হ'ল তার গূঢ় রহস্য।' ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিনে সেই উদ্দেশ্যে আহূত সভায় তিনি বলেছিলেন: 'নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না।'

অতএব আমরা দেখি যে, স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য এই সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: "আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' নামে অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণে'রই সেবক।" এই-ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ সংঘের সূচনা করলেন এবং তাঁর দেহান্তের পরও তাঁর গুরুভাইদের সুযোগ্য পরিচালনায় সংঘের কাজের বিস্তার ও বিকাশ হ'তে থাকল। একদিকে কাজের প্রসার, অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যাগ্রণীদের কয়েকজনের একের পর এক দেহত্যাগ—এই দুই কারণে ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি মহাসম্মেলনের আয়োজন করা

প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন—এই যুগ্ম প্রতিষ্ঠানের যে-মহাসম্মেলন ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে গৃহী এবং ত্যাগী—উভয় সদস্যরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল: সংঘের তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা, পরস্পর মতবিনিময় করা এবং ভবিষ্যতের পথনির্দেশক প্রধান প্রধান নীতি নির্ধারণ করা। এই মহাসম্মেলন বিপুল-সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

তারপর ৫৪ বছর অতীত হয়েছে, প্রতিষ্ঠান-দুটির আয়তন এবং কাজের পরিমাণও বেড়েছে। ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যার মূলে আছে সমাজের তথা বহির্বিশ্বের পরিস্থিতির ঘটমান পরিবর্তন। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছে। এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি পৃথিবীর দেশগুলিকে সমীপতর করেছে। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরোধ দেখা যাচ্ছে। জড়বাদী ধ্যানধারণায় মানুষের মন পরিব্যাপ্ত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে উন্মোচিত পারমাণবিক শক্তি পৃথিবীকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্ভাবনার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার এই জড়বাদী শক্তিগুলির আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, পৃথিবীর প্রাচুর্যপূর্ণ দেশগুলির মানুষের মন একটা উচ্চতর আদর্শের জন্য আজ তৃষিত। কিন্তু এই তৃষ্ণা ব্যাহত হচ্ছে কৃত্রিম-ধর্মীয় ও জড়বাদী দর্শনের দ্বারা, যা প্রচারিত হচ্ছে বিভিন্ন জাতি, ব্যক্তি ও আন্দোলনের মাধ্যমে। মানব-অস্তিত্বের এই তমসাচ্ছন্ন ও বেদনাদায়ক যুগের মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ধ্রুবতারার মতো যথার্থ পথ দেখাতে সচেষ্ট। কিন্তু এই মঠের অনুগামী ত্যাগী ও গৃহীর সংখ্যা অতি অল্প। তাই এই মহাসম্মেলন আহূত হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা পথ খুঁজে বের করার জন্য। এটা শুধু সাধুদের একার কাজ নয়; গৃহীভক্ত, অ এবং বন্ধুদেরও উচিত এই আন্দোলনের সাহায্য করা সর্বপ্রকারে, যতটা তাঁদের পক্ষে করা সম্ভব। আমরা জানি, ঝড় থেমে গেলে মেঘ সরে যাবে, এবং সূর্য আবার দীপ্তি পাবে। মহান ধর্মপ্রচারক ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন: 'বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, জনসাধারণকে এবং দরিদ্রদিগকে সুখী করিতে হইবে; আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য করিবার নির্বাচিত যন্ত্র। ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—অদম্য, অনন্ত, সর্বগ্রাসী।'

আজকের এই তমিস্র যুগেও রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্মানিত এবং পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত। ১৯২৬ সালের প্রথম মহাসম্মেলনে স্বামী সারদানন্দ তাঁর স্বাগত-ভাষণে আমাদের বলেছিলেন যে, প্রত্যেক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজ তথা সমগ্র মানবজাতি ঐ আন্দোলনের মূল তত্ত্বগুলি মেনে নেবার আগে বিরোধিতা ও উদাসীনতা অবলম্বন করে—এই দুই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই প্রত্যেকটি আন্দোলনকে যেতে হয়। আমরা এই দুটি অবস্থা অতিক্রম ক'রে এসেছি এবং এখন আমরা স্বীকৃতিরূপ তৃতীয় অবস্থায় রয়েছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, এই যে স্বীকৃতি এটা সক্রিয় নয়—নিষ্ক্রিয়। সেইজন্য এই মহাসম্মেলনে সুচিন্তিত আলোচনায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কেমন ক'রে আমরা—গৃহী ও ত্যাগীরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি এবং আমাদের প্রভুর বাণীর প্রচার অধিকতর শক্তিশালী করতে পারি, একমাত্র যে-বাণীই পারে বিরোধ-সংঘর্ষশীল মানবজাতির কাছে সান্ত্বনা ও শান্তি পৌঁছে দিতে।

কিন্তু স্বামী সারদানন্দজী সাবধানবাণী উচ্চারণ

ক'রে বলেছেন : 'এই তৃতীয় পর্যায়ে জনসাধারণ কর্তৃক পরিগৃহীত হলেই আন্দোলনটি যে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে, তা মনে করা উচিত নয়। কারণ বাধাহীন অবস্থায় পৌঁছে প্রথম অবস্থার উৎসাহ ও উদ্যমে যেন একটু ভাঁটা পড়ে, আর প্রথম অবস্থায় ঐ আন্দোলনের প্রবর্তকদের মধ্যে যে ভাবের গভীরতা ও উদ্দেশ্যের একতা ছিল, হঠাৎ বিস্তারের সঙ্গে তা কমে যায়। সুতরাং তখন বাইরের বাধার জায়গায় সদস্যদের বিভিন্ন মতামতের ফলে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে প্রথম অবস্থায় সত্যের জন্য যে স্বার্থত্যাগের ভাব ছিল, তার জায়গায় সত্যের সঙ্গে সত্যাভাসের আপস ক'রে সমাজে প্রতিপত্তিলাভের চেষ্টা এবং যথার্থ জিনিসটার পরিবর্তে বাইরের চাকচিক্যের দিকে ঝোঁক হয়। যারা সত্যের জন্য কষ্ট স্বীকার না ক'রে আরামে দিন কাটাতে চায়, তাদের স্বভাবতঃই এই দিকে প্রবৃত্তি হয়।'

এই প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই সংঘ কামকাঞ্চনত্যাগরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের মূল শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উনিশ শতকে কার্ল মার্কস 'কাঞ্চনে'র অর্থাৎ ধনসম্পদের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলেন দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ এবং শ্রেণীসংগ্রাম-মতবাদ উপস্থাপিত ক'রে। তার ফলে পৃথিবীতে এসেছে ঘৃণা, হিংসা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এবং মানুষে মানুষে সর্বদা মুখোমুখি সংঘর্ষ। সেই একই শতকে ফ্রয়েড এই মতবাদ উপস্থাপিত করেছিলেন যে, সমস্ত বিধিনিষেধের দূরীকরণের দ্বারাই যৌনসমস্যার সমাধান হতে পারে। তার ফলে পাশ্চাত্যে সেই সমাজের উদ্ভব হয়েছে, যা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অনুমোদন করে। এর পরিণামে সমস্ত নৈতিক চেতনা ক্ষীণ হয়ে গিয়ে চরম বিপর্যয় এসেছে। সেই একই উনিশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করেছিলেন যে, যদি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মানবজাতিকে উন্নীত ও আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করতে হয়, তবে অবশ্যই কামকাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে। এই কামকাঞ্চন-ত্যাগের আদর্শই রামকৃষ্ণ সংঘের ভিত্তি। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী ত্যাগী ও গৃহী উভয়কেই তাঁদের জীবনের দ্বারা অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে যে, তাঁরা এই মহান আদর্শ গ্রহণ করেছেন। কখনও কখনও মনে করা হয় যে, এই উপদেশ কেবলমাত্র সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদেরই জন্য। কিন্তু তা নয়। গৃহীব্যক্তি এই উপদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করতে না পারলেও যতটা তাঁর পক্ষে সম্ভব, ততটা অবশ্যই করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, একটি বা দুটি সন্তান হ'লে স্বামী-স্ত্রীর ভাই-বোনের মতো থাকা উচিত। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা এই কামকাঞ্চনত্যাগরূপ মহান আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত ক'রে জগতের সামনে তুলে ধরবেন, যাতে তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে জগতের মানুষ প্রকৃতিস্থ হয় এবং জীবনের উচ্চতর আদর্শগুলির জন্য লালায়িত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী আমরা (ভগবান যীশুর ভাষায়) 'জগদ্-বাসীর কাছে লবণের মতো। লবণ যদি তার লবণত্ব ও স্বাদ হারায় তবে কি দিয়ে তাকে আর লবণাক্ত করা যাবে !'

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় মহাশিক্ষা ধর্মসমন্বয়। বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে যুক্তিতর্কের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তিনি সেভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি যে, সব ধর্মপথই মানুষকে একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। তিনি ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন নিজের জীবনে বিভিন্ন ধর্ম ও মত অনুশীলন ক'রে এবং তাদের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তা উপলব্ধি ক'রে। সংঘর্ষদীর্ণ এই পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আর্নল্ড টয়েনবি বলেছেন : 'বিশ্ব-ইতিহাসের এই মহা সঙ্কটময় মুহূর্তে মানবজাতির পরিত্রাণের একমাত্র পথ ভারতীয় পথ। সম্রাট অশোক ও

মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-নীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রামাণিক সাক্ষ্য—এরই মধ্যে আমরা পাই সেই মানসিকতা ও ভাবাদর্শ যার দ্বারা মানবজাতির পক্ষে এক পরিবারভুক্ত হয়ে গড়ে ওঠা এবং পারমাণবিক যুগে আমাদের আত্মধ্বংসের এটাই একমাত্র বিকল্প

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর ওপর এই ভার ন্যস্ত হয়েছে যে, তাঁরা শুভেচ্ছা, সৌভ্রাত্র ও প্রেমের এই 'সুসমাচার' নিজেদের জীবনে অনুসরণ করবেন এবং তা সমগ্র জগতে প্রচার করবেন। তবে একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করা দরকার—আমাদের ধর্মের ওপর কোনও আক্রমণ নিষ্ক্রিয়ভাবে সহ্য করা চলবে না। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন হিন্দুধর্ম সক্রিয় হবে। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা অন্যান্য ধর্মগুলিকে আক্রমণ করব। কিন্তু আমরা আমাদের ধর্মকে, আমাদের জাতিকে এবং আমাদের দেশকে রক্ষা করতে সব রকম উপায় অবলম্বন করব। এই ক্ষেত্রে সনাতন ধর্ম রক্ষা করতে গৃহীভক্তদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত।

কোন সন্দেহ নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মসমন্বয় প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যা অনৈতিক, যা মানুষকে দুর্বল করে—এমন কোন-কিছু ধর্মের নামে গ্রহণ করতে হবে। বেদ, উপনিষদ্ এবং গীতাই আমাদের আধ্যাত্মিকতার চিরন্তন উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এই বেদ, উপনিষদ এবং গীতা যেভাবে প্রবেদিত, তেমনি ভাবেই গ্রহণ করতে হবে আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবনের পথনির্দেশক নীতি হিসাবে।

আর একটি মতবাদ, যা আমাদের ধর্মের সার হলেও নানা পৌরাণিক কাহিনী ও আচার-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নিহিত ও সুপ্ত ছিল, তা হচ্ছে মহান অদ্বৈতবাদ। এই অত্যুচ্চ দর্শন স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও তত্ত্ব এবং তার সামাজিক প্রয়োগের মধ্যে যে ব্যবধান তা কখনও দূরীভূত হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন মানুষ, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই' করুক। তিনি বলেছিলেন শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে। স্বামী বিবেকানন্দ এই আদর্শের বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন সমাজসেবা-মূলক কাজের প্রবর্তন ক'রে, যে-কাজ আধ্যাত্মিক সাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সাধনাই এ-যুগের মুখ্য সাধনা। ধ্যান, জপ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এই সাধনার প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছু নয়। এই সাধনা গৃহী এবং ত্যাগী—উভয়েরই জন্য। আমরা জানি, বিশ্বমুক্তি এবং একটা নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের কাজ, যার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, তা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমরা সবেমাত্র দেখছি উষার প্রথম অরুণিমা। মধ্যাহ্ন-গগনে সূর্য পৌঁছতে এখন অনেক অনেক দেরী। বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে প্রায় ৩০০ বছর লেগেছিল। আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ শূন্যে কাজ করে না। আমাদের একক এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারাই সেগুলি কার্যকরী হবে।" আমরা যদি উপযুক্ত যন্ত্র না হই, তাহলে আমাদেরই ক্ষতি। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনুসরণ ক'রে আমরা যদি যোগ্য আধার হই, তিনিই হবেন আমাদের শক্তি ও অনুপ্রেরণার চিরন্তন উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'তোমরাই বিচার কর, তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে যিনি সনাতন সাক্ষিস্বরূপ বর্তমান আছেন, আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করুন; আমরা কিছু করি বা না করি—যে মহা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী সেই কাজের জন্য তিনি তোমাদের অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক,

সেজন্য প্রভুর কাজ আটকে থাকে না। তিনি ধূলিকণা থেকেও তাঁর কাজের জন্য শত সহস্র কর্মী সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর অধীনে কাজ করতে পারা তো সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।'

অতএব এই মহাসম্মেলন শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীদের জীবনে একটি মহৎ ঘটনা। এই মহাসম্মেলনে সমাগত আপনাদের সকলকেই আমি স্বাগত জানাচ্ছি। সংঘের অগ্রগতি ও সমস্যাবলীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা আপনারা শুনতে পাবেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং আমরা অনেক গঠনমূলক প্রস্তাব পাব। এখান থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে সংঘের সমস্যাবলীর সমাধান সম্বন্ধে আপনারা চিন্তা করুন এবং যে মহৎ আন্দোলনের আপনারা অঙ্গ তার সঙ্গে সমস্ত অন্তর দিয়ে সহযোগিতা করুন। মহাসম্মেলনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রার্থনা করি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইদের আশীর্বাদ আমাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক।*

* ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮০, বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহাসম্মেলনে পঠিত ইংরেজী ভাষণের ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য-কৃত অনুবাদ।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পৌষ, ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

সখা তাঁর ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, গৌরববুদ্ধিশূন্য, মমত্ববুদ্ধিময়, সহজ, সরল, সুমধুর, স্বচ্ছন্দ, নিঃসঙ্কোচ, স্থির, ধীর, দৃঢ়, নিশ্চিন্ত, অক্ষুব্ধ, অচঞ্চল, অবাধ প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে সমান জন ব'লে মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণও নিজেকে তাঁর সখার সঙ্গে একেবারে সমান ব'লে উপলব্ধি ক'রে সেই গভীর প্রেমময় সখার 'অধীন' হয়ে যান, বা তাঁর প্রেমে বশ হয়ে যান—সানন্দে, সাদরে, সাগ্রহে, সানুগ্রহে এরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বশ্যতা 'দাস্যে' নেই—যা পূর্বেই বলা হয়েছে। কারণ, 'দাস্যে' প্রেম এরূপ গভীর নয় যে, ঈশ্বরদাস ভক্ত প্রভু ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপেই নিজস্ব ব'লে পরিগণিত করতে পারেন। বরং তিনি ঈশ্বরকে বহুল পরিমাণে উচ্চতর, মহত্তর, পূর্ণতর; এবং নিজেকে বহুল পরিমাণে নিম্নতর, ক্ষুদ্রতর, অপূর্ণতর—বলেই মনে করেন; এবং কেবলমাত্র 'ক্ষুদ্রত্বে'র আনন্দই উপভোগ করেন—যদি সত্যই সেরকম কিছু থাকে—সমানত্বের নয়।

মন্তব্য

বৈষ্ণব-মতবাদে স্থানে স্থানে মনে হয় যেন স্ববিরোধদুষ্ট তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন, 'চৈতন্যচরিতামৃতে' সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দাস্যপ্রেম অপেক্ষা সখ্যপ্রেম উচ্চতর, গভীরতর, মধুরতর; এবং দাস্যপ্রেম অপেক্ষা সখ্যপ্রেমই জীবকে ঈশ্বরের সঙ্গে নিবিড়তর, দৃঢ়তর, নিকটতর সম্বন্ধ বা বন্ধনে আবদ্ধ করে। অথচ, অন্যদিকে, তুল্য স্পষ্টতমভাবে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের চির-দাসত্বই জীবের একমাত্র কাম্য; এবং সেজন্য মুক্ত-

জীবও ঈশ্বরের চিরদাস (উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৮৭, পৃঃ ৪০৬, কার্তিক ১৩৮৭, পৃঃ ৫৫২)। তাহলে ?

তাহলে যে ক'রে হোক, আমাদের এই দুটি তত্ত্বকে মিলিয়ে নিতে হবে, যেহেতু কোনো স্ববিরুদ্ধতত্ত্ব কোনো মতবাদেই গ্রহণীয় নয়।

মুক্তির অর্থ যে শ্রীভগবানের চিরদাসত্ব, তা সকল বৈষ্ণবই সানন্দে স্বীকার করেন। বস্তুতঃ, কেবল মুক্ত নয়, বদ্ধ জীবও, এক কথায় সকল জীবই, ঈশ্বরের চিরদাস, শাশ্বত সেবক—

'এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥'

(চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৬।৭০)

কিন্তু সেই একই সঙ্গে, সমান জোরের সঙ্গে বৈষ্ণব-বেদান্তে বলা হয়েছে যে, এই প্রভু-ভৃত্য, সেব্য-সেবক সম্বন্ধ আদ্যোপান্ত প্রিয়-প্রিয়ের বা প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। হঠাৎ শুনলে আশ্চর্য লাগে—প্রভু-ভৃত্য কিরূপে প্রিয়-প্রিয় হতে পারেন ? কিন্তু এইটিই ত বৈষ্ণব-মতবাদের অপরূপ বৈশিষ্ট্য ! এ কথা পূর্বেই কিছু বলা হয়েছে।

প্রিয়তত্ত্ব

এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রখ্যাত 'প্রিয়তত্ত্বে'র সাহায্য গ্রহণ করেছেন—

'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। স যোঽন্যমাত্মানঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।৮)

"এই যে অন্তরতর আত্মা—ইনি পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর, বিত্ত অপেক্ষাও প্রিয়তর, অন্যান্য সকল বস্তুর অপেক্ষাও প্রিয়তর। যে ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে প্রিয়তর ব'লে মনে করেন, তাঁকে যদি কোনো ব্যক্তি বলেন—'তোমার প্রিয় বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হবে', তাহলে তিনি ঐ প্রকার বলতে সমর্থ, এবং ঐ প্রকারই ঘটবে। অতএব আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করবে। যিনি আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁর প্রিয় বস্তু নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।"

তারপরে, দু বার গ্রথিত সুবিখ্যাত মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের 'মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে', এই 'প্রিয়তত্ত্ব' উল্লিখিত আছে এইভাবে—

'স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।' ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৪।৫, ৪।৫।৬)

'তিনি বললেন, অয়ি ! পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হন না ; আত্মার প্রতি প্রীতিবশতঃই পতি প্রিয় হন।' ইত্যাদি।

এস্থলে, এই একই কথা বলা হচ্ছে বারংবার দশবার এই দশটি ক্ষেত্র প্রসঙ্গে—

পতি, জায়া, পুত্রগণ, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, (স্বর্গাদি) লোকসমূহ, দেবগণ, ভূতসমূহ, সর্ব বস্তু।

'ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।' (ঐ)

'অয়ি ! সর্ব বস্তুর প্রতি প্রীতিবশতঃ সর্ব বস্তু প্রিয় হয় না ; আত্মার প্রতি প্রীতিবশতঃই সর্ব বস্তু প্রিয় হয়।'

অর্থাৎ, পৃথিবীর সব কিছুই প্রিয়, সেই পরমাত্মা প্রিয় ব'লেই কেবল।

সেজন্য, শ্রীভগবান আমাদের অত্যন্ত প্রিয়, আমরা তাঁর শাশ্বত দাস বা সেবক হলেও ; এবং এই হ'ল তাঁর সঙ্গে আমাদের চরম ও পরম সম্বন্ধ—এই 'প্রিয়ত্বে'র সম্বন্ধ।

পুনরায়, 'প্রিয়ত্ব' সম্বন্ধটি সর্বদাই পারস্পরিক বা দ্বিমুখী—রাম শ্যামের প্রিয়, শ্যামও রামের প্রিয়। একই ভাবে, ঈশ্বর যেমন জীবের পরমপ্রিয়, ঠিক

তেমনি জীবও ঈশ্বরের পরমপ্রিয় ('ভক্তবৎসল'); জীব যেমন ঈশ্বরের দাস, ঠিক তেমনি, ঈশ্বরও জীবের দাস ('ভক্তদাস'); জীব যেমন ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল, ঠিক তেমনি, ঈশ্বরও জীবকে পাবার জন্য ব্যাকুল ('ভক্তকামী'); জীব যেমন ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী, ঠিক তেমনি, ঈশ্বরও জীবের মুখাপেক্ষী ('ভক্তমুখাপেক্ষী') ইত্যাদি।

কি অপূর্ব রমণীয় রসঘন রোমাঞ্চকর এই জীবেশ্বরের পারস্পরিক সম্বন্ধ!

সেজন্য, বলা চলে যে বৈষ্ণব-মতানুসারে, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে এই প্রভু-ভৃত্য বা সেব্য-সেবক সম্বন্ধের মধ্যেই রয়েছে নিম্নে উল্লেখিত অন্যান্য সম্বন্ধও সমভাবে অর্থাৎ, জীব যে কেবল ঈশ্বরের 'দাস' মাত্রই, তা-ই নয়—সেই সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের শিষ্য, সন্তান, সখা এবং প্রিয়ও সমভাবে।

'এহ হয়, আগে কহ আর'—এই ব'লে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে 'দাস্যপ্রেমে'র কথা বলছেন, তা নিশ্চয়ই উপরে উল্লেখিত পূর্ণবিকশিত 'দাস্যভাব' নয়, যার মধ্যে সখ্যভাবও পরিপূর্ণভাবে রয়েছে;—বরং অপূর্ণ, কেবল 'দাস্যপ্রেম'ই মাত্র—যার মধ্যে রয়েছে দূরত্ব, ভীতি, অস্থিরতা প্রভৃতিই কেবল; এবং সেজন্য, যার থেকে 'সখ্যপ্রেম' নিশ্চয়ই বৃহত্তর, মহত্তর, নিকটতর, নিজতর, মধুরতর, শান্ততর, সুন্দরতর।

এই ত একমাত্র উপায় উপরের সমস্যা-সমাধানের।

ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সপ্তবিধ সম্ভাব্য সম্বন্ধ

ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধকে স্বভাবতঃই নানা জনে নানা ভাবে দেখেছেন। যথা—

(১) রাজা-প্রজা, প্রভু-ভৃত্য, শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ।

(২) গুরু-শিষ্য, শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ।

(৩) পিতা-সন্তানের সম্বন্ধ।

(৪) মাতা-সন্তানের সম্বন্ধ।

(৫) পতি-পত্নীর সম্বন্ধ।

(৬) প্রিয়-প্রিয়ার সম্বন্ধ।

(৭) সখা-সখার অর্থাৎ দুই বন্ধুর সম্বন্ধ।

পূর্বেই যা বলা হয়েছে—এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম ছ'টিতে ন্যূনাধিক উচ্চ-নীচ-স্তরভেদ, তজ্জনিত ন্যূনাধিক দূরত্ব, এবং তজ্জনিত ন্যূনাধিক ভীতি আছেই আছে। এমন কি, বৈষ্ণব-শাস্ত্র-মতে যা নিকটতম, নিজতম, সহজতম, মধুরতম সম্বন্ধ, অর্থাৎ, প্রিয়-প্রিয়ার সম্বন্ধ, সেস্থলেও দান-প্রতিদান, বা এক কথায়, প্রাপ্তির প্রশ্ন আছে ব'লে ভীতিরও প্রশ্ন থেকেই যায় অনিবার্যভাবেই; এবং তজ্জনিত অস্থিরতাও এসে পড়ে একই ভাবে—সর্বক্ষণই যেন 'হারাই হারাই ভাব'—যা বৈষ্ণব-শাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গরূপেই পরিগণিত।

কিন্তু যেখানে সখাভাব বা বন্ধুত্ব, একমাত্র সেখানেই উচ্চ-নীচ-ভাবও নেই একেবারেই, তজ্জনিত দূরত্বও নেই একেবারেই, তজ্জনিত ভীতি এবং পরিশেষে তজ্জনিত অস্থিরতাও নেই সমভাবে একেবারেই।

সুবিখ্যাত সংস্কৃত-অভিধান 'অমরকোষে'র মতে 'বন্ধু' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল এই—

'স্নেহেন মনো বধ্নাতি যঃ'—

'যিনি স্নেহের দ্বারা মনকে বন্ধন করেন।'

এই প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকের কথা মনে পড়ছে—যেখানে 'বন্ধু', 'সুহৃৎ', 'মিত্র' ও 'সখা'—এই সমার্থক চারটি শব্দের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদের কথা অতি সুন্দরভাবে বলা আছে—

'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ ॥'

অর্থাৎ, যে দুজনের মধ্যে, একে অপরের ত্যাগ সহ্য করতে পারেন না, তাঁরা 'বন্ধু'। যে দুজনের মধ্যে, একে অপরের সঙ্গে সর্বদাই একমত, তাঁরা

'সুহৃৎ'। যে দুজনের মধ্যে, একে অপরের সঙ্গে সর্বদাই একই কার্য করেন, তাঁরা 'মিত্র'। যে দুজনের মধ্যে একে অপরকে সর্বদাই প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তাঁরা 'সখা'।

কি রোমাঞ্চকর মনে হয় যখন এক মুহূর্তও ভাবি যে, ষড়ৈশ্বর্যশালী, অনন্ত-অচিন্ত্য-গুণ-শক্তি-বিমণ্ডিত, ভূমা মহান্ পরমেশ্বর আমাদের 'বন্ধু', 'সুহৃৎ', 'মিত্র' ও 'সখা', উপরের অর্থানুসারে। তখন সত্যই মনে হয়—এই ত আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ শ্রীভগবানের সঙ্গে—কোনো ভেদ নেই, কোনো দূরত্ব নেই, কোনো স্বার্থ নেই, কোনো ভয় নেই—অথচ আছে কেবল প্রাণের সঙ্গে প্রাণের স্পর্শ, আত্মার সঙ্গে আত্মার সমতা, জীবনের সঙ্গে জীবনের মিলন; আছে কেবল অনাবিল প্রীতি, অনন্ত বিশ্বাস, অনবচ্ছিন্ন কল্যাণ-করণ; এবং সব মিলিয়ে অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় আনন্দ।

বস্তুতঃ, যে পুণ্যভূমি ধন্যভূমি অনন্যভূমি ভারতবর্ষের যুগযুগান্তব্যাপী সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাধনা-আরাধনা, জপ-তপ, তন্ত্র-মন্ত্রাদির মূল ভিত্তি হ'ল সেই অত্যাশ্চর্য অভিনব অপরূপ যুগ্ম-মন্ত্র—

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১৪।১)

'ইদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১)

'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।'

'ব্রহ্মই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড।'—

একমাত্র সেই দেশেই যে এরূপ সাহসভরে, গৌরব-সহকারে, আনন্দসঞ্চারে স্বয়ং পরমেশ্বরকেও এইভাবে নিকটতম, মধুরতম, প্রীতি-মৈত্রীর, বন্ধুত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনে নিরন্তর আবদ্ধ ক'রে রেখেছি আমরা, তথাকথিত দীনহীন, ক্ষুদ্রক্ষীণ, পাপতাপলীন, সংসারপঙ্কবিলীন জীব হয়েও—তা আর আশ্চর্যের বিষয় কি!

[ক্রমশঃ]

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

তৃতীয় পর্ব

[পৌষ, ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

নরেন্দ্র রাধাচরিত্রের শুদ্ধতা পবিত্রতা মাধুর্য সম্বন্ধে বলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলেন জৈমিনির কাহিনী। ব্যাসের প্রধান পাঁচ শিষ্য। সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন ও শুক। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণভক্ত সুরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ জৈমিনি ও ব্যাসের কাহিনী বলে-ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের বেশ কিছুকাল পরে সুরেন্দ্রনাথ একদিন কামতাড়নায় বেশ্যালয়ে গিয়েছিলেন। তাজ্জব ব্যাপার, সেখানে ঢুকে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমাসীন। সুরেন্দ্রনাথ লজ্জায় পালিয়ে আসেন। এদিকে ব্যাস-শিষ্য জৈমিনি গুরুদেবের কাছে সামবেদ ও মহাভারত শিখেছিলেন। তিনি তাঁর প্রণয়িনীকে বলেছিলেন খুব সাবধানে থাকতে। ভূতের উপদ্রব। কোন কারণেই দরজা যেন না খোলেন। একদিন কামের তাড়নায় জৈমিনি ছুটে আসেন রমণীর

কাছে। সারারাত ধরে অনেক অনুনয়-বিনয় করেও দরজা খোলাতে পারেন না। ভোর হলে কোকিলের ডাক শুনে রমণী দরজা খোলে। জৈমিনি দেখেন সেখানে ব্যাসদেব দাঁড়িয়ে আছেন। এভাবেই গুরুশক্তি শিষ্যকে রক্ষা করে থাকে।[৬]

'আমি বুঝেছি, আমার নাকি একবার হয়েছে বাবা মরে [যাবার পর]।'

স্মৃতিচারণ করে নরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বলেছিলেন: 'সাধন টাধন যা আমরা করছি, এসব তাঁর কথায়। · এতো আমাকে ভালবাসা, —কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন! অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ লোকের সঙ্গে কখন কখন গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না।'[৭]

নরেন্দ্রনাথ এবার নিজের সাধনজীবন প্রসঙ্গে বলেন: 'আগে মনে করতুম [বুঝি বা] পাগল হলুম—এখন আর তা [মনে] হয় না—[এখন] আনন্দ [—স্পষ্ট ধারণা হচ্ছে] something tangible.

'[তাছাড়াও ভেতরের] শক্তি খুব বাড়ছে।

'মা-ভাইবোন দুঃখ পাচ্ছে, আর মনে হয় না।'

দরদী শ্রোতা মাষ্টারমশাই মদত দিয়ে বলেন: ঠিক যেন সদাগরপুত্র খাঁটি চুনীপান্না হাতে পেয়েছে। চকচকে নকল চুনীপান্না তার কাছে এখন তুচ্ছ। নকল জিনিসে সে আর আকর্ষণ বোধ করে না।

নরেন্দ্রনাথ: 'ওর application?'

উত্তরে কালীপ্রসাদ কিছু বলেন।

মাষ্টারমশাই রাত্রিটা কাটান কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে।

পরদিন শনিবার। ৬ই মার্চ। তিনি গঙ্গাস্নান করে স্কুলে পৌছান সকাল আটটায়। স্কুলের দারোয়ানের কাছ থেকে রুটি চেয়ে নিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।[৮]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্তহারী অন্ত্যলীলার তৃতীয় পর্ব এখানেই সমাপ্ত। আলোচ্য তৃতীয় পর্বকালে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাবপ্রকাশ ঘটেছিল, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিম্নলিখিত কয়েকটি:

প্রথমতঃ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ভাবান্দোলনের গর্ভস্থলে ভাবী রামকৃষ্ণসঙ্ঘ ক্ষুদ্রাকারে মূর্ত হয়ে ওঠে। স্বামী শিবানন্দজী পরবর্তী কালে বলেছিলেন: কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের সেবায় ও ভজন-সাধনে কী আনন্দেই না আমাদের দিন কাটত! আমাদের সকলকে একত্রিত করে ভাবী সঙ্ঘের সৃষ্টি করবেন বলেই যেন ঠাকুরের ঐ অসুখ। অবতারের লীলার গূঢ়রহস্য সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে?'[৯] স্বামী প্রেমানন্দজীও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

মহেন্দ্র দত্ত লিখেছেন: 'দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস-মশাই-এর উপদেশ বীজস্বরূপ হইল, কাশীপুর বাগানে তাহা অঙ্কুরিত হইল, বরানগর ও আলমবাজার মঠে বৃক্ষরূপ ধারণ করিল। ক্রমে

৬* Prabuddha Bharat, June 1925। তুরীয়ানন্দজী ৯।১।১৯২১ তারিখে এ-কাহিনী বলেছিলেন।

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩। পরিশিষ্ট।২

৮ পৌষ, ১৩৮৭ ও বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত এই নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৭৯-৮০

৯ শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৩

* ১ হইতে ৫ পাদটীকা পৌষ, ১৩৮৭ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য—সঃ

ক্রমে এই বৃক্ষ বনস্পতিরূপ পরিগ্রহ করিল।'[১০]

দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে ত্যাগী সন্তানদের অধিকাংশই অধ্যাত্মসাধনার পথে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল নরেন্দ্রনাথের অগ্রগতি। তিনি দৃঢ়পদক্ষেপে অমৃতপথে পুরোগমন করে গুরুভাইদের উৎসাহিত করেছিলেন। তাছাড়াও এই পর্বকালে তারকনাথ, কালীপ্রসাদ, শশীঠাকুর, তাপসলাটুর মধ্যে পরিবর্তনাদিও ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

তৃতীয়তঃ নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। নরেন্দ্রনাথ পর্যায়ক্রমে নানানভাব উদ্দীপন করে অন্তেবাসীদের নিয়ে একটি মণ্ডল যেন গড়ে তুলছিলেন। পূর্বে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে সে-ভালবাসা প্রবলাকার ধারণ করে। সেবকদের 'আহারাদি, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নিদ্রা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বস্তু ও প্রয়োজন অতি তুচ্ছ হইয়া গেল।' ভালবাসা—পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ভালবাসাই হয়েছিল নরেন্দ্রর নেতৃত্বাধীন সঙ্ঘের বীজ।

চতুর্থতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক এই সময়ে নূতন ও একটি স্থায়ী রূপ ধারণ করেছিল। পুঁথিকার লিখেছেন: 'গৃহী সন্ন্যাসীতে দুয়ে সমান আদর। / মধ্যে বাধাইয়া দ্বন্দ্ব করিলা রগড়। / এই দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে প্রচারে পোষ্টাই।' বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল লিখেছেন যে এ ঘটনার ফলে, 'যুবকদের সংযম এবং গৃহস্থদের উদারতা বৃদ্ধি পায়।' প্রবীণভক্ত রামচন্দ্র দত্তও লিখেছেন: 'ত্যাগী ও সংসারীদের মধ্যে একটা বৈরীভাবের কাচের আড়াল তিনি সৃষ্টি করেছিলেন।' ফলে উভয়েরই কল্যাণ হয়। যাহোক শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে আনন্দমিলন অচিরে সংসাধিত হয় এবং উভয় গোষ্ঠীর সমবায়ে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন দৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

পঞ্চমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের যে 'আত্মগোষ্ঠী' স্বাভাবিকভাবে দানা বেঁধেছিল তার নেতৃত্ব আপনা হতেই গ্রহণ করেছিলেন গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্ত। ঘটনাপ্রবাহে গৃহীভক্তগণের নেতৃত্ব ক্রমেই সীমিত হয়ে যায়, অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা, বাগানবাড়ী-কেন্দ্রিক উদ্গত মঠের পরিচালনা ইত্যাদির দায়দায়িত্ব সম্প্রসারিত হয় ত্যাগী যুবকদের উপর। এই যুবকমণ্ডলীর পরিকেন্দ্রে শোভা পাচ্ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্বাচিত লোকশিক্ষক। ইতোমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে 'শক্তিসঞ্চার' করেছিলেন। যুবগোষ্ঠী ঈশ্বরলাভের আদর্শের আলোকে নিজেদের জীবনকে উদ্ভাসিত করে তোলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণেরই কর্মবেগময় প্রতিরূপ এই 'আত্মগোষ্ঠী' লোককল্যাণাভিমুখী একটি প্রবাহের আকার ধারণ করে। [ক্রমশঃ]

১০ মহেন্দ্রনাথ দত্ত: তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান, পৃঃ ২০

বিবেকানন্দদশকম্

স্বামিজীবানন্দেন বিরচিতম্

রামকৃষ্ণলব্ধশক্তি-বিশ্বমঙ্গলান্বিত
শ্রেষ্ঠমাতৃভক্তধীর বিশ্বজিৎশুভব্রত।
জ্ঞানভাস্বর স্থিরপ্রভ স্থিতাত্মভাব হে
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥১

সিংহশৌর্য দৃপ্তবীর্য রিক্তরাগবর্ধন
ত্যাগপূত দীপ্তসূর্য চাগ্নিতুল্যপাবন।
প্রেমসিক্ত বুদ্ধচিত্ত ভক্তিযুক্ত শঙ্কর
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥২

যুক্তিতর্কজালভেদ-শক্তিধী সুমণ্ডিত
জ্ঞানযোগ-রাজযোগ-ভক্তিযোগসাধক।
সর্বযোগসিদ্ধ দেব কর্মযোগদেশিক
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥৩

সর্বধর্মশুদ্ধভাবপূত বিশ্বনন্দন
ত্যাগরূপ বীর হে যতীশ্বর প্রভঞ্জন।
প্রাপ্তরামকৃষ্ণভাব-সিক্তপদ্মলোচন
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥৪

ভ্রান্তমোহমুগ্ধলোক-শক্তিবীর্যদায়ক
প্রাণশক্তিধর্মশক্তিদাতৃ-মোহনাশক।
মূর্তভাব দিব্যরূপ নিত্যবিশ্বরঞ্জন
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥৫

রামকৃষ্ণ-নিত্যভাব-সুপ্রচার-কেশরিন্
রামকৃষ্ণ-ভাবসিদ্ধ কর্মবেদতত্ত্ববিদ্।
রামকৃষ্ণ-সক্তচিত্ত ভীতিহীন শক্তিদ
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥৬

সর্বদেশলোকপূজ্য সর্বমিত্রকারক
শ্রান্তিহীন শুদ্ধচিত্ত রিক্তজীবসেবক।
নিত্যসিদ্ধবুদ্ধমুক্ত নীলকণ্ঠ শঙ্কর
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥৭

সত্যসন্ধ মোহহীন শক্তিপূর্ণসাগর
ধ্যাননিষ্ঠ যোগযুক্ত স্তব্ধহৈমশেখর।
ভূতকাল-ভাবিকাল-বর্তমানকালদৃক্
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥৮

দেশকালজাতিমধ্যতুচ্ছভাবনাশন
দ্বেষহীন শুদ্ধসত্ত্ব দিব্যভাবভাবন।
বুদ্ধিদীপ্ত চাত্মতৃপ্ত বিশ্বলোকচিন্তন
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥৯

রামকৃষ্ণভাবপূর্ণ-বিশ্বগেহনন্দিত
প্রেমপূর্ণ নিত্যমুক্ত মূর্তসত্য শাশ্বত।
রামকৃষ্ণ-দিব্যভাষ্য পূর্ণতত্ত্বদেশন
ত্বাং বিবেকরূপ নৌমি হে মহন্ নিরঞ্জন ॥১০

ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর প্রভাব

ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য

আজ এই সম্মেলনে যাঁর পবিত্রতম জীবনকথা আলোচনার ও শোনবার আশায় আমরা সকলেই ভক্তিবিনম্রচিত্তে উন্মুখ হয়ে আছি, তিনি ছিলেন অসংশয়িতরূপে প্রাচীন ও নবীন ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের নারীজাতির পরমতম আদর্শের মহত্তম প্রতিভূ, বর্তমান ভারতের নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে একাধারে বিরাট প্রশ্ন এবং challenge, ভগিনী নিবেদিতার অনবদ্য ভাষায়—"ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী।" তিনি বর্তমান বিশ্বের বিচিত্র ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নরনারীর পরমারাধ্যা একাক্ষরা 'মা'।

কিন্তু, কেমন এই 'মা'? অনন্ত করুণা, পবিত্রতা ও প্রেমের ঘনীভূত আধার, চিরাবগুণ্ঠিতা, নিভৃতবাসিনী, স্বল্পশিক্ষিতা এক গ্রাম্য নারীর জীবনের বহিরঙ্গ ও আন্তররূপের বিপুল বৈষম্য তাঁর অগণিত ভক্ত-অনুরাগী-শিষ্যের কাছে এক দুরধিগম্য প্রহেলিকা, যা ধরা পড়েছিল ভগিনী নিবেদিতার অনুভূতিতে—"তিনি কি প্রাচীন-পন্থীদের শেষ প্রতিনিধি অথবা নবীনপন্থীদের অগ্রদূত?"

সূর্য দীপ্ততেজে স্বপ্রকাশ। কিন্তু মাটির প্রদীপের দ্যুতি স্নিগ্ধতায়, রহস্যময়তায়, মাধুর্যে চিরমণ্ডিত। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের পূর্ণতম বিভায় ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের অধ্যাত্মগগন উদ্ভাসিত করেছিলেন, আর আমাদের 'মা' অরণ্যবাসিনী তপস্বিনী উমার মতো সমস্ত ভাবরাশি সংহত ক'রে লোকলোচনের অন্তরালে আত্মসংবৃত, আত্মসমাহিত। বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাস সেদিন নীরবে অপেক্ষা করছিল শেষ অধ্যায়টি সংযোজিত ক'রে কৃতার্থ হবার জন্য, যাতে লিখিত হয়েছিল এক পরম ভাগবতীতনুর স্ফুরণ ও মহিমা-বিচ্ছুরণের ক্রমাভিব্যক্তির অনুপম কাহিনী।

বেদ-উপনিষদ্-পুরাণ-মনু-শাসিত প্রাচীন ভারত স্মরণাতীত কাল থেকে নারীজাতিকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে—আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে নারী এবং পুরুষের সর্বতোভাবে সমানাধিকার ঘোষণা ক'রে সনাতন হিন্দুধর্মকে আজও অটুট, অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিশ্বের অন্য কোন ধর্মে এ দৃষ্টান্ত বিরল। ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডল, ৬১-সংখ্যক সূক্তের ৮ম মন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে পত্নীর অর্ধাঙ্গভূত পুরুষের উদ্দেশ্যে স্তব-গাথা, যা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতম আদর্শ—যেখানে ধর্মে এবং কর্মে পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান অংশগ্রহণ করেছে। তাই প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উপনয়ন থেকে বেদাভ্যাস পর্যন্ত সবই নারীদের কাছে উন্মুক্ত ছিল। বৈদিক যুগের অপালা-ঘোষা-বিশ্ববারা-বাক্ প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনীরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন চরম আত্মোপলব্ধির বাণী, উপনিষদের যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ ক'রে নারীজাতিকে অধ্যাত্ম-সম্পদে চিরগরীয়সী ক'রে গেছেন।

নারীমহিমার এই উজ্জ্বল বিকাশের হেতু অনু-সন্ধান করলে আমরা প্রাচীন ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের গূঢ়তম অনুভূতিটির খবর পাই। বৃহ-দারণ্যক উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণের ৩-সংখ্যক কণ্ডিকায় বিবৃত হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে

প্রজাপতি দ্বিতীয়ের ইচ্ছা ক'রে অবিভক্ত স্ত্রী-পুরুষকে দুইভাগে ভাগ করলেন। সমগ্র সৃষ্টির মূলে আছে এই দুই-এর লীলাবিলাস। পুরুষ ও নারী-শক্তির সামরস্য এক অখণ্ড মহাশক্তির সৃষ্টি করে। এই মহাশক্তি নারীত্বে প্রতিষ্ঠিত—শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যাকে সমগ্র জগতের আধারশক্তি বলা হয়েছে। আচার্য শংকর তাই বলেছেন—শিব শক্তিযুক্ত হ'লেই সৃষ্টিক্ষম, নতুবা শব। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫-সংখ্যক সূক্তে ঋষি বাক্ সেই পরমোপলব্ধি বিবৃত করেছেন নিজেকে ঈশ্বরী এবং সর্বভূতের সৃষ্টিকারিণীরূপে ঘোষণা ক'রে। তাই দেখতে পাই, মনু তাঁর সংহিতার ৩য় অধ্যায়ের ৫৬-সংখ্যক শ্লোকে নারীর শাশ্বত বন্দনা রচনা করলেন—"যেখানে নারীরা পূজিতা হন, সেখানেই দেবতারা প্রসন্ন হন। যেখানে তাঁরা পূজিতা হন না, সেখানে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই নিষ্ফল।"

তাই প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী হিন্দুগণ নারীর স্বরূপ ও স্বধর্মের পূর্ণ চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। দুহিতা, ভগ্নী, জায়া ও জননী—নারীর এই চারটি রূপ চারটি ভাবকে ব্যঞ্জিত করে—ভক্তি, স্নেহ, পাতিব্রত্য এবং মাতৃত্ব। কিন্তু নারীত্বের চরম বিকাশ মাতৃত্বে। আর তার সহায়ক হ'ল মূল চারটি ধর্ম—সেবা, করুণা, পবিত্রতা এবং প্রেম। নারীর দেবীত্ব মাতৃত্বেরই নামান্তর।

কিন্তু আমাদের মায়ের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদিনী তপস্বিনীদের কোনও সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইনি যে প্রায় নিরক্ষরা, পল্লী-ভূমিতে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে লালিতা, অন্তরালচারিণী অবগুণ্ঠিতা নারী। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে এঁর প্রভাব কি থাকতে পারে—এ প্রশ্ন অনিবার্য-ভাবেই এসে পড়ে। অথচ এঁরই সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বাণীবাহক, নররূপী নারায়ণ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে একটি পত্রে লিখছেন সুদূর আমেরিকা থেকে—

"মা-ঠাকরুন, কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না,—ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা ব'লে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।... রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ!"

স্বামীজীর এই উক্তির মধ্য দিয়ে তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হচ্ছে। (১) 'মা' স্বয়ং সৃষ্টির সারভূতা সেই মহাশক্তি; (২) গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি তাঁরই লীলার সহায়িকা এবং (৩) একমাত্র 'মা'-ই জীব-জগতের ধর্মার্থকাম-মোক্ষদা। শ্রীশ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপটি স্বামীজীর উক্তির মাধ্যমে এইভাবে উদ্‌ঘাটিত হওয়ার তাৎপর্যটি মায়ের পার্থিব লীলার নিগূঢ় রস-আস্বাদনে আমাদের প্রধান সহায়ক হ'য়ে উঠেছে।

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু-বিচিত্র সাধনার সার নির্যাস হ'ল মাতৃভাব। এই ভাবকেই মুখ্যতঃ অবলম্বন ক'রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন পরমতম অদ্বৈতবোধে। প্রাচীন ভারতের নারীজাতির আদর্শের পূর্ণ প্রকাশ মাতৃত্বে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের অনেক পরে শ্রীশ্রীমাকে স্বমুখে বলতে শোনা যায় যে, ঠাকুর তাঁকে রেখে গেছেন "মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য"। শ্রীশ্রীমায়ের এই উক্তির নিগূঢ়তম তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন স্বামীজী স্বয়ং—তাঁর পূর্বোক্ত পত্রের মাধ্যমে। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীমা একাধারে 'মা' এবং জীবমুক্তিপ্রদায়িনী—বিশ্বে নারীত্বের যতরকম প্রকাশ আছে, সে সমস্তেরই ঘনীভূত বিগ্রহ এবং তারও অতিরিক্ত এমন কিছু, যা অনির্বচনীয়। তিনি একক, অনন্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন দক্ষিণেশ্বরে নিভৃত রাত্রির

নিস্তব্ধতায় শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বারূপে উপলব্ধি ক'রে ষোড়শীপূজার অন্তে তাঁর দীর্ঘ সাধনার সর্বস্ব ফল 'মা'-এর পদপ্রান্তে সমর্পণ ক'রে প্রণাম নিবেদন করলেন, সেইদিন থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হ'ল সেই আপাতসুপ্ত মহাশক্তির জাগরণ। নারী থেকে পূর্ণ দেবীত্বে আরূঢ়া হলেন আমাদের 'মা'। শেষ ইঙ্গিতটি দিয়ে গেলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ— "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।" সত্যই তো তাই! 'মা'-এর পদচিহ্ন যে সারা বিশ্বের মানচিত্র ভরিয়ে তুলেছে!

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়,—শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে যিনি 'সরস্বতী', 'জ্ঞানদায়িনী', বিবেকানন্দের যিনি 'জ্যান্ত দুর্গা', সেই দেবী নিজেকে জয়রামবাটী, নহবত ও উদ্বোধনের সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে সারাজীবন সংবৃত ক'রে রাখলেন কেন? উত্তরে এইটুকুই বলা যায়—উনিশ ও বিশ শতকের ভোগসর্বস্ব, জড়বাদী, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় পুষ্ট, ইন্দ্রিয়বাদী ভারত তথা বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি দেবীত্বের চোখ-ধাঁধানো ঐশ্বর্যের প্রকাশ নিয়ে আসেননি, এসেছিলেন বাৎসল্যপ্রেম নিয়ে— সেই অপরিমেয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যাকে তিনি পুষ্ট করেছিলেন সংগোপনে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে। এই বাৎসল্যপ্রেমের সর্বগ্রাসী বন্যায় ডুবে গেল সমস্ত সীমাবদ্ধতা, পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী ইহলোকের অমৃতময় স্বাদ গ্রহণ করলো মুগ্ধ বিহ্বলতায়, অভিভূতচিত্তে। তাই ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর শাশ্বতপ্রভাব তাঁর দেবীত্ব ও মাতৃত্বের পরমরমণীয় সমন্বয়ে।

অথচ এই মাতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে অতি ধীরে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে। প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই দক্ষিণেশ্বরে, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর খাবার অন্যের হাতে দেওয়ার জন্য শ্রীশ্রীমাকে অনুযোগ করাতে মা উত্তর দিলেন— "তা তো আমি পারব না, ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।" কিংবা বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতিকে বেশী পরিমাণে খেতে দেওয়ার জন্য ঠাকুর অনুযোগ করাতে মা ঠাকুরকে জানিয়েছিলেন যে, ছেলেদের ভালমন্দের ভার তাঁরই, এজন্য ঠাকুরের চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। বলা বাহুল্য, ঠাকুরকে সেদিন বিনা বাক্যে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল এই সর্বপ্লাবী মাতৃত্বের কাছে। কিন্তু 'এহো বাহ্য' ।।১৭৯০৭

ঠাকুরের অন্তর্ধানের বহুদিন পরে কোন ভক্তের 'মা, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরে মা অসংকোচে বলতে পেরেছিলেন —'সন্তানের মত দেখি।' দাম্পত্যজীবন যতই অপার্থিব হোক না কেন, আজও পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাসে কোন নারী তাঁর স্বামী সম্পর্কে এই উক্তি করেছেন ব'লে আমরা জানতে পারিনি। তাই আমাদের 'মা' এদিক থেকে নিঃসঙ্গিনী, অপ্রতিমা। আর, এইখানেই মাতৃভাবের চরম পরাকাষ্ঠা, যেখানে সমস্ত পার্থিব সম্বন্ধ একটি মাত্র লক্ষ্যে অনিবার্যভাবে ধাবিত।*

[ক্রমশঃ]

* ৫ই এপ্রিল ১৯৮০ অপরাহ্ণে বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ। —সঃ

রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ঃ সাংবাদিক ও লেখক

ডক্টর উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

(পৌষ, ১৩৮৭ সংখ্যার পর)

লেখক হিসেবে রামমোহনের কৃতিত্বের আলোচনা অনেক হয়েছে। বিশেষতঃ বাঙলা গদ্যের লেখক হিসেবে। কাজেই ভাষানীতি-বিজ্ঞানের আলোচনায় না গিয়ে তাঁর ইংরেজি ও বাঙলা রচনা থেকে তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রের পরিচয় যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুকেই তুলে ধরার চেষ্টা করব। প্রথমতঃ রামমোহনের ইংরেজি রচনার কথাই ধরা যাক। তাঁর ইংরেজি রচনাকে দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও পুস্তিকার আকারে রচিত প্রবন্ধ। চিঠিপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো,—হ্যামিল্‌টনের অভদ্র ব্যবহারের প্রতিকার প্রার্থনা করে লেখা চিঠি, আমহার্স্ট'কে লেখা শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক চিঠি, গর্ডনকে লেখা আত্মজীবনী-মূলক চিঠি, 'Precepts of Jesus' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পর মিশনারীদের আক্রমণের উত্তরে বাল্‌টিমোরের জনৈক ভদ্রলোককে লেখা চিঠি, নেপ্‌ল্‌সের স্বাধীনতা নষ্ট হবার পর বাকিংহামকে লেখা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষামূলক চিঠি, ইংল্যাণ্ডের রিফর্ম বিল পাশ হবার পর উইলিয়াম র‍্যাথবোনকে লেখা চিঠি, অবসরপ্রাপ্ত ইংল্যাণ্ডবাসী ডিগ্‌বিকে লেখা চিঠি; জুরি-বিল সম্পর্কে ক্রফোর্ডকে লেখা চিঠি এবং লণ্ডন থেকে প্যারিসে যাবার আগে ফ্রান্সের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীকে লেখা পাশপোর্ট-সংক্রান্ত চিঠি। চিঠিগুলির অধিকাংশই রামমোহনের জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় রামমোহনের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সূত্রেও এগুলি উল্লেখিত। হ্যামিল্‌টনের আচরণের প্রতিবাদ করে লর্ড মিন্টোকে রামমোহন যেভাবে চিঠি লিখেছিলেন তাতে একই সঙ্গে আত্মসম্মান ও নির্ভীক দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে। তেমনি আমহার্স্ট'কে লেখা চিঠিতে রামমোহন প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার কঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পাঠ্যসূচি চেয়েছিলেন, প্রগতিশীল অন্যান্য দেশের সঙ্গে নিজের দেশকে প্রতিদ্বন্দ্বী করতে চেয়েছেন। গর্ডনকে লেখা চিঠির মধ্যে (যদি এ চিঠি প্রামাণিক মনে করা হয়) রামমোহন ব্যক্তিজীবনে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কৈশোরে ও যৌবনে কী কঠিন সংগ্রাম করে প্রাচীনপন্থী সামাজিকদের, এদেশে বসবাসকারী অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের এবং আপন পরিবারের নিকট আত্মীয়দের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে এবং শেষপর্যন্ত স্বদেশীয়দের সুশাসনে রাখবার জন্যে ইংল্যাণ্ডে সপরিষদ রাজার কাছে আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, সেকথাও তাঁর চিঠি মারফত প্রকাশিত। চিঠি পড়ে মনে হয় দিল্লীর মুঘল সম্রাটকে স্বদেশী হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর কিছু অধিকারে বিদেশী কোম্পানির অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিকার করতেই যেন তাঁর দূত হয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে গেছেন। বাকিংহাম কিংবা র‍্যাথবোনকে লেখা চিঠিতে রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রীতি, শাসনতান্ত্রিক উদারনীতির প্রতি সমর্থন ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ স্পষ্ট। তাঁর পূর্বতন মনিব অবসরপ্রাপ্ত ডিগ্‌বিকে লেখা চিঠির মধ্যে রামমোহন আমাদের দেশের ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা

যে রাজনৈতিক চেতনার বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা নানাভাবে বুঝিয়েছেন এবং ধর্ম ও সংস্কারের জন্যে রামমোহন যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাও জানিয়েছেন। খ্রীষ্টের উপদেশাবলির সারবত্তা তিনি মেনেছেন, ডিগ্‌বির সঙ্গে একমত হয়েছেন, কিন্তু স্বধর্মে আস্থা কোনভাবেই হারাননি। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে ইংরেজিতে লেখা আবেদনের মধ্যেও এই একই চরিত্রের প্রকাশ।

ক্রফোর্ডকে লেখা চিঠির মধ্যে বিচার-ব্যবস্থায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হিন্দু-মুসলমান বাদ দিয়ে খ্রীষ্টানদের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর বিরুদ্ধে বেশ স্পষ্ট প্রতিবাদ করেছেন। যে ইংরেজজাতি তাদের পার্লামেন্টের এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির এতো বড়াই করে, সেই শাসকজাতি যদি বিচার-ব্যবস্থায় এই পক্ষপাত নিয়ে আসে, তাহলে একশো বছর বাদে যখন ভারতীয়রা শিক্ষা-দীক্ষায় অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে তখন এই বিশাল দেশের মানুষ বন্ধু হলে তো ভালই,—আর যদি ঘোর শত্রু হয়ে পড়ে তা হলে কি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না? রামমোহনের চিঠিপত্র-আবেদনে এবং প্রবন্ধে-পুস্তিকাতেও এই রকম প্রচ্ছন্ন খোঁচা ও ভীতি প্রদর্শন থাকতো। ফ্রান্সের বিদেশ দপ্তরের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে রামমোহনের জাতি-সঙ্ঘ-পরিকল্পনা প্রকাশিত। দেশ, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত জাতিকে মিলিত করবার যে মহান্ পরিকল্পনার তিনি দ্রষ্টা, তার ভিত্তি ছিল বিশ্বমানবিক সংহতি—কোন সংকীর্ণ ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি বা দেশপ্রীতির স্থান সেখানে ছিল না।

রামমোহনের অন্য ইংরেজি রচনাগুলি বেশির ভাগই পুস্তিকা। কোনোটি বিধবার উত্তরাধিকার বিষয়ে, কোনোটি সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধের প্রতিবাদে, কোনোটি ইউরোপীয়দের স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাসের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে, কোনোটি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে সুপ্রিম কোর্টের মিতাক্ষরা সম্বন্ধে মতামতের প্রতিবাদে, কোনোটি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে। এছাড়াও তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য লেখা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডিড।

প্রতিটি লেখাতেই বৈষয়িক, প্রতিবাদী, যুক্তিবাদী, সমাজকল্যাণমুখী, স্বাধীনতাকামী এবং সংস্কারপন্থী রামমোহনের ব্যক্তিচরিত্র প্রকাশিত। সবার ওপরে উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বমানব রামমোহনকে দেখতে পাই।

রামমোহনের সংস্কৃত ও বাঙলা রচনা ইংরেজি রচনার তুলনায় বেশি না হলেও প্রায় সমান সমান। একেশ্বরবাদের সমর্থনে আরবি ও ফারসি ভাষায় লেখা (ভূমিকা অংশ আরবিতে) তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ (১৮০৩-৪ খ্রী:) 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুবাহ্‌হিদ্দীন'-এ যে শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধির প্রকাশ দেখি, সংস্কৃত শাস্ত্রবিচারে এবং বাঙলায় সেই বিচার-বিতর্কের প্রকাশে একই রকম শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধির প্রকাশ দেখি। বেদান্তের আলোচনায় রামমোহন কর্ম ও জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন; সেই সঙ্গে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব দুই-ই স্বীকার করেছেন। আমহার্স্টকে লেখা পত্রে দেখি, যে বেদান্তবাদী সংসার ও স্বজনকে মিথ্যা মনে করে বৈরাগ্যের আশ্রয় নেন তাঁকে তিনি স্বীকার করতে চান না। তবু মনে রাখতে হবে তিনি এদেশে নবযুগের প্রথম বেদান্ত-প্রচারক। বেদান্তচর্চা এদেশে সুপ্রচলিত হলেও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে বেদান্তবাদকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা স্মরণীয়।

বৈষয়িক জগতের উন্নতির চেষ্টায় যিনি আজীবন বিতর্ক, প্রতিবাদ ও আবেদন করে

গেছেন তিনি সংসারকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। অথচ এই সাংসারিক অসংগতির মধ্যে একটি শৃঙ্খলার রূপকার যে ঈশ্বর, তাঁকেই প্রেরণাস্বরূপ রেখে যাবতীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে রামমোহন লড়াই করেছেন। দেশে-বিদেশে সর্বত্র মানুষের দাসত্বমুক্তি ও সমানাধিকারে রামমোহনের সহানুভূতি ও উৎসাহ। ক্ষুরধার যুক্তিবুদ্ধিই রামমোহনকে গোঁড়া হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে চালিত করেছে। যুক্তি খণ্ডনে ও স্থাপনেই তাঁর অধিকাংশ রচনা শেষ হয়েছে। কেবলই যুক্তি খণ্ডন রামমোহনের বিতর্কপ্রবন্ধকে নীরস করেছে ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ হঠাৎ ঝলসে উঠেছে। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে' রামমোহন বলছেন: 'ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি [,] যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না।' কিংবা প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে হঠাৎ বলে ফেলেছেন: 'রাজাদের উপাসনায় যেমন উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দিয়া থাকে সেইরূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক [.] বিশেষ এইমাত্র [,] রাজাদের নিমিত্ত যে ঘুষ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্যাপ্ত হয় [,] ঈশ্বরের নিমিত্ত ঘুষ ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।'

অনেক সময় বিরুদ্ধপক্ষের প্রতি ধারালো আক্রমণে রামমোহন তাঁর ভাষাগত আভিজাত্য ছেড়ে তীব্র বেগে প্রায় খাঁটি বাঙলায় চলে এসেছেন। 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদে' নিবর্তকরূপী রামমোহন বলে উঠেছেন: 'তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর [,] পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ওই বিধবা উঠিতে না পারে [.] তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখ।'

'কবিতাকারের সহিত বিচারে' রামমোহনের বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ বোধহয় সবচেয়ে ধারালো। কবিতাকার যখন আক্রমণ করেছেন এই বলে যে, একালের ব্রহ্মজ্ঞানীরা জাহির করে বেড়ায় যে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞানীরা মৌন থাকেন, —তার উত্তরে রামমোহন লিখছেন: 'আমরা পৌত্তলিক নহি যে দীর্ঘ তিলকছাপা ও খোল কর্ত্তালের সহিত নগর কীর্ত্তন করিয়া অথবা সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা ও রক্তবস্ত্রাদি পরিধান ও নৃত্য-গীতের দ্বারা আপন উপাসনা অন্যকে জানাইব...।'

কবিতাকার যখন রামমোহন ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা যবনের মত পোশাক পরে দরবারে যান বলে আক্রমণ করেছেন, তখন রামমোহন তীব্র পাল্টা আক্রমণে বলেছেন: 'যদ্যপি এমত সকল তুচ্ছকথার উত্তর দিবাতে লজ্জাস্পদ হয় তথাপি পূর্বাবধি স্বীকার করা গিয়াছে সুতরাং উত্তর দিতেছি [,] আদৌ ধর্ম্মাধর্ম্ম এসকল অন্তঃকরণবৃত্তি হয়েন [,] পরিধানাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি আছে [,] দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসা করি যে শিল্পবস্ত্রমাত্র যদি যবনের পোষাক হয় তবে কবিতাকার এবং তাঁহার বান্ধব অনেক পৌত্তলিকেই শিল্পবস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যাইয়া থাকেন [,] যদি কবিতাকার বলেন পুত্তলিকার উপাসক ব্রাহ্মণ্যাদির শিল্পবস্ত্র পরিধান করিবাতে দোষ নাই [,] কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসকের দোষ আছে আর দিবসের মধ্যে এতকাল পর্য্যন্ত পরিলে দোষ নাই অতকাল পর্যন্ত পরিলে দোষ হয় ইহার প্রমাণ যখন কবিতাকার দিবেন, তখন এবিষয়ে অবশ্য বিবেচনা করিব। বিশেষতঃ কবিতাকার পাষণ্ড, নাস্তিক ইত্যাদি স্ফুট কটুশব্দ আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেও কবিতাকারের প্রতি ক্রোধ না জন্মিয়া আমাদের দয়ামাত্র জন্মে কারণ কুপথ্যসেবী রোগী কিম্বা বালককে ঔষধ সেবন করিতে কহিলে অথবা কুপথ্য হইতে নিষেধ করিলে ক্রোধ করে এবং প্রায় দুর্বাক্য কহিয়া থাকে...।'

[ক্রমশঃ]

সেবাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

পৃথিবীর আর সব দেশের মত ভারতবর্ষ আজ বহু সমস্যার সম্মুখীন। বর্তমান যুগে শিক্ষা, ধর্ম, জাতীয়-জীবন ও সমাজব্যবস্থায় যে সব জটিলতা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানকল্পে বহু মনীষী চিন্তা করছেন এবং তাঁদের অনেকেই উপলব্ধি করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে বা লেখায় এই সব বিষয়গুলি নিয়ে যৎসামান্য বা বিস্তারিত যা আলোচনা করেছেন, তারই মধ্যে নিহিত আছে দেশের ভাবী কল্যাণের পথ। শুধু যে রামকৃষ্ণ মিশনই স্বামীজী-প্রদর্শিত পথে দৃঢ়-পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে তা নয়, মিশনের বাইরেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সারদা নামাঙ্কিত বা অন্য নামের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্বামীজীর আদর্শে চলবার চেষ্টা করছে। তবে চলার পথে মাঝে মাঝে স্বামীজীর নির্দেশগুলি স্মরণ করা দরকার, কারণ কর্মের বিপুল জটিলতায় আবদ্ধ হয়ে বিভ্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আবার চলার পথটি ঠিক না হলে বা আদর্শের বিচ্যুতি বা বিভ্রান্তি ঘটলে লক্ষ্যস্থলে পৌছান ত দূরের কথা, অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে।

স্বামীজী-প্রদর্শিত জনসেবা বা লোকহিতকর কার্যাবলী সম্বন্ধেও ওই একই কথা খাটে। এটা সকলের কাছেই সুবিদিত যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবাণী 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' শুধু যে নবযুগের সূচনা করেছে তা নয়, অরণ্যের নিভৃত সাধনাকে এবং ভগবানলাভের রহস্যাবৃত পথগুলিকে আধুনিক বাস্তব জগতের কাছে সহজলভ্য করেছে।

সেবা সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ বা উপদেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে প্রথমেই বুঝা দরকার যে, স্বামীজী প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত দেবতাকে দেখেছেন। মানুষের সেই দেবতাকে জাগিয়ে তুলতে, তাঁর আবরণকে সরিয়ে দিতেই স্বামীজীর যাবতীয় প্রয়াস, এবং সেই প্রয়াসকে 'সেবা' নামে অভিহিত করা যায়। এই পরি-প্রেক্ষিতে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যা কিছু বলেছেন তাও সেবার আওতায় আসে, কারণ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার নিজের সত্তাকে, তার অনন্ত শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে। ধর্মের সঙ্গে সেবার সম্পর্ক আরও নিবিড়, কারণ জীবসেবাকেই তিনি 'পূজা' বলেছেন। প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন, "আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'"[১] মাদ্রাজে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা; তোমার সম্মুখে—তোমার চারি-দিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা; ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়।"[২] ১৮৯৫ সালে মিঃ লিখেছেন, "ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণে'রই সেবক।"[৩] স্বামীজীর কাছে মানুষ হচ্ছে 'জাগ্রত দেবতা'। আলমোড়া হতে মেরী হেলকে ইংরেজীতে লেখা এক কবিতায় বলেছেন, "ওরে মূর্খদল!

কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষদেবতা,
ভেঙে ফেল আর সব পুতুল প্রতিমা।"[৪]

অন্যত্র বলেছেন, 'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।'[৫] প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়?'[৬] শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে 'তপস্যা' বুঝাতে গিয়ে বলছেন, '…পরের জন্য কাজ করতে করতে পরা তপস্যার ফল—চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।'[৭] এই প্রসঙ্গে আরও বলছেন, '…পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্মবিকাশ।'[৭ক]

স্বামীজী সেবাকার্যকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান হতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে বলেননি, এবং সেবাকার্যকে কেবল দৈহিক বা ঐহিক সুখ-সুবিধার মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে বলেননি; সেবার মাধ্যমে তিনি জনগণের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখছেন, "সব চেয়ে সহজ উপায় এই: একটা ছোট কুঁড়ে নিয়ে গুরু-মহারাজের মন্দির কর। গরীবরা সেখানে আসুক, তাদের সাহায্যও করা হোক, তারা সেখানে পূজা-অর্চাও করুক। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে 'কথা' হোক। ঐ কথার সাহায্যেই তোমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছা কর, শেখাতে পারবে।"[৮] দুর্ভিক্ষের কাজে খুসি হয়ে বলছেন, '…ঐরূপে ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে পর ধর্মের বীজ রোপণ করা যাইতে পারে।'[৯] ১৮৯৮ সালে প্লেগনিবারণকল্পে যে বিজ্ঞপ্তি ছাপান হয়েছিল, তার সাতটি নির্দেশের প্রায় প্রত্যেকটিতেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-চিন্তার কথাও ছিল।[১০]

সেবাকার্যে সেবকের কি মনোভাব হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে বলেছেন, 'দরিদ্রগণকে তুমি যে দান করিতেছ, তাহার জন্য বাহাদুরি করিও না, অথবা তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা আশা করিও না, বরং তাহারা যে তোমাকে তাহাদের সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছে, সেইজন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।'[১১] অন্যত্র বলছেন, 'ঐ গরীব লোকটি আছে বলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিতে পারিতেছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দান করে সেই ধন্য হয়।'[১২] 'তোমার মন হইতে এই ভাব একেবারে দূর করিয়া দাও যে, তোমাকে জগতের জন্য কিছু করিতে হইবে। জগৎ তোমার নিকট হইতে কোন সাহায্যই চায় না।'[১৩] 'কর্মযোগ'-এ 'মুক্তি' প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য: 'কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইও না।'[১৪] এখানেও প্রযোজ্য। স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখছেন, 'ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্।'[১৫] শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন, 'আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত-ফেদান্ত পড়বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানবো—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।'[১৬] অন্যত্র তাঁকে বলছেন, 'তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুশী হই।'[১৬ক] লাহোরে এক বক্তৃতায় বলছেন, "'এই নিয়ে যা'—এ-ভাবে দান বা দয়াধর্মের অনুষ্ঠান করা যায় না, পরন্তু উহা হৃদয়ের অহঙ্কারের পরিচায়ক; দানের উদ্দেশ্য—জগৎ যেন জানিতে না পারে যে, দাতা দয়াধর্ম করিতেছে। হিন্দুদের অবশ্য জানা উচিত যে, স্মৃতির মতে—দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"[১৭] আলাসিঙ্গাকে চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছেন, 'নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর।'[১৮] স্বামী অখণ্ডানন্দকে উপদেশ দিচ্ছেন, "বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোনও ফল নাই, যদি কিছু

গরীবদের উপকার করিতে না পারো।... গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে, পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল।"[১৯] স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবাকার্যে সন্তুষ্ট হয়ে ক্যালিফোর্নিয়া হতে লিখছেন, '...বিশেষ আনন্দলাভ করলুম।...হৃদয় যত দেখাতে পারবে, ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলে বোঝে।'[২০] শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে 'ত্যাগ' সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন, 'তোর দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙালবেশে এসে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁকে কিছু না দিয়ে খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্য-চুষ্য দিয়ে পূর্তি করা—সে তো পশুর কাজ।'[২১]

সেবাকার্যে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে, কোন্ কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, এইসব বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নানাভাবে উপদেশ দিয়ে গেছেন। শিষ্য সদানন্দকে বলেছেন, 'প্রথমে ছোট-খাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল্, যাতে গরিব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে,...যাদের কেউ দেখবার নেই।'[২২] শিষ্য শরচ্চন্দ্র অন্নসত্র খোলার জন্য গৃহনির্মাণ, অর্থ প্রভৃতি সমস্যার কথা তুললে স্বামীজী বললেন, "মঠের দক্ষিণ দিকটা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্ছি এবং ঐ বেলতলায় একখানা চালা তুলে দিচ্ছি। তুই একটি কি দুটি অন্ধ আতুর সন্ধান ক'রে নিয়ে এসে কাল থেকেই তাদের সেবায় লেগে যা দেখি। নিজে ভিক্ষা ক'রে তাদের জন্য নিয়ে আয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া। এইরূপে কিছুদিন করলেই দেখবি—তোর এই কাজে কত লোক সাহায্য করতে অগ্রসর হবে, কত টাকাকড়ি দেবে! 'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'"[২৩] সেবাকার্য আরম্ভ সম্বন্ধে স্বামী কল্যাণানন্দকেও ঠিক এই রকমই উপদেশ দিয়েছিলেন, 'যদি বড় কাজ কিছু না-ও করতে পার—ভিক্ষে করে একটি পয়সা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি মাটির কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণার্ত পথিকদের জল দিও। তৃষ্ণাতুরকে জলপান করালেও মহৎ কাজ হবে।'[২৪] এখানে লক্ষণীয় যে, সেবাকার্যের বিশালতার উপর বা বহুজনকে সঙ্গে নেওয়ার উপর দৃষ্টি না দিয়ে তিনি সব সময় প্রত্যেককে নিজে কাজে নামতে আহ্বান করছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে সেবাকার্য চালাচ্ছিলেন, তখন সেখানে টাকা পাঠাবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী লিখছেন, 'ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে।...শুধু জল-তুলসীর পূজো ক'রে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তা হ'লে সব কল্যাণ হবে।'[২৫] শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে বলছেন, 'যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেদিকে; নয়—মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে, মরছে। তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে?'[২৬] তাঁকে আরও বলছেন, 'ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্ন-সংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। · আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্, তারপর দেশের ইতরসাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত ক'রে প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা।'[২৭] এখানে সেবকের নিজের মধ্যে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করবার নির্দেশ লক্ষণীয়। '...আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য ক'রে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য।'[২৮] একজন পরিচিত রোগীর চিকিৎসাব্যাপারে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলছেন,

'দু-দশটাকা যা দরকার হয় দেবে। যদি একজনের মনে—এ সংসার-নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও একটু আনন্দ ও শান্তি দেওয়া যায়, সেটুকুই সত্য, এই তো আজন্ম ভুগে দেখছি—বাকি সব ঘোড়ার ডিম।...'[২৯] আবার সেই সঙ্গে মিতব্যয়িতার দিকেও তাঁর নজর। স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখছেন, 'যাঁরা দুর্ভিক্ষ মোচন করছেন, তাঁদের এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জুয়াচোরেরা যেন গরীবের প্রাপ্য নিয়ে যেতে না পারে। ভারতবর্ষ এমন অলস জুয়াচোরে পূর্ণ এবং দেখে আশ্চর্য হবে, তারা কখনও না খেয়ে মরে না—কিছু না কিছু খেতে পায়ই।...আমরা চাই, যতদূর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকার্যের প্রতিষ্ঠা।'[৩০]

সেবাধর্মসম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তিগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাঁর অন্তঃকরণটি জানা দরকার। ১৮৯৪ সালে চিকাগো থেকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখছেন, 'আমার ভগবান্‌কে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি; তাহাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা প্রভুই জানেন।'[৩১] সেখান থেকে ১৮৯৫ সালে ব্যাঙ্গালোরের জি. জি. নরসিংহচারিয়ারকে লিখছেন, 'যতদিন না আমার দেহত্যাগ হচ্ছে, অবিশ্রান্তভাবে কাজ ক'রে যাব; আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকব।'[৩২] ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মসভায় বিজয়ী বীররূপে স্বামীজী যেদিন সংবর্ধিত হলেন, সেদিন রাত্রে এক ধন-কুবেরের সুসজ্জিত গৃহে রাজোচিত যন্ত্রাদির অধিকারী হয়েও দেশের দারিদ্র্যের কথা ভেবে তিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে পারেন নি, তাঁর চোখের জলে বালিস ভিজে গিয়েছিল।[৩৩] তাঁর আমেরিকা যাওয়ার একটা উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের দরিদ্রদের জন্য অন্নসংস্থান করা।[৩৪] পরে একসময় তিনি বলেছিলেন, 'ইচ্ছা হয়—মঠ-ফট সব বিক্রি ক'রে দিই, এই-সব গরিব দুঃখী দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে দিই··দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?'[৩৫] কলিকাতায় প্লেগনিবারণের জন্য স্বামীজীর সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প জানিয়া একজন গুরুভ্রাতা অর্থাভাবের কথা উল্লেখ করায় তিনি ভ্রূকুটি করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দরকার হলে নূতন মঠের জমি-জায়গা সব বিক্রী করব। আমরা ফকির; মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি।'[৩৬] শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন, "ইচ্ছা করলে তো আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি।...কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনে। সমাধি-ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়, 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং' হয়ে যায়।"[৩৭] স্যান ফ্রান্সিস্কোতে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে বলছেন, 'আমি সারাজীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী, তবে তাঁর মতবাদের নই।...তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন ক'রে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা।'[৩৮] আবার সহানুভূতিহীন ধনীদের সম্বন্ধে তাঁর কঠোর মন্তব্য—"...যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাদিগকে আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া অভিহিত করি।"[৩৯] আবার এই বিরাট পুরুষই গিরিশবাবুর কাছে দেশের অন্নাভাব, হাহাকার ইত্যাদি শুনে চোখের জল ঢাকবার জন্য বাইরে বার হয়ে গেলে গিরিশবাবু স্বামীজীর শিষ্যকে লক্ষ্য

ক'রে বলেছিলেন, 'দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি।... মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!'[৪০] অন্যত্র গিরিশবাবুকে স্বামীজী বলেছেন, 'এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারো জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারো এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা ক'রব।'[৪১]

এই পটভূমিকাতেই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রতি স্বামীজীর নির্দেশগুলি ভালভাবে বুঝা যায়। ১৮৯৭ সালে মঠের গুরুভ্রাতাগণকে লক্ষ্য করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন, "এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণ-চিকীর্ষবঃ' (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা।...যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন।"[৪২] ওই বৎসর তিনি আরও লিখছেন, 'আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।... জগতে কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।'[৪৩] রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন, 'শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement (কাজকর্ম)—এটা জেনে রাখবি।'[৪৪]

আবার পুরানো কথায় ফিরে আসা যাক। মাঝে মাঝে সেবাসম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশগুলি আমরা যেন আলোচনা ও পুনরালোচনা করি; কালোপযোগী করার অজুহাতে আমরা স্বামীজীর বাণীগুলির যেন সুবিধামত অর্থ করে না নিই; সেবাকার্যের প্রসারের পিছনে যেন লোকমান্যতা লুকিয়ে না থাকে। সবসময় সেবকের চারধারে যেন আলোকবর্তিকা হয়ে জলতে থাকে স্বামীজীর বাণীগুলি:

'এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা।'
'নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর।'
'ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্।'
'সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছে, সেইজন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।'
"ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণে'রই সেবক।"
'তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুশী হই।'

আকর-নির্দেশিকা: [এই আকর-নির্দেশিকায় যেখানে গ্রন্থের নামোল্লেখ নেই, সেখানে গ্রন্থটি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' বুঝতে হবে; সংস্করণ: ১ম থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড এবং ৯ম খণ্ড—৪র্থ সং; ৭ম ও ৮ম খণ্ড—৩য় সং]

(১) ৯।২৩৭ অর্থাৎ ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭. (২) ৫।১৯৯. (৩) ৭।১৯১. (৪) ৭।৪৭৫. (৫) ৭।২৭. (৬) ৭।২৮. (৭) ৯।৮১. (৭ক) ৯।৮২. (৮) ৭।৪১৯. (৯) ৭।৪২১. (১০) স্বামিজীর পদপ্রান্তে, ২০০-২০২. (১১) ১।৮৩-৮৪. (১২) ১।১০০. (১৩) ১।১১৭. (১৪) ১।১২৮. (১৫) ৭।৪০১. (১৬) ৯।২৩৬. (১৬ক) ৯।১৩৫. (১৭) ৫।২৯৫. (১৮) ৬।৪৩২. (১৯) ৭।৬১. (২০) ৮।১০২. (২১) ৯।১৩৫. (২২) ৯।৪১. (২৩) ৯।১২৭. (২৪) স্বামিজীর পদপ্রান্তে, ২৪৮. (২৫) ৭।৪১৫. (২৬) ৯।১৩৬. (২৭) ৯।১৬৫. (২৮) ৮।১০৩. (২৯) ৮।২০৩. (৩০) ৭।৪২০. (৩১) ৭।৩৬. (৩২) ৭।৯৮. (৩৩) যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় সং, ২।৩৩. (৩৪) ৯।২৩৫. (৩৫) ৯।২৩৫. (৩৬) যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় সং, ৩।১০৫. (৩৭) ৯।১৫৯. (৩৮) ৮।৩১৩-৩১৪. (৩৯) ৭।৩৫. (৪০) ৯।৩৯. (৪১) ৯।৪১. (৪২) ৬।৪৫৭. (৪৩) ৭।৮০. (৪৪) ৯।১৭৪.

ক্রুশবিদ্ধ বিবেকানন্দ

ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

ভগবান যীশু এই মর্তধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করতে। ঈশ্বর তাঁর স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের দুঃখকষ্টের ভার। ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল মৃত্যুর কাঠগড়ায়। চাবুকের কশাঘাতে সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। সেই ক্ষতবিক্ষত শরীরের উপর পাষণ্ড সৈনিকরা বিদ্রূপ করে তাঁর গায়ে থুথু দিয়েছে। এ করেও তাদের খেদ মেটেনি। কাঁটার মুকুট পরিয়ে তাঁকে দিয়ে তাঁর মৃত্যুক্রুশটি পর্যন্ত বহন করতে বাধ্য করেছে। তাঁকে নির্মমভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। ক্রুশের উপর হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে ঠুকে তাঁকে মারা হয়েছিল। সে কি নিদারুণ যন্ত্রণা! সেই তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর হৃদয় করুণার্দ্র হয়েছিল ঐ হতভাগ্য অবুঝ মানুষগুলোর জন্য। ঈশ্বরের কাছে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন: 'পিতা, এদের ক্ষমা কর। এরা কি করছে জানে না।' দুই দস্যুর সঙ্গে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা করল: 'প্রভু, আপনি যখন আপনার রাজ্যে গিয়ে প্রবেশ করবেন, তখন আমাকে স্মরণ রাখবেন।' যীশু নিজের মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলে গিয়ে তাকে অভয় দিয়ে বললেন: 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আজকেই তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে যাবে।' তিনি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন মানুষকে মুক্তি দিতে, চিরশান্তির পথের সন্ধান দিতে। তিনি নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন মানুষের কল্যাণের জন্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা আর একজনকে দেখি মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিতে—তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথম জীবনে তিনি চেয়েছিলেন নিজের মুক্তি। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে কাশীপুরে একদিন তিনি (তখন নরেন্দ্রনাথ) চাইলেন মুক্তি—সমাধিতে শুকদেবের মতো লীন হয়ে থাকতে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুক্তি দিলেন না। তিনি তিরস্কার করে বলেছিলেন: 'ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস!' তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে একেবারে নিরাশ করেননি। তিনি তাঁকে নির্বিকল্প সমাধির আনন্দের স্বাদ পাইয়ে দিয়ে বলেছিলেন: 'এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব চাপিয়ে দিলেন নরেন্দ্রনাথের কাঁধে দুঃখক্লিষ্ট মানুষের ভার। নরেন্দ্রনাথ ভুলে গেলেন নিজের মুক্তির কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবীন বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বুঝলেন নিজের মুক্তির চেষ্টা—স্বার্থপরতা। অন্যের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। মানুষের দুঃখকষ্টের ভার লাঘব করে তাকে পরমানন্দের সন্ধান দেওয়াই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে দাঁড়াল। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি নরকযন্ত্রণা ভোগ করেও হাজারো বার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত। পরবর্তী কালে তিনি বলেছিলেন: '…এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারো জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা ক'রব।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেওয়া মানুষের দুঃখ-যাতনার ক্রুশটি আজীবন তিনি বহন করেছিলেন। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব তিনি কিভাবে মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করতে গিয়ে

নিজেকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর মৃত্যু ভগবান যীশুর মতো কাঠের তৈরী ক্রুশের উপর পেরেক ঠুকে হয়নি; তাঁর মৃত্যু হয়েছিল মানবজাতির দুঃখকষ্টের ক্রুশে। সমগ্র মানবের দুঃখ-যাতনার তুষানল তাঁকে দগ্ধ করে হত্যা করেছিল। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন এই দুঃখ-যাতনার তুষানলে।

তাঁর জীবনের শুরুতেই দেখা যায় পরদুঃখ-কাতরতার বীজটি অঙ্কুরিত হতে। কোন ভিখারী বা সাধু বালক নরেন্দ্রনাথের কাছে একখানি কাপড় চাইলে তিনি দ্বিধামাত্র না করে, তাঁর পরনের নতুন কাপড়খানি খুলে দিয়ে সাহায্য করতেন। অসুস্থ রুগ্ন মানুষকে সেবা করার দরদী মনের পরিচয়ও ছোটবেলাকার ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়। কুড়ি-পঁচিশ জন সমবয়স্কদের সঙ্গে গড়ের মাঠে কেল্লা দেখতে যাওয়ার সময় তাঁদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে, সবাই যখন অসুস্থ বালকের কিছু হয়নি ভেবে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে এগিয়ে চলেছে, তখন নরেন্দ্রনাথের মনে ঐ বালকের জন্য সমবেদনা দেখা যায়। তিনি অসুস্থ বালকের কাছে ছুটে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখেন, প্রচণ্ড জ্বর। তিনি তাকে গাড়ি করে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসেন। এমনকি মানুষের কষ্ট লাঘব করতে যে সেবার প্রয়োজন তা করতে বিপদের সময়ও তাঁকে বিচলিত দেখা যায়নি। নির্ভীক হয়ে, বিপদকে উপেক্ষা করে তিনি সেবা করেছেন, তাও আমরা দেখি তাঁর ছোটবেলাকার ঘটনার মধ্যে। নরেন্দ্রনাথ ট্রাপিজ খাটাতে যখন চেষ্টা করছেন এক সাহেবের সাহায্যে তখন দড়ি ছিঁড়ে সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগে। আঘাতে সাহেব অজ্ঞান হয়ে যান এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্তস্রোত বইতে থাকে। একে তো সাহেব, তার উপর এই অজ্ঞান-হয়ে-যাওয়া ও রক্তস্রোত! দেখে সঙ্গীরা ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ পালিয়ে গেলেন না। কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে সাহেবের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে জড়িয়ে দিয়ে এবং চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। এইভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নিজের হাতে করে তারপর ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তারের পরামর্শে এক সপ্তাহ ধরে তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। এবং পাড়ার লোকেদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পাথেয় হিসেবে কিছু দিয়ে তাঁকে বিদায় করেন। ভবিষ্যতে যিনি সারা বিশ্বের দুঃখ-যাতনার ভার নিজের কাঁধে তুলে নেবেন তারই উন্মেষ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা যায়। [ক্রমশঃ]

মহাভূত মহাতীর্থ

শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ

'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' (বৃহ. উ. ১।৪।১০) —এই জগৎ আগে ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। অথবা অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে জগৎচরাচর অব্যক্ত অপরিস্ফুটরূপে বিদ্যমান ছিল। দেশশূন্য, কালশূন্য, বস্তুশূন্য—ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য, শব্দহীন, স্পর্শহীন, গন্ধহীন, রূপরসহীন, অনাদি অনন্ত অব্যয় ব্রহ্ম নিশ্চল হয়ে অবস্থান করছিলেন। 'নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ' (ঐত. উ. ১।১।১)—নিমেষাদি-ব্যাপারযুক্ত অন্য কিছুই ছিল না। সচ্চিদানন্দসমুদ্রে কোন আলোড়ন ছিল না। নিস্তরঙ্গ সেই শান্তসমুদ্রে হঠাৎ একসময়ে ভাবতরঙ্গ দেখা দিল—'বহু স্যাম্' (তৈ. উ. ২।৬, ছা. উ. ৬।২।৩)—আমি বহু হ'ব।

'তত্তেজোঽসৃজত' (ছা. উ. ৬।২।৩)—তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। দিগ্বিদিক্ জ্যোতির্ময় জটাজালে আচ্ছন্ন হ'ল, কোটি কোটি সূর্যের আলোক মহাশূন্যে খেলে বেড়াতে লাগল। 'তদপোঽসৃজত' (ঐ)—সেই তেজ জল সৃষ্টি করল। 'তা অন্নমসৃজন্ত' (ঐ, ৬।২।৪)—সেই জল অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করল। যদিও এখানে তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি—এই তিন ভূতের কথা বলা হয়েছে, তৈত্তিরীয় উপনিষদে তেজের আগে বায়ু এবং তারও আগে আকাশের কথা আছে। ('আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।' ২।১।৩)। তাই বেদান্তোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পাঁচটি ভূতই গৃহীত হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদেও পাঁচটি ভূতের কথা আছে। ('খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী'—২।১।৩)। বস্তুতঃ পরিদৃশ্যমান এই জগতের সকল কিছুই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের সৃষ্টি। আবার জগতের সব কিছুই পূর্ণব্রহ্ম—'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্।' (বৃহ. উ. ৫।১)

কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে তো জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন সম্ভব নয়। উন্নত প্রজ্ঞাযুক্ত মন সংসারী সাধারণ মানুষ কোথায় পাবে! সেইজন্য শুধু যে পাঁচটি মৌলিক ভূতকে ভিত্তি ক'রে এই সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাদের এক বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠা ক'রে উপাসনার জন্য দাক্ষিণাত্যের ভক্তিমান মানুষেরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাঁচটি পুণ্যক্ষেত্রে পঞ্চমহাভূতকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা। প্রত্যেক ভূতে তাঁরা পরব্রহ্মের প্রকাশমূর্তি গড়েছিলেন সাধারণ মানুষের নিষ্ঠা বর্ধনের জন্য। তাঁরা জেনেছিলেন পঞ্চভূতে সৃষ্ট সমস্ত জগৎ এই পঞ্চভূতেই আবার লয় প্রাপ্ত হয়—

'ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে
তয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
তয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্॥'

(শঙ্করাচার্য: বেদসারশিবস্তোত্রম্, ১১ শ্লোক)

'হে দেব, হে ভব, হে স্মরারি, তোমা হইতেই জগৎ হইয়া থাকে; হে মৃড় (আনন্দময়), হে বিশ্বনাথ, তোমাতেই জগৎ অবস্থান করে; হে ঈশ, হে হর, হে চরাচর-বিশ্বরূপী—লিঙ্গরূপী তোমাতেই এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়।' (স্বামী গম্ভীরানন্দ-কৃত অনুবাদ)।

তাই প্রকাশমূর্তিগুলির অবয়ব হয়েছিল বিশ্বরূপী শিবলিঙ্গ,—পঞ্চমহাভূতলিঙ্গম্। পঞ্চমহাভূতক্ষেত্রে এই পঞ্চমহাভূতলিঙ্গমের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিতা রয়েছেন মহামায়া মায়াশক্তি। তাঁদের নিকটে আছে সুপ্রাচীন স্থলবৃক্ষ আর পবিত্র পুষ্করিণী। ধর্মপ্রাণ দাক্ষিণাত্যবাসীরা শিব, শক্তি, বৃক্ষ, তীর্থবারি—সব কিছুরই পূজা অতি ভক্তিভরে ক'রে থাকেন।

ক্ষিতিমহাভূতলিঙ্গম্

প্রাচীন তীর্থ কামকোটি বা কাঞ্চীপুরমে আছেন ক্ষিতিমহাভূতলিঙ্গম্। কাঞ্চীপুরম্ মাদ্রাজ শহর থেকে মাত্র ৭২ কিলোমিটারের পথ। শহরের কেন্দ্রবিন্দু মাউণ্ট রোড থেকে ছেড়ে Indian Tourism বা Tamilnadu Tourism-এর বাসগুলি পক্ষীতীর্থ ও মহাবলীপুরমের সঙ্গে কাঞ্চীপুরম্‌তীর্থও যাত্রীদের দেখিয়ে নিয়ে আসে। যে সমস্ত দর্শনার্থীরা conducted tour পছন্দ করেন না, তাঁরা মাদ্রাজের বার্মাশেল বাসস্ট্যাণ্ড থেকে (ফ্লাওয়ার বাজারের পেছনে) কাঞ্চীপুরমের বাস ধরতে পারেন। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর গাড়ী ছাড়ে। রেলপথে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে মাদ্রাজ-বীচ্ স্টেশন থেকে কাঞ্চীপুরমের ছোট গাড়ীতে উঠতে পারেন। তবে অধিকাংশ ট্রেনই ছাড়ে

বিকালের দিকে, সেইজন্য সন্ধ্যার সময়টুকু ঠিকমত কাজে লাগানো যায় না। মাদ্রাজ-এগ্‌মোর্ রেলস্টেশন থেকেও লোকাল ট্রেনে ক'রে কাঞ্চীপুরমে যাওয়া চলে,—আরাক্কোনম্ হয়ে অথবা চিঙ্গলপুট হয়ে। আরাক্কোনমের চাইতে চিঙ্গলপুট দিয়ে যাওয়াই সুবিধে। কারণ চিঙ্গলপুট থেকে কাঞ্চীপুরম্ মাত্র ৩৫ কিলোমিটার, রেলস্টেশনে সব সময় কাঞ্চীপুরমের জন্য যানবাহন মেলে।

পুরাণবিশ্রুত এই কাঞ্চীপুরমের প্রসিদ্ধি বারাণসীর মত। শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ সকলের তীর্থক্ষেত্র এটি। শহরের চারটি ভাগের নাম তাই শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, জিনকাঞ্চী আর বৌদ্ধকাঞ্চী। বলা বাহুল্য, শিবকাঞ্চী বা পেরিয়াকাঞ্চীতেই আছেন ক্ষিতিলিঙ্গ একাম্রেশ্বর। ত্রিশ একর জমির ওপর তৈরি একাম্রেশ্বরের মন্দিরটি এ শহরের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। কে, কবে এবং ঠিক কখন যে মন্দিরটির প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে সপ্তম শতাব্দীর আগে যে এ মন্দিরের অবস্থিতি ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ। সপ্তম থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে পল্লব, চোল ও বিজয়নগরের রাজন্যবর্গ এর পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছেন। প্রাকারকে প্রাকার দিয়ে বেষ্টন ক'রে মন্দির সুরক্ষিত করেছেন, গোপুরম্ গড়েছেন, মণ্ডপ নির্মাণ করেছেন

পঞ্চপ্রাকারে ঘেরা একাম্রেশ্বর মন্দিরের চারটি গোপুরম্। গোপুরম্ হ'ল মন্দিরের প্রবেশতোরণ। দক্ষিণদেশীয় এই তোরণগুলির গঠন অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তোরণগুলিতে একাধিক তল থাকে, আর প্রত্যেক তলে থাকে একটি ক'রে গবাক্ষ। উচ্চতার সঙ্গে আয়তন কমিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোপুরম্‌গুলিকে গর্ভমন্দিরের চাইতে উঁচু ক'রে গড়া হয়। একাম্রনাথ-মন্দিরের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই, সব কয়টি গোপুরম্ই চমৎকার। তবে এদের মধ্যে বেশী আকর্ষণীয় হ'ল দক্ষিণটি। দক্ষিণগোপুরম্‌টি উচ্চতায় ১৯২ ফুট, এর নব-'তলছন্দে'র ধাপে ধাপে রয়েছে নিপুণ হাতের শিল্পকর্ম। নয় তলের নয় গবাক্ষে নয় টুকরো নীল আকাশ, গবাক্ষসারির শেষে গোপুরমের অর্ধগোলাকৃতি মুকুট, মুকুট ঘিরে খণ্ড মেঘের মেলা মানুষের মন কেড়ে নেয়। তোরণটি তৈরির কৃতিত্ব বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায়ের। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চীপুর জয় ক'রে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি এটি একাম্রনাথকে প্রণামী দিয়েছিলেন।

দক্ষিণদেশে এসে শুধু মন্দিরগোপুরমের গঠন-বৈশিষ্ট্য বা মন্দিরের অন্যান্য অংশগুলির শিল্পকর্ম লক্ষ্য করলেই কিন্তু দর্শকের দায়িত্ব শেষ হবে না। এদের স্থাপত্যশৈলী ও বিন্যাসের মধ্যে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সংকেতিত হয়েছে সেটিও অনুধাবন করতে হবে। যেমন,—রথাকার গোপুরম্‌গুলি হ'ল মানবদেহের প্রতীক। এই একাম্রনাথ-মন্দিরের দক্ষিণগোপুরমে যে নয়টি গবাক্ষ রয়েছে তারা হ'ল মানুষের শরীরের নবদ্বার। নবদ্বারযুক্ত দেহী জীব সর্বদা বাইরের বিষয় গ্রহণের চেষ্টা করছে। গোপুরমের সামনে তাই পড়ে আছে প্রশস্ত রাজপথ। এ পথ হ'ল সংসার। সংসারে, গোপুরমের এপারে অজ্ঞান-সুখদুঃখ-মৃত্যুময় মানবজীবন। আর ওপারে ?—পরমপদ আনন্দধাম। ওই আনন্দধামে পৌঁছানোই তো হবে মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য! সেইজন্য বুদ্ধিসারথি মনের লাগাম টেনে শরীররথকে চালনা ক'রে নিয়ে যাবে পথের ওপারে আনন্দময় ব্রহ্মধামে। পার হবে তিন 'দ্বারশোভা' অর্থাৎ তিন কাল ও তিন অবস্থার প্রতীক তিনটি মন্দিরদ্বার,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান আর জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। এই সকল অবস্থা অতিক্রম ক'রে ইন্দ্রিয়সমন্বিত দেহী জীব পরমাত্মার দর্শনে এগিয়ে যাবেন। দ্বারের পর তিনি দেখবেন 'বলিপীঠম্',

—এ এক সমচতুষ্কোণ প্রস্তরবেদী। বেদীর ওপর খোদাই করা রয়েছে অধোমুখ অষ্টদল এক পদ্ম। পদ্মটি বৃন্তহীন, বৃন্তস্থান বৃত্তাকার আসনের মত সমতল। বেদীর মূলে রয়েছে একটি চক্র। বলিপীঠমের এই চক্র সহস্রারের প্রতীক, আর অধোমুখ অষ্টদল পদ্ম হ'ল 'ইষ্টদেব-বাসস্থল'। সাধক সাধনার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত ক'রে ঊর্ধ্বমুখী করলে অধোমুখ পদ্মটি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে যায়। বলিপীঠমের সামনেই তিনি দেখতে পাবেন ধ্বজস্তম্ভ,—ধাতুকেতন মাথায় নিয়ে ঋজু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক মনকে এই ধ্বজস্তম্ভের মত স্থির করবেন। তবেই নন্দীরূপী জীবাত্মার দৃষ্টি পরমাত্মায় নিবদ্ধ করা সম্ভব হবে। তারপর ধীরে ধীরে এই অবস্থা থেকে আরও উন্নীত হ'লে যোগী হৃদয়-গুহামন্দিরে আপন আত্মার আলোকে পরমাত্মার দর্শন লাভ করবেন। তখন জীবাত্মা আর পর-মাত্মায় কোন প্রভেদ থাকবে না।—স্থাপত্য-পরম্পরার এই ব্যাখ্যা সাধুমহাত্মাদের জন্য। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এর নাগাল পায় না। সেইজন্য গোপুরমের গায়ে সংসারের নানাকাহিনীর চিত্রণ, নানারূপে গড়া দেবদেবী, পৌরাণিক মানুষের প্রতিমূর্তি। সেখানে দুঃখদুর্দশা, ভালমন্দের নানান ছবি। সংসারজীবী সাধারণ মানুষ সব রকম ভালমন্দ হাসিকান্না পেছনে ফেলে শান্তির আশায় দেবতার দুয়ারে ছুটে আসবে। বলিপীঠমে কুপ্রবৃত্তি, কুবাসনা, কুকর্ম বলিদান করবে। তারপর নন্দীর পিছনে দাঁড়িয়ে দেবদর্শন করবে, প্রণাম জানাবে। সংসারী মানুষের চিত্ত স্থির নয়, মনও উন্নত নয়, সেইজন্য নন্দী বা বৃষকে অতিক্রম করবার তার অধিকার নেই।

সংসারী সাধারণ মানুষের সাধারণ চিন্তা। তার ভাবনাশক্তিও সীমিত। বিরাট কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করবার ক্ষমতা তার নেই। সেইজন্য সহানুভূতিশীল মুনিঋষিরা সাধারণের জন্য রেখে গেছেন নানারকম পৌরাণিক কাহিনী। ধ্যান-ধারণার স্বল্প পরিসরে সরস ক'রে সাজানো পুরাণ-কাহিনীগুলির মূল সুর হ'ল ভক্তি। ভক্তিপথই সব চাইতে সহজ সাধনপথ। সেইজন্য সে যুগের মুনিঋষিরা ভক্তিমার্গ দিয়েই সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন কৈলাসের কাহিনী।

একদিন কৈলাসে কৌতুকবশে পার্বতী নিজের কোমল কর দু'টি দিয়ে শিবের চক্ষুর্দ্বয় আবৃত ক'রে ধরেছিলেন। দেবীর ক্ষণিক কৌতুকখেলায় ত্রিলোকে নেমে এসেছিল যুগযুগান্তের অন্ধকার। চন্দ্রসূর্যের আলো নিভে গিয়েছিল, দেবতারা প্রমাদ গণেছিলেন। তাঁরা দলবেঁধে শিবের দরবারে নালিশ জানাতে গিয়েছিলেন। বিচারকের আসনে বসে শিব পার্বতীকে নির্বাসন-দণ্ড দিলেন, বললেন —'যাও, মর্তবাসিনী হয়ে তুমি পৃথিবীর নানাতীর্থ পর্যটন কর। তীর্থে তীর্থে আমার তপস্যা কর। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলেই আবার কৈলাসে ফিরে আসবে, আমার পাশে স্থান লাভ করবে।'

মর্তবাসিনী হয়ে পার্বতী হলেন 'অম্বিকা'। কাম্পাই নদীর কূলে কাঞ্চীপুরম্ তীর্থে এসে এক আমগাছের তলায় বালি দিয়ে গড়লেন এই একাম্রেশ্বর শিবলিঙ্গ। বহুকাল ধ'রে একনিষ্ঠ-ভাবে এঁর পূজা ক'রে যেতে লাগলেন। একদিন শিবের বাসনা হ'ল অম্বিকাদেবীর নিষ্ঠা পরীক্ষা ক'রে দেখেন।—তিনি কাম্পাই নদীকে ইঙ্গিত করলেন। ইঙ্গিত পেয়েই কাম্পাই কূলের বাঁধন ভেঙ্গে ফুলতে ফুলতে বিশাল দেহ নিয়ে ওপরে উঠে এলেন। অম্বিকাদেবীর পূজার আয়োজন ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে ছুটে গেলেন। বালুলিঙ্গ জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। আকুল হয়ে মুক্তকুন্তলা দেবী দুই বাহু দিয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতাকে বুকের

মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন। লিঙ্গমূর্তি কোনমতে রক্ষা পেল। একাম্রনাথের দেহে এখনও অম্বিকা-দেবীর সেই আলিঙ্গন-চিহ্ন, বলয়ের দাগ বর্তমান। পৌরাণিক সেই আমগাছ এখনও ডালপালা মেলে মন্দিরচত্বরে বিরাজমান। কাম্পাই এখন এক বিস্তীর্ণ পুষ্করিণীতে পরিণত হয়েছে।

অম্বিকাদেবীর জন্য ক্ষিতিভূতক্ষেত্রে কোন পৃথক্ মন্দির নির্মিত হয় নি। তিনি শিবের পাশে অঞ্জলিবদ্ধা অবস্থায় রয়েছেন। জলাশয় কাম্পাইতীর্থ ছাড়াও চৌহদ্দীর মধ্যে রয়েছে পবিত্র দীঘি শিবগঙ্গা। কিন্তু শিব কোন তীর্থেরই জল স্পর্শ করেন না। বালুলিঙ্গের অভিষেক হয় মধু আর তেল দিয়ে। স্থূলবৃক্ষ আমগাছটিকে সযত্নে প্রাচীর ঘিরে রাখা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে এর চার শাখায় চার রকমের ফল ধরে। একাম্রনাথ-শিব কাঞ্চীতীর্থে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল দান করেন।

মন্দিরসীমার মধ্যে সবশুদ্ধ ১০৮টি শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁদের মধ্যে দু'টি অভূতপূর্ব এবং অবশ্যই দর্শনীয়।—একটি ১০০৮ লিঙ্গে গড়া এক বিরাট শিবলিঙ্গ, অপরটি ১০৮ শিবলিঙ্গের সমষ্টি। ছোট্ট এক মন্দিরপ্রকোষ্ঠে দেখেছিলাম সোনার নন্দী, রূপার মূষিক, আর একাম্রেশ্বর-শিবের বিজয়-বিগ্রহ। ধাতুনির্মিত এই বিজয়বিগ্রহে দেবী অম্বিকার ভক্তিকাহিনী মূর্ত হয়ে রয়েছে। দেবী মাটিতে হাঁটু পেতে ব'সে দুই বাহু দিয়ে তাঁর আরাধ্যদেবতাকে আলিঙ্গন ক'রে আছেন। মূর্তিগুলিকে উৎসবের সময় শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এ মন্দিরে বিষ্ণু আছেন পার্শ্বদেবতা হিসাবে। তাঁর জন্য পৃথক্ মন্দির ও পূজার ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এইসব পার্শ্বদেবতাদের মন্দিরসহ মূল মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন রাজা তৃতীয় কুলতুঙ্গ চোল। মণ্ডপের স্তম্ভমূলে তাঁর পূর্বপুরুষ কারিকল চোলের চারফুট উঁচু প্রস্তর-মূর্তিটি বোধ হয় তখনই তৈরী হয়েছিল। মূর্তিটি অতি চমৎকার।

দর্শক যদি সময় নিয়ে এ-মন্দিরের স্থাপত্যকলা পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন মন্দির-গাত্রের কোন কোন অংশ বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাংশ দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। ইতিহাস বলে সপ্তম শতাব্দীর গোড়াপত্তন থেকেই দাক্ষিণাত্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক'মে আসছিল। কাঞ্চীপুরমের রাজা 'প্রথম মহেন্দ্রবর্মন পল্লব' নায়নার (=সিদ্ধ শৈব সন্ন্যাসী) আপ্পারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পল্লবরাজ জৈনধর্ম ত্যাগ ক'রে আপ্পারের কাছ থেকে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। বোধ হয় সেইজন্যই বৌদ্ধ-মন্দিরগুলিকে ভাঙ্গচুর ক'রে বা ভাঙ্গা অংশ তুলে এনে এ-মন্দির গড়বার সময় কোনরকম সরকারী বিপত্তি উপস্থিত হয় নি। পরবর্তী কালে একাম্রেশ্বর-মন্দিরের ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটেছিল। দ্বিতীয় মহীশূরযুদ্ধের সময় ইংরেজ-বাহিনী মন্দিরটিকে বেশ কিছুদিনের জন্য সৈন্যাবাসে পরিণত করেছিল। তখন কৃষ্ণদেবরায় নির্মিত সহস্রস্তম্ভের সভামণ্ডপটি ভাঙ্গচুর করা হয়। মহামণ্ডপের হাজার স্তম্ভের মধ্যে এখন টিঁকে রয়েছে মাত্র ৬১৬টি। তবে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্মীরা পল্লব, চোল ও বিজয়নগর রাজন্যবর্গের তৈরি এই অসামান্য মন্দিরসৌধটি রক্ষা করবার জন্য বিশেষ যত্নবান হয়েছেন।

[ক্রমশঃ]

নামে ও প্রণামে

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

নামের করেছ সাধ—আহা!
চরিতার্থ হয় যেন তাহা
ইহজীবনেই।
কোটি যুগ-যুগান্তের পাতায় পাতায়
মহাকালবুকে—রাখে কেহ লিখে
শ্রুতিবাণী সব
উচ্চারিত যাহা লোকে-লোকে দিকে-দিকে
মুনি-ঋষি-কবি-কণ্ঠের ধ্বনিতে
'শৃণ্বন্তু' বাণীতে!—
'বেদাহং' ব'লে যাহা পেয়েছে জানিতে!—
শ্রুতিমাতা বলে যাঁরে বিশ্বলীলাময়!

আমি হীন? তুমি হীন?
তুমি আমি বিশ্বরূপে রূপময়
সেই এক—অনামিক!

সর্বরূপ সর্বময় যিনি,
তাঁর নামলীলা শোনো
নামে ও প্রণামে তাঁরে জানো।

ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি তোমাতে আমাতে
নিমেষের পলকের জন্মমৃত্যুর লীলাতে
বিশ্বরূপ একীভূত এই মহা বিশ্বধামে!
একাকার মহা 'আমি' নামে ও প্রণামে!

আমি ও সে

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

পাশাপাশি কিংবা আগুপিছু
আমি চলি সেও চলে,
আমি থামি সেও থামে;
কখনো-বা আমি চলি সে দাঁড়িয়ে থাকে,
আমি থামি সে এগিয়ে ডাকে।
আমার সঙ্গেই নিত্য আছে, তবু
তাকে আমি ঠিক চিনি না তো!

অত ভেবে কাজ কী-বা, মরি-বাঁচি
ছুটে চলি,—
পৌঁছতে তো হবেই,
দূরে সে দাঁড়িয়ে হাসে;
স্ফীত যদি অহঙ্কারে
ঝড়ের মতন এসে ধরাশায়ী করে
যত সজ্জিত গরিমা।
নিদ্রাসুখে নিশ্চেতন যদি
আমারি শিয়রে বসে বলে—'ঐ ত্যাখ্
সূর্য ওঠে, এখন কি ঘুমের সময়?'
—আমাকে সে গল্প বলে অফুরন্ত জীবনের।

তবু, আর পারি নাকো।
এইবার তার চোখ বেঁধে
ভেগে পড়ি জনতার আত্মহারা ভিড়ে;
কী অবাক, আমাকে সে খুঁজে নিয়ে আসে।

যীশুজননী মেরী

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

[পৌষ, ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

পাঁচ

মা মেরীর প্রতি যীশুর মনোভাব যেন স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। সোজাসুজিভাবে মাতৃসম্ভাষণ না করে তিনি তাঁকে মানবী বলে সম্বোধন করেছেন। ভ্রাতৃমণ্ডলী বা জননীর উল্লেখে তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে এই সম্বোধন সংযুক্ত করলে মা মেরীর প্রতি তাঁর অবজ্ঞা না হলেও অনাদরের ভাব ছিল এ সংশয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু যীশুর এ আচরণের গভীরতর কারণ ছিল বলে মনে হয়।

তত্ত্বের দিক থেকে যীশু ঈশতনয়—ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির পরিভাষায় বলা যায়—অবতার-পুরুষ। ঈশাবতরণ প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ (৪।৬)

—'জন্মহীন হয়েও এবং অব্যয়াত্মা আর ভূতবর্গের ঈশ্বর হয়েও আমি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে আত্মমায়াযোগে সম্ভূত হই।'—ঈশাবতারের জন্মাদি সবই মায়াশ্রিত—শ্রীভগবানের নরলীলা নরবৎ হলেও তা কেবল ইন্দ্রজালবৎ প্রতীয়মান সত্য। যীশু মা মেরীকে জননীরূপে সম্ভাষণ করলে তা নরলীলার দিক থেকে স্বাভাবিক হত সন্দেহ নেই। কিন্তু জননীকে অনাত্মীয়ার মতো মানবী-সম্ভাষণে তিনি যে অপৌরুষেয় সত্তা এই তত্ত্বটি যেন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীভগবানের মানবশরীরে সম্ভূতির ভাবনা ধর্মপ্রাণ ভারতীয়ের সংস্কারগত। কিন্তু ইহুদী ধর্মে পরমেশ্বর আর মানবের মধ্যে এমন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান কল্পিত হয়েছে যে তিনি যে ঈশতনয়, সাধারণ মানুষ নন, তা প্রতিপাদন করার জন্য তিনি এ কথা বার বার ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রকারান্তরে তাঁকে মানবীয় সম্পর্ককেও অস্বীকার করতে হয়েছে। ঐজন্যই সর্বদা সর্বথা ঈশ্বরকেই পিতৃসম্ভাষণ করেছেন।—অবশ্য যোশেফকে তিনি কীভাবে সম্বোধন করতেন চার দিব্যকথায় সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই।

যীশুর বয়স যখন বারো বছর তখনকার একটি কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। [লুক ২]

যোশেফ আর মা মেরী প্রতি বছরই পাসোভার উৎসবে জেরুজালেমে যেতেন, যীশুও যেতেন তাঁদের সঙ্গে। সে বছর উৎসবের পর অন্য যাত্রীদের সঙ্গে তাঁরাও ফিরছিলেন, কিন্তু যীশু যে থেকে গেলেন ভিড়ের মধ্যে তা বুঝতে পারলেন না; মনে করলেন, সহযাত্রীদের মধ্যে কোথাও আছেন তিনি। একদিনের পথ অতিক্রম করবার পরও তাঁকে দেখতে না পেয়ে তাঁরা আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত লোকদের কাছে খোঁজখবর নিলেন, কিন্তু যীশুর সন্ধান পেলেন না। তাঁরা তখন জেরুজালেমেই ফিরে গেলেন।

তীর্থভূমি জেরুজালেম ছোট্ট জায়গা নয়, সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিন দিন বাদে তাঁরা দেখলেন যে বালক যীশু যিহোভার মন্দিরে এক জায়গায় পণ্ডিতদের মধ্যে বসে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। বালকের বোধশক্তি দেখে পণ্ডিতরা হতবাক।

মা মেরী যীশুকে বললেন, 'বাছনি, আমাদের সঙ্গে এমন করলে কেন? তোমার বাবা আর আমি আকুল হয়ে তোমাকে কত খোঁজাখুঁজি করছি।'

যীশু বললেন, 'খোঁজাখুঁজি করার কী আছে! জানতে না কি, আমি আমার বাবার ঘরেই থাকব?'

তাঁরা যীশুর কথার মানে বুঝতে পারলেন না। যীশু তাঁদের সঙ্গে ন্যাজারেথে ফিরে গেলেন।

মা মেরী কিন্তু তাঁর এই কথাগুলো বুকের মধ্যে পুষে রাখলেন।

মা মেরীকে মাতৃসম্ভাষণ না করার অন্য কারণও থাকতে পারে। যীশুর যা জীবন সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসীর জীবনের সঙ্গে তার তুলনা হয়। অনেকে মনে করেন, যীশুর প্রথম জীবন তাঁর সমকালের এসেনী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কেটেছিল; হয়তো তিনি ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন। পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সংযোগ রাখা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। সম্ভবত সন্ন্যাসীর আচরণ-বিধির অনুসারী হয়েই তিনি মা মেরীকে জননীরূপে সম্ভাষণ করেননি।

প্রকৃতপক্ষে তিনি মা মেরীকে অবজ্ঞা তো দূরের কথা উপেক্ষাও করেননি। ক্যানার বিবাহোৎসবের ভাণ্ডারে যখন মদ ফুরিয়ে গেল, মা মেরী তখন তাঁকে সে কথা জানিয়েছেন। তাঁর মনে লেশমাত্র স্বার্থচিন্তা ছিল না। একান্ত করুণার বশেই তিনি ইচ্ছা করেছেন, যীশু তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে গৃহকর্তাকে এই সামাজিক সংকট থেকে উদ্ধার করুন। যীশু যে ঐ শক্তির অধিকারী আর পরের কল্যাণের জন্যই তা প্রয়োগ করেন মা মেরী এই সত্যটি অনুভব করেছেন। তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যরাও তখন বা পরেও যীশুর কারুণিক স্বরূপটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি না তা বোঝা যায় না।

মা মেরীর কথায় যীশু ক্ষুব্ধ হননি, বিরক্ত হননি। শুধু তাঁর দিব্য বিভূতি প্রকাশের অবকাশ তখনও হয়নি বলে মৃদু অনুযোগ করেছেন কিন্তু আত্মপ্রকাশ না করেও তিনি বিভূতিবলে করুণাময়ী জননীর ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

যীশু যে ভাগবত জীবনের কথা ভক্তমণ্ডলী বা জনসমাজে বার বার বলেছেন, সে জীবনে মায়িক সম্বন্ধের কোনো স্থান নেই। ভাগবত প্রসঙ্গ করার সময় যখন তাঁর কাছে ব্যবহারিক জগতের সম্পর্কে ভ্রাতৃমণ্ডলী বা জননীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তিনি আধ্যাত্মিক সাধনসূত্রে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথাই বলেছেন সে আত্মীয়তা, সে সম্পর্ক গভীরতর।

ক্রসবেধে যীশুর লীলাবসানের জন-কথিত একটি বর্ণনাংশও [জন ১৯] স্মরণীয়। ক্রসবিদ্ধ যীশুর কাছে সমবেত জনতার মধ্যে অন্তরঙ্গ শিষ্য বা ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন তিন মেরী- যীশুজননী মেরী, মাতৃস্বসা ক্লোপাসপত্নী মেরী আর মেরী ম্যাগডালিনি, যাকে যীশু শত পাপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

যীশু তাঁর জননীর দিকে চেয়ে দেখলেন (জন মা মেরীকে যীশুর জননীরূপেই উল্লেখ করেছেন), তারপর চাইলেন কাছেই দাঁড়ানো এক শিষ্যের দিকে যাঁকে তিনি ভালোবাসতেন (জন তাঁর বিবরণে আত্মপরিচয় দেননি, সংকোচে সম্ভ্রমে এইভাবে নিজেকে গোপন রেখেছেন)। জননীর উদ্দেশে যীশু বললেন, 'নারী, চেয়ে দেখো—তোমার পুত্র!' তারপর সেই শিষ্যকে বললেন, 'দেখো—তোমার মা।'

সেই সময় থেকেই ঐ শিষ্য মা মেরীকে নিয়ে গিয়ে যেন প্রতিষ্ঠাই করলেন তাঁর আপন গৃহ-মন্দিরে।

ভ্রাতৃমণ্ডলী কোথায় গেল—কোথায়ই বা গেল অন্য পরিজন! এ এমন এক জগৎ, যেখানে লৌকিক যত সম্বন্ধ চুকে বুকে যায়; গড়ে ওঠে এক দিব্যভাবাশ্রিত সুগভীর প্রেমসম্পর্ক। যোশেফের পত্নী, 'ভ্রাতৃমণ্ডলী'র মাতৃপদবাচ্যা, আর এক মেরীর ভগিনী বা ক্লোপাসের শ্যালিকা—এই রকম বহিরঙ্গ সম্পর্ক কোথায় হারিয়ে গেছে! শুধু থেকে গেছে শাশ্বত পরিচয়—ভক্তহৃদিনিলয়ে চিরনিবাসিনী দেবশিশুর দিব্যস্নেহময়ী জননী সর্বসন্তাপহারিণী আর্তজনের পরমনির্ভর করুণার চিরনির্ঝর অমলমূর্তি মা মেরী।

সমালোচনা

স্বানুভবসুধা (১ম খণ্ড : পূর্বার্ধ) : শ্রীশ্রীবাবা-ঠাকুর। সঙ্কলয়িত্রী ও প্রকাশিকা : শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী, ৮।৩৭ ফার্ণ রোড, কলিকাতা ৭০০০১৯। (১৯৮০), পৃঃ ৭+১১৩+১৮+৪৭৬+৭, মূল্য : চল্লিশ টাকা।

বাংলার ধর্মজগতে বই ছাপানোর ঝোঁক সব সময়ই বেশী। সম্প্রতি কোনো সংবাদ-পত্রের সমালোচনাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সাংবাদিক বলছিলেন, 'আমরা এখন ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা আর প্রকাশ করবো না ঠিক করেছি।' সেটা কার দুর্ভাগ্য বলা কঠিন। আমরা যে বইটির আলোচনা করতে যাচ্ছি, এ বইটির সমালোচনা যদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাতে আধ্যাত্মিক আগ্রহসম্পন্ন অনেকেরই একটি মৌলিক, অনাড়ম্বর, গভীরদর্শী জীবনচেতনার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটবে। এমন সুমুদ্রিত পরিচ্ছন্ন প্রকাশনও হাল আমলে চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। শ্রদ্ধেয় বিষয়বস্তুকে সুচারু প্রকাশনার মাধ্যমে নিবেদন করে প্রকাশিকা ও সঙ্কলনকারিণী শ্রীমতী চক্রবর্তী পাঠকপাঠিকাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ লাভ করবেন, সন্দেহ নেই।

'পরিশিষ্টে' লেখিকার মন্তব্য সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করি—'অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপই হইল শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের অনুভূতি ও দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সচ্চিদানন্দই হইল ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম স্বয়ং। সে-ই আবার সকলের আপনস্বরূপ বা সত্যস্বরূপ। ইহা নিত্যঅদ্বৈত ও নিত্যবর্তমান।'

সাকার-আকার, দ্বৈত-অদ্বৈত, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম—সব সাধনপন্থা ও অনুভূতির মধ্যে এক অখণ্ড সত্যের ধারা এ গ্রন্থে প্রতিভাত। আপাতদৃষ্টিতে সরল সহজ মনে হলেও বিভিন্ন স্তরের ভাব ও চিন্তার উপস্থাপনায় বক্তার, সঙ্কলয়িত্রীর ও সংগ্রাহকদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। যা আলাপচারী হতে পারতো বা দার্শনিক বক্তৃতার বিষয় হতে পারতো—বিষয়বস্তু অনুসারে ভাগ করে এ গ্রন্থে তা অনেকগুলি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশিত।

দাক্ষিণাত্যের আলোয়ারদের গানে, বাংলা চর্যাগীতিকায় এ-জাতীয় ভক্তি ও তত্ত্বময় গীতি-রচনার ধারা উল্লেখযোগ্য। আলোচ্যগ্রন্থের 'স্বানুভব' বা আত্ম-অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশগুলি ঠিক ঐ স্তরের সাহিত্যসার্থকতা লাভ না করলেও আন্তরিকতা ও তন্ময়তার মিলনে সাধকমনের যথাযথ প্রতিচ্ছবি। সদ্য খনি থেকে তোলা মণি যেমন বহুমূল্য হলেও মণিকারের শিল্পকৌশলের অপেক্ষা রাখে এ গ্রন্থের অনেক কবিতাই সেই স্তরের। তারই মধ্যে এক একটি গানে সাহিত্য-সম্পূর্ণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

আসবে বলেছিলে হরি, তাই বসে গুণছি দিন
তোমার গৌর হ'তে বাকি আছে কতদিন—।
শিব হবে অদ্বৈত যোগ করি ভঙ্গ •
বলাই দাদা নিতাই হবে খেলা করি সাঙ্গ।
... ...
উদ্ধব হবে শ্রীবাস যার গৃহে খেলবে রাস।
গরুড় গোবিন্দ হয়ে বইবে তব অঙ্গবাস ॥

(পৃঃ ৪৪১-৪২)

নমি তোমায় মোরা সবায়
শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান
ঈশা মুশা বুদ্ধ যীশু
গোরা আল্লা তোমার নাম ॥ (পৃঃ ৩৩১)

সব মিলিয়ে সত্যান্বেষী সাধক-অন্তরের ব্যাকুলতা, অনুভব-বৈচিত্র্য, যথার্থ 'আমি' বা স্ব-স্বরূপের আনন্দসুধা এ গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে নতুন অথচ চিরপুরাতন ভাবজগতের নবরূপায়ণের সন্ধান দেবে।

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন

কামারপুকুর-জয়রামবাটী অঞ্চলে এবং ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বালিদেওয়ানগঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নবনির্মিত জগৎপুর, নিশ্চিন্ত নীড়, অভয়বাড়ি ও নূতন কানাইপুর গ্রামের এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার পীড়িত জনগণের সেবার জন্য গত ২৭শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি দিবসে কতিপয় ভক্ত ও বন্ধুর দানে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়। উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বার্ষিক আনুমানিক পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রয়োজন হইবে। এই প্রকল্প ভারতীয় আয়কর আইনের ৩৫ সিসিএ ধারায় অনুমোদিত এবং দাতাগণ আয়কর ১০০% ছাড় পাইবেন। পল্লীমঙ্গল সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেবাকার্যের নিমিত্ত মুক্তহস্তে দান করার অনুরোধ জানাইতেছে।

এই দিনের উৎসবে কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও নিশ্চিন্ত নীড়ে বহুলোক যোগদান করেন এবং তৃপ্তিসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। শেষোক্ত স্থানে প্রায় নয় হাজার গ্রামবাসী উপস্থিত হন। রোগীদের ভিড়ও যথেষ্ট হয়।

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) **অন্ধ্র প্রদেশ :** শ্রীকাকুলামে (বন্যায়) প্রাথমিক ত্রাণকার্য শেষ হইয়াছে।

(খ) **গুজরাত :** (১৯৭৯'র মোরভির বন্যায়) পুনর্বাসনকার্য প্রাগ্রসর।

(গ) **পশ্চিমবঙ্গ** (১৯৭৮-এর বন্যায়) পুনর্বাসনকার্য : বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পুনরুদ্ধারের কার্য এবং বন্যাদুর্গত যে-সকল ব্যক্তি দারিদ্র-সীমার নীচে রহিয়াছে, তাহারা যাহাতে খাদ্যে স্বনির্ভর হইতে পারে সেজন্য গৃহীত কর্মসূচীর রূপায়ণ প্রাগ্রসর।

নেপালে :

ভূমিকম্পত্রাণ : পশ্চিম নেপালে বৈটাদি জেলায় গরম পোশাক প্রভৃতি বিতরণ করা হইতেছে।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ (মানিক মহারাজ) গত ২৪শে নভেম্বর ১৯৮০, সকাল ১০-৪৫ মিনিটে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮১ বৎসর। তিনি পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ও হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্যরোগে ভুগিতেছিলেন ; ফুসফুসে সংক্রামক অসুখের জন্য ২২শে নভেম্বর সেবাশ্রমে ভর্তি হন এবং ঐ রোগেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৭ সালে পাটনা আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৩৩ সালে তাঁহার গুরুদেবের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পাটনা আশ্রম ব্যতীত তিনি ঢাকা, কনখল, বৃন্দাবন, রাজকোট, এলাহাবাদ এবং বারাণসী সেবাশ্রমে কাজ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সময়ে স্বর্গাশ্রম, উত্তরকাশী এবং নর্মদাতে থাকিয়া তপস্যা করেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে ছিলেন।

স্বামী অলোকানন্দ (অমূল্য মহারাজ), গত ৯ই ডিসেম্বর ১৯৮০, ভোর ৪-২২ মিনিটে বহুমূত্ররোগাধিক্যে অচেতন হইয়া বৃন্দাবন সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৭ বৎসর। তিনি গত কয়েক বৎসর যাবৎ বহুমূত্ররোগ এবং কখন কখন অত্যধিক উদরাময়ে ভুগিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩০ সালে দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪২ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। দেওঘর বিদ্যাপীঠ ব্যতীত তিনি বেলুড় মঠ, ঢাকা, নতুন দিল্লি, কনখল, লক্ষ্ণৌ, চণ্ডীগড় এবং বৃন্দাবন কেন্দ্রে কাজ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি গত কয়েক বৎসর যাবৎ অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি-উৎসব

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৮তম আবির্ভাবতিথি গত ১৩ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৮০), রবিবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতির সময় হইতেই বহু ভক্ত নরনারী উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আনন্দ-উৎসবের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সারাদিন ও সান্ধ্য আরাত্রিকের পরও সকল ভক্তকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের নূতন বাড়ীর সারদানন্দ হলে সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। সকালে শ্রীধ্রুব চৌধুরী ও সহশিল্পীবৃন্দের ভজনের পর স্বামী সুপ্রসন্নানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও বাণী আলোচনা করেন। কালীকীর্তন করেন দীনসংঘের শিল্পীবৃন্দ। সন্ধ্যায় লীলাগীতি পরিবেশন করেন খোপাধ্যায় ও সহশিল্পীবৃন্দ।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মজয়ন্তী ও খ্রীষ্টোৎসব

পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের বহুস্মৃতিধন্য উদ্বোধন কার্যালয় তথা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ২৭শে পৌষ, ১১ই জানুআরি (১৯৮১), রবিবার সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহার জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজনকীর্তনাদি হয় এবং সারাদিন সাধু ও সমবেত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর নূতন বাড়ীর সারদানন্দ হলে স্বামী সারদানন্দজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বলেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ ও স্বামী মুমুক্ষানন্দ।

২৪শে ডিসেম্বর (১৯৮০) সারদানন্দ হলে ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্বসন্ধ্যা পালিত হয়। তাঁহার সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে বাইবেল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী শ্রীশানন্দ।

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ১৭ই জুন ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ২৮শে জুন ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

আগের পরিচ্ছেদে (১।৩।৫) শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তির কথা বলেছেন। বলেছেন ভক্তিপথ সহজ পথ

এখন তিনি জ্ঞানের কথা বলবেন। তারই মুখবন্ধ ক'রে রাখছেন মাষ্টারমশাই গীতার একটি শ্লোক দিয়ে, যাতে জ্ঞানীর লক্ষণ বলা হয়েছে—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥
(৩।১৭)

—'যে-ব্যক্তি আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোন করণীয় নেই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানা-রকম অবস্থার বর্ণনা আছে।' তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলছেন, 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।'—তিনি রসস্বরূপ। জীব সেই রসস্বরূপকে লাভ ক'রে আনন্দিত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলছেন, 'য এবং বেদ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি স ইদং সর্বং ভবতি।'—যিনি নিজেকে 'আমি ব্রহ্ম' এইভাবে জানেন, তিনি সর্বাত্মভাব লাভ করেন। গীতাতেও নানাভাবে ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা—স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বলা হয়েছে।

এ-সব অবস্থা শরীরবোধ থাকতে হয় না—ভারী কঠিন। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, 'জ্ঞানপথ—বড় কঠিন পথ। বিষয়বুদ্ধির—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে—জ্ঞান হয় না।' গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি সব শাস্ত্রেই বলা হয়েছে, বিষয়বাসনা ত্যাগ না করলে জ্ঞান হবে না। বলা হয়েছে, 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'—ত্যাগের দ্বারাই বিরল কেউ কেউ অমৃতত্ব লাভ করেছেন। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
(৭।৩)

—'হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিরল কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভের জন্য প্রচেষ্টা করেন; আর প্রযত্নশীল মুমুক্ষুগণের মধ্যেও কদাচিৎ কেউ আমার স্বরূপ জানতে পারেন।' তাই জ্ঞানপথ বড় কঠিন। এতে চাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি আর মুমুক্ষুত্ব—এই সাধনচতুষ্টয়। কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা অনিত্য—যিনি বুঝেছেন, ইহলোকের ও পরলোকের সব কিছু ভোগ্য বিষয় যাঁর কাছে 'বান্তাশনে'র মতো—বমিত খাদ্যের মতো ঘৃণ্য, যিনি অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ দমন করেছেন, যাঁর সহ্য-শক্তি অপার, মনকে সমস্ত বিষয়বাসনা থেকে যিনি গুটিয়ে এনেছেন আত্মবস্তুতে, গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে যাঁর অটল বিশ্বাস, যাঁর মন সমাহিত—তিনিই পারবেন জ্ঞানলাভ করতে। কাজেকাজেই জ্ঞানপথ অতি কঠিন। মানুষের জ্ঞানবিচারই আসবে না, যদি তার ত্যাগবুদ্ধি না থাকে। কামনাবাসনা না গেলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আসে না। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র। শংকরাচার্যের মতে এই সূত্রে 'অথ' শব্দটির অর্থ— সাধনচতুষ্টয়ের অনন্তর। সাধনচতুষ্টয় থাকলে তারপরে আসবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ব্রহ্মবিষয়ে জানবার ইচ্ছা। কামকাঞ্চনে এতোটুকু আসক্তি থাকলে হবে না। তাই ঠাকুর বলছেন, 'এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।' কলিযুগে মানুষ অন্নগত-প্রাণ, পৃথিবীর ভোগ্যবিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত। কাজেই মানুষকে কি করতে হবে? না, ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু ভক্তি-লাভ করবার জন্যও সাধন চাই। ভক্ত হওয়া মানে মুখে শুধু 'হরি' 'হরি', 'ভগবান' 'ভগবান' বলা নয়। তাঁর প্রতি আসক্তি জন্মাতে হবে। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি যে টান, সেই টান ভগবানে আনতে হবে। প্রহ্লাদ বলেছিলেন:

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

—'অবিবেকী লোকেদের বিষয়ের প্রতি যে অন্তহীন অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায়, তোমাকে স্মরণ করবার সময় তোমার প্রতি সেইরকম অনুরাগ

যেন আমার হৃদয় থেকে চলে না যায়।'

এরপর ঠাকুর মনের সাতটি ভূমির কথা বলছেন: 'যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের বাসস্থান। মনের তখন উর্ধ্ব-দৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে।' মন যখন এই তিনটি নিম্নস্তরে বিচরণ করে তখন মানুষ যেন নেশার ঘোরে কামকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে থাকে। এর উর্ধ্বে যে আর কিছু আছে, তা ভাববারও অবসর পায় না।

তারপরই ঠাকুর বলছেন: "মনের চতুর্থ ভূমি—হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হ'য়ে বলে, 'একি!' 'একি!' তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।" সেইজন্য হৃদয়ে অনাহত-চক্রে নিজের ইষ্টের ধ্যান করতে বলা হয়। কেননা, এটি হচ্ছে ইষ্টের লীলাভূমি। যে-মন নীচের তিনটি চক্রে বিচরণ করছে, তাকে তুলে হৃদয়ে আনতে বলেন গুরু। এটি ডঙ্কামারা জায়গা—ভগবানের বৈঠকখানা। সেইজন্য এখানে ধ্যান ঠিক ঠিক করতে পারলে ঐশ্বরিক জ্যোতির দর্শন হয়। ভক্ত সেই দিব্য জ্যোতিঃ দর্শনে বিহ্বল হয়ে যায়, তাতেই আকৃষ্ট হয়ে সেই আনন্দেই ডুবে থাকতে চায়। তাই আর বিষয়ের দিকে, সংসারের দিকে মন যেতে চায় না তার।

এবার ঠাকুর বলছেন: 'মনের পঞ্চম ভূমি—কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না, যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।' এই পঞ্চম ভূমিতে বিশুদ্ধচক্রে মন উঠলে অজ্ঞান অবিদ্যা দূর হয়ে সাধক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। তন্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে এই সব চক্রের কথা আছে। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নাপথে কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা—এই ষট্‌চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারে সপ্তমচক্রে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করতে পারলে পরম জ্ঞান লাভ করা যায়।

এরপর ঠাকুর বলছেন: "মনের ষষ্ঠ ভূমি—কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন ক'রে উন্মত্ত হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায় কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম ছুঁলাম; কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না। শিরোদেশ—সপ্তম ভূমি—সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয় কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা।"

এইভাবে সাধনা ক'রে মনকে নিম্নভূমি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে উচ্চতম স্তরে সপ্তমভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে অর্থাৎ সবিশেষ ব্রহ্মদর্শনের রাজ্য অতিক্রম ক'রে মনকে নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটি জ্ঞানপথের সাধনা। তখন 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।'—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হয়ে যান। এই নির্বিকল্পসমাধি-অবস্থা একুশ দিন অব্যাহত থাকলে সমাধিস্থ ব্যক্তির দেহত্যাগ হয়।

কিন্তু যাঁরা অবতারপুরুষ—যেমন, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা ঈশ্বরকোটি—যেমন, শংকরাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁরা জগৎকল্যাণেই আবির্ভূত ব'লে ঐ নির্বিকল্পসমাধি-অবস্থা থেকে ব্যুত্থিত হন। কিভাবে? সেকথাও ঠাকুর বলেছেন, এঁদের একটু 'অহং' থাকে লোকশিক্ষার জন্য, সেটুকু নিয়ে তাঁরা নির্বিকল্পসমাধি থেকে নেমে আসেন। যেমন শংকরাচার্যের 'বিদ্যার আমি' ছিল।

সেটি নিয়ে তিনি নেমে এসেছিলেন। ঠাকুর ছমাস একাদিক্রমে এই নির্বিকল্পভূমিতে ছিলেন; তখন তাঁর শরীররক্ষার জন্য একজন সাধু দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। তিনি বহু যত্ন ক'রে তাঁকে কোন-রকমে একটু একটু খাইয়ে তাঁর শরীরকে রক্ষা করেছিলেন। জগতের মানুষের কাছে নতুন ধর্ম প্রচার করবেন, ধর্মের অভ্যুত্থান ও অধর্মের পরাভব হবে, ধর্ম সম্পর্কে সকল সংশয় দূর করবেন, সর্বধর্ম-সমন্বয় করবেন, ত্যাগের মহিমা প্রচার করবেন—এইজন্যই তাঁর আবির্ভাব। তাই তিনি ঐ সমাধিস্থ অবস্থা থেকে নেমে এসেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—তাঁর 'আমি' বোধ থাকে কিনা। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, একটু থাকে।' সেটুকু লোককল্যাণচিকীর্ষার জন্য। সেটুকু নিয়েই তিনি নির্বিকল্পসমাধির পরেও নেমে এসেছিলেন জগৎকল্যাণের প্রেরণায়। ঠিক একই ভাবে স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা নির্বিকল্পসমাধির পরেও শরীর ছেড়ে দেননি।

গীতা—

কর্মযোগী কাজ করে কিন্তু সাধারণ লোকের মতো করে না। কারণ, কাজের প্রতি তার কোন আসক্তি থাকে না। নিজের মন-বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যাবে—এই উদ্দেশ্যেই সে কাজ করে। এইভাবে কাজ করলে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবান যেখানে যেখানে কর্মের কথা বলেছেন, সেখানে সেখানে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, কর্মটা কিন্তু আমাদের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি। অর্জুন কর্মযোগী। তাঁকে কাজ করতে হবে; তবে তিনি যদি সাধারণ লোকের মতো কাজ করেন, তাহলে সেটা বন্ধনের কারণ হবে। সেই বন্ধন থেকে অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য শ্রীভগবান কর্মের উপদেশ দিচ্ছেন না; কর্মযোগের উপদেশ দিচ্ছেন। আসক্তি ত্যাগ ক'রে কর্ম করতে বলছেন। আসক্তি ত্যাগ ক'রে কর্ম করলে, তবেই শান্তি পাওয়া যাবে—নৈষ্ঠিকী শান্তি, আত্যন্তিকী শান্তি, পরমা শান্তি। এ-কথা আগের দিন আমরা আলোচনা করেছি। (৫।১২)

এই অধ্যায়ের নাম 'সন্ন্যাসযোগ'। আর এখন যে-শ্লোকটি আমরা পড়বো, তারই মধ্যে অধ্যায়টির সারতত্ত্ব নিহিত আছে। শ্রীভগবান বলছেন: 'জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ ক'রে এই নবদ্বারযুক্ত দেহপুরে কিছু না ক'রে, কাউকে দিয়ে কিছু না করিয়ে সুখে থাকেন।' (৫।১৩) কর্মযোগ করলে পরে কালে এই অবস্থা হবে। আপনা হতেই সমস্ত কর্ম ত্যাগ হয়ে যাবে। এইটি হচ্ছে এই অধ্যায়ের সূত্র। এই নৈষ্কর্ম্যের অবস্থা আসবে স্বাভাবিকভাবে। এই বিষয়েই ঠাকুরের সেই বিখ্যাত উপমা: শাশুড়ী যেমন সন্তান-সম্ভবা বধূর কর্ম ধীরে ধীরে কমিয়ে সন্তানের জন্মের পর সব কর্ম একেবারে বন্ধ ক'রে দেন। এই হচ্ছে ভাব। কর্মের সন্ন্যাস এইভাবেই হবে। এইজন্যই এই অধ্যায়ের নাম 'সন্ন্যাসযোগ'।

তারপর শ্রীভগবান কর্মের উদ্ভবের কথা বলছেন। বলছেন: 'ঈশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব বা কর্ম সৃষ্টি করেন না। কর্মের সঙ্গে ফলের যে সংযোগ সেটাও তিনি রচনা করেন না। কিন্তু জীবের স্বভাবই সব কিছু করাচ্ছে।' (৫।১৪) শংকরাচার্য বলছেন, 'স্বভাব'-এর অর্থ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতি বা মায়া, যে দৈবী মায়ার কথা শ্রীভগবান পরে (৭।১৪ শ্লোকে) বলবেন। এরই অপর নাম অজ্ঞান। আসলে প্রতিটি জীব অজ্ঞান থেকেই জীবজগৎ—কর্তৃত্ব, কর্ম, কর্মফল সব কিছু সৃষ্টি করছে। জ্ঞান হ'লে এই অজ্ঞানের বা অবিদ্যার নাশ হয়। এখানেও আমাদের স্মরণ করতে হবে যে, শ্রীভগবান অর্জুনকে বারবার বলছেন, 'যুদ্ধ করো কর্মযোগ হিসাবে', কারণ অর্জুনের অবিদ্যা আছে; নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি হ'লে সেই অবিদ্যার নাশ

হবে ; তখনই এই জ্ঞান হবে যে, স্বরূপতঃ শ্রীভগবান কাউকে দিয়ে কর্ম করান না, কর্মের ফলও কাউকে দেন না।

তারপর বলছেন : 'বিভু অর্থাৎ পরমেশ্বর কারও পাপ গ্রহণ করেন না, কারও পুণ্যও গ্রহণ করেন না ; অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়ে রয়েছে, এইজন্যই জীব মোহগ্রস্ত হয়।' (৫।১৫) এই যে আমরা সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা সত্ত্বেও মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছি, এর কারণ হচ্ছে, আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে। এই অজ্ঞানকে বিদূরিত করতে হবে। তাহলেই আমাদের মোহ কেটে যাবে। সূর্য রয়েছে, তার সামনে এক খণ্ড মেঘ। সেই মেঘখণ্ড সূর্যের প্রকাশ হতে দিচ্ছে না। সেই মেঘখণ্ডটি অপসারিত হলেই সূর্য প্রকাশিত হবে।

শ্রীভগবান আরও বলছেন : 'যাদের সেই অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে গেছে তাদের জ্ঞান সূর্যের মত পরমজ্ঞান বা পরব্রহ্মকে প্রকাশিত করে।' (৫।১৬) সেই পরমজ্ঞান যখন প্রকাশিত হবে, তখন কি হবে? শ্রীভগবান বলছেন : 'যাদের বুদ্ধি পরব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁতে আত্মবুদ্ধি যাদের হয়েছে, তাঁতেই যাদের নিষ্ঠা, যারা ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্ম যাদের পরমা গতি, জ্ঞানের দ্বারা যাদের পাপ নিঃশেষে দূরীভূত হয়েছে, তারা আর নতুন দেহে ফিরে আসে না, অর্থাৎ তারা মোক্ষ লাভ করে।' (৫।১৭) এই যে আমাদের অজ্ঞান, সেটি দূর করতেই হবে। তাহলে আর কর্ম থাকবে না। কর্ম না থাকলে কর্মফলেও আর বাঁধা পড়তে হবে না—পাপপুণ্য কোনটাই থাকবে না, তার ফলে জন্মমরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে, মুক্তিলাভ হবে।

জ্ঞান হ'লে কেমন অবস্থা হয় সেটি অর্জুনকে বারবার শোনাচ্ছেন। বলছেন : 'যারা পণ্ডিত অর্থাৎ জ্ঞানী, তারা বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, কুকুর ও চণ্ডাল প্রভৃতি সকল জীবেই সমদর্শী।' (৫।১৮)

শ্রীভগবান আরও বলছেন : 'যাদের মন সাম্যে বা সমতায় স্থিত, তাদের দ্বারা ইহজীবনেই সংসার বিজিত হয়েছে। কেননা, ব্রহ্ম সর্বত্র এক এবং সর্বদোষের পার। যাদের এই জ্ঞান হয়েছে, তারা ব্রহ্মেই অবস্থিতি করে।' (৫।১৯)

এই সব শ্লোকে চরম অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। লক্ষ্যটাকে অর্জুনের সামনে রেখে দিচ্ছেন শ্রীভগবান। শ্রীভগবান আরও বলছেন : 'ব্রহ্মে স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে এবং প্রিয় বস্তু পেয়ে উল্লসিত বা অপ্রিয় বস্তু পেয়ে উদ্বিগ্ন হয় না।' (৫।২০)

'বাহ্য শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে যার অন্তঃকরণ আসক্তিশূন্য, আত্মাতেই যে-ব্যক্তি সুখ অনুভব করে, ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত সেই ব্যক্তি অক্ষয় সুখ-লাভ করে।' (৫।২১)

এইভাবে কয়েকটি শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জুনকে লক্ষ্যের কথা বললেন। এইবার তিনি সাধনার ইঙ্গিত দিয়ে বলছেন : 'হে কুন্তীপুত্র, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজনিত যে সুখভোগ, তা দুঃখেরই কারণ হয়ে থাকে। এই সব ভোগ আদি ও অন্তযুক্ত ; পণ্ডিত ব্যক্তি এগুলিতে প্রীতি-লাভ করে না।' (৫।২২) শুধু যারা মোহাবিষ্ট বিষয়ী মানুষ, তারাই বিষয়ভোগে আনন্দিত হয়—জানে না যে এগুলি দুঃখরূপী। যারা পশুপ্রকৃতির তারাই এইরকম অবিবেকী হয়

সাধনার ইঙ্গিত দিয়ে শ্রীভগবান আরও বলছেন : 'যে-ব্যক্তি আমরণ কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করতে পারে, সে-ই যোগী, সে-ই সুখী।' (৫।২৩) শ্রীভগবানের কথার মর্ম এই যে, সাধক-মাত্রেই উদ্ভবমুহূর্তেই কাম ও ক্রোধকে প্রতিরোধ করবেন। আমরণ এইরকম প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। কাম ও ক্রোধ যে সাধকের মহাশত্রু একথা শ্রীভগবান আগেও বলেছেন (৩।৩৭), পরেও বলবেন (১৬।২১)।

বিবিধ সংবাদ

ভিত্তিস্থাপন

বিধান নগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিগত ৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে (১৯৮০), শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রের সল্ট লেকের জমিতে ৩০শে এপ্রিল কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ প্রমুখ প্রবীণ সন্ন্যাসিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীগণেন্দ্রনাথ রায় কেন্দ্রের সামান্য সূচনা হইতে উত্তরোত্তর বিকাশের কথা বলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে উপস্থিত সহস্রাধিক জনমণ্ডলীকে উদ্বোধিত করিয়া বলেন যে, শুধু মন্দির নির্মাণ করিলে বা ধর্মকথা আলোচনা করিলেই হইবে না—ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আদর্শ জীবনে রূপায়িত করা চাই। জনগণের সেবা, বিশেষ করিয়া সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর সেবাই প্রকৃত কাজ।

৩০শে এপ্রিল বিকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা ও অধ্যাপিকা চামেলী বসু। সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজিকা অমলাপ্রাণা। সন্ধ্যায় 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

১লা মে পূজা ও হোমের শেষে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ও ভাষণ দেন স্বামী মহানন্দ। পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলা' পরিবেশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচনা-চক্রে বিগত ৬ই, ৭ই ও ৮ই বৈশাখ (১৩৮৭) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৬ই মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ ইত্যাদি হয়। মধ্যাহ্নে তিনশতাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বাগীশানন্দ, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, স্বামী স্বয়ংসিদ্ধানন্দ এবং শ্রীঅমরেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ৭ই বৈকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী বাগীশানন্দ, শ্রীশঙ্করলাল গুপ্ত, স্বামী স্বয়ংসিদ্ধানন্দ এবং স্বামী অমৃতত্বানন্দ। সভাশেষে হাওড়া-শিবপুরের 'প্রফুল্ল তীর্থ' কর্তৃক 'মাতৃসাধক রামপ্রসাদ' গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই মধ্যাহ্নে প্রায় দেড়সহস্রাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও শিশুদের বসে-আঁকা প্রতিযোগিতায় সফলকাম প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীশঙ্করলাল গুপ্ত। 'প্রফুল্ল তীর্থ' কর্তৃক 'বিদ্রোহী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শোভা মজুমদার, প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা করুণাপ্রাণা ভাষণ দেন। আলোচনা-চক্রের সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

বড়িশা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সংঘ কর্তৃক সংঘের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে বিগত ২৩শে এপ্রিল (১৯৮০), শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। স্বামী সর্বানন্দ পূজা করেন। বেলুড় মঠের কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর

শুভাগমন হয়। সাধু ও ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী দেবানন্দ ও স্বামী সর্বানন্দ।

নিরঞ্জনানন্দ-জন্মজয়ন্তী

রাজারহাট-বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদ ঈশ্বরকোটি শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী তীর্থ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, নারায়ণসেবা, কথাকীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী শিবময়ানন্দ ও প্রধান অতিথি স্বামী শিবপ্রাণানন্দ। সভান্তে রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

পরলোকে

শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী সারদানন্দের মন্ত্রশিষ্যা মুকুলমালা পালিত ১০ই জানুআরি ১৯৮১, বিকাল ৬টার সময় কলিকাতাস্থিত তাঁহার পিতৃগৃহে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি বেথুন কলেজ হইতে ১৯৩৬ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন এবং পরে শান্তিপুরে পরীক্ষা দিয়া 'সাহিত্যভারতী' উপাধি প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি শান্তস্বভাবা ও পরদুঃখকাতরা ছিলেন। এগার বৎসর বয়সে স্বামী সারদানন্দজীর কৃপা লাভ করেন। তাঁহার সেবা ও মধুর ব্যবহারে সকলে তৃপ্ত হইতেন। এণ্টালি মণিমেলার সকল শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের 'কাকীমা' হইয়া মুকুলমালা তাঁহার নিঃসন্তান জীবন পরমানন্দে অতিবাহিত করেন। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে তিনি দশ বৎসর ভাগবত ও উপনিষদাদি পাঠে যোগদান করিবার সুযোগ পান। সততা, সত্যনিষ্ঠা, উদারতা, মধুর ব্যবহার ও সরলজীবনের জন্য পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন।

প্রসঙ্গতঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ও বাংলা গীতাঞ্জলির স্বরূপ' পুস্তিকাটির পৃঃ ১২-তে তথ্য-তালিকার যে-অংশ আছে, তাহাতে ক্রমিক সংখ্যা 95-এর পর ইংরেজী গীতাঞ্জলির 'first words' হিসাবে 'I was not aware of the moment' লেখা আছে। 'Index of first words' কলমের অন্তর্গত পরবর্তী 'first words' হিসাবে লেখা আছে 'Even so, in death the same unknown', কিন্তু ইহার ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া নাই। 'উদ্বোধনে'র অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ সংখ্যায় পুস্তিকাটির সমালোচনা প্রকাশিত হইলে লেখক জানান যে, '95'-সংখ্যক কবিতাটির দুইটি ভাগ আছে এবং উল্লিখিত 'first words' দুইটি ঐ দুইটি ভাগের। এই তথ্যটি পুস্তিকাটির পৃঃ ১২-তে পাদটীকা হিসাবে দেওয়া না থাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, সমালোচনায় (পৃঃ ৬৩, কলম ২, পঙ্‌ক্তি ৭-১৫) বন্ধনীর মধ্যে যে-মন্তব্যটি আছে, তাহা বাদ যাইবে। উল্লেখ্য যে, এই বন্ধনীমধ্যস্থ মন্তব্য সমালোচকের নহে, আমাদেরই সম্পাদকীয় বিভাগের।

—সংযুক্ত সম্পাদক

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই: ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮·০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, মূল্য ২২·৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫·২৫; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭·৮০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ মূল্য ৮·২৫; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯·৫০; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। পৃঃ ৬৪০, মূল্য ২৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩·৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬·০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৮, মূল্য ১·২০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৫০, মূল্য ৫·২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২·২০. বাঁধাই ২·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯·০০

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী—স্বামী অচ্যুতানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ৬১, মূল্য ১.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪·২৫

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭·৫০ ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১০·০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬·০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬১২, মূল্য ১৭·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১৬·০০; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬·০০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১০৬, মূল্য ২·৫০

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। দ্বিতীয় সং. পৃঃ ৫৮, মূল্য ২·৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ: স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩০৬, মূল্য ৮·০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১·২৫

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রৎ প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত

ফাল্গুন ১৩৮৭
৮৩তম বর্ষ
২য় সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮৩তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৫৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৩৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে, তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনাঃ- ধর্ম দর্শন ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার** সময় তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা, বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শপূত যোগোদ্যান মঠটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট পবিত্রতম তীর্থস্থানগুলির অন্যতম। এখানে শ্রীশ্রীমা শুভাগমন করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভজন-সঙ্গীতাদি দ্বারা ভক্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন এবং স্থানটি শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের অনেকের পুণ্যসাধনক্ষেত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহের অবসানের পর তাঁর পবিত্র অস্থির একভাগ প্রথমে এখানেই স্থায়ীভাবে সমাহিত হয়। যোগোদ্যানের বর্তমান নাটমন্দিরটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত হওয়ায় উৎসবাদিতে এবং সাপ্তাহিক ধর্মসভায় স্থান সঙ্কুলান হয় না। এজন্য নাটমন্দিরটি আরও প্রশস্ত করে নির্মিত হবে স্থির হয়েছে এবং নির্মাণকার্যের আনুমানিক ব্যয় ১,৭০,০০০ টাকা। এই সৎকার্যে সর্বপ্রকার দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। বলা বাহুল্য, সরকারী নিয়মানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে প্রদত্ত দান আয়করমুক্ত।

একাউন্ট পেয়ী চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Yogodyan Math' —এই নামে হবে।

নিবেদক

স্বামী ভূতেশানন্দ

অধ্যক্ষ

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ

৭ যোগোদ্যান লেন

কলিকাতা-৭০০০৫৪

১ ফাল্গুন, ১৩৮৭

৮৩তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

জোর ক'রে তিনি সব করাচ্ছেন ব'লে অসৎ কাজ করলে সর্বনাশ হয়। ঐ থেকেই ভাবের ঘরে চুরি আরম্ভ হয়। ভাল কাজ কবলে কেমন একটা elation (উল্লাস) হয়। বুক ফুলে ওঠে। বেশ কবেছি ব'লে আপনাকে বাহবা দিবি। এটা তো আর এড়াবার জো নেই, দিতেই হবে। ভাল কাজটাব বেলা আমি, আর মন্দ কাজটার সময় তিনি—ওটা গীতা-বেদান্তের বদহজম, বড় সর্বনেশে কথা, অমন কথা বলিসনি। বরং তিনি ভালটা করাচ্ছেন আর আমি মন্দটা করছি—বল্। তাতে ভক্তি আসবে, বিশ্বাস আসবে। তাঁর কৃপা হাতে হাতে দেখতে পাবি। আসল কথা, কেউ তোকে সৃষ্টি কবেনি, তুই আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেছিস কিনা। বিচার এই, বেদান্ত এই। তবে সেটা উপলব্ধি নইলে বোঝা যায় না। সেইজন্য প্রথমটা সাধককে দ্বৈতভাবটা ধবে নিযে চলতে হয়; তিনি ভালটা করান, আমি মন্দটা করি—এটিই হ'ল চিত্তশুদ্ধিব সহজ উপায়। তাই বৈষ্ণবদেব ভেতর দ্বৈতভাব এত প্রবল। অদ্বৈতভাব গোড়ায় আনা বড় শক্ত। কিন্তু ঐ দ্বৈতভাব থেকে পরে অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি হয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৯।৪১৬-১৭]

কথাপ্রসঙ্গে

কর্তা ও কারয়িতা

অধিকারিভেদে সাধকগণ যে-চারিটি ভাব অবলম্বন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হন, সেগুলি হইতেছে : (১) আমি কর্তা, (২) ঈশ্বরই কর্তা ও কারয়িতা, (৩) সব ব্রহ্মাত্মক এবং (৪) 'সব' বলিয়া কিছু নাই—এক ব্রহ্মই আছেন। এই চারিটি ভাবের কোনটিই মিথ্যা বা ভ্রান্ত নহে, অবস্থাবিশেষে প্রত্যেকটিরই প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে বলা যায়, ভাবগুলি উত্তরোত্তর অধিকতর সত্য। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 'ঈশ্বরই কর্তা ও কারয়িতা'—এই দ্বিতীয় ভাবটি লইয়া মুখ্যতঃ আলোচনা করিব।

প্রথম কথা হইতেছে এই যে, আমি যদি কর্তা না হই, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের কোনও অর্থ হয় না। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন : 'সত্যং বদ। ধর্মং চর।' (সত্য বলো, ধর্মাচরণ করো।) বিধিমুখে যেমন বলিতেছেন, তেমনই নিষেধমুখেও বলিতেছেন : 'সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্।' (সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না, ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না।)

গীতায় সাধকগণের প্রতিনিধিস্থানীয় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বিধিমুখে বলিতেছেন : 'যুদ্ধায় যুজ্যস্ব' (যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও); 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব' (নিষ্কাম হও); 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা' (আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্মসমূহ করো); 'নিয়তং কুরু কর্ম' (শাস্ত্রবিহিত কর্ম করো); 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ' (শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ করো); 'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্' (হে বীর, কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ করো); 'মামেকং শরণং ব্রজ' (একমাত্র আমারই শরণাগত হও)। আবার নিষেধমুখেও বলিতেছেন : 'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ' (উহাদের [রাগদ্বেষের] বশীভূত হইও না); 'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি' (অকর্মে তোমার প্রবৃত্তি না হউক); 'ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন / ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি' (ইহা [এই গীতাশাস্ত্র] তুমি অতপস্বীকে, অভক্তকে, যে শুনিতে চাহে না তাহাকে এবং যে আমার নিন্দা করে তাহাকেও কখনও বলিবে না) ইত্যাদি।

কেবলমাত্র গীতা বা উপনিষদে নহে, আমাদের সমস্ত শাস্ত্রেই অজস্র বিধি-নিষেধের কথা রহিয়াছে। মানুষ যদি কর্তা না হয়—যদি 'রোবট' বা যন্ত্রমানব হয়, তাহা হইলে এই সকল বিধি-নিষেধের কোনও সার্থকতা থাকে না। বেদান্তদর্শনের 'কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' (২।৩।৩৩) সূত্রে[১] মহর্ষি বাদরায়ণ এই কথাই বলিয়াছেন।

সুতরাং সাধনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিমাত্রেরই এই প্রত্যয় থাকা উচিত যে, তাঁহার কর্তৃত্বশক্তি আছেই—করা বা না-করা তাঁহার ইচ্ছাধীন; তিনি যদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম করেন, তাহা হইলে তাঁহার কল্যাণ, যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম করেন, তাহা হইলে তাঁহার অকল্যাণ। জগতে যাঁহারাই মহান কর্মবীর হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কর্তৃত্বশক্তিতে সুদৃঢ় আস্থা ছিল। 'আমার কোন ক্ষমতাই নাই, ঈশ্বর যেমন করিতেছেন তেমনই হইতেছে'—এইরূপ যাহার মনোভাব তাহার দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না।

কিন্তু 'ঈশ্বর যেমন করিতেছেন তেমনই

---

১ যে-শ্রুতিবাক্যের উপর বাদরায়ণের এই সূত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই : 'এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।' (ইনিই দর্শনকর্তা, স্পর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা, ঘ্রাণকর্তা, আস্বাদনকর্তা, মননকর্তা, নিশ্চয়কর্তা, কর্তা, বিজ্ঞাতৃস্বভাব পুরুষ।)—প্রশ্নোপনিষদ্, ৪।৯

হইতেছে'—কথাটি মিথ্যা নহে। অতীব সত্য। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' আমরা অসংখ্যবার পাই যে, জীব কর্তা নহে, ঈশ্বরই কর্তা। কয়েকটি সুপরিচিত উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে: "অজ্ঞানে বোধ হয় আমি কর্তা। ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না, এ বোধ হলে তো, সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্তা', 'আমি কর্তা' এই বোধ থেকেই যত দুঃখ অশান্তি।" (১।২।৮); 'তিনিই একমাত্র কর্তা আর আমি অকর্তা, এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত' (১।১৭।৪); 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; এইটির নাম জ্ঞান।' (১।১০।৭); "'আমি করছি', এটি অজ্ঞান থেকে হয়; হে ঈশ্বর, তুমি করছ—এইটি জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা।" (১।১০।৫); "বেদান্তের একটি উপমা আছে।—একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু, বেগুন সব ভাতে দিয়েছ; খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে 'আমি নড়ছি', 'আমি লাফাচ্ছি।' ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে, আলু, বেগুন, পটল ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্ছে। যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে লাফাচ্ছে না। হাঁড়ির নিচে আগুন জলছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়, তা হ'লে আর নড়ে না। জীবের 'আমি কর্তা' এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান। জলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ।—পুতুলনাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়ে না চড়ে না!" (১।১৭।৪); "আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' তাঁরই জয়; আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র!" (১।১৭।৪)

তাহা হইলে কী দাঁড়াইল! বাদরায়ণ বলিতেছেন, জীব কর্তা, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, জীব অকর্তা। এই উভয় উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য এইখানে যে, বাদরায়ণ কেবলমাত্র 'কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' সূত্রটি রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 'পরাৎ তু তৎ শ্রুতেঃ' (২।৩।৪১) বলিয়া আরেকটি সূত্রও রচনা করিয়াছেন এবং সেই সূত্রটির তাৎপর্য: জীব স্বতন্ত্র কর্তা নহে; 'পরাৎ' অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতেই জীবের কর্তৃত্ব, কারণ শ্রুতিতে এইরূপই বলা হইয়াছে। জীব প্রযোজ্য কর্তা, ঈশ্বর হেতুকর্তা, প্রযোজক কর্তা। অর্থাৎ ঈশ্বর কারয়িতা। বাদরায়ণ 'শ্রুতেঃ' বলিয়া যে-শ্রুতির ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা হইল: (১) 'এষঃ হি এব সাধু কর্ম কারয়তি তং, যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে। এষঃ হি এব অসাধু কর্ম কারয়তি তং, যম্ অধঃ নিনীষতে' (কৌষীতকী উপনিষদ্, ৩।৮)। অর্থাৎ, ইনিই (পরমেশ্বরই) তাঁহাকে সাধু কর্ম করান, যাঁহাকে এই লোকসকল হইতে উর্ধ্বলোকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন। ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম করান, যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন।[২] (২) 'যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্,

২ তুলনীয়: 'যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি / তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥' (দেবীসূক্ত: ঋগ্বেদ, ১০।১২৫।৫)—আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি কাহাকেও ব্রহ্মা করি, কাহাকেও ঋষি করি এবং কাহাকেও বা অতিশয় মেধাবী করি।
এই সকল উক্তি হইতে প্রশ্ন উঠিতে পারে: 'তবে কি ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ আছে?—

মাধ্যন্দিনী শাখা, ৩৭।১০)। অর্থাৎ, যিনি (ঈশ্বর) আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়া অভ্যন্তরবর্তী হইয়া আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং তোমার আত্মা (উদ্দালকের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি)।

গীতাতেও আমরা পাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন ঃ

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

(১৮।৬১)

—হে অর্জুন, সকল প্রাণীকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়ার দ্বারা চালিত করিয়া ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।

ঐ অধ্যায়েই যে-কোন কর্মের সিদ্ধির পাঁচটি কারণের উল্লেখ শ্রীভগবান করিয়াছেন :

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥

(১৮।১৪)

—(১) দেহ, (২) দেহী জীব, (৩) বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, (৪) প্রাণাদি বায়ুর বিবিধ ব্যাপার এবং (৫) দৈব অর্থাৎ পরমাত্মা পঞ্চম [কারণ]।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আচার্য রামানুজ লিখিয়াছেন : 'অত্র কর্মহেতুকলাপে দৈবং পঞ্চমং পরমাত্মা অন্তর্যামী কর্মনিষ্পত্তৌ প্রধানহেতুঃ ইতি অর্থঃ।' অর্থাৎ, মূল শ্লোকস্থ 'অত্র' শব্দের অর্থ কর্মের [সিদ্ধির] কারণসমূহে ; এই কারণসমূহের মধ্যে পঞ্চম কারণ অন্তর্যামী পরমাত্মাই কর্মনিষ্পত্তির প্রধান কারণ।

আর একাদশ অধ্যায়ের সেই অতি প্রসিদ্ধ কথা : 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব / নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥' (১১।৩৩)—হে সব্যসাচী, ইহারা (তোমার শত্রুরা) আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হইয়াছে। তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব সম্বন্ধে যে-কথা আমরা উপনিষদে ও গীতায় পাইলাম, পুরাণগুলিতেও তাহাই পাই। বিষ্ণুপুরাণে দেখি, পুত্র প্রহ্লাদ গুরুগৃহে কী শিক্ষালাভ করিয়াছেন, পিতা হিরণ্যকশিপু এই প্রশ্ন করিলে প্রহ্লাদ যখন কেবলই শ্রীহরির কথা বলিতে লাগিলেন, তখন ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু বলিলেন ঃ

প্রবিষ্টঃ কোঽস্য হৃদয়ে দুর্বুদ্ধেরতিপাপকৃৎ।
যেনেদৃশান্যসাধূনি বদত্যাবিষ্টমানসঃ॥

(১।১৭।২৫)

—কোন্ অতি পাপকারী এই দুর্বুদ্ধির (প্রহ্লাদের) হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যাহার দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হইয়া [প্রহ্লাদ] ঈদৃশ অসাধু কথাসকল বলিতেছে ?

পিতার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন ঃ

ন কেবলং মদ্‌হৃদয়ং স বিষ্ণু-
রাক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ সমস্তান্
সমস্তচেষ্টাসু যুনক্তি সর্বগঃ॥ (১।১৭।২৬)

—হে পিতঃ! কেবল আমারই হৃদয়ে নহে, সেই বিষ্ণু সমস্ত লোক ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। সর্বব্যাপী তিনি আমাকে, আপনাকে এবং অন্যান্য সকলকেই সমস্ত কর্মে নিযুক্ত করিতেছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখি, যমুনাতীরে মধুবনে বালক ধ্রুব যখন কঠোর তপস্যায় নিরত, তখন শ্রীভগবান তাঁহাকে দর্শন দিলেন। অভিভূত-হৃদয় ধ্রুবের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। অন্তর্যামী শ্রীভগবান

তিনি কি খামখেয়ালী, স্বৈরাচারী, নিষ্ঠুর ? এই আশঙ্কার উত্তরে মহর্ষি বাদরায়ণ আরেকটি সূত্র রচনা করিয়াছেন ঃ 'কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ' (২।৩।৪২)। ইহার তাৎপর্য ঃ 'জীবের প্রযত্ন অর্থাৎ জীব যে-ধর্মাধর্ম সঞ্চয় করে, ঈশ্বর তদনুসারে তাহাকে কার্যে প্রবৃত্ত করান।' (কালীবর বেদান্তবাগীশ)। সুতরাং ঈশ্বরে পূর্বোক্ত দোষগুলি আরোপ করা যায় না।

বুঝিলেন, ধ্রুব তাঁহাকে স্তব করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অপারগ। তখন তিনি বেদময় শঙ্খের দ্বারা ধ্রুবের কপোলদেশ স্পর্শ করিলে ধ্রুব স্তব করিলেন :

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥
(৪।৯।৬)

—অখিলশক্তিধর যিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বকীয় তেজের দ্বারা প্রসুপ্ত আমার এই বাণীকে এবং হস্ত, চরণ, শ্রবণ, ত্বক্ প্রভৃতি [কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে] ও প্রাণাদি বায়ুকেও সঞ্জীবিত করিতেছেন, সেই [পরম] পুরুষ ভগবান আপনাকে নমস্কার।

ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্রসহায়ে কিছু আলোচনা করিলাম। কিন্তু ঈশ্বর শুধু কারয়িতা নহেন, কর্তাও। মহর্ষি বাদরায়ণের বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র : 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। ইহার অর্থ : ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা। যে-শ্রুতিবাক্যের ভিত্তিতে মহর্ষির এই সূত্র রচিত, তাহা হইল : 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি, অভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম ইতি।' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১)—যাঁহা হইতে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালে যাঁহাতে গমন করে ও যাঁহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম। (পুত্র ভৃগুর প্রতি পিতা বরুণের উক্তি)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ন্যায় অন্যান্য উপনিষদেও ঈশ্বরই যে কর্তা—একথা বলা হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিতেছেন :

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥
(৩।১।৩)

—দ্রষ্টা (সাধক) যখন জ্যোতির্ময়, জগৎকারণ, কর্তা পুরুষকে দর্শন করেন, তখন পাপপুণ্যবিমুক্ত হইয়া সেই নিরঞ্জন বিদ্বান্ [ব্রহ্মের সহিত] পরম সাম্য প্রাপ্ত হন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও নানাভাবে ঈশ্বরকে কর্তা বলা হইয়াছে। যথা, 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা' (৪।১৭), 'কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ' (৬।১১), 'স বিশ্বকৃৎ' (৬।১৬) ইত্যাদি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী গার্গীকে বলিতেছেন : 'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ' (৩।৮।৯) ইত্যাদি।

—হে গার্গি, এই অক্ষর পুরুষেরই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া বর্তমান আছে, দ্যুলোক ও পৃথিবীও এই অক্ষর পুরুষেরই প্রশাসনে বিধৃত হইয়া বর্তমান আছে, ইত্যাদি। এখানে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরই কর্তা, তাঁহারই প্রশাসনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছু ঠিক ঠিক চলিতেছে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন : 'তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।' (৯।১৯)—আমিই উত্তাপ বিকিরণ করি, আমিই জল আকর্ষণ করি এবং বর্ষণ করি

আমরা দেখি, প্রকৃতিতেই এই সব ঘটিতেছে। কিন্তু ঠিক ভক্ত দেখেন, ঈশ্বরই কর্তা; তিনিই প্রকৃতির যাবতীয় কার্য নিষ্পন্ন করিতেছেন। আমরা ভাবি, আমরাই আহার্যবস্তু পরিপাক করিতেছি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

(১৫।১৪)

—আমি জঠরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহে অবস্থিত হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চারি প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিতেছেন: আমি আমার ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশপূর্বক চরাচর ভূতসকলকে ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ওষধিসমূহ পুষ্ট করি। (১৫।১৩)

সুতরাং ঈশ্বর যে কর্তা ও কারয়িতা—ইহা আমরা শাস্ত্রপ্রমাণে জানিলাম। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। কারণ, ঈশ্বর সর্বপ্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং জীব নিয়ন্ত্রিত—এই বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি থাকেই। ইহার পরবর্তী ধাপে সাধকের এই বোধ আসে যে, সমুদয় জগৎ ব্রহ্মাত্মক। সুতরাং কেই-বা নিয়ন্ত্রণকর্তা আর কেই-বা নিয়ন্ত্রিত! উভয়েই এক! বিভিন্ন বেশে অভিনয়কারী একই নটের ন্যায় এক ঈশ্বরই বহুরূপে লীলা করিতেছেন। সর্বত্র তাঁহারই লীলা চলিতেছে। তাই 'কথামৃতে' আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন: 'কি দেখছি জান? তিনিই সব হয়েছেন। মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তৈরী—তার ভেতর থেকে তিনিই হাত, পা, মাথা নাড়ছেন! যেমন একবার দেখেছিলাম—মোমের বাড়ী, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু সব মোমের—সব এক জিনিসে তৈরী। দেখছি—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাঠ হয়েছে।' (৩।২৪।২)

কিন্তু এই অতি উচ্চ ভাবেও কিছুটা বহুত্বের ধারণা থাকে—স্বগতভেদ থাকিয়াই যায়। ইহার পরবর্তী অবস্থা বাক্যমনের অতীত। পরমার্থতঃ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়—কর্তাও নহেন, কারয়িতাও নহেন। ('নাস্তি আত্মনঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ'—গীতা, ৫।১৩, শাংকরভাষ্য)। নির্গুণ ব্রহ্ম ক্রিয়া-কারক-ফলভেদশূন্য, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ-শূন্য। একমাত্র তিনিই আছেন। কিন্তু এইরূপ বলাতেও ত্রুটি থাকে। কারণ, ব্রহ্মের যত লক্ষণই আমরা নির্দেশ করি না কেন, কোনও লক্ষণের দ্বারাই তাঁহাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ নিষেধমুখে বলিতেছেন: 'অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি, নহি এতস্মাদ্ ইতি নেতি অন্যৎ পরম্ অস্তি।' (২।৩।৬)—অতঃপর 'নেতি নেতি' ইহাই [ব্রহ্মের] নির্দেশ; কারণ, 'নেতি' এই বাক্য (ন ইতি) হইতে ভিন্ন বা শ্রেষ্ঠ অপর কোনও নির্দেশ ব্রহ্মের নাই।

'কথামৃতে' এই 'নেতি নেতি'র কথাও বহুবার পাওয়া যায়।[৩] তথাপি মনে হয়, 'ঈশ্বরই কর্তা ও কারয়িতা'—এই ভাবটিরই প্রাধান্য বেশী। 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এই কথাগুলি 'কথামৃতে' কমপক্ষে বিশবার আছে। কথাগুলি অবশ্য অতি পুরাতন। পাণ্ডবগীতায় আছে:

যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে॥

—হে মধুসূদন, যন্ত্রের দোষগুণ ক্ষমা করো; আমি যন্ত্র, আপনি যন্ত্রী, আমার দোষ নাই।

---

৩ কয়েকটি উদ্ধৃতি: "তিনি যে কি, মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। 'নেতি' 'নেতি' ক'রে যা বাকী থাকে আর যেখানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম।" (৩।৫।১); "'নেতি' 'নেতি' ক'রে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। 'নেতি' 'নেতি' বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়।" (২।১৩।১); "'নেতি' 'নেতি'। আত্মা ধরবার ছোঁবার যো নাই। তিনি নির্গুণ—নিরুপাধি।" (৪।১।৫)

আর 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'—যে-গানটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই গাহিতেন, তাহারও শেষ দুইটি পঙ্‌ক্তি হইল :

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।

আবার 'ঈশ্বরই কর্তা ও কারয়িতা'—ইহাও পুরাতন কথা। শংকরাচার্যের নামে প্রচলিত 'অপরাধভঞ্জনস্তোত্রে' আছে :

'ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী।'

সুতরাং এই সকল কথা নিঃসন্দেহে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক উচ্চারিত হওয়ায় উহারা নবপ্রাণরসে সঞ্জীবিত হইয়াছে। এইজন্যই তাঁহার উক্তিগুলি আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে এবং নূতন জীবনের সন্ধান দেয়।

'ঈশ্বরই কর্তা ও কারয়িতা' অথবা 'জগদম্বাই কর্ত্রী ও কারয়িত্রী' (উভয়ই একই কথা)—এই ভাবটি যে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের একটি অতি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা নিজেরাও প্রত্যেকেই এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ আরও উচ্চতর ভাবে উন্নীত হইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের অনেক উক্তি প্রমাণহিসাবে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহা করা হইল না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের নিকট বিষয়টি নূতন নহে।

আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যাবির্ভাবতিথি-স্মরণে রচিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 'ঈশ্বরই কর্তা ও কারয়িতা'—এই কথাটি অনধিকারীর হাতে পড়িয়া 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হইয়া দাঁড়ায়। দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন :

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

(পাণ্ডবগীতা)

—ধর্ম কি তাহা আমি জানি, কিন্তু ধর্মে আমার প্রবৃত্তি নাই; অধর্ম কি তাহাও আমি জানি, কিন্তু অধর্ম হইতে আমি নিবৃত্ত হই না। হে হৃষীকেশ, আপনি আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া যেভাবে আমাকে নিযুক্ত করিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

বলা বাহুল্য, দুর্যোধনের এই উক্তি আত্ম-প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন / যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি', একথা কে বলিতে পারে?—যাহার জীবনে ধর্মাচরণ স্বতঃস্ফূর্ত, যাহার দ্বারা কোন অবস্থাতেই কোনও অধর্মাচরণ সম্ভব নহে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই। 'ধর্ম জানি, অথচ করি না; অধর্ম জানি, অথচ নিবৃত্ত হই না'—একথা যে বলে, তাহার মুখে 'ভগবান যেমন করাইতেছেন, তেমনি করিতেছি'—একথা সাজে না। স্বামী বিরজানন্দজী তাঁহার 'পরমার্থপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "আমি অবশ হয়ে সব করছি, আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, একথা তার পক্ষেই সাজে, যে ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে এক করতে পেরেছে। সে এক পরম ভক্তেই পারে, যে পরমেশ্বর ছাড়া আর কিছুই জানে না। তার পা কখনও বেতালে পড়ে না, তার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হয় না। তার হৃদয় অদম্য শক্তি ও অনুপ্রেরণায় ভরা থাকে, তাতে নৈরাশ্যভাব আসে না, সে সুখে-দুঃখে বিচলিত হয় না। তার 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' ভাব সর্বদা থাকে। তার কাছে লাভালাভ, জয়-পরাজয়, মান-অপমান সব সমান হয়ে যায়।"

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

স্বামী ভূতেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমাকে আমরা দেখি সঙ্ঘজননীরূপে। এই বিশাল রামকৃষ্ণ সংঘের তিনি স্রষ্টী, পালয়িত্রী। ঠাকুর তাঁর কয়েকটি সন্তানকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন, তাঁদের স্নেহ দিয়েছেন নিশ্চয়ই, যার দ্বারা তাঁরা একত্রীভূত হয়েছেন এবং তাঁদের জীবনকে আদর্শান্বিত করেছেন। কিন্তু তারপর তাঁরা পরিব্রাজক হয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের কোন মঠ প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প দৃঢ় হচ্ছে না, দূর-দূরান্তরে যে যেখানে পারছেন চলে যাচ্ছেন, পথে অনশনে অর্ধাশনে তাঁদের দিন কাটছে—কত বিপদেরও সম্মুখীন হচ্ছেন।

অন্তর্যামিণী মা সব লক্ষ্য করেছেন। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন, 'ঠাকুর, তোমার সন্তানরা এইভাবে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে বেড়াবে, এইজন্যই কি তোমার আসা? তুমি এসেছ, তোমার সন্তানরা তোমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমার আদর্শ যাতে জগতে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে তার জন্য একটি সঙ্ঘ গড়ে তুলবে, দৃঢ় ভিত্তির উপর সেই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হবে।' কিন্তু তিনি তো মা, তাই বলছেন এরা খাবে কি? পরবে কি? 'হে ঠাকুর, এদের যেন মোটা ভাত-কাপড়ের কখনো অভাব না হয়। তা না হলে তোমার আসা, তোমার সঙ্গে এদের আসা সব বৃথা হয়ে যাবে।' বস্তুতঃ ঠাকুরের এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার যে সঙ্কল্প ছিল, মা তাঁর প্রার্থনার ভিতর দিয়ে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। এজন্য আমরা তাঁকে সঙ্ঘজননী বলি। ঠাকুরের কাছে যে-স্নেহ তাঁর সন্তানরা পেয়ে পরস্পরের নৈকট্য-বোধ করেছেন, মায়ের কাছ থেকেও তা সমভাবে পেয়েছেন অথবা বলা যায়—বেশীই পেয়েছেন এবং তাঁদের অন্নবস্ত্রের যাতে অভাব না হয় মায়ের মতই তিনি তাই কামনা করেছেন।

তারও পরে সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণও তিনি হাতে নিচ্ছেন, অদ্ভুতভাবে। যখন সঙ্ঘে কোন একটি বিশেষ কিছু নিয়মকানুন হচ্ছে, যা তাঁর মনে হচ্ছে কল্যাণকর হবে না, তিনি বলছেন, এটা কোরো না। এমন কি স্বামীজীকে পর্যন্ত নিরস্ত করেছেন। এবং সকলেই মায়ের বিধান নির্বিবাদে মাথা পেতে নিচ্ছেন। বেলুড় মঠে স্বামীজী দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। তাঁর ইচ্ছা স্মৃতির বিধান অনুসারে পূজায় বলিদান হয়। মা কিন্তু সে-কথা শুনে বললেন, না বাবা, মঠে বলি হবে না। স্বামীজী আর প্রশ্ন করলেন না—মা বলেছেন শেষ কথা।

আর একটি ঘটনা। একবার এক ব্রহ্মচারীর কিছু ত্রুটির জন্য সমবয়সীরা তাকে ভয় দেখালেন যে, শিবানন্দ মহারাজ তাকে মঠ থেকে চলে যেতে বলবেন। ভীত ব্রহ্মচারীটি মায়ের কাছে চলে গেল জয়রামবাটীতে। মা তাকে আশ্বাস দিয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে শিবানন্দ স্বামীকে লিখলেন, বাবা, ছেলেটিকে আবার মঠে থাকতে দিও। দোষ করেছে, আর করবে না। শিবানন্দ স্বামী মায়ের চিঠি পেয়ে ব্রহ্মচারীটিকে মঠে পাঠিয়ে দিতে যাকে চিঠি দেন। ব্রহ্মচারী মঠে ফিরে এলে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি!'

দু-একটি ঘটনা বললাম দৃষ্টান্ত হিসাবে। অথচ মা সাক্ষাৎভাবে এই সঙ্ঘের পরিচালনার কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করতেন না। সন্তানরা তাদের

নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে সঙ্ঘ চালাতেন। মা হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু কোন্‌খানে কি দরকার ঠিক জানতেন এবং কোথাও ত্রুটি থাকলে সেই ত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। বুঝতে দিতেন না যে, তিনিই সঙ্ঘের কাজ নিজে নিয়ন্ত্রিত করছেন—এমন ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বাণী যেভাবেই আসুক না কেন, সেটি সঙ্ঘের সকলেরই শিরোধার্য। কাজেই তিনি সঙ্ঘ-নিয়ন্ত্রী—সঙ্ঘজননী। তিনি সন্তানদের শুধু ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখছেন মায়ের মতো তা নয়, তাদের পারত্রিক কল্যাণও তিনিই দেখছেন।

যাকে হাতে ধরে, হাতে-কলমে শেখানো যাকে বলে, সেইভাবে ঠাকুর শিখিয়েছেন। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সব রকম শিক্ষাই ঠাকুর দিয়েছেন। আর সেই বিদ্যাকে সংগোপনে রাখতে, সংযত করে রাখতেও শিখিয়েছেন। তার ফলে এমন একটি অপূর্ব যন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে, যে-যন্ত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই বিশাল সঙ্ঘকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আজও পরিচালিত করছে।

[ক্রমশঃ]

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মের সপ্তবিধ প্রধান গুণ-প্রসঙ্গে পৌষ ও মাঘ ১৩৮৭ সংখ্যায় তাঁর চতুর্থ গুণ 'সৌহার্দ্য' সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাঁর এই অপূর্ব গুণের জন্য তিনি জীবের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েন; এবং জীবের সঙ্গে তাঁর হয় একেবারে সমান সমান প্রাণের মধুরতম বন্ধুত্বের রমণীয়তম সম্পর্ক।

বস্তুতঃ, ভাবাবেগপ্রধান ভারতীয়দের নিকট এরূপ অমৃতরসঘন 'সৌহার্দ্য' একটি উচ্চতম, পবিত্রতম, মোহনতম চিরকাম্য বস্তু; এবং সেজন্য ভারতীয় সাহিত্য এই বন্ধুত্বের গুণগানে ভরপুর। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ 'হিতোপদেশে'র উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশেষভাবে এইজন্য যে, সেস্থলে মানুষের মুখে নয়, ইতর প্রাণীর মুখেই সেই সব উচ্চ ধর্ম-দর্শনের বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে উদাত্ত স্বরতানলয়ে। যেমন—

'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥'

(হিতোপদেশ, প্রথম পরিচ্ছেদ, মিত্রলাভের ১০৮নং শ্লোক—একটি মৃগের উক্তি)

"উৎসবকালে বিপৎপাতে
দুর্ভিক্ষসময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবোত্থানে।
রাজদ্বারে শ্মশানে সমানে
যিনি থাকেন, তিনিই 'বান্ধব' অনুক্ষণে॥"

পুনরায় শুনুন—

'শুচিত্বং ত্যাগিতা শৌর্যং সামান্যং সুখদুঃখয়োঃ।
দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদ্‌গুণাঃ॥'

(ঐ, ১২৮নং শ্লোক—একটি কাকের উক্তি)

'পবিত্রতা, ত্যাগশীলতা, সাহসিকতা,
সুখে দুঃখে সমভাব ধীর।
দানশীলতা, স্নেহময়তা, সত্যবাদিতা—
এই হল সপ্ত সুহৃদ্‌গুণ স্থির॥'

একবার ভাবুন, কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়—সর্বত্রই, প্রতি পদে পদে শ্রীভগবানকে আমরা কাছে কাছে পাচ্ছি, পাশে পাশে পাচ্ছি অনবরত আদ্যোপান্ত অতন্দ্র সহায়রূপে—কি রোমাঞ্চকর এই ঘটনা! পুনরায়, ভাবুন, বন্ধু-শ্রেষ্ঠের উপযুক্ত বন্ধুরূপে, আমরাও হলাম সাতটি শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী—কি আশাজনক এই আশ্বাস! তাহলে, কেনই বা ভাবব না যে, এরূপ মধুরমোহন বন্ধুত্বই হোক না আমাদের উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ!

(৫) **জ্ঞানদাতৃত্ব**: ভাবব নিশ্চয়ই। কিন্তু, হায়, কঠোর শিক্ষক বলদেব এখনও তাঁর উত্থান-পতনশীল খেলা থেকে বিরত হননি, এখনও তাঁর অনেক কিছুই শিক্ষা দেবার আছে আমাদের, শ্রীভগবানের বিষয়ে। সেজন্য 'সৌহার্দ্যে'র অমল কোমল সরল স্তরে নামিয়ে এনে, পুনরায় তিনি আমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কঠিনতর, প্রখরতর, প্রবলতর 'জ্ঞানদাতৃত্বে'র স্তরে। পরমেশ্বর আমাদের নিকটতম, নিজতম, প্রিয়তম সখা নিশ্চয়ই—কিন্তু কেবল তাই নয়—তাঁর অন্য কর্তব্যও আছে আমাদের প্রতি, কেবল আমাদের সঙ্গে লীলাখেলা, হাস্যকৌতুক করা ছাড়া এবং তা হ'ল জ্ঞানদান। প্রকৃত প্রভুরূপে, প্রকৃষ্ট বন্ধুরূপে তিনি চান না যে, আমরা চিরকাল তমিস্রাচ্ছন্নই হয়ে থাকব, পরনির্ভরশীলই হয়ে থাকব, চপল-তরলই হয়ে থাকব। সেজন্য, প্রকৃত প্রভুরূপে, প্রকৃষ্ট বন্ধুরূপে তিনি এক প্রকৃত-প্রকৃষ্ট ধনই দান করেছেন আমাদের—যা একবার পেলে আর কোনো ভয় থাকে না, ভাবনা থাকে না, ভবসাগর পার হবার শক্তির অভাব থাকে না। কি সেই মহাধন? সকল দেশের সকল যুগের সকল জাতির সকল শ্রেষ্ঠ জনেরা সমস্বরে উত্তর দিচ্ছেন নির্ভয়ে নিদ্বিধায় নিঃসংশয়ে—'জ্ঞান'।

'জ্ঞান'! ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের একেবারে মূল, এবং একাধারে ফুল সেই 'জ্ঞান'—কত অসংখ্য তার বন্দনা কত অসংখ্য ভারতীয় গ্রন্থে! ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বীজরূপে প্রোথিত আমরাও শুষ্ক তপ্ত সংসারোদ্যানে চিত্তশতদল, জীবনশতদলকে বিকশিত ক'রে তুললাম সেই জ্ঞানেরই অরুণালোকস্পর্শে। এই ত হ'ল শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ অবদান! এরূপে সর্ববাদিসম্মতিক্রমে, একমাত্র 'জ্ঞানে'র মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানবজীবনের সকল প্রগতি, সকল পরিপূর্তি, সকল পরিতৃপ্তি।

অতি মধুর কথা, অতি আশার কথা, অতি আনন্দের কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের দিক থেকে পুনরায় পড়লাম আমরা মুশকিলে, যেহেতু ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতকল্পে 'প্রগতি'র স্থান নেই, স্থান নেই 'পূর্তি'র।

কি অবিশ্বাস্য অসম্ভব অযৌক্তিক কথা এটি! যদি উন্নতিই না হবে, যদি পূর্ণতাই না হবে, তাহলে ধর্ম-দর্শন-নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজনটিই বা কি —কি প্রয়োজন আকুলব্যাকুল নিরন্তর প্রার্থনার—

'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৩।২৮)

'অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও; অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও; মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও।'

বস্তুতঃ যদি আমরা এইভাবে চিরকাল অসত্যেই থেকে গেলাম, অন্ধকারেই থেকে গেলাম, মৃত্যুতেই থেকে গেলাম, যদি আমরা এইভাবে ক্ষুদ্রবীজ থেকে বিশাল মহীরুহে পরিণত না হলাম; ক্ষুদ্রকোরক থেকে বিশাল শতদলে বিকশিত না হলাম; ক্ষুদ্রশিখা থেকে বিশাল যজ্ঞাগ্নিতে প্রদীপ্ত না হলাম—তাহলে কি হ'ল সেই অনড় অচল প্রগতিহীন পূর্ণতাবিহীন জীবনের অর্থ? 'চরৈবেতি চরৈবেতি' (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৩৩।৩) 'কেবলই চলতে থাক, কেবলই চলতেই থাক'—কোথায়

রইল এই মহামন্ত্রের মর্যাদা ?

হঠাৎ শুনলে মনে হয়—এ সবই বুঝি ঠিক—স্রোতোবিহীন বদ্ধ পঙ্কিল কূপ অথবা জলাশয়ের মতই অপবিত্র, অধন্য, অপূর্ণ, অচল আমাদের সমগ্র জীবন—যদি এইভাবে 'প্রগতি'কে, 'পূর্তি'কে স্থান না দিই তাতে মূর্খের মত, মূঢ়ের মত, মোহান্ধের মত।

কিন্তু ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্বটিকে সামান্যমাত্রও উপলব্ধি করতে পারলে ভারতীয় জীবনদর্শনে 'প্রগতি' বা 'পরিপূর্তি'র স্থান কেন যে নেই, তার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হব। সেই অনুপম অপরূপ অত্যাশ্চর্য মূলীভূত তত্ত্বটি পাঁচটি সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন মন্ত্রের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে, অন্যান্য বহু মন্ত্রাদি ব্যতীতও, যথা—

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১৪।১)

'ইদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১)

'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।৮।৭ ইত্যাদি)

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১৯)

'অহং ব্রহ্মাস্মি।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।১০)

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।'

'ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।'

'তিনিই তুমি।'

'এই আত্মাই ব্রহ্ম।'

'আমিই ব্রহ্ম।'

তাই যদি হয়, জীবই যদি ব্রহ্মস্বরূপ হন, তাহলে জীব নিশ্চয়ই ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্যপূর্ণ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যতৃপ্ত। সেক্ষেত্রে জীবের ক্ষেত্রে প্রগতি এবং পরিপূর্তির প্রশ্নই ত আর উঠতেই পারে না কোনোক্রমেই; যেহেতু যিনি নিত্যপূর্ণ বা প্রথম থেকেই আদ্যন্তকালই, শাশ্বতভাবেই পরিপূর্ণ, তাঁর আবার পরে নূতন ক'রে পূর্তি বা প্রগতি লাভের অবকাশ বা সম্ভাবনা কোথায় ? একই ভাবে, যিনি নিত্যবুদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যতৃপ্ত, অথবা প্রথম থেকেই আদ্যন্তকালই শাশ্বতভাবেই জ্ঞানবান, শুদ্ধ, মুক্ত, তৃপ্ত, তাঁর আবার পরে নূতন ক'রে জ্ঞান, পবিত্রতা, মুক্তি, তৃপ্তি বা আনন্দ লাভেরও অবকাশ বা সম্ভাবনা কোথায় ?

সেজন্যই, ভারতীয় দর্শনানুসারে যদিও আমরা সাধারণতঃ ব'লে থাকি যে, জীবের জ্ঞানলাভ হ'ল, মুক্তিলাভ হ'ল ইত্যাদি, তথাপি প্রকৃতকল্পে এসব ক্ষেত্রে 'লাভে'র কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ, যা আছে চিরকাল, তা পুনরায় নূতন ক'রে লাভ করা যায় কিরূপে ?

তাহলে, 'জ্ঞান' ও 'অজ্ঞান', 'মোক্ষ' ও 'বন্ধে'র মধ্যে কি কোনো প্রভেদ নেই ? নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সে প্রভেদ বস্তুগত্যা নয়, উপলব্ধিগত্যা কেবলই। অর্থাৎ, প্রথম ক্ষেত্রে, জ্ঞান আছে, এবং সেই সম্বন্ধে উপলব্ধিও আছে; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, জ্ঞান আছে, অথচ সেই সম্বন্ধে উপলব্ধি নেই। একই ভাবে, নিত্যমুক্ত জন যখন সে সম্বন্ধে জানেন, তখন তিনি 'মুক্ত'; এবং যখন সে সম্বন্ধে জানেন না, তখন তিনি 'বদ্ধ'।

সুতরাং, এরূপ ক্ষেত্রে, প্রভেদ কেবল 'জানা বা না জানা'র দিক থেকে; 'থাকা বা না থাকা'র দিক থেকে নয়—যেহেতু, উপরে যা বলা হ'ল, এক্ষেত্রে 'না থাকা'র প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু সেই বস্তুটি সদাসর্বদাই আছে, তাকে আমরা জানি বা না জানি। যেমন—দিনে সূর্য সর্বদাই আকাশে থাকে; অথচ হঠাৎ একখণ্ড কালো মেঘ এসে যখন তাকে ঢেকে ফেলে, তখন আকাশে পূর্ববৎ বিদ্যমান সেই সূর্যটিই আমাদের সম্মুখে আর থাকে না, বা আমাদের কাছ থেকে তিরোহিত হয়ে

যায়। একই ভাবে অজ্ঞান-অবিদ্যার আবরণে আবৃত যখন আমরা আমাদের স্বরূপ বা ব্রহ্মকে জানতে পারি না; জানতে পারি না আমাদের সেই নিত্যস্বরূপ, তখন আমরা আমাদের স্বরূপগত নিত্যজ্ঞান ও নিত্যমোক্ষের বিষয় না জেনে নিজেদের জ্ঞানহীন ও বদ্ধ ব'লে মনে ক'রে, নিজেদের জড় দেহমনের সঙ্গে একীভূত ক'রে, নিজেদের আত্মায় সেই দেহমনের জড়ত্ব, মরত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, তুচ্ছত্ব, পাপময়ত্ব, শোকদুঃখপূর্ণত্ব প্রভৃতি অধ্যাস বা আরোপ ক'রে অশেষ দুর্গতি-দুর্দশাগ্রস্ত হই। এরই নাম 'বদ্ধ' বা বদ্ধাবস্থা।

[ক্রমশঃ]

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

চতুর্থ পর্ব

কাশীপুর বাগানবাড়ী। অধ্যাত্ম অনুভূতিরূপ বীণায় সব পর্দাগুলিতে ঝঙ্কার তুলে একটি মধুর ঐকতান সৃষ্টি করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেখানকার পরিবেশ মধুময়।

শ্রীরামকৃষ্ণ দুঃসহ রোগাক্রান্ত, কিন্তু তাঁর অন্যতম নিকটতম সেবক লাটু বলছেন: 'তাঁর কষ্ট কুছু ছিল না। এক এক সময় তাঁর এমন অবস্থা হোতো যে সারা দেহে পুলক ঝরে পড়তো। হামনে তো দেখেছে যে তিনি তখন কেমন আনন্দে থাকতেন।...সত্যি যদি তাঁর দুঃখু কষ্ট হোতো, তাহলে কি তিনি হামাদের এতো আনন্দ দিতে পারতেন?'[১]

অনৈশ্বর্যের ঐশ্বর্য নিয়ে নারায়ণ নরবেশে সমুপস্থিত। বাইরে ঐশ্বর্যলেশ, ভেতরে ঐশ্বর্যের দীপ্তি। ভক্তগণের সংশয়তৃষ্ণ মনকে শান্ত করে নারায়ণ স্বমুখে বলেছেন: 'তিনি যখন দেখিয়ে দ্যান—এর নাম অবতার, তিনি যদি তাঁর মানুষ-লীলা দেখিয়ে দ্যান, তা হলে আর বিচার কর্তে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না।'[২]

নরলীলার ভিতর বিভু-বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন। নরলীলার একটি রসঘন দৃশ্যাংশ অবতারপুরুষের জন্মমহোৎসব। লীলাকরের অনুমোদন নিয়েই জন্মোৎসবের আয়োজন। 'মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথের যত্নে এবং ব্যয়ে ১৮৮১ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সংস্থাপিত হয়।'[৩] শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভক্তগণ পাঁচ বছর জন্মোৎসব পালন করেছেন। বিপুল উৎসাহে বিচিত্র রঙ্গে-ভঙ্গে সে-উৎসব উদ্‌যাপন করেছেন। উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে 'মুরুব্বি' ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: 'প্রাতঃকাল হইতে ভক্তদিগের সমাগম আরম্ভ হইত।...দশটার পরে পরমহংসদেব স্নানাদি করিতেন, পরে কীর্তন আরম্ভ হইত।...কীর্তনের রস অক্ষরে (আখরে)

১ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, ৩য় সং, পৃঃ ১৮৯
২ শশিভূষণ ঘোষ: শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৪৪৩
৩ মনোমোহন, ১৩৫১, পৃঃ ৮০

বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে অক্ষর দিয়া গানটিকে মাতাইয়া আপনি মাতিয়া উঠিতেন। তিনি মাতিলে আর কাহার রক্ষা থাকিত না। ভক্তেরাও বিহ্বল হইতেন। এই মাতান ভাবটির বাস্তবিক সংক্রামকতাশক্তি ছিল।…সেই স্থানের উপস্থিত ব্যক্তিরা কাষ্ঠ-পুত্তলের ন্যায় হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পরমহংসদেবের এ অবস্থায় জ্ঞান থাকিত না।… সেই সময়ে তাঁহাকে মনের সাধে সাজান হইত। জনৈক স্ত্রীলোক ভক্ত তাঁহার বস্ত্রখানি চাঁপা ফুলের রং করিয়া দিতেন।…গৌরী মা পুষ্পের মালা ও চন্দন আনিয়া দিতেন। যখন সেই মালা গলদেশে শোভা পাইত, যখন শ্বেত চন্দনের বিন্দুসকল চরণ এবং ললাটে প্রকাশিত হইত, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়ন এবং মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। আহা! সে রূপের তুলনা কি আছে? সে রূপ উপমাবিরহিত।…যেন রূপের জালে নয়ন-বিহঙ্গ আবদ্ধ হইয়া পড়িত।…রূপ দেখিয়া মন ভুলিল, আপনাকে আপনি ভুল হইল, সকলে রামকৃষ্ণময় হইয়া পড়িল। · জয় ধ্বনিতে দিক কম্পিত হইতে লাগিল। কেহ উর্ধ্ববাহু হইয়া, কেহ করতালী দিয়া, কেহ ত্রিভঙ্গ ঠামে এবং লম্ফে ঝম্ফে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে কেহ প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন, কেহ ভক্তের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ আনন্দে অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিলেন, কেহ হাসিতে হাসিতে যেন শ্বাসবায়ু পর্যন্ত প্রশ্বাস করিয়া ফেলিলেন এবং কেহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।… তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতি লাভ করিতেন ·।'[৪]

বিগত পাঁচ বছর ঘটা করে জন্মোৎসব পালিত হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণে। এবার লোকেশের দেহকোষ রোগাক্রান্ত। বিষাদবিমগ্ন। কাশীপুর বাগানের পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্রীম লিখেছেন, 'যেমন একটি নগরীর মধ্যে সকলই সুন্দর, কিন্তু শত্রুসৈন্য অবরোধ করিয়াছে।' লোকেশ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ দীর্ণ কিন্তু ভক্তগণের প্রতি তাঁর অহেতুকী ভালবাসা, ত্রিতাপ-তাপিত মানুষের প্রতি তাঁর সর্বগ্রাসী সহানুভূতি। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কিসে সংসারে আবদ্ধ না হয়ে ভগবান-লাভে সমর্থ হয়, সদাসর্বদা তাঁর সেই ভাবনা। ইতোমধ্যে অন্তরঙ্গগণের স্থির বিশ্বাস হয়েছে সাক্ষাৎ ঈশশক্তি রামকৃষ্ণবপুতে অভিস্ফুরিত— শ্রীরামকৃষ্ণই ভক্তি-মুক্তি-প্রদাতা সদ্‌গুরু।

আজ পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি সমুপস্থিত। শুক্লা দ্বিতীয়া, ২৪শে ফাল্গুন, ১২৯২ সন। ইংরাজী ৭ই মার্চ, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। রবিবার।

জন্মোৎসব সম্বন্ধে মাষ্টারমশাই লিখেছেন: 'গত রবিবারে (অর্থাৎ ৭ই মার্চ) ঠাকুরের জন্ম-তিথি উপলক্ষে বাগানে পূজা হইয়া গিয়াছে। গত বর্ষে জন্মমহোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া হইয়াছিল। এবার তিনি অসুস্থ। ভক্তেরা বিষাদসাগরে ডুবিয়া আছেন। পূজা হইল। নামমাত্র উৎসব হইল।'[৫]

এদিকে সেবক লাটুর স্মৃতিচারণা হতে পাই: 'কাশীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছিলো। সেদিন লোরেনভায়ের গান হোলো আর সুরেন্দরবাবু একছড়া ভালো গোড়েমালা ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন। বলরামবাবু ও মাষ্টারমশাই একখানা কাপড় ও আংগা দিলেন, আর একজোড়া চটিজুতো কে এনেছিলো জানি না। সেটা আবার চুরি যায়। তখন যে জুতা-

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৩য় সং, পৃঃ ১৩০-৩২

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।২৪।১

জোড়া আনা হয়েছিলো তা এখনও মঠে পূজো হয়।'[৬]

মাষ্টারমশাই গিয়েছিলেন শাঁখারীটোলাতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ীতে। উদ্দেশ্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শারীরিক অবস্থার বিষয় ডাক্তারকে জানাবেন এবং তাঁকে কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখতে আসার জন্য অনুরোধ করবেন।

প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর ডাক্তার সরকার জানান যে, তিনি বেলা ছটার পর রোগী দেখতে বেরুবেন।

মাষ্টারমশাই বলেন: তা হোক—আপনি এখন একটু বিশ্রাম করবেন না?

ডাক্তার সরকার: না, ঘুম নয় but I must have the time to myself.

মাষ্টারমশাই লক্ষ্য করেন যে, ডাক্তার সরকার বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ইতোমধ্যে মাষ্টারমশাই একখানি বই পড়তে থাকেন। সেখানে ভগবান বুদ্ধ ও ভগবান খ্রীষ্টের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

ডাক্তার সরকার বিশ্রাম থেকে উঠে মাষ্টার-মশায়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। মাষ্টার-মশাই সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধে বলেন। বলা বাহুল্য শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিকোণ হতেই মাষ্টার-মশাই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। সাধনসিদ্ধ, যেমন কেউ কেউ অনেক পরিশ্রম করে ক্ষেতে জল আনে, চাষবাস করে। তেমনি জন্মজন্মান্তরের অনেক সাধ্যসাধনার ফলে কারো একটু আধটু ভক্তি হয়। আরেক আছে নিত্যসিদ্ধ। এদের আজন্ম জ্ঞানচৈতন্য হয়ে আছে। নিত্যসিদ্ধ এক বিশিষ্ট পর্যায়ের। এদের আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতালফোঁড়া শিব—বসানো শিব নয়।

জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সম্বন্ধে কথা ওঠে। যেমন কারু পায়ে একটি কাঁটা ফুটলে সে আরেকটি কাঁটা জোগাড় করে। তারপর কাঁটা দিয়ে কাঁটাটি তুলবার পর ছুটি কাঁটাই ফেলে দেয়! অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান-কাঁটা। জ্ঞান অজ্ঞান ছুই কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ করে ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানা ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করা বিজ্ঞানের অন্তর্গত। জ্ঞানী সাধারণতঃ হয় ভয়তরাসে, কিন্তু বিজ্ঞানী নির্ভয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে এই তত্ত্বগুলি মাষ্টার-মশাই বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলেন তথায় উপস্থিত ডাক্তার কর্ণেল রে-কে।

অতঃপর মাষ্টারমশাই Rev. Joseph Cook-এর মানবজ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান বিষয়ে বলেন।

তিনি আরও বলেন Baile Pascal (1623-1662)-এর পরমতত্ত্ব (Absolutism) সম্বন্ধে।'[৭]

[ক্রমশঃ]

৬ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, তদেব, পৃঃ ১৯৬

৭ 'He propagated a religious doctrine that taught the experience of God through the heart rather than through reason. Although there was nothing original in these opinions Pascal nevertheless stamped them with the passionate conviction of a man in love with the absolute, of a man who saw no salvation apart from a heartfelt desire for the truth, together with a love of God that works continually toward destroying all self-love.' Encyclopaedia Britannica, Vol. 13, 15th Edn., p. 1042

রামমোহনের ব্যক্তিত্ব : সাংবাদিক ও লেখক

ডক্টর উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

]

রামমোহনের বিচার-বিতর্কগুলি সব চেয়ে বেশি সাহিত্যিক গুণ পেয়েছে কথোপকথনমূলক রচনার নাটকীয় সংলাপে। একাধারে তীব্র ব্যঙ্গ ও উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রথম শ্রেণীর স্যাটায়ারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই রকম সাহিত্যিক গুণের সবচেয়ে সরস প্রকাশ হয়েছে 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' রচনায়। পাদরি একবার বলছেন, 'এক ঈশ্বর হয়েন'; আবার বলছেন, 'পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং ধর্মাত্মা ঈশ্বর।' এই পরস্পরবিরোধী কথা বলার পরে পাদরি যখন তিন চৈনিক শিষ্যকে বললেন, এবার বলো, ঈশ্বর ক'জন, তখন প্রথমজন বলেছে যে ঈশ্বর তিনজন, কিন্তু 'তিনে মিলে এক হয়েন' ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। নেহাৎ পাদরি নিজেই ঈশ্বর তিনজন বলেছিলেন বলেই সে ঈশ্বর তিনজন বলেছে। দ্বিতীয়জন বলেছে, সে পাদরির বক্তৃতায় প্রথমে ভেবেছিল ঈশ্বর অনেক। কিন্তু পাদরি কমিয়ে মোটে তিন বলায় সে আরও কমিয়ে দুই বলেছে। তৃতীয় শিষ্য পাদরির কাছে সব শুনেও গম্ভীর হয়ে বললে আপনার বক্তৃতা শুনে মনে হলো, ঈশ্বর নেই। পাদরি শুনে চমকে গেলেন তৃতীয় শিষ্য তখন বললে, এক বস্তু বর্তমান থাকতে থাকতে যদি তার স্থানান্তর ঘটে, তখন সে বস্তুর অভাবই তো ঘটে। পাদরি আবার বিস্মিত হলেন। তখন সেই শিষ্য বুঝিয়ে বললে, 'পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ঈশ্বর ছিলেন না এব' ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন [,] কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?' অর্থাৎ খ্রীষ্টের মৃত্যুতে ঈশ্বরের স্থানান্তর ঘটেছে। অতএব ঈশ্বরের অভাব ঘটেছে, ঈশ্বর নেই।

রামমোহন সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কেউ ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখেননি যে তার্কিক রামমোহনের মধ্যে এক রসিক রামমোহন বাস করতেন যিনি নীতিকথার অদ্বিতীয় রূপকার ঈশপের মতো গল্পচ্ছলে বুঝিয়ে দিতেন যে বুঝেসুঝে শাস্ত্র পড়তে হয়। আর শাস্ত্রানুবাদ ও তার ভূমিকা এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যার কথা বাদ দিলে অন্ততঃ 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' কিংবা 'কবিতাকারের সহিত বিচার' কিংবা 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' ইত্যাদি রচনা থেকে যে যে অংশ পড়া হলো তাতে কি এতটুকু অন্বয়গত অস্পষ্টতায় বা দুরূহ শব্দের ধাক্কায় রসিকতা মাঠে মারা গেছে? একালের চোখে এই বিবাদ-বিতর্কের সরসতায় আজও আমরা সমান মুগ্ধ। সেকালের ঈশ্বর গুপ্তের কথা এক হিসেবে খুবই সত্য যে—'দেওয়ানজী জলের ন্যায় বাঙ্গলা লিখিতেন।' আসলে সেই ফোর্ট উইলিয়ামী গদ্যের পরিবেশে রামমোহনই প্রথম লেখক যিনি বিচার-বিতর্কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহিত্যিক হয়ে গেছেন। সাধারণভাবে তিনি অত্যন্ত যুক্তিবাদী, সংযত, গম্ভীর এবং প্রতিপক্ষের যুক্তিখণ্ডনে আমাদের সব সময় সতর্ক করে রাখেন, কিন্তু আক্রমণের মুখে তিনি তাঁর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ মুখোশ সরিয়ে মাঝে মাঝে হাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী প্রকাশ করেছেন।

আজকের দৃষ্টিতে যে যুগের গদ্য প্রায় অনেকটাই দুষ্পাঠ্য সেই যুগেও রামমোহন ভাষার

সরলীকরণে মন দিয়েছিলেন, সংস্কৃতের ঘনসন্নিবিষ্ট বাক্যগঠনে বাঙলার ধাত বুঝে ছড়িয়ে শিথিল করে বলতে চেয়েছিলেন, বিচারকে সহজবোধ্য করতে চেয়েছিলেন—আজকের দিনে তা যতই দুর্বোধ্য ঠেকুক। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে' তিনি বলেছিলেন, ভট্টাচার্য তাঁর রচনাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছেন দুরূহ সংস্কৃত শব্দে। পরিচ্ছন্ন বাক্যগঠনে সব সময়েই তিনি মনোযোগী হয়েছেন কিন্তু যতিচিহ্ন প্রয়োগের অভ্যাস বাঙলা গদ্যে তখনও প্রায় আসেনি বলেই মাঝে মাঝে ভারসাম্য-হীন হয়ে গেছে তাঁর বাক্য। আর স্কুল বুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' পড়লে দেখা যাবে সম্পূর্ণ একখানি বাঙলা ব্যাকরণই তিনি লিখতে চেয়েছিলেন—অত্যন্ত সহজ ভাষায়—বাঙলা শব্দ ও ক্রিয়াপদের উদাহরণ দিয়ে —পরবর্তী কালের পণ্ডিতেরা যে বাঙলা ব্যাকরণকে আবার সংস্কৃতের সূত্রবন্দী করে ফেলেছিলেন। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই বেশ কিছু উদাহরণে বাঙলা শব্দ পাওয়া যাবে, কিছু প্রয়োগও পাওয়া যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে, কতখানি পরিচ্ছন্ন বাঙলায় রামমোহন তাঁর বক্তব্যকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময়ে কর্মবাচ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাঙলা প্রয়োগ আগে দিয়ে পরে সংস্কৃতের কাছা-কাছি প্রয়োগ দেখিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেক সময়ে বাঙলা প্রয়োগ দিয়ে সংস্কৃত থেকে ব্যুৎপত্তির ক্রমটিও দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং উদাহরণ হিসাবে ভাজ, মাসী, মেসো, বামনাই, ঘর, পাগলী ইত্যাদি শব্দগুলি উপভোগ্য মনে হয়। চলতি বাঙলাকেই ব্যাকরণে আনতে চাইছেন বোঝা যায়। রামমোহনের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা যেমন সমাজকল্যাণমুখী ছিল তেমনি ভাষাগত পরিচ্ছন্ন-তার মূলেও ওই একই প্রবণতা কাজ করেছে। সমাজকল্যাণই যাঁর লক্ষ্য, বহুজনের মঙ্গলই যাঁর ব্রত, সমাজ ধর্ম শিক্ষা রাজনীতির ক্ষেত্রে আধুনিকতা ও গণতান্ত্রিকতাই যাঁর লক্ষ্য, লেখক হিসেবে পাঠকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগস্থাপনে তৎপর হয়ে তিনি যে ভাষাকে সহজবোধ্য ও যুক্তিসিদ্ধ করতে এগিয়ে যাবেন, বাক্যগঠনে ও শব্দনির্বাচনে তিনি যে অর্থগত স্বচ্ছতাকেই লক্ষ্য রাখবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই বিতর্ক-বিচারের ক্ষেত্রে রামমোহনের অসাধারণ মনীষা যেমন যুক্তিতর্কনির্ভর সংহত প্রবন্ধ রচনার জন্ম দিয়েছে, তেমনি এ-জাতীয় প্রবন্ধে চিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্রেও 'যুগোপযোগী' স্বচ্ছতা তাঁরই দান। রামমোহনের বিরুদ্ধবাদীদের লেখা 'বেদান্তচন্দ্রিকা', 'বিধায়ক নিষেধক সম্বাদ' কিংবা 'পাষণ্ডপীড়ন' পড়লে বোঝা যায়, রামমোহন-বিরোধীরা বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রবন্ধ রচনায় রামমোহনের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বোধ্য বাঙলা লিখতেন এবং অনেক সময়েই ইংরেজি বিদ্যার অভিমানে যেমন আমরা ইংরেজি ভঙ্গিতে বাঙলা লিখে বসি তেমনি মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি পণ্ডিতেরা ক্রিয়াপদ ছাড়া প্রায় সংস্কৃত বাক্যই লিখে গেছেন। কাজেই এখনকার দৃষ্টিতে দেওয়ানজীর জলের মত বাঙলাকে ইঁটের মতো শক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু রামমোহনের বিরুদ্ধ-পক্ষের গদ্য পড়লে মনে হয় দীর্ঘসমাসযুক্ত কাদম্বরীর গদ্য পড়ছি আর রামমোহনের গদ্য তুলনায় অনেকটা শ্বাসপর্বের কাছাকাছি। বরং রামমোহন বেদান্তগ্রন্থে যে অনুবাদ-ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং যে ভঙ্গিতে শ্লোক তুলে তুলে ব্যাখ্যা করেছেন 'পাষণ্ডপীড়নে' অনেকটা সেইরকম কিংবা আরও দীর্ঘবিলম্বিত বাক্য দেখতে পাই। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করতে রামমোহন এতই তৎপর যে, যে-দু'চারটি অন্বয়গত দুশ্চিন্তা থাকে, তা কাটিয়ে উঠতে পারলে স্পষ্টই অর্থবোধ হয়। কাজেই ধর্ম সমাজ শিক্ষা রাজনীতির মতো রচনাগত সৌষ্ঠবের ক্ষেত্রে যুগের কথা ভাবলে রামমোহন সব সময়েই যুগোত্তীর্ণ।

লেখক রামমোহনের আর একটি নিভৃত গোপন সত্তা ছিল। সে সত্তার কথা না বললে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। যে রামমোহন আযৌবন 'বিষয়-সম্পত্তি দেখেছেন, মামলা-মোকদ্দমা করেছেন, তেজারতির ব্যবসা করেছেন, সিভিলিয়ানের দেওয়ানগিরি করেছেন, বিলাসিতা করেছেন, মার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, অভিমানে আত্মীয়দের যথোচিত সাহায্য থেকে নিরস্ত থেকেছেন, ধর্মসংস্কারে নানা সম্প্রদায়ের নিন্দে-মন্দ কুড়িয়েছেন, গোষ্ঠী করে নতুন ধর্ম প্রচার করেছেন, সঙ্গী পেয়েছেন, সঙ্গী হারিয়েছেন, হতাশ না হয়ে সংগ্রাম করে গেছেন এবং বিশ্ব-রাজনীতির সংস্পর্শে এসে দেশবাসীর পরাধীনতার জন্যে দুঃখ পেয়েছেন সেই রামমোহনের মনের মধ্যে এক ধ্যানস্তব্ধ ঐক্যচেতন নিরাসক্ত সত্তা বাস করতো। সে সত্তাটি সংসারবিমুখ ছিল না, বরং সংসারে বিশ্ববিধানের একটি ঐক্যবোধক শৃঙ্খলাকে খুঁজতে উন্মুখ হয়েছিল। এই উন্মুখীনতার সূচনা 'তুহ্‌ফাৎ' রচনার সময়, আর পূর্ণতা ঘটেছিল আত্মীয় সভা, ইউনিট্যারিয়ান সোসাইটি এবং ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এক বিশ্বব্যাপ্ত শৃঙ্খলায় যিনি বস্তুজগৎকে বেঁধে রেখেছেন সেই ব্রহ্মের চিন্তাই তাঁকে ফিজিক্যাল সায়ান্স-শিক্ষার দিকে টেনেছিল। আবার বস্তুজগতে যেমন আইনের ব্যতিক্রমহীন রাজত্ব, সামাজিক জীবনেও তাই হওয়া চাই—এই বোধ থেকেই তিনি হ্যামিল্টনের অপমানের প্রতিবাদে আইনের সমদৃষ্টির কথা তুলেছিলেন। সেই-জন্যেই তাঁর ব্রহ্ম মানবব্রহ্ম—যে ধর্মমতেই থাকুক, বুদ্ধিবিচার থেকেই মানুষ সেই ঐক্য-বিধায়ক ঈশ্বরকে—ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবে। এই উপলব্ধিতে আসতে গিয়ে সংসারে যে কষ্ট মানুষ পাবে, সেই কষ্টকে নির্বিকার সইবার ক্ষমতাই হলো বৈরাগ্য। রামমোহন এই বৈরাগ্যকেই মৃত্যু পর্যন্ত পাথেয় করে নিয়েছিলেন। তাই এই জীবনে এই মৃত্যুরীতির কথা বারবার মনে রেখেই নির্বিকারভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশ্বমানবের সমতার কথাই চিন্তা করেছিলেন। রামমোহনের সঙ্গীতের মধ্যে সংসারের দম্ভ, বিলাসিতা, পরনিন্দা, অভিমানের ধুলোকাদামাখা পরিবেশের মধ্যে ঐক্যধ্যানী বিনম্র বিষণ্ণ মানুষটিকেই চোখে পড়ে। মানুষের জীবনের শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা মনে করিয়ে বলেছেন :

অতএব সাবধান
ত্যজ দম্ভ অভিমান
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

বৈরাগ্যের এই অভ্যাসে, বিবেকের এই পরীক্ষায় সত্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাসে বহুবর্ণময় রামমোহনের চরম উপলব্ধিটি কী তা আরেকটি গানে প্রকাশ পেয়েছে :

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা।
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা;
তোমার প্রভাব দেখি, না থাকি একাকী।

সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে যে রামমোহন গণহিত-সচেতন, সমাজকল্যাণমুখী, প্রতিবাদী, যুক্তিবাদী, প্রতিবেদনশীল, শ্লেষবিদ্রূপপরায়ণ ও রসিক, সেই রামমোহন যখন স্রষ্টা—শিল্পী, তখন তিনি যেন স্বজন-বিচ্ছিন্ন বড় একাকী হয়ে গানের নিঃসঙ্গ ভেলায় একমাত্র ঈশ্বরকে সঙ্গী করে মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি শুনতে শুনতে এগিয়ে গেছেন।

লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দর্শন সেনশর্মা

লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু কেমন গুরু?

মাথায় জটা নাই, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নাই, পরিধানে নাই রক্তাম্বর বা গৈরিক?

ঠাকুর যে নিজেই জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'মা, আমায় শুকনো সাধু করিসনি, রসে বসে রাখিস!'

তা প্রেম-ভক্তিরসেই যদি ডুবে থাকতে সাধ, তবে ত অলকাতিলকা দিয়ে শোভিত করতে পারেন দেহমন্দিরকে, কণ্ঠে রাখতে পারেন তুলসীর মালা? এই সব আভরণের ত প্রয়োজন হয় ভক্তি-সাধনার বন্ধনীতে সাধকের দেহমনকে শাসিত রাখতে, আর পাঁচজনের থেকে সাধকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে! কিন্তু যাঁর হৃদয় অনুক্ষণ ঈশ্বর-অনুভূতিতে সিঞ্চিত হয়ে আছে, সাধারণ মানুষের সহজ সাবলীল সাহচর্যে যাঁর প্রাণ উজ্জীবিত হয়, তাঁর প্রয়োজন কি দেহের উপর এই সব অসাধারণত্বের আবরণের? রুদ্রাক্ষের মালাই হোক বা গঙ্গামাটির রসকলিই হোক, তা কি লোকগুরুকে চিহ্নিত করবে না কোন বিশেষ গোষ্ঠীর অভিধায়? তাতে কি সীমিত হবে না তাঁর আত্মার পরিচয়—আত্মীয়তার পরিধি? তাছাড়া রামকৃষ্ণদেবের কি কোন একটিমাত্র ভাব? কখনও সোঽহং, কখনও দাস্য, কখনও সখ্য আবার কখনও বা বালকভাব! তবে কোন্ রূপসজ্জায় সাজবেন তিনি? তাঁর মূলভাব ত বালকভাব! বালকের কি বিশেষ কোন সাজ আছে? সে ত আপন স্বভাব-মাধুর্যেই বহুরূপী, সর্বত্রগামী!

আরও আছে। সাধকের এই সব বিশেষ প্রতীক কি ব্যবধান সৃষ্টি করবে না লোকগুরুর সঙ্গে তাঁর উপাস্য জনগণেশের? বাইরের এই সব আড়ম্বর দেখে কি আড়ষ্ট হয়ে যাবেন না সাধারণ মানুষ? বাইরের বর্ণচ্ছটায় কুণ্ঠিত হয়ে যাবে না সাধারণ মানুষের অন্তর? রাজবেশ, রাজসিক বৈভব, রাজপুরুষদের কেতা-কানুনই ত ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তোলে রাজার সঙ্গে আর পাঁচ জনের। রাজবেশ খুলে খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়ান যদি রাজা, তখন কি কোন দূরত্ব থাকে তাঁর সঙ্গে প্রজাসাধারণের? দূরত্ব যাঁর কাম্য, তাঁরই প্রয়োজন অসাধারণ আবরণের, বর্ণাঢ্য আভরণের। আর যিনি চান প্রতিটি মানুষের প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মেলাতে, আচণ্ডালের আত্মাকে কাছে আনতে চান আত্মীয়তার আন্তরিক আকর্ষণে, তাঁর পক্ষে সমস্ত উপাধি-বৈভব ত শুধু অনাবশ্যক নয়, অন্তরায়ও বটে! লোকগুরু যে প্রতি পলে সহজ স্বাভাবিকভাবে কাছে পেতে চান মানুষকে—সকল মানুষকে। ধর্ম-সম্প্রদায়-কুল-শীল-মান-আভিজাত্যের কোন বিচার না করে স্বচ্ছন্দে স্ব-ভাবে সবাই যেন তাঁর কাছে আসতে পারে। তিনি যে সকলের, সবাই যে তাঁর! তাই কাতর ভাবে প্রার্থনা করেছেন জগদম্বার কাছে, 'মা, ওদের চাইতে আমি বড়, এভাব আমার যেন কখনও না হয়!' এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের জীবনের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। রামকৃষ্ণদেব তখন শ্রীমথুরানাথ বিশ্বাসের জানবাজারের বাড়ীতে আছেন। ধনী-ভক্তের বাড়ীতে দুর্গোৎসব—আবাল-বৃদ্ধবনিতার খুব আনন্দ! সে বছর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপস্থিতিতে মথুরের বাড়ী পবিত্র হওয়াতে ঐ আনন্দ হাজারোগুণে বেড়ে গেছে। আর ঠাকুর ত নিরন্তর প্রতিমাতে জগন্মাতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছেন। ভাবাবেশে ঠাকুরের দেহ অপূর্ব রূপময়

হয়ে উঠেছিল। ঐ অবস্থার কথা ঠাকুর নিজেই বলেছেন, "তখন তখন এমন রূপ হয়েছিল রে যে, লোকে চেয়ে থাকত; বুক মুখ সব লাল হয়ে থাকত, আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুত! লোকে চেয়ে থাকত বলে একখানা মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম, 'মা, তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিতরের রূপ দে', গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলতুম, 'ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা'; তবে কতদিন পর ওপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল।" এইভাবে ঠাকুর সুতীক্ষ্ণ সতর্কতার সঙ্গে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন অসাধারণত্বের তিলমাত্র প্রকাশ পরিহার করতে। যাতে অসাধারণত্বের মহিমায় তাঁকে বিভূষিত হতে না হয় সেইজন্যই ত ঠাকুরের এই ব্যাকুলতা। কেননা তিনি যে সব সময়ই সকল মানুষের সমগোত্রীয় সহযাত্রী হয়ে আপন অনুপম ভঙ্গীতে উদ্দীপন করতে চেয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরভক্তির, উদ্গাত করতে চেয়েছেন তাঁদের প্রত্যয়ের, উন্মেষ করতে চেয়েছেন সকলের চৈতন্যের। তাই ত দেখি প্রায়-নিরক্ষরা লক্ষ্মীদেবীও ঠাকুরের সঙ্গে যেমন সমভূমিতে, তেমনি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, বিলাতফেরত কেশবচন্দ্র সেন, খৃষ্টান পাদ্রি কুক সাহেব কেউই নন দূরের লোক ঠাকুরের কাছে। সকলেই সহজভাবে এসেছেন তাঁর কাছে।

আবার কামারপুকুরের যে-সব মেয়েরা প্রতিদিন প্রত্যূষে বাড়ীর ঝাঁটপাট সেরে জল আনতে যাবার পথে ঠাকুরের সঙ্গে এক-আধঘণ্টা কাটিয়ে যেতেন, তাঁদের যখন ঠাকুর রঙ্গ করে বলছেন, শ্রীবৃন্দাবনে নানাভাবে নানাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপিনীদের মিলন হত—পুলিনে জল আনতে গিয়ে গোষ্ঠ-মিলন, সন্ধ্যেবেলা ঠাকুর যখন গরু চরিয়ে ফিরতেন তখন গোধূলি-মিলন, তারপর রাত্রে রাসে মিলন। তা হ্যাঁগা, এটা কি তোদের স্নানের সময়ের মিলন নাকি? তখন তাঁরা লজ্জায় কুঁকড়ে না গিয়ে অনাবিল আনন্দের হাসিতে গড়িয়ে পড়তেন! কারণ, তাঁদের প্রত্যয়ে ঠাকুর যে তাঁদের সাথী—সখা—বড় আপনার লোক! এখানে ত লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের সঙ্কোচ আসতেই পারে না।

তেমনি, দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর আহ্লাদী ছেলে যেমনভাবে মাকে আদর করে তেমনিভাবে ভক্তিমতী গোপালের মাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে আদর করেছিলেন তখনও গোপালের মা এতটুকুও সঙ্কুচিতা হননি। গোপালের মার কাছে যে ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপাল—আদরের ধন! প্রত্যেকেই অনুভব করতেন ঠাকুরের মধ্যে সকল সংশয়ের সমস্ত সঙ্কোচের নিরঞ্জন!

ঠাকুরের শিক্ষাদানের পদ্ধতিও অদ্ভুত। গুরুগিরি তিনি করতেন না। নিজেই ত বলেছেন, 'গুরুগিরি করা ভাল নয়।' প্রথমেই গভীর ভালবাসার টানে মানুষের মন জয় করে নিতেন। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে হত যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। এমনি ছিল তাঁর ভালোবাসার শক্তি। প্রতিটি মানুষের সুখদুঃখ, জীবন-অনুভূতির সঙ্গে যে ছিল ঠাকুরের প্রগাঢ় সহানুভূতি! সহানুভূতিজনিত ভালোবাসায় ঠাকুর আসতেন অন্যের সমতলে। উভয়ের সাম্যবোধ গাঢ় হলে যাকে যা বলবার দু'চার কথায় বলে বোঝাতেন ঠাকুর। গুরু বা অভিভাবকের ভঙ্গীতে কোন বিশেষ উপদেশ ত তিনি দিতেন না। ঠাকুরের জীবনের একটি ঘটনা ঠাকুরের এই বিশেষ ভাবটিকে তাৎপর্যময়রূপে প্রকটিত করে। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানকার রাধাগোবিন্দের বিগ্রহমূর্তিদুটি রাত্রিতে শয়নমন্দিরে শয়ান করান হত, আর ভোরবেলা তাঁদের এনে বসানো হত মন্দিরের মধ্যে সিংহাসনে। সেখানে পূজা ভোগ-রাগাদি হত। তারপর বিশ্রামের জন্য বিগ্রহমূর্তি-

দুটিকে আবার নিয়ে যাওয়া হত শয়নমন্দিরে। অপরাহ্ণে আবার তাঁদের সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হত। সন্ধ্যায় আরতির পরে ভোগরাগান্তে রাত্রিতে তাঁদের শয়ন দেওয়া হত শয়নমন্দিরে। এমনি ভাবে প্রতিদিনই বার বার বিগ্রহমূর্তিদুটিকে এ-ঘর ও-ঘর করাতে হত পূজক ব্রাহ্মণকে। একদিন পূজারি পা পিছলে পড়ে যান, আর গোবিন্দজীর মূর্তিটির পা ভেঙ্গে যায়। বিগ্রহের অঙ্গহানি! ভীষণ ব্যাপার! রানী রাসমণি ও মথুর-বাবু উপায় নির্ধারণের জন্য শহরের সব খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সভা বসালেন। পণ্ডিতেরা বহু শাস্ত্র-বিচার করে বললেন, ভগ্নবিগ্রহের পূজা সম্ভব নয়, অতএব ভাঙ্গামূর্তিটিকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন মূর্তি স্থাপিত হোক। পণ্ডিত-দের বিচার অনুযায়ী কারিগরকে নতুন মূর্তি তৈরীর আদেশ দেওয়া হয়ে গেল। এমন সময় মথুরবাবুর মনে হল একবার 'ছোট ভট্টচার্যি'র মতটা নিলে হয়। সব শুনে ঠাকুর বললেন, 'রানীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আরেকজনকে এনে তার জায়গায় বসানো হত—না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত?' ঠাকুরের কথা শুনে সবাই অবাক্! গভীর মমতার সঙ্গে সেদিন ঠাকুর সবার হৃদয়ে জাগিয়েছিলেন ঈশ্বর-আত্মীয় বোধ! এই ছিল ঠাকুরের শিক্ষা দেবার পদ্ধতি।

প্রতি প্রসঙ্গেই তিনি গল্প বলতেন. অজস্র গল্প। অতি পরিচিত বহুশ্রুত সে-সব গল্প। তবু ঠাকুরের মুখে জীবন্ত হয়ে উঠত সে-সব গল্প। তিনি বলতেন তাঁর নিজস্ব ঢঙ্গে, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়। গল্পের সঙ্গে মিল দেখিয়ে দিতেন দৈনন্দিন জীবনের। উদাহরণ তুলে ধরতেন আপাততুচ্ছ সব প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্য থেকে। সহজ সরল ঐ সব গল্প-কথা থেকেই প্রত্যেকে বুঝে নিতে পারতেন ঠাকুরের বক্তব্য আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে—লাভ করতেন ভক্তির পথ, প্রত্যয়ের সূত্র, তৃপ্তির আস্বাদ! ঠাকুরের এই অনির্বচনীয় গল্প বলা সম্বন্ধে লিখেছেন রসিক-সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী, "এঁর মত সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য খ্রীষ্টের ভাষা ও বাক্য-ভঙ্গির। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন—এর অর্থ, উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোন বাছবিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে—'তাঁর জাঁতায় যাই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে'। পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল, সময় মতো ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন-কি, যে সব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন।...ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাবো। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক-রিলিজিয়ান), আচার-ব্যবহার, ভাব —সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গি সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না, কিন্তু যেখানে শুদ্ধ-মাত্র রুচির প্রশ্ন, সেখানে তিনি ধোপ-দুরস্ত ফিটফাট হবার কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না।"

ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর প্রভাব

ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঠাকুরের বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে যখন মা বলেন—'আমি সত্যিকারের মা ; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য—সত্য জননী' অথবা ভিন্ন প্রসঙ্গে যখন অন্য কোন ভক্তকে বলেন—'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা', কিংবা ডাকাত আমজদের প্রসঙ্গে বলেন—'আমার শরৎ (সারদানন্দজী) যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমনি আমার ছেলে', অথবা বলেন, 'আমি যে মা ইতর জীবেরও', তখনই আমাদের মোহাচ্ছন্ন মনে মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হয় হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্য—'সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি'—সেই পরম একের অনুভূতি—যার চরম চরিতার্থতা শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবন ও বাণীতে বিধৃত হয়ে আছে।

মা তাঁর সর্বজীবে সন্তানভাব বা বৎসলতা-বোধের মাধ্যমেই ব্রহ্মবোধে নিশ্চলা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এর থেকে সহজতম অথচ কঠিনতম পথ বোধ হয় আর নেই। এই একনিষ্ঠ সন্তানবোধে অবিচল থাকতে পারলেই নারীজাতি আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারবে অর্থাৎ সেই অদ্বৈতবোধের উচ্চতম ভূমিতে, যার প্রাক্-প্রস্তুতি আসবে ত্যাগ-তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, সেবা-করুণা এবং ক্ষমার মধ্য দিয়ে। বিশ্বের সমস্ত জীবের প্রতি ঠিক ঠিক সন্তানভাব না এলে অনন্ত দয়া, অপার করুণার স্রোত উৎসারিত হবে কেমন ক'রে? তাই হাজার অত্যাচার করলেও, বিদেশী শাসক ইংরেজদের তিনি 'আমার সন্তান' বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। বিশ্ব-প্রেমের এমন জলন্ত উদাহরণ আমাদের স্তম্ভিত করে।

আর এই 'মা' যখন গুরুর আসনে বৃতা হলেন, তাঁর ঘনীভূত বাৎসল্যরস বিশ্বমুক্তিব্রতে রূপান্তরিত হ'ল। পাপী-তাপী নির্বিশেষে সকলকেই শ্রীপদে আশ্রয় দিলেন, অভয়-বাণী উচ্চারণ করলেন—'এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে', 'তোমাদের এই শেষ জন্ম', 'বিধির সাধ্য নাই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে', 'কিছু করতে হবে না, যা করতে হয় আমি করবে।' বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে প্রায় বিনামূল্যে এমন মুক্তি পাবার দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে? কিন্তু সেই সঙ্গে এই নির্দেশও দিলেন—'স্মরণ-মনন রাখবে, যখন পার জপ করবে', 'জপাৎ সিদ্ধিঃ', সব শেষে বললেন—'(সংসারে) যার উপর যেমন কর্তব্য ক'রে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না।'

এইভাবে ব্যবহারিক বেদান্তের সার-নির্যাস নিষ্কাম কর্মের সুমহান্ আদর্শটি একটিমাত্র বাক্যে ব্যঞ্জিত ক'রে গেলেন এবং এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যা যুগ যুগ ধ'রে ভারতের ধর্মজীবনকে মহিমান্বিত ক'রে রাখবে।

অতএব স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি—'মা ঠাকুরাণী গেলেই সর্বনাশ'—এর গভীরতম তাৎপর্য আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুক্ষণ 'মা জগদম্বা'র ভাবে আবিষ্ট, মুহুর্মুহুঃ নির্বিকল্পসমাধিস্থ। কতটুকু সময় মর্ত্যসীমায় নিজেকে ধরা দিতেন তিনি? কিন্তু আমাদের মা সারা জীবন অতি সাধারণ নারীর মতো দু'বেলা সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা ও প্রাত্যহিকতার গণ্ডীতে নিজেকে দৃঢ় আবদ্ধ ক'রে রেখে, নারী-পুরুষ-

নির্বিশেষে সকলকে অম্লান বদনে কোলে টেনে, কাঞ্চনকে 'মা লক্ষ্মী' ব'লে মাথায় ঠেকিয়ে, অবলীলায় জীবকে মুক্তি বিতরণ ক'রে গেলেন। আমাদেরও মোহমুক্তি শুরু হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, সংসার ত্যাগ করে নয়, সংসারের 'সার'টি নিতে পারলেই সেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব নয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনকে এই অতুলনীয় সম্পদে মহিমমণ্ডিত ক'রে তুলেছে।

শ্রীশ্রীমা তাঁর সারাজীবন ধ'রে যে বিপুল অধ্যাত্ম-সম্পদ নির্বিচারে সকলের মধ্যে বিতরণ ক'রে গেছেন, তার মহান উত্তরাধিকার বর্তেছে গৌরী-মা, ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিস্টিন প্রমুখের ওপরে। গৌরী-মা ক'লকাতার ওপরে 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা ক'রে দুর্গাপুরী দেবীর মতো আত্মোৎসর্গকারিণী সন্ন্যাসিনীর সৃষ্টি করলেন, অন্যান্য বালিকাদের আশ্রমে সুশিক্ষিত ক'রে দেখিয়ে গেলেন সাধারণ পরিবারের নারীরাও সংসারের মধ্যেই ঈশ্বরকে বেঁধে ফেলতে পারেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'বালিকা বিদ্যালয়'-এর উদ্বোধন করালেন শ্রীশ্রীমাকে দিয়ে, যেখানে মূল প্রেরণা হ'ল শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেবা ও নিষ্কাম কর্ম। পরবর্তী কালে 'শ্রীশ্রীসারদা মঠ' প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শত শত নারী আজ আত্মত্যাগ ও সেবার আহ্বানে ক্রমাগত সাড়া দিচ্ছেন। এঁরা দেশব্যাপী সেবার কাজে এবং আত্মোপলব্ধির আদর্শে উৎসর্গ করছেন নিজেদের। আজকের যুগের নারীরা এই সন্ন্যাসিনীদের আদর্শে ও পূত-চরিত্রের প্রভাবে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ ভারতের নারীসমাজ শ্রীশ্রীমায়ের অতুলনীয় জীবন ও বাণীর প্রভাবে তাঁদের জীবন ও চরিত্র আধ্যাত্মিকতার অমূল্য সম্পদে গরীয়ান ক'রে তুলতে পারবেন।

[ক্রমশঃ]

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীদেবব্রত দাস

ভারতের জাতীয় জীবন প্রাচীন কাল থেকেই আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের দিকে লক্ষ্য রেখেই ভারতে গড়ে উঠেছিল সমাজ ও সংস্কৃতি। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ধর্মকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে এ-জাতির উত্থান-পতন। এই ধর্মপ্রাণ ভারতে কতনা বিদেশী এসেছে! কিন্তু ভারতের সনাতন ধর্ম রয়েছে অনাহত, অব্যাহত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়?—ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।' (বাণী ও রচনা ৬।১৬০) তিনি আরও বলেছেন: 'যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবান্‌কে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।' (বাণী ও রচনা ১০।১৫৯) এখন এই 'সনাতন সর্বজনীন ধর্ম যখন কাল-প্রভাবে গ্লানিযুক্ত হয়, যখন মায়াপ্রসূত অজ্ঞানের অনির্বচনীয় প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহকাল এবং পার্থিব ভোগসুখলাভকেই সর্বস্বজ্ঞানপূর্বক জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে,…তখনই শ্রীভগবান স্বকীয় মহিমায় সনাতন ধর্মকে রাহুগ্রাসমুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলেন এবং দুর্বল মানবের প্রতি কৃপায় বিগ্রহবান হইয়া তাহার হস্ত-ধারণপূর্বক তাহাকে পুনরায় ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত

করেন।' (লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৯-১০) এই-ভাবে ভারতীয় জনজীবনে যখনই দুর্যোগ এসেছে, তখনই পতনোন্মুখ ধর্মকে রক্ষা করতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছে। আবির্ভাব ঘটেছে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের। বুদ্ধ, যীশু প্রমুখ প্রায় সকল ধর্মনেতাই নিজ নিজ আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মাদর্শের পরিচয়ে দেখা যায়, বস্তুতঃ তিনি কোন বিশেষ ধর্মমতের প্রবক্তা নন। পরন্তু সকল ধর্মমতকেই সার ভেবে তিনি এক মহা সমন্বয়ী ধর্মের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এটাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য ধর্মাচার্য ও অবতারপুরুষগণের মধ্যে মূল পার্থক্য।

মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষসাধনই শিক্ষা। শিক্ষা প্রধানতঃ দু'প্রকারের: জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষা ও মননকেন্দ্রিক শিক্ষা। জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষা বাস্তব জীবনের উন্নতি সাধন করে আর মননকেন্দ্রিক শিক্ষা মানুষের মনের তথা আধ্যাত্মিক চিন্তা ইত্যাদির বিকাশ ঘটায়। জাতীয় জীবনে পূর্ণতা আসতে পারে এই দুই শিক্ষার সম্মিলনে। প্রাচীন কালের শিক্ষা আর বর্তমান কালের শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ অনেক। আবার প্রাচ্যের শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষার ভাবধারাও আলাদা আলাদা। কিন্তু সকল প্রকার শিক্ষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কতকগুলি ক্ষেত্রে সেগুলির যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি বৈসাদৃশ্যও প্রচুর। তবে অনেকাংশেই দেখা যায় শিক্ষার মূল ত্রুটি ও তার প্রকার-বৈচিত্র্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত শিক্ষার ভাবধারা যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখব যে তাঁর শিক্ষা বস্তুতঃ কোন বিশেষ কালের প্রয়োজনে নয়। সকল সময়ের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। আবার তাঁর শিক্ষাধারা দেশ বা জাতির গণ্ডীও অতিক্রম করে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল সমগ্র জীবনকে নিয়ে। একদিকে দর্শনের ছাত্র যেমন তাঁর কাছে দর্শনতত্ত্ব শিখতেন, ধর্মসাধক তাঁর কাছে নিতেন ধর্মশিক্ষা; তেমনি অপরদিকে শিক্ষাবিদ্‌, সমাজসংস্কারক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ্‌ অর্থাৎ জীবনের বিভিন্ন পথের পথিকেরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন নিজ নিজ পথের নির্দেশ। আবার পুরোপুরি বাস্তববাদী সংসারীও তাঁর কাছ থেকে সহজ জীবনযাত্রার পথটি চিনে নিতে পারেন। শিক্ষার চাতুর্য-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্রোহ ছিল মুখর। শিক্ষার সঙ্গে মনের অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ যোগ না থাকলে সে শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। আবার নিছক কেতাবী অর্থকরী শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর বাণী ছিল সোচ্চার। দাদা রামকুমারকে তিনি বলেছিলেন, 'এই চালকলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না, আমি এমন বিদ্যা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়।' 'শিক্ষার ক্ষেত্রে পুঁথির অপ্রতিহত আধিপত্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শিক্ষায় বস্তুভার।' (চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, পৃঃ ২০২) এই বস্তুভারাক্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে ঠাকুর বলেছেন, 'দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না, বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে হাতে আনা বড় শক্ত।' আবার শুধু পুঁথিগত শিক্ষার দ্বারা জীবনের বিকাশ ঘটে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল; কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশীদর্শন অনেক তফাত।' পূর্ণ শিক্ষা কি সে প্রসঙ্গে তাঁর মত: মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরকে জানার শিক্ষাই বিদ্যার্জনের মূল কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ অপরা বিদ্যারও যে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। লাটুমহারাজকে তাঁর

বর্ণপরিচয় শিক্ষাদান এবং 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি', 'যে একটা বিদ্যাতে নিপুণ তার পক্ষে ঈশ্বরলাভ সহজ' ইত্যাদি তাঁর উক্তিসকল।

নারীশিক্ষার বিষয়েও তাঁর ভাবনা ছিল প্রচুর। গৌরীমাকে তিনি বলেছিলেন, 'এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু; তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে…এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাধন-ভজন ঢের হয়েছে এবার এ তপস্যাপূত জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগবে, ওদের বড় কষ্ট।' দেখা যাচ্ছে তিনি এদেশে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছেন এদেশের শিক্ষিত মেয়েদের দ্বারাই। আবার এও চিন্তা করেছেন যে, সমাজশিক্ষার যে কেন্দ্র এই শহর, সেই শহর থেকেই সেই শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। বাস্তবিকই আমরা অবাক্ হই এই ভেবে যে, তাঁর মতো একজন তথাকথিত 'নিরক্ষর' গ্রাম্য মানুষের শিক্ষাসম্বন্ধীয় এতো উন্নত মানের চিন্তার উন্মেষ হলো কিভাবে!

ধর্ম ও সমাজ পরস্পর জড়িত, পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। প্রত্যেক জাতিই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে অল্পবিস্তর প্রভাবিত। বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের আদর্শ প্রচার করতে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজের ধারক ও বাহক হল মননশীল মানুষ। সুতরাং ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল ধর্মেই মানুষের বিকাশলাভের কথাই বলা হয়েছে। সেইদিক থেকে সমন্বয়ী মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন সব সমাজেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি, আগেই যা বলেছি, বিশেষ কোন ধর্মমতের সৃষ্টি করেননি। সকল ধর্মকেই সারবান ভেবে স্বীয় সাধনায় তাদের মিলন ঘটিয়েছেন। বস্তুতঃ তাঁর এই সাধনা সমাজের মানুষকে নিয়েই। এদিক থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকলের প্রিয়, আদর্শস্থানীয় ও পূজনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে কালে জন্মেছিলেন, সেই কাল থেকে আজকের কালে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তাঁর বাণী, তাঁর আদর্শ, তাঁর সমাজচিন্তা সর্বকালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি কোন বিশেষ সমাজের হিতসাধনে ব্রতী ছিলেন না, মনুষ্যজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই তাঁর সাধনা। ঠাকুর তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় সমস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতির পথ প্রশস্ত করে গেছেন। বাস্তবজীবনে তিনি গ্রামে মানুষ হয়েছেন। শৈশব থেকেই মানুষের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ তাঁর জীবনে প্রকাশ পেয়েছে। শৈশবে ধনী কামারণী নাম্নী এক শূদ্রার কাছে উপনয়নকালে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ তিনি ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও যে কাজ করেছেন তা তৎকালীন গোঁড়া সমাজে এক বিপ্লবেরই নামান্তর। মানুষের প্রতি ভালবাসা, সংবেদনশীলতা ও শ্রদ্ধা তাঁর জীবনব্যাপী অটুট ছিল। সমষ্টির কল্যাণ ছিল তাঁর কাম্য। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল অপরিসীম। 'চালকলা বাঁধা' শিক্ষা কেবল ব্যক্তি-গত সুখ আনবে, বৃহৎ সমাজের কথা ভাবতে দেবে না। সমাজকল্যাণের বড় কথাই তো হল লোক-শিক্ষা। সেই শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন তাঁর সহজ সরল বাণীর মধ্য দিয়ে। লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শবাণী—মানুষকে 'মানহুঁস' হতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জাতিগত-ধর্মগত-শ্রেণীগত সকল বৈষম্যের ঊর্ধ্বে। হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মমতে সাধনা করে তিনি এই মতই প্রচার করেন যে, ঈশ্বরই বিভিন্ন রূপে লীলা করছেন। ঠাকুরের সমাজচেতনার উল্লেখ করতে গিয়ে যে দৃষ্টান্তটি সর্বাগ্রে মনে পড়ে তা হল, ধর্মসাধক হয়েও তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন কাটাননি, মানুষের সমাজে বাস করে মানুষের মাঝেই তিনি অধ্যাত্মসাধনা করেছেন, ঈশ্বরলাভ করেছেন। মানুষ তথা সমাজকে তিনি অস্বীকার করেননি। মানুষের মাঝে বাস করেই মানবজীবনের চরম সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

[ক্রমশঃ]

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

শ্রীশুভেন্দুমোহন ঘোষ

ভারতের গ্রন্থাগার-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন (Dr. S. R. Ranganathan নামেই দেশে বিদেশে সমধিক পরিচিত) তাঁর 'The Five Laws of Library Science' গ্রন্থে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের যে-পাঁচটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নরূপ :

(১) ব্যবহার করার জন্যই গ্রন্থ
('Books are for use')

(২) প্রতিটি পাঠকের জন্যই গ্রন্থ
('Every Reader his Book')

(৩) প্রতিটি গ্রন্থের জন্যই পাঠক
('Every Book its Reader')

(৪) পাঠকের সময় বাঁচাও
('Save the time of the Reader')

(৫) গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান জীবকোষ
('Library is a growing organism')

প্রথম সূত্রটির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং এই সূত্রের যথার্থতা সম্বন্ধেও কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস ভিন্নতর সাক্ষ্য দেয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলিকে লৌহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখা হ'ত কুলুঙ্গির সঙ্গে এবং সেগুলিকে শৃঙ্খল-মুক্ত করা হ'ত না। এই-ভাবে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যুগের পর যুগ ধ'রে গ্রন্থগুলির সংরক্ষণ করা। গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত বা পঠিত হ'লে বিনষ্ট হবে, এমন এক ধরনের কুসংস্কার কায়েম ছিল।

মুদ্রণের আবিষ্কারের পূর্বে একটি গ্রন্থ নকল করতে লেগে যেত বহু বৎসর এবং ঐ সময়ে গ্রন্থও ছিল অতি-দুষ্প্রাপ্য। এই পরিস্থিতিতে প্রথম সূত্রটি পালন করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমশঃ এটি একটি মজ্জাগত বদভ্যাসে পর্যবসিত হ'ল। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হ'লেও, গ্রন্থ সযত্নে সংরক্ষণের জন্য, ব্যবহারের জন্য নয়—মানুষের মনে বদ্ধমূল-হয়ে-যাওয়া এই ধারণা দূরীভূত হ'তে আরো বহু শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল। যদিও সাম্প্রতিককালের গণতান্ত্রিক পটভূমির পরি-প্রেক্ষিতে এই পুরাতন সংস্কার মৃতপ্রায় হয়ে এসেছে, তবুও এ-কথা বলা বোধ করি যায় না যে, এই সংস্কার একেবারেই নেই।

ডঃ রঙ্গনাথন বলেছেন যে, আধুনিককালের গ্রন্থাগারিক সব সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন গ্রন্থাগারের প্রতিটি গ্রন্থ পঠিত হয়—তাক শূন্য হয়ে গেছে এই দৃশ্য তাকে আনন্দদান করবে। যদি কোনো গ্রন্থ অপঠিত অবস্থায় পড়ে থাকে, তাহলে ধ'রে নিতে হবে যে, সেই গ্রন্থ বা গ্রন্থগুলির কোনো উপযোগিতা নেই। অতএব সেই বা সেইসব গ্রন্থ রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। যে গ্রন্থের বা গ্রন্থসমুদয়ের পাঠক নেই বা চাহিদা ফুরিয়েছে সেই গ্রন্থ বা গ্রন্থসমুদয় তাক জুড়ে থাকলে পরে মূল্যবান তথা কালজয়ী গ্রন্থসমুদয় তাকে সুসজ্জিত হয়ে পাঠকের গোচরীভূত হবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, এ-অবস্থা গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করে না।

দ্বিতীয় সূত্র : গ্রন্থ সব ধরনের পাঠকদের জন্য। এই দ্বিতীয় সূত্রটি গ্রন্থ-ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, নূতন গ্রন্থাগার নির্মাণের অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে যে-

গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের ত্রিমুখী কাজই করা হবে। দ্বিতীয় সূত্রের বিস্তৃত রূপটি হ'ল 'শিক্ষা প্রতিটি মানুষের জন্য, কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণীর জন্য নয়।'

তৃতীয় সূত্র : প্রতিটি গ্রন্থের সার্থক পাঠক থাকবে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থসমষ্টি পাঠককুলের দ্বারা ব্যবহৃত হবে বিনা বাধায় বিনা আয়াসে—প্রতিটি পাঠক তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি গ্রন্থ নির্বাচন ও রসাস্বাদন করবে স্বাধীনভাবে।

নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার প্রবর্তন (অর্থাৎ গ্রন্থ পাঠ করার জন্য বা পাঠ করতে নেওয়ার জন্য কোনো মূল্য নেওয়া হবে না পাঠকসাধারণের কাছ হ'তে) গ্রন্থাগার-আদর্শের ভিত্তিস্বরূপ। এতদ্ব্যতীত, গ্রন্থাগারে 'Open Access System' (শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় এর বাংলা করেছেন 'অবাধ-প্রাপ্তি' বা 'মুক্তদ্বার') প্রবর্তন করা যুক্তিসঙ্গত। এই বিশেষ প্রথায় ব্যবহারকারী নিজেই গ্রন্থসমীপে গিয়ে গ্রন্থ গ্রহণ করতে পারে। 'অবাধপ্রাপ্তি'-প্রথা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক প্রথা। 'Open Access System'-এর বিপরীত রূপ 'Closed Access System'। 'Closed Access System'-এ গ্রন্থরাজি আলমারীর বা Shelf-এর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, গ্রন্থ পেতে হ'লে requisition slip-এ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম, বর্গীকরণ সংখ্যা ইত্যাদি খুঁটিনাটি লিখে দিতে হয়।

Open Access System ব্যতীত classified shelf arrangement, analytical cataloguing (গ্রন্থ-ভুক্ত কোনো অধ্যায় বা বিষয়কে সূচীকৃত করা), reference-service, library publicity methods (যেমন library bulletin প্রকাশ, library display, library extension service) —ইত্যাদির সুপ্রয়োগের ফলে প্রতিটি গ্রন্থের যোগ্য পাঠক তৈরী করা যায়।

চতুর্থ সূত্র : বর্গীকরণ (classification), সূচীকরণ (cataloguing) দ্রুতগতিসম্পন্ন charging and discharging work (charging অর্থে গ্রন্থ দেওয়া ও discharging অর্থে গ্রন্থ ফেরত নেওয়া)—এই সমস্ত উপায়ে ব্যবহারকারীদের সময়ের সাশ্রয় করতে হবে। Brown charging system, Newark charging system, mechanised charging system ইত্যাদি অনেক charging systems চালু আছে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে charging counter-এ long queue বা লম্বা লাইন যেন না চোখে পড়ে, তথ্য-সন্ধানে ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পেতে ব্যবহারকারীর যেন অযথা দেরী না হয়, cataloguing বা সূচী-করণ এমনভাবে করতে হবে যাতে গ্রন্থের যাবতীয় খবর বা bibliographical অনুপুঙ্খ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। বর্গীকরণও এমনভাবে করতে হবে যেন shelf-এ বা তাকে সম-বিষয়ের গ্রন্থসমূদয়ের পাশাপাশি related disciplines-এর গ্রন্থও থাকবে। এর ফলে চাহিদানুযায়ী নির্দিষ্ট বইটি না পেলেও সম-পর্যায়ের গ্রন্থের হদিশ পাবে পাঠক বা ব্যবহারকারী।

পঞ্চম সূত্র : ক্রম-বিবর্তন গ্রন্থাগারের স্বাস্থ্যোন্নতির সূচক। গ্রন্থাগার বাড়ুক কলেবরে বা আয়তনে, প্রসারিত হোক গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধিতে, নিত্যনূতন আসবাবপত্রের আগমন ঘটুক, পাঠক-কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি পাক—এসব চাই। প্রয়োজন হ'লে পরে নূতন বিভাগ খুলতে হবে, আধুনিক আলোকসজ্জার আয়োজন করতে হবে, Carrell বা নির্জন পাঠের কোণ বা স্থান তৈরী করতে হবে ইত্যাদি।

[ক্রমশঃ]

ক্রুশবিদ্ধ বিবেকানন্দ

ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে পরিব্রাজক হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছিলেন Imitation of Christ-এর অমর উক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে : 'We have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen.' তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখে অনুভব করেছিলেন মানুষের দুঃখ-কষ্ট। তিনি দেখেছিলেন ভারতের অধিকাংশ মানুষ অর্থাভাবে অনাহারে মরছে। তাদের পরনে নেই কোন বস্ত্র। অশিক্ষায় আর বহুদিন ধরে পরজাতির অধীনে থাকতে থাকতে ভারতবাসী হয়ে পড়েছে কৃতদাস, অলস। তিনি দেখলেন সারাটা জাত যেন তমোনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। ভারতের এই হীনদশা দেখে তাঁর হৃদয় বেদনায় হাহাকার ক'রে উঠল। এই পরিব্রাজকজীবনে স্বামীজীর হৃদয় পরদুঃখে কিভাবে দগ্ধ হচ্ছিল, তা তাঁর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দের উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা পাই : "তিনি বলেছিলেন, 'হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না।' অতঃপর মুখে একটা গভীর বিষাদের ছায়া নিয়ে এবং ভাবাতিশয্যে কম্পিত কলেবরে তিনি নিজের হাত বুকের উপর রেখে আরও বললেন, 'কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।' তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি আর বলতেই পারছিলেন না—চোখের জল পড়তে লাগল।" এই সব কথা বলতে বলতে স্বামী তুরীয়ানন্দও বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি আরও বললেন : "স্বামীজী যখন ঐ কথাগুলি বলছিলেন, তখন আমার মনে কি খেলছিল বলতে পার? আমি ভাবছিলাম : 'বুদ্ধও কি ঠিক এমনি অনুভব করেননি, আর এমনি কথা বলেননি?'···আমি যেন ঠিক দেখছিলাম যে, জগতের দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে—তাঁর হৃদয়টা যেন তখন একটা প্রকাণ্ড কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেঁধে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরী করা হচ্ছিল।" এই মলমের প্রলেপ দিয়ে তিনি দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশারূপ ক্ষত দূর করবেন, ক্ষতের জ্বালা থেকে মুক্ত ক'রে মানুষের মুখে হাসি ফুটাবেন, জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তাদের আত্মমর্যাদা-বোধ জাগিয়ে তুলবেন। কিন্তু খালি পেটে কিছুই হয় না। তাই তাদের মুখে তুলে দিতে হবে প্রথমে অন্ন, তার সঙ্গে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যবহারিক বিদ্যা শেখাতে হবে; তারপর শেখাতে হবে ধর্ম। কিন্তু এ করতে চাই প্রথম লোকবল, দ্বিতীয় পয়সা। তিনি ছুটে গেলেন দেশের বড় বড় লোকেদের কাছে। কিন্তু কেউ তাঁকে সাহায্য করল না। তিনি স্থির করলেন পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে টাকা উপার্জন ক'রে ভারতের দুঃখ-দারিদ্রপীড়িত মানুষের সেবা করবেন। স্বামীজী তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : '···আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার ক'রব, ক'রে দেশে যাব and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life.'

চিকাগো ধর্মমহাসভার পর স্বামীজীকে

ওখানকার জনসাধারণ সম্মানের উচ্চ শিখরে উঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি গরীব ভারতবাসীর কথা ভুলে গেলেন না। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করলে এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। স্বামীজীর গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ধনী একব্যক্তি একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। তিনি এক সুসজ্জিত কক্ষে স্বামীজীর শয়নের ব্যবস্থা করলেন। তিনি শয়ন করতে গেলেন। ভারতবর্ষের দুঃখ-ক্লিষ্ট মানুষের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি আর শয়ন করতে পারলেন না। কান্নায় তাঁর মাথার বালিশ ভিজে গেল। ঘরের বাইরে এসে বাতায়নের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন ভারতের কথা। ক্ষুধার্ত মানুষের পেটের জ্বালা তাঁকে তুষানলের ন্যায় দগ্ধ করতে লাগল। তিনি যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে করুণস্বরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে বেরিয়ে এল আর্তনাদ : 'হা আমার দুঃখিনী মাতৃভূমি! তোমার এত দুর্দশা, আর আমার অদৃষ্টে এই সুখভোগ! আমি এ সুখসৌভাগ্য আর নামযশ নিয়ে কি করবো!' যেখানে তাঁর হাজার হাজার ভারতীয় ভাইবোনেরা অনাহারে মরছে, সেখানে এই সুসজ্জিত কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন তিনি কি ক'রে করবেন! দুঃখক্লিষ্ট মানুষের যন্ত্রণা যে তাঁরই অন্তরের যন্ত্রণা! মানুষের এই দুঃখকষ্ট কি ক'রে দূর করবেন এই ছিল দিবারাত্র তাঁর একমাত্র চিন্তা।

স্বামীজী নিজে বিদেশে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন; আর বিদেশ থেকে জ্বলন্ত ভাষায় উৎসাহপূর্ণ চিঠির মাধ্যমে গুরু-ভাইদের ও স্বদেশবাসীকে সেবাব্রতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : "পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।" শিষ্য আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :...'ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না, তারা শিক্ষা পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদা-সর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হ'লে সে দুরাত্মা।' এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর সুগঠিত শরীর ভাঙতে লাগল। অনিদ্রা ও নানারকম রোগে তিনি আক্রান্ত হলেন। ভগ্ন শরীর নিয়ে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। ফিরে এসেই বিশ্রাম না নিয়ে মানুষকে দাসসুলভ মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি দিয়ে আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। আর বন্যা-প্লেগ-দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষদের সেবা করতে চারদিকে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের। স্বামীজীর শিষ্য বিরজানন্দ চাইছিলেন সাধনভজনে ডুবে থাকতে। স্বামীজী তাঁকে তিরস্কার ক'রে বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, 'দেখ, নিজের মুক্তি যদি খুঁজিস তো নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবি, আর অপরের মুক্তির জন্য যদি কাজ করিস তো এখনই মুক্ত হয়ে যাবি।' এইভাবে কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে স্বামীজী মঠে ফিরে এলেন। কিন্তু তবুও বিশ্রাম নেই, অবিরাম কর্ম ক'রে চলেছেন পরদুঃখ নিবারণের জন্য।

বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়িতে আছেন। একদিন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করছেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমাজের এক বিভীষিকাপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত ক'রে স্বামীজীর চোখের সামনে তুলে ধরলেন। স্বামীজী বেদান্তবিচারের কথা ভুলে গিয়ে নির্বাক্ হয়ে রইলেন। জগতের নিদারুণ দুঃখক্লিষ্ট মানুষের কথা শুনে তাঁর হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হ'ল। তাঁর চোখে শত ধারায় অশ্রু এসে পড়ল। হৃদয়ের ভাব গোপন করার জন্য তিনি ঘরের বাইরে চলে গেলেন। স্বামীজী চলে গেলে গিরিশবাবু শরচ্চন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে বললেন: 'দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!' এই বলরামবাবুর বাড়িতেই আর একটি ঘটনা। স্বামী তুরীয়ানন্দের ভাষায়: "আমি স্বামীজীকে দেখতে এসে দেখি, তিনি এত গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বারাণ্ডায় পায়চারি করছেন যে, আমার আগমন টেরই পেলেন না। পাছে তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ে এই ভয়ে আমি চুপ ক'রে রইলাম। একটু পরে স্বামীজী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মীরাবাঈ-এর একটি বিখ্যাত গান গুনগুন ক'রে গাইতে লাগলেন। পরে নিজের হাত দুখানিতে মুখ লুকিয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে বিষাদভাবে গাইলেন, 'দরদ না জানে কোঈ!' তাঁর দুঃখময় সুর ও নৈরাশ্য যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল ও সবই বিষাদে ভরে উঠছিল। 'ঘায়েল কী খত ঘায়ল জানে, ঔর না জানে কোঈ' —এই বিষাদময় গানে যেন সমস্ত আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হচ্ছিল। তাঁর স্বর আমার হৃদয়ে যেন তীরের মতো বিঁধছিল এবং আমারও চোখে জল এসেছিল। স্বামীজীর দুঃখের কারণ বুঝতে না পেরে আমি বড়ই বিব্রত বোধ করছিলাম। একটু পরেই বুঝতে পারলাম—জগতের দুঃখিত নিপীড়িতদের দুঃখের প্রতি এক অপার সহানুভূতিতেই তাঁর এই ব্যথা!"

দিনরাত মানুষের সঙ্গে অনর্গল কথা ব'লে ব'লে স্বামীজী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা বিশ্রাম নিতে বলেন, গুরুভাইরা জোর করেন একটু বিশ্রাম নেওয়াতে, কিন্তু পারেন না। অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বামীজী ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রামের জন্য আলমোড়া যান। স্বামীজী ছিলেন আজন্ম যোগী, হিমালয়ের নির্জনতার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। তাই হিমালয়ের নির্জনতা পেয়ে তিনি চাইলেন ধ্যানে লীন হয়ে থাকতে কিন্তু মানুষের দুঃখ-যাতনা তাঁর মনকে আবার সমতলভূমিতে টানতে লাগলো। মুর্শিদাবাদে মহুলা গ্রামে দারুণ দুর্ভিক্ষের খবর পেলেন স্বামী অখণ্ডানন্দের এক চিঠিতে। সেখানে স্বামী অখণ্ডানন্দ জীবন পণ ক'রে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করছেন জেনে তিনি খুসী হয়ে উৎসাহপূর্ণ একটি চিঠি তাঁকে লেখেন। সেই চিঠির শেষে লিখছেন: 'আমি শীঘ্রই Plain-এ (সমতলে) নামছি। বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে ম'রব, এখানে মেয়েমানুষের মতো বসে থাকা কি আমার সাজে?' দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুঃখই তাঁকে আবার সমতলভূমিতে নেমে আসার সংকল্প নিতে বাধ্য করে। যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ আসতে পারেননি অসুস্থতার জন্য। কিন্তু ১৮৯৮ সালে এপ্রিল মাসে কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব যখন হয় তখন স্বামীজী দার্জিলিং-এ ছিলেন। সেসময় কিন্তু আর থাকতে পারেননি, ছুটে এসেছিলেন কলকাতায় জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু টাকার অভাব। একজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'স্বামীজী, টাকা কোথায় পাওয়া

যাবে?' বজ্রনিনাদে স্বামীজী উত্তর দিলেন: 'কেন, যদি প্রয়োজন হয় নতুন কেনা মঠের জমিটমি বিক্রি ক'রে দেব।' এত পরিশ্রমে কেনা মঠের জমি ও বাড়ি মানুষের দুঃখ নিবারণে বিক্রি ক'রে দেবেন বলতে মুহূর্তের জন্য দ্বিধাবোধ করলেন না। সৌভাগ্যবশতঃ শেষ পর্যন্ত মঠের জমি ও বাড়ি বিক্রি করতে হয়নি, জনসাধারণের কাছ থেকে সাহায্য এসেছিল। এর পরেও ১৮৯৯ সালে কলকাতায় দ্বিতীয়বার প্লেগ হ'লে স্বামীজী আবার ঐ-কথা বলেন। স্বামী সদানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতিকে নিয়ে স্বামীজী সেবাকার্য আরম্ভ করেন। কাজের বিস্তার হচ্ছিল, কিন্তু অর্থের সংস্থান না থাকায় স্বামীজী চিন্তিত হয়ে পড়েন। মানুষের চরম দুর্দশা দেখে সেবাকার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নতুন তৈরী মঠ-বাড়ি বিক্রি ক'রে দিতে চাইলেন। কিন্তু সংঘজননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী অনুমোদন না করায় স্বামীজীর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি।

[ক্রমশঃ]

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সামগ্রিকভাবেই বাংলাসাহিত্যের উপর বিস্তৃত। এই দুই মনীষী বাংলার সমাজ-জীবনকে একদিন বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিলেন—সে আলোড়নে বাঙালীর চিন্তাজগতে প্রভূত পরিবর্তন ঘটে গেছে। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজ-জীবনের অংশরূপেই তার দ্বারা প্রভাবিত নিঃসন্দেহে। সাহিত্য যেখানে সমাজ-জীবনের দর্পণ, সেখানে সেই দর্পণে উভয়ের চিন্তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। নাটকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সেই প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ ঋণকে আমরা যত সহজে সনাক্ত করতে পারি, অপ্রত্যক্ষ ঋণের হিসাব-নিকাশ ততখানি সহজে করা সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ, সহজ ও পরিচিত জীবন থেকে চিত্রকল্পের ব্যবহার নাটকীয়তা সৃষ্টির দিক থেকে বিশেষ উপযোগী উপাদান। নাট্যকারেরা এ সম্পর্কে উদাসীন অথবা অমনোযোগী ছিলেন, একথা মনে করার কারণ নেই। তাঁদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ বা চিন্তার প্রতিফলন কিংবা বিবেকানন্দের গদ্যরীতির প্রেরণা তাঁদের সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত নাটকগুলিতে বিবেকানন্দের জলন্ত দেশপ্রেমের বাণী ও নিষ্কাম-কর্মযোগের আদর্শের ছায়াপাত অবশ্যই ঘটেছে। বিদেশে স্বামীজীর সাফল্য আমাদের আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা নাট্যকারের চেতনায় আত্মপ্রকাশ করেছিল—একথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এগুলি যত সহজে উপলব্ধি করা যায়, তত সহজে প্রমাণ করা যায় না। তাই আমার প্রবন্ধে আমি কেবল প্রত্যক্ষ প্রভাবের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। আশা করছি, তরুণ গবেষকরা এ বিষয়ে নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করবেন এবং আমাদের সামনে পূর্ণতর চিত্র উপস্থিত করতে পারবেন।

বাংলা নাটকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে একটা কথা জানিয়ে রাখছি। স্বল্পপরিসরে উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, তাই অনেক-

ক্ষেত্রেই শুধু প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করেছি—কৌতূহলী শ্রোতা ইচ্ছা করলে নাটকের সেই সব অংশ পাঠ করে নিতে পারবেন। তা ছাড়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থে যে নাটকগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছি বর্তমান রচনায় সে সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলব।

বাংলা নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর জীবদ্দশাতেই এবং সে নাটক তিনি স্বয়ং দেখেছিলেন। সপার্ষদ কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ রামকৃষ্ণ-ভাবস্পর্শে নতুন জন্মলাভ করেছে। ব্রাহ্ম-সমাজের চিন্তাধারা ক্রমশঃ রামকৃষ্ণের ধর্মমতের উদারতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে—তারই ফলশ্রুতি 'নববিধান' এবং 'নববৃন্দাবন অর্থাৎ ধর্মসমন্বয় নাটক' যা পরবর্তী কালে শুধু 'নববৃন্দাবন' নামেই পরিচিত। মূলনাটকের নামকরণে 'ধর্ম-সমন্বয়' কথাটি যোগ করে নাটকের নিহিত বক্তব্য আভাসিত করা হয়েছে। নাট্যকার ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বা চিরঞ্জীব শর্মা কেশব-চন্দ্রের অনুগামীরূপেই রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এবং রামকৃষ্ণ-ভাবধারাকে গভীরভাবে অন্তরে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধিতা ছিল না। ফলে উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় নাটকটি রচিত ও নববিধান সম্প্রদায় কর্তৃক কয়েকবার অভিনীত হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের অভিনয় ছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্রনাথ) অভিনয় এই নাটকের পক্ষে স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৮৩ সালের ২৫ জানুয়ারি সমাজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে নাটকটির অভিনয়-আসরে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন।

নাটকটির মূল বক্তব্য ধর্মসমন্বয়—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার আংশিক প্রকাশ। নববিধান সমাজ শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবদ্-ভাবনাকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন নাট্যসংলাপে তার কিছু পরিচয় মেলে। নাট্যান্তর্গত একটি চরিত্রের সংলাপঃ

'ওদের মতের সঙ্গে শাস্ত্রের অনেক ঐক্য দেখতে পাই। ওরা দেবদেবীর যেরূপ অর্থ বার করেছে সেগুলো ঠিক। এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই এক একটি গুণকে দেবদেবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বাইরের মূর্তি ও কিছু নয়; ভেতরের ভাবই যথার্থ।'

নাটকে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক ধর্মবিতর্ক থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাতে একটি চরিত্রের মধ্যস্থতা ও মীমাংসায় শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই:

'বিবাদের তো কোন কারণ আমি দেখতে পাই না। আপনারা আমরা সেই একপিতার সন্তান। বাইরের খোসাটা ফেলে দিন, দেখবেন ভেতরের শাঁস একরকম। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রক্ত যেমন এক, পিতৃভক্তি, সন্তানস্নেহ, দয়ামায়া যেমন এক তেমনি আমাদের ধর্মও এক। …আসল বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই।'

ব্রহ্মবাণী বলে যে সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে চিরঞ্জীব শর্মার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আলেখ্যই ফুটে উঠেছে :

'দেখরে হৃদয়ঘরে কি মজার সংবাদের তার
ক্ষ্যাপা মন আমার
করে ভিতরে তার গতিবিধি স্বর্গধামের সমাচার।
প্রেমবিজলীযোগে ধ্যানসমাধিযোগে
কত তত্ত্বকথা আসে সেথা শুভসংযোগে
আহা কোথায় গোলোক কোথায় ভূলোক
পলকে হয় একাকার।'

নববিধানীদের পক্ষ থেকে যেমন রচিত হয়েছিল 'নববৃন্দাবন' নাটক, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের পক্ষ থেকেও তেমনি রচিত হয়েছিল 'লীলামৃত' নাটক। নাট্যকার ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র

দত্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রামকৃষ্ণ-লীলাপ্রচার। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি, যোগোদ্যানে কল্পতরু উৎসবে। পরে ২৩ জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটারে পুনরভিনয়ের কথা জানা যায়। তিনটি অভিনয়ই প্রযোজনা করেছিলেন 'পটলডাঙ্গা নামকীর্তন সমিতি' নামে একটি সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়। নাটকটির বিশেষত্ব হল, রামকৃষ্ণলীলা মুখ্য বিষয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় প্রদর্শিত হয়নি—সর্বত্র তিনি নেপথ্যে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে তাঁর বিচিত্র ভাবগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে—একমাত্র শেষ-দৃশ্যে ফুলমালাশোভিত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রতিকৃতি মঞ্চে উপস্থিত করা হয়েছিল।

রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে পূর্ণ আস্থাশীল। তিনি বিশ্বাস করতেন: 'ত্রেতায় রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ/এবার একই দেহে যুগল নামে জীব উদ্ধারিতে দীনের বেশে' শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। রামচন্দ্র একবার গিরিশ-চন্দ্রের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন, নাটকের একটি গানে সেই পরিচয়টি পরিস্ফুট:

'(এসেছে) প্রেমে মাতোয়ারা এক নবীন
গোসাঁই
একাধারে বিরাজ করে অদ্বৈত গৌর নিতাই।'

প্রস্তাবনা-অংশে গোলোকের দৃশ্যের উপস্থাপনা ও বিষ্ণুর অবতাররূপে মর্ত্যভূমিতে আগমনের বার্তা জানিয়ে 'লীলামৃত' নাটক শুরু হয়েছে। রামচন্দ্রের কাহিনী ও সংলাপ এবং কালীপদ ঘোষ রচিত গানগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র পরিচয় ও ভাবধারা পরিস্ফুট।

কিন্তু 'লীলামৃত' পরিবেশনার অনেক আগেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব ঘটেছে গিরিশচন্দ্রের মাধ্যমে।

গিরিশচন্দ্র পূর্বে দু'বার শ্রীরামকৃষ্ণকে চোখে দেখলেও উভয়ের মধ্যে প্রথম পরিচয় হয় ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ অর্থাৎ স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম আগমন ও 'চৈতন্যলীলা' দেখার দিন। অবশ্য গিরিশের দিক থেকে সেদিনের পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি, কারণ তিনি সেদিন অসুস্থ থাকায় অভিনয় আরম্ভ হওয়ার পরেই বাড়ি চলে যান। সেদিনের অভিনয়-পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ রামকৃষ্ণ-বিনোদিনী সংবাদ শুনেছেন পরে এবং তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে একটি ধারণা জন্ম নিয়েছে যে, ইনি পতিতপাবন—পতিতপতিতার উদ্ধারকল্পে থিয়েটার দেখার ছলে এসেছিলেন রঙ্গমঞ্চে এবং এক অস্পৃশ্যা বারবনিতাকে করুণায় অভিষিক্ত করে আপন নামের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। এই ধারণা তাঁর দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে যখন প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন, 'আমি যে পাপী, আমার উদ্ধার নেই'। উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'হ্যাঁরে তুই কি এতই পাপ করেছিস যে স্বয়ং পতিতপাবনও তোকে উদ্ধার করতে পারবে না?' সেইদিনই গিরিশের স্থির বিশ্বাস জন্মেছে, শ্রীরামকৃষ্ণই পতিতপাবন।

এই পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের 'চৈতন্যলীলা' দর্শনের প্রায় চারমাস পরে যখন গিরিশচন্দ্র 'নিমাই-সন্ন্যাস' লিখেছেন, তখন তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই পতিতপাবন মূর্তিই আভাসিত হয়েছে। এই নাটকের প্রস্তাবনা-অংশে নট ও নটীর সম্মিলিত গানে গিরিশ বলেছেন:

'ডাকে হে পতিত তোমায়/পতিত-পাবন পুরাও সাধ
দীনের ঠাকুর কোথায় গৌরচাঁদ…
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে
দাও হে প্রেমসুধার স্বাদ।'

কিন্তু এই সংশয়টুকুও ঘুচে গেল একবছরের মধ্যে। ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসের প্রথমে যখন গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' মঞ্চস্থ হল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ রোগশয্যায়। 'বিল্বমঙ্গল' শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশে, তাঁরই নির্দেশিত কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যে কাহিনী-নির্দেশ দিয়েছিলেন গিরিশ তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের জীবনকে—যে জীবনের কেন্দ্রে তখন তিনি স্থাপন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

প্রবল ঈশ্বরানুভূতি, সাকার-নিরাকার-সমন্বয়-সাধন, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যানুভূতি প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ভাব ও চিন্তার সমন্বয় ঘটেছে 'বিল্বমঙ্গলে'। নাটকটির ইংরেজী তর্জমার প্রকাশক আহ্বান করে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যেই সংক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণভাবে নাটকের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে :

'It is the first drama—a drama with a mission and the mission is the one with which the Ramkrishna Mission, established long after its composition, is associated.'

ভক্তমাল থেকে 'বিল্বমঙ্গলে'র কাহিনী সংগৃহীত হলেও এ নাটকে গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব কল্পনার অভাব নেই। এই মৌলিকতার একটি নিদর্শন পাগলিনীচরিত্রের পরিকল্পনা চরিত্রটি গঠনের পশ্চাতে এক উন্মাদিনী নারীর বাস্তব প্রেরণা থাকলেও ভাবকেন্দ্রে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নারীচরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পনা গিরিশের পক্ষে আদৌ অযৌক্তিক বা অসঙ্গত হয়নি। নাটক-রচনার কিছুকাল আগে পানিহাটির উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যদর্শনে অভিভূত গিরিশচন্দ্র তাঁকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আমি নিজেও বলতে পারি না পুরুষ কি প্রকৃতি।' নাটকে দেখা যায়, যে-বিল্বমঙ্গল বারবনিতা চিন্তামণির সন্ধানে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে পাগলিনীই সত্যকার চিন্তামণির সন্ধান দিয়েছে :

'চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী
বরাভয়করা ভক্তমনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী···
কভু রজতভূধর···
কভু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা···
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি···
কভু একাকার
নাহি আর কালের গমন ;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়
নাহি—নাহি ফুরাইল বাক।'

সাকার-নিরাকারের ব্যবধানটুকু ঘুচে গেছে এই পরিচয়দানের মধ্যে।

তীব্র ঈশ্বরানুভূতি ও অন্বেষণের আর্তি পাগলিনীর আচরণ ও সংলাপের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পাগলিনী খুঁজে পেয়েছে একই উপাস্যকে। বহুস্বামিত্বের উপমা এবং সেই বহুর মধ্যে একেরই অস্তিত্ব ঘোষণায় শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনার রূপটি সুন্দর-ভাবে ফুটে উঠেছে।

পাগলিনী যে চিন্তামণির সন্ধান দিয়েছে সেই চিন্তামণিকেই আমরা পেলাম 'কালাপাহাড়' নাটকের চিন্তামণি চরিত্রে। 'বিল্বমঙ্গল' যেমন গিরিশের জীবনের আলেখ্য 'কালাপাহাড়'ও তেমনি তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি। 'কালাপাহাড়ে'র চিন্তামণি শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রতিরূপ।

'বিল্বমঙ্গল' থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা

গিরিশের নাটকে ছড়িয়ে পড়েছে—বাংলা নাট্যসাহিত্যে তার প্রভাবও হয়েছে সুদূরপ্রসারী। ঈশ্বরানুভূতির তীব্রতা এবং সাধক ও যোগী শ্রীরামকৃষ্ণকে আরও স্পষ্টভাবে পেলাম 'পূর্ণচন্দ্র' ও 'শঙ্করাচার্য' নাটকে। গোরক্ষনাথের জীবন অবলম্বনে রচিত 'পূর্ণচন্দ্রে' সাধক গোরক্ষনাথের মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যেরই ফল। গোরক্ষনাথের মুখে শুনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি :

'পরীক্ষায় হয় পার
সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।
যার অঙ্গে বিঁধে নাই অঙ্গনা নয়ন
কাঞ্চনে টলে না যার মন
সুযোগে আসক্তি যারে টলাইতে নারে
সেই নরোত্তম।'

কামিনীকাঞ্চনে আসক্তিহীন এই নরোত্তমের সাক্ষাৎ গিরিশচন্দ্র পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে কোনো কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়নি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন 'শঙ্করাচার্য' নাটক—উৎসর্গ করেছিলেন লোকান্তরিত বন্ধু কালীপদ ঘোষকে। উৎসর্গপত্রে নাট্যকার লিখেছেন :

'ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে ; কিন্তু আমার আক্ষেপ, তুমি নরদেহে আমার শঙ্করাচার্য দেখলে না।...'

মূর্তিমান বেদান্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা দর্শন করেছিলেন তাঁরা গিরিশের 'শঙ্করাচার্যে' তাঁকে নতুন করে দর্শন করার অবশ্য সুযোগ পেয়েছেন, কারণ নাটকটিতে শঙ্করাচার্যের অবয়বে দক্ষিণেশ্বরের মূর্তিমান বেদান্তই আত্মপ্রকাশ করেছিল। শঙ্করাচার্য বা বেদান্তদর্শনের মত নীরস বিষয় নিয়ে সর্বসাধারণের উপযোগী নাটক রচনা যে সহজসাধ্য ছিল না সে কথা তখনকার থিয়েটারের প্রযোজকরা জানতেন বলেই এ নাটকের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল কিন্তু 'শঙ্করাচার্য' ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক থেকেও যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। বলা বাহুল্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহচর্যই গিরিশচন্দ্রের সাফল্যের মূলে। নাটকটির অভিনয় দেখে সেকালের এক পণ্ডিত মন্তব্য করেছিলেন, 'গিরিশবাবু বেদান্তের সূক্ষ্ম মর্ম জলের ন্যায় বুঝাইয়া দিলেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত, তাহার আর সন্দেহ নাই।'

কিন্তু 'বেদান্তের সূক্ষ্ম মর্ম জলের ন্যায়' গিরিশকে বুঝিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সংস্পর্শ বেদান্তের সহজ ব্যাখ্যার কি পরিমাণ অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে চাই না—'কথামৃত' তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। তবু গিরিশের হাতে তার রূপটিকে দেখাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দি। নাটকে মহামায়ার উপদেশ 'বিদ্যামায়ার সঙ্ঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংস না হলে জীবের চৈতন্য হয় না।' এই বক্তব্যটি পরিস্ফুট করতে একটি গানে গিরিশ গ্রহণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বহুকথিত দুটি কাঁটার উপমা :

'পরলে পরে সাধের বাঁধন খুললে খোলে না
কাঁটা দিয়ে কাঁটাতোলা—কথায় চলে না।'

সাকার-নিরাকার-বিচারেও শঙ্করাচার্যের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা। শিষ্য শান্তিরাম প্রশ্ন করেছে : 'এই প্রভু বলেন—অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্মই বিদ্যমান—আর সকলই মায়া। আর দেবদেবী, নোড়ানুড়ি যা যেখানে দেখেন অমনি ছন্দোবন্ধে স্তব রচনা করেন...এর কোনটা ঠিক কোনটা অঠিক আমি বুঝব বলুন!'

শঙ্করাচার্যের উত্তর : 'যতদিন দেহবুদ্ধি রহে
পূজাস্তব যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন।
মুক্তআত্মাপ্রভৃতি রহেন পূজারত
যতদিন দেহবুদ্ধি রয়।...

মুমুক্ষু যে জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন
মুক্তিপথে হয় অগ্রসর···
ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে
উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি
দেবদেবী উপাসনা তেঁই প্রয়োজন।'

শঙ্করাচার্য-চরিত্রে গিরিশচন্দ্র সম্মিলিত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে। শিষ্যের একটি প্রশ্নের উত্তরে শঙ্করাচার্য প্রচারের যে সার্থকতার কথা বলেছেন তাতে শুনতে পাই বিবেকানন্দের কণ্ঠ :

'হীনবুদ্ধি নরে বিদ্যাদম্ভ ভার
হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধনেরে।
অহঙ্কারে ভাবে ভ্রান্ত অন্য সম্প্রদায়
সত্যউপলব্ধি মাত্র কেবল তাহার।
অস্তি ভাতি প্রিয়—এই মহাবাক্য-ত্রয়
করিতে স্থাপন মম তর্ক প্রয়োজন
ইহার অধিক নাহি শাস্ত্র শিক্ষা আর।'*

[ক্রমশঃ]

* ৬ই এপ্রিল ১৯৮০ অপরাহ্নে, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।

মহাভূত মহাতীর্থ

শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অপ্-মহাভূতলিঙ্গম্

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বেশী আকর্ষণ কিন্তু অপ্-মহালিঙ্গম্-মন্দিরের প্রতি। কেননা এ মন্দির ঐতিহাসিক তথ্যের এক অন্যতম উৎস, আর স্থাপত্যের এক অপরূপ নিদর্শন। মন্দিরটির অবস্থান কাবেরী নদীর এক দ্বীপে।

ব্রহ্মগিরি-উৎস থেকে বঙ্গোপসাগর-মোহনা পর্যন্ত চারশো পঁচাত্তর মাইল যাত্রাপথের মধ্যে কাবেরী তিনটি মনোরম দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। তিনটিই পুণ্যভূমি, তীর্থক্ষেত্র। প্রথম দ্বীপ আদিরঙ্গম্,—আজকের শ্রীরঙ্গপত্তনম্। দ্বিতীয় দ্বীপ মধ্যরঙ্গম্,—বর্তমান নাম শিবসমুদ্রম্। আর তৃতীয় দ্বীপ 'শ্রীরঙ্গম্',—সেখানেই আছেন অপ্-মহালিঙ্গম্। শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপে যেতে হ'লে মাদ্রাজ-মাদুরাই-রামেশ্বরম্ লাইনের 'তিরুচিরাপল্লী' স্টেশনে নামতে হয়। মাদ্রাজের এগ্‌মোর্ রেল-স্টেশন থেকে তিরুচিরাপল্লীর দূরত্ব ৪০১ কিলো-মিটার। তিরুচিরাপল্লীর সঙ্গে চিদম্বরম্, তাঞ্জোর, পণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ, মাদুরাই প্রভৃতি স্থানের বাস-যোগাযোগও রয়েছে। তামিলনাড়ু স্টেট্ ট্রান্সপোর্টের গাড়ী সুদূর কন্যাকুমারী, ত্রিবান্দ্রাম্ থেকেও এ শহরে যাতায়াত করে দক্ষিণদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগর তিরুচিরাপল্লীতে বাসস্থানের অভাব নেই,—প্রচুর হোটেল রয়েছে, ধর্মশালা-দেবস্থানম্ও আছে। পরিচ্ছন্ন সুপ্রাচীন জনপদ, কাবেরীর দক্ষিণপারে এর অবস্থান। উত্তরপারে শ্রীরঙ্গম্। শ্রীরঙ্গ-ভূখণ্ডের উত্তরে যে জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার নাম 'কোল্লিডম্' —পৌরাণিক মানুষেরা বলতেন 'উদয়পুণ্য-কাবেরী'। নাম শুনলেই তখন নদীর গতিপ্রকৃতি বোঝা যেত। পুণ্যকাবেরী থেকে কোল্লিডম্ উদিত হয়েছে তিরুচিরাপল্লীর শহরের নয় মাইল পশ্চিমে। মূলধারা আর মুক্তধারার মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে সতেরো মাইল দীর্ঘ দ্বীপ শ্রীরঙ্গম্।

শ্রীরঙ্গম্‌দ্বীপে মাইল দেড়েকের ব্যবধানে দু'টি অনন্যসাধারণ মন্দির আছে। একটি বিষ্ণুমন্দির—রঙ্গনাথের, অপরটি শিবমন্দির—জম্বুনাথের। জম্বুনাথই হচ্ছেন অপ্‌-মহাভূতলিঙ্গম্‌। রেলস্টেশন থেকে অপ্‌-মহাভূতলিঙ্গমের মন্দির মাত্র সাত কিলোমিটার। অহরহ বাস যাতায়াত করছে। তবে দল ভারী, সময় কম, অথবা সঙ্গে শিশুরা থাকলে ট্যাক্সি নেওয়াই সুবিধা। ট্যাক্সিচালক তিরুচিরাপল্লীর গুহামন্দির, শৈলদুর্গ, গণেশমন্দির, রঙ্গনাথজীর মন্দির, জম্বুনাথজীর মন্দির সব কিছু মাত্র একটি বেলার মধ্যে দেখিয়ে আবার যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারেন।

জম্বুনাথ বা জম্বুকেশ্বর স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। কয়েক শত বছরের প্রাচীন এক জামগাছের নিচে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর শরীর থেকে অনবরত জল নির্গত হচ্ছে। লিঙ্গমূর্তি ও জামগাছটিকে ঘিরে যে ছোট্ট গর্ভমন্দির নির্মিত হয়েছে, তার মেঝের ওপর সর্বদা জলপ্রবাহ। ভূতেশ্বরকে দর্শন করতে গেলে পায়ের পাতা জলে ডুবে যায়। একসঙ্গে ভীড় ক'রে দেবদর্শন করা যায় না। যাত্রীরা তাই সঙ্কীর্ণ পথ ধ'রে সারিবদ্ধ হয়ে একে একে গর্ভমন্দিরের দ্বারে আসেন, যুক্তকরে দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে অন্য পথ দিয়ে ঘুরে বাইরে বেরোন।

স্থানীয় লোকেরা অপ্‌-মহাভূতলিঙ্গমের মন্দিরকে বলেন 'তিরুভানৈক্কাভু', 'তিরুভানৈকোবিল' বা 'তিরুভানৈকাভাল'। তিরু অর্থ শ্রী, আনৈ মানে হাতী, কাভু বা কোবিল হ'ল মন্দির, আর তামিল শব্দ কাভাল-এর মানে কুঞ্জবন। অর্থাৎ এ স্থান হচ্ছে শ্রীহস্তীর কুঞ্জবন। এ মন্দির শ্রীহস্তীর পবিত্র দেবালয়। পুরাকালে পুণ্যভূমি শ্রীরঙ্গমের অরণ্যে একটি শ্বেতহস্তী বাস করত। তার বিশাল বিশাল চারটি বাঁকানো দাঁত ছিল। চার দাঁতে জঙ্গল সরিয়ে সরিয়ে হাতীটি রঙ্গদ্বীপের সর্বত্র বিচরণ ক'রে ফিরত। এই সাদা হাতীটির প্রধান কাজ ছিল প্রত্যহ জম্বুকেশ্বরকে দর্শন করা। বিজন বনের যে-কোন প্রান্তেই তার রাত্রিবাস ঘ'টে থাকুক না কেন পুব আকাশে সূর্যের রক্তিমাভা দেখা দিলেই তাকে কাবেরী নদীর দিকে ছুটতে দেখা যেত। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান সেরে হাতীটি শুঁড়ের মধ্যে পবিত্র নদীজল সংগ্রহ করত। তারপর জম্বুনাথের সামনে উপস্থিত হয়ে সেই জলে তাঁকে স্নান করাতো। অরণ্যভূমির পুষ্প চয়ন ক'রে তাঁকে অর্ঘ্য দিত, প্রণাম জানাতো।

আবার এই জামগাছটিতে বাস করত এক মাকড়সা। সেও ছিল অপ্‌-মহাভূতলিঙ্গমের পরমভক্ত। জামগাছের ঝরাপাতায় লিঙ্গশরীর আচ্ছন্ন হ'ত ব'লে তার মনে খুব কষ্ট হ'ত। সেইজন্য মাকড়সাটি দিনরাত এ ডাল থেকে সে ডালে ঘুরে সূক্ষ্মসূতোর জাল বুনে রাখতো। জালের চাঁদোয়ায় ঝরাপাতা আটকা পড়ত, আর তখন সে দু'চোখ ভ'রে জম্বুনাথকে দর্শন করত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অত বড় একটা জাল বোনার পরিশ্রম তাকে রোজই করতে হ'ত। কেননা সকাল বেলা স্বয়ম্ভুকে স্নান করাতে এসে সাদা হাতী শুঁড়ের জলের তোড়ে বোনা-জাল ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ফেলতো। একদিন বিরক্ত হয়ে মাকড়সাটি গুড়িগুড়ি হাতীর শুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর ভেতরে বসে মজা ক'রে তার নাকের নরম মাংসে কামড় মারতে লাগল। এদিকে কামড়ের যন্ত্রণায় হাতীটি ছটফট করতে লাগল, তার জীবনসংশয় উপস্থিত হ'ল। মৃতপ্রায় শ্বেতহস্তীকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করলেন তিরুচিরাপল্লী পর্বতের শৈবসাধু শারমমুনি। তিনি হাতী ও মাকড়সার বিরোধ মিটিয়ে দিলেন, নিজে জম্বুনাথের আরাধনায় মগ্ন হয়ে রইলেন। গহন অরণ্যের মধ্যে ধ্যানরত শারমমুনির যাতে কোন-

রকম বিপদ না ঘটে সেইজন্য কৃতজ্ঞ হাতীটি তাঁকে সর্বদা পাহারা দিত। মন্দিরমণ্ডপের স্তম্ভে এ-কাহিনীর ছবি উৎকীর্ণ করা রয়েছে।

শোনা যায়, শিবসেবাপুণ্যের ফলে হাতী ও মাকড়সা উভয়েই মনুষ্যজন্ম লাভ করেছিল। পরজন্মে হাতীটি হয়েছিল স্বনামধন্য শৈবকবি পুষ্পদন্ত, আর মাকড়সা তাঁরই ভক্তিমান পুত্র মাল্যবান। জম্বুকেশ্বরকে মাকড়সাটি এত ভালবাসতো যে আরও একবার মনুষ্যজন্ম নিয়ে সে এই হস্তীকুঞ্জে এসেছিল। প্রাণের ঠাকুর জম্বুকেশ্বরের মাথায় এবার আর জালের চাঁদোয়া নয় একেবারে স্থায়ী আচ্ছাদন গ'ড়ে দিয়েছিল। এ-মন্দির প্রতিষ্ঠার গৌরব সেই ক্ষুদ্র কীট মাকড়সার, —জন্মান্তরের মানুষ চোলরাজ কোচ্চেঙ্গানমের। শুভদেব ও কমলাবতীর সন্তান রাজা কোচ্চেঙ্গানন্ ছিলেন পরমশৈব, সুগায়ক ও সুকবি। তিনি প্রচুর শিবসঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে সবশুদ্ধ সত্তরটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই জম্বুকেশ্বর-মন্দির তাদের মধ্যে অন্যতম। চোলরাজ কোচ্চেঙ্গাননের জন্মকথা পেরিয়াপুরাণে (তামিল পুরাণ) বর্ণিত হয়েছে, তিরুভালানগাড়ুর তাম্রলিপিতে পাওয়া গেছে, এই মন্দিরের দেওয়ালেও লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রফলক নিরীক্ষণ ক'রে বলেছেন যে সম্ভবতঃ রাজা কোচ্চেঙ্গানন্ ছিলেন খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীর মানুষ। সুতরাং অপ্-মহালিঙ্গম্-মন্দিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর আভ্যন্তর অংশ অতি প্রাচীন।

প্রাচীন এই মন্দিরটির নানাস্থান থেকে তথ্য-জিজ্ঞাসু পণ্ডিতেরা ১৩১টারও বেশী শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন। চোল, হোয়সলা, পাণ্ড্য, নায়ক প্রভৃতি বংশের রাজারা যাঁরা যখন শ্রীরঙ্গম্ অধিকার করেছেন, জম্বুনাথকে প্রণাম জানাতে ভোলেন নি। দেবতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভূপতিরা সম্পত্তি দান করেছেন, তাঁকে অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়েছেন, নিজেদের আদেশ ও অনুশাসনের কথা মন্দিরগাত্রে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। এমনই এক শিলালিপিতে আছে জননাথ জম্বুনাথের জনতাদর্শনের কথা। প্রজাবৎসল রাজা রাজরাজ চোল তাঁর এক নির্দেশে বলেছেন যে 'ইষ্টদেবতা' জম্বুকেশ্বর বিশেষ বিশেষ তিথিতে পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে নগরপরিক্রমায় বেরুবেন। হরপার্বতীর বিজয়বিগ্রহ শোভাযাত্রা ক'রে ভক্তের দুয়ারে দুয়ারে দর্শন দেবেন। প্রত্যেক পরিক্রমাতিথির তিন দিন আগে থেকে পথে পথে ঢোল বাজিয়ে রাজঘোষক ঘোষণা ক'রে দেবে শোভাযাত্রার সময় আর যাত্রাপথের বিবরণ, যাতে শ্রীরঙ্গম্‌দ্বীপের প্রত্যেক অধিবাসী, এমন কি বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, অসমর্থ প্রজাও শয্যায় শয়ান থেকেই দেবদর্শনের সুযোগ লাভ করেন।

এখানে শিবের নাম যেমন জম্বুকেশ্বর, পার্বতীর নাম তেমনি অখিলাণ্ডেশ্বরী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনি জন্মদাত্রী, জগন্মাতা। মাতা অখিলাণ্ডেশ্বরী অষ্টম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এখানে ভয়ঙ্করীরূপেই পূজিতা হতেন। তখন এ-মন্দিরে তন্ত্রসাধনা হ'ত, এমন কি নরবলিপ্রথারও প্রচলন ছিল। আদি শঙ্করাচার্য শ্রীরঙ্গমে এসে দেবীর সন্তান-বৎসলারূপটি প্রচারে সচেষ্ট হন। তিনি দেবীর কর্ণে একটি চক্র স্থাপনা ক'রে তাঁর প্রতাপ প্রশমিত করেন।

জগন্মাতাও জম্বুনাথের পূজারিণী। লোক-চক্ষুর অন্তরালে থেকে প্রতিদিন শঙ্করামৃতীর্থে স্নান ক'রে তিনি জম্বুকেশ্বরের অর্চনা করেন। দেবীর তীর্থস্নান বা শিবার্চনা মর্ত্যবাসীর চোখে ধরা পড়ে না, সেইজন্য মন্দিরের পুরোহিত নিত্য সেই স্বর্গীয় দৃশ্যটি ভক্তজনের সামনে উপস্থাপিত করেন। প্রাথমিক পূজার পর প্রত্যহ বেলা

বারোটা নাগাদ পূজারী ব্রাহ্মণ শঙ্করালম্ তীর্থে স্নান ক'রে লাল পট্টবস্ত্র, নানা অলঙ্কার ও টুপির মত চোলদেশীয় মুকুট প'রে পার্বতীর বেশে সজ্জিত হন। পার্বতীরূপী পুরোহিত প্রথমে অখিলাণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে তাঁর অনুমতি নেন। তারপর মৃদঙ্গম্, নাগেশ্বরম্, ঢোল, বাঁশী প্রভৃতি নানারকম বাদ্য ও একটি বৃষকে সঙ্গে নিয়ে মহাসমারোহে মহামণ্ডপ প্রদক্ষিণ করেন। অন্য ব্রাহ্মণেরা পার্বতীর মাথায় বর্ণালী কাপড়ের বাহারী ছাতা ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে চলেন। ভক্তজনেরা ভীড় ক'রে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। প্রদক্ষিণের পর পূজারী ব্রাহ্মণ গর্ভমন্দিরে গিয়ে পার্বতীর অনুকরণে দ্বিতীয়বারের জন্য জম্বুনাথের পূজা করেন। পূজাশেষে পূজারী পার্বতী ও জীবন্ত নন্দীকে স্পর্শ করবার জন্য পুণ্যার্থীদের মধ্যে মহাধুম পড়ে যায়।

এ-মন্দিরে দিনে চারবার জম্বুনাথের পূজা। সে-পূজা দেখবার সৌভাগ্য থেকে দেবতারাও বঞ্চিত হ'তে চান না। অহরহ অলক্ষ্যে থেকে তাঁরা অপ্-মহালিঙ্গমের অর্চনা তো দর্শন করছেনই, আনুষ্ঠানিকভাবেও দেখতে আসতেন স্বয়ং নারায়ণ। ও-মন্দিরের রঙ্গনাথজীও বছরে একবার জম্বুনাথদর্শনে আসতেন। তৃতীয় প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে যে মনোরম নারকেলকুঞ্জটি রয়েছে সেখানে পুষ্করিণীর পাড়ে ছোট মন্দিরের মধ্যে নিজভক্তদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বিশ্রাম করতেন, চার প্রহরে চারবার শিবপূজা দেখে পরিতৃপ্ত হতেন। জম্বুনাথের সেবায়েতরাও পরম যত্নে বিশিষ্ট অতিথির আপ্যায়ন করতেন, উৎসব হ'ত, মেলা বসত। বেশ কিছুদিন হ'ল এই সুন্দর প্রথাটির বিলুপ্তি ঘটেছে। বৈষ্ণবরা শৈবদের সঙ্গে বিবাদ ক'রে শ্রীরঙ্গম্দ্বীপের মাঝখানে পাঁচিল গেঁথে নিজেদের এলাকা ভাগ ক'রে নিয়েছেন। ভোলানাথ শিবের কিন্তু এই সব ভাগাভাগির দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি তিরু-ভানৈকাভুর নিভৃত পরিবেশে পরম নিশ্চিন্তে বাস করছেন। শ্রীরঙ্গম্দ্বীপে এখন রঙ্গনাথজীরই রমরমা।

যদিও এ-দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির, তবু প্রত্যেক শিল্পসমালোচক এক বাক্যে জম্বুকেশ্বর-কোবিলেরই বেশী প্রশংসা করেছেন। ফার্গুসন, ব্রাউন, হ্যাভেল, হাবুলে প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থপতিবিদ্‌রা বারবার এ-মন্দিরে এসেছেন, বিভিন্ন অংশ জরিপ ক'রে দেখেছেন, কারুকার্যের ছবি তুলে নিয়ে গেছেন। মহামণ্ডপ ও পূর্বগোপুরমের গঠন দেখে তাঁরা চমৎকৃত হয়ে গেছেন। মাড়বর্মন সুন্দরপাণ্ড্য ও বীর সোমেশ্বরের গড়া এই পূর্ব-গোপুরমের বয়স অন্ততঃপক্ষে সাতশো বছর। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরি তোরণটির স্তরে স্তরে রয়েছে সুরুচি রাজপুরুষদের শিল্পবোধের পরিচয়। এ-মন্দিরের অন্যান্য গোপুরম্গুলিও প্রশংসনীয়। তবে কোনটিই উচ্চতায় খুব বেশী নয়। সর্বোচ্চটির উচ্চতা একশো ফুটের মত হবে।

অপ্-মহালিঙ্গমের আবাসটিও পঞ্চপ্রাকার-বেষ্টনী দিয়ে সুরক্ষিত। গর্ভমন্দির ঘিরে যে প্রাকার সেটাই সর্বপ্রাচীন, প্রায় সমচতুষ্কোণ, উচ্চতায় ত্রিশ ফুট। দ্বিতীয় প্রাকারের উচ্চতা আরও পাঁচ ফুট বেশী,—এ বেষ্টনীটি আয়তক্ষেত্রাকার। এর সঙ্গে পঁয়ষট্টি ফুট উঁচু একটি গোপুরম্ ও ভেতরে কতগুলি ছোট ছোট মণ্ডপ আছে। তৃতীয় প্রাকার-বেষ্টনীর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দু'টি মুখো-মুখি গোপুরম্। এক গোপুরম্ থেকে আর এক গোপুরম্ পর্যন্ত স্তম্ভযুক্ত প্রশস্ত দালান। দালানের ঠিক মাঝখান থেকে সোজা পথ চলে গেছে গর্ভমন্দিরে। এই বেষ্টনীর মধ্যেই তিরুক্কামাকোট্টম্ বা শ্রীমাতৃমন্দির। মাতা অখিলাণ্ডেশ্বরীর কোট্টমটি চোলরাজদের পরবর্তী সংযোজন। কোট্টমের সামনে সুন্দর একটি মণ্ডপ

রয়েছে। সেখানকার মূর্তিগুলি সৌন্দর্যে ভাস্কর্যে অতুলনীয়। বিশেষ ক'রে একপাদ ত্রিমূর্তিটি অবশ্যই দর্শনীয়। একপাদ শিবশরীরের একদিকে আবির্ভূত হয়েছেন ব্রহ্মা, অন্যদিকে বিষ্ণু। তিন দেবতার পাদমূলে তাঁদের তিনটি বাহন অপরূপ দেবতাদের ভাবব্যঞ্জনা।

তৃতীয় প্রাকারের বাইরে আর চতুর্থ প্রাকারের মধ্যে সেই পুণ্যতীর্থ শঙ্করালম্। প্রাকৃতিক ঝর্নার জলে পুষ্ট এই দীঘিটিকে দাক্ষিণাত্যবাসীরা কাবেরীর সমতুল্য পবিত্র জ্ঞান করেন। বিশাল দীঘির চারদিক ঘিরে নির্মিত হয়েছে সোপান, দালান। দালানে রয়েছে একশো বিয়াল্লিশটি কারুময় স্তম্ভ। দীঘির বিপরীতে হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ। অপরূপ এই মহামণ্ডপটির স্থাপত্যকলা। বিস্ময়কর এই সভাগৃহটির শিল্পসমতা! যদিও মণ্ডপটির নির্মাণকাজ কোন কারণে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, তবু যেটুকু তৈরি হয়েছে তার যেন তুলনা নেই। স্তম্ভের গঠন, খিলানের কারুকার্য, ঝুলন্ত ব্র্যাকেটের নির্মাণকৌশল বারবার দেখলেও মন তৃপ্ত হয় না। কত শত শিল্পী কত শত দিন ধরেই তো গড়েছিল এই মহামণ্ডপ, স্বাভাবিকভাবে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ছিল তাদের ব্যক্তিগত শিল্পবোধ, অথচ এর স্থাপত্যকর্মের মধ্যে কোথাও এতটুকু বেমানান অংশ চোখে পড়ে না। শত শত শিল্পী এক মন এক প্রাণ হয়ে একমাত্র জম্বুনাথকে স্মরণ ক'রে পাথর কেটেছিল, সারাটা মণ্ডপ জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল এক অখণ্ড পরিচ্ছন্ন অতুলনীয় ভাস্কর্য।

অপরূপ এই মণ্ডপটিকে রক্ষা করছে চতুর্থ প্রাকার-বেষ্টনী—এক দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীর। প্রায় দেড় মাইল তার পরিধি। দৈর্ঘ্যে ২৪৩৬ ফুট, প্রস্থে ১৪৯৩ ফুট, উচ্চতায় ৩৫ ফুট আর ঘনত্বে ছয় ফুট। এই প্রাচীরের বাইরে রয়েছে চারদিকে চারটি পথ। পথের ওপর পাশাপাশি গৃহস্থের ঘরবাড়ী। তারপর পঞ্চম ও শেষ প্রাকার। প্রাকারে সংলগ্ন এক পশ্চিমমুখী গোপুরম্।

দুর্গাকৃতি এই মন্দিরে বিপৎকালে আশ্রয়-লাভের জন্য দেশী বিদেশী অনেকেই ছুটে এসেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিচিনোপোলি যুদ্ধের সময় জম্বুকেশ্বর ফরাসীসৈন্যবাহিনীকে নিজের পক্ষপুটে আগলে রেখেছিলেন। দীর্ঘ দশ-বছর সংগ্রাম চালাবার পর তারা যখন ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করল, তখন তিনি মহীশূর সেনাদলকে আশ্রয় দিলেন। এখনও তাঁর দুই বাহু প্রসারিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে শ্রীরঙ্গম্‌বাসীর মনে পড়ে যায় জম্বুকেশ্বরকে, মানসিক দুঃখের দিনে তারা লুণ্ঠিত হয় তাঁরই শ্রীচরণে। [ক্রমশঃ]

ভাগ্যবান নটবর পাঁজা

শ্রীপরিমলকান্তি দাস

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র দ্বিতীয় ভাগে (১২শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) একটি নামের উল্লেখ আছে— 'নটবর পাঁজা'। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগ ও প্রারব্ধ সম্বন্ধে ভক্তদের বলছেন—'মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার, এসব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বললে, তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বললে, ঠাকুর, সে বড় হবে না ; আমি থাকতে পারি ; কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয় ত বনেতে একটা রাজ্য

হয়ে যাবে! আমার এখনও ভোগ আছে। নটবর পাঁজা যখন ছেলেমানুষ এই বাগানে গরু চরাত। তার কিন্তু অনেক ভোগ ছিল। তাই এখন রেড়ির কল ক'রে অনেক টাকা করেছে। আলমবাজারে রেড়ির কলের ব্যবসা খুব ফেঁদেছে।'

কে এই ভাগ্যবান নটবর পাঁজা? সেই সময় আলমবাজারে আরও অনেক রেড়ির তেলের ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপদেশ প্রসঙ্গে তাঁদের কথা উল্লেখ না ক'রে নটবর পাঁজার দৃষ্টান্ত দিলেন কেন? তবে কি তাঁর সঙ্গে পূর্ব-পরিচিতি ছিল? নটবর পাঁজার বাল্যকালের দৈন্যাবস্থার কথা তিনি জানতেন এবং সেইজন্যই এই দৃষ্টান্তের অবতারণা।

নটবর পাঁজা একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান আদিবাড়ী মেদিনীপুর জেলার দেব্ড়া ডাকখানার অন্তর্গত ধামতোড় গ্রামে। আনুমানিক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতার বিশেষ জমি-জায়গা না থাকায় সংসারের সচ্ছলতা কোন কালেই ছিল না। সেইজন্য পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষালাভ ক'রে নটবর কৃষিকাজে তাঁকে সাহায্য করতেন।

রানী রাসমণির কালীবাড়ী-প্রতিষ্ঠার কথা লোক-মারফত সেই সময় বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় ও গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়েছিল। প্রায় ৬০ বিঘা জমির উপর এত বড় কালীবাড়ীর কথা কেউ কোনদিন শোনে নি, দেখেও নি। সেইজন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহুলোক কাজের জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসেছিল। সংসারের অসচ্ছলতার জন্য নটবর পাঁজা বাল্যকালেই গ্রামের দাদা, কাকাদের সঙ্গে হাঁটাপথে রূপনারায়ণ নদ পার হয়ে ভাগ্যান্বেষণে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের জন্য জমি ক্রয়ের পর রানী রাসমণি প্রথমে মা ভবতারিণীর মন্দির তৈরী করার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। দীর্ঘ পোস্তা, বৃহৎ কালীমন্দির, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, চাঁদনী, শিবমন্দির ইত্যাদি তৈরীর জন্য এই সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞে প্রভূত অর্থবল ও লোকবল প্রয়োজন হয়েছিল এবং তিনি দক্ষতার সঙ্গে এই কাজ পরিচালনা করেছিলেন মন্দির তৈরীর কাজে নিয়োজিত অসংখ্য মজুরের মধ্যে নটবর পাঁজাও মায়ের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ঈশ্বরের আবাসস্থল মন্দির। ভাগ্যবানেরাই এর নির্মাণ-কাজে যোগদানের সুযোগ পায়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দৈনিক কাজ করতেন। সরলমতি স্বাস্থ্যবান গ্রাম্য বালক। কর্তব্যকর্মে অপূর্ব নিষ্ঠা। সদাহাস্যময়। সারাদিন কাজের পরও মুখে হাসিটুকু লেগে থাকতো। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য নটবর প্রথমে মথুরবাবুর ও পরে রানী রাসমণির সুনজরে এসেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর তখন একটি গণ্ডগ্রাম। ঐ অঞ্চলে গঞ্জ বলতে কিছুদূরে আলমবাজার। দোকান-পাট সব সেখানেই। কাজের শেষে নটবর ও অন্যান্য কর্মীরা দৈনিক দোকান-বাজার সেখান থেকেই করতো। এইভাবে যাতায়াতে আলম-বাজার নটবরের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলো। সেই সময় আলমবাজারে বেশ কয়েক ঘর বর্ধিষ্ণু রেড়ির তেলকল ব্যবসায়ী ছিলেন। এখানে এসে তিনি ঐ সব কলঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতেন কিভাবে বীজ থেকে তেল বেরিয়ে আসছে। আগ্রহবশতঃ কিছুদিন তিনি কলঘরে কাজও করেছিলেন।

ইতিমধ্যে রানী রাসমণির কালীমন্দিরের কাজ শেষ হয়েছে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শুভ স্নানযাত্রার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'ল। কালীমন্দিরের ভবতারিণীমূর্তি তৈরী করেছিলেন বর্ধমান জেলার দাঁইহাটা গ্রামের প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রীনবীনচন্দ্র

ভাণ্ডারী। তাঁর অপূর্ব ভাস্কর্যে মূর্তি যেন চিন্ময়ী সত্তা লাভ করেছিল। কলকাতার ঝামাপুকুর টোলের পণ্ডিত শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় এলেন মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। সঙ্গে অনুজ শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠার দিন রানীমা বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞ, দান-ধ্যান, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ইত্যাদি কোন কিছুই তিনি অপূর্ণ রাখেন নি।

কিছুকাল পরের কথা। কালীমন্দিরে গদাধর এখন পূজারী। অগ্রজ রামকুমার ইতিমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সেইজন্য পূজার সব দায়িত্ব এখন গদাধরের উপর।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নটবর রানী রাসমণির সুনজরে ছিলেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন স্থানে লোক মোতায়নের প্রয়োজন বিবেচনা ক'রে রানীমা নটবরকে মজুরের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে গোয়াল ও বাগান দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কৃষকের ঘরের ছেলে চাষ-আবাদ ভালই জানে। মনোমত কাজ পেয়ে খুব খুশি। নটবর এখন এস্টেটের তরফের কর্মী হওয়ায় ক্রমে অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরিচয় হয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে পড়েন। গরু চরাতেন, বাগান দেখতেন। অবসরমত ঠাকুরের কাছে এসে গল্প করতেন ও তাঁকে তামাক সেজে দিতেন। এইভাবে প্রথম অবস্থায় নটবর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময় তিনি তেলকলের ব্যবসা করবার কথা ঠাকুরকে বলেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন— 'মায়ের যদি ইচ্ছা হয় তবে নিশ্চয় হবে।'

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর কাজ তখনও কিছু কিছু চলছিল। এই সময় কোন এক বিশেষ পূজার দিনে রানী রাসমণি দক্ষিণা, দান ও কর্তব্যরত কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদির জন্য বহু রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে আসেন এবং বিলি-ব্যবস্থার জন্য স্তূপীকৃত অর্থ ঘরে রাখেন। এই সময় বিশেষ প্রয়োজনে নটবরকে ডাকা হয়। নটবর এসে রানীমাকে প্রণাম জানিয়ে বিনীতভাবে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ে স্তূপীকৃত রৌপ্যমুদ্রার উপর। বিস্ফারিত নেত্রে একভাবে সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন। অন্য কর্মচারীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পর রানীমা নটবরকে আদেশ দেবার জন্য তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখেন, বিস্ফারিত নেত্রে নটবর রৌপ্যমুদ্রার দিকে চেয়ে আছে। জীবনে এত অর্থ দেখেনি তাই তার অপলক দৃষ্টি কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারছে না। সেদিন নটবরের মনের কোণে বোধ হয় একটা ক্ষীণ আশা জেগেছিল, "যদি তার কিছু অর্থ থাকতো তবে 'পরাণ মাহাতো'র মত আলমবাজারে রেড়ির তেলের ব্যবসা শুরু করতো।"

'নটবর কি দেখছো ?'

রানীমার ডাকে চমকে উঠে আমতা আমতা ক'রে হাত কচলে নটবর বিনীতভাবে বললেন, 'আজ্ঞে না কিছু নয়। এত রৌপ্যমুদ্রা একসঙ্গে দেখিনি, তাই চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আদেশ করুন রানীমা।'

গ্রাম্য বালকের সরলতায় রানী রাসমণি কৌতূহলী নটবরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা নটবর, তোমাকে কিছু অর্থ দিলে কি করবে ?'

নটবর এতটা আশা করেন নি। উত্তর তৈরী ছিল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'আজ্ঞে রেড়ির তেলের ব্যবসা করবো।'

সেই শুভদিনে আশ্রিতের বাসনা পূর্ণ করতে রানী রাসমণি নটবরকে তিন আঁচলা রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে বলেছিলেন, 'মা, ভবতারিণীর সেবা করেছ, আশা করি তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।'

বিস্মিত নটবর রানীমার সামনে কান্নায় ভেঙ্গে

পড়ে বার বার তাঁর চরণ বন্দনা করেন। আনন্দে বিহ্বল হয়ে মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম জানান। পরে সাশ্রুনয়নে রানীমার কাছে বিদায় নিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনে রেড়ির তেলের ব্যবসায় ব্রতী হন।

আলমবাজারে একটা ছোট দোকানঘর ভাড়া নিয়ে নটবর ব্যবসা শুরু করেন। মিষ্টস্বভাব ও সরলতায় তিনি প্রতিবেশী ব্যবসায়ীদের সহ-যোগিতায় ক্রমে ক্রমে ব্যবসায় উন্নতি করতে থাকেন। ব্যবসায়ে কঠিন পরিশ্রম করলেও কালীবাড়ী ও শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি ভোলেন নি। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও কালীনাম স্মরণ ক'রে ব্যবসা শুরু করতেন।

রেড়ির তেলের ব্যবসা বেড়ে চলে। খুচরো বিক্রি ছাড়া, অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত তিনি 'RALLI BROTHERS'-এর সঙ্গে পাইকারী ব্যবসা আরম্ভ করেন। কয়েক বছরের মধ্যে প্রভূত অর্থলাভ হয়। আরও তেলকল বসান। তৈরী করেন নিজস্ব পাকা বসতবাড়ী। আলমবাজারে তখন ঐ অঞ্চলে অনেক তেলকল ছিল। পুরাতন ব্যবসায়ীদের মধ্যে শ্রীপরাণ মাহাতো ও শ্রীকীর্তিবাস মাঝির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁরা বড় ব্যবসায়ী ব'লে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্যবসায়ে স্থিতিশীল হয়ে নটবর সংসারী হন।

ভক্তিপরায়ণ নটবর পাঁজা তাঁর নবনির্মিত বাড়ীতে দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা শুরু করেন। এই সকল পূজায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিশেষ-ভাবে আমন্ত্রণ জানাতেন। সকল পূজায় দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার ব্যবস্থা থাকতো। নটবরের পূজা দেখতে ঠাকুর তাঁর গৃহে আসতেন। এ ছাড়াও, তিনি অবসরমত নটবর পাঁজার দোকানেও এসে বসতেন। প্রতিবেশী ব্যবসায়ী শ্রীপরাণ মাহাতো, শ্রীকীর্তিবাস মাঝি ও শ্রীহরিশচন্দ্র পাল এঁদের দোকানেও ঠাকুরের যাতায়াত ছিল। এ সব ঠাকুরের সাধক-জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের পরও নটবর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে যেতেন। কৈশোরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ তাঁকে সুস্থ জীবনযাপনের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। সেই স্মৃতি আজীবন তাঁর মনে ভাস্বর হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি-লাভের পর তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য দেখা দেয়। বিশেষ ক'রে তিনি ঠাকুরের অভাব বোধ করতে থাকেন। ব্যবসায়ে আর তেমন মন লাগে না। সমুদয় ব্যবসা পুত্র শ্রীঈশ্বর পাঁজার হাতে সমর্পণ করেন এবং সাত্ত্বিক জীবনযাপন ক'রে তিনি মাতৃ-আরাধনায় মগ্ন হন। এইভাবে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি মাতৃনামে বিভোর থেকে আনুমানিক ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

নটবর পাঁজার বাড়ী ও তেলকল আর নেই। তবে বছর দশেক পূর্বে সেই জীর্ণ বাড়ীর কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল এবং তেলকলের Press Machine-এর যন্ত্রাংশও পড়ে ছিল। বর্তমানে আলমবাজারের অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক নতুন দোকান ও ঘরবাড়ী হয়েছে। নটবর পাঁজার তেলঘরের চিহ্নমাত্রও নেই। তবে, অনুসন্ধানে জায়গাটি জানা গেছে। এখন আলমবাজারে যেখানে 'নারায়ণী' সিনেমা আছে ঠিক তার উল্টোদিকে যে জায়গায় ছোট ছোট দোকানঘর ও বেকারী আছে (১১৩, সূর্য সেন রোড, আলমবাজার, কলিকাতা-৩৬) ওটাই ছিল নটবর পাঁজার বাড়ী ও কলঘর। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত পাদস্পর্শে সেই স্থান পবিত্র তীর্থ। *

---

* এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে ৺নটবর পাঁজার একমাত্র জীবিত প্রপৌত্র শ্রীগঙ্গাধর পাঁজার (৫৮) বিবৃতি থেকে। এ ছাড়া তৎকালীন ব্যবসায়ী ৺কীর্তিবাস মাঝি ও ৺হরিশচন্দ্র পাল মহাশয়দের পুত্রেরা জীবিত। বয়স প্রায় ৯০ বছর। তাঁরাও ব্যক্তিগতভাবে

ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া

শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আছে (২।২।৫), ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিতেছেন : 'আজ্ঞে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্যাস তিনটি দোষের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, হে ভগবান্! তুমি বাক্যমনের অতীত, কিন্তু আমি কেবল তোমার লীলা—তোমার সাকাররূপ—বর্ণনা করেছি, অতএব অপরাধ মার্জনা করবেন।'

কথামৃতের যে-পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গ আছে, তার পাদটীকায় 'রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখা যায়। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই শ্লোকটি নাই। তবে ভাগবতে শ্লোকটি না থাকিলেও শংকরাচার্যের অনেক রচনায় শ্লোকটির ভাব পরিস্ফুট। বস্তুতঃ শ্লোকটিতে জ্ঞানী সাধকের অন্তরের ভাব প্রকাশিত। উহাতে কিন্তু ভক্তের মন ভরে না। ভক্ত ভগবানের সাকাররূপ দর্শন করিতে চান। সে-নিরুপম রূপ দর্শন করিয়া ভক্ত হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান।

শ্রীরামপূর্বতাপনীয়োপনিষদ্ বলিতেছেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
(১।৭)

নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তবে এই ব্যাখ্যাও সম্ভব যে, এখানে নির্গুণ ব্রহ্মের মায়াযোগে অবতার-দেহ ধারণের কথা বলা হইয়াছে।—যিনি চিৎস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অংশশূন্য, অশরীরী, সেই ব্রহ্মই উপাসকদের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য মায়িক দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

শুধু শ্রীরামপূর্বতাপনীয়োপনিষদে নহে, আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ধরনের কথা আছে। ভগবান নিরাকার, আবার সাকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও অসংখ্যবার বলিয়াছেন, 'ভগবান মানুষের মত দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য, নানারূপ ধ'রে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য।'

অসংখ্য জীবকুল আমরা বুঝি যে, আমাদের সত্তা আছে; ইহাও বুঝি যে, আমাদের চেতনা আছে। সৎ আর চিৎ আমাদের অনুভববেদ্য, কিন্তু আমরা আছি বড় কষ্টে, বড় দুঃখে—ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত হইয়া। আনন্দহীন আমরা, যদিও স্বরূপতঃ আমরা সচ্চিদানন্দ। আপামর আমরা সকলেই আনন্দপিয়াসী। জানি বা না জানি—আমরা সকলেই অসীম অনন্ত আনন্দের উৎস শ্রীভগবানকে খুঁজিতেছি। যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাকেই চাহিতেছি। অক্সিজেন না পাইলে যেমন প্রাণ বাঁচে না, শ্রীভগবানকে না পাইলেও আমাদের তদ্রূপ অবস্থা হয়। আমরা জীবন্মৃত হইয়া পড়ি।

মানুষ ভগবানকে চাহিয়াছে। কিন্তু পায় নাই। কারণ, তিনি নিজে না ধরা দিলে কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না।

* * *

আমাকে বিবৃতি দিয়েছেন। আরও বক্তব্য এই যে, ৺ভবতারিণী-মূর্তির নির্মাতার সম্বন্ধে যে-তথ্য আমি পরিবেশন করেছি, তা আমি সংগ্রহ করেছি শ্রীপ্রিয়গোপাল হাজরা মহাশয়ের কাছ থেকে। ইনি রানী রাসমণির বংশধর, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের অন্যতম অছি এবং জানবাজারে রানী রাসমণির বাড়ীতে থাকেন। —লেখক

মানুষ তাঁহাকে অনেকদিন ধরিয়া চাহিয়াছে। পায় নাই। তাপসের অনুরাগ-অশ্রুও ফলপ্রসূ হয় নাই। তাই আজ তিনি মানুষকে চাহিয়াছেন। ব্যথিত মানুষের আগ্রহকে, তীব্র ব্যাকুলতাকে সার্থক করিতে আজ তিনি অনন্ত করুণায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে-মাসে ও যে-তিথিতে এই শুভাবতরণ ঘটিয়াছে, সেই মাসের নাম ফাল্গুন, সেই তিথি শুক্লা দ্বিতীয়া।—

শুভ ফাল্গুনী দ্বিতীয়া
স্মরণে পবিত্র হোক
তনু-মন-হিয়া।

[ক্রমশঃ]

সমালোচনা

ভক্তরাজবাণী: শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিকা: ডঃ শোভা মুখার্জী, বরাট কমপাউণ্ড, নেপিয়ার টাউন, জব্বলপুর। পরিবেশক: নালন্দা প্রেস, কলিকাতা ৭০০০০৬। (১৯৭৯), পৃঃ ৮৮, মূল্য: আট টাকা।

যে-মহাপুরুষের বাণী শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত এবং অন্যদের লেখা হইতে সঙ্কলিত হইয়া আলোচ্য গ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে, তাঁহার সন্ন্যাস-নাম স্বামী সদাশিবানন্দ। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য; 'মন্ত্রশিষ্য' শব্দটি ব্যবহার করিলাম না, যদিও ৯ই জুলাই ১৯৬০ সালে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হইলে, 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভাদ্র ১৩৬৭ সংখ্যায় তাঁহার দেহত্যাগের বিবরণে 'মন্ত্রশিষ্য' শব্দটি ব্যবহৃত দেখা যায়। পূজ্যপাদ সদাশিবানন্দজী মহারাজ স্বয়ং আমাদের বলিয়াছেন যে, স্বামীজী তাঁহাকে কোনও মন্ত্র দেন নাই।

এ-সকল কথার অবতারণা গ্রন্থে বা পত্রিকায় কি ভুল-ত্রুটি আছে, তাহা দেখানোর উদ্দেশ্যে নহে। পূজ্যপাদ ভক্তরাজ মহারাজ ('ভক্তরাজ' নামটি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কর্তৃক প্রদত্ত) সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করাই আমাদের উদ্দেশ্য, কারণ যাঁহার বাণী পাঠকবর্গ পড়িবেন তিনি কে ছিলেন, ইহা জানা প্রয়োজন; নতুবা সে-বাণী পড়িতে তাঁহাদের আগ্রহ হইবে কেন? গ্রন্থকার 'ভূমিকা'য় ভক্তরাজ মহারাজের কিছু পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তথ্যের কিছু কিছু ভুল আছে (ভুল শুধু যে আলোচ্য গ্রন্থেই আছে, তাহা নহে, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-গুলিতেও কিছু-না-কিছু তথ্যের ভুল দেখা যায়)। ভূমিকায় বা অন্যত্র কোথায় কি ভুল আছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া, কিছু তথ্য যাহা আমরা পূজ্যপাদ ভক্তরাজ মহারাজের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি; ইহাতে ভূমিকায় যে ভুল তথ্য আছে তাহা সংশোধিত হইয়া যাইবে:

(১) স্বামীজী ১৯০২ সালের জানুআরি মাসে (সম্ভবতঃ ১২ই জানুআরির পর) কাশী যান এবং ৮ই মার্চ বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। (অর্থাৎ স্বামীজী প্রায় দুই মাস কাশীতে ছিলেন, ছয় মাস নহে)। এই সময়ের মধ্যেই স্বামী সদাশিবানন্দজীর (তখন হরিনাথ) দীক্ষা হয়। স্বামীজীর মহিমা এই যে, জনৈক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য হরিনাথকে আরায় যে-দীক্ষামন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহা হরিনাথকে তিনি পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। স্বামীজী শুধু হরিনাথের মনকে সমাধির রাজ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তৎকালে যে-অনুভূতি হরিনাথ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত

হইতে তাঁহাকে দীক্ষোত্তরকালে বিশ বৎসর সাধন-ভজন করিতে হইয়াছিল।

(২) ১৯২১ সালে ভক্তরাজ মহারাজ পরম পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। (দীক্ষার ১৯ বৎসর পরে)। যদিও 'উদ্বোধনে' (৬২।৪৪৫) সন্ন্যাসগ্রহণের সাল ১৯২০ লেখা আছে, আমরা ১৯২১ সালই গ্রহণ করিয়াছি, কারণ পূজ্যপাদ ভক্তরাজ মহারাজ স্বয়ং আমাদের বলিয়াছিলেন যে, তিনি ১৯২১ সালে কাশীতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তিনি আরও যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত ১৯২১ সালটির সঙ্গতি আছে। (আমাদের পরিবেশিত এই তথ্যে ভুল থাকিলে কেহ যদি প্রমাণসহ জানান, তাহা হইলে 'উদ্বোধনে'র পরবর্তী কোন এক সংখ্যায় তাঁহার প্রদত্ত তথ্য কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশিত হইবে।) শ্রীশ্রীমহারাজ ১৯২০ সালে কাশীতে আদৌ গিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ—প্রচলিত জীবনী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থে এ-বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাই নাই।

(৩) ১৯৬০ সালের ৯ই জুলাই কাশী সেবাশ্রমে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। (১৯৬১ নহে)।

(৪) হরিনাথের বৃন্দাবনবাস-প্রসঙ্গে 'ভূমিকা'য় উল্লেখিত 'শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দির' স্থলে 'শ্রীরঙ্গনাথ-জীর মন্দির' পড়িতে হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থে ৫.৬.১৯৫৩ হইতে ১১.৭.১৯৫৩ পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন গ্রন্থকার খাতা-পেন্সিল লইয়া ভক্তরাজ মহারাজের নিকট বসিয়া তাঁহার যে-উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করেন, তাহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই উপদেশগুলিই গ্রন্থটির মুখ্য অংশ। ইহা ছাড়া ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসের তিনদিন এবং ১৯.৫.৫৩ হইতে ৪.৬.৫৩ পর্যন্ত প্রদত্ত উপদেশাবলী প্রায় প্রতিদিন অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ দে কর্তৃক লিখিত। শেষাংশে ২১.৭.৫৩ হইতে ২৬.৭.৫৩ পর্যন্ত প্রদত্ত উপদেশ-সমূহ শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর ঘোষ কর্তৃক লিপিবদ্ধ। 'মুখবন্ধে' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'শ্রীমান শ্রীসুরজমল আগরওয়াল, (ডিরেক্টর অফ্ ফোনস্, দিল্লী) দেরাদুনে কয়েক পৃষ্ঠা হিন্দিতে লিখিয়াছিলেন। এই সমস্ত দে সাহেবের অনুগ্রহে আমি প্রাপ্ত হই। এবং তাহা আমার বুদ্ধি অনুযায়ী গ্রন্থাকারে রূপ দিবার জন্য পূজ্য মহারাজজী কর্তৃক আদিষ্ট হই।' কিন্তু গ্রন্থমধ্যে অন্যান্যদের নাম থাকিলেও শ্রীসুরজ-মলের নামের উল্লেখ নাই। এইহেতু সুরজমলজী কি লিখিয়াছিলেন, তাহা জানা গেল না। যাহা হউক, পাঠকবর্গ স্বামী বিবেকানন্দের একজন ত্যাগী শিষ্যের অমূল্য উপদেশাবলী এই গ্রন্থে পাইবেন। উপদেশগুলি বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন শাস্ত্রের কিছু কথা এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবের কথা পাওয়া যায়। শেষোক্ত কথাগুলি পড়িলে দেখা যায়, কী অপূর্বভাবে পূজ্যপাদ ভক্তরাজ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কথা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না—গীতার ভাষায় তিনি ছিলেন 'অনিকেতঃ'। তাঁহাকে দর্শন করিলেই স্বামীজীর কথা—'Have thou no home···Like rolling river free thou ever be···Go thou the free from place to place, and help them out of darkness, Maya's veil.'—স্মৃতিপথে উদিত হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের কোনও নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত না থাকিলেও তিনি সর্বদাই সংঘশরীরেই বিরাজমান ছিলেন এবং সংঘের ভাবধারারই প্রচারক ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে যত্র-তত্র ইহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদপটে পূজ্যপাদ ভক্তরাজ মহারাজের সৌম্যমূর্তি—তাঁহার দূরপ্রসারিত দৃষ্টির নির্লিপ্ততা হৃদয়কে স্পর্শ করে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে এই নূতন

সংযোজনটিকে আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই। গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র। মন্মথবাবুর 'স্বামীজীর স্মৃতি' শীর্ষক যে-ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (৬২তম, ৬৪তম ও ৬৫তম বর্ষে) প্রকাশিত হয় এবং ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'বেদান্তকেশরী'তে অনূদিত হইয়া 'Reminiscences of Swami Vivekananda' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার (বাংলা ও ইংরেজী —উভয় ভাষারই) রূপকার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নিঃসন্দেহে তিনি পরম ভাগ্যবান। তাঁহার লিখিত বর্তমান গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুরাগী ব্যক্তিগণ কর্তৃক গ্রন্থটি সংগৃহীত ও সমাদৃত হইবে, ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

স্বামী ধ্যানানন্দ

প্রসঙ্গতঃ

'উদ্বোধনে'র পৌষ ১৩৮৭ সংখ্যায় 'তোমারে করি শত নমস্কার' প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী লেখেন, "বাংলা ভাষায় হেলেনের 'আমার জীবন' ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ আজো অনূদিত হয়নি।" (পৃঃ ৬৭৫, কলম ১, পঙ্‌ক্তি ১৬-১৭)। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া 'বিবেক ভারতী' পত্রিকার অন্যতম সহ-সম্পাদক শ্রীরণজিৎকুমার সিংহ একটি পত্রে আমাদের জানাইয়াছেন যে, হেলেন কেলারের 'The Open Door' বইখানি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক 'মুক্তদ্বার' নামে অনূদিত হইয়া পার্ল পাবলিকেশনস লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

—সংযুক্ত সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

২৫শে জানুআরি ১৯৮১, বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৭১তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসী ও গৃহী সদস্যবৃন্দের এই সম্মিলিত সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ।

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) অন্ধ্রপ্রদেশ : শ্রীকাকুলাম জেলায় (বন্যায়) গৃহনির্মাণকার্যের প্রস্তুতি প্রাগ্রসর। ১৩ই ফেব্রুআরি ১৯৮১, স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শ্রীকাকুলামে ২০০টি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন।

(খ) গুজরাত : (১৯৭৯'র মোরভির বন্যায়) পুনর্বাসনকার্য : (১) ২১শে জানুআরি ১৯৮১, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বন্যার্তদের পুনর্বাসনের জন্য নবনির্মিত ভানালিয়া গ্রামের উদ্বোধন করেন। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই আদর্শ গ্রামটিতে ১৮৩টি গৃহ, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি ডিস্পেনসারি ব্লক, বালমন্দির ও ডাকখানা আছে। রাজ্যসরকার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রামটির নামকরণ করা হইয়াছে—'শ্রীসারদানগর'। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০ হাজারেরও অধিক জনসাধারণ যোগদান করেন। গৃহগুলি বন্যার্তদের

হস্তে সমর্পণ করা হয়।

(২) লালবাগে গৃহনির্মাণকার্য অব্যাহত আছে।

(গ) উড়িষ্যা: (১৯৮০'র বন্যায়) বন্যা-বিধ্বস্ত গুম্মুপুরে পুনর্বাসনকার্য সংগঠিত হইতেছে।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়) (১) হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বালি-দেওয়ানগঞ্জে জমি পাওয়া মাত্র আরও গৃহনির্মাণ-কার্য শুরু করা হইবে।

(২) মালদা (১৯৮০'র বন্যায়): বন্যা-দুর্গতদের পুনর্বাসনকার্যের জন্য প্রাথমিক সমীক্ষা শুরু করা হইয়াছে।

নেপালে:

ভূমিকম্পত্রাণ (১৯৮০): পশ্চিম নেপালে ভূমিকম্পবিধ্বস্ত বৈটাদি জেলায় ২৯টি পঞ্চায়েতের ৪,৯৪২ ভূমিকম্পদুর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে পশমী কম্বল ২,০০০, 'বালাক্লাভা' টুপি ১০০০, পশমী গেঞ্জি ১,৭৬২, মহিলাদের শাল ১,০০০ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। সম্পূর্ণ জেলাটিকে সাহায্যের আওতায় আনিতে আরও এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করিতে হইতে পারে।

বাংলাদেশে:

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধ-বিতরণ, দুইটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বস্ত্রাদি-বিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা চলিতেছে। ঢাকা ও দিনাজপুর কেন্দ্র দূরবর্তী গ্রামসমূহের রোগীদের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় পরিচালনা শুরু করিয়াছে।

উৎসব

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৮তম আবির্ভাবতিথি ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮০, যথারীতি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে রান্না-করা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১১৯তম আবির্ভাবতিথি ২৭শে জানুআরি ১৯৮১, যথারীতি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ১২,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে রান্না-করা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের উৎসর্গীকরণ

৬ই ফেব্রুআরি ১৯৮১, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ কর্তৃক হায়দ্রাবাদ আশ্রমের সর্বজনীন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির উৎসর্গীকৃত হয়। ৫ই হইতে ৯ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত এই উৎসবে প্রায় ২০০ সাধু-ব্রহ্মচারী ও ৬০০ ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। ২রা ফেব্রুআরি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আশ্রমের 'বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে'র উদ্বোধন করেন এবং অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি. অঞ্জাইয়া আশ্রমের 'বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে'র উদ্বোধন করেন।

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

মায়লাপুর (মাদ্রাজ) রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব ১৩ই হইতে ১৬ই ফেব্রুআরি ১৯৮১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ১৫ই প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী স্মারক দিবসের সভায় পৌরোহিত্য করেন তামিল নাড়ুর রাজ্যপাল শ্রীসাদিক আলি। ১৬ই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএম. জি. রামচন্দ্রন।

নূতন মঠ-কেন্দ্র

দুইটি নূতন মঠ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে: (১) রামকৃষ্ণ মঠ, লক্ষ্ণৌ, (২) রামকৃষ্ণ মঠ, কনখল।

বিবিধ

গত ৯ই নভেম্বর ১৯৮০, স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ রায়পুর কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন।

গত ২২শে নভেম্বর ১৯৮০, স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ বৃন্দাবন সেবাশ্রমের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন।

গত জানুআরি ১৯৮১, স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ মালদহ কেন্দ্রের বিদ্যালয়ের নূতন গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং গত ২১শে জানুআরি ১৯৮১, জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের সাধুনিবাসের ভিত্তিস্থাপন করেন।

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের একজন সহকারী শিক্ষক কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কারের (১৯৮০ সালের) জন্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

মিশনের নাডি (ফিজি) কেন্দ্র হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিতে ঐ কেন্দ্রের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। মিশন কর্তৃক পরিচালিত বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার ডলার; এখনও সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া যায় নাই। নওয়াইকোবা শিল্পবিদ্যালয়ে ও বুনিয়াসিতে মিশনের দুইটি গৃহ ধ্বংস হইয়াছে।

দেহত্যাগ

স্বামী অদ্বয়ানন্দ (অর্ধেন্দু মহারাজ) গত ১৭ই জানুআরি ১৯৮১, সকাল ৬-২৪ মিনিটে ৭০ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাঁকুড়া আশ্রমে তিনি কয়েক মাস ধরিয়া পীড়িত ছিলেন এবং দেহত্যাগের কয়েক দিন পূর্বে সেখান হইতে তাঁহাকে সেবা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। রক্তে শর্করাধিক্যের ফলে সংজ্ঞাশূন্যতা এবং মস্তিষ্কে রক্ত-চলাচলে বিঘ্নই তাঁহার দেহান্তের কারণ।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩০ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কামারপুকুর ও বাঁকুড়া কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি বেলুড় মঠ শিল্পবিদ্যালয়, মাদ্রাজ মঠ, উদ্বোধন এবং অদ্বৈত আশ্রমে (কলিকাতা) বিভিন্ন পদে কাজ করেন।

স্বামী শ্যামলানন্দ (হৃষীকেশ মহারাজ) গত ১৮ই জানুআরি ১৯৮১, সকাল ৯-২২ মিনিটে ৭২ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেলুড় মঠে তিনি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অসুস্থ ছিলেন এবং সেখান হইতে গত ১১ই জানুআরি তাঁহাকে সেবা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। বহুমূত্ররোগজনিত গ্যাংগ্রীন (দেহকলার বিনাশ)-এর ফলেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৯ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দিনাজপুর আশ্রমের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি চেরাপুঞ্জী, সারগাছি, লক্ষ্ণৌ ও উদ্বোধন কার্যালয়ে কাজ করেন।

স্বামী বোধঘনানন্দ (রাঘবন মহারাজ) গত ৮ই জানুআরি ১৯৮১, বিকাল ৪-৫০ মিনিটে ৭৫ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ১৬ই জানুআরি বেলুড় মঠ হইতে তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে সংজ্ঞা-হীন অবস্থায় ভর্তি করা হয়। মস্তিষ্কে রক্ত-চলাচল বিঘ্নিত এবং যকৃতের কর্মক্ষমতা নষ্ট হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৩ সালে মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪১ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মাদ্রাজ মঠ ব্যতীত তিনি উটাকামুণ্ড আশ্রমে কাজ করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবতিথি-উৎসব

স্বামী বিবেকানন্দের ১১৯তম আবির্ভাবতিথি গত ২৭শে জানুআরি (১৯৮১), মঙ্গলবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজনকীর্তনাদি হয়। বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর স্বামী সুপ্রসন্নানন্দ 'শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিতে স্বামীজী' বিষয়ে আলোচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি-উৎসব

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৬তম আবির্ভাবতিথি গত ৮ই মার্চ (১৯৮১), রবিবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজনকীর্তনাদি হয়। বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর সারদানন্দ হলে 'সুরপীঠে'র শিল্পীবৃন্দ 'ভজনপ্রেমিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' সংগীত-আলেখ্য পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত নরনারী যোগদান করেন।

৮ই মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে ১লা মার্চ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর উদ্যোগে স্বামী শ্রুত্যানন্দের তত্ত্বাবধানে সকাল ৭-৩০ মিনিটে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রম, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, কাশীপুর উদ্যানবাটী, বাগবাজার বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, আদ্যাপীঠ, করুণাময়ী আশ্রম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কালীকীর্তন সমিতি, বিবেকানন্দ শিশু সংসদ, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থী ও ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী ভক্ত নরনারী। এই শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া গিরিশ এভিনিউ, ভূপেন বোস এভিনিউ, আর. জি. কর রোড হইয়া দেশবন্ধু পার্কে শেষ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর পট ট্রাকে ও টেম্পোতে বাহিত হয়। যুবকেরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি এবং বালকেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পট সিংহাসনে সাজাইয়া স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যায়। বহু বাণী ও পতাকায় শোভিত, ব্যাণ্ড-বাদ্য ও কীর্তন-মুখরিত, ধূপের গন্ধে সুরভিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর জয়ধ্বনিতে মহিমান্বিত সমগ্র শোভাযাত্রাটি সারা পথ এক দিব্য আনন্দ-উৎসবময় পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রায় তিন হাজার ভক্ত নরনারী, বালকবালিকা এবং সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের এই সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রাটি পথের অগণিত দর্শকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোভাযাত্রাশেষে দেশবন্ধু পার্কে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের স্বামী অমলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করেন। সমবেত সকলকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ২৪শে জুন ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ৫ই জুলাই ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

আগের দিন আমরা মনের সাতটি ভূমির কথা আলোচনা করেছি। সপ্তম ভূমিতে মন গেলে

নির্বিকল্পসমাধি হয়। সেই অবস্থায় জীবকোটিদের শরীর একুশ দিনের বেশী থাকে না। 'এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা।' (১৷৩৷৬) এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তদের কথা ভেবে, তাঁদের অধিকার বিচার ক'রে বলছেন, তাঁদের জ্ঞানের পথ নয়, তাঁদের ভক্তির পথ। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁরা। তাঁদের উৎসাহিত ক'রে বলছেন: 'তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।'

এরপর ঠাকুর আবার সমাধির কথা বলছেন: 'সমাধি হ'লে সব কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। পূজা-জপাদি কর্ম, বিষয়-কর্ম ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমনকি তাঁর নাম গুণগান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।' শিবনাথ শাস্ত্রী এখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে উদাহরণ দিয়ে বলছেন: "যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি তোমার নাম, গুণ কথা অনেক হয়েছে। যেই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সেসব কথা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথবাবু এসেছেন।' তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হয়ে যায়।" তারপর ঠাকুর নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা ক'রে বলছেন: "আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলাম 'দাদা, একি হ'ল?' হলধারী বললে 'একে গলিতহস্ত বলে।' ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম থাকে না।"

দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবিদিষা-সন্ন্যাসের পূর্বে পিতৃশ্রাদ্ধ ও আত্মশ্রাদ্ধ করবার প্রথা প্রচলিত আছে। সেজন্য সন্ন্যাসের পরে তাঁরা আর শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে কি দেখছি? না, তাঁর মায়ের দেহত্যাগের পর তিনি যখন তর্পণ করতে যাচ্ছেন, তখন তাঁর হাতের আঙুল বেঁকে ফাঁক হয়ে সব জল গলে পড়ে যাচ্ছে। কেন? না, তাঁর সব করণীয় কর্ম শেষ হয়ে গেছে, ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে। তাঁর বিদ্বৎ-সন্ন্যাস—আমাদের মতো বিবিদিষা-সন্ন্যাস নয়। তাই আপনা থেকেই সকল বিধি-নিষেধের পারে তিনি চলে গেছেন। ইন্দ্রিয়াদি জেনে নিয়েছে যে, এঁর এইসব কর্ম করবার আর প্রয়োজন নেই। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলিই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছে। সকল কর্মের পারে তিনি চলে গেছেন, আর কিছু করণীয় নেই—এই অবস্থাকেই 'গলিতহস্ত' অবস্থা বলে। জ্ঞান হয়ে গেলে এই অবস্থা লাভ হয়।

এরপর তিনি সবিকল্পসমাধির—ভাবসমাধির কথা বলছেন; নির্বিকল্পসমাধির কথা নয়। ভাব-সমাধিতে ঈশ্বরের রূপ-দর্শন হয়। এবং সেটা সংকীর্তনাদি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও সম্ভব হয়। শেষ পর্যায়ে নামসংকীর্তনাদি সব শুদ্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে বলছেন: "সংকীর্তনে প্রথমে বলে, 'নিতাই আমার মাতা হাতী!'—'নিতাই আমার মাতা হাতী!' ভাব গাঢ় হ'লে শুধু বলে 'হাতী! হাতী!' তারপর কেবল 'হাতী' এই কথাটি মুখে থাকে। শেষে 'হা' বলতে বলতে ভাবসমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি, এতক্ষণ কীর্তন করছিল চুপ হয়ে যায়।" ঠাকুর ব্রাহ্মণভোজনের উদাহরণ দিচ্ছেন—প্রথমে খুব হৈ চৈ হয়। খাওয়া আরম্ভ হ'লে হৈ চৈ অনেক কমে যায়। খাবার পর ঘুম। তখন সব চুপ।

নানারকম পূজা, উৎসব—সত্যনারায়ণ, ষষ্ঠী শীতলা এইসব দেবদেবীর পূজা-অনুষ্ঠান প্রাথমিক, প্রারম্ভিক। সত্যিকারের উপলব্ধি হবে এই সবের শেষে, তখন এইসব অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন হয়ে যাবে। ঠাকুর তাই বলছেন: 'প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম কমবে। শেষে কর্মত্যাগ আর সমাধি।'

আবার সহজ সরল উপমা দিয়ে বিষয়টি বোঝাচ্ছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে : 'গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হ'লে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে কর্ম প্রায় করতে হয় না। ছেলে হ'লে একেবারে কর্মত্যাগ। মা ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা করে।' যতদিন না পরমানন্দ লাভ হচ্ছে, ততদিনই কর্ম করতে হয়। সেই পরম প্রাপ্তি হ'লে সর্বকর্ম শেষ হয়ে যায়। এইটিই গীতোক্ত 'নৈষ্কর্ম্য' অবস্থা। ঈশ্বরদর্শনের পরে স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থা আসে।

আবার তিনি ফিরে আসছেন সমাধির প্রসঙ্গে। বলছেন যে, সমাধিস্থ হবার পর প্রায় শরীর থাকে না। এখানে 'প্রায়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তার আগের কথার জের টেনে বলছেন কাদের শরীর একুশ দিনে নাশ হয়ে যায় না। বলছেন যে, নারদাদি আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। লোকশিক্ষার জন্য নির্বিকল্পসমাধির পরও এঁদের শরীর থাকে। উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, কুয়ো খোঁড়া হয়ে গেলে কেউ কেউ ঝুড়ি-কোদাল ফেলে দেয়। আবার কেউ কেউ রেখে দেয় ভবিষ্যতে কারও দরকার হবে মনে ক'রে। এঁরাই সেই মহাপুরুষ, যাঁরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে নির্বিকল্প-ভূমি থেকে নেমে এসে জীবকে মুক্ত করেন। এসব প্রসঙ্গ আগে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। স্বামীজী বলেছিলেন : 'এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয় তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করবো। মনে হয়, খালি নিজের নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে।'

বহুদর্শী শ্রীরামকৃষ্ণ সব রকম লোকের সঙ্গে মিশেছেন। তাঁর জন্ম পল্লীগ্রামে। সেখানকার সর্বস্তরের স্ত্রী-পুরুষ সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন ব'লে সকলের ভাব তিনি জানতেন। তিনি আনন্দময় পুরুষ। কৌতুক-রঙ্গপ্রিয়। তাঁর সেই হাস্যরসের কিছু আভাস আমরা এখানে পাচ্ছি। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থপরতা কেমন সেটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন দৃষ্টান্ত দিয়ে। 'ঝুড়ি-কোদাল বিদায়' দেওয়ার প্রসঙ্গেই এই স্বার্থপরতার কথা এসেছে।

তাঁর জীবন ছিল অদ্ভুত। সব সময়ই তিনি সমাধিস্থ হয়ে থাকতেন না। সমাধিতে যেমন তিনি সমস্ত জগৎকে ভুলে থাকতেন, তেমনি আবার কত স্বাভাবিক থাকতেন। প্রতিটি জিনিস তাঁর কত গোছান থাকত। ছুরির হাতলটি যে-দিকে রাখতেন রোজ সেইদিকেই ঠিক সেটি রাখতেন, কোন দিনই ভুল হত না। প্রদীপের সলতে কেমন ক'রে পাকাতে হয় এসব সাংসারিক বিষয়েও তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সম্পূর্ণ-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর।

সাধারণ জ্ঞানী পুরুষ যাঁরা, তাঁরা কেন লোক-শিক্ষা দিতে চান না? কেন তাঁদের মনে সে-সংকল্প ওঠে না? আধারের তারতম্যের জন্য। শক্তিবিশেষ আছে ব'লে। কারও ভিতর বেশী শক্তি, কারও ভিতর কম শক্তি। অবতারপুরুষ মানুষের কল্যাণের জন্য দেহধারণ করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা নয়। সীমিত শক্তি নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু বিশেষ আধারে বিশেষ শক্তির প্রকাশ। সেই কথাই আবার 'হাবাতে কাঠ' আর 'বাহাদুরী কাঠে'র উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন ঠাকুর। বাজে কাঠ জলে ভেসে যায়। তাতে একটা পাখি বসলে তা ডুবে যায়। কিন্তু বাহাদুরী কাঠ—শাল, সেগুনের বড় গুঁড়ি স্বচ্ছন্দে জীবজন্তু বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারে। অবতারেরা বাহাদুরী কাঠ। নিজেরা যেমন অনায়াসে পার হয়ে যান,

তেমনি অসংখ্য আশ্রিতজনকেও পার ক'রে দেন। অমিত-শক্তিধর এঁরা। (১।৩।৬)

গীতা—

আগের দিন আমরা আলোচনা করেছি, জ্ঞান হ'লে কেমন অবস্থা হয়। শ্রীভগবান কয়েকটি শ্লোকে (৫।১৬-২১) সেই চরম অবস্থার কথা বর্ণনা ক'রে দুটি শ্লোকে (৫।২২-২৩) সাধনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তা-ও আমরা আলোচনা করেছি। এখন আবার কয়েকটি শ্লোকে শ্রীভগবান সাধকের চরম অবস্থার কথা ব'লে সাধনারও ইঙ্গিত দিচ্ছেন। শ্রীভগবান বলছেন: "যিনি 'অন্তঃসুখ', 'অন্তরারাম', 'অন্তর্জ্যোতি'—সেই যোগী ব্রহ্মভূত হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।" (৫।২৪) 'অন্তঃসুখ', 'অন্তরারাম', 'অন্তর্জ্যোতি'—এই শব্দগুলিতে 'অন্তঃ' শব্দের অর্থ আত্মা। আত্মাতেই যাঁর সুখ, আত্মাতেই যাঁর আরাম বা ক্রীড়া, আত্মাই যাঁর জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ সেই যোগী পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষ লাভ করেন। তিনি ইহজীবনেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান—উপনিষদ্ যেমন বলছেন, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যেই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় জগৎ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যোগীর কাছে আত্মা যখন প্রকাশিত হন, তখন সেই প্রকাশ ইন্দ্রিয়জ নয়। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ—কোন ইন্দ্রিয়ই আত্মাকে প্রকাশ করতে পারে না। 'অন্তর্জ্যোতি' শব্দটি দিয়ে এই তত্ত্বই বোঝানো হয়েছে। যোগী বাহ্যসুখনিরপেক্ষ—'অন্তঃসুখ', 'অন্তরারাম' শব্দ দুটি দিয়ে সেই কথাই বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ বাহ্য বিষয়েই সুখ পায়। শ্রীধরস্বামী বলছেন, তাদের দৃষ্টি নৃত্যগীতাদিতে—যোগীর কিন্তু তা নয়। বাইরের কোন কিছুই তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে না। তিনি 'আত্মরতি', 'আত্মক্রীড়' হয়ে যান।

ব্রহ্মনির্বাণের কথা পরের শ্লোকটিতেও শ্রীভগবান বলছেন। বলছেন, কারা এই ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মনির্বৃতি—ব্রহ্মানন্দ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। 'যাঁরা ঋষি, যাঁরা নিষ্পাপ, যাঁদের সব সংশয় চলে গেছে, যাঁরা জিতেন্দ্রিয় এবং সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত, তাঁরাই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।' (৫।২৫) এখানে 'ঋষি' বলতে শংকরাচার্যের মতে সম্যগ্‌দর্শী সন্ন্যাসী।

এর পরের শ্লোকটিতেও আবার 'ব্রহ্মনির্বাণ' শব্দটি এসেছে। শ্রীভগবান বলছেন: 'কাম-ক্রোধমুক্ত, সংযতচিত্ত সন্ন্যাসিগণ, যাঁরা আত্মাকে জেনেছেন, তাঁদেরই ব্রহ্মনির্বাণ হয়—মুক্তি হয়।' কখন? না—জীবিতাবস্থাতেও হয়, শরীর চলে গেলেও হয়। অর্থাৎ তাঁরা সর্বদাই মুক্ত। একবার মুক্ত হ'লে আর বদ্ধাবস্থা হতে পারে না—এই কথাই এখানে বলা হয়েছে। (৫।২৬)

যাঁরা সম্যগ্‌দর্শী—যাঁদের আত্মদর্শন হয়েছে, তাঁরা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। এই আত্মদর্শনের অন্তরঙ্গ সাধন—ধ্যানযোগের কথা শ্রীভগবান বিস্তারিতভাবে বলবেন ষষ্ঠ অধ্যায়ে। ষষ্ঠ অধ্যায়টির নাম 'ধ্যানযোগ'। এখানে সেই ধ্যান-যোগের সূত্রস্থানীয় দুটি শ্লোকের অবতারণা করেছেন শ্রীভগবান: 'বাহ্য বিষয়সমূহ বাইরেই রেখে অর্থাৎ মন থেকে সমস্ত বিষয়চিন্তা দূর ক'রে দিয়ে, ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসিকার অভ্যন্তরেই সঞ্চরণশীল রেখে—তাদের সমান ক'রে অর্থাৎ ছোট-বড় বা বিষম হতে না দিয়ে, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে সংযত ক'রে, ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ-বর্জিত হয়ে যিনি মোক্ষ পরায়ণ হন, তিনি সর্বদাই মুক্ত।' (৫।২৭-২৮)

এইরকম সমাধিমান যোগীর বিজ্ঞেয় কী—কী বা কাকে জেনে তিনি পরমা শান্তি লাভ করেন, পরবর্তী শ্লোকে শ্রীভগবান তা-ই বলছেন। বলছেন: 'আমিই সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সমস্ত লোকের মহেশ্বর, সর্বপ্রাণীর সুহৃৎ—আমাকে

জেনে সেই যোগী শান্তি লাভ করেন।' (৫।২৯) মানুষ যে-সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যাদি করে ভগবানই তার ভোক্তা, পালনকর্তা। ভুজ্ ধাতু থেকে ভোক্তা শব্দটি এসেছে। ধাতুটি উভয়পদী। আত্মনেপদী হ'লে ধাতুটির অর্থ হয় ভোগ করা, আহার করা। পরস্মৈপদী হ'লে অর্থ হয় পালন করা, রক্ষা করা। তাই সমস্ত যজ্ঞতপস্যাদির—অর্থাৎ যা-কিছু ভগবৎ-প্রীতির জন্য করা হয়, তা তিনি গ্রহণ করেন, ভোগ করেন—যে-কথা নবম অধ্যায়েও তিনি বলবেন—'পত্র, পুষ্প, ফল, জল যে সংযতচিত্ত ব্যক্তি ভক্তিভরে আমায় অর্পণ করে, আমি সেই ভক্তিপূত উপহার ভক্ষণ অর্থাৎ গ্রহণ করি।' (৯।২৬) আবার এও সত্য যে, ভগবানের কৃপা না হ'লে সামান্যতম কাজই সম্পন্ন হয় না—যজ্ঞ-তপস্যাদি তো দূরের কথা! ভগবানই যে কার্য-সিদ্ধির প্রধানতম কারণ, তা শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন (১৮।১৪)। সুতরাং ভগবান যজ্ঞ-তপস্যাদির পালক বা রক্ষাকর্তা। তিনি রক্ষা না করলে কারো সাধ্য নেই যে, ঐ সব দুরূহ কাজ সম্পন্ন করে। ভগবান সর্বলোকের মহেশ্বর—অর্থাৎ, হিরণ্যগর্ভ, যিনি লোক সৃষ্টি করেন, তাঁরও ঈশ্বর তিনি, এই কথাই এখানে বলা হয়েছে। হিরণ্যগর্ভকেও তিনি সৃষ্টি করেন। তিনি সর্বভূতের সুহৃৎ। সুহৃৎ যিনি, তিনি প্রত্যুপকারের অপেক্ষা রাখেন না। একজন প্রতিদানে আমার উপকার করবে—এই আশায় উপকার করা সুহৃদের ধর্ম নয়। ভগবান কারো উপকারের অপেক্ষা না রেখেই সকলেরই উপকার ক'রে থাকেন—এমন যে ভগবান, তাঁকে জেনে যোগী শান্তি লাভ করেন। এই শান্তি মুক্তিরই নামান্তর।

[পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত]

বিবিধ সংবাদ

আধুনিক চিকিৎসাজগতে 'এ্যাকুপাংচার' চিকিৎসার স্বীকৃতি

এ্যাকুপাংচার (Acupuncture) চিকিৎসা-পদ্ধতি চীনদেশে আরম্ভ হয়েছিল দু-হাজার বছরেরও আগে। বর্তমানে চীনদেশে (People's Republic of China) এর প্রচলন বিস্তৃত হওয়ায় এবং অন্যান্য অনেক দেশে এই চিকিৎসা-প্রথাটি চালু হওয়ায় এটি অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে বেজিং-এ 'এ্যাকুপাংচার, মোক্সিবাসন (Moxibustion) এবং এ্যাকুপাংচার-অবেদন (anæsthesia)'-এর উপর একটি জাতীয় আলোচনাচক্রে তেত্রিশটি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ যোগ দেন। ঠিক তার অব্যবহিত পরেই সেখানে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা (World Health Organisation) ঐ বিষয়ে তিনদিনব্যাপী আর একটি আলোচনার ব্যবস্থা করেন এবং তাতে বারটি দেশের পনেরজন বৈজ্ঞানিক চীনের তিনটি স্থানে এ্যাকুপাংচারের চিকিৎসা ও গবেষণাকেন্দ্র পরিদর্শন ক'রে এসে ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান সংবাদটি শেষোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে লিখিত।

*'এ্যাকুপাংচার' শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ হ'তে গঠিত: 'একাস' (acus) অর্থাৎ সূচ এবং 'পাংচার' (puncture) অর্থাৎ ফুটান। এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে নানা রোগের চিকিৎসার জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে সুতার মত সরু সূচ ফুটান হয় এবং ১৫-৩০ মিনিট বা আরও বেশি সময় ঐ অবস্থায় রাখা হয়। প্রয়োজন মত সূচগুলিকে

দ্রুত ঘুরান হয়, উপর-নীচ করা হয়, অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সক্রিয় করা হয়। অনেকে বলেন যে, আঙুল দিয়ে গভীর চাপের সাহায্যে এ্যাকুপাংচারের কাজ হ'তে পারে—যাকে বলে 'এ্যাকুপ্রেসার' (Acupressure)। এ্যাকুপাংচার সুচগুলিকে সক্রিয় করার জন্য আধুনিক যুগে লেসার (Laser) এবং আল্ট্রা-সাউণ্ড (Ultrasound) স্পন্দনের কথা ভাবা হচ্ছে। আর একরকম উত্তেজনা সৃষ্টির নাম 'মোক্সিবাসন', যাতে সুচগুলির মাথার উপর অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চামড়ার উপর 'মোক্সি' নামক একটি দেশজ উদ্ভিদ পুড়িয়ে শরীরের মধ্যে উত্তাপ পাঠান হয়। এ্যাকুপাংচারকে চীনাভাষায় 'জেং ডিজু' (Zhen diju) বলে। এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'সূচীবিদ্ধকরণ-মোক্সিদাহকরণ'।

এ্যাকুপাংচার করতে গেলে শারীরস্থান (anatomy) ও শারীরবৃত্ত (physiology) জানা দরকার। চৈনিক চিকিৎসাপ্রণালীমতে শরীরে বহু শক্তি-প্রণালী (energy channels or 'jing-luo') আছে, যার মধ্য দিয়ে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয়। এই প্রণালীগুলির উপরেই সুচ ফুটাবার স্থান নির্ণয় করা হয়। কানেও একই উদ্দেশ্যে স্থান নিরূপিত হ'তে পারে ('auriculo-acupuncture')। এ্যাকুপাংচার চিকিৎসায় কেউ কেউ চীনামতবাদকে অনুসরণ করেন, অন্যেরা পাশ্চাত্য প্রথামতে শারীরিক গঠন, শারীরতত্ত্ব ও রোগনির্ণয়ের উপর ভিত্তি ক'রে পরীক্ষামূলকভাবে এই চিকিৎসা করেন। আবার এ্যাকুপাংচারের পদ্ধতি, জীবনীশক্তি-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা, সূচীবিদ্ধকরণের স্থাননির্ণয়, এ্যাকুপাংচার-চিকিৎসক হবার জন্য নিম্নতম শিক্ষার মান ইত্যাদি নিয়ে দেশভেদে মতভেদ বর্তমান।

সে যাই হোক, এ্যাকুপাংচার এখন সব মহাদেশেই স্থায়ী আসন দখল করেছে। আফ্রিকার ঘানা ও নাইজেরিয়াতে এবং পাকিস্তানে সত্তরের দশকে এটি চালু হয়েছে। শ্রীলঙ্কাতে এ্যাকুপাংচারের মূলতত্ত্ব দু-হাজার বছর আগে জানা ছিল, তবে বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসকরা চীনে এই প্রথা শিখে এসে প্রয়োজনমত ব্যবহার করেন। আমেরিকাতে গত শতাব্দীর শেষের দিকে এটি কিছু কিছু চালু হয়। এ্যাকুপাংচারের ফলাফল সম্বন্ধে সে দেশে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হওয়ায় এবং প্রথাটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকায় প্রথমে এটিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, তবে মানুষের দেহে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে ওখানকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ, কমিটি ও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্থির করেন যে, এ্যাকুপাংচারের যন্ত্রণাবোধ-দূরীকরণের ক্ষমতা সম্বন্ধে গবেষণা করা হবে। ১৯৭৪ সালে এইভাবেই প্রথাটি আইনভুক্ত হয়। ইউরোপ, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও জার্মানীতে গত কয়েক বছর যাবৎ এই চিকিৎসাপ্রথা চালু হয়েছে। জাপানে প্রায় একহাজার বছর ধরে এই চিকিৎসা চলছে। মালয়েশিয়া বর্তমানে এটিকে স্বীকৃতি দেবার পথে।

উপরে উল্লিখিত বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার সেমিনারে লক্ষ্য করা হয় যে, কয়েকটি রোগে এ্যাকুপাংচার একমাত্র চিকিৎসারূপে, আবার কয়েকটিতে অন্যান্য চিকিৎসার সঙ্গে এটি ব্যবহৃত হয়। যেসব রোগে বর্তমানে এ্যাকুপাংচার ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হচ্ছে: দাঁতে ব্যথা ও দাঁত তোলার যন্ত্রণা, সর্দি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি (বিশেষত শিশুদের), গ্যাস্ট্রাইটিস ও অম্লরোগ, আমাশয়, চোখ-উঠা ও চোখে ছানি, মাথাধরা, পক্ষাঘাত, অস্টিও-আরথ্রাইটিস, সায়াটিকা, শিরদাঁড়ায় ব্যথা প্রভৃতি। এইসব অসুখে এ্যাকুপাংচার চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় ব'লে দাবী করা হলেও, ফলাফল বিজ্ঞান-

সম্যকভাবে নিরূপিত হয়নি। গর্ভাবস্থা, হৃৎপিণ্ডের কয়েকটি অসুখ, রক্তক্ষরণের প্রবণতা, সূচফুটানোর জায়গায় চর্মরোগ প্রভৃতি অবস্থায় এ্যাকুপাংচার বিধেয় নয়। এই সেমিনারে এ্যাকুপাংচারের সাহায্যে অজ্ঞান করার ব্যাপারটি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। ঠিক হয় যে, এ্যাকুপাংচারের সাহায্যে একেবারে অসাড় করা যায় না এবং যন্ত্রণাবোধক্ষমতা নষ্ট হলেও, ঠাণ্ডা-গরমবোধ বা স্পর্শবোধ নষ্ট হয় না। সেইজন্য সেমিনারে 'এ্যাকুপাংচার-এ্যানিস্থেসিয়া (anæsthesia)'র বদলে 'এ্যাকুপাংচার-এ্যানালজেসিয়া (analgesia)' কথাটি ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আলোচনায় দেখা যায় যে, চীনদেশে সব অস্ত্রোপচারের ১৫-২০ শতাংশে এ্যাকুপাংচার-এ্যানালজেসিয়া হিসাবে অর্থাৎ যন্ত্রণাবোধনাশকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাথা, ঘাড়, বক্ষস্থল, পেটের কয়েকটি (বিশেষত সন্তাননিরোধের জন্য) অস্ত্রোপচারে এর প্রয়োগ বেশী ফলপ্রদ। আমেরিকা ও ইউরোপেও অনেক অস্ত্রোপচার এ্যাকুপাংচারের সাহায্যে হচ্ছে। সব জায়গার হিসাব মিলালে দেখা যায়, যেসব ক্ষেত্রে প্রথাটি এ্যানালজেসিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার ৭০-৮০ শতাংশেই এটি ফলপ্রসূ হয়েছে। যাই হোক, এ্যাকুপাংচার অস্ত্রোপচারে অবেদন অর্থাৎ অজ্ঞানকরণের ক্ষেত্রে যে অতি মূল্যবান পদ্ধতি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গবেষণা : গত দশবছরে এ্যাকুপাংচার সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। জন্তুজানোয়ারের উপরেও এই গবেষণা চলছে। এ্যাকুপাংচারের প্রধান কাজ হচ্ছে শরীরের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং শরীরের রোগপ্রতিরোধক্ষমতা, যন্ত্রণারোধক্ষমতা, প্রদাহরোধক্ষমতা, পক্ষাঘাতরোধক্ষমতা, সংকোচননিবারণক্ষমতা এবং স্নায়বিক উত্তেজনা নিরোধক্ষমতাকে বর্ধিত করা। চীনা বৈজ্ঞানিকগণ এ্যাকুপাংচারের স্নায়ুর উপর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

শিক্ষণ : এ্যাকুপাংচারকে যখন আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালীর অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে, তখন এর শিক্ষণব্যবস্থারও প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রয়োজনভেদে বিজ্ঞানশিক্ষার অঙ্গহিসাবে, মেডিকেল কলেজে এবং গ্রামীণ প্রাথমিক চিকিৎসকের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। শিক্ষণকালও সেইরূপ বিভিন্ন হবে। চীনদেশের মেডিকেল কলেজে এ্যাকুপাংচারসহ পুরাতন চীনাশিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়; আবার গ্রামীণ নগ্নপদচিকিৎসক ('barefoot doctors') এবং শহুরে চিকিৎসক ('red medics')-দেরও সর্দি জ্বর প্রভৃতি সাধারণ রোগে এ্যাকুপাংচারের প্রয়োগ শিখতে হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ্যাকুপাংচার শিখবার কোন বিশিষ্ট ধারা নেই বা সুযোগ নেই। সেখানকার পাস করা চিকিৎসকদের এ বিষয়ে আগ্রহ নেই, কিন্তু অজ্ঞতা আছে। ফলে রোগীরা এ্যাকুপাংচার চিকিৎসার জন্য অশিক্ষিতদের কাছে যেতে বাধ্য হয়।

উল্লিখিত সেমিনারে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থাকে এ্যাকুপাংচার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে জ্ঞানবিস্তারের জন্য অনুরোধ জানান হয়েছে।

(WHO Chronicle, July/August 1980, pp. 294-301.)

উৎসব

আরিট (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা ও ৪ঠা মে (১৯৮০), শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ৩রা মঙ্গলারতি, সংগীত, সুরে কথামৃত, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ গ্রামপরিক্রমা, বিশেষ পূজা, কথামৃতপাঠ ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে আশ্রম-

প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণীপাঠ এবং আলোচনা হয়। উক্ত সভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী বিশোকাত্মানন্দ এবং স্বামী সুশান্তানন্দ। রাত্রে কালীকীর্তন হয়। ৪ঠা প্রাতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক ক্রীড়াদির অনুষ্ঠান হয়। বৈকালে বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বিশোকাত্মানন্দ; প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ। রাত্রে ডাঃ প্রভাতকুমার ঘোষের পরিচালনায় যোগ-ব্যায়াম ও অন্যান্য ব্যায়াম-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। পরে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

পরলোকে

শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য **অক্ষয়কুমার রায়** গত ৩০শে জানুআরি ১৯৮১, বৈকাল ৪-১০ মিনিটে ৮৮ বৎসর বয়সে দুর্গাপুরে পরলোকগমন করেন।

১২৯৯ সনে ঢাকা জেলার পীরপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি বি. এ. পাস করিয়া চট্টগ্রাম মর্দাল স্কুল ও রংপুর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু পূজ্যপাদ মহারাজদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২২ খ্রীঃ তিনি স্বামী শিবানন্দজীর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। রামকৃষ্ণ মঠের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী প্রয়াত স্বামী পবিত্রানন্দজী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। অকৃতদার অক্ষয়বাবু গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর মতই জীবনযাপন করিতেন। শিশুর মত সরল ছিলেন তিনি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রসঙ্গ লইয়াই তিনি কালাতিপাত করিতেন। 'উদ্বোধন' ও অন্যান্য ধর্মবিষয়ক পত্রিকাতে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তকের লেখক, যেগুলি একদা পূর্ববঙ্গে বেশ প্রচলিত ছিল। শেষ জীবনে তিনি ছোটদের জন্য স্বামীজীর একটি প্রামাণিক জীবনী রচনার কাজে নিরত ছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি আমৃত্যু 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক ছিলেন।

গত ৫ই ফেব্রুআরি ১৯৮১, বেলা ১১-১৫ মিনিটে **সুধীরকুমার বসাক** ৬১ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মস্তিষ্কের কোন অংশে রক্ত-সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত হয়।

১৩২৬ সনের ১৩ই চৈত্র, কলিকাতায় তাঁহার জন্ম। ২৮ বৎসর বয়স হইতেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট সেতার-বাদন ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত শিক্ষা করেন। গত দশ বৎসর যাবৎ তিনি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে নিত্য যাতায়াত করিতেন এবং গত চার বৎসর সেখানে সান্ধ্য আরাত্রিক-ভজন প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত পরিচালনা করেন। উদ্বোধন কার্যালয়ে 'সারদানন্দ হলে' প্রতি সপ্তাহে দুইদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। এই দুই দিনের সভাতেও তিনি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করিতেন।

সান্ধ্য আরাত্রিক শুরু হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা আগে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর নাটমন্দিরে অতি নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন জপ-ধ্যান করিতেন। আরাত্রিকের পরেও কিছুক্ষণ জপ-ধ্যান করিয়া গৃহে ফিরিতেন। মাঝে মাঝে সকালে আসিয়াও জপ-ধ্যান করিতেন। দেহান্তের পূর্বদিন তিনি সকালে প্রায় তিন ঘণ্টা উক্ত নাটমন্দিরে বসিয়া জপ-ধ্যান করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় একটি মাটির গ্লাসে করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের অন্নপ্রসাদ লইয়া যান। এবং যথারীতি বিকালে আসিয়া জপ-ধ্যান করিয়া আরাত্রিক-ভজন পরিচালনা করেন।

দানশীল, সেবাপরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তিমান, সুগায়ক ও অমায়িক প্রকৃতির এই মানুষটির অভাবে আমরা মর্মাহত।

KOLAY
DELTA
SPICED BISCUITS

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই: ১ম ভাগ, পৃ: ৮২৪, মূল্য ২৮'০০। ২য় ভাগ পৃ: ৬২৮, মূল্য ২২'৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃ: ১৪৬, মূল্য ৫'২৫; ২য় খণ্ড পৃ: ৪১৪, মূল্য ৭'৮০; ৩য় খণ্ড পৃ: ২৬৪ মূল্য ৮'২৫; ৪র্থ খণ্ড পৃ: ২৯৫, মূল্য ৯'৫০; ৫ম খণ্ড পৃ: ৪০০, মূল্য ১১'৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। পৃ: ৬৪০, মূল্য ২৬'০০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃ: ১১২, মূল্য ৩'৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃ: ২৯৬, সাধারণ ৬'০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃ: ৩৬, মূল্য ১'২০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃ: ৪০, মূল্য ৫'২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত, পৃ: ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২'২০, বাঁধাই ২'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ। পৃ: ২০৯, মূল্য ৯'০০

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী—স্বামী অচ্যুতানন্দ সঙ্কলিত, পৃ: ৬১, মূল্য ১'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃ: ২০৬, মূল্য ৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃ: ১৫৮, মূল্য ৪'২৫

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃ: ২১৬, মূল্য ৭'৫০, ২য় ভাগ পৃ: ৪০৮, মূল্য ১০'০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃ: ২৫৬, মূল্য ৬'০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃ: ৬৪২, মূল্য ১৭'০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃ: ৪০, মূল্য ৩'০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃ: ৪৬৪, মূল্য ১৬'০০; ২য় খণ্ড পৃ: ৪৮৭, মূল্য ১৬'০০; ৩য় খণ্ড পৃ: ৪৯২, মূল্য ১৮'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃ: ১৩৬, মূল্য ২'৫০

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। দ্বিতীয় সং, পৃ: ৫৮, মূল্য ২'৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃ: ২৫৮, মূল্য ৭'০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ: স্বামী মাধবানন্দ)। পৃ: ৩০৬, মূল্য ৮'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃ: ১২৪, মূল্য ১'২৫

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

*
* *

*
* *

Udbodhan—Phone : 55-2447 FEBRUARY 1981 Regd. No. WB/NC-19

৮০।৬ [illegible] ট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১৪·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

চৈত্র ১৩৮৭

৮৩তম বর্ষ

৩য় সংখ্যা

তেল মাখা কি
ছেড়েই দিলি ?
জবাকুসুম

উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

কর্মের দ্বারাই যোগ হোক আর
মনের দ্বারাই যোগ হোক, ভক্তি
হলে সব জানতে পারবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

Statement about ownership and other particulars of

UDBODHAN

FORM IV

According to Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

(1) Place of Publication	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700003.
(2) Periodicity of its Publication	Monthly.
(3) Printer's Name	Swami Hiranmayananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.
(4) Publisher's Name	Swami Hiranmayananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.
(5) Editor's Name	Swami Hiranmayananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
(6) Name & Address of individuals who own the Newspaper	Trustees of the Ramkrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal.

1.	Swami Vireswarananda	*President*	-do-
2.	Swami Nirvanananda	*Vice-President*	-do-
3.	Swami Bhuteshananda	"	-do-
4.	Swami Gambhirananda	"	-do-
5.	Swami Vandanananda	*General Secretary*	-do-
6.	Swami Gahanananda	*Asst. Secretary*	-do-
7.	Swami Atmasthananda	"	-do-
8.	Swami Gitananda	*Treasurer*	-do-
9.	Swami Abhayananda		-do-
10.	Swami Ranganathananda		-do-
11.	Swami Tapasyananda		-do-
12.	Swami Adidevananda		-do-
13.	Swami Hiranmayananda		-do-

I, Swami Hiranmayananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI HIRANMAYANANDA
Signature of Publisher.

Date: 15. 3. 1981.

৮৩তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা চৈত্র, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

স্বাধীনতার আদর্শই হইতেছে মোক্ষলাভের প্রকৃত আদর্শ। তাহা ইন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব—আনন্দ বা বেদনা, ভাল বা মন্দ যাবতীয় বিষয় হইতে মুক্তি।

ইহা হইতেও অধিক—আমাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হইবে; এবং মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। জীবন মৃত্যুরই ছায়া মাত্র। জীবন থাকিলেই মৃত্যু থাকিবে; সুতরাং মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত হও।

আমরা চিরকালই মুক্ত, কেবল আমাদিগকে উহা বিশ্বাস করিতে হইবে, যথেষ্ট বিশ্বাস থাকা চাই। তুমি অনন্ত মুক্ত আত্মা, চিরমুক্ত—চিরধন্য। যথেষ্ট বিশ্বাস রাখো—মুহূর্ত মধ্যে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে।

দেশ কাল ও নিমিত্তের অন্তর্গত সমুদয় বস্তু বদ্ধ। আত্মা সর্বপ্রকার দেশ কাল ও নিমিত্তের বাহিরে। যাহা বদ্ধ, তাহাই প্রকৃতি,—আত্মা নয়।

অতএব তোমার মুক্তি ঘোষণা কর, এবং তুমি প্রকৃত যাহা, তাহাই হও—চিরমুক্ত, চির-ভাগ্যবান্।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।২৫০-৫১]

কথাপ্রসঙ্গে

সাযুজ্যমুক্তি

শংকরাচার্যের প্রশিষ্য[1] সর্বজ্ঞাত্মমুনি তাঁহার রচিত অদ্বৈতবেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সংক্ষেপ-শারীরকে'র শেষ অধ্যায়ে একটি শ্লোকের (৪।৩৪) প্রথম চরণে লিখিয়াছেন : 'সাযুজ্যাদি বিবাদ-গোচরপদং নিঃশ্রেয়সং নো ভবেৎ।' অর্থাৎ, বিবাদের বিষয়ীভূত সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য প্রভৃতি[2] মুক্তিপদ বা মুক্ত্যবস্থা প্রকৃত মুক্তি নহে। কেন নহে, তাহার বিচার আমাদের আলোচ্য বিষয় না হইলেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্রিয়ার ফল মাত্রেই অনিত্য এবং সাযুজ্যাদি মুক্তি উপাসনারূপ ক্রিয়ার ফল হওয়ায় উহারা অনিত্য। আর যে-মুক্তি নিত্য নহে, তাহা প্রকৃত-মুক্তিপদবাচ্য নহে।

উদ্ধৃত শ্লোকচরণে 'বিবাদগোচরপদং' এবং 'সাযুজ্যাদি' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রথমতঃ কিছু মন্তব্য করা যাইতেছে। বেশ বুঝা যায়, সর্বজ্ঞাত্মমুনির সমকালে বা তৎপূর্বে সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য প্রভৃতি মুক্তি সম্বন্ধে কলহ ছিল। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কালে এই কলহ তুমুল হইয়া উঠে এবং 'বিবাদগোচরপদং' বিশেষণটির প্রয়োগ যে কতদূর সার্থক তাহা সহস্রাধিক বৎসর পরেও আজ আমরা ভাবিয়া বিস্মিত হই। আর 'সাযুজ্যাদি' শব্দটির পরিবর্তে তিনি অনায়াসে 'সালোক্যাদি', 'সারূপ্যাদি' বা 'সামীপ্যাদি' শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন—তাহাতে ছন্দোভঙ্গ হইত না। কিন্তু তাহা যে তিনি করেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা ভেদাভেদবাদীদের চরম লক্ষ্য এই সকল মুক্তির মধ্যে সাযুজ্যমুক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ —সালোক্যাদি মুক্তি সাযুজ্যমুক্তিরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যিনি সাযুজ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সালোক্যাদি মুক্তিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ-বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা যাইবে। (পৃঃ ১১৯ দ্রষ্টব্য)

এখন সাযুজ্যাদি মুক্তি সম্পর্কিত বিবাদের বিস্তারিত কথা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

(১) ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা ॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য ॥ (১।৩)

১ এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। সর্বজ্ঞাত্মমুনি শংকরাচার্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্যের শিষ্য—ইহাই প্রচলিত মত এবং রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (পরবর্তী কালে স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী) তাঁহার সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র ভূমিকায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি।

২ সগুণব্রহ্মবিদ্‌গণের মুক্তি পঞ্চবিধ—(১) সালোক্য : অভীষ্ট দেবতার সহিত একই লোকে (বৈকুণ্ঠাদিতে) বাস ; (২) সারূপ্য : অভীষ্ট দেবতার সহিত সমানরূপতা (যেমন বৈকুণ্ঠে সকলেই চতুর্ভুজ—ভাগবত, ৩।১৫।১৪) ; (৩) সামীপ্য : অভীষ্ট দেবতার সমীপে বাস—পার্ষদরূপে ; (৪) সাযুজ্য : সাযুজ্যমুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা বর্তমান প্রবন্ধেই পাওয়া যাইবে ; (৫) সার্ষ্টি (বা সার্ষ্ট্য বা সার্ষ্টিতা) : অভীষ্ট দেবতার ন্যায় সমান ঐশ্বর্য (যেমন মুক্ত ব্যক্তিদের অণিমাদি ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি। তবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে না—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭)।

মুক্তিকোপনিষদে সার্ষ্টির উল্লেখ নাই—অবশিষ্ট চারিটি মুক্তির কথা আছে ; অধিকন্তু কৈবল্যমুক্তির কথা আছে এবং বলা হইয়াছে, একমাত্র কৈবল্যমুক্তিই পারমার্থিকী ('কৈবল্যমুক্তিঃ একা এব পারমার্থিকরূপিণী'—১।১৮)।

(২) সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥
ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি॥ (১।৫)

(৩) নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥ (ঐ)

(৪) সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥ (২।৬)

এই সকল পয়ার হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে সাযুজ্যমুক্তি সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

কিন্তু রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ মহান আচার্য-গণের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা ব্রহ্ম-সাযুজ্যেরই জয়গান গাহিয়াছেন এবং সাযুজ্যমুক্তিই যে জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। (তাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য-ভেদে সাযুজ্যমুক্তি দ্বিবিধ—এরূপ মত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম আর ঈশ্বরে কোনও পার্থক্য নাই)। আচার্য নিম্বার্ক তাঁহার 'মন্ত্ররহস্যষোড়শী'র নবম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, সাধক নিজেকে শ্রীগুরুর মাধ্যমে শ্রীভগবানে উৎসর্গ করিলে কৃতকৃত্য হন—ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন ('হুত্বাত্মানং বুধশ্চৈবং কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে। ভববন্ধবিনির্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥') ব্রহ্মসাযুজ্য যে ভগবদ্-ভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ—ইহাও তিনি 'মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী'র চতুর্দশ শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন ('…তদ্ভাবাপত্তিলক্ষণম্। শ্রেয়ঃ প্রয়োজনম্ জ্ঞেয়ং…॥')। উল্লিখিত নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য সুন্দর ভট্ট শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-সাযুজ্যের অর্থ 'ব্রহ্ম-ঐক্য' নহে।

রামানুজীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের নিত্য পঠনীয় বরদাচার্য-রচিত একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, মুক্তির অধিকারী জীব দেহান্তে দেবযানমার্গে গমন করিয়া নিত্য, অপ্রাকৃত শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া সেখানে পরব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করিয়া পরমানন্দ-ধন্য হন ('শ্রীবৈকুণ্ঠমুপেত্য নিত্যমজড়ং তস্মিন্ পরব্রহ্মণঃ/সাযুজ্যং সমবাপ্য নন্দতি সমং তেনৈব ধন্যঃ পুমান্')।

সাযুজ্যমুক্তির অর্থ যে 'ব্রহ্ম-ঐক্য' নহে, ইহা আচার্য রামানুজও শ্রীভাষ্যে (১।১।১) নানা যুক্তি ও প্রমাণসহায়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্বগ দ্রামিড়াচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য হইতেও উদ্ধৃতি দিয়াছেন: 'দেবতাসাযুজ্যাৎ অশরীরস্য অপি দেবতাবৎ সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ।' এখানে 'দেবতা'র অর্থ শ্রীভগবান এবং 'অশরীরস্য'-এর অর্থ মুক্ত ব্যক্তির (কারণ মুক্ত ব্যক্তির প্রাকৃত দেহ থাকে না)। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটির অর্থ: ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করায় মুক্ত ব্যক্তিরও শ্রীভগবানের ন্যায় সর্ববিষয়ে সিদ্ধি-লাভ হয়। তাৎপর্য এই যে মুক্ত ব্যক্তির শ্রীভগবানের সহিত ঐক্য হয় না, কিন্তু তিনি শ্রীভগবানের ন্যায় সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প হন।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের মতে ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য নিকৃষ্টতর ('ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার')। এ-বিষয়ে এই যুক্তি দেখানো হয় যে, ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত ব্যক্তিদের—অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের—কথঞ্চিৎ এই সম্ভাবনা থাকে যে, ঐ লীনাবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি সেব্য-সেবকভাব লইয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর সেব্য-সেবকভাবের প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা

থাকে না, কারণ তাঁহারা যাঁহার সেবা করিবেন, তাঁহারই অঙ্গে লীন হইয়া গিয়াছেন।[৩]

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে সাযুজ্যমুক্তি[৪] দিয়াছিলেন এবং সেই সাযুজ্যমুক্তি ঈশ্বরসাযুজ্যমুক্তি হইলেও শিশুপাল পুনরায় শ্রীবৈকুণ্ঠের দ্বারপাল হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিশুপাল যে সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকেই শুকদেবের উক্তিরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে ('বাসুদেবে ভগবতি সাযুজ্যং চেদিভূভুজঃ'—৭।১।১৩)। এবং সাযুজ্যমুক্তির যে-দ্বৈবিধ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক প্রবেদিত[৫], তদনুসারে শিশুপালের সাযুজ্যমুক্তি যে ঈশ্বর-সাযুজ্যমুক্তি—এ-বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বিষয়টির স্পষ্টীকরণের জন্য শিশুপালের কাহিনীটি এখানে বিবৃত করা প্রয়োজন, যদিও উহা অনেকেরই অবিদিত নহে।

ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন একদা বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণের দর্শনাভিলাষী চতুঃসন একে একে ছয়টি প্রাকারদ্বার অতিক্রম করিয়া সপ্তম প্রাকারদ্বারে পৌঁছিয়া দুই জন দ্বারপালকে দেখিতে পাইলেন। 'জয়' ও 'বিজয়' নামধারী এই দুই দ্বারীকে চতুঃসন কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সপ্তম প্রাচীরদ্বারে প্রবেশ করিলেন। পরম জ্ঞানী চতুঃসন পঞ্চমবর্ষীয় বালকবৎ বিচরণ করিতেন। নগ্ন কুমারচতুষ্টয়কে দেখিয়া জয় ও বিজয় বেত্রের দ্বারা তাঁহাদের নিবারণ করিলেন। শ্রীহরির দর্শনে ব্যাঘাত হওয়ায় চতুঃসন সহসা কুপিত হইয়া জয় ও বিজয়কে অভিশাপ দিলেন: 'তোমরা এই বৈকুণ্ঠ-লোক হইতে সেই লোকে যাও, যেখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই রিপুত্রয় বিদ্যমান।' জয় ও বিজয় বুঝিলেন যে, ইহা অমোঘ ব্রহ্মশাপ এবং মহাভীত হইয়া নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া চতুঃসনের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও চতুঃসনের অনুগ্রহে তাঁহাদের যেন শ্রীভগবানের স্মরণ-প্রতিবন্ধক মোহ উপস্থিত না হয়।

এদিকে অন্তর্যামী শ্রীহরি সমস্ত ব্যাপারটি অবগত হইয়া লক্ষ্মীদেবীসহ সেখানে উপস্থিত হইলে চতুঃসন তাঁহার স্তব করিলেন। স্তবে হইয়া শ্রীভগবান বলিলেন: 'এই জয় ও বিজয় আমার পার্ষদ, কিন্তু ইহারা তোমাদের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিয়া আমাকেও করিয়াছে। অতএব তোমরা ইহাদের যে-দণ্ডবিধান করিয়াছ, তাহা আমি অনুমোদন করিতেছি। আমার সেবকেরা তোমাদের যে-তিরস্কার করিয়াছে, তাহা আমারই কৃত বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, উহারা তাহাদের অপরাধের সমুচিত গতি

৩ এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপনিষদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের মতে তিনি ঈশ্বরের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি ('যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা'—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোক)।

৪ শ্রীসম্প্রদায়ের যামুনাচার্য-বিরচিত প্রসিদ্ধ 'স্তোত্ররত্নে'ও শিশুপালের সাযুজ্যমুক্তির উল্লেখ আছে ('…যচ্চ চৈদ্যস্য কৃষ্ণ / প্রতিভবমপরাদ্ধুর্মুগ্ধসাযুজ্যদোঽভূঃ…'—হে কৃষ্ণ, প্রতি জন্মে তোমার নিকট অপরাধী চেদিরাজ শিশুপালকে তুমি যখন আনন্দময় সাযুজ্যমুক্তি দান করিয়াছ, [তখন বল এমন কী পাপ আছে, যাহা তুমি ক্ষমা করিতে পার না।])।

৫ জীব গোস্বামীও ভগবৎসাযুজ্য ও ব্রহ্মসাযুজ্য ভেদে সাযুজ্যমুক্তি যে দুই প্রকার, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের উপর তাঁহার টীকা 'ক্রমসন্দর্ভে' উল্লেখ করিয়াছেন ['সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য' ইত্যাদি (৩।২৯।১৩) শ্লোকটির টীকা দ্রষ্টব্য]।

সত্ত্বঃ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হউক। আমার সেবকদ্বয়ের আমার নিকট হইতে অন্যত্র বাস তোমরা অচিরে সমাপ্ত করিলে আমারই প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ করা হইবে।'

শ্রীহরির কথা শুনিয়া চতুঃসন বলিলেন : 'হে প্রভু, নিবৃত্তিধর্মনিষ্ঠ যোগীরা আপনারই অনুগ্রহে অচিরে মৃত্যুঞ্জয় হন—আপনি এ কী বলিতেছেন, আমরা আপনাকে অনুগ্রহ করিব! আপনি যদি মনে করেন জয়-বিজয় নিরপরাধ, তাহাদের শাপ দিয়া আমরাই অপরাধ করিয়াছি, তাহা হইলে আমাদেরই দণ্ড দিন—সে-দণ্ড আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিব।'

চতুঃসনের কথা শুনিয়া শ্রীভগবান বলিলেন : 'জয়-বিজয় এখনই অসুরগতি প্রাপ্ত হউক। আমার প্রতি ক্রোধাবেশহেতু উহাদের চিত্তের একাগ্রতা দৃঢ় হইবে এবং তাহার ফলে উহারা শীঘ্রই আমার নিকট আসিতে পারিবে। তোমাদের প্রদত্ত অভিসম্পাত আমারই পূর্ববিহিত জানিবে।'

অনন্তর মুনিগণ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলে শ্রীহরি জয়-বিজয়কে বলিলেন : 'তোমরা এখান হইতে যাও, ভীত হইও না, তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা অচিরেই বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া আসিবে। এই ব্রহ্মশাপ আমার অনুমোদিত। কারণ, আমি যখন যোগনিদ্রায় ছিলাম, তখন লক্ষ্মীদেবী আমার আলয় হইতে বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ করিতে গেলে তোমরা তাঁহাকেও নিবারণ করিয়াছিলে। ইহাতে লক্ষ্মীদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তখনই বৈকুণ্ঠলোক হইতে তোমাদের পতন নির্ধারিত করিয়াছিলেন; সুতরাং এই ব্রহ্মশাপ নিমিত্তমাত্র।'

অনন্তর জয়-বিজয় বৈকুণ্ঠ হইতে পতিত হইয়া সত্যযুগে মর্ত্যলোকে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীহরি বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে এবং নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন। দ্বিতীয় জন্মে ত্রেতাযুগে জয়-বিজয় রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীহরি রামচন্দ্ররূপে তাঁহাদের বধ করেন। তৃতীয় জন্মে দ্বাপর যুগে তাঁহারা শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহাদের বধ করিলে তাঁহারা পুনরায় বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। (ভাগবত ৩।১৫-১৬ ; ৭।১)

শিশুপালবধ সম্বন্ধে মহাভারতে লিখিত আছে, পাণ্ডবদের রাজসূয়যজ্ঞে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে, যজ্ঞসভায় সমবেত সকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাঁহারই প্রাপ্য। ভীষ্মের কথায় সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিলে চেদিরাজ শিশুপাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরকে ভৎর্সনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতে থাকেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা শিশুপালকে বধ করেন। তখন সভাস্থ রাজন্যবর্গ দেখিলেন যে, একটি সূর্যসম উজ্জ্বল তেজ শিশুপালের দেহ হইতে নির্গত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে শিশুপালের দেহ হইতে নির্গত 'তেজ'-এর অর্থ লিঙ্গশরীর। ('তেজো লিঙ্গশরীরম্'—সভাপর্ব, অধ্যায় ৪৪, শ্লোক ২২)। শিশুপালের সূক্ষ্মশরীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করায় শিশুপালের যে-সাযুজ্যমুক্তি হইয়াছিল, তাহাকে ঈশ্বরসাযুজ্যমুক্তি বলা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরসাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়াও শিশুপাল শ্রীভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হন নাই। সুতরাং 'ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার' কথাটি সহজবোধ্য নহে।[৬]

৬ শংকরাচার্যও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (৪।৪।১৭) 'ঈশ্বরসাযুজ্য' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন ('যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহ এব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি' ইত্যাদি), তবে বলাই বাহুল্য, কৃষ্ণদাস

* * *

বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সাযুজ্যমুক্তি ব্যাখ্যাত হওয়ায় বিষয়টি জটিল হইয়া গিয়াছে। অবশ্য কোনও মতবাদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই। 'যত মত তত পথ'—এই সত্যে আমরা বিশ্বাসী। তবে তুলনামূলক আলোচনা সর্বদাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, উহার ফলে কোন একটি বিশেষ মতবাদের সাহায্যে উপস্থাপিত কোন ব্যাখ্যার অন্ধ অনুসরণ না করিয়া যে-ব্যাখ্যা আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তাহা আমরা স্বাধীনভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং কোন একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের দিকে না ঝুঁকিয়া প্রথমে 'সাযুজ্য' শব্দটির অর্থ-নিরূপণ প্রয়োজন।

'সযুক্'-এর ভাব এই অর্থে 'সযুজ্' শব্দটি হইতে সাযুজ্য শব্দটি নিষ্পন্ন।[৭] শব্দটি বিভিন্ন উপনিষদ্, 'ধর্মশাস্ত্র', ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ ও স্তোত্রাদিতে আমরা পাই। সেগুলির প্রাসঙ্গিক অংশের কিছু কিছু আমরা আলোচনা করিব। উহাতে 'সাযুজ্য'-এর অর্থ স্পষ্ট হইতে পারে।

মুণ্ডকোপনিষদে 'সাযুজ্য' শব্দটি না থাকিলেও আলোচ্যমান প্রসঙ্গে প্রথমেই উহার বিখ্যাত 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' (৩।১।১) মন্ত্রটির কথা মনে পড়ে। শংকরাচার্য ইহার ভাষ্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া 'দ্বা', 'সুপর্ণা' ইত্যাদি পদচতুষ্টয় মন্ত্রটিতে ঐভাবে আসিয়াছে; লৌকিক সংস্কৃতে উহারা হইবে—দ্বৌ সুপর্ণৌ সযুজৌ সখায়ৌ। 'সযুজৌ'-এর অর্থ তিনি করিয়াছেন, 'সহ এব সর্বদা যুক্তৌ'—সর্বদা একসঙ্গে যুক্ত বা মিলিত। (মন্ত্রটিতে বলা হইয়াছে, একই দেহবৃক্ষে জীব ও ঈশ্বররূপ পক্ষিদ্বয় অধিষ্ঠিত।)। সুতরাং এই মন্ত্র হইতে সাযুজ্যের অর্থ দাঁড়ায়—সর্বদা সম্মিলিত বা যুক্ত থাকার অবস্থা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'সাযুজ্য' শব্দটি ছয়বার পাওয়া যায়—প্রথম অধ্যায়ে দুইবার এবং পঞ্চম অধ্যায়ে চারিবার; সর্বত্রই প্রাণোপাসনার প্রসঙ্গে। প্রথম অধ্যায়ের একস্থলে (১।৩।২২) শংকরাচার্য তাঁহার ভাষ্যে সাযুজ্যের অর্থ করিয়াছেন—'সযুগ্‌ভাবঃ সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমানত্বম্'। অর্থাৎ, সাযুজ্যের অর্থ সযুগ্‌ভাব—প্রাণদেবতার সদৃশ দেহেন্দ্রিয়ে অভিমান। প্রথম অধ্যায়ের অন্যত্র

কবিরাজ গোস্বামী যে-অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অর্থে নহে। কারণ, শংকরপ্রমুখ অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করেন না যে, উপনিষদের অদ্বৈতব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের (ঈশ্বরের) অঙ্গকান্তি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শিশুপালের স্থূলদেহ হইতে নির্গত তেজকে নীলকণ্ঠ যে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা অদ্বৈতবাদীদেরই ব্যাখ্যা। শংকরাচার্যও উপরি-উক্ত ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, যাঁহারা ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহারা মনের দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হন। 'মন' শব্দটি এখানে উপলক্ষণ—'মন' বলিতে লিঙ্গশরীর। কিন্তু দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি আচার্যগণের মতে সাযুজ্যাদি মুক্তিতে লিঙ্গশরীর থাকে না—'অপ্রাকৃত তনু' থাকে।

৭ 'সাযুজ্য' শব্দটির সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি দেখাইতে হইলে একেবারে 'যুজ্' ধাতু হইতে আরম্ভ করিতে হয়। দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী 'যুজ্' ধাতুর অর্থ যুক্ত হওয়া, সমাহিত হওয়া। এই ধাতুর উত্তর পাণিনির 'ক্বিপ্ চ' সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'যুজ্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ('যুজ্যতে সমাধত্তে ইতি যুক্')। প্রথমার একবচনে 'যুক্'। ইহার অর্থ—যিনি যুক্ত, সমাহিত। 'যুজা সহ'—যুক্-এর সহিত যিনি বর্তমান—এই অর্থে 'সযুজ্' শব্দটি হয় (পাণিনির 'তেন সহেতি তুল্যযোগে' সূত্রানুসারে বহুব্রীহি সমাস)। সযুক্-এর ভাব—এই অর্থে 'সযুজ্' শব্দের উত্তর ষ্যঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'সাযুজ্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। (পাণিনির সূত্রঃ 'গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্মণি চ')। কেবলমাত্র এইভাবেই যে 'সাযুজ্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, তাহা নহে; অন্যভাবেও হইতে পারে।

(১।৫।২৩) সাযুজ্যের অর্থ করিয়াছেন—'সযুগ্-ভাবম্ একাত্মত্বম্'। অর্থাৎ, সাযুজ্যের অর্থ সযুগ্‌ভাব—একাত্মতা। পঞ্চম অধ্যায়ের (৫।১৩।১-৪) চারিটি স্থলে সাযুজ্যের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই—প্রথম অধ্যায়েই দুইবার ব্যাখ্যা করায়, পুনরায় ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। এই ছয়টি স্থলেই 'সাযুজ্য' শব্দটির সহিত 'সালোক্য' বা 'সলোকতা' শব্দদ্বয় আসিয়াছে এবং শংকরাচার্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সাধনার উৎকর্ষে 'সাযুজ্য' ও অপকর্ষে 'সালোক্য' লব্ধ হয়। প্রাণদেবতা হইতেছেন হিরণ্যগর্ভ। বিভিন্ন প্রকারে তাঁহার উপাসনা করা হয়। উপাসনা উৎকৃষ্ট হইলে সাধক হিরণ্যগর্ভের সহিত একাত্মতা লাভ করেন, নিকৃষ্ট হইলে হিরণ্যগর্ভের লোকে বাস করেন, কিন্তু তাদাত্ম্য লাভ করিতে পারেন না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন সামের উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। একটি সামের নাম 'রাজন' সাম। এই রাজন-সামকে দেবতা-বৃন্দে প্রতিষ্ঠিত দেখাই রাজন-সামের উপাসনা। 'রাজন' শব্দের অর্থ দীপ্তিমান্। অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতি দেবগণও দীপ্তিমান্। এই সাদৃশ্যহেতু রাজন-সামকে দেববৃন্দে প্রতিষ্ঠিত মনে করিতে হয়। এইভাবে উপাসনা করিলে যে-ফল পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে উপনিষদ্‌টি বলিতেছেন : 'স য এবম্ এতদ্ রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদ, এতাসাম্ এব দেবতানাং সলোকতাং সাষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি' ইত্যাদি (২।২০।২)। অর্থাৎ, যিনি রাজন-সামকে এইভাবে দেবগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি দেবগণের সালোক্য, সার্ষ্টি বা সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি। ইহার ভাষ্যে শংকরাচার্য লিখিয়াছেন যে, 'সলোকতা'র অর্থ সমানলোকতা, 'সাষ্টি'র অর্থ সমান ঋদ্ধি, 'সাযুজ্যে'র অর্থ সযুগ্‌ভাব—একদেহদেহিত্ব ; 'বা' শব্দটি মূলে উহ্য আছে, অর্থাৎ 'সাযুজ্যং' শব্দটির পরে এবং 'গচ্ছতি'র পূর্বে 'বা' শব্দটি পড়িতে হইবে ; কারণ, কেহ সালোক্য, কেহ সার্ষ্টি, কেহ বা সাযুজ্য লাভ করেন। উপাসনার তারতম্যহেতু ফলেরও তারতম্য হয়। নিষ্কর্ষ এই যে, উপাসনার পরাকাষ্ঠায় সাযুজ্য, ন্যূনতায় সালোক্য, সার্ষ্টি।

মুক্তিকোপনিষদে সালোক্যাদি মুক্তির আলোচনা আছে। এ-বিষয়ে আমরা পূর্বেই কিছু উল্লেখ করিয়াছি (পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য)। 'সাযুজ্য' মুক্তির প্রসঙ্গে উপনিষদ্‌টিতে 'ভ্রমরকীটে'র দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। উহা আমরা পরে 'ভ্রমরকীটে'র প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। (পৃঃ ১২৪ দ্রষ্টব্য)। এখানে যাহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য তাহা হইল—মুক্তিকোপনিষদ্ বলিতেছেন: 'সারূপ্য' মুক্তির অপর নাম 'সালোক্য-সারূপ্য' মুক্তি এবং 'সামীপ্য' মুক্তির অপর নাম 'সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য' মুক্তি। যদিও মুক্তিকোপনিষদ্ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, তথাপি এই ধারা অনুসারে আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, 'সাযুজ্য' মুক্তির অপর নাম 'সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য-সাযুজ্য' মুক্তি। ইহার অর্থ হইল : সালোক্যমুক্তি ব্যতীত সারূপ্য-মুক্তি হয় না ; সালোক্য ও সারূপ্য-মুক্তি ব্যতীত সামীপ্যমুক্তি হয় না এবং সালোক্য, সারূপ্য ও সামীপ্য-মুক্তি ব্যতীত সাযুজ্যমুক্তি হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, সালোক্যমুক্তি সারূপ্যমুক্তির অন্তর্ভুক্ত, সালোক্য ও সারূপ্য-মুক্তি সামীপ্যমুক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং সালোক্য, সারূপ্য ও সামীপ্য-মুক্তি সাযুজ্যমুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য সাযুজ্যমুক্তিকেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রমুখ আচার্যগণ আসল মুক্তি বলেন।

মৈত্রী উপনিষদ্, মহানারায়ণ উপনিষদ্ প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপনিষদে সাযুজ্যমুক্তির কথা আছে। বাহুল্যভয়ে সেগুলির আলোচনা আমরা করিলাম না। 'সাযুজ্য' শব্দটির অর্থ-নিরূপণের

উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি উপনিষদ্ অবলম্বনে শব্দটির অর্থ পাইলাম: সর্বদা সম্মিলিত বা যুক্ত থাকার অবস্থা, সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমান, একাত্মতা, একদেহিত্ব। *ইহাই যথেষ্ট মনে করি। এখানে* আপত্তি হইতে পারে, আমরা কেবলমাত্র শংকরাচার্যের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিলাম কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, আচার্য রামানুজ বা নিম্বার্কের কোন উপনিষদ্ভাষ্য নাই; আর, অধিক টীকা-ভাষ্যের প্রয়োজনও নাই। কারণ, শংকরাচার্য কর্তৃক উপরি-উক্ত অর্থ-নিরূপণে কোন দার্শনিক মতবাদ স্থান পায় নাই। সুতরাং তাঁহার নিরূপিত অর্থ স্বীকার করিতে কোন সম্প্রদায়ই আপত্তি করিবেন না। বিবাদ যাহা কিছু, সকলই দার্শনিক মতবাদ লইয়া—শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া নহে।

এখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বহুল উদ্ধৃত শ্লোকের আলোচনা করিব। শ্লোকটি এই

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(৩।২৯।১৩)

এই শ্লোকে ভগবান কপিল তাঁহার মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন যে, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদত্ত হইলেও উত্তম ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; শ্রীহরির সেবা ব্যতীত তাঁহারা অন্য কিছুই কামনা করেন না।

মূল শ্লোকে 'সাযুজ্য' শব্দটি নাই—'একত্ব' শব্দটি আছে। শ্রীধরস্বামী 'একত্বে'র অর্থ করিলেন 'সাযুজ্য'। এই অর্থ খুবই সমীচীন, কারণ শ্লোকোক্ত 'একত্ব' যদি জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বুঝায়, তাহা হইলে সাযুজ্যমুক্তিটি বাদ পড়িয়া যায়। কিন্তু সাযুজ্যমুক্তিকে বাদ দেওয়া যায় না, কারণ সালোক্যাদি, চতুর্বিধ মুক্তির উহাই চরম অবস্থা। আরও কথা এই যে, মুক্তির যে-প্রসঙ্গ চলিতেছে, তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ মুক্তির কোনই স্থান নাই। বস্তুতঃ আলোচ্য শ্লোকটির অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকেই আছে, 'মদ্ভাবায় উপপদ্যতে'; অর্থাৎ, এইরূপ ভক্তিযোগের দ্বারা মানুষ ভগবদ্ভাব-প্রাপ্তির যোগ্য হয়। আর পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নিম্বার্ক প্রমুখ আচার্যগণ ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিকেই সাযুজ্যমুক্তি আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন-একটি বিশেষ প্রসঙ্গে 'একত্বে'র অর্থ 'সাযুজ্য' করিলে 'সাযুজ্য' শব্দটিরই অর্থ 'একত্ব' হইয়া যায় না। 'একাত্মতা' আর 'একত্ব' এক কথা নহে, ইহাও মনে রাখা দরকার।

জনৈক টীকাকার আলোচ্য শ্লোকটির 'একত্বে'র অর্থ 'সাযুজ্য' গ্রহণ করিয়া সাযুজ্যের অর্থ করিয়াছেন 'সাধর্ম্য', কারণ গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ' (১৪।২)। সাযুজ্যের অর্থ সাধর্ম্য এবং সাধর্ম্যের অর্থ সাম্য[৮] অনেকেই করিয়াছেন। আমরাও এই অর্থ গ্রহণে পরাঙ্মুখ নহি। (তবে আমরা বলি, সাযুজ্যের ফলেই সাধর্ম্য বা সাম্যের আবির্ভাব হয়। পৃঃ ১২২ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উক্ত শ্রদ্ধাস্পদ টীকাকার 'সাযুজ্যে'র অর্থ 'সাধর্ম্য' করিতে যে-ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় গীতোক্ত 'সাধর্ম্য' শব্দটির দ্বারা তিনি পূর্ব-প্রভাবিত। তিনি লিখিয়াছেন: 'যুজ্যতে ইতি যুক্ ধর্মঃ, ধর্মঃ হি ধর্মিণা যুজ্যতে; সমানঃ যুক্ যস্য সঃ সযুক্, সযুজঃ ভাবঃ সাযুজ্যম্ সাধর্ম্যম্।' টীকাকারের বক্তব্য:

৮ রামানুজের গীতাভাষ্য, জীব গোস্বামীর 'সর্বসম্বাদিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। নাগোজী ভট্ট পাতঞ্জল মহাভাষ্যের উপর তাঁহার টীকায় 'সাম্যে'র অর্থ করিয়াছেন 'সাযুজ্য' ('প্রয়োজন' ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

'যুক্' শব্দের অর্থ ধর্ম ; কারণ, ধর্ম ধর্মীর সহিত যুক্ত থাকে। 'সযুক্'-এর অর্থ 'সধর্মা' অর্থাৎ সমানধর্মা। কাহার সহিত সমানধর্মা ? ঈশ্বরের সহিত। অসংখ্য কল্যাণগুণের আকরস্বরূপ ঈশ্বরের যেমন পাপরাহিত্য, জরারাহিত্য, মৃত্যুরাহিত্য, শোকরাহিত্য, ক্ষুধারাহিত্য, তৃষ্ণারাহিত্য, সত্যকামত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব—এই আটটি বিশেষ গুণ আছে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮।১।৫), জীবেরও সেইরূপ ঐ আটটি গুণ আছে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮।৭।১)। পার্থক্য এই যে, ঈশ্বরের ঐ গুণাষ্টক কখনও তিরোহিত হয় না, কিন্তু জীবের ঐ গুণাষ্টক অবিদ্যাপ্রভাবে তিরোহিত হয় এবং উপাসনাপ্রভাবে আবির্ভূত হয় এবং তখনই হয় ঈশ্বরের সহিত সাধর্ম্য। তাই সাযুজ্যের অর্থ সাধর্ম্য

টীকাকারগণের নিকট আমাদের ঋণ অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু কোন কোন স্থলে তাঁহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। প্রাসঙ্গিক একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শংকরাচার্য তাঁহার রচিত 'সৌন্দর্যলহরী' স্তোত্রে লিখিয়াছেন :

ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা-
মিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ।
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাম্ ॥

(শ্লোক ২২)

['ভবানি ! তুমি তোমার দাস, আমার উপর করুণাদৃষ্টি বিতরণ করো'—এইরূপ স্তুতি করিতে অভিলাষ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি 'ভবানি তুমি' (এইটুকু মাত্র) বলে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের দীপ্তিযুক্ত মুকুট দ্বারা উদ্ভাসিতচরণরূপ নিজ-সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক।]

টীকাকারেরা দেখিলেন, 'ভবানি' শব্দটির দুইটি অর্থ হয়—(১) 'হে ভবানি !' এবং (২) 'আমি যেন হই' (ভূ ধাতু, লোট্, উত্তমপুরুষ, একবচন)। সুতরাং 'ভবানি ত্বং'-এর অর্থ করা যায় 'আমি যেন তুমি হই'। অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সূচিত হওয়া 'ভবানি ত্বং' একটি মহাবাক্য হইয়া গেল ! দেবী ভবানীও ভাবেন, সাধক মহাবাক্য প্রয়োগ করিয়া দেবীর সহিত অভিন্নত্ব প্রার্থনা করিতেছেন। এইরূপ ভাবিয়া দেবী তাঁহাকে অভেদজ্ঞান দেন। কিন্তু সাধক তো নিজেকে দাস বলিতেছেন এবং দেবীর করুণাদৃষ্টি ভিক্ষা করিতেছেন। সুতরাং দেবীর ঐরূপ ভাবিবার কারণ কী ? আরও কথা এই যে, স্তোত্রটি শংকরাচার্য-রচিত এবং টীকাকারেরা যখন মহাবাক্যের প্রসঙ্গ তুলিতেছেন, তখন 'সাযুজ্য' শব্দটির প্রচলিত অর্থ ত্যাগ করিয়া এই বিশেষ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থই (ঐক্য) গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে 'নিজসাযুজ্যপদবীং'-এর 'মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুট-নীরাজিতপদাম্'—এই বিশেষণটির কী গতি হইবে ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ থাকিবেন, তাঁহাদের মণিমুকুটও থাকিবে, আবার মহাবাক্য-

৯ ধর্ম ধর্মীর সহিত যুক্ত হয়—এইহেতু 'যুক্'-এর অর্থ ধর্ম হইলে, কর্ম কর্মীর সহিত যুক্ত হয়—এইহেতু 'যুক্'-এর অর্থ কর্ম, গুণ গুণীর সহিত যুক্ত হয়—এইহেতু 'যুক্'-এর অর্থ গুণ—এইভাবে 'যুক্'-এর অসংখ্য অর্থ করা যাইতে পারে। সুতরাং টীকাকারের যুক্তিটি সহজবোধ্য নহে।

আমরা পাদটীকা ৭-এ যে-ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছি, তাহাতে 'যুক্' শব্দের অর্থ ঈশ্বর, যিনি নিত্যসমাহিত। 'সযুক্'-এর অর্থ যোগী, যিনি ঈশ্বরের সহিত বর্তমান ; অর্থাৎ, সর্বদা ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করেন। সেই যোগীর ভাব হইল 'সাযুজ্য'। ব্যুৎপত্তিগত এই অর্থের গুণাগুণ সুধীগণের বিবেচ্য।

জনিত 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' ব্রহ্মজ্ঞানও হইবে—ইহা কী করিয়া সম্ভব ?

সকল দিক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সাযুজ্যের অর্থ যদি 'তন্ময়তা' করা যায়, তাহা হইলে অসমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। ব্যুৎপত্তিগত যে সযুগ্‌ভাবের কথা শংকরাচার্য বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে 'তন্ময়তা' অর্থই পাওয়া যায় এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাধিক ব্যাখ্যাকার[১০] সাযুজ্যের এই 'তন্ময়তা' অর্থ করিয়াছেন। যে-সাম্যের কথা—সত্য-কামত্বাদি গুণাষ্টকের আবির্ভাবের কথা রামানুজ প্রমুখ আচার্যগণ বলিয়াছেন, যে-সাধর্ম্যের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন ('মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ—গীতা, ১৪।২), তন্ময়তাই তাহার মূল। তন্ময়তাই কারণ; সত্যকামত্বাদি গুণের আবির্ভাব—সাম্য, সাধর্ম্য ইত্যাদি কার্য। কার্য ও কারণের অভেদত্ব সকলেরই স্বীকৃত বলিয়া সাম্য, সাধর্ম্য প্রভৃতিকে সাযুজ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু 'যুজ্‌' ধাতু এবং তাহা হইতে উৎপন্ন 'সযুগ্‌' শব্দটি লক্ষ্য করিলে 'তন্ময়তা' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহা সুবিদিত যে, উপাসক উপাস্যের গুণাবলীর অধিকারী হন। যিনি যে-পরিমাণে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত—যে-পরিমাণে তন্ময়, সেই পরিমাণেই তিনি ঐশ্বরিক গুণাবলীর অধিকারী হন—সাম্য, সাধর্ম্য প্রাপ্ত হন। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী সারদানন্দ বেলুড় মঠে পঠিত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: 'ভক্তি যৎকিঞ্চিৎও যথার্থ অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তকে উপাস্যের অনুরূপ করিয়া তুলে। সর্বজাতির সর্বধর্মগ্রন্থেই একথা প্রসিদ্ধ। ক্রুশারূঢ় ঈশার মূর্তিতে সমাধিস্থ-মন ভক্তের হস্তপদ হইতে রুধির-নির্গমন, শ্রীমতীর বিরহদুঃখানুভব-নিমগ্নমন শ্রীচৈতন্যের বিষম গাত্রদাহ এবং কখন বা মৃতবৎ অবস্থাদি, ধ্যানস্তিমিত বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে বৌদ্ধ ভক্তের বহুকালব্যাপী নিশ্চেষ্টাবস্থান প্রভৃতি ঘটনাই ইহার নিদর্শন। প্রত্যক্ষও দেখিয়াছি, মনুষ্যবিশেষে প্রযুক্ত ভালবাসা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানুষকে তাহার প্রেমাস্পদের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছে; তাহার বাহ্যিক হাবভাব চালচলনাদি এবং তাহার মানসিক চিন্তাপ্রণালীও সমূলে পরিবর্তিত হইয়া তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তিও তদ্রূপ যদি আমাদের জীবনকে দিন দিন তাঁহার জীবনের কথঞ্চিৎ অনুরূপ না করিয়া তুলে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ভক্তি এবং ভালবাসা তত্তন্নামের যোগ্য নহে।

'প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি আমরা সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হইতে সক্ষম? একের সম্পূর্ণরূপে অপরের ন্যায় হওয়া জগতে কখনও কি দেখা গিয়াছে? উত্তরে আমরা বলি, সম্পূর্ণ একরূপ না হইলেও এক ছাঁচে গঠিত পদার্থনিচয়ের ন্যায় নিশ্চিত হইতে পারে। ধর্মজগতে প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচসদৃশ। তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরাও সেই সেই ছাঁচে গঠিত হইয়া অদ্যাবধি সেই সকল বিভিন্ন ছাঁচের রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মানুষ অল্পশক্তি; ঐ সকল ছাঁচের কোন একটির মত হইতে তাহার আজীবন চেষ্টাতেও কুলায় না। ভাগ্যক্রমে কেহ কখন কোন একটি ছাঁচের যথার্থ অনুরূপ হইলে আমরা তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। সিদ্ধ মানবের চালচলন, ভাষা, চিন্তা প্রভৃতি শারীরিক এবং মানসিক সকল বৃত্তিই সেই ছাঁচ-

১০ 'কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥' (ভাগবত, ১০।২৯।১৫) এই শ্লোকের উপর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা দ্রষ্টব্য। খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীও ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'তন্ময়তাং তৎসাযুজ্যম্'।

প্রবর্তক মহাপুরুষের সদৃশ হইয়া থাকে।' (লীলা-প্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পরিশিষ্ট)।

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দের উপদেশেও আছে: 'ঠাকুরকে ডাকার মানে কি না—ঠাকুরের গুণের কতকাংশের অধিকারী হওয়া। যে যাঁর চিন্তা করে, সে তাঁর গুণ পায়। ঈশ্বরের প্রথম গুণ—প্রভুত্ব। তাঁর চিন্তা ক'রে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির উপর পূর্ণ প্রভুত্ব পাওয়া চাই। আমরা নিজেদের প্রভু হব। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছা-মাত্রই কার্য হয়। আমাদেরও যা ইচ্ছা করব, তা কার্যে পরিণত করতে হবে। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের ভালবাসা। তাঁর মতন সকল প্রাণীকে ভালবাসতে হবে। এ প্রকার তাঁর গুণের যে যত অধিকারী হয়েছে, সে তত ঠিক ঠিক ঠাকুরকে ডাকছে।' (সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ৬৮-৬৯)।

যে-তন্ময়তা বা সাযুজ্যের ফলে এই সাম্য হয়, তাহার একটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কামারহাটির ব্রাহ্মণী অঘোরমণি দেবী—'গোপালের মা'। স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গে' বিস্তারিত-ভাবে লিখিয়াছেন।[১১] প্রত্যক্ষদর্শিনী সেবাধন্যা নিবেদিতাও 'The Master as I saw him' গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। গোপালের মার শরীরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন ভক্তদের বলিয়াছিলেন: 'এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে ভরা—হরিময় শরীর!' ভাবরাজ্যে গোপালকে লাভ করিয়া গোপালের মার আনন্দ দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব জনৈকা মহিলাকে বলিয়াছিলেন: 'দেখ দেখ, আনন্দে ভরে গেছে—ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে!' গোপালের মা জীবনের শেষ দিকে 'আমি খাব', 'আমি শোব' ইত্যাদি না বলিয়া বলিতেন, 'গোপাল খাবে', 'গোপাল শোবে' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, গোপালের সহিত সাযুজ্য অনুভব করিতেন বলিয়াই ঐরূপ বলিতেন। ইহারই নাম 'সযুগ্‌ভাব','সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমানত্ব','একাত্মতা', 'একদেহদেহিত্ব'—যাহা আমরা শংকরাচার্যের ব্যাখ্যায় পাইয়াছি। (পৃঃ ১১৮-১৯ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আমরা পাই: "শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। পারার হ্রদে সীসে অনেক দিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরেপোকা ভেবে ভেবে আরশোলা নিশ্চল হয়ে যায়। নড়ে না; শেষে কুমুরেপোকাই হয়ে

১১ অনেকেরই হয়ত জানা নাই যে, স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' শুরু করেন গোপালের মার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিয়া। 'ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ—গোপালের মার পূর্বকথা' বলিয়া যাহা আমরা বর্তমান 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের গুরুভাব, উত্তরার্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাই, তাহাই 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধ (একাদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা)। বর্তমানে গুরুভাব, উত্তরার্ধের সপ্তম অধ্যায় 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে'র দ্বিতীয় প্রবন্ধ। (একাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা)। 'গোপালের মার শেষকথা'ই এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের মূল বিষয়।

[শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৩১১ সালের ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে আহূত সভায় স্বামী সারদানন্দ ভাষণরূপে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা 'উদ্বোধনে'র ১৫ই চৈত্র ১৩১১'র সংখ্যায় (৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) 'শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোচন' (যথামুদ্রিত) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। (আংশিক উদ্ধৃতি পৃঃ ১২২-২৩-এ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী কালে 'ঠাকুরের মানুষভাব' শিরোনামে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের গুরুভাব, উত্তরার্ধের পরিশিষ্টরূপে উহা সংযোজিত হয়। বলাই বাহুল্য, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোচন' প্রবন্ধ দিয়া 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' শুরু হয় নাই—গোপালের মার কথা দিয়াই উহা শুরু হয়।]

যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে 'তিনিই আমি', 'আমিই তিনি'। আরশোলা যখন কুমুরেপোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।" (৫।১৭।১)

কুমুরেপোকা ও আরশোলার যে-দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিয়াছেন, তাহার অনুরূপ 'ভ্রমর-কীটে'র দৃষ্টান্ত আমরা উপনিষদ্, ভাগবত, শংকরাচার্যের রচনা প্রভৃতিতে পাই। মুক্তিকোপনিষদে আছে, হনূমানের মুক্তিবিষয়ক প্রশ্নে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন :

গুরূপদিষ্টমার্গেণ ধ্যায়ন্ মদ্‌গুণমব্যয়ম্।
মৎসাযুজ্যং দ্বিজঃ সম্যগ্ ভজেদ্ ভ্রমরকীটবৎ ॥
(১।২৪)

[কীট যেমন ভ্রমরের চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমরবৎ হইয়া যায়, সেইরূপ দ্বিজ গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট মার্গে আমার অক্ষয় গুণরাশির ধ্যান করিতে করিতে আমার সাযুজ্য লাভ করে।]

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে :

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥
(৭।১।২৭)

[ভ্রমর কর্তৃক গর্তে অবরুদ্ধ কীট দ্বেষ ও ভয়হেতু ভ্রমরকে স্মরণ করিতে করিতে ভ্রমরেরই স্বরূপতা লাভ করে।]। শ্রীধরস্বামীর মতে ইহা সাযুজ্যমুক্তিরই দৃষ্টান্ত (৭।১।২৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)

শংকরাচার্যও তাঁহার 'অপরোক্ষানুভূতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

ভাবিতং তীব্রবেগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ ॥
(শ্লোক ১৪০)

[যে-বস্তু নিশ্চয়পূর্বক তীব্রবেগে ভাবিত হয়; মানুষ শীঘ্রই সেই বস্তু হইয়া যায়—ইহা ভ্রমর ও কীটের দৃষ্টান্ত হইতে জানিতে হইবে।]

'আত্মবোধ' গ্রন্থেও শংকরাচার্য অনুরূপভাবে ভ্রমরকীটের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন (শ্লোক ৪৯)। অবশ্য শংকরাচার্য উভয় ক্ষেত্রেই অদ্বৈত-বেদান্তের ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির ক্ষেত্রে যে-তন্ময়তা, যে-তদাকারাকারিতা—সাযুজ্যমুক্তির ক্ষেত্রেও সেই তন্ময়তা, সেই তদাকারাকারিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার পুনরুল্লেখ করিয়া শেষ করি : 'আরশোলা যখন কুমুরেপোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।'

এ-মুক্তি কী মুক্তি? - সাযুজ্যমুক্তি।[১২]

১২ সাযুজ্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে গোপালের মার কথার অবতারণা করিয়া আমরা মন্তব্য করিয়াছি যে, গোপালের সহিত গোপালের মার সাযুজ্য আর শংকরাচার্য-ব্যাখ্যাত সাযুজ্য একই (পৃঃ ১২৩ দ্রষ্টব্য)। এখানে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে প্রাণোপাসনাদির ক্ষেত্রে সাযুজ্যের যে-ব্যাখ্যা শংকরাচার্য করিয়াছেন (পৃঃ ১১৮-১৯ দ্রষ্টব্য), তাহা দেহান্তের পরের ব্যাপার-সংক্রান্ত এবং যদিও আমরা গোপালের মার ক্ষেত্রে 'সাযুজ্যমুক্তি' শব্দটি ব্যবহার করি নাই, তথাপি গোপালের মার জীবৎকালের সাযুজ্যের সহিত দেহান্তে প্রাপ্য সাযুজ্যমুক্তির সমীকরণ করা ঠিক হয় নাই। এই আপত্তির গভীরে আছে জীবন্মুক্তির প্রশ্ন। সংক্ষেপে বিষয়টির স্পষ্টীকরণ সম্ভব নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে জীবন্মুক্তি স্বীকৃত। গোপালের মাকে জীবন্মুক্ত বলিতে—তিনি ইহলোকেই সাযুজ্যমুক্তি পাইয়াছিলেন বলিতে—আমাদের দ্বিধা নাই। যদিও আমরা অদ্বৈতবাদী এবং সেইহেতু প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত সর্বজ্ঞাত্মমুনির কথায় বিশ্বাসী, তথাপি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দর্শনের উপযোগিতা আমরা সর্বদা স্বীকার করিয়া থাকি। যিনি সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত, অদ্বৈতবেদান্তোক্ত মুক্তি তাঁহার অতি সমীপস্থ। শ্রীমতীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার 'বিজ্ঞানীর অবস্থা'।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন মহাসম্মেলন (১৯৮০)

সমাপ্তি-ভাষণ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আমরা মহাসম্মেলনের সমাপ্তি-পর্বে সমুপস্থিত হয়েছি। গত কয়েকদিন ধরে আমরা বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী বক্তাদের ভাষণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও শ্রীস্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি এবং তাঁদের সেই জীবনাদর্শ আমাদের দেশে ও বিদেশে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধেও অবহিত হয়েছি। এ-সব থেকে আমরা কি শিখলাম? আমি যা বুঝেছি তা কয়েকটি কথায় তুলে ধরব। আমরা জানতে পেরেছি—অবশ্য আমরা আগেও জানতাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অতুলনীয়। এখন আমাদের প্রত্যয় আরো সুদৃঢ় সম্বদ্ধ হয়েছে। এ বাণী শুধুমাত্র অনন্যস্বতন্ত্র নয়, এই বাণী দ্বারা সমগ্র বিশ্বে একটি নূতন সমাজ-ব্যবস্থার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এর থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু ভারতবর্ষের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্যও অপরিহার্য। সুতরাং সঙ্ঘের সভ্য হিসাবে গৃহী এবং সন্ন্যাসী আমাদের সকলের কর্তব্য, এই সকল মহৎ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং অপরকে এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করা। আমাদের উচিত এই সকল সুমহান আদর্শগুলিকে ভারতবর্ষের সর্বত্র, সকল প্রত্যন্তে এবং ভারতবর্ষের বাইরে দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া। এই পবিত্র (বেলুড় মঠ) ভূমি ছেড়ে চলে যাবার পূর্বে আসুন আমরা সঙ্কল্প করি যে, এই মহাসম্মেলনের মঙ্গল সুসমাচার আমরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেব, যাতে সকল মানুষ এই ভাবাদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং এই আনন্দ-সংবাদ সকলের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।

তারপর, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যদি আবার একটি মহান জাতির মর্যাদায় উন্নীত হতে চাই, তাহলে আদর্শগত, নৈতিক ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আমাদের সমাজের যেসব গ্লানি ও দুর্বলতা রয়েছে তা অবশ্যই দূর করতে হবে। আমার ধারণা, এ বিষয়ে সম্ভবতঃ নারীগণ পুরুষের চেয়ে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম। অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা, অনাথদের সমস্যা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি ও অসাম্যের বিরুদ্ধে নারীগণ নিজেদের সংগঠিত করতে পারেন। তিনশ' চারশ' অনাথের বৃহৎ আশ্রমের জন্য চেষ্টা না করে আপনারা একটি বা দুটি সন্তানের দায়িত্ব নেবার জন্য পিতা-মাতা খুঁজে বের করতে পারেন না কি? অনেক অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন যাঁদের কোন সন্তান নেই। তাঁদের প্রত্যেকে একটি বা দুটি সন্তানের যত্ন, ভরণপোষণের ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিতে পারেন না কি? এই ব্যবস্থা অনাথাশ্রমের চাইতে শ্রেয়, কারণ অনাথাশ্রমে শিশুরা পারিবারিক যত্ন ও পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সন্তানহীন স্বামী-স্ত্রী এই অভাব পূরণ করতে সক্ষম। নারীগণ এগিয়ে এসে সমাজে এধরনের সন্তানহীন বিত্তে সমর্থ স্বামী-স্ত্রীকে খুঁজে বের করতে পারেন এবং তাঁদের একজন কি দুইজন অনাথের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করতে পারেন। এভাবে এগিয়ে গেলে একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কলিকাতার সারদা সঙ্ঘের সভ্যাদের আমি এই কথা বলেছিলাম।

দ্বিতীয় কথা, প্রকৃত ভারতবর্ষ গ্রামেই বর্তমান। দেশের উপজাতি ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন করতে না পারলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এদের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও

আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করতে হবে আমাদের অনুন্নত সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য বড় ভয়াবহ। আজ হয়ত একজনের মতো একমুঠো খাবার জুটল, যা দিয়ে সে পেট ভরাতে পর্যন্ত পারল না, সে কিন্তু জানেনা আগামীকাল তার কপালে কি জুটবে। কোন নিশ্চয়তা নেই যে, সে কাল আবার একমুঠো ভাত পাবে। এই তো এদের অবস্থা। এই দারিদ্র্যের হাহাকারের সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য অনেক সমস্যা, যেমন স্বাস্থ্য, বিপরীত পরিবেশ, পানীয় জল ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এসকল ও অন্যান্য নানা জরুরী সমস্যার সমাধান আমাদের করতে হবেই।

এসকল সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা নিয়ে আমি এখানে উপস্থিত হইনি। আপনারা এবিষয়ে সরকারী দপ্তর বা কোন কোন ধনীলোকের সাহায্য পেতে পারেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় সরকারের মৎস্য বিভাগ থেকে মাছ-চাষের সাহায্য নিয়েছি। তেমনি অন্ধ্রপ্রদেশের রায়লসীমাতে আর্তত্রাণ কাজের জন্য সাহায্য নিয়েছি। আপনারা যদি কাজ করেন আপনারাও সরকারী সাহায্য পাবেন। পরিকল্পনা নিয়ে তেমন কোন সমস্যা নেই, প্রধান সমস্যা নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর। অনুন্নত সম্প্রদায়ের অবস্থা ও সমস্যাবলীকে অগ্রাধিকার, জাতীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এবিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করব আপনারা যাঁরা আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা নিজ নিজ কর্মস্থানে ফিরে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগতভাবে, ছোট ছোট সংগঠনের মাধ্যমে এইসকল পরিকল্পনার রূপদানের চেষ্টা করবেন।

আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দিই। আমাদের নটরামপল্লীর স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে কয়েকজন দন্তচিকিৎসকের ব্যবস্থা করেছেন। সেই চিকিৎসকগণ গ্রামে গিয়ে সকল শিশুর দাঁত পরীক্ষা করেছেন। এই শিশুদের দাঁত পরীক্ষা করবার জন্য তাঁরা নিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে যাবেন। এখন সেখানকার স্বামীজী চেষ্টা করছেন চক্ষু-চিকিৎসকের জন্য, যাঁরা গ্রামে গিয়ে শিশুদের চোখের যত্ন নিতে পারবেন, যাতে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও ভিটামিনের অভাবে তারা দৃষ্টিশক্তি না হারায়। আমি শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিলাম, আমি কোন পরিকল্পনা দিচ্ছি না। সুতরাং আপনারা সকলেই যদি অপরের উন্নতির জন্য কিছু চেষ্টা করেন, তাহলেই ভারতের পুনর্গঠন সহজ হবে। আশা করি আপনারা স্বামীজীকে হতাশ করবেন না। আপনাদের সকলের উপর স্বামীজীর ছিল অগাধ ভরসা। স্বামীজী জাতিকে যে গুরু-দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন সেই দায়িত্ব আপনারা, আশা করি, সানন্দে স্কন্ধে তুলে নেবেন ও স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যত্নবান হবেন। আমি স্বামী আত্মস্থানন্দকে বলছি স্বামীজীর একটি বাণী পড়ে শুনাতে।

স্বামী আত্মস্থানন্দ পড়ে শোনান: 'আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজ-পুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর; বলি—জীবন-বলি তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে

যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।'[১]

মহাসম্মেলন সমাপ্ত হল। আমার ইচ্ছা আপনারা প্রত্যেকেই স্থির করুন যে, অন্তত তিনটি উদ্দেশ্য সফল করতে যত্নবান হবেন: সমাজ সংস্কারে যুক্ত হবেন এবং স্বামীজী ও ঠাকুরের বাণী প্রচারে যথাশক্তি প্রয়াসী হবেন। শুধু ঠাকুরের বাণী প্রচারের দ্বারাই অনেক সুফল অর্জন করতে পারবেন। যেমন ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে গীতা পাঠ করে বা অপরকে পাঠ করে শোনায়, সেও পুণ্য অর্জন করে। ঠিক তেমনি যে কথামৃত পাঠ করে, বা পাঠ করে অপরকে শোনায়, অপরকে কথামৃত সম্বন্ধে জানতে ও স্বাধ্যায় করতে সাহায্য করে, সেও এধরনের শুভকর্ম হতে পুণ্য অর্জন করে থাকে।

আমি যেমন বলেছি তেমনিভাবে এই সুসমাচার প্রথমে ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং পরে ক্রমে ক্রমে প্রতিটি দেশে প্রচার করুন। আমাদের সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক যাবতীয় অর্থহীন প্রথানুগত্য বর্জন করুন, বিশেষতঃ অস্পৃশ্যতা দূর করুন। অস্পৃশ্যতা অর্থহীন। আমরা মুখে বেদান্ত বলি, আবার পরমুহূর্তে বলি, 'আমার ঘরে ঢুকো না; তোমার হাতের ছোঁয়া জল আমি খাব না।' এসবের অর্থ কি? নেহাৎ-ই পাগলামি, অর্থহীন।

প্রথমেই তাদের প্রত্যহের দিনযাপন, জীবন-পদ্ধতি এবং তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নতি করুন। অবশ্য, তারা হয়ত পরিচ্ছন্ন থাকে না, তাদের পরিবেশ হয়ত নোংরা। তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করুন। এটা যে করা সম্ভব, একথা আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। তাদের সামনে মহান আদর্শ তুলে ধরুন, তাদের বলুন অবস্থার উন্নতি করতে, দেখবেন ক্রমে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে। আপনারা চলচ্চিত্রের সাহায্যে একাজ করতে পারেন। আপনারা তাদেরকে সংস্কৃতিবিষয়ক, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক ছবি দেখান। উন্নয়নমূলক এই সকল ছবি দেখালে তারা ক্রমে এসকল আদর্শ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। এটা করা নিশ্চয়ই সাধ্যাতীত নয়।

আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা অপরের সাহায্য করুন। অপরকে সাহায্য করলে সুখী হওয়া যায়। আমরা নিজেদের জন্য যা করি বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে যে সুখ আহরণ করি, তার চাইতে অনেক বেশী পরিতৃপ্তি পাই যখন আমরা অপর কাউকে সাহায্য করে তাকে খুশী করতে পারি।

এই সমাপ্তি-অধিবেশনে আমার এই কথাগুলি আপনারা মনে রাখবেন, তাহলেই আপনাদের মহাসম্মেলনে যোগদান সার্থক হবে, মহাসম্মেলন যথার্থ তাৎপর্যবহ হবে। নতুবা, শুধুমাত্র কয়েকটি ভাষণ শুনে, কিছু জ্বালাময়ী বাক্যাবলী শ্রবণ করে কোন কল্যাণই সাধিত হবে না। একজন যুবক বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে আমাকে সে বলল, 'স্বামীজী, খুব সুন্দর একটা বক্তৃতা শুনলাম; চমৎকার বক্তৃতা।' বক্তা কি নিয়ে বললেন জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, 'তা তো আমি জানি না।'

এই মহাসম্মেলনের বক্তৃতাগুলি কি আমাদের সামাজিক সমস্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে? মৌল আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাগুলি কি আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে? কি আমাদের যথার্থ করণীয়? আমি আশা করব,

১ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সংস্করণ (১৩৭১), পৃঃ ৩৬৬-৬৭

আমার এই পরামর্শ গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন বক্তার ভাষণে প্রদত্ত উপদেশ অনুসরণ করবেন।

এখন প্রশ্ন, আপনারা আবার একটি মহা-সম্মেলনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করছেন কি? এধরনের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। আমাদের পুনঃ পুনঃ চাই এধরনের মহাসম্মেলন। আমি কিন্তু বলব, পরবর্তী মহাসম্মেলন আয়োজনের পূর্বেই আমাদের সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখতে হবে, বিচার করে জানতে হবে দেশের উপর এই মহাসম্মেলনের প্রভাব কতটা পড়েছে এবং তার ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে। দেখতে হবে, মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে কিনা। দেখতে হবে, এর দ্বারা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে কি? দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের সজ্য কিছু করতে সমর্থ হয়েছে কি? প্রশ্নোত্তর ইতিবাচক হলে যথাশীঘ্র সম্ভব পরবর্তী মহাসম্মেলন সংগঠনের প্রয়োজন হবে। নতুবা, শুধুমাত্র মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান নিরর্থক। আপনারা জানেন এর জন্য কতরকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এইমাত্র মহা-সম্মেলনের পরিচালক সমিতির সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেছেন তাঁকে কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে এর জন্য। মহাসম্মেলনের জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম। অবশ্য অর্থ হয়ত সংগৃহীত হতে পারে, আপনারা হয়ত দান করতে সমর্থ, কিন্তু পরিশ্রম? গত ছয়মাস ধরে আমাদের বেশ কয়েকটি কর্মকেন্দ্র বেশ অসুবিধা ভোগ করেছে, কারণ সেসকল স্থানের সাধুকর্মীদের নিয়ে আসা হয়েছে এখানকার মহাসম্মেলনের কাজে। এই ঘটনার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি করা উচিত হবে না, অবশ্য যদি না এই ধরনের মহাসম্মেলনের ফলে অন্যদিক থেকে নিশ্চিত কিছু সুফল পাওয়া যায়। তাহলেই পরবর্তী মহাসম্মেলনের সংগঠনের জন্য যথার্থ উৎসাহ সঞ্চারিত হবে।

সর্বশেষে আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা স্বামীজী ও ঠাকুরের বাণী প্রচার করুন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করে সফলতা অর্জন করুন এবং এভাবেই তাহলে পরবর্তী মহাসম্মেলন সংগঠনের পটভূমিকা তৈরী হয়ে উঠবে। আশা করি আপনারা এভাবে কর্মযোগে যুক্ত হয়ে আপনাদের উদ্যমে সাফল্য-মণ্ডিত হবেন এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষকে অদূর ভবিষ্যতে পরবর্তী মহাসম্মেলন আহ্বান করতে বাধ্য করবেন।

এখন বিদায়ক্ষণ। আমি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও শ্রীস্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করছি, আপনারা যেন মঙ্গলমত ঘরে ফিরতে পারেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যিনি যেখানেই থাকুন—পর্বতচূড়ায় বা সমুদ্রের অতল তলে বা জঙ্গলে বা সহরে—সর্বত্র যেন ঐ ত্রয়ী শক্তি আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁদের কাছে আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা।*

* ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ বিকালে বেলুড় মঠে মহাসম্মেলন-সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ইংরেজীতে প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণের স্বামী প্রভানন্দ-কৃত অনুবাদ।—সঃ

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

স্বামী ভূতেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমাকে বোঝা এইজন্য কঠিন যে, তাঁর সাধারণ ব্যবহারগুলি একেবারে সাদাসিধে মেয়ের মতো। ঠাকুর লেখাপড়া বেশী শেখেননি, তবু যতটুকু শিখেছিলেন মা ততটুকুও শেখেননি। ঠাকুর পুঁথি লিখতে পারতেন, মা রামায়ণাদি পড়তে পারতেন, কিন্তু লিখতে বিশেষ পারতেন না; এমন কি শেষ বয়সে নিজের নাম সইও করতে পারতেন না। এই তো লেখাপড়ার দিক! কিন্তু কত বড় বড় বিদ্বান্ এসে তাদের বিদ্যাবত্তার অভিমান ত্যাগ ক'রে মায়ের পায়ের কাছে বসে তাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়েছে! এই সাধারণ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কি ক'রে নিজেকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন, দেখবার জিনিস। শুধু এদেশের নয়, বিদেশেরও অনেকে মায়ের কাছে এসে অভিভূত হয়েছেন। নিবেদিতার মতো একটি বিশাল ব্যক্তিত্বও অভিভূত না হয়ে পারেনি। আমরা নিবেদিতার সম্বন্ধে ভাবি যে, তিনি স্বামীজীর একেবারে একনিষ্ঠ ভক্তশিষ্যা ছিলেন। কিন্তু, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কম লড়াই করেননি। খুব ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ছিলেন তিনি। সেই নিবেদিতা মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর পদতলে বসে ছোট মেয়ের মতো কত আবদার করেছেন। তাঁর ভাষায় তিনি বলেছেন, মা মায়ের ভাষায় বলেছেন। তবে পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান কিভাবে হোত? আশ্চর্য ব্যাপার! মা তাঁকে খুকী ব'লে ডাকতেন। নিবেদিতা তাঁর সমস্ত বিদ্বত্তার শক্তি ভুলে একটি ছোট্ট সরল শিশুর মতো ব্যবহার করতেন মায়ের সঙ্গে। এটি মায়ের ব্যক্তিত্বের কম পরিচায়ক নয়।

মায়ের কত শক্তি, কত ঐশ্বর্য ছিল, যারা তাঁর সান্নিধ্যে আসত তারাও বুঝতে পারত না। কারণ তাঁর ভিতরে এমন একটা স্বাভাবিকতা ছিল, এমন একটা মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ ছিল, যা ঐশ্বর্যের দিকটা আপনিই ভুলিয়ে দিত। এই মাতৃহৃদয় কিরকম, সন্তানের জন্য কতখানি মঙ্গল-কামনা রয়েছে সে-হৃদয়ে, তার দু-একটি দৃষ্টান্ত বলি।

মায়ের একজন ভক্ত ছিল—বিভূতি ঘোষ। মা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। জয়রামবাটী থেকে দূরে তার বাড়ী। একদিনের ঘটনা তার মুখে শুনেছি। মা তাকে বিদায় দিতে যাচ্ছেন। সঙ্গে ক'রে গ্রামের শেষ প্রান্ত অবধি গেছেন। এদিকে ঝড় আসছে। মা প্রথমে বারণ করেছিলেন—শোনেনি, যেতে হবে তাকে মা দাঁড়িয়ে আছেন। বিভূতি যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছে মা ঠিক একদৃষ্টে দেখছেন। দেখে কষ্ট হ'ল যে, যতক্ষণ দেখা যাবে মা তো ততক্ষণ দেখতে থাকবেন। কতক্ষণ অবধি দাঁড়িয়ে থাকবেন তিনি! সে ছুটতে আরম্ভ করল, যাতে মায়ের কষ্ট কম হয়। ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে ফিরে দেখছে—মা একভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর যখন আর দৃষ্টি যায় না, তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। এদিকে মা ভাবছেন, বিভূতি যখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, তাই তো আমার বিভূতি এতক্ষণ অমুক নদীটা পেরুল, এতক্ষণ সে হয়ত মাঠটা পার হ'ল। সমানে ভাবছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন।

তারপর বিভূতি কর্মস্থল বা দেশ থেকে ফিরে আবার এলে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তুমি যাবার পর ঝড় এলো, রাস্তায় কষ্ট পাওনি তো ?'

একটা দিনের কথায় কেউ বলছে, 'কোন্ সালের ঘটনা ?' মা বলছেন, 'আমার বিভূতি তখন ছবছরের না সাতবছরের।' কথাগুলি মায়ের স্নেহের কথা। এর ভিতরে কোন অলঙ্কার নেই, কোন আড়ষ্টভাব নেই, সহজ সরল কথা।

মা কিন্তু একজনের সঙ্গে আর একজনের পার্থক্য কখনও করতেন না। প্রত্যেক সন্তানের প্রতি সমদৃষ্টি তাঁর। মা বলেছিলেন, 'শরৎ যেমন আমার ছেলে, আমজদও তেমনি আমার ছেলে।' এই আমজদ একজন কুখ্যাত ডাকাত। আর স্বামী সারদানন্দ ছিলেন মায়ের একনিষ্ঠ সেবক, যাঁর সম্বন্ধে মা বলেছিলেন, 'আমার ভার একমাত্র শরৎই বইতে পারে।' একজন ভক্ত বললেন, 'কেন মহারাজ ?' অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। মা বললেন, 'না, সেও পারে না, একমাত্র শরৎই পারে আমার বোঝা বইতে।' সেই শরৎ এবং আমজদের মধ্যে মা পার্থক্য করতেন না। সন্তানের গুণ দেখে স্নেহ যায় না। স্নেহ সন্তানের প্রতি যায়, সে সন্তান ব'লে, তার যোগ্যতার বিচার ক'রে নয়।

মা একদিন আমজদকে খেতে দিয়েছেন নিজের ঘরের বারান্দায়। পরিবেশন করছেন নলিনীদি। আমজদ মুসলমান। পাছে ছোঁয়া যায় এই ভয়ে নলিনীদি দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পরিবেশন করছেন। দেখে মা বললেন, 'পরিবেশন করতে হবে না বাপু, এইরকম ক'রে দিলে কি কেউ খেতে পারে ? আমি দিচ্ছি।' মা আমজদকে স্নেহভরে আস্তে আস্তে খাওয়াচ্ছেন। সে ডাকাত। সে ভুলে যাচ্ছে, সে ডাকাত। সে জানছে, সে মায়ের সন্তান। এই সন্তান-সম্পর্কটা ডাকাতকে ডাকাত রাখতে পারছে না— তার পরিবর্তন হচ্ছে, সে সৎ হয়ে যাচ্ছে।

দোষকে গুণে পরিণত করবার এই হচ্ছে প্রণালী। মায়ের স্তবে আছে : 'দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি'—আমাদের অশেষ দোষকে তুমি গুণে পরিণত করো। আর সেই গুণে পরিণত করার প্রণালীটিও ঐ স্তবেই বলা হয়েছে : 'স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং'—স্নেহ দিয়ে আমাদের মনকে আবদ্ধ করো। এই মাতৃস্নেহ অগাধ, অতলস্পর্শী, অফুরন্ত। নির্বিচারে চারদিকে প্রসারিত। স্নেহের শাসনের চেয়ে শক্ত শাসন আর নেই। এর চেয়ে শক্ত বাঁধন আর নেই। এতে মানুষকে সব সময় এমন ভাবে বেঁধে রাখে যে, তার পা বেচালে পড়ে না। ভাগবতে আছে :

> যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
> ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥
> (১১।২।৩৫)

'কবি' নামে এক যোগীন্দ্র নিমিরাজকে বলছেন : হে রাজন ! ভাগবতধর্ম আশ্রয় ক'রে মানুষ কখনও প্রমাদগ্রস্ত হয় না। চোখ বুঁজে দৌড়লেও সে পড়ে যায় না, তার পদস্খলন হয় না।

ঠিক সেইরকম অপারস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমাকে যে আশ্রয় করে, তার কোন ভয় নেই। মা আছেন তার পিছনে। মা সর্বশক্তিময়ী। তাঁর সহস্র বাহু দিয়ে তাকে রক্ষা করছেন, কোন রকমেই তার অকল্যাণ হতে পারে না।

মায়ের এই সর্বকল্যাণকারিণী শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে যদি আমরা তাঁকে মা ব'লে গ্রহণ করতে পারি, তাঁর শরণাগত হতে পারি, তাহলে আমাদের সমস্ত দোষত্রুটি দূর হবে এবং তাঁর কৃপায় তাঁর স্নেহের মহিমা আমরা ক্রমশঃ বুঝতে পারবো।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

আত্মজ্ঞানের সাহায্যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেলে আমাদের নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত নিত্যতৃপ্ত শাশ্বত স্বরূপটি, ব্রহ্মস্বরূপটি প্রকাশিত হয়ে উঠে পূর্ণতম গৌরবে। তখন আমরা সাধারণ ভাষার দিক থেকে বলি—'আমরা জ্ঞানলাভ করলাম, আমরা মোক্ষলাভ করলাম', যদিও, যা উপরেই বলা হ'ল, এক্ষেত্রে 'লাভ' বা নূতন কোনো কিছুর নূতন ক'রে প্রাপ্তির কোনো প্রশ্নই নেই—যেহেতু, যা চিরকাল প্রাপ্ত হয়েই আছে, তার পুনরায় নূতন ক'রে প্রাপ্তি হবে কিরূপে? এ বিষয়ে বহু উদাহরণের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি বিশেষ সাহায্যকারক :

(১) 'কণ্ঠচামীকরবৎ' (জেকবের 'লৌকিক ন্যায়কুসুমাঞ্জলি', দ্বিতীয় ভাগ)।

'চামীকর' শব্দের অর্থ স্বর্ণ। সেজন্য, এই উদাহরণের অর্থ হ'ল 'কণ্ঠলগ্ন স্বর্ণহারের ন্যায়'। মনে করুন, একজন আত্মভোলা ব্যক্তির কণ্ঠে তাঁর স্বর্ণহারটি লম্বিত হয়েই রয়েছে প্রথম থেকেই। কিন্তু তিনি অন্যমনস্ক হয়ে সেকথা না জেনে, ইতস্ততঃ সেই স্বর্ণহারটিকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সেই সময়ে একজন তাঁকে বললেন —'সে কি! আপনার স্বর্ণহারটি ত আপনার নিজের গলাতেই রয়েছে দেখুন।' তখন সেই ব্যক্তি আনন্দিত হয়ে ব'লে উঠলেন—'আমি আমার স্বর্ণহারটিকে এখন ফিরে পেলাম; আমার স্বর্ণহারটিকে আমি এখন লাভ করলাম।' একথা ত ঠিক নয়—যেহেতু যা তাঁর নিজের কাছেই ছিল প্রতিদিন—এখন কেবল তিনি নূতন ক'রে সেকথা জানতে পারলেন—এইমাত্র।

(২) 'রাজপুত্রব্যাধন্যায়' (শঙ্করের বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য ২।১।২০)।

একজন রাজপুত্রকে তাঁর শিশুকালে ব্যাধেরা অপহরণ ক'রে নিয়ে নিজেদের সন্তানরূপেই লালন-পালন করলেন। তারপরে সেই রাজপুত্র যৌবন-প্রাপ্ত হ'লে তাঁর অঙ্গে নানাবিধ রাজচিহ্ন পরিস্ফুট হ'ল। তা দেখে, একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁকে রাজপুত্র ব'লে চিনতে পেরে তাঁকে আহ্বান ক'রে সানন্দে বললেন—'আপনি ত ব্যাধপুত্র নন, আপনি নিশ্চয়ই রাজপুত্র।' তখন সেই রাজপুত্রও সানন্দে বললেন—'এতদিন পরে ব্যাধপুত্র আমি সত্যই রাজপুত্রই হলাম।' তাঁর এই কথাটিও সমান ভ্রান্ত; যেহেতু জন্ম থেকেই উত্তরাধিকার-সূত্রেই তিনি ত রাজপুত্রই ছিলেন, যতই না তিনি ব্যাধগৃহে লালিত-পালিত হয়ে এতদিন ব্যাধরূপেই পরিচিত হোন। সেজন্য, এখন কেবল তাঁর আদ্যন্তকালব্যাপী, রাজপুত্রত্বই তাঁর নিকট নূতন ক'রে প্রতিভাত হ'ল; এখন সে বিষয়ে, তিনি নূতন ক'রে জানতে পারলেন, এইমাত্র।

(৩) 'দশমস্ত্বমসি' (ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রকৃত 'বেদান্তপরিভাষা', ১ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ; মাধবাচার্য অথবা বিদ্যারণ্য মুনীবরকৃত 'পঞ্চদশী'র 'তৃপ্তি-দীপ' নামক ৭ম পরিচ্ছেদ, ২৩-২৮ শ্লোক)।

এস্থলে দশজন মূর্খ লোকের কথা বলা হচ্ছে। ঘটনাটি হ'ল এই : দশজন ব্যক্তি একত্রে একটি নদী পার হলেন। ওপারে গিয়ে তাঁরা নিজেরা গণনা

ক'রে দেখতে লাগলেন সকলেই পার হয়েছেন কিনা। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ প্রত্যেক গণনাকারী নিজেকে বাদ দিয়ে গণনা করতে লাগলেন—প্রত্যেকেই সেই একই ভুল করতে লাগলেন। ফলে প্রত্যেকবারই গণনায় তাঁরা মাত্র নয়জনই হলেন। তখন তাঁদের মধ্যে একজন পার হবার সময় জলে ডুবে গেছেন—এই ভেবে তাঁরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এই শুনে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেখানে এসে তাঁদের রোদনের কারণ অবগত হয়ে গণনাকারিগণকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে 'এক দুই তিন চার' ব'লে ব'লে গুণতে লাগলেন, এবং শেষজনের কাছে এসে বললেন—'দশমস্ত্বমসি'—'আপনিই ত সেই দশম ব্যক্তি, নিজেকে বাদ দিয়ে গণনা করছেন কেন?' তখন তাঁদের দশজন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল।

'পঞ্চদশী'তেও এরূপ বলা আছে :

'নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাত্তদা।
ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষ্যমাণোঽপি তান্নব॥'
(ইত্যাদি)

এই সকল ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে, একটি পূর্ব থেকেই বিরাজিত তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথমে জ্ঞান নেই; পরে জ্ঞান হচ্ছে—কিন্তু সেজন্য সেই তত্ত্বটির নিজের ত কিছুই এসে যাচ্ছে না; কারণ, তার সম্বন্ধে কারো জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক, সে নিজে ত যেমন ছিল, ঠিক তেমনিই থাকছে প্রথমে ও পরে সমান ভাবেই।

একই ভাবে জ্ঞানের কথাই ধরা যাক। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, প্রথমে আমাদের আত্মা, মন বা চিত্ত একেবারে শূন্য থাকে; তার পরে বাইরে থেকে, নূতন জ্ঞান এসে তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে পূর্ণ করে। কিন্তু ভারতীয় মতে আমাদের আত্মা কোনোদিনও শূন্য নয়, জ্ঞানবিহীন নয়, যা পরে পূর্ণ হয়, জ্ঞানবান্ হয়। বরং আত্মায় স্বয়ং-অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম আত্যন্তকাল বিরাজিত ব'লে আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু সংসারী বদ্ধ জীব আমরা আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞান-অবিদ্যার আবরণে আবৃত হয়ে আছি ব'লে আমাদের নিজেদের শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপত্ব, শাশ্বত জ্ঞানস্বরূপত্ব এখন জানি না। সেজন্য, আমাদের ক্ষেত্রে, জ্ঞানলাভের অর্থ হ'ল—এই অজ্ঞান-অবিদ্যার আবরণটিকে উন্মোচিত-উত্তোলিত মাত্র করাই কেবল—আর অপর কিছুই নয়, আর অধিক কিছুই নয়।

অতএব, বলদেবের মতেও পরমেশ্বর বা পরব্রহ্মের 'জ্ঞানদাতৃত্ব' গুণের অর্থ কেবলমাত্র এই যে, তিনি আমাদের অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত-উত্তোলিত ক'রে আমাদের অন্তর্নিহিত শাশ্বত জ্ঞানকেই প্রকাশিত ক'রে তোলেন আমাদের নিকট—নূতন জ্ঞানদান করেন না আমাদের—যা সাধারণতঃ ভাবা হয়। সেজন্য, পরব্রহ্মের 'জ্ঞানদাতৃত্ব' সদর্থক (পজিটিভ) নবজ্ঞানদান নয়—নঞর্থক (নেগেটিভ) অজ্ঞানাবরণ উন্মোচন-উত্তোলনই কেবলমাত্র।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত ধারক-বাহক-প্রকাশক-প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের সেই আলোড়নকারী অভিনব শিক্ষার সংজ্ঞাটির কথা স্মরণ করুন :

'Education is the manifestation of the perfection already in man.'

'Religion is the manifestation of the Divinity already in man.' (C. W., IV, 1932, p. 304)

'শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ।'

'ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ।'

এই সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা অন্য রকমের ব'লে স্বামীজী বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই এই কথা বলেছেন। যথা—

"Now this knowledge, again, is inherent in man; no knowledge comes from outside; it is all inside. What we say a man 'knows,' should, in strict psychological language, be what he 'discovers' or 'unveils'; what a man 'learns' is really what he 'discovers', by taking the cover off his own soul, which is a mine of infinite knowledge. We say Newton discovered gravitation. Was it sitting anywhere in a corner waiting for him? It was in his own mind; the time came and he found it out. All knowledge that the world has ever received comes from the mind; the infinite library of the universe is in your own mind. The external world is simply the suggestion, the occasion, which sets you to study your own mind, but the object of your study is always your own mind. The falling of an apple gave the suggestion to Newton, and he studied his own mind; he rearranged all the previous links of thought in his mind and discovered a new link among them, which we call the law of gravitation. It was not in the apple nor in anything in the centre of the earth. All knowledge therefore, secular or spiritual, is in the human mind. In many cases it is not discovered but remains covered and when the covering is being slowly taken off we say 'we are learning', and the advance of knowledge is made by the advance of this process of uncovering. The man from whom this veil is being lifted is the more knowing man; the man upon whom it lies thick is ignorant, and the man from whom it has entirely gone is all-knowing, omniscient. There have been omniscient men, and, I believe, there will be yet; and that there will be myriads of them in this cycles to come. Like fire in a piece of flint, knowledge exists in the mind; suggestion is the friction which brings it out. So with all our feelings and actions — our tears and our smiles, our joys and our griefs, our weeping and our laughter, our curses and our blessings, our praises and our blames —every one of these we may find, if we calmly study our own selves, to have been brought out from within ourselves by so many blows. The result is what we are; all these blows taken together are called Karma—work, action. Every mental and physical blow that is given to the soul, by which, as it were, fire is struck from it, and by which its own power and knowledge are discovered, is Karma, this word being used in its widest sense; thus we are all doing Karma all the time. I am talking to you: that is Karma. You are listening: that is Karma. We breathe: that is Karma. We walk: Karma. Everything we do, physical or mental, is Karma, and it leaves its marks on us."

(C. W. I, 1931, pp 26-27)

অর্থাৎ, "জ্ঞান, পুনরায়, মানুষের মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে। কোনো জ্ঞানই বাইরে থেকে আসে না; এ সবই আছে ভেতরেই। আমরা যখন বলি যে, কোনো ব্যক্তি 'জানছেন', তখন ঠিকঠিক মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় আমাদের বলা উচিত যে, তিনি 'আবিষ্কার করছেন' বা 'আবরণ উন্মোচিত করছেন'; যা মানুষ 'শিক্ষা করেন', তা প্রকৃতকল্পে তিনি 'আবিষ্কার করেন', তাঁর আত্মার—যে আত্মা অনন্ত জ্ঞানের খনি—সেই আত্মার আবরণ অপসৃত করেন। আমরা বলে থাকি যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন। এটি কোনো কোণে তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে বসেছিল কি? এটি ছিল তাঁর মনের মধ্যেই চিরবিরাজিত; এবং সময় হ'লেই, তিনি তা খুঁজে পেয়ে গেলেন পৃথিবী যা-কিছু জ্ঞান পেয়েছে, তা মন থেকেই এসেছে। জগতের অনন্ত গ্রন্থাগার তোমার মনের মধ্যেই রয়েছে। বাইরের জগৎ কেবল একটি উপলক্ষ্য বা ইঙ্গিতই মাত্র, যা তোমাকে তোমার মনকে অধ্যয়ন করতে নিযুক্ত করে। কিন্তু তোমার অধ্যয়নের বিষয় হ'ল সর্বদাই তোমার নিজেরই মন। একটি আপেলের পতন নিউটনকে কেবল একটি উপলক্ষ্যই মাত্র এনে দিয়েছিল; এবং তখন তিনি নিজের মনকেই অধ্যয়ন করলেন। তিনি পূর্বের সমস্ত যোগসূত্রকে নিজেরই মনের মধ্যে পুনর্বিন্যাস করলেন; এবং একটি নূতন যোগসূত্র আবিষ্কার করলেন তাদের মধ্যে—একেই আমরা বলি 'মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি'। এটি আপেলেও ছিল না; পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলীয় অন্যত্র কোথাও ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই এটির আবিষ্কার হয়ই না, তা বদ্ধই হয়ে থাকে; এবং যখন আবরণটি ধীরে ধীরে উত্তোলিত করা হয় আমরা বলি যে, 'আমরা শিখছি'। এই উত্তোলনের অগ্রগতির উপরই জ্ঞানেরও অগ্রগতি নির্ভর করে। যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইভাবে আবরণটি উন্মোচিত হয়, তিনিই হন জ্ঞানী ব্যক্তি। যে ব্যক্তির উপর এই আবরণটি ঘনরূপে বিরাজ করে, তিনিই হন অজ্ঞ ব্যক্তি; এবং যে ব্যক্তি থেকে এরূপ আবরণটি সম্পূর্ণরূপেই অপসৃত হয়ে যায়, তিনিই হন সর্বজ্ঞ ব্যক্তি। এরূপ সর্বজ্ঞ ব্যক্তি পূর্বেও ছিলেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন; এবং আমার স্থির বিশ্বাস এই যে—এরূপ অগণ্য সর্বজ্ঞ ব্যক্তি কালক্রমে ভবিষ্যতে আসবেন। যেমন, চকমকি পাথরের মধ্যে অগ্নি নিহিত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি মনের মধ্যেও জ্ঞান নিহিত হয়ে থাকে —উপলক্ষ্যই হ'ল সেই ঘর্ষণ, যা তাকে প্রকাশিত করে। একই ব্যাপার ঘটে আমাদের সমস্ত অনুভূতি ও কর্মের ক্ষেত্রেও; আমাদের অশ্রু এবং মৃদু হাস্য, সুখ এবং দুঃখ, রোদন এবং হাস্য, অভিশাপ এবং আশীর্বাদ, প্রশংসা এবং নিন্দা—সকল ক্ষেত্রেই, যদি আমরা স্থিরশান্তভাবে আমাদের নিজেদেরই অধ্যয়ন করি, তাহলে দেখব যে, এ সবই আমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই সেই সব আঘাত দ্বারাই বাইরে প্রকাশিত হয়েছে। তারই ফলে, আজ আমরা যা তা-ই। এই সব আঘাতকে একত্রিত ক'রে বলা হয় 'কর্ম'। প্রত্যেক দৈহিক বা মানসিক আঘাতই কর্ম—যে আঘাত দ্বারা আত্মাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়; এবং তার নিজের জ্ঞান ও শক্তি আবিষ্কৃত হয়। এস্থলে 'কর্ম' শব্দটি তার ব্যাপকতম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপে, আমরা সকলেই সর্বদাই কর্ম ক'রে যাচ্ছি। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি—তা হ'ল কর্ম। তুমি শুনছ—তা-ও হ'ল, কর্ম। আমরা চলছি—তা হ'ল কর্ম। দৈহিক ও মানসিক যা-কিছু আমরা করি, তা হ'ল কর্ম; এবং কর্ম তার চিহ্ন রেখে যায় আমাদের উপর।" (স্বকৃত অনুবাদ)

সেজন্য মানুষের পরিপূর্ণ শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপত্বে, জ্ঞানস্বরূপত্বে আজন্ম বিশ্বাসী স্বামীজী আবেগভরে বলছেন:

'It is the journey from truth to truth,

from lower truth to higher truth. Darkness is less light ; evil is less good ; impurity is less purity.' (C. W., II, 1963, p. 327)

'And this is the march of humanity. Man never progresses from error to truth, but from truth to truth, from lesser truth to higher truth—but it is never from error to truth.' (Op. cit II, p. 365).

'Not from error to truth, nor from bad to good, but from truth to higher truth, from good to better, best.' (Op. cit IV, 371-72)

'এই যাত্রা হ'ল সত্য থেকে সত্যে, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে। অন্ধকার হ'ল অল্প আলোক ; পাপ, অল্প পুণ্য ; অপবিত্রতা, অল্প পবিত্রতা।'

'এবং এইটিই হ'ল মনুষ্যজাতির দুর্বার অগ্রগমন। মানুষ কখনই ভ্রান্তি থেকে সত্যে উন্নীত হন না; কিন্তু নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে—কিন্তু কখনই ভ্রান্তি থেকে সত্যে নয়।'

'ভ্রান্তি থেকে সত্যে নয় ; মন্দ থেকে ভালোয় নয় ; কিন্তু সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে ; ভালো থেকে অধিকতর ভালোতে, অধিকতম ভালোতে।'

(স্বকৃত অনুবাদ)

এইভাবে, জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম তাঁর জ্ঞানদাতৃত্ব সার্থক করছেন বদ্ধ জীবকে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে নয় ; অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে নয় ; অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে নয় কিন্তু জ্ঞান থেকেই জ্ঞানে নিয়ে ; সত্য থেকেই সত্যে নিয়ে ; আলো থেকেই আলোকে নিয়ে। এর অপেক্ষা অধিক আশার, অধিক অনুপ্রেরণার, অধিক আনন্দের, অধিক গৌরবের আর কি হ'তে পারে ?

[ক্রমশঃ]

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় শ্রীরামকৃষ্ণবাণী

সঙ্কলক : ডক্টর জলধিকুমার সরকার

[বৈশাখ ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

৬০। "ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে, রাখাল টাখাল এরা সব তখন ছোট। একদিন রাখালের বড় খিদে পেয়েছে, ঠাকুরকে বললে। ঠাকুর ঐ কথা শুনে গঙ্গার ধারে গিয়ে 'ও গৌরদাসী, আয় না, আমার রাখালের যে বড় খিদে পেয়েছে', ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলেন। তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া যেত না। খানিক পরে গঙ্গায় একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা ঘাটে লাগতেই তার মধ্য হ'তে বলরামবাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি নামলো এক গামলা রসগোল্লা নিয়ে। ঠাকুর তো আনন্দে রাখালকে ডাকতে লাগলেন, 'ওরে আয় না রে রসগোল্লা এসেছে, খাবি আয়। খিদে পেয়েছে বললি যে।' রাখাল তখন রাগ ক'রে বলতে লাগল, 'আপনি অমন ক'রে সকলের সামনে খিদে পেয়েছে বললেন কেন?' তিনি বললেন, 'তাতে কিরে, খিদে পেয়েছে, খাবি তা বলতে দোষ কি?' তাঁর ঐ রকমই স্বভাব ছিল কি-না।" ১।৩৯

৬১। "একদিন ভূতির খালের দিক থেকে [ঠাকুর] আসছেন, বৃষ্টি হয়ে গেছে ; একটা মাগুর মাছ পুকুর থেকে রাস্তায় উঠেছে, ঠাকুরের পায়ে ঠেকেছে। ঠাকুর সেটাকে পায়ে করে ঠেলে

ঠেলে এনে পুকুরে ছেড়ে দিলেন, বললেন, 'পালা, পালা, হৃদে দেখতে পেলে এখুনি তোকে মেরে ফেলবে।' এসে হৃদয়কে বলছেন, 'হৃদু, এই এত বড় একটা মাগুর মাছ, হলদে রং, রাস্তায় উঠেছিল, পুকুরে ছেড়ে দিলুম।' হৃদয় বললে, 'ও মামা, তুমি করলে কি গো, ও মামা, তুমি করলে কি গো! আঃ, এত বড় মাছটা ছেড়ে দিলে! আনলে বেশ ঝোল হত।'" ২।৫৩-৪

৬২। "কখনও কখনও দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল। তিনি বলতেন, 'বুনো পাখী খাঁচায় রাতদিন রাখলে বেতে যায়; মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।'" ২।৫৫

৬৩। "ঠাকুর বলতেন, 'গিরিশের পাপ নিয়ে আমার শরীরে এই ব্যাধি।'" ২।৮০

৬৪। ভক্ত জিজ্ঞাসা করছেন, "মা, তুমি যে আমাকে জয়রামবাটীতে বলেছিলে, ঠাকুর শ্বেতকায় ভক্তদের ভিতরে আসবেন। না কি?

"মা—না, তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে, তাই বলেছি। যেমন এখন সব খৃষ্টানরা আসছে না? ঠাকুর বলেছিলেন যে একশ বছর পরে আবার আসবেন। এই একশ বছর ভক্তহৃদয়ে থাকবেন। গোলবারান্দা হ'তে বালি, উত্তরপাড়ার দিকে দেখিয়ে বলেছিলেন। আমি বললুম, 'আমি আর আসতে পারব না।' লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাককাটা করলেও আর আসব না।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'যাবে কোথা? কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব এসে পড়বে।'" ২।৯৮

৬৫। ঈশ্বরের উপর অভিমানপূর্ণ ভক্তের এক চিঠির উত্তরে মা বলছেন, "ঠাকুর বলতেন, শুক, ব্যাস তো ডেয়ো-পিঁপড়ে। তাঁর অনন্ত রয়েছে। তুমি যদি ঈশ্বরকে না ডাক—আর কত লোক তো তাঁকে মনেই করছে না—তাতে তাঁর কি? সে তোমারই দুর্ভাগ্য। ভগবানের এমনি মায়া যে তিনি এই রকম করে সব ভুলিয়ে রেখেছেন—'বেশ আছে ওরা, থাক।'" ২।১৯৪

৬৬। "কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁধতুম। একদিন খেতে বসেছেন—ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভাল রাঁধতে পারত। সে যেটা রেঁধেছে, খেয়ে বললেন, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে, এ রামদাস বদ্যি আমি যেটা রেঁধেছি, খেয়ে বললেন, 'আর এই ছিনাথ সেন।' শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে। লক্ষ্মীর মা হ'ল রামদাস বদ্যি, আর আমি হলুম ছিনাথ সেন—হাতুড়ে। শুনে হৃদয় বলছে, 'তা বটে, তবে তোমার এ হাতুড়ে বদ্যি তুমি সব সময় পাবে—গা টিপতে, পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হ'ল। রামদাস বদ্যি—তার অনেক টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সব সময় পাবে না। আর লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে—সে তোমার সব সময় বান্ধব।' ঠাকুর বললেন, 'তা বটে, তা বটে। এ সব সময় আছে।'" ২।১৬৬

৬৭। "ঠাকুর বলতেন, 'মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনও মেয়ে নয়'—সে তো পুরুষ। গৌরদাসীকে বলতেন, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।'" ২।১৬৩

৬৮। "কামারপুকুরে একজন তাঁকে দেখতে এসেছিল। লোকটা ভাল নয়। সে চলে যাবার পর ঠাকুর বললেন, 'ওরে, দে, দে, ওখানটায় এক ঝোড়া মাটি ফেলে দে।' কেউ ফেলতে না যাওয়ায় নিজেই কোদালটা নিয়ে ঠনঠন করে মাটি ফেলে দিয়ে তবে ছাড়লেন। বললেন, 'ওরা, যেখানে বসে, মাটিসুদ্ধ অশুদ্ধ হয়।'" ২।৮৫

[ক্রমশঃ]

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

আপাত-অজ্ঞানতার অন্তরালে প্রগাঢ় জ্ঞানের মূর্তিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের প্রধানত দুটি নাটক— 'নসীরাম' ও 'কালাপাহাড়ে'। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের চরিত্র-পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্রই সার্থক পথিকৃৎ এবং এর প্রভাব দূরবিস্তৃত। গিরিশ-সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে অমৃতলাল বসু ও মনোমোহন গোস্বামীর নাটকে এই প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। পরবর্তী কালের নাট্যকাররা প্রায়শই এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীমূলক নাটকগুলিতে রামকৃষ্ণ-চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি সকলেই প্রায় গ্রহণ করেছেন। নাটকীয়তার দিক থেকে এই চরিত্র-পরিকল্পনা সহজ ও বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নেই কিন্তু জীবনীনাটকের ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে চরিত্রের ব্যক্তিত্বের দিকটা অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হয়েছে।

সেদিক থেকে গিরিশচন্দ্র কিন্তু যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রামকৃষ্ণকে নিকট-সান্নিধ্যে লাভ করেও রামকৃষ্ণ-জীবনীনাটক রচনার কথা চিন্তা করেন নি এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনো স্ব-নামে মঞ্চে উপস্থিত করেন নি। 'নসীরাম' কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে পরিকল্পিত হলেও 'কালা-পাহাড়ে' চিন্তামণি একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র। 'নসীরাম' থেকেই বাংলা নাটকে 'কথামৃতে'র জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। চিন্তামণির সংলাপও গিরিশচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করেছেন 'কথামৃত' থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা তাঁর নিজেরই ভাষায় দুটি নাটকেই গৃহীত। 'নসীরাম' ও 'কালাপাহাড়' সম্পর্কে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হারাণচন্দ্র রক্ষিত থেকে শুরু করে আধুনিক সমালোচকগণ পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বাহুল্যবোধে বর্তমান রচনায় এই দুটি নাটক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম।

রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসার পর গিরিশচন্দ্র সব নাটকেই সচেতনভাবে রামকৃষ্ণ-ভাবধারা দর্শক-সমক্ষে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক গল্পগুলিকে নাটকের বিভিন্ন situation তৈরীর কাজে সার্থক-ভাবে ব্যবহার করেছেন। 'রূপসনাতন', 'করমেতি বাঈ', 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'মনের মতন', 'তপোবল' প্রভৃতি নাটকে নাটকীয় পরিস্থিতি রচনায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে এর যথেষ্ট নিদর্শন আছে। আবার রামকৃষ্ণ-গিরিশ-সম্পর্ক ও গিরিশের জীবনে তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সংবাদও পাওয়া যাবে তাঁর বিভিন্ন নাটক থেকে। 'নন্দদুলালে'র মত গীতি-নাট্য কিংবা 'মিলন কানন' বা 'নিত্যানন্দ-বিলাসে'র মত অসমাপ্ত নাটকও রামকৃষ্ণ-প্রভাব-বহির্ভূত নয়। একটি বক্তৃতায় গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমি তাঁর [রামকৃষ্ণের] কাছ থেকে নাটক লেখা শিখেছি।' বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণের লোকচরিত্র অধ্যয়ন-ক্ষমতা, সংলাপ ও ক্রিয়ায় নাটকীয় রসসৃষ্টির নিপুণতা নাট্যকার গিরিশের সামনে নাটকীয় রসসৃষ্টির স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটিত করেছিল।

গিরিশের রামকৃষ্ণ-চরিত্র রূপায়ণের একটা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই চোখে পড়বে। তিনি অতি সামান্য ক্ষেত্রেই মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থিত করেছেন। তাঁর অধিকাংশ নাটকেই হরি-প্রেমোন্মত্ত হরিনাম-প্রচারকরূপেই রামকৃষ্ণ-চরিত্র উপস্থাপিত। কোথাও কোথাও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিন্নতাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর

প্রধান কারণ হল, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে গিরিশের সুদৃঢ় বিশ্বাস। বিষ্ণুর অবতার-রূপেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত, তিনি যে স্বয়ং পতিতপাবন-রূপে পতিত-পতিতারও উদ্ধারকল্পে জন্মগ্রহণ করেছেন, এ নিয়ে গিরিশ অন্যের সঙ্গে তর্ক করতেও পরাঙ্মুখ হন নি। তাছাড়া, 'চৈতন্য-লীলা'র সূত্রেই তিনি রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন—একথা গিরিশচন্দ্র কখনই বিস্মৃত হতে পারেন নি।

গিরিশের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভেদ। তাঁর কথায়, 'পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান মহাভক্তি-আবরণে আবৃত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবৃত। উভয়ের একই ভাব—কার্যে ভিন্নভাব ধারণ।' তাই অনেক নাটকে দেখা যায় গিরিশচন্দ্র একই আধারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে উপস্থিত করেছেন। 'শঙ্করাচার্য' প্রভৃতি নাটকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। স্বতন্ত্রভাবে বিবেকানন্দের ভাববৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে 'মায়াবসান' এবং বিশেষ করে 'ভ্রান্তি' নাটকে। 'মায়াবসানে' নিষ্কাম কর্মযোগ ও সেবাব্রতের আদর্শ বিবেকানন্দ-অনুসারী। গিরিশচন্দ্র 'ভ্রান্তি' নাটক লিখেছিলেন বিবেকানন্দ-তিরোভাবের অব্যবহিত পরে। স্বামীজীর মানবপ্রেমিক রূপটি গিরিশচন্দ্রকে কতখানি আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' বর্ণিত একটি দিনের বিশেষ একটি ঘটনায়। সেদিন শিষ্যসকাশে বেদপাঠরত বিবেকানন্দের কাছে গিরিশচন্দ্র যখন মানুষের জীবনের দুঃখ ও বেদনার চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন তখন অভিভূত বিবেকানন্দ উদ্গত অশ্রু সংবরণ করতে বেদপাঠ বন্ধ রেখে সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। মানুষের বেদনায় বিচলিত সেই বিবেকানন্দের অন্তরটি ছিল গিরিশের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু। সদ্যলোকান্তরিত সুহৃদ্ ও গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দের এই রূপটিকেই তিনি উপস্থিত করেছেন 'ভ্রান্তি' নাটকের রঙ্গলাল-চরিত্রে। রঙ্গলাল দেবতাজ্ঞানে মানুষের সেবায় আত্ম-নিয়োজিত। আবার বিবেকানন্দের বীর্যের বাণী শুনতে পাই 'সৎনাম বা বৈষ্ণবী' নাটকে, ফকীরের কণ্ঠে। আরঙ্গজেবের অত্যাচারে নির্বীর্য ও মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজকে ফকীর যে ভাষায় তিরস্কার করেছে তাতে স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দই মূর্ত হয়ে উঠেছেন:

'আপনার কি ধারণা, যে হিন্দুরা সকলে সত্ত্ব-গুণী তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে? তা নয়—একবার চক্ষু খুলে দেখ যে ঘোর তমো-তে দেশ আচ্ছন্ন—অলস কুম্ভকর্ণের মত জড় হয়ে আছে। অনলস হয়ে কর্মে-প্রবৃত্ত হলে তবে সে জড়তা দূর হবে। ভগবান বলেছেন, কার্য ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। জড় তমোগুণী কি চৈতন্যলাভ করতে পারে? সৎকার্যের ফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তবে সে নির্বাণের অধিকারী। ...বীর ব্যতীত কেউ সত্ত্বগুণ লাভ করে না।'

স্বামীজীর 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ' গানটির অন্তর্নিহিত ভাব—এমন কি কোথাও কোথাও ভাষাসমেত অন্তত চারটি নাটকে ব্যবহার করেছেন গিরিশচন্দ্র। 'করমেতি বাঈ' নাটকে 'সুরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া' একেবারে অনুবাদ বলেই মনে হয়। 'মায়াবসানে' 'মেদিনী মিশিল তরল সলিলে', নাট্যায়িত 'সীতারামে' 'উদার অম্বর শূন্য সাগর' এবং 'অশোক'-এ 'শ্বাসবায়ু তুমি, জীবনপ্রাণ' গানগুলিতে স্বামীজীর গানটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের সমকালীন নাট্যকারদের মধ্যে অমৃতলাল বসু কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের রচয়িতা হলেও মূলত প্রহসনকার হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বল্পসংখ্যক পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে কোথাও কোথাও রামকৃষ্ণ-প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বিশেষ করে 'আদর্শবন্ধু' নাটকে চটসাঁই-চরিত্রটিতে

'নসীরাম' (গিরিশের নাটক) তথা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ভাষার প্রভাব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একালের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী তাঁর নাটক-রচনা ও চরিত্র-পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্রকেই অনুসরণ করেছেন। 'কালাপাহাড়ে'র অনুসরণে একই কাহিনীবস্তু নিয়ে মনোমোহনের নাটক 'ধর্মবিপ্লব'। এখানে 'কালাপাহাড়ে'র চিন্তামণি-চরিত্রটির ছায়াপাত ঘটেছে বামাচরণ-চরিত্রে। অনুরূপভাবে 'নসীরামে'র আংশিক অনুসরণে 'বিধির বিধান' নাটকের পুলহ-ঋষিচরিত্র পরিকল্পিত। 'ধর্মবিপ্লব' নাটকে নিরঞ্জন-চরিত্রে 'ভ্রান্তি'-র রঙ্গলাল-চরিত্রটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। মনোমোহনের মৌলিকতা প্রকাশিত হয়েছে 'সমাজ' নাটকে। এই নাটকে মনোমোহন গোস্বামীই সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের নামোল্লেখ করে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত আর্তের সেবাকার্য দৃশ্যতঃ উপস্থিত করেছেন। সেবাব্রতী সন্ন্যাসীর স্থায়িভাবে সেবাকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং দেশের তৎকালীন অবস্থায় তার উপযোগিতার বিষয়ও নাটকের কাহিনীবস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'অভিনেত্রীর রূপ'-এর যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হলেও মুদ্রিত হয় নি। উপন্যাসের পরিণতি-অংশে কালী ও মাতৃসাধক রামকৃষ্ণের জয়ঘোষণা নাট্যকারের জীবন ও সাহিত্যের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রভাবই সূচিত করে। নায়কের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির দৃশ্যটি যে নাট্যরূপেও গৃহীত হয়েছিল—একথা অবশ্যই অনুমান করা চলে।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত নাট্যকার না হলেও তাঁর তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। এর মধ্যে 'কামিনী ও কাঞ্চন' নামকরণ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে রামকৃষ্ণ-ভাবধারারই বাহক। 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় 'কামিনী ও কাঞ্চন' উপন্যাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

'লেখক মহাপুরুষ রামপ্রসাদ চরিত্রে জ্ঞান-ভক্তি সমন্বয়াচার্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের সরল মাতৃনির্ভরতা, জীবদুঃখকাতরতা, কামিনী-কাঞ্চন-বিজয়, জ্বলন্ত ত্যাগ, অপরিসীম দয়া, অলৌকিক শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।'

হারাণচন্দ্র অঙ্কিত রামপ্রসাদের চিত্র একটি গানে পরিস্ফুট হয়েছে এবং তা যে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আলেখ্য তা সহজেই বোঝা যায় গানের নিম্নলিখিত দুটি পঙ্‌ক্তি থেকে :

'যেই কৃষ্ণ সেই রাম, সেই আমার প্রসাদ
নানারূপে অবতীর্ণ—পুরাণ ভক্তের সাধ—
এমন দয়ালঠাকুর যেবা চেনে, তার কেবা
সাধে বাদ।'

নাট্যরূপটি মুদ্রিত না হলেও অভিনয়ের ভূমিকালিপি থেকে জানা যায় রামপ্রসাদ-চরিত্রটি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গেই নাটকে গৃহীত হয়েছিল।

গিরিশযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিজ্ঞানের ছাত্র—কর্মজীবনে বিজ্ঞানেরই অধ্যাপক। জড়বাদী বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ক্ষীরোদ-প্রসাদ প্রথম জীবনে সমকালীন ঐতিহ্য রক্ষা করে নাস্তিকতাকেই আশ্রয় করেছিলেন। কালক্রমে রামকৃষ্ণ-ভাবধারার সংস্পর্শে এসে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে মানসিক দ্বন্দ্ব—সেই জড় ও চৈতন্যের দ্বন্দ্বে তিনি জড়প্রকৃতির অন্তরালে চৈতন্যশক্তিকে কিভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন তার পরিচয় পাই 'মিডিয়া' নাটকে বিজ্ঞানসাধক জিবারের সংলাপে :

'আগে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পেরেছি, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি জড়াপ্রকৃতির অন্তরালে, প্রতি পরমাণুর অন্তরালে চৈতন্যময়ীর লীলা। সেই মা কৌমুদীরূপে জগতে মধুবর্ষণ করেন। ···মাতৃরূপে সর্বজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়ে

জগতে শান্তি বিতরণ করেন।'

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বঙ্গে রাঠোর' নাটকে ধর্ম-সমন্বয়ের ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে নসীর মামুদ-চরিত্রে। নিরাকারবাদী নসীর মামুদ ঘটনাসূত্রে সাকার সাধনাকেও স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের শেষ জীবনের রচনা 'নর-নারায়ণ' যে নাট্যকারের জীবনে বিশ্বাসের ক্রম-বিকাশ একথা তিনি স্বয়ং বলেছেন। যে ক্ষীরোদ-প্রসাদ প্রথম দিকে শ্রীরামকৃষ্ণকে মানবরূপেই গ্রহণ করেছিলেন, তিনিই তাঁর প্রথম জীবন ও পরবর্তী কালের উপলব্ধির কথা কর্ণের মুখে প্রকাশ করেছেন। নাটকের প্রথমাংশে কর্ণের মুখে কৃষ্ণের পরিচয় :

'মানব—মানব, তবে
মুক্তকণ্ঠে বলি আমি—অপূর্ব মানব
ধরণীতে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।
কর্ণের শেষ সত্য-উপলব্ধি :
আর তো মানব বলা চলে না তোমায়
—তুমি ভগবান।···
ভগবান যদি ইচ্ছা করে
এইমত, প্রাণাধিক, ঠিক এইমত মূর্তি ধরে।'

'নরনারায়ণে' কৃষ্ণের অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রই নাট্যকার অঙ্কন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও তাই কৃষ্ণ-চরিত্রে আরোপিত হয়েছে, যেগুলি মহাভারত-বহির্ভূত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছেন জীবনের গোধূলি-লগ্নে। প্রথম যৌবনে বিলাত যাওয়ার অপরাধে হিন্দুসমাজে তাঁর লাঞ্ছনা তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল এবং অত্যন্ত তিক্তভাবেই তিনি আক্রমণ করেছেন আপন ধর্ম ও সমাজকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-উদারতার সংস্পর্শে এসে (যা ঘটেছিল একান্ত আকস্মিকভাবে পুত্র দিলীপকুমার ও ভাগিনেয় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর জন্য) তিনি আবার নতুন করে ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। সেই ব্যাকুলতা তাঁর শেষজীবনে রচিত নাটকের গানে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। 'পরপারে' নাটকের গানগুলিতে তাঁরই একান্ত বাসনা সঙ্গীতের আকারে উপস্থিত করেছেন :

'আর কেন মা ডাকছ আমায়
এই যে এইছি তোমার কাছে।···
এবার যদি পেইছি শ্যামা
আর ত তোমায় ছাড়ব না মা
ওমা, ঘরের ছেলে পরের কাছে
মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।'

কিংবা

'ভবার্ণবে দিশাহারা
পাচ্ছিলাম না কূলকিনারা
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা
তারা বলে দিলাম পাড়ি।'

এইকালে তিনি নাটক লিখেছেন তিনখানি। পৌরাণিক নাটক 'ভীষ্মে' মাতৃস্তুতির মধ্যে মানসিক পরিবর্তনের ক্ষীণ আভাস দেখা দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী দু'খানি সামাজিক নাটক 'পরপারে' এবং 'বঙ্গনারী'তে স্পষ্টভাবেই মাতৃসাধনা ও সাধকের প্রতি আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠেছে। 'পরপারে'তে ভবানীপ্রসাদ-চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের রুদ্ধ ভক্তি-স্রোত উৎসারিত হয়েছে, আবার 'বঙ্গনারী'তে কেদার-চরিত্র পরিকল্পনায় সারল্য ও নিষ্কাম-কর্মাদর্শে রামকৃষ্ণ-ভাবধারারই অনুসরণ দেখতে পাই। 'পরপারে'র অন্তিম দৃশ্যটিতে শান্তার কণ্ঠে স্বয়ং নাট্যকারই কালিকা-বন্দনা করেছেন :

'বিশ্বব্যাপিনী বিবসনা উন্মাদিনী কালী করালী মা আমার! ও কি মূর্তি! ঊর্ধ্ব বাহু দুটি গগন ভেদ করে উঠছে; মাথার চারিদিকে ঘিরে কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা নৃত্য কর্চ্ছে; কটিদেশ জড়িয়ে ধরে ধরণী স্তন্য পান কর্চ্ছে'

পদতলে রসাতল মূর্ছিতা হয়ে পড়ে আছে! ঐ দেখ, মা তাঁর মুষ্টি দিয়ে সংহার ও সৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছেন; তাঁর রসনায় হুঙ্কার ও অভয়বাণীর সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে; তাঁর বক্ষে জন্ম ও মৃত্যু স্পন্দিত হচ্ছে; তাঁর সম্মুখে স্বর্গ, পশ্চাতে নরক —দুই মহাসমুদ্রের মত পড়ে রয়েছে। তাঁর বক্ষের উপর জগতের যত পুণ্যাত্মা ঘুমিয়ে আছে।'

এই কালে দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিক পরিবর্তনের আরও একটি দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বারবনিতা সম্পর্কে তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তায় গভীর পরিবর্তন এসেছে, যার পরিচয় 'পরপারে' নাটকের শান্তা-চরিত্রে উদ্ভাসিত। রামকৃষ্ণ-উদারতার সংস্পর্শই যে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিবর্তন এনেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। দ্বিজেন্দ্রতনয় দিলীপকুমারও এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

মাঝে কিছুদিনের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও অপরেশ মুখোপাধ্যায় কৈশোর থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে। স্বতঃই তাঁর পৌরাণিক নাটকে রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের ছায়া দেখা যায়। 'শ্রীরামানুজ' নাটক তিনি লিখেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে। নাটকের প্রতিটি অঙ্ক রচনা করে নিয়ে নিয়ে যেতেন স্বামী সারদানন্দের কাছে—পড়ে শোনাতেন, তাঁর নির্দেশ মতো সংশোধন করে নিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও নাটকটি সংশোধনে নানা পরামর্শ দিতেন। তাঁদের আদেশেই যে নাটকে রামনাম-ভজন সংযোজিত হয়েছিল, একথা অপরেশচন্দ্রই লিখেছেন। 'শ্রীরামানুজ' নাটকটির একটা গৌরবের দিক আছে যা, অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এই সূত্রে বলে নি। এই নাটক মঞ্চাভিনয়ের সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভাববিহ্বল হয়ে পড়েন। রামানুজ আচণ্ডালে নাম বিতরণ করছেন—এই দৃশ্যটি দেখতে দেখতে তিনি অবিরল অশ্রুপাত করতে থাকেন এবং তারপরেই কৃপার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে ভক্তদের দীক্ষা দিতে থাকেন।

১৯৪৮ সালের পর থেকে বাংলা নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে কালিকা থিয়েটারে তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'যুগদেবতা' নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে। 'যুগদেবতা' নাটকের প্রথমে নামকরণ হয়েছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। নাটকটি উদ্বোধনের পূর্ব মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তেরা আপত্তি জানালেন বেলুড় মঠের কাছে। আপত্তির প্রধান এবং একমাত্র কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী প্রভৃতি পূত চরিত্রে যাঁরা অংশ নেবেন তাঁদের সকলের নৈতিক চরিত্র হয়ত পরিশুদ্ধ নয়—তাতে ভক্তদের মানসিক পীড়া উপস্থিত হবে। বেলুড় মঠের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত নাটক ও চরিত্রগুলির নাম পরিবর্তন করে নাটকটি মঞ্চে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু সে নিষেধের বেড়া অচিরেই ভেঙে পড়ল। বাংলার রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র ও যাত্রাজগতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও ভাবধারার প্লাবন এলো। বর্তমান কালের প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা নাট্যকারই রামকৃষ্ণ-নাটক লিখেছেন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'নটী বিনোদিনী', দেবনারায়ণ গুপ্তের 'পরমারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণ', মন্মথ রায়ের 'মহাউদ্বোধন' এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রুপ থিয়েটারেও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ভাবধারা যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'নটী বিনোদিনী'র কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। ব্রজেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ যাত্রার শ্রেষ্ঠ পালাকারেরাও এই প্রভাব থেকে দূরে রইলেন না। যাত্রা ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলার গ্রামে গঞ্জে সহস্র সহস্র মানুষের অত্যন্ত কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। সারদাদেবী, বিবেকানন্দ, নিবেদিতার জীবনকাহিনীতেও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

সে প্রবাহ আজও অব্যাহতগতি।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর প্রভাব

ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভারতের সামাজিক জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর প্রভাব আলোচনা করার তাৎপর্য আজকের দিনে অপরিসীম। এবং এখানেই শ্রীশ্রীমা আমাদের সামনে এক পরম রহস্য। তাঁর নিজের জীবন কেটেছিল সংকীর্ণ পরিবেশে। তথাকথিত শিক্ষার আলোকবর্জিতা এই নারী বালিকা-বয়সেই বধূ হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন স্বামীর সেবায়, ভাইদের অভিভাবিকা এবং অসংখ্য নরনারীর ইহপরকালের ত্রাণকর্ত্রী রূপে। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে উনিশ শতকে নারী-জাগরণের ঢেউ বর্তমান ভারতে যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তা সত্যই অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে—জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, খেলাধূলা, শরীরচর্চা প্রভৃতি বিচিত্র স্তরে নারীজাতির অবদান ও ক্রমাগত অগ্রগতি আমাদের স্তম্ভিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও লক্ষ্য করছি যে, পুরুষের সঙ্গে নারীর সাম্য বা সমানাধিকার লাভের ব্যগ্রতা ক্রমশঃই উদ্দাম আন্দোলনে, উৎকট প্রতিযোগিতা-মূলক অশুভ মানসিকতায় পর্যবসিত হবার পথে পা বাড়িয়েছে। নারীর মুক্তি নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে পুরুষের আচারের অন্ধ অনুকরণ বা পুরুষের সঙ্গে ঈর্ষামূলক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কখনই আসতে পারে না। উভয়ের মিলিত চিন্তায়, কর্মে ও আচরণেই নিহিত আছে সমাজ-জীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা। অন্যথা অনিবার্য পরিণতি সামাজিক অশান্তি, কলুষতা, বিদ্বেষ এবং পারিবারিক বন্ধনের ক্রম-শিথিলতা। বর্তমান ভারতের সমাজ-জীবনে এই ব্যাধি ক্রমবর্ধমান।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী এই আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, ভগিনী নিবেদিতার প্রশ্নের সমাধানরূপেই তিনি এই বিপর্যয়ে একমাত্র ত্রাণকর্ত্রীর ভূমিকায় আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং আধুনিক বিশ্বের নারীসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপায়ণ তাঁর জীবনে সংঘটিত হয়েছে। একদিকে নারীর সামাজিক মহিমার চরম নিদর্শন রেখে গেলেন তাঁর সেবা, করুণা, পাতিব্রত্য এবং মাতৃত্বে; অন্যদিকে বিকশিত করলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্বের সকলের প্রতি কৃপা বিতরণের পরম ঔদার্য, যেখানে সর্বপ্রকারের সামাজিক বিধি-নিষেধ, সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত, নিন্দিত ও ধিক্কৃত। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ত্রিবেণী—তীর্থস্বরূপ তাঁর জীবন ও বাণীর অনুধ্যান সেইজন্যই এত অর্থবহ।

নারীজীবনের চারটি মুখ্য প্রকাশ—কন্যা, ভগিনী, জায়া ও জননী—শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে কি অনুপম অভিব্যক্তি লাভ করেছে! দরিদ্র পিতামাতার সংসারে আবির্ভূত হয়ে পরিবারের সমস্ত কাজ বাল্যাবধি করতে হয়েছে। পরবর্তী কালে বিধবা মা এবং ছোট ছোট ভাইবোনেদের অন্নসংস্থানের জন্য ধান ভেনেছেন দিনের পর দিন! ভাইবোনেদের শুধু স্নেহ-যত্ন বা অর্থ-সাহায্যই করেননি, ছোট ভায়ের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর উন্মাদ স্ত্রী এবং মেয়ের সমস্ত ভার নিজের কাঁধে বয়ে গেলেন সারা জীবন; জয়রামবাটীতে ভাইদের সংসারে থেকে অসংখ্য শিষ্য-সন্তান পরিবৃতা মা ঘুঁটে কুড়োচ্ছেন, বাসন মাজছেন, ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন,

কাপড় কাচছেন, রান্না ক'রে সকলকে খাওয়াচ্ছেন, এবং সবশেষে তাদের এঁটো পরিষ্কার করছেন নিজের হাতে! আবার, 'উদ্বোধনে'ও উপরি-পাওনা হ'ল রাধু ও তার অপ্রকৃতিস্থা মা—যাদের নিয়ে হাসিমুখে সংসার করার কথা আজকের দিনে কয়জন নারী ভাবতে পারেন? তাই প্রশ্ন জাগে—মা মানবী না দেবী?

আর মায়ের পাতিব্রত্য? বিস্তৃত আলোচনা ক'রেও এর পূর্ণ মাধুর্যের আভাস মাত্রও উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিনি শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের চিরানুবর্তিনীই ছিলেন না, স্বামীকে তিনি একাধারে 'মা-কালী' এবং আপন সন্তান-রূপে দেখতেন। তাই মা ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—'না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।' পক্ষান্তরে, ঠাকুরও তাঁকে একাধারে নহবত-বাসিনী গর্ভধারিণী মা, পদসেবারতা সারদা এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা 'মা জগদম্বা'র রূপে দেখে 'আনন্দময়ী' নামে অভিহিত করেছেন। জগতে পতি-পত্নীর কামগন্ধশূন্য, নিষ্কলুষ, স্বর্গীয় জীবনের এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে? প্রাচীন ভারতে স্বামী-স্ত্রীর যজ্ঞাদি কার্যে সমানাধিকারের যে দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, যার বলে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের পূর্ণঘটটি স্থাপিত হয়, এই দুই দেব-মানব ও দেবীমানবীর জীবনে তারই পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করি।

নারীজীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ বিকাশ মাতৃত্বে, এর আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। শুধু সমাজ সম্বন্ধেই নয়, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও মাতৃভাবই ভগবদ্ভাবের সহজতম ও মধুরতম প্রকাশ, এইটি দেখানোই শ্রীশ্রীমায়ের নরদেহধারণের গূঢ়তম তাৎপর্য। তাই তাঁর অপার্থিব মাতৃত্ব এবং অলৌকিক দেবীত্ব একসূত্রে গ্রথিত।

দৈহিক সম্পর্কে মা না হয়েও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে হাজার হাজার পুত্র-কন্যার ভক্তিসিক্ত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত 'মা' ডাক শোনা জগতের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। ভারতের সমাজ-জীবনে মাতৃত্বের এই অপরূপ ভাব সমগ্র জাতিকে নতুন মন্ত্রে উদ্দীপিত করছে—যেখানে মায়ের পদপ্রান্তে বসে আপামর নারী-পুরুষ গার্হস্থ্য-জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সমন্বয়ের দীক্ষা গ্রহণ করেছে এবং করছে। 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে!'—এত বড় অভয়বাণী আর কে কবে দিতে পেরেছে, কিংবা 'ভাল ছেলের মা সবাই হতে চায়, কিন্তু খারাপ ছেলের মা কে হতে চায়?'—একথা কে বলতে পেরেছে! সর্বব্যাপী এই মাতৃত্ব অখণ্ড-অদ্বৈতবোধে উদ্ভাসিত—স্বামী সারদানন্দ এবং ডাকাত আমজদ একই মুদ্রার এপিঠ, ওপিঠ!

শ্রীশ্রীমায়ের বাণীগুলির গভীরতম অর্থ তাঁর কর্মে ও আচরণে প্রতিফলিত। আদর্শ গৃহস্থ নারীর প্রথম প্রয়োজন—ঐতিহ্যানুসারী শিক্ষা, যার পরিণতি হবে স্বদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের ভাল দিকগুলির সঙ্গে পরিচিতি এবং সর্ববিধ সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি। তাই মা নিজে তেমন লেখাপড়া না শিখলেও তাঁর দুই ভাইঝিকে কিছুটা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজে শিক্ষিতা মহিলাদের স্নেহ করতেন এবং অন্যান্যদের শিক্ষিতা হবার জন্য উৎসাহ দিতেন।

দ্বিতীয় প্রয়োজন হ'ল—দৈনন্দিন জীবনে উপযোগী সমস্ত রকম কাজ শেখা ও জানা। স্ত্রী-ভক্তদের সেলাই-এর কাজ ও নানারকম হাতের কাজ দেখে তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেন। নারীজাতির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের বিকাশে হৃদয়ের

মাধুর্য ফুটে উঠবে—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। তাই মা দুঃখ ক'রে বলছেন—"মাদ্রাজের দুটি মেয়ে, বিশ-বাইশ বছর বয়স, বিয়ে হয়নি, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা! তারা সব কেমন কাজ-কর্ম শিখেছে। আর আমাদের? এখানে পোড়া দেশের লোকে আট বছর হতে-না-হতেই বলে, 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।'" শ্রীশ্রীমা এখানে আধুনিকা। অথচ, এই মা-ই আবার ভক্ত-প্রদত্ত সিল্কের গেঞ্জী তিনদিন ব্যবহারের পর ফেরত দিয়ে বললেন—'মেয়েমানুষ জামা পরলে লোকে কি বলবে?' প্রাচীন ও নবীনের কি অদ্ভুত সহাবস্থান।

তৃতীয় হ'ল লজ্জাশীলতা, যা হিন্দুনারীর । শ্রীশ্রীমা বিশেষ কারণ ছাড়া যে সদাসর্বদা থাকতেন এবং সব পুরুষের সামনে আসতেন না, তার অন্যতম কারণ এইটি। মা তাঁর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে ইচ্ছুক এক স্ত্রীভক্তকে বললেন—'বৌমা, নাই বা স্নান করতে গেলে…পুরুষগুলো হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে' ইত্যাদি। নারীর লজ্জাহীনতা সমাজ-জীবনের যত-কিছু অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার অন্যতম কারণ

চতুর্থ—পাতিব্রত্য। স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—'তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী'—যাঁরা পতিসেবার মহিমায় চিরসমুজ্জ্বল। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীমা এঁদেরও অতিক্রম করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে রেখেছিলেন ঠাকুরের অন্তরালে—'আমি কে? ঠাকুরকে ডাকো। তিনিই যা করবার করবেন।' তাই জনৈক ভক্তের স্ত্রীকে বলছেন—'স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও রাজ-অট্টালিকা' এবং স্বামীকে বলছেন—'স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থেকো। দুজনে যেখানেই থাক, সেখানেই রামরাজ্য।'

পঞ্চম—কর্মপরিণত অদ্বৈত বা ব্যবহারিক বেদান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—'অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।' শ্রীশ্রীমা ব্যবহারিক জীবনে তার পূর্ণ প্রয়োগ দেখিয়ে আমাদের শিখিয়ে গেলেন যে, সংসার আর ঈশ্বর পৃথক্ নয়। তাই জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বলছেন—'কাজ কর মা, কাজ কর। সংসারে কাজ না করলে মনে কুচিন্তা আসবে।' কর্ম যে উপাসনারই নামান্তর মাত্র, নারীজাতির গার্হস্থ্যকর্ম যে আদৌ ঈশ্বরবিমুখতা নয়, তারই অনবদ্য দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রীমার জীবন ও বাণী।

শ্রীশ্রীমার ষষ্ঠ বাণীটি সমাজ-জীবনে সামঞ্জস্যের অমোঘ অস্ত্র—'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যখন যেমন, তখন তেমন; যার কাছে যেমন, তার কাছে তেমন।' প্রতিটি গৃহস্থের অবশ্য-আচরণীয় এই নির্দেশটি সমাজের ভারসাম্যই যে শুধু রক্ষা করে তাই নয়, পরন্তু আমাদের মনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত সংঘাত ও অশান্তির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সহনশক্তির অপূর্ব মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের সামাজিক ব্যাধির মূল হ'ল—পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা। এর ফলেই আজ আমরা বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই বস্তুটি কত অপরিহার্য, সেটিই শ্রীশ্রীমা তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের দেখিয়ে গেলেন।

তাঁর সপ্তম ও শেষ বাণীটি আমাদের জীবনের পরম পাথেয়। জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বলছেন—'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, মা; জগৎ তোমার।' এই অদোষদর্শিতা সাধনার বস্তু। দুর্লভ তপস্যার ধন। শ্রীশ্রীমা তাঁর জীবনে কোনদিন কাউকে নিন্দা করেননি বা কারোর দোষ কীর্তন করেননি। এর কারণটি তাঁর ঐ বাণীর শেষাংশেই নিহিত।—জগৎটা যে তাঁরই!

শান্তির এই শাশ্বত পথের অভ্রান্ত দিশারী আমাদের মা।—প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের অভিনব সেতুস্বরূপ অনন্তমহিমান্বিতা আমাদের মা।

ক্রুশবিদ্ধ বিবেকানন্দ

ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

যিনি বলতে পারেন : 'যদি একজনের মনে—এ সংসার-নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও একটু আনন্দ ও শান্তি দেওয়া যায়, সেইটুকুই সত্য, এই তো আজন্ম ভুগে দেখছি—বাকি সব ঘোড়ার ডিম।', তিনি কি পারেন স্থির থাকতে—দরিদ্ররূপী নারায়ণকে রাস্তার ধারে রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে! তিনি অস্থির হয়ে উঠেন সেবা করার জন্য।

একটি ঘটনা। একবার স্বামীজী তাঁর গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে দেওঘরে আছেন। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে তাঁরা দেখেন রাস্তার ধারে একটি দুঃস্থ লোক পড়ে আছে। সে আমাশয় রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে এবং শীতে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে, গায়ে তার শতছিন্ন মলিন বস্ত্র। এই আর্তনারায়ণকে দেখে স্বামীজী অস্থির হয়ে উঠলেন সেবার জন্য। কিন্তু তিনি পরের বাড়িতে আছেন। গৃহস্বামী যদি কিছু মনে করেন, এই চিন্তা তিনি ক্ষণকালের জন্য করলেন। মুহূর্তের মধ্যে ঠিক ক'রে নিলেন গৃহস্বামী যা-ই ভাবুন না কেন, তিনি এই দুঃস্থ ব্যক্তির সেবা করবেন। গুরুভাই-এর সাহায্যে ধরাধরি ক'রে তিনি তাকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে এলেন। তাকে একটি ঘরে শুইয়ে দিয়ে গা পরিষ্কার ক'রে, পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়ে আগুন দিয়ে সেঁক দিতে লাগলেন। এইভাবে শুশ্রূষায় লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল। গৃহস্বামী দেখে আনন্দিত হলেন এবং ভাবলেন স্বামীজী শুধু বক্তৃতা করেই বেড়ান না, স্বহস্তে সেবাও করেন।

মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণায় স্বামীজীর হৃদয় অনিবার জ্বলছিল। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাচ্ছিলেন না। সব সময় তাঁর এক চিন্তা—কিসে মানুষের দুঃখ দূর হবে। একটি ঘটনা উল্লেখ করলে এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। স্বামীজী তখন মঠে আছেন। একদিন স্বামীজীর সঙ্গে কয়েকজন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন। এই সময়ে পাঞ্জাবে অন্নাভাব ছিল। পাঞ্জাবের মানুষের দুঃখের কথা, তার দূরীকরণের উপায় এবং জনগণের উন্নতির কথা তাঁর সঙ্গে স্বামীজী আলোচনা করতে লাগলেন। কথাবার্তার পরে বিদায়কালে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি নিরাশ হয়ে বললেন : 'মহাশয়, ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন উপদেশ-লাভের উচ্চ আশা নিয়ে আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কথাবার্তা তুচ্ছ বিষয়াবলীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে গেল। দিনটাই বৃথা গেল!' স্বামীজী মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে বললেন : 'মহাশয়, যে পর্যন্ত আমার দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে,—সে পর্যন্ত আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো ও তার যত্ন লওয়া—আর যা-কিছু তা হয় ধর্মধ্বজিতা বা অধর্ম!'

স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছে। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভাইরা চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে দ্বিতীয়বার বিদেশে যেতে অনুরোধ করলেন স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের জন্য। বিদেশে গেলেন কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের আর পুনরুদ্ধার হ'ল না; তিনি ফিরে এলেন ভারতে। পরিশ্রমের কিন্তু বিরতি নেই—অবিরাম পরিশ্রম ক'রে চলেছেন। দ্বিতীয়বার বিদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি শিষ্য কল্যাণানন্দকে একদিন বললেন : 'দেখ কল্যাণ, হৃষীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ রুগ্ন সাধুদের জন্যে কিছু করতে পারিস? তাঁদের দেখবার কেউ নেই। তুই গিয়ে তাঁদের সেবায় লেগে যা।' পরিব্রাজক-

জীবনে উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণের সময় বৃদ্ধ ও পীড়িত সাধুদের দুঃখদুর্দশা দেখে স্বামীজীর হৃদয় করুণায় ভরে উঠেছিল। তাই পরবর্তী কালে স্বামী কল্যাণানন্দের মত উপযুক্ত শিষ্যকে পেয়ে তিনি উপরি-উক্ত কথাগুলি বলেছিলেন। তারই ফলে স্বামী কল্যাণানন্দ এবং স্বামীজীর আর একজন শিষ্য স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে কনখলে এক সেবাশ্রম গড়ে উঠল।

দেশের মানুষের দুরবস্থার কথা ভেবে ভেবে রাত্রে স্বামীজী ঘুমাতে পারতেন না। একটি ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ করলে বুঝতে পারব স্বামীজীর রোগ-যন্ত্রণা তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ—দেশের মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে ছিল। মঠে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর ঘরের উত্তরে ছোট ঘরটিতে থাকতেন। একদিন রাত্রে তিনি স্বামীজীর ঘরের দিক থেকে করুণস্বরে কান্নার এক আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, স্বামীজী কি অসুস্থতার যন্ত্রণায় কাঁদছেন? তিনি তাড়াতাড়ি স্বামীজীর ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন স্বামীজী মেঝের উপর পড়ে করুণ-স্বরে কাঁদছেন। তিনি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'স্বামীজী, আপনার কি শরীর খারাপ?' তখন স্বামীজীর চেতনা হ'ল। তিনি বললেন: 'কে—পেসন? আমি ভেবেছিলাম, তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছ।' তখন বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী বেদনাহতচিত্তে সাশ্রুনয়নে বললেন: 'দেশের দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশার কথা ভেবে ভেবে আমি ঘুমুতে পারছি না, মনটা বেদনায় ছটফট করছে। তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, এদেশের সুদিন আসুক, দুর্দিন চলে যাক।' বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সেদিন স্বামীজীকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন।

স্বামীজী মঠে আছেন। মঠে গরীব সাঁওতালরা কাজ করত। স্বামীজী তাদের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতেন তাদের সাংসারিক দুঃখকষ্ট। দুঃখকষ্টের কথা শুনে স্বামীজীর চোখ ছলছল ক'রে উঠত। একদিন স্বামীজী স্বহস্তে তাদের লুচি তরকারি মেঠাই-মণ্ডা দৈ ইত্যাদি সানন্দে পরিবেশন ক'রে খাওয়ালেন। পরিতৃপ্তিসহকারে খাওয়ার পর সাঁওতালরা চলে গেলে, মঠের সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য ক'রে স্বামীজী বললেন: 'দেখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হ'ল? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। ইচ্ছা হয়—মঠ-ফট সব বিক্রি করে দিই, এই সব গরীব-দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?...আহা! দেশে গরীব-দুঃখীদের জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়—এমন কেউ নেই রে!...তোরা সব বুদ্ধিমান ছেলে, হেথায় এতদিন আসছিস। কি করলি বল দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পারলিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত-ফেদান্ত পড়বি! এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানবো—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।'

স্বামীজী শুধু ভারতের ছিলেন না। তিনি শুধু ভারতের মানুষের কথা ভাবেন নি। তিনি শুধু ভারতের মানুষের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন নি। তিনি ছিলেন সমস্ত জগতের। তিনি শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডিকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: "আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভুল ক'রে

লোকে যাদের 'মানুষ' বলে আমরা সেই 'নারায়ণের'ই সেবক।" আর একটি পত্রে আলাসিঙ্গাকে স্বামীজী লিখেছিলেন: 'আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের।' তাই দেখি, তিনি পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন টাকা উপার্জন ক'রে ভারতবর্ষের মানুষের দুঃখ দূর করতে, কিন্তু ওখানকার মানুষকে দেখেও তাঁর হৃদয় কেঁদেছিল। তিনি দেখেছিলেন তারা কামকাঞ্চনের উপাসক—আকণ্ঠ ভোগবিলাসে নিমগ্ন। ভূমার আনন্দ তারা জানে না। জানে না যে তারা পরমানন্দস্বরূপ আত্মা। যদি তারা তা জানত, তাহলে তুচ্ছ ভোগবিলাসের মধ্যে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত না। তাদের মধ্যে আত্মার এই বন্ধনদশা দেখে স্বামীজীর হৃদয় করুণার্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি বেদান্তের বাণী তাদের কাছে প্রচার করলেন। তিনি সর্বশক্তিমান আত্মার মহিমার কথা তাদের কাছে প্রচার করলেন। বললেন: উঠো জাগো। ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে ডুবে থেকো না। তোমরা জাগো, জেগে দেখো তোমাদের আত্মার ঐশ্বর্য। আত্মজ্যোতির দর্শন পেলে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে, চিরশান্তি পাবে—চির-আনন্দের অধিকারী হবে।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার যখন বিদেশে গিয়েছিলেন তখন একবার তাঁর কয়েকজন অনুরাগী বন্ধুদের সঙ্গে কায়রো শহরে বেড়াচ্ছিলেন। কথাবার্তা বলতে বলতে রাস্তা হারিয়ে তাঁরা এসে পড়েছিলেন শহরের এক প্রান্তে নোংরা বস্তির কাছে যেখানে পতিতারা থাকে। পতিতারা স্বামীজীকে দেখে হাসতে হাসতে ডাকতে লাগল। সঙ্গিনীদের একজন স্বামীজীকে এবং দলের অন্যদের তাড়াতাড়ি এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু স্বামীজী সেকথা না শুনে ধীরে-সুস্থে পতিতাদের দিকে এগিয়ে চললেন এবং বলতে লাগলেন: 'আহা বাছারা! আহা অভাগিনীরা! ওরা তাদের সৌন্দর্যের পায়ে নিজেদের দেবীত্বকে বলি দিয়েছে! এখন দেখ দেখি তাদের অবস্থা!' তাদের এই দুর্দশা দেখে তিনি অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

একদিকে ভারতের দুঃখক্লিষ্ট মানুষের জন্য জমাট-বাঁধা দুঃখ, আর একদিকে পাশ্চাত্যে জড়বাদের প্রভাবে স্বাধীন আত্মার বন্ধনদশা দেখে বেদনা—এই দুই যন্ত্রণা স্বামীজীর হৃদয়কে সমানভাবে বিদ্ধ করেছে। স্বামীজী চেয়েছিলেন সন্ন্যাসীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই উভয়বিধ অভাবমোচনে অগ্রসর হোন। সন্ন্যাসীরা কি আদর্শে নিজেদের জীবন গঠিত করবে সে-সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন: "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে যারা এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলে যায় 'বৃথৈব তস্য জীবনম্'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।" তাঁর এই আদর্শের পতাকা যাঁরা বহন করবেন, সেই সব গুরুভাই ও শিষ্যদের অগ্নিময়ী ভাষায় আত্মোৎসর্গ করতে আহ্বান করছেন: 'রামকৃষ্ণ এই জগতের জন্য প্রাণ দিতে এসেছিলেন। আমিও জগতের জন্য প্রাণ দেব। তোমরা সকলে দেবে—তোমরা সকলে—।...বিশ্বাস করো, আমাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিলে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে বিরাট বীরের দল, ঈশ্বরের সৈনিকরা, যারা আনবে জগতে বিপ্লব।' (স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী থেকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেওয়া মানুষের দুঃখ-যাতনার ক্রুশটি স্বামীজী সারা জীবন ধরে বহন করেছেন।

দুঃখ-যাতনার ক্রুশ বহন করতে তিনি নিজেকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। তিনি নিজেকে স্বেচ্ছায় আহুতি দিয়েছেন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য। ভগবান যীশু মানবজাতির কল্যাণের জন্য বলেছিলেন: পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মানুষের বেদনা বহন করবেন। তেমনি স্বামী বিবেকানন্দও মানুষের দুঃখ-যাতনার ক্রুশটি সমগ্র মানবজাতির যতদিন মুক্তি না হয় ততদিন বহন করতে প্রস্তুত। তাঁর অমর বাণী: '...আমি কোনো দিন কর্ম থেকে বিরত হব না। যতদিন না সারা জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করছে, ততদিন আমি সর্বত্র—মানুষের মনে প্রেরণা জাগাতে থাকব।'

ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া

শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

একশত পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে এই দৈবী ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। রাশিচক্র বারংবার আবর্তিত হয়। আর এই শুভ আবির্ভাব-তিথির—ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ার সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকে বিশ্বের অগণিত ভক্ত নরনারী। এবার রাজার প্রাসাদে নয়, দীনের পর্ণকুটীরে তাঁহার আগমন—লোকচক্ষুর অগোচরে অপরিগ্রহব্রতরত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর—ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণির সন্তানরূপে 'পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্তে'।

পরম ভক্তিমান ক্ষুদিরাম গিয়াছিলেন গয়াধামে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ করিতে। সেখানে নবদূর্বাদলশ্যাম জ্যোতির্ময় এক দিব্যপুরুষ স্বপ্নে দর্শন দিলেন ক্ষুদিরামকে। তিনি বলিলেন—'ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে আমি পরম প্রসন্ন হয়েছি। আমি পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হয়ে তোমার সেবা গ্রহণ করবো।'

ক্ষুদিরামের চক্ষে আনন্দাশ্রু। ভক্তির বান ডাকিয়া গেল যেন! তিনি স্বপ্নের ঘোরেই জবাব দিলেন—'না, না প্রভু, আমার এ সৌভাগ্যের প্রয়োজন নেই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমি কি আপনার সেবা করতে পারবো?'

—'ভয় নেই ক্ষুদিরাম, তুমি আমায় ভালবেসে যা দেবে তাই আমি তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করবো। আমার অভিলাষ পূরণ করতে আপত্তি করো না।'

দেবস্বপ্ন বৃথা হয় নাই। হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ভক্তপ্রবর দরিদ্র ক্ষুদিরামের গৃহে হইল ভক্তের ভগবান—পতিতপাবনের শুভাবতরণ। —ছদ্মবেশী রাজরাজেশ্বরের গুপ্তভাবে নিজ রাজ্য পরিদর্শনের অভিলাষে।

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত / অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'—এই যে চিরকালের প্রতিশ্রুতি, যাহা মর্ত্যমানবের পরম আশ্বাস—তাহা রক্ষা করিতেই তাঁহার আবির্ভাব। পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সবচেয়ে কাছে—হৃদয়গুহাতে অবস্থান করিতেছেন আর তাঁহাতেই সমগ্র জীবজগৎ প্রোথিত—'সূত্রে মণিগণা ইব'।

নির্গুণব্রহ্ম লীলারহিত। কিন্তু সগুণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সতত প্রবাহিত, তরঙ্গায়িত। তিনি খেলা করেন নিজের সঙ্গে নিজে—এক তিনি, বহু হন লীলা-আস্বাদনের জন্য। 'একোঽহং বহু স্যাম্'—নিজেকেই সৃষ্টি করেন বহুরূপে: কেহ

সেবক, কেহ যাচক, কেহ অন্তরঙ্গ, কেহ বহিরঙ্গ - সকলের মাধ্যমে তিনি আস্বাদন করেন নিজেকে নিজে।

শ্রীরামকৃষ্ণে আছে করুণা—নির্গুণব্রহ্মে তাহা নাই। নিত্য ও লীলা—সগুণ ও নির্গুণ—তত্ত্বে অভেদ, লীলায় ভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত কৃপাময়। অপার ক্ষমার মূর্তি তিনি। চন্দ্র হালদারের দুর্ব্যবহার, গিরিশচন্দ্রের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভর্ৎসনা, —সবই ক্ষমা করিলেন প্রসন্নচিত্তে। নিঃসীম করুণায় অসংখ্য পাপী-তাপীকে দিলেন শ্রীপদে আশ্রয়।

নির্গুণব্রহ্মে রূপভেদ নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে আছে। মথুরবাবু দেখিলেন ঠাকুরের মধ্যে শিব ও শক্তির অপূর্ব প্রকাশ। অসংখ্য ভক্তকে তিনি দর্শন দিয়াছেন—নানাভাবে, নানারূপে।

অলৌকিক দর্শনের কথা—ভাবরাজ্যের কথা থাকুক। লৌকিক দৃষ্টির কথাই ধরা যাক। কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর, কাশীপুরের ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান। কাহারও তিনি পরিত্রাতা, কাহারও সন্তানস্বরূপ, কাহারও বা ইষ্টরূপ। আবার যাহারা মূঢ়—গূঢ়তত্ত্ব জানে না, তাহারা দেখিল তিনি ক্ষুদিরামের পুত্র—গদাই, অন্যদের দৃষ্টিতে তিনি উন্মাদমাত্র।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে তিনি অবতারবরিষ্ঠ—'চির-উন্মদ প্রেমপাথার'। গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতির দৃষ্টিতে তিনি পরব্রহ্ম জগৎপোষক—করুণার অবতার। রসিক মেথরের দৃষ্টিতে পতিতপাবন। আর সকলেরই দৃষ্টিতে তিনি একাধারে আদর্শ সন্ন্যাসী ও আদর্শ গৃহী—একাধারে পরম জ্ঞানী ও পরম ভক্ত।

আপ্তকাম আত্মারাম সেই আদিপুরুষ আসিয়াছিলেন প্রেম বিলাইতে, ভালবাসা শিখাইতে। শুদ্ধ ভালবাসায় শ্রীভগবান বাঁধা পড়েন —এই কথা জানাইতে, দেখাইতে ও বুঝাইতে।

কামারপুকুরের ধনী কামারনী, চিনু শাঁখারী, দক্ষিণেশ্বরের রসিক মেথর, কামারহাটির গোপালের মা, বাগবাজারের গোলাপ-মা ও যোগীন-মা, নটী বিনোদিনী—সমাজের নানা স্তরের মানুষের একটি জিনিস সকলেরই ছিল। সেটি ভালবাসা। তাইতো তিনি বাঁধা পড়িলেন ইঁহাদের সকলেরই নিকট!

সর্বলোকের মহেশ্বর ও সর্বভূতের সুহৃদ্ তিনি। তাঁহাকে জানিলেই পরাশান্তি।

'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥'

(গীতা, ৫।২৯)

'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥'

(গীতা, ১১।১৮)

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীদেবব্রত দাস

[পূর্বানুবৃত্তি]

জগতে দু'প্রকার শক্তি আছে—জড়শক্তি আর চিতিশক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তি। এই জড়-শক্তিতেই বিশ্বাস অধিকাংশ মানুষের। কেবল জড়-বাদকেই স্বীকার করে তারা। চর্মচক্ষুতে যা দেখা যায়, ইন্দ্রিয় দিয়ে যা বোধ করা যায় আজকের অধিকাংশ মানুষ তাতেই বিশ্বাস করে। এরা চার্বাকপন্থী। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ও সাধারণ বোধশক্তির বাইরেও তো কিছু থাকতে পারে!—

যার অপরোক্ষ অনুভূতি সম্ভব। এই প্রকার বিশ্বাসে বিশ্বাসীরাই অধ্যাত্মবাদী। ভারতসহ প্রাচ্য দেশগুলি সাধারণতঃ এই চিতিশক্তিতে বিশ্বাসী, অপরদিকে পাশ্চাত্য দেশগুলি বহুলাংশে জড়শক্তিতেই বিশ্বাস করে। এখন দেখা যাক, এই প্রকার পার্থক্যের কারণ কি। 'ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছে, দুঃসহ শীতের প্রকোপ অতি প্রাচীনকাল হইতে পাশ্চাত্য মানবমনে দেহবুদ্ধির দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া তাহাকে একদিকে যেমন স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি আবার সংহত চেষ্টায় স্বার্থসিদ্ধি—এ কথা সহজেই বুঝাইয়া উহাতে স্বজাতিপ্রীতির আবির্ভাব করিয়াছিল। ঐ স্বার্থপরতা এবং স্বজাতিপ্রীতিই তাহাকে কালে অদম্য উৎসাহে অপর জাতিসকলকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে ধনসম্পদে নিজ জীবন ভূষিত করিতে প্ররোচিত করে। উহার ফলে যখন সে নিজ জীবনযাত্রার কতকটা সুসার করিতে পারিল, তখনই তাহাতে ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব হইয়া তাহাকে ক্রমে বিদ্যা ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হইতে প্রবৃত্ত করিল।...এবং পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতারূপ নিশ্চিত প্রমাণপ্রয়োগ না করিয়া কোন বিষয় কখন বিশ্বাস বা গ্রহণ করিবে না, ইহাই তাহার নিকট মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।' (লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৪-১৬) 'কিন্তু জড়-বিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিলেও, পূর্বোক্ত নীতি আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্যকে পথ দেখাইতে পারে নাই। কারণ সংযম, স্বার্থহীনতা এবং অন্তর্মুখতাই ঐ বিজ্ঞানলাভের একমাত্র পথ...।' (ঐ, পৃঃ ১৬)

প্রাচ্যে জাতীয় জীবনের ভিত্তি ছিল ধর্ম প্রাচ্যে মানুষ কেবল দৈহিক সুখভোগকেই চরম বলে স্বীকার করেনি। দেহগত-সুখভোগের ঊর্ধ্বেই যে চরম ও পরম আনন্দ—এই বিশ্বাস থাকায় বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মভাবের মধ্য দিয়ে তারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছে। ভারতের জাতীয় জীবন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে ভারতীয় সভ্যতা এক অপূর্ব উপাদানে গড়ে উঠেছিল। সংযম, একতা ও উদারতা এই সভ্যতার মূল উপাদান। 'ত্যাগের জন্য ভোগের গ্রহণ এবং পরজীবনের জন্য এই জীবনের শিক্ষা' (ঐ, পৃঃ ১৯) —এই ছিল ভারতে মূলমন্ত্র। পাশ্চাত্যের ভারতাধিকারের দিন থেকে ভারতে তথা প্রাচ্য দেশগুলিতে জাতীয় জীবনে একটা বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন হল ঐতিহ্যগত অধ্যাত্ম-বাদ থেকে জাতির ক্রমবিচ্যুতি ও পাশ্চাত্যের জড়বাদে বিশ্বাস।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ, জড়বাদের যুগ। এ-অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবেদিত ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার স্থান কোথায়? একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, বিজ্ঞান মানুষের ব্যবহারিক ও জাগতিক চাহিদা মেটায়, মানুষের জড়জীবনকে স্বচ্ছন্দতর করে তোলে। অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা মানুষের মানসিক ও অতিজাগতিক উন্নতি সাধন করে তাকে সংযম, উদারতা ও একতার পথে নিয়ে যায়। তাই এই বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে প্রাণ সঞ্চার করতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন। বিবেকানন্দ বলেছেন, "যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য-বীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে

পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে।" (বাণী ও রচনা। ৬।৩৩-৩৪) এই 'ঘরের সম্পত্তি' —চিরন্তন ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে, বিজাতীয় শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করতেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও সাধনায় বিশ্ববোধের এক অপূর্ব প্রতিফলন ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম বিশ্বজনীন, তাঁর মানবতাবোধ দেশকালের পার্থক্য মানে না, তাঁর সাধনা কোন বিশেষ সমাজের জন্য কেন্দ্রীভূত নয়। তাঁর শিক্ষা বিশ্বের সকলের জন্যই, তাঁর অদ্বৈতভাব সমগ্র বিশ্বকে একসূত্রে গেঁথেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা কোন নির্দিষ্ট পথের সাধনা নয়। শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, মুসলিম, খৃষ্টান—যে কোনও ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধকই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঈপ্সিত সাধনপথের সন্ধান পায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধির অনন্যতা এইখানেই। সর্বধর্ম-সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন পথে সাধনা করে 'যত মত তত পথ' এই মূলসত্যে উপনীত হন। চরম ও পরম তত্ত্বের উপলব্ধির জন্য সকল জাতির যে যুগযুগান্তের সাধনা, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে একসূত্রে বেঁধেছেন —এর চাইতে বিশ্ববোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি থাকতে পারে!

বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন অনেকাংশে মিটেছে, কিন্তু অভাববোধ যায়নি। এই অপূর্ণতাকে দূর করার পথের সন্ধান, সব-কিছু পার্থিব পাওয়ার চেয়ে অনেক অনেক বড়ো—পরমকে পাওয়ার উপায়, আর আজকের হারিয়ে-যাওয়া আত্মসম্বিত ও মনুষ্যত্বের পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা—এ-সবই শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন। জীবনের অপূর্ণতাকে চিরকালের জন্য দূর করতে হলে মানুষকে ঈশ্বরলাভ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে 'মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর-লাভ, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।' এই ঈশ্বরলাভ করতে হলে মানুষকে সর্বাগ্রে আত্মসম্বিত ফিরে পেতে হবে, মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হবে। এই আত্মসম্বিতই শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজচেতনার মূল কথা। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য বিবেকানন্দ বলেছেন, 'এস, মানুষ হও।…তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো?… তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করি (বাণী ও রচনা: ৬।৩৫৯) বলেছেন, ' Future India—Ancient India-র (ভবিষ্যৎ ভারত—প্রাচীন ভারতের) অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India (বর্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব! আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।' (বাণী ও রচনা: ৭।৭৫-৭৬)

ভগবানলাভের জন্য সর্বাগ্রে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন। এই মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন কোন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীতেই আবদ্ধ নয়। মানুষের জীবনের বিকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটে। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ মনুষ্যত্বের স্বাক্ষর রাখে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সমূহ ভাবের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ দেবমানব। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।' (বাণী ও রচনা: ৯।১৯১) সেই সকল বিদ্যা ও ভাব তো আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন; সেগুলিকে প্রকাশিত ও প্রাণবন্ত করতে প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণের।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

শ্রীশুভেন্দুমোহন ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সভ্যতা যতটা প্রাচীন, গ্রন্থাগারও ততটাই প্রাচীন। কিন্তু সভ্যতা তার প্রাক্-পর্যায়ে একই সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে প্রসার লাভ করেনি। প্রথম কিছুকাল সভ্যতা কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। পোড়া-টালি, প্যাপিরাস রোলস্, পার্চমেণ্ট (ভেড়ার চামড়া), ভেলাম্ (নবজাত বাছুরের চামড়া থেকে তৈরী), তাল-পাতা, ভূর্জপত্র প্রভৃতি বস্তসমূহই ছিল তৎকালীন লেখার সামগ্রী।

শুরুতে মঠে-মন্দিরেই গ্রন্থাগার ছিল। তার-পরে ক্রমে রাজপ্রাসাদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে।

প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে প্রাচীন সুমেরিয়ার টেলোতে অবস্থিত গ্রন্থাগারটিতে ত্রিশ হাজারেরও বেশী পোড়া-টালিতে (আনুমানিক ৩১০০ খ্রী: পূ:) কৃষি, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশিত ছিল। হামুরাবি যখন উর থেকে ব্যাবিলনে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ষোড়শ শতকে, তখনও পোড়া-টালি ব্যবহৃত হ'ত লেখার কাজে।

আসিরীয়ান সভ্যতার (যতদিন নিনেভের জন্ম হয়নি ততদিন আসুরই ছিল আসিরীয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী) উদ্ভবের সময়ে গ্রন্থাগার উৎকর্ষ লাভ করে। নিনেভেতেও (Nineveh) গ্রন্থাগার ছিল, যে-গ্রন্থাগারটি সারগন (Sargon) নির্মাণ করেছিলেন এবং ৬৮১ খ্রী: পূ: অবধি সেনাচেরিব (Sennacherib) এই গ্রন্থাগারটি আমৃত্যু রক্ষা করেন। সেনাচেরিবের দৌহিত্র আসুরবানিপাল (Assurbanipal) এই গ্রন্থাগারটিকেও পুনরায় সুসমৃদ্ধ করেন এবং কুড়ি হাজারেরও বেশী পোড়া-টালি দ্বারা গ্রন্থাগারটিকে সুশোভিত করেন। এইসব পোড়া-টালিতে ব্যাকরণ, কাব্য, ইতিহাস, ধর্ম, বিজ্ঞান, অভিধান-সংকলনের বিদ্যা (Lexi-cography) ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ ছিল। আসুরবানিপালের পোড়া-টালিগুলি কেবলমাত্র কুলুঙ্গিতে সুবিন্যস্তভাবে সুসজ্জিতই ছিল না; প্রতিটি টালির সূচীকরণ করা হয়েছিল। টালিগুলি বিষয়ানুযায়ী প্রতিটি cubicle (ছোট ছোট ঘরের মতন) বা painted alcove (চিত্রিত/ কুলুঙ্গি)-এ সাজানো ছিল এবং প্রতিটি টালিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে tag (ফিতে বা দড়ির প্রান্তস্থিত ধাতুখণ্ড) লাগানো ছিল সনাক্তকরণের জন্য। অনুমান করা হয়, এটি ছিল সর্বসাধারণের গ্রন্থাগার (Public library)। এটি সমাজের সকলস্তরের মানুষের পক্ষে অভিগম্য ছিল। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে তারপরে এই গ্রন্থাগারে যাওয়ার প্রয়োজন হ'ত না। আসিরীয়ার রাজকীয় নকলনবিসরা (royal scribes) ব্যাবিলনের বরসিপ্পার (Borsippa) গ্রন্থাগার থেকে যে-সমস্ত লিপি নকল ক'রে নিয়ে এসেছিল তারই সাহায্যে আসুরবানিপালের এই গ্রন্থাগারটি নির্মিত হয়। কিন্তু পাণ্টা-বিব্লিয়া, শিপ্পারা, আশুর, আক্কাড, উর—এই সমস্ত স্থানেও গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রাচীন মিশরে গ্রন্থাগার : আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর পোড়া-টালির ব্যবহারের যুগ শেষ হয় এবং প্যাপিরাস লেখার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'তে শুরু করে। যদিও প্যাপিরাসে লেখা 'বুক অব দি ডেড' ও 'দ্য প্রিসেপ্টস্ অব টা-হোটেপ'-এর মতন সুপ্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তথাপি প্রাচীন মিশরে গ্রন্থাগার কেমন ছিল সে-সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যতটুকু জানতে

পারা গেছে তা হেরোডোটাস, প্লেটো, ডিও-ডোরাস, প্লুটার্ক প্রভৃতি লেখকদের লেখা থেকে। নীতিশাস্ত্র, পাটীগণিত, জ্যামিতি, আইন ইত্যাদি নানা বিষয়ে গ্রন্থ লেখা হয়েছিল কিন্তু কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ সময়ে গিজে (Gizeh) নামক স্থানে গ্রন্থাগার ছিল। ডিও-ডোরাসের মতে ১২৫০ খ্রীঃ পূঃ সময়ে থিবস্ নগরেও একটি গ্রন্থাগার ছিল (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় রামেসিস এই গ্রন্থাগারের নির্মাতা ছিলেন)।

গ্রীক গ্রন্থাগার : প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা ১২০০ বৎসর স্থায়ী ছিল। অর্ধশতকেরও অধিক কাল অবধি লিখনপদ্ধতি বলতে গেলে অনাবিষ্কৃত ছিল। গ্রীকরা ফিনিশীয়দের কাছ থেকে কিভাবে লিখতে হয় তা শিখেছিল এবং মিশরীয়দের কাছ থেকে গ্রন্থ নির্মাণের পদ্ধতি শিখেছিল। সম্ভবতঃ ৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে গ্রীক বর্ণমালার উদ্ভব হয়। তার আগে গণ-আবৃত্তিকারেরা (rhapsodists) পুরাণ, উপকথা এমনকি সম্পূর্ণ হোমারীয় মহাকাব্য কণ্ঠস্থ করে সবাইকে শোনাত। গাছের পাতা ও ছাল প্রাচীন গ্রীসে লেখার কাজে ব্যবহার করা হ'ত। পরবর্তী পর্যায়ে মোম-আচ্ছাদিত কাষ্ঠফলক, পার্চ-মেন্ট, ভেলাম্ ইত্যাদির ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং গ্রন্থাগারের জন্ম হয়। আরিস্ততল ও প্লেটোর কালে গ্রীসে গ্রন্থাগারের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। গ্রীসে ব্যক্তিগত সংগ্রহের গ্রন্থাগার, সরকারের ও স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ছিল। এথেনীয়ান এ্যাকাডেমীর গ্রন্থাগারের নাম স্মরণ-যোগ্য। এই গ্রন্থাগারটি ক্রমে উচ্চশিক্ষার এক পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া যখন গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় তখন সেখানেও একটি দর্শনীয় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে—এই গ্রন্থাগারে মিশরীয়, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন ও আরও অন্যান্য ভাষায় রচিত পুঁথি ছিল। ২৮৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে দ্বিতীয় টলেমি তাঁর প্রাসাদে এই গ্রন্থাগার স্থাপন করেন ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র গ্রন্থাগারটির পুনঃসংস্কার করেন। এই গ্রন্থাগারে হোমারের প্রতিটি রচনা, প্লেটোর রিপাব্লিক্, হেরোডোটাস ও জেনোফনের (Xenophone) রচনা, ইস্কাইলাস সোফোক্লেস, আরিস্তোফানেস-এর নাটকাবলী, ইউক্লিডের জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy) ইত্যাদি বিষয়ের উপর গ্রন্থ ছিল। বেশীর ভাগ গ্রন্থ প্যাপিরাসে লেখা, কিছু লেখা পার্চমেণ্টে। এই গ্রন্থাগারের আংশিক ক্ষতি হয় জুলিয়াস সীজারের আক্রমণে ও পরিপূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মুসলিম বিজেতাদের হাতে। আরও দুটি গ্রীক গ্রন্থাগারের নাম করা যায়; যার মধ্যে একটি হ'ল সেরাপিসের (Serapis) মন্দিরে অবস্থিত গ্রন্থাগার (daughter of the first foundation নামে পরিচিত) এবং অন্যটি হ'ল দ্বিতীয় ইউমেনিস (১৯৭-১৫৯ খ্রীঃ পূঃ) স্থাপিত গ্রন্থাগার।

রোমান গ্রন্থাগার : সিসারো (Cicero), লিউক্রেসিয়াস (Lucretius), সীজার, হোরেস, ভার্জিল (Vergil), ওভিদ (Ovid), লিভি (Livy) প্রভৃতি রোমান লেখকদের রচিত গ্রন্থাদি রোমের গ্রন্থাগারে ও বিপণিতে স্থান পেয়েছিল। রোমানরা গ্রন্থ-প্রেমী ছিল, বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত ব্যক্তিরা গ্রন্থাগারে ও বিপণিতে যাতায়াত করত এবং নকলনবিসরা কোনো গ্রন্থ নকল করার সাথে সাথে সেই গ্রন্থ সমালোচিত হ'ত। পালকের তৈরী কলম দিয়ে প্যাপিরাস, পার্চমেণ্ট ও ভেলামের উপর লেখার চল ছিল। (বলে রাখা ভালো যে, ল্যাটিন 'পেন্না' অর্থাৎ পাখীর পালক, এই শব্দ হ'তেই ইংরাজী 'পেন' শব্দের উৎপত্তি)। বলা হয় যে, জুলিয়াস সীজার রোমে সর্বসাধারণের গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কিন্তু সীজার হত্যার ফলে সেই পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়

অবশ্য, সীজারের রাজত্বকালের অনেক পরে সম্রাট অগাস্টাসের রাজত্বকালে কাইয়ুস এ্যাসিনিয়াস পোলিও সীজারের পরিকল্পনাকে অনেকখানি বাস্তবায়িত করেন। সম্রাট অগাস্টাসও দুটি সর্বসাধারণের গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন। বর্বরদের আক্রমণে ও ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে বহু রোমান গ্রন্থাগার বিনষ্ট হয়েছিল।

[ক্রমশঃ]

সমালোচনা

রামচরিতমানসে কাকগরুড়-কথা: শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, লেখক ও প্রকাশক, ৮৯ অশোক রোড, গাঙ্গুলীবাগান, কলিকাতা-৮৪। পৃষ্ঠা ৫৬, মূল্য: চার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬।

গ্রন্থখানি শ্রীমৎ তুলসীদাস বিরচিত রামচরিতমানসের অন্তর্গত কাকগরুড় কাহিনী অবলম্বনে লিখিত পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় মহাপুরুষগণের উক্তি ও ভাবধারার সহিত তুলনামূলক আলোচনা গ্রন্থখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তদ্‌গতচিত্তে মনপ্রাণ ঢালিয়া গ্রন্থকার বইখানি লিখিয়াছেন। ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। ভক্তজন ইহা পড়িয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন, এতে সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

জন্মজয়ন্তী

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮০, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১২৮তম আবির্ভাবতিথি-উৎসব মঙ্গলারতি এবং ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভজনাদি সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ১৫০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৩রা জানুআরি স্বামী অভজানন্দের সভাপতিত্বে মেদিনীপুর আশ্রমে, ৪ঠা জানুআরি শ্রী ডি. কে. নাথের সভাপতিত্বে মানিকপাড়া শহরে, ৫ই জানুআরি কুমার বীরেন্দ্র বিজয় মল্লদেবের সভাপতিত্বে ঝাড়গ্রাম শহরে ও ৬ই জানুআরি আই. আই. টির অধ্যাপক ডক্টর এন. সি. রায়ের সভাপতিত্বে খড়্গপুর শহরে বিশেষ ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভাসমূহে বেলুড় মঠের স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনকথা এবং বর্তমানযুগে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। প্রতি সভায় বহু ভক্তজনের সমাগম হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী নিরুক্তানন্দ (নারায়ণ মহারাজ) গত ১৩ই ফেব্রুআরি ১৯৮১, রাত্রি ১০-২৫ মিনিটে ৪০ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত এক বৎসর যাবৎ তিনি বুকের বৈকল্যসহ নানা অসুখে ভুগিতেছিলেন। হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৬৪ সালে মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। আরোগ্য লাভের পর ১৯৬৯ সালে পুনরায় সংঘে যোগদান করেন (কাঞ্চিপুরম্ আশ্রমে)। ১৯৭৯ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সেলম আশ্রম ও বৃন্দাবন সেবাশ্রমেও কাজ করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ১লা জুলাই ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ১২ই জুলাই ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তদের আমন্ত্রণে বেণী পালের সিঁথির উদ্যানবাটীতে এসেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকে এসেছেন—শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করছেন। সহজ সরলভাবে উপমা দিয়ে পরমতত্ত্বটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অধিকারীভেদে কার কি রকম দরকার সেটি বুঝে তাঁদের উপদেশ দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁদের ঈশ্বর সম্পর্কে যে ধারণা সেইটাই শেষ কথা নয়। বার বার তাঁদের বলেছেন, কলিযুগে ভক্তিপথই সহজ পথ। সগুণ ঈশ্বরের যে উপাসনা তাঁরা করেন, সে বেশ ভাল। সঙ্গে সঙ্গে মনের সপ্তভূমির প্রসঙ্গ তুলে সপ্তম ভূমিতে নির্বিকল্প সমাধির কথা—নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতির কথা বলেছেন। 'বাহাদুরী কাঠ' ও 'হাবাতে কাঠে'র উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, লোকগুরুরা জগতের মানুষের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন, সে-কাজ যাদের 'সামান্য আধার' তাদের দ্বারা সম্ভব নয়—তারা 'লোকশিক্ষা দিতে ভয়' পায়। (১।৩।৬) এ-সব কথা আমরা আলোচনা করেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদে (১।৩।৭) ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের উপাসনাপদ্ধতিতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনার কথা তুলবেন। তাই মাষ্টারমশাই এই পরিচ্ছেদের শুরুতেই গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৪৫ নং শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটিতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে বলছেন : 'হে দেব, যা পূর্বে আমি দেখিনি বা অন্য কেউ দেখেনি, আপনার সেই বিশ্বরূপ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার অতি প্রিয় আপনার সেই পূর্বরূপই আমাকে দেখান। আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।' ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কথা ব'লে শেষ করা যায় না। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের কিছুটা দেখলেই ভয় হয়। আর তা দেখারই বা প্রয়োজন কি? তাঁকে আপনার ক'রে পাওয়া, আপনার ক'রে নেওয়াই আসল কথা। সেই কথাই ঠাকুর এখন বলবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন, কিন্তু তাঁদের কোন ত্রুটি চোখে পড়লে সেটির সংশোধনের জন্যও নিঃসংকোচে বলতেন। এই-ভাবেই ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাসভায় গিয়ে যে দোষটি তাঁর চোখে পড়েছে—ভগবানের ঐশ্বর্যের মহিমা বর্ণনা ক'রে প্রার্থনা—সে বিষয়ে বলতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি বলছেন—তাঁকে আপনার ক'রে নাও, নিজের ক'রে নাও, ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়ে লাভ কি? তাঁর প্রতি অনুরাগের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। উপমা দিয়ে এসব বুঝিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের মাধুর্যের প্রতি তিনি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে। বাউল কুবীরের একটি গান গাইছেন তাঁদের সামনে—'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।' ডুবে যেতে হবে। ব্রাহ্মভক্তদের যে-ভাব, সেটি উপরে উপরে ভাসা ভাসা ভাব। তাই ঠাকুর তাঁদের বোঝাচ্ছেন, উপর উপর ভাসলে জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায় না; আগে ডুব দিতে হবে, ডুব দিয়ে রত্ন তুলতে হবে, তারপর অন্য কাজ। ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যেতে হবে, তবেই

প্রেমধন লাভ হবে।

শিবনাথ শাস্ত্রীকে ঠাকুর বলছেন, 'তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে।' বলছেন, 'শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।'

পূর্বজন্মের কথার এই সূত্র ধরে একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন?' প্রশ্নটির উত্তর কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সোজাভাবে দিলেন না। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে।' তিনি বলতে পারতেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি জন্মান্তর আছে।' এখন, 'জানি' না-ব'লে 'শুনেছি' কেন বললেন? 'জানি' বললে হয়তো ব্রাহ্মভক্তেরা নানারকম প্রশ্ন তুলতে পারতেন—'কি ক'রে জানলেন?', 'আপনার পূর্বজন্মের স্মৃতি আছে কিনা?' এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি সম্ভবতঃ ব্রাহ্মভক্ত বা সাধারণ লোকের সামনে ইচ্ছুক ছিলেন না। এবং সে উত্তর হয়তো তাদের পক্ষে কল্যাণকর নাও হ'তে পারতো। ঠাকুর যদি বলতেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ', তাহলে ব্রাহ্মভক্তদের ভাব নষ্ট হয়ে যেতো। আর ঠাকুর বার বার বলছেন যে, কারোর ভাব নষ্ট করতে নেই। স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত 'My Master' বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থে আছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জন্ম থেকেই জানতেন তিনি কে এবং কি উদ্দেশ্যে শরীরধারণ করেছেন। এটি অবতারতত্ত্বের কথা। অবতাররা কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হন না। তাঁরা তাঁদের স্বরূপে সদাই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন তাঁর পূর্ব পূর্ব শরীরধারণের বৃত্তান্ত। তবু পূর্বোক্ত কারণে তিনি বললেন না, 'আমি জানি জন্মান্তর আছে।'

ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে।' এই 'শুনেছি' কথাটার মধ্যে একটু ভাবনার অবকাশ আছে। তিনি পড়েন নি, লোকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে নানা সময়ে, 'এতো কথা আপনি কি ক'রে জানলেন? এতো শাস্ত্রের কথা আপনি বলেন, অথচ শাস্ত্রাদি তো আপনি পড়েন নি?' তাতে ঠাকুর বলেছেন, 'ওগো আমি শুনেছি কতো।' শ্রীক্ষেত্র ও গঙ্গাসাগরযাত্রী এবং সেখানকার ফেরত বহু সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে, পদ্মলোচন, বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের কাছে তিনি বহু শাস্ত্রকথা শুনেছিলেন। আর তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। একবার যা শুনতেন সেটা তাঁর স্মরণে থেকে যেত। এইভাবেই শাস্ত্রের কথা, গীতা, উপনিষদাদিতে পুনর্জন্মের কথাও নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। সাধুমুখেও জন্মান্তরবাদের কথা শুনেছিলেন। তাই বলছেন, 'আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে।'

ঠাকুর জন্মান্তর সম্বন্ধে নিজের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের কথা না ব'লে বলছেন—'ঈশ্বরের কাজ আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো?' ভগবানের কাজ —জন্ম, মৃত্যু আমরা বুঝি না; কি তাঁর উদ্দেশ্য —কেন এই জন্ম, জরা, ব্যাধি—কেন এতো লোকক্ষয় এক একটা মহামারীতে—এসব কিছুই আমরা বুঝতে পারি না। ভগবানের ভুবনমোহিনী মায়ার কাজ আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে সেটি বোঝা যায় না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বলছেন কেন 'শুনেছি'? তার উত্তরে বলছেন—'অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না।' অর্থাৎ শাস্ত্রকাররা, সাধুমহাপুরুষরা ব'লে গেছেন, তাই বিশ্বাস করি। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হচ্ছে ব্রাহ্মভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গের গভীরে যেতে চাইলেন না বলেই যেন সাধারণভাবে এই উত্তরটা দিলেন, বিশেষভাবে দিলেন না। জন্মান্তরের কথা যে তিনি অন্তরঙ্গদের বলেননি তা নয়। বহুবার বলেছেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ

সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।' এতো জন্মান্তরেরই কথা! আবার ভাবে দেখেছেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনের দল চলেছে। সেখানে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতকে দেখেছেন, আবার ঐ দলে আরও দুজনকে দেখেছেন, যাঁদের সম্বন্ধে পরে বলেছেন যে, তাঁরা মাষ্টারমশাই ও বলরামবাবু। আবার শরৎ (পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ) ও শশী (পরবর্তী কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাঁরা 'ঋষি কৃষ্ণে'র (যীশু খ্রীষ্টের) দলে ছিলেন। তাঁর মানসপুত্র সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি ব্রজের রাখাল।

কিন্তু ব্রাহ্মভক্তদের ও-সব কথা বললেন না। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ঈশ্বরের কার্য যে মানববুদ্ধির অগম্য তাই বলতে লাগলেন। শরশয্যায় শুয়ে অমন যে প্রবল-পরাক্রমশালী মহাপবিত্র ভীষ্ম তিনিও কাঁদছেন—কিন্তু কেন? ভীষ্ম বলছেন যে, তিনি দেহের মায়াতে কাঁদছেন না। কাঁদছেন এই ভেবে যে, ভগবানের কাজ কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষে—সব সময় তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন, তবুও তাঁদের দুঃখকষ্টের শেষ নেই! কেন এমন হচ্ছে—এই কথা ভেবেই, ভগবানের কাজের থেই না পেয়েই তিনি কাঁদছেন।

ব্রাহ্মভক্তদের সান্ধ্য উপাসনার পর সংকীর্তন শুরু হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন। নৃত্য-কীর্তনান্তে ঠাকুর প্রণাম করছেন—বলছেন, 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।' এই প্রণাম দিয়েই ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে প্রথমে পরাজিত করেছিলেন। সে-প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র পরে বলেছিলেন, এবারে প্রণাম-অস্ত্রে জগৎ জয় করতে এসেছেন। এখানে সেই প্রণাম করছেন—সকলকে। কেন? না—সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখছেন। (১৷৩৷৭)

গীতা—

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ কয়েকটি শ্লোকে ধ্যান-যোগ সম্বন্ধে সূত্রাকারে বলা হয়েছে যে, বাহ্য বিষয়সমূহ বাইরেই রেখে অর্থাৎ মন থেকে সমস্ত বিষয়চিন্তা দূর ক'রে দিয়ে ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসিকার অভ্যন্তরেই সঞ্চরণশীল রেখে—তাদের সমান ক'রে অর্থাৎ ছোট-বড় বা বিষম হ'তে না দিয়ে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সংযত ক'রে, ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ-বর্জিত হয়ে যিনি মোক্ষপরায়ণ হন, তিনি সর্বদাই মুক্ত। এইরূপ যোগী সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সমস্ত লোকের মহেশ্বর, সর্ব প্রাণীর সুহৃদ্—শ্রীভগবানকে জেনেই শান্তি লাভ করেন। এরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা শ্রীভগবান এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'সন্ন্যাসযোগ'। এতে সন্ন্যাসের বিশেষ প্রশংসা আছে। তাই শ্রীভগবানের মনে হচ্ছে একটা সংশয় অর্জুনের মনে আসতে পারে যে, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল। সন্ন্যাসবিধিতে আছে যে, সন্ন্যাসের পরে সে-ব্যক্তি 'নিরগ্নি' হয়ে যাবে। যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া-কর্ম অগ্নিসাপেক্ষ। 'নিরগ্নি' হয়ে যাবে মানে যাগ-যজ্ঞাদিতে তার কোন অধিকার থাকবে না। এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা অগ্নি স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। সন্ন্যাসের পরে শুধুমাত্র শরীরধারণের জন্য তাঁরা ভিক্ষাটনাদি কাজ করেন। তাঁরা কর্ম-ত্যাগী সন্ন্যাসী। কিন্তু শুধুমাত্র নিরগ্নি হলেই, কর্ম-ত্যাগী হলেই প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। তাই শ্রীভগবান বলছেন: 'যিনি কোনরকম ফলের আশা না ক'রে কর্তব্যবুদ্ধিতেই কর্ম করেন, তিনি হচ্ছেন সন্ন্যাসী, তিনি হচ্ছেন যোগী। যিনি

কেবলমাত্র বাহ্যিক কর্মত্যাগ করেছেন ও অগ্নি স্পর্শ করেন না, তিনি ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী নন।' (৬।১) কাজেই কোনরকম ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে কাজ ক'রে যেতে হবে। এইভাবে শ্রীভগবান অর্জুনকে কর্মযোগেরই অধিকারী জেনে কর্মযোগী হ'তে প্রোৎসাহিত করছেন।

যিনি কর্মযোগী, তিনি সন্ন্যাসী, তিনি যোগী—এটা কিভাবে হ'তে পারে? সেইটাই শ্রীভগবান অর্জুনকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন: 'হে অর্জুন, শাস্ত্র যাকে সন্ন্যাস বলেন, তাকে যোগ ব'লেই জানবে। যে-ব্যক্তি সংকল্প ত্যাগ করেনি—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেনি, সে কখনও যোগী হ'তে পারে না।' (৬।২) বেদে যাকে সন্ন্যাস বলা হয়েছে আর শ্রীভগবান অর্জুনকে যে কর্মযোগের কথা বলেছেন, এ দুটি একই, বাইরের কর্ম পরিত্যাগ না করলেও আন্তর ত্যাগের প্রয়োজন কর্মযোগী হ'তে গেলে। যে তা পারে না সে কখনও যোগী হ'তে পারে না। আচার্য শংকর বলছেন: 'যে-কর্মী সংন্যস্ত-ফল-সংকল্প হন, তিনি যোগী, সমাধিমান্ অর্থাৎ অবিক্ষিপ্তচিত্ত হন, কেননা তাঁর চিত্তবিক্ষেপের কারণ ফলসংকল্পের সম্যক্‌রূপে ত্যাগ হয়েছে।' শ্রীধর স্বামী বলছেন: জ্ঞানযোগী হোন বা কর্ম-যোগী হোন—যে-কোন যোগীই হোন কর্মফল-সংকল্প ত্যাগ করতেই হবে। তা না হলে চিত্তের বিক্ষেপ যাবে না। যার চিত্ত বিক্ষিপ্ত সে কখনও যোগী হ'তে পারে না।

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করায় কর্মযোগীর চিত্ত বিক্ষিপ্ত নয়। তিনি ক্রমশঃ ধ্যানযোগের যোগ্যতা লাভ করতে থাকেন। ধ্যানযোগই অপরোক্ষ জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন। কর্মযোগ সাধককে ধ্যান-যোগের অধিকারী করে। তাই কর্মযোগ ধ্যান-যোগের সাধন। কর্মযোগ উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। কর্মযোগের মধ্য দিয়ে গিয়ে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ধ্যানযোগে আরূঢ় হ'তে হবে। তাই শ্রীভগবান বলছেন: 'ধ্যানযোগে আরূঢ় হ'তে ইচ্ছুক মুনির পক্ষে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানই সাধন। যিনি যোগারূঢ় হয়েছেন সেই ধ্যাননিষ্ঠের পক্ষে সর্ব-কর্মের নিবৃত্তি [আত্মসাক্ষাৎকারের] সাধন।' (৬।৩) যোগারূঢ় অবস্থায় আর কোন কর্ম থাকবে না; আপনা থেকেই কর্মত্যাগ হয়ে যাবে। তামসিকতার বশীভূত হয়ে কর্ম ছেড়ে দেওয়া নয়, কর্ম নিষ্কাম-ভাবে করতে করতে দেখা যাবে আপনা থেকেই কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। এখন ঐ 'যোগারূঢ়' কথাটি আরও পরিষ্কার ক'রে শ্রীভগবান বলছেন: 'সমস্তসংকল্পত্যাগী যোগী যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে আসক্ত হন না এবং নিত্যনৈমিত্তিকাদি যাবতীয় কর্মে আসক্ত হন না, তখন তাঁকে ধ্যান-যোগারূঢ় বলা হয়।' (৬।৪) সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগীর অর্থ—ইহলোকের বা পরলোকের কোন ভোগের কামনা নেই এই যোগীর। 'সংকল্প' কথাটি দ্বিতীয় শ্লোকেও এসেছে। ফলবিষয়ক অভিসন্ধির নামই সংকল্প। এখানে সেই কথাই বলা হচ্ছে—এই যোগী সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী অর্থাৎ এ-জগতের তো বটেই, ব্রহ্মলোকের পর্যন্ত কোন ভোগের অভিসন্ধি তাঁর নেই। এরূপ যোগীকেই ইহামুত্রফলভোগবিরাগী বলা হয়। এবং তিনিই যোগারূঢ়।

এই কথা ব'লেই শ্রীভগবানের হয়তো মনে হয়েছে যে, অর্জুনের মনে হতাশা আসতে পারে—আমার পক্ষে কি এইভাবে যোগারূঢ় হওয়া সম্ভব? সেই হতাশাভাব দূর করার জন্য শ্রীভগবান বলছেন: 'নিজেকে নিজেই উদ্ধার করবে, নিজেকে অবসন্ন করবে না, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু।' (৬।৫) নিজের বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে এই অনিত্য সংসারে নিত্য বস্তু কি। তাঁকে জানতে হবে, তাঁকে পেতে হবে। তাঁকে না পেলে এই

সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। সেইজন্য পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন, উপলাস্তীর্ণ দুর্গম পথে চলতে আমাদের চরণ যতই ক্ষতবিক্ষত হোক না কেন, তবুও আমাদের এই পথ অতিক্রম করতে হবে নিজেরই চেষ্টায়। 'পারবো না—পারছি না—আমার দ্বারা হবে না' মনে এই ভাব কখনই আনা চলবে না। নিজের উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যেন কখনও না বিচলিত হয়। সেইজন্য স্বামীজী বলেছেন: 'পুরাতন ধর্মে বলা হয়েছে, যে ধর্মে বিশ্বাসী নয় সে নাস্তিক, কিন্তু নতুন ধর্ম বলছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক।' এই শ্রদ্ধা, এই আস্তিক্য বুদ্ধি চাই। নচিকেতা এই শ্রদ্ধার জন্য যমের কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন। ঠাকুর একটি গান গাইতেন: 'হরিষে লাগি রহো রে ভাই / তেরা বনত বনত বনি যাই/তেরা বিগড় বাত বনি যাই।' আবার বলতেন: "দূর শালা! 'বনত বনত' কি? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নেই। মনে জোর করতে হয় —এখনি হবে, এখনি তাঁকে পাব। ম্যাদাটে ভক্তির কর্ম কি তাঁকে পাওয়া?" এই আস্তিক্যবুদ্ধি আনতে হবে—আমার মধ্যেই অনন্তশক্তি, আমি নিজেই আমার উদ্ধারকর্তা, বন্ধু। বাইরে থেকে কেউ এসে আমাকে লক্ষ্যে পৌছে দেবে না। গুরু শুধুমাত্র পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু পথ চলতে হবে নিজেকেই। (তবে অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষরা নিজেদের দেহে অপরের পাপ টেনে নিয়ে তার ভোগ কমিয়ে দিতে পারেন।)। আবার আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু যদি এই আস্তিক্যবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত না হই, যদি কুপথে চলি, বিষয়ে ডুবে যাই। সেইজন্য নিজেদের অন্তরে যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, তাতে আস্থা রেখে সংসার-যন্ত্রণা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

এখন কি রকম ব্যক্তির আত্মা তাঁর বন্ধু এবং কি রকম ব্যক্তির আত্মা তার শত্রু—সেই কথা শ্রীভগবান বলছেন: 'যে-ব্যক্তি আত্মার দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি জয় করতে পেরেছেন, সেই ব্যক্তির আত্মাই তাঁর বন্ধু, কিন্তু যে-ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, তার আত্মাই তার শত্রুর মতো।' (৬।৬) এখানে 'আত্মা' শব্দটির অর্থ 'মন'। যে-মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করা যায়, সেই মনই হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু। এই শুদ্ধ মনই নিজের যে-স্বরূপ, তাকে জানার সহায়তা করে, তাই তা প্রকৃত বন্ধু। আর যে মলিন মন, বিষয়াসক্ত মন ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করতে পারে না সেই মনই শত্রুর মতো আচরণ করে।

কেউ জগতে তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবে না; নিজেই চলতে হবে পথ। বহু চেষ্টা করতে হবে। নিজের শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। যে শক্তিহীন, নিজের উপর আস্থাহীন, তার পক্ষে আত্মোপলব্ধি অসম্ভব। উপনিষদ্ বলছেন: 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—এই আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নয়। আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

বিবিধ সংবাদ

ভিত্তিস্থাপন

গত ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৮০) হুগলী জেলার অন্তর্গত সারদাপল্লীতে 'সারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে'র প্রস্তাবিত মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে প্রত্যূষে গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর আনুষ্ঠানিক পূজা সম্পন্ন হয়। সারদা-পল্লীর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শ্রীমৎ স্বামী

ভূতেশানন্দজী মহারাজ। শ্রীঅম্বিকা দাস প্রদত্ত জমির উপর সঙ্ঘের এই মন্দিরটি নির্মিত হইবে। একটি পাঠাগার ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হইবে। এই উপলক্ষে প্রদত্ত আশীর্বাদী ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলেন: "শ্রীশ্রীমায়ের নামাঙ্কিত এই পল্লীর গৃহে গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের অর্চনা হয়, এ খুবই আনন্দের কথা। এই পূজার তাৎপর্য এই যে, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্যথা এই পূজা বাহ্যিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হবে। বর্তমানের অশান্ত পৃথিবীতে পূর্ব ও পশ্চিম দেশের মনীষিবৃন্দ এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মাধ্যমেই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মানুষ আজ এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামায়ের বাণীই এই সংকট থেকে আমাদের মুক্তির পথ দেখাতে সমর্থ।"

দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া মহারাজজী বলেন: 'আমরা আজ ক্ষুদ্রস্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবে আচ্ছন্ন। আসুন আমরা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর চরণে সমবেতভাবে প্রার্থনা করি তাঁরা যেন আমাদের হৃদয়ের এই মলিনতা ও ক্ষুদ্রতা অপসারণ ক'রে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহলে আমাদের সকলের স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিক দুর্বল মনোভাব তাঁরা দূর করবেন এবং আমাদের জীবনে ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।'

সঙ্ঘের সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন শ্রীবরুণ বসু। স্থানীয় ভক্তগণ সমবেত হইয়া পল্লীটিকে উৎসবমুখর করিয়া তোলেন। শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে এবং ভক্তবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস। অপরাহ্নে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীবাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য **করালীচরণ মুখোপাধ্যায়** গত ১৪ই মার্চ (১৯৮১) সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে পরলোকগমন করেন।

১৩০৯ সালের ১১ই ফাল্গুন বাঁকুড়া শহরে তাঁহার জন্ম। ১৩২২ সালে ছাত্রাবস্থায় ৺বিভূতিভূষণ ঘোষের সাহায্যে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন। গুরুপ্রণামী দিবার মত অর্থ না থাকায় শ্রীশ্রীমা নিজেই তাঁহাকে একটি টাকা দেন গুরুপ্রণামী দিবার জন্য তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের সান্নিধ্যে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সুকণ্ঠ সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিত। বাঁকুড়া জেলায় স্বগ্রামে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে তিনি সুদীর্ঘকাল জনসেবা করেন। এবং সেখানকার বহুবিধ জনহিতকর কার্যের সহিত যুক্ত ছিলেন। পরে রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ৬০ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট বর্ধমান জেলার শ্রীপুর/নিঙ্গা কয়লাখনি অঞ্চলে অবসরজীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। গত অগস্ট মাসে পড়িয়া গিয়া দক্ষিণ উরুর হাড় ভাঙিয়া যাওয়ায় তদবধি শয্যাশায়ী ছিলেন। শেষদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন এবং করজপ করিতে করিতে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক এবং পরবর্তী কালে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ **ভবানীচরণ গুহ**, ১৯শে চৈত্র, ১৩৮৭ (২রা এপ্রিল, ১৯৮১) সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন।

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য এবং ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। সত্যনিষ্ঠ, আত্মত্যাগী, নিরহঙ্কার ও সেবাপরায়ণ ভবানীবাবু বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষে নিঃস্বার্থভাবে ত্রাণকার্যে ব্রতী হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বহুবিধ সমাজসংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছিলেন।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই : ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮·০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮ মূল্য ২২·৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫·২৫ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭·৮০ ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ মূল্য ৮·২৫ ; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯·৫০ ; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১·৮০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩·৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬·০০ ; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৭০, মূল্য ১·২০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৬০, মূল্য ৫·২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯·০

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪·২৫

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭·৫০ ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১০·০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬·০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ১৭·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১৬·০০ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬·০০ ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১০৬, মূল্য ২·৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩০৬, মূল্য ৮·০০

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪·০০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৩·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২·৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩·০০

২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫·০০

ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩·২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫·০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১·৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬·০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭·৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫·৫০

২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫·০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪·০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬·৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, মূল্য ১·০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩·..

সৎকথা—পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭·৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪·৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ— পৃঃ ৭২, মূল্য ২·০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬, মূল্য ২·৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫·২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩·০০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ — পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫·০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪·০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭০, মূল্য ৬·২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা— শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০·০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১·২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩১, মূল্য ০·৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩·৫০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৭৪, মূল্য ২৪'০০

সংস্কৃত

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮'০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮'৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ৯'২৫

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায়, ৩য় খণ্ড ৪'০০, ৪র্থ খণ্ড ৩'০০; ২য় অধ্যায় ১৩'০০; ৩য় অধ্যায় ১৩'০০; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮'০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

বৈশাখ ১৩৮৮

৮৩তম বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও লওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়, ৮৩তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৫৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৩৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে, তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা, বিকাল ৩টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৮৮

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

ই ঈ
ইউবিআই-তে ব্যাঙ্ক বোঝায়
ঈশানবাবু টাকা জমায়।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

৮৩তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম; এক মাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম দৃশ্যসমূহ—অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ হ্রদাদি দেখিতে পাইতাম। একদিন অতিশয় পিপাসার্ত হইয়া একটি হ্রদে জলপান করিব, ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অমনি উহা অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আসিল—সারা জীবন ধরিয়া যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আসিয়াছি, এ সেই মরীচিকা। তখন আমি আমার নিজের নির্বুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলাম, গত এক মাস ধরিয়া এই যে-সব সুন্দর দৃশ্য ও হ্রদাদি দেখিতে পাইতেছিলাম, ঐগুলি মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়, অথচ আমি তখন উহা বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম—সেই হ্রদ ও সেই-সব দৃশ্য আবার দেখা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই জ্ঞানও আসিল যে, উহা মরীচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারায় উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এইরূপেই এই জগদ্‌ভ্রান্তি একদিন ঘুচিয়া যাইবে।···মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিবে। এই জগৎ, নরনারী, প্রাণী—সবই আবার আসিবে, যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে, আমি ঐগুলির স্বরূপ জানিয়াছি। তখন ঐগুলি আর আমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ কষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে না। যখন কোন দুঃখকর বিষয় আসিবে, মন তাহাকে বলিতে পারিবে—আমি জানি, তুমি ভ্রমমাত্র। যখন মানুষ এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে। জীবন্মুক্ত-অর্থে জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৩।৫৮-৫৯]

কথাপ্রসঙ্গে

শংকরাচার্যের জীবন্মুক্তিবাদ

রামানুজাচার্য, নিম্বার্কাচার্য প্রমুখ অধিকাংশ বৈদান্তিক জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে যিনি যত বড় মহাপুরুষই হউন না কেন—ভগবানলাভই করুন আর আত্মজ্ঞানলাভই করুন—যতক্ষণ তিনি বাঁচিয়া আছেন, ততক্ষণ তিনি মুক্ত নহেন। অর্থাৎ, মরিলেই তাঁহার মুক্তি। জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে মুক্তির অধিকারী বা মুক্ত-প্রায় বলা যাইতে পারে, কিন্তু মুক্ত বলা যায় না।[১]

এই মতবাদের প্রমাণ হিসাবে রামানুজাচার্য, নিম্বার্কাচার্য প্রমুখ বৈদান্তিকগণ প্রধানতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি উপস্থাপিত করেন :

(১) 'ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ অপহতিঃ অস্তি।' (৮।১২।১) [ইন্দ্রের প্রতি প্রজাপতির উপদেশ]।

(২) 'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।' (ঐ) [ঐ]।

(৩) 'তস্য তাবৎ এব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে ; অথ সম্পৎস্যে।' (৬।১৪।২) [শ্বেতকেতুর প্রতি উদ্দালক-ঋষির উপদেশ]।

প্রথম বাক্যটির অর্থ : যাঁহার শরীর আছে, তাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয়ের নিবৃত্তি নাই। দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ : যিনি শরীররহিত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না। তৃতীয় বাক্যটির অর্থ : যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি দেহত্যাগ করিতেছেন, ততক্ষণই তাঁহার [মুক্তিপ্রাপ্তিতে] বিলম্ব ; দেহান্তের পর তিনি মুক্ত হন।

এই তৃতীয় উপদেশটি ঋষি উদ্দালক তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে দিয়াছিলেন। উদ্দালক বলিয়াছিলেন : "কোন এক ব্যক্তির চোখ বাঁধিয়া গন্ধারদেশ হইতে তাহাকে আনিয়া একটি জনশূন্য অরণ্যে ছাড়িয়া দিলে সে দিগ্ভ্রান্ত হইয়া 'আমার চোখ বাঁধিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে, এই অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে'—এই বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকে যাইতে থাকিলে কেহ যদি তাহার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলে, 'এই দিকে গন্ধারদেশ, এই দিকে যাও', তাহা হইলে সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে গন্ধারদেশেই উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনই এই সংসারে সাধক আচার্য-

১ 'মুক্ত' বলা না গেলেও প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন রামানুজ-সম্প্রদায়ের বরদাচার্য একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, 'মুক্ত' ব্যক্তি দেহান্তের পর অর্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া পরব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করিয়া ধন্য হন ('মুক্তোঽর্চির্দিনপূর্বপক্ষ' ইত্যাদি)। এখানে 'মুক্ত' শব্দটির প্রয়োগ গৌণার্থে বুঝিতে হইবে, মুখ্যার্থে নহে। যেমন, মানুষকেও 'দেবতা' বলা হয়, যদি তাহার দেবোচিত গুণাবলী থাকে। অথবা, 'মুক্ত' শব্দটি পাণিনির 'বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্ বা' সূত্রানুসারে ব্যাখ্যেয়। অর্থাৎ, 'মুক্ত' তাঁহাকেই বলা হইতেছে, যিনি বর্তমানকালের সমীপস্থ ভবিষ্যতে (অদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ অচিরেই) মুক্ত হইবেন। যেমন, গীতায় বলা হইয়াছে, 'যততাম্ অপি সিদ্ধানাম্' ইত্যাদি (৭।৩)। যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা তো সাধক! কিন্তু তাঁহারাও অচিরেই সিদ্ধ হইবেন, এই অর্থে সাধকদেরও শ্রীভগবান 'সিদ্ধ' বলিয়াছেন। বরদাচার্যের শ্লোকটির শেষাংশে পরব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্তির কথা আছে। ঐরূপ সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে মুক্ত—ইহাই রামানুজ ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত।

কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া জ্ঞানলাভ করেন।" এই পর্যন্ত বলিয়া উদ্দালক পূর্বোক্ত 'তস্য তাবৎ এব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে; অথ সম্পৎস্যে'—এই বাক্যটির দ্বারা বিষয়টির উপসংহার করেন।

কোন সন্দেহ নাই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের এই তিনটি বাক্যের উল্লিখিত আক্ষরিক অর্থ রামানুজ-প্রমুখ বৈদান্তিক আচার্যগণের মতবাদের সপক্ষেই যায়—অর্থাৎ, জীবন্মুক্তি সম্ভব নহে, জ্ঞানলাভের পরেও নহে; দেহান্তেই মুক্তি হইতে পারে।

আচার্য শংকর জীবন্মুক্তিবাদী। এখন আমরা দেখিব, তিনি উক্ত বাক্যত্রয় কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম দুইটি বাক্যে 'সশরীর'-এর অর্থ তিনি করিয়াছেন— 'শরীরাভিমানী'[২] এবং 'অশরীর'-এর অর্থ করিয়াছেন 'আত্মা'[৩]। 'শরীর' বলিতে শুধু স্থূলদেহটিই নহে, স্থূলদেহের সহিত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকেও গ্রহণ করিতে হইবে (শরীরম্ ইতি অত্র সহ ইন্দ্রিয়মনোভিঃ উচ্যতে' —ছা. উ. ৮।১২।১ ভাষ্য)। 'অশরীর'স্বরূপ আত্মা যখন শরীরে অভিমান করেন, তখনই তিনি পুণ্য ও পাপের কার্য যে প্রিয় ও অপ্রিয়, তাহাদের দ্বারা স্পৃষ্ট হন। শরীরাভিমানী এই আত্মাই যখন নিজ অশরীরস্বরূপত্বের বিজ্ঞানের দ্বারা শরীরাভিমান-রহিত হন, তখন তাঁহাকে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করে না। সুতরাং শংকরমতে ছান্দোগ্য উপনিষদের এই দুইটি বাক্যে 'মরার' কোনই কথা নাই। জ্ঞান হইলেই প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করে না—এই বোধ হয়। ইহাই জীবন্মুক্তি। জ্ঞানহীন ব্যক্তি শরীরাভিমানবশতঃ প্রিয়াপ্রিয় নিজেতে আরোপ করে। জীবন্মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় বাক্যটির ব্যাখ্যা শংকরাচার্য যেভাবে করিয়াছেন, তাহাতে শংকরোত্তর কালের বহু অদ্বৈতবাদী আচার্যকেই ঐ বাক্যটি এবং উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা করিতে হইয়াছে। বাক্যটি অতি স্পষ্টভাবে বলিতেছে যে, আচার্যলাভ করিয়া জ্ঞানী হইলেও আত্মস্বরূপপ্রাপ্তিতে দেহপাত পর্যন্ত বিলম্ব হয় সুতরাং শংকরাচার্যকেও তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যে-সকল কর্মের দ্বারা বর্তমান শরীর আরব্ধ হইয়াছে, তাহাদের ফলভোগ সম্পূর্ণ হইলে অর্থাৎ দেহপাত হইলে তবেই মোক্ষ হয়। আবার তিনি ইহাও বলিতেছেন যে, আচার্য-কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় তিনি (জ্ঞানের সমকালেই) মুক্ত হন। এইখানেই বিষয়টি দুর্বোধ্য হইয়া গিয়াছে।

উদ্দালক গন্ধারদেশবাসীর যে-দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, শংকরাচার্য তাহার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, অরণ্যটি

---

২ তুলনীয়: 'ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ' (গীতা, ১৮।১১)। ইহার আক্ষরিক অর্থ: দেহধারী ব্যক্তি কখনও নিঃশেষে সকল কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। শংকরাচার্য 'দেহভৃৎ'-এর অর্থ করিয়াছেন: দেহে যাহার অভিমান আছে ('দেহাত্মাভিমানবান্ দেহভৃৎ উচ্যতে'—ভাষ্য)। জ্ঞানী ব্যক্তি সহস্র কর্ম করিলেও তাঁহার কোনই কর্ম নাই, কারণ তিনি নিজেকে নিষ্ক্রিয় আত্মা বলিয়া জানেন; পক্ষান্তরে দেহাভিমানী ব্যক্তি বাহ্যতঃ কিছু না করিলেও কখনও নিঃশেষে কর্মত্যাগ করিতে পারেন না—ইহাই শংকরাচার্যের বক্তব্য।

বেদান্তদর্শনের 'তৎ তু সমন্বয়াৎ' (ব্র. সূ. ১।১।৪) সূত্রের ভাষ্যে শংকরাচার্য ছান্দোগ্য উপনিষদের আলোচ্য প্রথম দুইটি বাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া জীবন্মুক্তিবাদ স্থাপিত করিয়াছেন ('সিদ্ধং জীবতঃ অপি বিদুষঃ অশরীরত্বম্')।

৩ আত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—এই ত্রিবিধ শরীররহিত। ঈশোপনিষদের অষ্টম মন্ত্রের ('স পর্যগাৎ' ইত্যাদি) শাংকরভাষ্য দ্রষ্টব্য।

হইতেছে দেহ ; তাহাতে প্রবিষ্ট জীবের—'আমি অমুকের পুত্র, অমুকরা আমার বান্ধব, আমি সুখী দুঃখী মূর্খ পণ্ডিত, আমার পুত্র মৃত, ধনসম্পত্তি বিনষ্ট—হায় আমি কি করিয়া বাঁচিব? কে আমাকে উদ্ধার করিবে?'—ইত্যাকার বিলাপই ঐ গন্ধারবাসীর চিৎকার। বদ্ধ জীবের ঐ আর্তনাদ শুনিয়া তাহারই অশেষ-সুকৃতিবশতঃ পরমকারুণিক সদ্গুরু আসিয়া তাহাকে বলেন—"তুমি সংসারী মানুষ নও, পুত্র-বান্ধবাদি কেহই তোমার নাই, 'তত্ত্বমসি'—তুমি সেই আত্মাই।" ইহাই হইল গন্ধারবাসীর চক্ষু হইতে মোহবস্ত্রের উন্মোচন। এইভাবে মোহমুক্ত হইলে জীব নিজ আত্মাকে পাইয়া—আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া সুখী হয়, যেমন গন্ধারদেশবাসী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুখী হইয়াছিল।

এইরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা ও মনোরম সংস্কৃতভাষা সত্ত্বেও শংকরাচার্যকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, আচার্য-কর্তৃক জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও সেই ব্যক্তির সৎস্বরূপপ্রাপ্তির ততক্ষণই বিলম্ব থাকে, যতক্ষণ তাহার প্রারব্ধকর্মশেষে দেহপাত না হয়।

শংকরাচার্য তাঁহার 'অপরোক্ষানুভূতি'[৪] গ্রন্থে অবশ্য লিখিয়াছেন : 'অজ্ঞানিজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ' (শ্লোক ৯১)। অর্থাৎ, অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি প্রারব্ধের কথা বলিয়াছেন—বস্তুতঃ প্রারব্ধ বলিয়া কিছু নাই। ইহার পরবর্তী শ্লোকে এবং পূর্ববর্তী অনেকগুলি শ্লোকে (৯০-৯৬) প্রারব্ধের মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইয়াছে। ইহার দ্বারা কিন্তু সমস্যাটির সমাধান হয় না। প্রারব্ধ মিথ্যা—ইহা আর নূতন কথা কি! সবই তো মিথ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত! কিন্তু এ-সবের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াই তো বিচার! ব্রহ্মজ্ঞানটি সত্য হইল, প্রারব্ধটা মিথ্যা হইল—এবং এইভাবে সমস্যাটির সমাধান হইল, ইহা যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে তিনি অযৌক্তিক কথা বলিতেছেন বুঝিতে হইবে। শংকরাচার্য যখন মুণ্ডক উপনিষদের 'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ/ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' (২।২।৮) মন্ত্রটির অথবা গীতার 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' (৪।৩৭) শ্লোকার্ধটির ব্যাখ্যা করিতেছেন, তখন তিনি প্রারব্ধ স্বীকার করিতেছেন। যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাকে কে অস্বীকার করিবে!

সুতরাং সমস্যাটা প্রারব্ধের সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব লইয়া নহে। সমস্যাটা এই যে, আলোচ্যমান তৃতীয় বাক্যটির দ্বারা জীবন্মুক্তি খণ্ডিত হইতেছে কিনা। বলা বাহুল্য, শংকরাচার্য এবং তাঁহার অনুগামীরা কেহই জীবন্মুক্তি খণ্ডিত হইতেছে, একথা স্বীকার করিবেন না। আর যদি কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে, আচার্যের উপদেশজনিত জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে জীবন্মুক্তি হয় হউক,—বিদেহমুক্তি হইতে ততক্ষণই বিলম্ব, যতক্ষণ না দেহপাত হয়—ইহাই তৃতীয় ব্যাখ্যাটির তাৎপর্য, তাহা হইলে শংকরপন্থীরা পূর্বপক্ষীর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া, অর্থাৎ তিনি যে মুক্তি দুইটি, ইহা মনে করিয়া ঐরূপ কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিয়া পূর্বপক্ষীকে প্রশ্ন করিবেন : 'বিদেহমুক্তি আর জীবন্মুক্তিতে কী পার্থক্য?'

বস্তুতঃ জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিতে মুক্তি হিসাবে কোনই পার্থক্য নাই। মুক্তিতে যদি তারতম্য স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মুক্তিই অনিত্য হইয়া যায়। আর যে-মুক্তি অনিত্য, তাহা মুক্তিই নহে। দেহ থাকা আর না-থাকা লইয়াই কথা। দেহ থাকিলে মুক্তিকে 'জীবন্মুক্তি' বলা হয় ; দেহ না থাকিলে সেই একই মুক্তিকে 'বিদেহমুক্তি' বলা হয়। সুতরাং এইভাবেও সমস্যাটির সমাধান হয় না। এই কারণে শংকরাচার্যের পরবর্তী সর্বজ্ঞাত্মমুনি, চিৎসুখাচার্য, মধুসূদন

---

৪ গ্রন্থটি শংকরাচার্য-রচিত—ইহা সকলের অভিমত নহে।

সরস্বতী প্রমুখ ধুরন্ধর অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ জীবন্মুক্তের 'অবিদ্যালেশ' স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহাদের মতে আলোচ্য তৃতীয় বাক্যটির তাৎপর্য হইল: আচার্যের উপদেশে জীবন্মুক্তি হইলেও যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ জীবন্মুক্তের অবিদ্যালেশ থাকে, দেহান্তে সেই অবিদ্যালেশ নিবৃত্ত হইয়া যায়। 'জীবন্মুক্তের অবিদ্যালেশ' কথাটি একেবারেই 'শ্রোত্রমনোঽভিরাম' নহে। কিন্তু উহার সূক্ষ্ম বিচারে প্রবেশ করিতে পারিলে উহা সরস মনে হইলেও হইতে পারে।

'জীবন্মুক্তের অবিদ্যালেশ' কথাটি ব্যবহার না করিয়া আমরা শংকরাচার্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য বিষয়টি যেভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা উপস্থাপিত করিতেছি। সুরেশ্বরাচার্য তাঁহার 'পঞ্চীকরণ-বার্তিকে' 'জীবন্মুক্ত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং আমাদের আলোচ্য 'তস্য তাবৎ এব চিরং' ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ বাক্যটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য হইল: জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শরীরাদির 'প্রতিভাস' (appearance as distinct from reality) অর্থাৎ আপাত-প্রকাশ থাকে, যতদিন তাঁহার শরীর থাকে, কিন্তু শরীরাদিতে তাঁহার সত্যত্ববুদ্ধি থাকে না। এক ব্যক্তি মরুভূমিতে মরূদ্যান দেখিয়া জল অন্বেষণ করিতে যায়, কিন্তু পরে যখন তাঁহার জ্ঞান হয় যে, উহা মরীচিকা, তখন সে মরূদ্যানটি দেখিলেও জানে যে উহা মরীচিকা এবং সেইজন্য আর জল অন্বেষণে যায় না। সেইরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও জগৎ দেখেন, কিন্তু জানেন যে, উহা মিথ্যা এবং মিথ্যা বলিয়া বদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় উহাতে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হন না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির এইরূপ জগদ্-দর্শন ('প্রতিভাস') দেহপাতেই নিবৃত্ত হয়। সুতরাং 'তস্য তাবৎ এব চিরং'—ইহার অর্থ হইল জীবন্মুক্ত ব্যক্তির এই 'প্রতিভাস' নিবৃত্তির ততক্ষণই বিলম্ব, যতক্ষণ তাঁহার শরীর থাকে।[৫]

অন্যভাবে বলা যায়, অবিদ্যার দুইটি শক্তি—'আবরণ' ও 'বিক্ষেপ'। জীবন্মুক্তের আবরণ নাই, বিক্ষেপ আছে। বিক্ষেপহেতুই তিনি জগৎ দেখেন। এই বিক্ষেপের নিবৃত্তির ততক্ষণই বিলম্ব, যতক্ষণ তাঁহার শরীর থাকে—ইহাই আলোচ্য তৃতীয় বাক্যটির তাৎপর্য।

পূর্বাচার্যগণের অনুসরণে একটি জটিল বিষয়ের উপর কিছুটা আলোকপাত করিতে আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। এখন আমাদের কাজ সহজ। জীবন্মুক্তি অনায়াসে প্রতিপাদিত করা যায়, এইরূপ অনেক শ্লোক উপনিষদ্ ও গীতায় আছে। সেইগুলির কয়েকটির শাংকর-ব্যাখ্যা আমরা উপস্থাপিত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে:

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
(৪।৪।৭)

[মানুষের হৃদয়ে যে-কামনাসমূহ আশ্রিত রহিয়াছে, সে-সকলই যখন দূর হয়, তখনই মর্ত্য মানুষ এই দেহেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।]

ইহার ভাষ্যে শংকরাচার্য লিখিয়াছেন: 'বিদ্বান্ জীবন্ এব অমৃতঃ ভবতি। অত্র অস্মিন্ শরীরে বর্তমানঃ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ব্রহ্মভাবং মোক্ষং প্রতিপদ্যতে ইতি অর্থঃ।' অর্থাৎ, জ্ঞানী জীবিত থাকিয়াই অমৃত হন। [মূল শ্লোকের] 'অত্র'

---

৫ বেদান্তদর্শনের 'অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ' (ব্র. সূ. ৪।১।১৫) সূত্রের ভাষ্যে শংকরাচার্য 'তস্য তাবৎ এব চিরং' ইত্যাদি বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া জীবন্মুক্তের বাধিত (অপনোদিত) মিথ্যাজ্ঞানের কিভাবে অনুবৃত্তি হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে জীবন্মুক্ত, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

শব্দের অর্থ 'এই শরীরে'। এই শরীরে বর্তমান থাকিয়াই তিনি ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

এই শ্লোকটি কঠোপনিষদেও আছে (২।৩।১৪) এবং উহার অব্যবহিত পরবর্তী 'যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ' ইত্যাদি (২।৩।১৫) শ্লোকটিও প্রায় একরূপ। বলা বাহুল্য, এই শ্লোকদ্বয়ের ভাষ্যে জীবন্মুক্তিবাদ প্রতিপাদিত করিতে শংকরাচার্যের কোনই অসুবিধা হয় নাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে: 'আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উর্ধ্বে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত। এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ সবিশেষ জানিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তি স্বরাট্ হন' (৭।২৫।২)। ইহার ব্যাখ্যায় শংকরাচার্য লিখিয়াছেন: 'বিদ্বান্ জীবন্ এব স্বারাজ্যে অভিষিক্তঃ, পতিতে অপি দেহে স্বরাট্ এব ভবতি।' অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াই স্বারাজ্যে অভিষিক্ত হন এবং দেহপাতের পরও স্বরাট্ই হন। স্বারাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া, স্বরাট্ হওয়া ও মুক্ত হওয়া একই কথা।

পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিতে মুক্তি হিসাবে কোনও ভেদ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লিখিত ভাষ্যে শংকরাচার্য সেই কথাই বলিয়াছেন।

গীতার 'কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্' ইত্যাদি শ্লোকে (৫।২৬) সেই একই কথা পাওয়া যায়: 'জীবতাং মৃতানাং চ ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষঃ বর্ততে।' অর্থাৎ, কামক্রোধরহিত সন্ন্যাসিগণ জীবনেও মুক্ত, মরণেও মুক্ত।

গীতার 'যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ' ইত্যাদি শ্লোকের (৫।২৪) ভাষ্যেও শংকরাচার্য লিখিয়াছেন: 'মোক্ষম্ ইহ জীবন্ এব ব্রহ্মভূতঃ সন্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি।' অর্থাৎ, যে-যোগী আত্মাতেই সুখী, আত্মা যাঁহার নিকট প্রকাশিত, তিনি জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন

শংকরাচার্য তাঁহার 'আত্মবোধ' গ্রন্থের ৪৯-সংখ্যক শ্লোকে 'জীবন্মুক্ত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে অবিদ্যার দ্বারা উপস্থাপিত দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির ধর্মসকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় (উহাদের মিথ্যাত্ব নির্ণীত হয়)—তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া তদ্রূপই হইয়া যান।

'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থেও 'জীবন্মুক্ত' শব্দটি শংকরাচার্য বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন এবং জীবন্মুক্তের লক্ষণ সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। (শ্লোক ৪২৫-৪১, ৫২৬-২৯, ৫৩৬-৫৯ দ্রষ্টব্য)।

এইসকল প্রকরণগ্রন্থে, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (পাদটীকা ২-এর শেষ অনুচ্ছেদ এবং পাদটীকা ৫ দ্রষ্টব্য) এবং গীতার আরও একাধিক শ্লোকের ভাষ্যে শংকরাচার্য জীবন্মুক্তি প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সেগুলির উল্লেখ করা হইল না।

শংকরাচার্যের এই জীবন্মুক্তিবাদ মানবমাত্রেরই পরম সম্পদ। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করিয়া ইহজীবনেই মুক্ত হইতে শংকরাচার্য আমাদের আহ্বান করিতেছেন। আমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া যথাসাধ্য জীবন্মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি। যোগ্য অধিকারী হইলে আমরা নিঃসন্দেহে জীবন্মুক্ত হইব। না পারিলেও সাধনার ফল আছেই। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।'

রামকৃষ্ণ সংঘ

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

ইউরোপে যুক্তিবাদের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হতে দেখা যায় অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে। তৎপূর্বে ধর্মীয় চিন্তা আর শাস্ত্রীয় অনুশাসন ইউরোপীয় জীবনকে ঘিরে রেখেছিল। এইসব অনুশাসনের কোনও রকম লঙ্ঘন ঘটলে ব্যাপারটা ধর্মবিরোধিতা বা ভ্রষ্টাচার হিসাবে গণ্য হত এবং সেইসঙ্গে তার জন্য কঠোর, কখনও বা নৃশংস ধরনের শাস্তি দেওয়া হত। সামান্যতম স্বাধীন চিন্তার লক্ষণ দেখা গেলে যাজকীয় বিচারের ব্যবস্থা হত যার ফল ছিল অতি ভয়ানক—অভিযুক্ত ব্যক্তি ভোগ করতেন নিষ্ঠুরতম দণ্ড, কখনও কখনও এমন ব্যক্তিকে কাঠের খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হত। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ শিল্পকলার ক্ষেত্রে মানুষের সৃজনীশক্তির মুক্তি সূচিত করে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানগত বিবিধ বিধানের কঠিন বন্ধন অংশতঃ শিথিল হয় সংস্কার এবং প্রতিসংস্কারের ঘটনাপরম্পরায়। তবু দীর্ঘকাল, বলতে গেলে সপ্তদশ শতকে নিউটনের অভ্যুদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, যুক্তিবাদের বন্ধনদশা ঘোচেনি। এমন-কি নিউটনকেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে —লক্ষ্য রাখতে হয়েছে যাতে তাঁর কোনও কাজ ধর্মপ্রতিষ্ঠানবিরোধী না মনে হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ: যুক্তিবাদ বন্ধনমুক্ত হয়ে পূর্ণতর প্রকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে; অষ্টাদশ শতক অতিক্রম করে যুক্তির এই জয়যাত্রা যখন উনবিংশ শতকে উপনীত তখন তার প্রতিষ্ঠা এমনই মুক্ত পরিবেশে যে, সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পেরেছে, পেরেছে তাঁকে অস্বীকার করতেও। এই যুগের ইউরোপ এক সম্পূর্ণ নূতন সমাজে পরিণত। শিল্প-বিপ্লব, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি এবং ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ ইউরোপকে, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডকে, ঈশ্বর বলে আদৌ যদি কেউ থাকেন তবে সেই ঈশ্বর সম্পর্কে এবং মানুষ সম্পর্কে নানা ধরনের চিন্তার উর্বর ক্ষেত্র করে তুলেছে।

এই যুগে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল? ত্রয়োদশ শতক থেকে মুসলমান আধিপত্যে ভারতবর্ষ বাঁধা ছিল দাসত্বের শৃঙ্খলে। মাঝে মাঝে এই বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াস দেখা গিয়েছে। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ এবং সংঘর্ষের ফলে এ-ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ, সার্থক প্রচেষ্টা কখনও হয়নি। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় কয়েকটি শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটছিল এদেশের ভূমিতে। তারা এসেছিল বণিক এবং ব্যবসায়ী রূপে। কিন্তু ক্রমে সেই ভূমিকার রূপান্তর ঘটিয়ে তারা দেশজয় করতে শুরু করে দিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজশক্তি বঙ্গদেশ জয় করে নিল বিপুলভাবে এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রধানতম শক্তি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল। ক্রমশঃ এদেশের একটি বৃহদংশে ইংরাজশক্তির আধিপত্য বিস্তৃত হল। আরও কিছু কাল পরে প্রায় সমগ্র ভারতে ইংরাজ-রাজশক্তির শাসন স্থাপিত হল। কিন্তু রাজনৈতিক আধিপত্যই ভারতে ইংরাজ-শাসনের একমাত্র ফল নয়। এই বিদেশী শক্তি তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতি—ভারতবাসীর ধর্ম ও জীবনাদর্শের উপর যা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় জীবনে সে এক বিষম সংকট-মুহূর্ত। তখন মনে হয়েছিল, ভারতের নিজস্ব সত্তার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটবে।

সংস্কারপন্থী কয়েকটি গোষ্ঠী ক্রমে এদেশে

সংগঠিত হয়, রাষ্ট্রীয় শাসকদের ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে তারা নিজেদের ধর্ম ও সমাজের সামঞ্জস্য রচনায় তৎপর হয়েছে। রামমোহন রায় প্রমুখ সমাজনেতাদের মধ্যে দেখা যায় একটি হীনম্মন্যতাবোধ। তাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ স্বীকার করে নেন এবং প্রতীচ্য আদর্শ গ্রহণ করে সেইভাবে নিজেদের ধর্ম ও সমাজের সংস্কারে প্রয়াসী হন।

এদিকে পাশ্চাত্য জীবন ও সমাজের রূপরেখার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। যে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার উন্মেষ হয় ইউরোপে, প্রাকৃতিক নিয়মকেই সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অতি-প্রাকৃতের প্রতি বিশ্বাস ক্ষয় পেতে থাকে। এই কারণে পাশ্চাত্যের অনেকে নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদী হয়ে পড়েন। মনীষীদের মধ্যে অনেকে—যেমন ডারুইন, হাক্সলি, টিন্ড্যাল, হার্বার্ট স্পেনসার, হিউম, মিল—নাস্তিকতা এবং অজ্ঞেয়বাদ প্রচার করেন।

চিন্তাজগতের এই পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আরনল্ড্ টয়েনবী বলেছেন যে, কালে কালে ঘটনাগত পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বহিরাগত সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। যদি সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পর্যাপ্ত বল আর প্রাণশক্তি থাকে, তবে সে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং যদি তার প্রতিক্রিয়া ওই সংঘাতের উপযুক্ত মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে বেঁচে থাকে—নতুবা তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ একই কথা বলেছেন, যদিও ভিন্ন-ভঙ্গীতে: "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন, 'যখনই ধর্মের প্রভাব কমে যায় ও অধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে তখনই আমি মানব-জাতিকে রক্ষা করবার জন্য জন্মগ্রহণ করি।' আমাদের এই জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন ও নূতন নূতন পরিস্থিতির জন্য যখনই নূতন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখনই এক শক্তিতরঙ্গ এসে থাকে। আর মানব আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় স্তরে যেহেতু ক্রিয়াশীল তাই উভয় ক্ষেত্রেই এই সমন্বয়-তরঙ্গের উদ্ভব হয়।…অধুনা আবার আধ্যাত্মিক স্তরে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে জড়বাদী ভাবসমূহ যখন অত্যুচ্চ গৌরব ও শক্তির অধিকারী, জড়বস্তুর উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার ফলে মানুষ যখন আজ নিজের দিব্য স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে অর্থো-পার্জনের যন্ত্রমাত্ররূপে পর্যবসিত হতে চলেছে, এই অবস্থায় আর একবার সমন্বয়ের প্রয়োজন। সমন্বয়ের সেই বাণী উচ্চারিত হয়েছে, এসেছে সেই শক্তি যা ক্রমবর্ধমান জড়বাদের মেঘ অপসারিত করে দেবে। সেই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, অনতি-বিলম্বেই তা মানবজাতিকে তার প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, আর এশিয়া থেকেই এই শক্তি বিস্তৃত হতে আরম্ভ করবে।"

এই শক্তির নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। পার্থিব অভ্যুদয়ের গতি কখনও সরলরেখায় নিয়ন্ত্রিত হয় না। এটি তরঙ্গের উত্থান-পতনের সঙ্গে তুলনীয়। তরঙ্গের পতনের পর প্রবল জলস্ফীতির মতোই জাতির অবনতির পরই এক মহাজাগরণ দেখা দেয়। তার শীর্ষদেশে অবস্থান করেন এক মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ যিনি মানবজাতিকে অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে নিয়ে যান। শতাব্দীর পর শতাব্দীর অবনতদশার পর ভারতবর্ষের পুনরুত্থান ঘটছে এবং এই অভ্যুদয়কে সার্থক করবার জন্য যে মহান শক্তির উন্মোচন হয়েছে সেটি রূপ পরিগ্রহ করেছে এক ব্যক্তির মধ্যে—সেই ব্যক্তির নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। এরূপ ব্যক্তিদেরই ভারতবর্ষে 'অবতার' বলা হয়। এ-পর্যন্ত জগতের সর্বশেষ অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অবতারপুরুষের আদর্শ জীবন ও বাণীতে

প্রতিফলিত করবার জন্য প্রয়োজন হয় কয়েকজন তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত মানুষের। এ ছাড়া অবতার-পুরুষের ভাবের রূপায়ণ সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই তাঁর আদর্শের কথা কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরই যন্ত্রস্বরূপ হয়ে এঁরা অধঃপতিত এবং মৃতকল্প মানবজাতির মধ্যে তাঁর বাণী প্রচার করে তাকে সঞ্জীবিত করে তুলুন—এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তাঁর এই মানবকল্যাণের ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কুঠিবাড়ির ছাদে উঠে ব্যাকুল-হৃদয়ে উচ্চস্বরে বলতেন: 'তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না।' কয়েক বছর পরে একে একে ভক্তেরা তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করলেন, এবং তিনি তাঁদের গড়ে তুলতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন যুবক যাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। তাঁর শেষ অসুখের সময়ে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে কাশীপুর বাগানবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, এই যুবকরা তখন নিজেদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সেখানকার কর্তব্যকর্ম ছেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে একত্রিত হন, তাঁর দেখাশোনা ও সেবা করেন। এই সেবাকে উপলক্ষ্য করে উক্ত যুবকদল শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে পেয়েছেন গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং এইভাবে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের উপযুক্ত বাহকরূপে গড়ে উঠেছেন। তাঁর গৃহী ভক্তরা প্রভুর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন, বিশেষভাবে যাঁরা চিহ্নিত তাঁরা চিকিৎসাদির দেখাশোনা করেন এবং অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজন মেটান—এঁদেরও ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁরা রামকৃষ্ণ সংঘের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে সন্ন্যাসি-সংঘ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আদেশ করেছিলেন কিনা অথবা তাঁর এই দিব্যলীলায় এই অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কী ভূমিকা নিতে হবে, কীভাবে তাঁর ভাবপ্রচার করতে হবে সে-সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না। এইটুকু আমরা জানি যে, তিনি নরেন্দ্রনাথকে (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) উক্ত যুবকদের নেতা হতে বলেছিলেন, কোনও আশ্রমের মতো জায়গায় তাঁরা যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকেন, সংসারজীবনে জড়িয়ে না পড়েন সেইদিকে তাঁকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন।

জগতের সব মহান ধর্মের ক্ষেত্রেই এই রকম ঘটে থাকে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, বুদ্ধের জীবৎকালে একটি সম্প্রদায় মাত্র ছিল—পরিব্রাজক-সম্প্রদায়, যা সংঘ নামে অভিহিত হয়। বাইরের লোকেদের কাছে 'শাক্যপুত্তীয় সমন'—অর্থাৎ শাক্যবংশোদ্ভূত ব্যক্তিকে যে-ভিক্ষুরা অনুসরণ করেন—এই ছিল তাঁদের পরিচয়। বর্ষা-কালে এই ভিক্ষুরা কোনও একটি নির্জন স্থানে বাস করতেন। তাকে বলা হত বস্সবাস। বৌদ্ধসংঘ বা ভিক্ষুদলের কোনও চিহ্নিত বা নির্বাচিত প্রধান ছিলেন না। একত্র মিলিত হলে তাঁরা কতকটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের সাংগঠনিক কাজকর্ম সম্পন্ন করতেন। শোনা যায়, আনন্দ বুদ্ধকে তাঁর উত্তরাধিকারীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন: 'ধম্ম-বিনয়ের যেসব বিধি আমি তোমাদের সকলের জন্য দিয়েছি, আমি চলে গেলে তারাই তোমাদের আচার্য হোক।' কিন্তু ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সংস্কার উদ্ভব হয়, ভিক্ষুরা বিভিন্ন স্থানে বাস করতে থাকেন এবং সংঘবদ্ধ হন। তবু কিছু ভিক্ষু আগের মতো নিভৃতচারী থেকে গেলেন। এই উভয় শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নিয়ে বৌদ্ধসংঘ গঠিত হয়। কিন্তু এই সংঘ কখনও কেন্দ্রিতভাবে সংগঠিত হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর নির্দেশ যাই হোক না কেন, স্বামী

বিবেকানন্দ কেন্দ্র-সমন্বিত সংঘেরই পরিকল্পনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ এ-ব্যাপারে পাশ্চাত্য সংগঠন-পদ্ধতির প্রভাব তাঁর মনে কাজ করেছিল। তিনি পাশ্চাত্য ধরনের সংগঠনের দোষত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তবুও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য যদি আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ ও উন্মোচন করতে হয় তবে এই ধরনের সংঘের সংগঠন অবশ্য কর্তব্য।

আমরা বৌদ্ধধর্মে ত্রিবিধ উপাস্য লক্ষ্য করি : বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। বুদ্ধ অবশ্য ছিলেন মানব। পরবর্তী বৌদ্ধগণ কিন্তু তাঁকে সকল দেবতার উপরে স্থান দেন এবং তাঁকেই পরম উপাস্য জ্ঞান করেন। সেই সঙ্গে ধর্ম এবং সংঘও দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং বৌদ্ধদের উপাস্য রূপে পরিগণিত। এইভাবে ত্রিশরণ-মন্ত্রের উদ্ভব, যথা—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

বৌদ্ধের পক্ষে এই ত্রিশরণ-মন্ত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিসম্পন্ন সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ডক্টর সুকুমার দত্ত বলেন : 'আমাদের জানানো হয়েছে, বৌদ্ধধর্মের প্রথম দিকে এই ত্রিশরণ-মন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, পরবর্তী কালে ভিক্ষু-আশ্রমে দীক্ষার জন্য মন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়।' সে যাই হোক, পৃথিবীর সর্বত্র বৌদ্ধ গৃহী এবং ভিক্ষুরা এই ত্রিশরণ-মন্ত্রের স্বীকারকে তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল বলে মেনে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সন্ন্যাসি-সংঘের দ্যোতক হিসাবেই সংঘ শব্দটি ব্যবহৃত। বৌদ্ধ গৃহীরা সংঘের অন্তর্ভুক্ত হতেন না। তাঁরা ছিলেন উপাসক এবং উপাসিকা আর তাঁদের কর্তব্য ছিল সংঘের তত্ত্বাবধান ও সেবা।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে সন্ন্যাসি-সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। আমরা দেখছি, এদেশে এমন ঘটনা ঘটল দ্বিতীয়বার। সন্ন্যাসি-ভ্রাতৃমণ্ডলী এই সংঘের কেন্দ্রে স্থিত। কিন্তু গৃহী ভক্তরাও তার বহির্ভূত ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গক্রমে এক সময়ে বলেছিলেন, বৌদ্ধধর্মের একটি বড় ত্রুটি এই যে, তার সব কিছুই সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহীদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। এই ত্রুটির সংশোধনের জন্যই সন্ন্যাসি-সংঘের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি সংস্থা তিনি ১৮৯৭ সনের ১লা মে স্থাপন করেন। উক্ত সংস্থার পরিচালকদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন সন্ন্যাসী, অন্য কয়েকজন গৃহী। অবশ্য পরবর্তী কালে, নিজেদের কর্মে ব্যস্ত থাকার ফলে গৃহী-সদস্যরা সংস্থার পরিচালক হিসাবে থাকতে পারেননি এবং পরিচালনার দায়িত্ব সন্ন্যাসি-সদস্যদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে হয়। তবে ১৯০৯ সনে নিবন্ধভুক্ত এই রামকৃষ্ণ মিশন সংস্থার সদস্যদের মধ্যে যেমন সন্ন্যাসীরা আছেন, তেমনই আছেন গৃহী ভক্ত এবং অনুরাগীরাও।

রামকৃষ্ণ সংঘ তাই এখন দুইটি সংস্থা নিয়ে গঠিত—রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন, যেখানে গৃহীদের সঙ্গে সন্ন্যাসীরা যুক্ত হয়ে প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য কাজ করছেন।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই এই সন্ন্যাসি-সংঘের উপর দেবত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'কারণ এই সংঘই তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] অঙ্গস্বরূপ এবং এই সংঘেই তিনি সদা বিরাজিত। একীভূত এই সংঘ যে আদেশ করেন, তাই প্রভুর আদেশ ; সংঘকে যিনি পূজা করেন, তিনি প্রভুর পূজা করেন, এবং সংঘকে যিনি অমান্য করেন, তিনি প্রভুকেই অমান্য করেন।' উদ্ধৃত এই বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রভুর সত্তা এই সংঘে সদা বিরাজমান থেকে তাকে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করছেন।

এটিও স্পষ্ট যে, গৃহী এবং সন্ন্যাসীরা—'মঠে'র ত্যাগী সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত হিসাবে অথবা মিশনের

সদস্য হিসাবে—এই সংঘেরই অঙ্গীভূত। সন্ন্যাসি-সদস্যগণ নিঃসন্দেহে সংঘের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু সামগ্রিক সংঘের উপচ্ছায়ায় যাঁরা বিরাজ করছেন সেই গৃহী-সদস্যরাও সংঘেরই অঙ্গ।

দুঃখের বিষয়, মঠের গৃহী ভক্তরা এবং মিশনের সদস্যরা এই ভাবটি সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন-নি। অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করেন যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হলে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়, গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনে সাধনা করে যেতে হয় এবং যিনি গুরু তাঁর প্রতি অনুগত ও অনুরক্ত হয়ে থাকতে হয়। নিঃসন্দেহে এসবের প্রয়োজন আছে, এগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী এবং গৃহী ভক্তদের মনে রাখা উচিত যে, রামকৃষ্ণ সংঘ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সাধনা ও ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের জন্য নয়। সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তদের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে এক নূতন জগতের প্রকাশ ঘটানোই সংঘের প্রকৃত অন্তর্নিহিত আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর প্রকৃত ভক্ত হওয়ার একটি অপরিহার্য শর্ত হল সংঘের সঙ্গে একীভূত হওয়া।

অজ্ঞ লোকেরা আমাদের আন্দোলন, আমাদের পূজনীয় সব মহাপুরুষ এবং আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে আক্রমণ করছে—এই ব্যাপার প্রায়ই দেখা যায়। আমরা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধু, অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাই। সাধু হিসাবে এই ধরনের আক্রমণ সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখানো চলে না। এই পরিস্থিতিতে সংঘ এবং সংঘ-প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার বন্ধ করার জন্য গৃহী ভক্তদের সচেষ্ট হওয়া উচিত নয় কি? তাঁরা অন্ততঃ প্রতিবাদ তো করতে পারেন।

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত অনুগামী হতে হলে কেবলমাত্র গুরুর নিকট দীক্ষালাভ, তাঁর প্রতি ভক্তিপোষণ এবং কিছু অনুষ্ঠানক্রিয়াদির নিয়মিত সম্পাদনই যথেষ্ট নয়, পরন্তু একটি সক্রিয় জীবন গঠন এবং সেই জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য উৎসর্গ করাই এক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। সেইসঙ্গে যখনই এবং যেখানেই সংঘের উপর আক্রমণ হবে সেই মুহূর্তে সেখানে আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। আপনাদের পরিবারের উপর যখন আক্রমণ হয়, তখন কি আপনারা তার মোকাবিলা করেন না? তবে আপনাদের আধ্যাত্মিক পরিবারের ক্ষেত্রে প্রতি-রোধের ব্যাপারে এই নিষ্ক্রিয়তা কেন? রম্যাঁ রলাঁ তথাকথিত ধর্মানুগামীদের সম্পর্কে বলেছেন: 'পক্ষান্তরে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত হাজার হাজার যেসব ভীরু ধর্মবিশ্বাসী আছেন—তা সে যাজক-সম্প্রদায়েরই হোন অথবা গৃহীই হোন—তাঁদের ধর্মের ধ্বজা বহন করবার কোনও অধিকার নেই। প্রত্যয় যাকে বলে সে-বস্তু এঁদের নেই। যেন কতকগুলি সুখপ্রদ বিশ্বাসরূপ শস্যে ভরা ডাবার সামনে আস্তাবলে এঁদের জন্ম, সেখানেই এঁরা গড়াগড়ি দিয়ে থাকেন আর ওই বিশ্বাসরূপ শস্য নিয়ে চর্বিতচর্বণ করে থাকেন।' যে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের অভীঃ মন্ত্র দিয়েছেন আমরা তাঁরই পতাকাবাহক। আমাদের পক্ষে কি অনুরূপ আচরণ সাজে? আমরা ছোট, বড় অনেক সম্প্রদায়কে তাদের সীমিত দৃষ্টি আর সীমিত কর্মক্ষেত্র নিয়ে গুরুর চারপাশে সংহত হতে দেখি, তাদের দেখি গুরু আর নিজেদের ধর্ম-আন্দোলনকে বীরত্বের সঙ্গে রক্ষা করতে। জগতে দেবত্বের সর্বোত্তম বিকাশ যাঁর মধ্যে হয়েছে, অবতারবরিষ্ঠ সেই রামকৃষ্ণের অনুগামী আমরা—আমরা তবে কেন দীনহীনের মতো আচরণ করব? আসুন, আমরা সকলে তাঁর বাণী সাহসের সঙ্গে প্রচার করবার জন্য অগ্রসর হই, স্বামী বিবেকানন্দ জগতের কল্যাণের জন্য যে-যন্ত্র স্থাপন করেছেন

সেটি রক্ষার জন্য হই কৃতসংকল্প। আমরা যেন মনে রাখি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই উপর এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী যেন আমরা ভুলে না যাই। তিনি বলে-ছিলেন: 'এই ভারত পুনর্বার জাগ্রত হবে এবং যে-মহাতরঙ্গ এই কেন্দ্র থেকে সমুত্থিত হয়েছে, মহাপ্লাবনের মতো তা সমগ্র মানবজাতিকে অভি-সিঞ্চিত করে তাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। এই আমাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং শিষ্যপরম্পরাক্রমে উক্ত ব্রতের সাধনে আমরা যথাসাধ্য প্রস্তুত হয়েছি। যে-কেউ এতে বিশ্বাস করবে, সে-ই প্রভুর কৃপায় মহাবীর্য ও তেজস্বিতা লাভ করবে।'

এই মহালগ্নে আমরা যেন স্মরণ করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সকলের গুরু। মানবগুরু হলেন আধার যাঁর মাধ্যমে আদি গুরুশক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই দিক দিয়ে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সকল অনুগামীই পরস্পরের গুরুভ্রাতা; পার্থিব ভ্রাতাদের মধ্যে যে-বন্ধন থাকে তার চেয়েও দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে গুরুভ্রাতৃগণ আবদ্ধ। এই প্রত্যয় নিয়ে, আসুন, আমরা প্রভুর অভীষ্ট সম্পাদনের জন্য সম্মিলিত হই। এই পুণ্যলগ্নে, আসুন, আমরা নূতন ত্রিশরণ-মন্ত্র উচ্চারণ করি:

আমি শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত
আমি স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত তাঁর বাণীর শরণাগত
আমি সংঘের শরণাগত ॥*

* ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৮০, বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহাসম্মেলনের (১৯৮০) দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে পঠিত ইংরেজী মূল ভাষণের শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায়-কৃত অনুবাদ।—সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

জন্ম-স্বয়ংবরা

সবে কীর্তনের আসর ভাঙ্‌ছে, গ্রাম শিহড়ে। গাঁয়ের লোক এখন ভজনানন্দে বাড়ি ফিরছে। এক রসিকা পল্লীরমণী কোলে-বসা দু বছরের ছোট্ট মেয়ে সারদাকে সাদরে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে এত লোক রয়েছে, এদের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে সাধ যায়?"[১] দুখানি কচি হাত উঠিয়ে একলক্ষ্যা সারদা নির্দেশ করলে একেবারে "চাঁদা মামাকে"।

গদাই বেশে এসে "চাঁদা মামা" বুঝি ভেবে-ছিলেন এ ধরায় ভিড়ের মাঝে কে আর আমায় চিনতে পারবে এখানে? রাজার মতো ছদ্মবেশে এসে, সব দেখে শুনে হেসে কেঁদে চলে যাব। কিন্তু পড়ে গেলেন ধরা, সবার আগে ঐ ছোট্ট মেয়েটির কাছে। রামকে দেখলে 'আমি সীতা' চিনবেন না, কৃষ্ণকে দেখলে "আমি রাধা" চিনবেন না—একি হয় না-কি? আর "যে হয় আপন জনা তাকে নয়নে-নয়নে যায় গো জানা!"

জন্ম-স্বয়ংবরা সারদা এই নীরব ঘোষণাটি করে নিশ্চিন্ত মনে জয়রামবাটী ফিরে গিয়ে মায়ের কাছে বড় হতে থাকে।

২

ঝড়ের মুখে রামকৃষ্ণ

দক্ষিণেশ্বরে ঝড় উঠেছে। কোন্‌টা আম, কোন্‌টা তেঁতুল গাছ আর বোঝা যাচ্ছে না।

১ স্বামী গম্ভীরানন্দ, শ্রীমা সারদাদেবী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ২৯

কালীর পূজারী রামকৃষ্ণ মা-মা-মা-পাগল হয়েছেন। অসহ অদর্শন-যাতনা আর সইতে না পেরে যখন বলিপ্রিয়ার সকাশে নিজেকে বলি প্রায় দিলেন-দিলেন, এ-বলি মা নিলেন না। প্রত্যক্ষ অনুভূতি-নিমজ্জিত রামকৃষ্ণ সদানন্দময়ী চৈতন্যজয়িতা কালী পেয়ে হলেন কালী-পাগল।

আনুষ্ঠানিক পূজা খসে পড়ল শীতের পাতার মত। পূজিতার প্রতি রামকৃষ্ণের সমগ্র চৈতন্যখানি প্রবাহিত হয়ে গেল খর স্রোতে। যদি একবার দর্শন হতে পারে, তবে অনুক্ষণ হতে পারে না কেন? রামকৃষ্ণের কালী-পাগলামি বেড়েই চলল।

আর তাঁর ভগবৎ-উন্মাদনার কাহিনী পল্লবিত হতে-হতে কামারপুকুরে ছড়িয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণি প্রমাদ গণলেন। পড়া শেখাতে শহরে পাঠান হয়েছিল। এখন দেখছি পড়া গেল, 'চ্যাঙ'ও গেল। প্রাণের সব আকুতি ঢেলে ডেকে পাঠালেন দেশে গদাইকে। দেখে প্রাণ জুড়াবে। আর চিকিৎসা হবে। জগৎভোলা রামকৃষ্ণ ছিলেন চির মাতৃভক্ত। মাতৃভক্ত হবেন বলেই জগৎ-ভোলা। আর ঐ যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে চিন্ময়ী ভবতারিণী আর এই যে কামারপুকুরে ছনের ঘরে মা চন্দ্রমণি—সে একই মা।

মাতৃ-আদেশে রামকৃষ্ণ এলেন কামারপুকুরে। চন্দ্রমণি চোখ মেলে দেখলেন—তাঁর গদাই যেমন ছিল তাঁর কাছে, তেমনি যেন আছে; তবে অনেকখানি বেশী যেন হয়েছে। সবটা যেন ঠিক বোঝা যায় না। ভালর চেয়ে আরও ভাল। তবে সংসারে আর কারো মতই নয়। এটাই কি তার রোগ?

তাই মেজ ছেলে রামেশ্বরের সঙ্গে যুক্তি করে 'চিকিৎসার' আয়োজন করতে লাগলেন। গোপনে। কারণ, ভয় ছিল, বিবাগী গদাধর, একলক্ষ্য গদাধর এ অব্যর্থ ঔষধ সেবন করতে কিছুতেই রাজী হবে না। তাই হয়ত ভেবেছিলেন ঔষধটা একবার গিলিয়ে মুখ চেপে ধরলেই হয়ে যাবে। তাই 'উত্তম-বৈদ্য'কে একটু উত্তম ঔষধ গেলাবার মতলব চলছিল রামেশ্বরের সঙ্গে। তবে অভাবনীয় ভাগ্যবশে বুকে আর হাঁটু দিতে হল না।

জানেন তো সংসারের ঐ সুপ্রসিদ্ধ ঔষধটির নাম কি? বিবাহ! কিন্তু ঔষধের মুখ্যটি জোগাড় করতে চন্দ্রমণি ও রামেশ্বর নাজেহাল হয়ে গেলেন। জন্ম-স্বয়ংবরা কে তা তো আর তাঁরা জানতেন না।

তখন কৃপাবশে ভাবাবেশে একটি ঘোষণা করে গদাধর মা ও ভাইকে আশ্চর্যান্বিত ও নিশ্চিন্ত করলেন। বললেন: নানা স্থানে ঘুরে কিছুই হবে না। যাও জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখ গে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা আছে।[২] যিনি চিহ্নিত হয়ে আছেন, তিনিই কুটোবাঁধা হয়ে থাকার খবরটি দিলেন। এই অভিজ্ঞান-বিনিময় কি ঐ চূর্ণ-পলে শিহড়ে সংসাধিত হয়েছিল জন্ম-স্বয়ংবরার আত্ম-নিবেদনে?

ছোট্ট-মেয়ে হক্-কথা বলতে পারে না এ ভাবনা ভিত্তিহীন। ঘাসের নুইয়ে পড়া কচি ডগায় বিলম্বিত শিশিরবিন্দুতে কি সূর্য স্বয়ং-প্রকাশ হন না? তাই বলছি রামকৃষ্ণকে জন্ম-স্বয়ংবরাই প্রথমে চিহ্নিত করলেন। ছোট্ট মেয়ে মহাকাব্যের নায়িকা হতে পারবে না কেন? তাই কঠিন ব্যাধির ঔষধের যখন প্রয়োজন হল, মাতৃসাধক রামকৃষ্ণ 'সত্যি সত্যি তুমি আমার মা আনন্দময়ী'র কাছেই এলেন। যুগ-যুগান্তের শাশ্বত সম্বন্ধ কিনা।

চিনতে পারলেন কি করে? সে কি কথা! যিনি 'শ্রীমতা শ্রীমহারাজ্ঞী শ্রীমৎসিংহাসনেশ্বরী, চিদগ্নিকুণ্ড-সম্ভূতা দেবকার্যসমুদ্যতা', তাঁকে বিশ্বম্ভর চিনতে পারবেন না?

বিয়ে হয়ে গেল। বিশ্বের এই বিরাট খেলা-ঘরের আজব বিয়েটি হয়ে গেল।

---

২ তদেব, পৃঃ ৩০

খুল্লতাতের কোলে-কাঁধে চেপে নববধূ সারদা-সুন্দরী এলেন শ্বশুরালয়ে। তখন খেজুর পাকার দিন। গাছতলায় কত পাকা খেজুর সাত-সকালে পড়ে বিছিয়ে থাকত। সারদার বড় আনন্দ। কত-কত পাকা খেজুর। ছোট্ট দু-হাতে ঠাঁই হয় না। কত নূতন আত্মীয় জন। আর কত বড় একটি জীবন্ত পুতুল—স্বামী! সদানন্দের সঙ্গে যুগে-যুগে আনন্দে মিলন।

স্নেহ-বিগলিতা গরবিনী শাশুড়ি লাহাদের বাড়ি থেকে ধার করে কত গয়না পরিয়েছেন নববধূকে। সারদা-সুন্দরী জগৎসুন্দরী হয়েছেন।

"ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী ; তাই সাজতে ভালবাসে।" ধার করা অলংকারে সারদাকে সাজিয়ে, এখন চন্দ্রমণি পড়লেন সংকটে। তাঁর অতি আদরের কচি-কান্ত বৌমার অঙ্গ থেকে গয়না খুলে নিয়ে লাহাবাবুদের ফেরত দেবেন কি করে? প্রাণ যেন চিড়চিড়িয়ে উঠল। গদাই বললেন: মা, তুমি ভেবো না। ব্যাপারটা আমি সামলে দিচ্ছি। সারদা যখন সুষুপ্তিমগ্না রামকৃষ্ণ সারদা-অঙ্গ থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে মায়ের হাতে দিলেন। চন্দ্রমণি চট্‌পট্ গয়না লাহাবাবুদের ফেরত দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

জেগে উঠে নিজেকে নিরালংকারা দেখে সারদার সে কি কান্না! চন্দ্রমণি নববধূকে কোলে টেনে নিয়ে বহু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: "মা, গদাই তোমাকে এর চেয়েও ভাল ভাল অলংকার কত দেবে।"[৩]

এতে সারদা শান্ত হলেও তাঁর খুল্লতাত সেদিনই জয়রামবাটী থেকে এসে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিরাভরণা দেখে, ক্রোধভরে অমনি সারদাকে কোলে তুলে নিয়ে দ্রুতপদে চলে গেলেন জয়রামবাটীতে।

চন্দ্রমণির বেদনা-মথিত মনকে শান্ত করার জন্য পরিহাসচ্ছলে গদাই বললেন: "ওরা এখন যা-ই বলুক বা করুক না কেন, বিয়ে তো আর ফিরবে না!"[৪]

এই যে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী রামকৃষ্ণের কুটো-বাঁধা কনের সন্ধান দানে ও বিবাহে উৎসাহ, এবং 'বিয়ে-তো আর ফিরবে না' বলে নিশ্চিন্ততার আনন্দ-কৌতুকবোধ—এর তাৎপর্য-নিরূপণ সম্ভব শুধু রামকৃষ্ণ-সারদার দিব্য যুগ্ম জীবনের অতুলনীয় পূর্ণতার মধ্যে।

এ বিয়েটি যদিও হল একটি খেলাঘরের বিয়ের মতো, বাংলার একটি অজ-পাড়াগাঁয়ে, তবু কালে এই বিয়ের ফলশ্রুতিরূপে জগতে হল যুগ-ধর্ম-সংস্থাপন। এ বিয়েটি যদি না হত জগৎবাসী কী-যে হতভাগ্য হত, এ বিয়ে হয়ে যাবার পর, আজ আর তা কেহ কল্পনাই করতে পারবে না।

এ বিয়েটি না হলে আমরা পেতুম না আমাদের প্রাণের ঠাকুর, আমাদের দয়াল ঠাকুর ও আমাদের কপালমোচন ঠাকুরকে। তার চেয়েও নিদারুণ দুর্ভাগ্য হত—আমরা পেতুম না আমাদের অভয়া-বরদা শ্রীমা-কে। ভাল-মন্দের সমাশ্রয়দায়িনী, জ্ঞানমোক্ষপ্রদায়িনী আমাদের চিরকালের মা-কে।

বলুন দেখি রামকৃষ্ণের এ বিয়েটি না হলে আমরা শ্রীমাকে কি করে পেতুম?

আজ এ বিশ্বের কিসের বিনিময়ে কে শ্রীমাকে হারাতে চাইবেন বলুন!

সাধারণতঃ এ সংসারে বিয়ের ফলে হয় সন্ততি-সৃষ্টি। আর এই দিব্য পরিণয়ের ফলে হল কত মহান সন্ত-সৃষ্টি যাঁদের সাধন-সিদ্ধি-সেবায় মানুষের জীবনে ধর্মে-কর্মে হয়েছে নব সঞ্জীবনী-সঞ্চার।

৩

সারদা-শিল্পী রামকৃষ্ণের চারুকলা

ছেলেবয়েস থেকেই গদাধরের অন্যান্য গুণা-

৩ তদেব, পৃঃ ৩২

৪ স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭২, পৃঃ ১১৭

বলীর মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যের একটি বিশেষ গুণ লক্ষিত হয়েছিল। তিনি ভাল ছবি আঁকতে ও দেবদেবীর মূর্তি গড়তে পারতেন। এটি ছিল তাঁর ঈশ-চৈতন্য-প্রশ্বাসিত গুণ, কারো কাছে শিখতে হয় নি। তাঁর তুলির স্পর্শে দেবদেবীর মুখচোখ জীবন্ত ও দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হয় উঠত। আর তাঁর এই শিল্পকুশলতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই সারদা-শিল্পী রামকৃষ্ণে—যাঁর মননধ্যানের নিপুণতায় শ্যামাসুন্দরীর কন্যা সারদা কালে হলেন সর্বশক্তিময়ী, সর্বমঙ্গলা, সদ্‌গতিপ্রদা, চিন্ময়ী পরমানন্দা বিজ্ঞানঘনরূপিণী। এ শুধু মাটির তালে গঠন-প্রযুক্তি নিয়োগ বা পাথর কেটে অবয়ব-প্রকাশ নয়। এ হচ্ছে নিজের দিব্য চৈতন্যের অভিঘাতে স্ফুটনোন্মুখ চৈতন্যরূপিণীকে স্বমহিমায় উত্তীর্ণ করা। এমন শিল্প-নিদর্শন জগতের ইতিহাসে আর একটিও কি আছে ?

এই অতীন্দ্রিয় শিল্পশৈলীর আভাস দিয়ে পরবর্তী কালে প্রসঙ্গান্তরে ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন :

> "চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে এক-মেটে, তারপর দো-মেটে, তারপর খড়ি, তারপর রঙ, পরে পরে করতে হয়।"[৫]

চৈতন্যরূপিণী সারদাকে স্বমহিমায় পূর্ণ বিকাশের সহায়ক হতে, রামকৃষ্ণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে নিয়োগ করলেন এই একই শিল্পশৈলী। কালী সাধনায় সিদ্ধ রামকৃষ্ণ যদিও এসেছিলেন চন্দ্রমণির আহ্বানে তাঁর দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করাতে—সে উদ্দাহরূপ চিকিৎসাটিই এখন পরিণত হল তাঁর এক নূতন সাধনার সূচনায়। এই হল "প্রতিমা প্রথমে এক-মেটে"।

বিয়ের এক বছর পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করে ঠাকুর পুনর্বার সব ভুলে সাধনায় নিমজ্জিত হলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী গঙ্গাপ্রবাহে নীয়মানা হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুরের তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনার নিয়ামিকা হতে। এই অনন্য সাধকের অতন্দ্র সাধনার দুর্নিবার আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তবৎসল দেবদেবীর ভিড় জমে গেল। এলেন মহামায়া বহুরূপে, এলেন শিব, এলেন সীতা, এলেন হনুমান, এলেন রাম, এলেন রাধা, এলেন কৃষ্ণ। এসে আর কেহ কোথাও ফিরে গেলেন না। রামকৃষ্ণের চৈতন্যকেন্দ্রে তাঁরা স্ব স্ব মহিমায় অবর্ণনীয়রূপে আহিত হয়ে রইলেন।

বহুভাবের বহুসাধনায় সিদ্ধিলাভে ধন্যাতিধন্য রামকৃষ্ণের যখন দ্বিতীয়বার দিব্যোন্মাদ অবস্থা চলছে, তখন একদিন তাঁর জীবনাঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন দীর্ঘকায় ব্রহ্মজ্ঞানী তোতাপুরী। ভবতারিণীর আদেশে ঠাকুরের অদ্বৈতসাধনা শুরু হল, গোপনে সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর। দেহজ্ঞান জগৎ-বোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে নিমজ্জিত হলেন। অদ্বৈতভূমিতে ছয়মাস অবস্থানের পর ভবতারিণীর ইচ্ছায় ও আদেশে রামকৃষ্ণ ভাবমুখবিহারিন্। ইসলাম সাধনাও হয়ে গেল।

এই বিরামহীন ছয়-সাত বছর বহুবিধ সাধনকালে, কামারপুকুর-জয়রামবাটীতে 'একমেটে' করে রেখে আসা সারদাকে তাঁর একবারও মনে পড়েছিল কিনা তা নির্ণয় করার নিশানা রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে বড় একটা মেলে না।

ঘুরে ঘুরে ছয়ঋতু এসেছে-গেছে। প্রখর উত্তপ্ত খাঁখাঁ সূর্যকিরণ কম্পমান চক্রবালে। তৃষ্ণায় প্রাণী-কণ্ঠ শুষ্ক করে এসেছে-গেছে স্নেহহীন গ্রীষ্ম। গরগর গরজনে মেঘছাওয়া আকাশ ভেঙে নেবেছে বর্ষা

৫ শ্রীম-কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, কথামৃত ভবন, কলিকাতা, ১৩৭৪, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮

ডেকেছে বান আমোদরে। আবার হেসেছে শরতে সুনীল আকাশ। উড়ে গেছে দেশান্তরে জয়রামবাটীর আকাশ পেরিয়ে শ্বেত বলাকা। চক্রবালে হাওয়ায় দুলেছে সুশুভ্র কাশফুল। সূর্যি উঠার পূর্বে কচি ঘাসের উপরে ঝরেছে সদ্যফোটা শিউলি ফুল। কাক-কোকিল, চিল-পায়রা, ময়না-শালিক, টিয়া-কাকাতুয়া, কত কথা কয়েছে নিজেদের ভাষায়। বুলিরা করেছে কত গান। চাদর মুড়ি দিয়ে শিশিরছাওয়া পথে কুয়াশা সরিয়ে-সরিয়ে এসেছে-গেছে শীত। তারপর এসেছে ঋতুরাজ সহাস্য বসন্ত, কুসুম-মঞ্জুরিত, অলি-গুঞ্জরিত, নবীন হাওয়ায় উড়িয়ে সুবাসিত উত্তরীয়।

সারদা বড় হতে থাকে পিত্রালয়ে গাঁয়ের অন্যান্য মেয়েদের মত। আপাত অন্যদের মত হয়েও তিনি ছিলেন অনন্যা। শান্তা, শিষ্টা, অচঞ্চলা, সহৃদয়া, কর্মকুশলা, সদা সেবাপরায়ণা। এ সময়ের সারদা সম্বন্ধে কালী-মামা বলেছিলেন:

"দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি কি না করেছেন। ধান ভানা, পৈতে কাটা, গরুর জাবর দেওয়া, রান্নাবান্না—বলতে গেলে সংসারের বেশী কাজই তো দিদি করেছেন।"[৬]

আরও কত কাজ করেছেন: গলাজলে নেবে গরুর জন্য ঘাস কাটা, মুনিষদের জন্য ক্ষেতে মুড়ি নিয়ে যাওয়া। ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে পঙ্গপালে কাটা ধান কুড়ানো। শ্যামাসুন্দরীর বাহুর বল, নয়নের মণি, গাঁয়ের সকলের আদরের ধন সারদা। তাঁর অন্তর্নিহিত দিব্যভাবের অঞ্জন যেন লেগেছিল সকলের চোখে।

এইভাবে চলা দিনগুলির পথে সারদা যখন তের বছরের কিশোরী (মে-মাসে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) কামারপুকুরে প্রত্যাগত রামকৃষ্ণ সারদাকে আহ্বান করলেন: "ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এস।"[৭] [ক্রমশঃ]

৬ স্বামী গম্ভীরানন্দ, শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ২৮
৭ তদেব, পৃঃ ৩৩

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূর্ব সংখ্যায় ব্রহ্মের প্রধান সপ্ত গুণের মধ্যে পঞ্চম গুণ 'জ্ঞানদাতৃত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'দাতৃত্ব' শব্দটির নূতন অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ, এস্থলে 'দাতৃত্ব' শব্দের অর্থ কোনো নূতন অপ্রাপ্ত বস্তুর দাতৃত্ব নয়; কিন্তু যা পূর্ব থেকেই আছে, সে সম্বন্ধেই কেবল নূতন অপ্রাপ্ত জ্ঞানের দাতৃত্বই মাত্র—তার বিষয়ে অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচিত ক'রে।

(৬) **মোক্ষদাতৃত্ব:** ব্রহ্মের ষষ্ঠ প্রধান গুণ 'মোক্ষদাতৃত্বে'র ক্ষেত্রেও 'দাতৃত্ব' শব্দটিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা একেবারেই চলবে না। অর্থাৎ, তিনিই যে আমাদের মোক্ষদান করেন, তাঁর প্রসাদেই যে আমরা মুক্তিলাভ করি—এসব সাধারণ অর্থের কথা এস্থলে কোনোক্রমেই আসতে

পারে না, যেহেতু তাতে স্ববিরোধদোষের উদ্ভব হবে অনিবার্যভাবেই।

অনেকেই হয়ত বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হবেন এই কথায়। তার কারণ হ'ল এই :

ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনে দুটি প্রধান মতবাদ দৃষ্ট হয়—(১) শঙ্করপ্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণের নিষ্ক্রিয়তাবাদ। এই মতানুসারে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, সকল প্রকার গুণশক্তিবিহীন; এবং প্রকৃত সৃষ্টি বলে কিছুই নেই। (২) রামানুজ-নিম্বার্কাদিপ্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈত-স্বাভাবিকদ্বৈতাদ্বৈত-বাদিগণের মতানুসারে ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়—বস্তুতঃ, সকল প্রকার দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণেরই এই মত। এক্ষেত্রে সক্রিয় ব্রহ্মের দুটি প্রধানতম কার্য হ'ল প্রারম্ভে সৃষ্টি, পরিশেষে মুক্তি। এরূপে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, প্রারম্ভে জীবকে সৃষ্টি ক'রে পুনরায় সংসারে প্রেরণ করেন; পরিশেষে তাঁকে স্বর্গ (বা নরক) এবং মোক্ষ দান করেন। সেজন্য, ভক্তিবাদী দার্শনিক মতবাদের সর্বত্রই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা ভগবানকে 'সৃষ্টিকর্তা' এবং 'মোক্ষদাতা' রূপে বন্দনা করা হয়েছে আবেগভরে। যথা—সকলের পরমপ্রিয় বিখ্যাত শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথাই ধরুন :

'ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥'

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৭৫)

তুমিই বিশ্বধারিণী দেবি!
তুমিই সৃষ্টিকারিণী।
তুমিই পালনকারিণী সদা
পরিশেষে ধ্বংসসাধিনী॥

পুনরায় :

'সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী।
ত্বাং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৭-৮)

'সর্বভূতস্বরূপা দেবী
স্বর্গমুক্তিদায়িনী'—
এইভাবে স্তুতা তোমার যোগ্যা,
কোন্ স্তুতি আর উপযোগিনী?
সকল জনের হৃদয়ে তুমি
বুদ্ধিরূপে স্থিতা অনিবার।
স্বর্গমুক্তিদায়িনি দেবি।
নারায়ণি! তোমায় নমস্কার॥

মুগ্ধ ভক্ত বলবেন, এতে আর আপত্তির কি আছে? বরং বলুন, কি সুমধুর, রমণীয়, রোমাঞ্চকর কথা এটি:—আমাদের প্রারম্ভেও তিনি, পরিশেষেও তিনি; সৃষ্টিতেও তিনি, মুক্তিতেও তিনি; আদ্যোপান্তই কেবল তিনিই; আমিও না, তুমিও না, অন্য কেউই না—এ ত সর্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর তত্ত্ব।

কিন্তু দার্শনিক বলবেন এক্ষেত্রে একেবারে অন্যকথা। বলবেন, এ কথা মনোমুগ্ধকর হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানমুগ্ধকর নয়। তার কারণ অন্বেষণ করতে ত আমাদের বেশী দূর যেতে হয় না, যেহেতু হাতের কাছেই ত রয়েছে আমাদের ভারতীয় দর্শনের অন্যতম মূল ভিত্তি 'কর্মবাদ'। এ বিষয়ে বহুবার পূর্বে বলা হয়েছে। সংক্ষেপে পুনরায় বলা চলে যে, এই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত যুক্তি-বিচারসম্মত মতবাদ অনুসারে, আমরা যে কর্ম ভেবে-চিন্তে, বুদ্ধি বিচার ক'রে সম্পূর্ণ স্বাধীন-রূপে একটি বিশেষ ফললাভের জন্যই সকাম-ভাবে সম্পন্ন করি, তার ফল অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ, ভালই হোক বা মন্দই হোক, তার ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে অবশ্যম্ভাবী-ভাবেই ন্যায়ের অমোঘ বিচারানুসারে। কিন্তু একজন্মে কৃত এরূপ অসংখ্য সকাম কর্মের ফলভোগ সেই জন্মেই সম্ভবপর না হ'লে ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারেই কর্মকর্তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবেই হবে তাঁর পূর্বজন্মে কৃত প্রাক্তন সকাম কর্মের যথোপযুক্ত ফলভোগের জন্যই—এর

অন্যথা কোনোক্রমেই হবে না। এটিই হ'ল ভারতীয় সুবিখ্যাত 'কর্মবাদে'র অচ্ছেদ্য অঙ্গ—তুল্য সুবিখ্যাত 'জন্মজন্মান্তরবাদ'। এই মতানুসারে এই নূতন জীবনে বদ্ধজীব পেলেন আরেকটি স্বর্ণ সুযোগ নিষ্কামভাবে কর্ম ক'রে ও উপযুক্ত সাধন অবলম্বন ক'রে মোক্ষলাভ করবার। অবশ্য, পূর্বের মত অজ্ঞানবশতঃ, তিনি যদি তা না করেন, কেবল পূর্বের মত সকাম কর্মই ক'রে যেতে থাকেন, তাহলে কেবল জন্মজন্মান্তরই হবে তাঁর সার—এক জন্মের সকাম কর্মের ফলে এবং সকাম কর্ম অনুসারে তাঁর হবে পুনর্জন্ম; সেই জন্মের সকাম কর্মের ফলে এবং সকাম কর্মানুসারে, তাঁর হবে পুনর্জন্ম। এইভাবে কর্ম → জন্ম → কর্ম → জন্মের অনাদি (অনন্ত নয়) সংসারচক্রে নিয়ত বিঘূর্ণিত হয়ে তিনি অশেষ-দুর্গতিগ্রস্ত হয়ে পড়বেন অনিবার্যভাবেই। কিন্তু যে জন্মে তাঁর অজ্ঞান দূর হয়ে যাবে, সুবুদ্ধির উদয় হবে, নিষ্কামভাব মনে আসবে, সেই জন্মেই সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্ম ক'রে এবং উপযুক্ত সাধন অভ্যাস ক'রে তিনি মোক্ষলাভে সমর্থ হবেন। এবং সেজন্য সেই জন্মই হবে তাঁর শেষ জন্ম এই পৃথিবীতে

এই ত হ'ল ভারতীয় দর্শনের অখণ্ডনীয় অতি যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সম্মত কথা—একে ত স্বীকার ক'রে নিতেই হয় আমাদের, তার ফল যাই হোক না কেন। অর্থাৎ, আমাদের স্বীকার ক'রে নিতেই হয় যে, আমাদের প্রাক্তন সকাম কর্মানুসারেই আমাদের সৃষ্টি; এবং আমাদের বর্তমান নিষ্কাম কর্ম ও সাধনানুসারেই আমাদের মুক্তি—এর ত আর ব্যতিক্রম হতে পারে না কোনোক্রমেই।

অন্য আরেকটি দিক থেকেও ত এরূপ 'কর্মবাদ' আমাদের অবশ্যপ্রয়োজনীয়। আমরা সংসারে দেখি যে, রয়েছে অসংখ্য দুঃখশোক, পাপতাপ। এ সবের জন্য দায়ী কে? ঈশ্বর যদি দায়ী হন, তাহলে ত তাঁকে বলতে হবে অতি নিষ্ঠুর, যেহেতু তিনি স্বেচ্ছায় এইভাবে জীবকে সৃষ্ট করছেন এক জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে, এক উত্তপ্ত লৌহকটাহে, এক প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরিতে।

পুনরায়, দেখুন চোখ মেলে—রাম শ্যাম যদু মধুতে কত প্রভেদ—রাম ধনী, শ্যাম দরিদ্র; যদু জ্ঞানী, মধু মূর্খ; হরি স্বাস্থ্যবান, হারু রুগ্ন; কালু ব্রাহ্মণ, ভুলু শূদ্র ইত্যাদি। এই সব বিভেদের কারণ যদি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হন, তাহলে ত তাঁকে বলতেই হয় পক্ষপাতদুষ্ট। সেক্ষেত্রে স্বয়ং ব্রহ্মের বিরুদ্ধেও আরেকটি অভিযোগও আনতে হয়; অর্থাৎ, তিনি হলেন কেবল নিষ্ঠুরই নন, পক্ষপাতদুষ্টও সমভাবে।

এজন্য মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'ব্রহ্মসূত্রে' বলেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে স্পষ্টতমভাবে: 'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ, তথা হি দর্শয়তি।' (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪)

'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে। কস্মাৎ? সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে, স্যাতামেতৌ দোষৌ—বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ। ন তু নিরপেক্ষস্য নির্মাতৃত্বমস্তি। সাপেক্ষো হি ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ—ধর্মাধর্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্মাধর্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ। ঈশ্বরস্তু পর্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ।' (ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, ২।১।৩৪)

অর্থাৎ, ঈশ্বরকে 'বৈষম্য' বা পক্ষপাতিত্ব এবং 'নৈর্ঘৃণ্য' বা নিষ্ঠুরতা দোষে অভিযুক্ত করা যায় না। কেন? যেহেতু তিনি নিজের মতানুসারে যথেচ্ছভাবে সৃষ্টি করেন না; করেন একটি বিশেষ শর্তানুসারেই কেবল, একটি বিশেষ কারণানুসারেই কেবল। কি তা? তা হ'ল জীবের নিজেরই ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য বা সকাম কর্ম। সেজন্য ঈশ্বরের কোনই অপরাধ নেই এক্ষেত্রে। তিনি মেঘের

মতই কাজ ক'রে যান। মেঘ নিরপেক্ষভাবে সর্বত্রই সমানভাবে বারিবর্ষণ ক'রে যায়। বিভিন্ন বীজ সেই বারিস্পর্শে স্ব স্ব প্রকৃতি বা স্বভাব বা অন্তর্নিহিত গুণশক্তি অনুসারে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়ে উঠে। সেজন্য মেঘ দায়ী নয় একেবারেই; কেবল সেই সেই বীজেরাই নিজেরাই দায়ী।

তাহলে এই দিক থেকেও ত আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম অবশ্যম্ভাবীভাবেই যে, জীব নিজেই নিজের সৃষ্টি ও মুক্তির জন্য দায়ী সম্পূর্ণভাবেই, নিজের কর্মানুসারেই। তাহলে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে 'সৃষ্টিকর্তা' ও 'মুক্তিদাতা' বলাই ত ভুল একেবারে—যখন জীব নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা, এবং নিজেই নিজের মোক্ষদাতা।

এরূপে, স্বীকার ক'রে নিতেই হয় যে, কর্মবাদ-মূলক ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের স্থান প্রায় নেই বললেই চলে—সবই জুড়ে আছেন কেবল জীব বা আত্মা।

তাহলে? তাহলে ত আমাদের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর 'সৃষ্টিকর্তা', 'মুক্তিদাতা' প্রভৃতি মতবাদও হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক ও অসত্য।

পরন্তু ভারতীয় ভক্তিবাদের আরেকটি প্রধান স্তম্ভ, অর্থাৎ 'ঈশ্বরপ্রসাদবাদ'ও হয়ে পড়ছে ঠিক তাই। এই সর্বজনবিদিত সর্বজনসমাদৃত 'ঈশ্বরপ্রসাদবাদ' অনুসারে ঈশ্বরের প্রসাদ বা কৃপা ব্যতীত জীবের মুক্তিলাভ হতেই পারে না একেবারেই, যতই না তিনি সাধনভজন করুন। সেজন্য এই মতানুসারে, মুক্তিক্রম এরূপ: নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি → জ্ঞানের উদয় → ভক্তির আবির্ভাব → ঈশ্বরপ্রসাদ → সাক্ষাৎকার → মোক্ষ।

সেজন্য সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রে এবং অন্যান্য স্থলেও পরমা জননীকে 'বরদা' প্রভৃতি নামে স্তুতি নিবেদন করা হয়েছে। যেমন শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথাই পুনরায় ধরুন—

'তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥'

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৬)

তিনিই সৃষ্টি করেন এই বিশ্বচরাচর।
প্রসন্না হলে তিনিই মুক্তির বর দেন সত্বর॥

এক্ষেত্রে জগজ্জননীকে একাধারে 'সৃষ্টিকারিণী' ও 'মুক্তিদায়িনী' রূপে বন্দনা করা হয়েছে, যে দুটি বর্ণনাতেই চিন্তাশীল দার্শনিক এবং কূটতার্কিক ন্যায়শাস্ত্রবিদের আপত্তি সমধিক।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আদ্যোপান্ত বারংবার বিশ্বজননীকে 'বরদা', 'অভ্যুদয়দা', 'ফলদা' (১।৫৬, ৪।১৫, ১৬, ২২, ১১।৩৫ ইত্যাদি) প্রভৃতি ব'লেও স্তুতি নিবেদন করা হয়েছে; এবং বারংবার 'প্রসীদ প্রসীদ' প্রভৃতি ব'লে তাঁর করুণাও ভিক্ষা করা হয়েছে। যথা, 'নারায়ণীস্তুতি' নামে বিদিত সেই সুপ্রসিদ্ধ বন্দনাগীতিতে বলা হয়েছে আকুলভাবে, আবেগভরে:

'দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমেশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥'

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৩)

হে ভক্তদুঃখহারিণি দেবি!
হও তুমি প্রসন্না।
হে অখিলবিশ্বজননি দেবি!
হও তুমি প্রসন্না॥
হে বিশ্বেশ্বরি দেবি!
হও তুমি প্রসন্না।
পালন কর দেবি বিশ্বভুবন
জগদীশ্বরি হয়ে প্রসন্না॥

এমন কি, জ্ঞানমূলক উপনিষদেরও একস্থলে বলা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে সুবিখ্যাত কঠোপনিষদে:

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥'
(কঠোপনিষদ্ ১।২।২৩)

এই আত্মাকে যায় না পাওয়া
বেদপাঠ দ্বারা কোনো দিন।
যায় না পাওয়া ধারণাশক্তি দ্বারা
বহুশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অমলিন ॥
তিনি যাঁকে বরণ করেন,
তিনিই লভেন তাঁরে নিশ্চিত।
তাঁরি নিকট স্বীয় স্বরূপ তিনি
করেন সদা প্রকাশিত ॥

ভারতদর্শনসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতে ত মনে হয় যেন স্ববিরুদ্ধ কথাই বলা হচ্ছে—

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥'
(গীতা, ৬।৫)

নিজেই নিজের উদ্ধার কর
করো না আত্মায় অবসন্ন।
আত্মাই আত্মার বন্ধু সনাতন
আত্মাই আত্মার শত্রু ভীষণ ॥

অথচ পরিশেষে সুস্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে ঃ

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥'
(গীতা, ১৮।৬৬)

সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে'
আমারি শরণ লও।
মুক্ত করব তোমা সর্বপাপ হতে
শোকাকুল নাহি হও ॥

এইটিই গীতার শেষ বাণী। তাহলে কি ভাবব যে, স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মোক্ষলক্ষ্যে নিয়ে যাবেন, তাঁর আশ্রয় যদি আমরা গ্রহণ করি সকল ধর্মকর্ম পরিত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণভাবে? অর্থাৎ, প্রথমে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগপ্রমুখ বিভিন্ন মার্গ সম্বন্ধে বিশদভাবে প্রপঞ্চনা ক'রে গীতা কি শেষে একমাত্র প্রপত্তিমার্গ, বা ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণরূপ মার্গকেই মুমুক্ষুর একমাত্র অবলম্বযোগ্য ব'লে নির্দেশদান করছে? তাহলে প্রথমে অত জোরের সঙ্গে, তুল্য সুস্পষ্টভাবে আত্মনির্ভর-শীলতাকেই প্রপঞ্চিত করা হ'ল কেন? আত্ম-নির্ভরশীলতা ও ঈশ্বরনির্ভরশীলতাকে কিরূপে সমন্বিত করা যায়?

আর উদাহরণের প্রয়োজন নেই। এইগুলি থেকেই ভারতীয় ধর্মদর্শনে ঈশ্বরপ্রসাদবাদ ('Theory of Grace') যে কত কেন্দ্রীভূত স্থান অধিকার ক'রে আছে, তা স্পষ্টতমভাবে বোঝা যায়।

কিন্তু তাহলে উপায় কি? একদিকে ন্যায়ের অমোঘ যুক্তি; অন্যদিকে ভাবের স্বতোৎসারিত স্ফূর্তি—কিরূপে উভয়কে সমন্বিত ক'রে আমরা বলব যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর মুক্তিদাতা, এবং আমরাও স্বমুক্তিসাধক? সত্যই কর্মবাদে বিশ্বাসী আমাদের ত বলতেই হবে মুক্তি আমাদের স্বসাধনা দ্বারা লভ্য ও প্রাপ্ত মহাধন; তা কারো সাহায্য বা প্রসাদ বা করুণার প্রতি বিন্দুমাত্রও নির্ভর করে না—কারণ, মুক্তি ত আমাদের ন্যায্য দাবী, যা আমরা নিজেদের স্বতন্ত্র শক্তি দ্বারাই লাভ করি, অন্য কারো অনুগ্রহ ভিক্ষা করার প্রয়োজন আমাদের কোথায় এস্থলে? তাহলে ব্রহ্ম মোক্ষ-দাতাই বা হলেন কিরূপে; এবং তাঁর অমূল্য করুণা বা প্রসাদেরই বা আবশ্যকতা কোথায়?

[ক্রমশঃ]

সোমনাথ

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

অনেক সমুদ্রঢেউ নিত্য দেখে-দেখে অকস্মাৎ
একদিন সূর্যালোকে সকালের আরব-সাগরে
মনে হোলো কেউ নেই, ঢেউ নেই, কূল নেই আর।
চোখে যা দেখেছি রূপ, কানে যতো তরঙ্গ-আরাব
এসেছে, সে কিছু নয়,—সমস্তই অলীক বিভ্রম
স্পর্শ, গন্ধ, রসনার স্বাদ—মানে ইন্দ্রিয়ের দান—
মনে হোলো সৃষ্টি যেন শূন্য, শূন্য,-শূন্যই পরম।
মন যেন চিহ্নহীন,—সে আমার প্রথম সোমনাথ।

গুর্জরের বহু স্মৃতি ক্রমেই বিলীন হয়ে যায়,
দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অবসানমূর্তি ক্ষীণ হয়,
রাজকোটে যে-ক'দিন ছিলুম সে-দৃশ্যেরা কোথায়?
আরো দূর অতীতের অতিক্রান্ত সমস্ত সময়
যেন একই কুহেলির আস্তরণ অথবা প্রপাত,
সমস্ত জীবনে যেন অভিব্যক্ত একই সোমনাথ।

আশ্রয়

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

উঠিল লীলার উর্মি অরূপ-সাগরে।
অবতীর্ণ মর্ত্যে ব্রহ্ম নররূপ ধরে'।
ব্রহ্ম যদি এল ধরা,—শক্তিও যে আসে।
সারদা-শকতি মিশে রামকৃষ্ণ-পাশে॥
রামকৃষ্ণ-সারদার এ দিব্য-জীবন—
ধরার কলুষগ্লানি করিছে খণ্ডন।
যে'বা অন্ধ, মোহবন্ধ দেখিতে না পায়—
এ দিব্য-জীবন বিনা নাহিক উপায়॥

ত্যাগ-ভক্তি-সেবা-প্রীতি-বিবেক-বিচার,
সর্ব দিব্য-গুণ যত্র মূর্ত একাধার,—
এই সেই পরব্রহ্ম যুগ্মরূপধারী ;—
শ্রেষ্ঠ কাম্য চিনি' লহ মোহ পরিহরি'।
চাও যদি মুক্তিপথ,—শান্তির আলয়,—
এ দিব্য-জীবন মূঢ়! করহ আশ্রয়।

বর্তমান সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী*

আমাদের প্রসঙ্গের শিরোনামের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি প্রশ্ন যেটি দুশ্চিন্তামূলক।

বর্তমানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা মানুষের চিরকালীন মনোধর্ম। এ দুশ্চিন্তা আগেও থেকেছে, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। দুশ্চিন্তা বর্তমানের সব কিছু নিয়েই। তা' সে কী সমাজব্যবস্থা, কী শিক্ষাসংস্কৃতি, শিল্প সাহিত্য কাব্যভাবনার রুচি রীতি নিয়ে, কী ন্যায়-অন্যায় শ্রেয়-অশ্রেয়ের মাপকাঠি নিয়ে, কী জীবনচর্যার পদ্ধতি নিয়ে, আর 'ধর্ম' বস্তুটা নিয়ে তো বটেই। 'বর্তমান'কে নিয়ে বর্তমান কাল চিরদিনই উৎকণ্ঠিত। সর্বদাই শঙ্কা ওই বুঝি সব যেতে বসলো।...'গেলো ঐতিহ্য, গেলো যুগযুগান্তর-সঞ্চিত ধ্যানধারণা আদর্শ ও চিরন্তন মূল্যবোধসমূহ। অতএব অবধারিত যে, সমাজ ধ্বংসের পথে দ্রুত ধাবমান, সভ্যতা শালীনতা সুরুচি সুনীতি সবই বিদায়ের পথে।'

তবে? দুশ্চিন্তা তো আসবেই।

এই মনোভাবের মধ্যে একটি কথাই সোচ্চার হয়ে ওঠে, ওইসব পরম মূল্যবান জিনিসগুলি তাহলে একদা 'ছিল'। বিশেষভাবেই ছিল। যেন 'এই সেদিনও ছিল', তবে যা দেখা যাচ্ছে, আর থাকবে না।...যেতে বসেছে।

কিন্তু যায় কি সত্যি? যায় না। গেলে পৃথিবী এ যাবৎকাল টিঁকে থাকতো না। মানুষের দুর্মতির ভারে কবে তলিয়ে যেতো। এ-সমস্যা তো শুধু সমকালের নয়, প্রবহমান আবহমান কালের। যে মানুষ আপন দুর্মতির বোঝা চাপিয়ে খেয়া তরীটিকে ডোবাতে বসে, সেই মানুষই আবার সহসা এক সময় আর্তনাদ করে ওঠে, 'গেল গেল ডুবে গেল! সবাই আমরা ডুবতে বসেছি।'

এই চৈতন্যের ধাক্কায়, সে তখন ভার সামলাতে বসে, চিন্তা করতে বসে কী করে রক্ষা হবে।

বিবর্তনের রীতি অনুসারে অহরহই তো ভাঙাগড়ার খেলা, অন্তরঙ্গে, বহিরঙ্গে। ভাঙনটা দেখলেই যুগ 'গেল গেল' বলে ভীত হয়। এই ভীতিটা অবশ্যই শুভলক্ষণ। অর্থাৎ মানবচিত্তের সহজাত শুভবুদ্ধির লক্ষণ। এই 'শুভবুদ্ধি' নামক 'ওষধিলতা'টুকুর সম্বলেই, মানুষের এই অনন্তকালের কালস্রোতে টিঁকে থাকা। এই ওষধিলতাটির জোরেই মানুষ সহস্র 'মার'-এর মুখোমুখি পড়েও মরে না। নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরে আসে।

তাই, আত্মকর্তৃত্বহীন হিতাহিত-জ্ঞানহীন, লোভের আর অসংযমের দাস, সাধারণ মনুষ্য সমাজের বাইরের চেহারাটি যেমনই হোক, তার অবচেতনে এই শুভবুদ্ধিটি কাজ করে চলে। মোক্ষম সময় এসে পড়লেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ ঠিক হচ্ছে না। এটা ভুল হচ্ছে। মানুষকে নির্ভুল হতে হবে, সঠিক হতে হবে।'

অথচ সেই 'সঠিক'টা যে ঠিক কী, সেটা কোনো কালেই ঠিক হয় না।...হয়তো কোথাও-না-কোথাও একখানা নির্ভুলের আদর্শ ছাঁচ আছে, থাকে, কিন্তু কে আসছে সেই আদর্শের ছাঁচে ঢালাই হতে? কে পারে অত খাটতে?

অতএব একদা কল্যাণকামী মহৎ চিন্তা থেকে 'মানুষে'র জন্যে 'মানুষ' হবার উপযুক্ত যে আদর্শ ছাঁচটি গড়া হয়, হয়তো পরমাগ্রহে গৃহীতও হয়, পরবর্তী কালে আবার সেই ছাঁচই অবহেলায় পরিত্যক্ত হয়। বলা হয়, 'এ-যুগে' ও অচল। নতুন ছাঁচ চাই, নতুন যুগের উপযুক্ত।

* জ্ঞানপীঠ ও রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিতা প্রখ্যাত লেখিকা।

'মানুষ' হয়ে ওঠবার চেষ্টাটা দেখতে পাওয়া যাক বা না যাক, মানুষ হবার উপযুক্ত একটা ছাঁচ গড়ার চেষ্টাটা যুগে যুগে দৃশ্যমান। কিন্তু মানুষ জাতটা এমনই বাউণ্ডুলে, কিছুই বেশীদিন ধরে রাখতে পারে না। কাজেই আবারও একই নাটকের পুনরভিনয়, আবারও পুরনো আদর্শ 'অচল' বলে পরিত্যক্ত, আবারও বেসামাল বর্তমানকে নিয়ে হিমশিম খাওয়া।

এছাড়া তো উপায়ও নেই, মানুষের মধ্যে যে অন্তরাত্মার অহরহ এ আর্তনাদও আছে, আরো কিছু করতে হবে! অন্য কিছু! যা করে চলেছি, তার থেকে বিশেষ কিছু, বেশী কিছু। 'নতুন কিছু।'

অন্তরাত্মার এই ব্যাকুলতাই প্রাণের লক্ষণ, কর্মের প্রেরণা। এই প্রেরণাতেই অবিরত অন্য কিছু করা। তাতে হয়তো ভুলও হয়। তবু ভুল করতে করতে আর ভুল শোধরাতে শোধরাতেই তো মানুষ তার উত্তরণের ইতিহাস রচনা করে চলেছে।

কাল অনন্ত, জীবন অনন্ত—একদা গুহা থেকে যে জয়যাত্রার শুরু, সেযাত্রা দুরন্তবেগে এগিয়ে চলেছে মহাকাশের অসীম শূন্যতা ভেদ করে।… এই আকাশভেদী অভিযান, ভুল হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে সে বিচার মহাকালের, তবে এই যাত্রা জানিয়ে চলে মানুষ ধ্বংস হবার পাত্র নয়। সীমাবদ্ধ জীবন তার জন্যে নয়।

তবু 'বর্তমান'কে নিয়ে হিমশিম খাওয়াও চলতেই থাকে। অথচ সে 'বর্তমান' তো অবিরতই অতীত হয়ে চলেছে।… আজকের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা, কালের বাতাসে ঝরে পড়ে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এসে দাঁড়ায় সদ্যোজাত 'বর্তমান'।

'অতীত' তখন মৃত পিতামহের ছবির মত মনের দেওয়ালে ঝোলে। সেই 'অতীতে'র কণ্ঠে তখন দোলে পূজার মালা।

বিগত পিতামহের ছবিতে মালা দোলাবার সময় কি মনে পড়ে পিতামহ রুক্ষ ছিলেন কি রাগী ছিলেন? কৃপণ ছিলেন, অথবা দুর্দান্ত শাসক ছিলেন? মনে পড়ে না! কারণ বিগতকে আমরা পূজার বেদীতে বসাতে ভালবাসি, ভালবাসি তাকে শ্রদ্ধা করতে, ক্ষমা করতে।

বিগত কালও যেন বিগত আত্মীয়ের মতই। তাকে পূজা করি শ্রদ্ধা করি, আর তার সব ভুল ত্রুটি, অনাচার অপরাধ, অসঙ্গতি বিকৃতি ভুলে গিয়ে ক্ষমা করে ফেলে, ভাবতে বসি, 'যা কিছু শুভ মহৎ আর কল্যাণকর, সব সেখানেই সঞ্চিত ছিল।…সেই মহান অতীতের উত্তরাধিকারী কি আজকের এই হিতাহিত জ্ঞানহীন বেয়াড়া-বেপরোয়া বর্তমান? যাকে কোনো মতেই বাগ মানানো যায় না!! চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এই উন্মার্গগামী আধুনিক কাল সমাজকে রসাতলে পাঠাবে, আর পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

সর্বদাই উদ্বেগ আশঙ্কা।

বললে হয়তো ভুল হবে না এই উদ্বিগ্ন অভিযোগের অধিকাংশটাই তৎকালীন 'সাহিত্য'কে দোষী করে। সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না বলেই জগতের সমস্ত পাপ-তাপ অন্যায় অসঙ্গতি বিচ্যুতি বিকৃতির দায়দায়িত্ব ওই সাহিত্যের ঘাড়ে চাপিয়েই, তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়।

পবিত্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ধারক-বাহকরা একদা রবীন্দ্রনাথকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে-ছিলেন, এ ইতিহাস কার না জানা? কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে শরৎচন্দ্রকেও।…তারও আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকেও একদিন 'পারিবারিক জীবনে বিষ-বৃক্ষের চারা রোপণের' অভিযোগে অভিযুক্ত করা

হয়েছিল, সে ইতিহাসও অনেকের জানা।… অভিযুক্ত করা হয়েছে আরো অনেক শক্তিশালী লেখককে।

পরবর্তী কালে 'কল্লোলযুগের' লেখকগোষ্ঠীর অদৃষ্টেও কম শাপ-শাপান্ত জোটেনি।…এবং সেই মহা পাপিষ্ঠ গোষ্ঠীর দ্বারাই যে সমাজ রসাতলে যাবে, এতে কারো দ্বিমত ছিল না।…

কালের নিয়মে সেই গোষ্ঠীই বাংলা সাহিত্যের শীর্ষে স্থান পেয়েছেন, তাঁরাই বাংলা কথাসাহিত্যকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরাই এখন সাহিত্যে নমস্য।

আসল কথা অভ্যস্ত রীতির উপর সহসা নতুন একটা রীতি এসে পড়লেই প্রথমটা চেঁচামেচি ওঠে, এবং ধরেই নেওয়া হয় ওই নতুনটা অনিষ্টকারী। ও ওর পকেটের মধ্যে ধ্বংসের 'বীজ নিয়ে এসেছে।' এ আশঙ্কা জীবন আর জগতের সর্ব ক্ষেত্রেই।… বিজ্ঞানের নতুন সত্য আবিষ্কারে আবিষ্কারকারকের ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড ঘটেছে, ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তও তো বিরল নয়। পরবর্তী কাল আবার সেই দণ্ডিতেরই মূর্তি গড়ে পূজা করেছে।

সাহিত্যের কাজও নতুন সত্যকে আবিষ্কার করা। যা সকলের চোখে ধরা পড়ে না, তা' সাহিত্যিকের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে যায়, তাই তার প্রকাশটা লোকের চোখ ধাঁধায়, সয়ে নিতে সময় লাগে। সেই 'সময়টুকু'র অবকাশে লেখকের ভাগ্যে জোটে লাঞ্ছনা, ধিক্কার, সমালোচনা।

সাহিত্যের বিচারের ভার সমকালের হাতে নয়, মহাকালের হাতে। কালের কুলোয় ঝাড়াই-বাছাই হতে হতে, যা উড়ে যাবার তা উড়ে যায়, যা থাকবার তা' গোলায় ওঠে।

তবে—কিছু কিছু কেবলমাত্র ভঙ্গীসর্বস্ব অক্ষম কলম অতি দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাতে, সাহিত্যের হাটে খানিকটা উৎপাত বাধায় বটে। যা দেখে আমরা বিরক্ত হই, উদ্বিগ্ন হই, এবং সেটাকেই 'বর্তমান সাহিত্যে'র নমুনা বলে ভুল করি।

এ আপদ থাকবেই। দেবতার মন্দিরের পিছনের বেলগাছে যেমন অপদেবতার আশ্রয়।

সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই মাঝে মাঝেই ওই অপদেবতাদের উৎপাতে শঙ্কিত হতে হয়, আশঙ্কা হয় ওদের উৎপাতে বুঝি বা ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন ঐতিহ্য বিঘ্নিত হচ্ছে, ওদের ওই বেপরোয়া কলমের তীক্ষ্ণ খোঁচায় সেই মহান ধারা বিপর্যস্ত হতে বসেছে।

ভয়টা অমূলকই। 'ভারতীয় সংস্কৃতি' কি এমনই ঠুনকো, যে সামান্য কিছু উৎপাতকারী অর্বাচীন কলমের খোঁচায় তার বিপর্যয় ঘটবে?

'ভারতীয় সংস্কৃতি'র সহনশক্তি অসীম, পরিপাক-ক্ষমতা অফুরন্ত। হাজার হাজার বছর ধরে তার উপর তো উৎপাত হয়েই চলেছে। ভয় হয়েছে সে বুঝি বিপরীত কোনো অপ-সংস্কৃতির কাছে আত্মবিক্রয় করে বসছে, হারিয়ে যেতে বসেছে তার মহান ঐতিহ্যসমেত।… কিন্তু তেমন ঘটনা কি ঘটেছে? আত্মবিক্রয় না করে মহাঅজগরের মতই সে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিয়ে অনায়াসে হজম করে চলেছে।…সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবির কণ্ঠে যে ঘোষিত হয়েছে, 'হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।' সেটাতো ভুল নয়?

পাশ্চাত্য শিক্ষা আর পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে, ভারতের বহিরঙ্গের চেহারার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে বটে সেও হয়তো কালচক্রের নিয়মানুসারেই। তবু ভয় পাবার কিছু আছে বলে মনে হয় না। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে',

এই তো ভারতের বাণী !

চিরদিনই সমাজের কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়, আত্মবিস্মৃত হয়, অধঃপতিত হয়, ধ্বংসের দেবতার কাছে আত্মবিক্রয় করে, কিন্তু সে তো সমুদ্রে বুদ্বুদ্।

কিছু ভারতীয় জন পাশ্চাত্য-প্রভাবান্বিত হয়েছে, অথবা হচ্ছে বলে কি ভারত তার সত্তা হারিয়ে বসেছে ? ভারত কি তার আত্মিক শক্তিতে দেউলে হয়ে গিয়েছে ?

তা' যদি হতো, তাহলে আজ অতিভোগে জর্জরিত ভোগবাদী দেশগুলি শান্তির আশায় ভারতের কাছে হাত পাততে আসতো না। আর বাংলার এক অখ্যাত গণ্ডগ্রামের 'পাগলছেলে গদাধর', আর চিরঅবগুণ্ঠনবতী কন্যা মা সারদাকে ভারত ছাড়িয়ে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরোতে হতো না।

চাকচিক্যহীন ক্ষুদ্র গ্রাম 'দক্ষিণেশ্বর' আজ বিশ্বের বিস্ময়স্থল।···বিস্ময়দৃষ্টি নদীয়ার ধূলিকণার প্রতিও। তবে ? তবে কেন ভাবতে বসবো ভারত নিঃস্ব হতে বসেছে ?

আমি চিরদিনই আশাবাদী। এবং কোনো দিনই মনে করি না এই বর্তমানকালটাই সব থেকে খারাপ ! তাই অনেকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠতে পারি না, 'নাঃ ! আশা করবার আর কিছু নেই। দেশটা পচে গেছে।'

অবশ্য আমার সীমিত বুদ্ধি ও সীমিত চিন্তাশক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই আমার এই বিনীত বক্তব্য, বারে বারে অনেক দুঃসময়ই তো পার করে এসেছে দেশ, বর্তমানে তার থেকে এমন আর কী দুঃসময় ? ভালোয় মন্দে মিশোনোই তো যুগ। কোনো যুগই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, অথবা ষোলআনাই উজ্জ্বল নয়।

এই সূত্রেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলি, সাহিত্যেও কোনো :কা লমাত্রই 'মহৎসৃষ্টি', অথবা কেবলমাত্রই 'অপসৃষ্টি' হয় না। বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। আপাতত তাকিয়ে দেখে তো দেখতে পাচ্ছি বর্তমান বাংলা সাহিত্য বেশ আশাপ্রদই। বাংলা সাহিত্য দিনে দিনেই বহু শাখাপ্রশাখায় সমৃদ্ধ হয়ে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। কাব্য কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক ইত্যাদি বাদেও প্রবন্ধসাহিত্য ভ্রমণসাহিত্য, এমন কি দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি ভূগোল ইতিহাস সব কিছু নিয়েই আকর্ষণীয় সাহিত্য রচিত হচ্ছে। জোয়ার এসেছে প্রবল বেগে।···সমাজের যে অনগ্রসর দিকগুলি এযাবৎকাল লোকলোচনের অন্তরালে অন্ধকারে পড়ে থেকেছে, সেই দিকগুলির আবরণ উন্মোচিত হচ্ছে। আদিবাসী, সাঁওতাল, কোলভীল, অরণ্যচারীরাও আজ সাহিত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, জানতে পারা যাচ্ছে, তাদের জীবনও সুখ দুঃখ আশা আনন্দ বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় স্পন্দিত হয়, তারাও নিজস্ব একটি 'সভ্যতা'র শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের মধ্যেও আশ্চর্য সুন্দর চরিত্র থাকে, থাকে মানবিকতাবোধ।

সাহিত্য নিত্য নতুন দিগন্তের দরজা খুলে দিচ্ছে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাববার চেষ্টা করে চলেছে, মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন করতে চাইছে। সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ লেখকের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, যাঁরা সত্যিই ভালো লিখছেন। ভালো লিখছেন আরো অনেকেই, মোটের মাথায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যের চেহারাটি বেশ সমারোহময়। তবে সর্বত্রই তো মূল্যবানের সঙ্গে মূল্যহীনের, ক্ষমতাশালীর সঙ্গে অক্ষম জনের সহাবস্থান তো ঘটেই থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন গাছের সঙ্গে আগাছা ! তাদের মধ্যে বিষাক্তলতাও থাকে, তবু পৃথিবীর ভূমির আর কতখানি অনিষ্ট সাধন করতে পারে তারা ? বরং আগাছারা মাটি শক্ত

রাখার কাজে লাগে।

দেশের সমগ্র ছাপাখানাই বেশ কিছুটা 'আগাছা'র ভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু 'ছাপালেখা' মাত্রেই তো সাহিত্য নয়! উপেক্ষা না করে, তাদের সম্পর্কে চিন্তা করতে বসা সময়ের অপচয়। যদিই বা বলা হয়, সাময়িকভাবেও, তারা দেশের সংস্কৃতির পরিপন্থী হচ্ছে, তবে এটাও ভাবতে হয়, বর্তমানে কি কিছু সৎসাহিত্যও রচিত হচ্ছে না? সৎ, মহৎ, মানবিকতাবোধসম্পন্ন? তারা ব্যর্থ হয়ে যাবে? ব্যর্থ হয়ে যাবে চিরায়ত সাহিত্যগুলি? ব্যর্থ হয়ে যাবেন রবীন্দ্রনাথ? ব্যর্থ হয়ে যাবে লক্ষ লক্ষ কপি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী, স্বামীজীর বাণী?

যুগযুগান্ত কাল হতে শত শত সাধক মহাসাধকের সাধনভূমি এই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী!

'সাহিত্যের অনাচারে ভারতীয় সংস্কৃতি বিপন্ন', এমন একটা হুজুগের কথা সর্বদাই শুনতে পাওয়া যায় বলেই, আমি আমার বিশ্বাসমত এই কথাগুলি চিন্তা করে থাকি, তাই বললাম। সকলেই যে আমার সঙ্গে একমত হবেন এমন নয়।

তবে সত্যিই যদি 'ভারতীয় সংস্কৃতি' আজ আপাতদৃষ্টিতে কিছু বিপন্ন হয়ে থাকে, তো তার জন্য দায়ী বর্তমান সাহিত্য নয়, বর্তমান রাজনীতি।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[কার্তিক ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

অ্যান্থ্রোপোলজি বা নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় স্বামীজীর বহুদর্শী মননের একটি সুন্দর পরিচয় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র 'শরীর ও জাতিতত্ত্ব' অংশে ফুটেছে। কত সরস করে যে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু প্রকাশ করা যায় তার নজির হিসাবে একটু নমুনা পাঠকদের দিই।

"আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্যদের লালচে সাদা রঙ, কালো বা লাল চুল, সোজা নাক চোখ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ ভেদে একটু তফাত। যেখানে রঙ কালো, সেখানে অন্যান্য কালো জাতের সঙ্গে মিশে এইটি দাঁড়িয়েছে। এঁদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত দু-চার জাতি এখনও পুরো আর্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুড়িজাত, নইলে কালো কেন হ'ল? কিন্তু ইউরোপী পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশুর লাল চুল জন্মায়। কিন্তু দু-চার বৎসরেই চুল ফের কালো হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।

"এখন পণ্ডিতেরা লড়ে মরুন! আর্য নাম হিঁদুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুদের নাম আর্য, বস্। কালো বলে ঘৃণা হয়, ইউরোপীরা অন্য নাম নিনগে। আমাদের তায় কি?"

আবার দুই সভ্যতার তুলনায় স্বামীজীর বিচিত্র-কল্পনাসঞ্জাত মন্তব্যের হাস্যরসও লক্ষণীয়—"আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদরোগে ফুসফুস রোগে এদের বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা কি প্রায় নিরুৎসাহ, বৈরাগ্যবান্ হয়? হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে আশা-বিশ্বাস

পুরো থাকে। ওলাউঠা রোগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারোগী মরবার সময় পর্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে। অতএব সেইজন্যেই কি ভারতের লোক সর্বদাই 'মরণ মরণ' আর 'বৈরাগ্য বৈরাগ্য' করছে? আমি তো এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; কিন্তু কথাটা ভাব্‌বার বটে।"—স্বামীজীর 'ভাব্‌বার কথা'-রসরচনাগুচ্ছ মনে করলে তাঁর সানন্দ রস-পরিবেশনের অন্তরালে তীব্র ব্যঙ্গের হুল-ফোটানোর ক্ষমতার কথা আমাদের মনে পড়বে। উদ্ধৃত রচনাংশটি কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দরস (হিউমার)। দুই সভ্যতার পোশাক ও ফ্যাশনের বর্ণনায় স্বামীজীর রসিকসত্তার সর্বত্র প্রকাশ। 'পরিচ্ছন্নতা'-সম্বন্ধে দু' সভ্যতার তুলনায়ও তাই। উদ্ধৃতি দিতে গেলে সব অংশই তুলে দিতে হয়। তবে একটি সেরা অংশ এইরকম—"সেদিন বিকালে [স্বামীজী বিদেশ থেকে লিখছেন] কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ী স্নান করতে টবের মধ্যে বসেছিল, সেইখানেই মারা পড়েছে!! কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ীর চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাত!!" পাশ্চাত্যে স্নানের অভ্যাস সেকালে প্রায় ছিল না বলেই এ কাহিনীর উৎপত্তি। একালেও আমাদের তুলনায় ওদের স্নানাদি অনেক কম!

দুই সভ্যতার অন্তর্নিহিত পার্থক্য বোঝাতে স্বামীজীর বর্ণনাভঙ্গীর অসামান্যতা বাংলাসাহিত্যে চলতিভাষার প্রকাশভঙ্গীর ও হাস্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—"আমাদের স্নান-করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে পরিষ্কার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেঁধে গোময়সিক্ত মাটির উপর থালসুদ্ধ অন্নব্যঞ্জন ঝাড়লে; বামুনের কাপড়ে থামছে ময়লা উঠছে। হয়তো মাটি ময়লা গোবর আর ঝোল কলাপাতা ছেঁড়ার দরুন একাকার হয়ে এক অপূর্ব আস্বাদ উপস্থিত করলে!!

"আমরা দিব্যি স্নান ক'রে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইউরোপে ময়লা গায়ে, না নেয়ে একটি ধপধপে পোশাক পরলে। এইটি বেশ ক'রে বোঝ, এইটি আগাগোড়ার তফাত—হিঁদুর সেই যে অন্তর্দৃষ্টি, তা আগাপাস্তলা সমস্ত কাজে। হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি—সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হ'ল, কাপড় যা তা হোক! বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হ'ল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন!··হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।"

আচার-বিচারের অন্তরালে থাকে জাতির জীবন দর্শন। সেদিক থেকে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জীবনযাত্রার ওই সরস বর্ণনাটি পরিহাসতরল হলেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক। এ দুই সভ্যতার সম্মেলনে—অন্তর ও বাহিরের পরিচ্ছন্নতার সমবায়ে যথার্থ আচার গড়ে উঠবে। এইটিই স্বামীজীর বক্তব্য। আসলে যারা বাইরের পরিচ্ছন্নতা মানে না তারাও 'মহা অনাচারী'। এদেশের রোগ, মহামারী ইত্যাদি তার নিয়ত প্রমাণ। এই কলকাতা শহরেই লক্ষ্য করবেন সামান্য স্বাস্থ্যনীতির প্রতিও এখন আমাদের কী উপেক্ষা। কফ, থুথু প্রস্রাব, শৌচ—সব কিছুই আজকাল রাস্তার উপরেই সেরে ফেলতে শিশু থেকে বৃদ্ধ, মূর্খ থেকে উচ্চশিক্ষিত—সকলেই সমান ব্যস্ত। আমরা কলকাতাবাসীরা আজ 'মহা অনাচারী'—তাতে সন্দেহ নেই!

রামানুজের উল্লেখ করে স্বামীজী আহার সম্বন্ধে বিভিন্ন দোষ নিয়ে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন। জাতিদোষ, আশ্রয়দোষ, নিমিত্তদোষ*

* "জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাজ লশুন ইত্যাদি

—এই তিনটি দোষের ধারণার মধ্যে 'আশ্রয়দোষ'-সম্বন্ধে ধারণা থেকেই যে ছুঁৎমার্গের উদ্ভব, স্বামীজীর এ মন্তব্যটি একালের সমাজতাত্ত্বিকদের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বামীজীর ভাষায়—"এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ—'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।' তবে অনেক স্থলেই 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে একটা কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।" স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন—'আমাদের ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।'

আমিষ-নিরামিষ প্রসঙ্গে স্বামীজী ধর্মজীবনের সহায়করূপে নিরামিষ, এবং কর্মময় জীবনের প্রয়োজনে আমিষাহারের পক্ষে। এই আলোচনার মধ্যেও স্বামীজীর স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গব্যঙ্গময় ভাষাভঙ্গী—"এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শুয়োর খেলে শুয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কোপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক।"

অজীর্ণ, বহুমূত্র ইত্যাদি জাতীয় রোগে স্বামীজী স্বাস্থ্যচর্চার উপরেই জোর দিতে বলেছেন—"হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই ক'রে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ—'ভাল ক'রতে পারব না, মন্দ ক'রব, কি দিবি তা বল্'। পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা!"

দেশ-বিদেশের রকমারি খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে পরিচয় সত্ত্বেও স্বামীজীর মন্তব্য—"আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি শুক্তো মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না।" নিজে কলকাতায় মানুষ হয়েও রান্নাবান্নার ব্যাপারে স্বামীজী পূর্ব-বাংলার নকল করতে বলেছেন—'উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া'—হিসাবে। একদিকে প্রাচীন পৃথিবীর খাওয়া-দাওয়া আর একদিকে একালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আহারাদির পর পর যে বর্ণনা স্বামীজী করে গেছেন তাতে রান্নাঘরের মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় অথচ প্রায়-অনুচ্চারিত দিক বাংলা-সাহিত্যে সুপরিবেশিত। ভেবে দেখ্‌লে রন্ধনশিল্প জগতের একটি সেরা শিল্প। যথার্থ খাদ্যরসিক এবং লোভী পেটুকের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। কিন্তু সংস্কারগুণে খাদ্য নিয়ে আলোচনা সাহিত্যে হাস্যরসের মাধ্যমেই আমরা বেশী করে থাকি। স্বামীজী কিন্তু হাস্যরসের মাধ্যমে রন্ধন-শিল্পের ইতিহাসের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সভ্যতার সার্থক, মনোজ্ঞ অথচ আনন্দময় আলোচনায় বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আহার ও পানের ব্যাপারে জলের বিশেষ ভূমিকা। তখনকার দিনে গঙ্গাজল এনে ফটকিরি দিয়ে শুদ্ধ করার নিয়ম ছিল। ফিলটারপদ্ধতির ত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ স্বামীজী লিখছেন—"গঙ্গাজল জালায় পুরে একটু ফটকিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতি ফিলটার-

উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হ'তে আসে; দুষ্টলোকের অন্ন খেলেই দুষ্টবুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট-কেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে।"
—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

মিলটারের চোদ্দপুরুষের মাথায় ঝাঁটা মারে, কলের জলের দুশো বাপান্ত করে।" চলতি কথার গালাগালকেও স্বামীজী সরসভঙ্গীতে তাঁর গদ্যরীতির নিজস্ব অলঙ্কার করে তুলেছেন—'মাথায় ঝাঁটা মারে', আর 'দুশো বাপান্ত' তার সরস উদাহরণ।

সব দেশেই 'পচা', 'রসা' জিনিসের প্রতি একশ্রেণী ভোজনরসিকের পক্ষপাত থাকে। চট্টগ্রামে বা মেদিনীপুর অঞ্চলে শুঁটকির জনপ্রিয়তা তার উদাহরণ। ইউরোপী ও ভারতীয়ের মধ্যে এ বিষয়ে তুলনা করে স্বামীজী লিখছেন—"ইউরোপীরা এখনও বন্য পশু পক্ষীর মাংস না পচলে খায় না। তাজা পেলেও তাকে টাঙিয়ে রাখে যতক্ষণ না প'চে দুর্গন্ধ হয়। কলকেতায় পচা হরিণের মাংস পড়তে পায় না; রসা ভেটকির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচবে, যত পোকা কিলবিল করবে, ততই উপাদেয়। পলায়মান পনীর-কীটকেও তাড়া ক'রে ধ'রে মুখে পুরবে—তা নাকি বড়ই সুস্বাদ!!" এরই পাশাপাশি তুলনায় এদেশে পেঁয়াজ-রসুন-খাওয়ার রকমারি—"নিরামিষাশী হয়েও প্যাজ-লশুনের জন্য ছোঁক ছোঁক করবে, দক্ষিণী বামুনের প্যাজ-লশুন নইলে খাওয়াই হবে না। শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ ক'রে দিলেন। প্যাজ, লশুন, গেঁয়ো শোর, গেঁয়ো মুরগী খাওয়া এক জাতের [পক্ষে] পাপ, সাজা—জাতিনাশ। যারা শুনলে এ কথা তারা ভয়ে প্যাজ-লশুন ছাড়লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমদুর্গন্ধ হিং খেতে আরম্ভ করলে! পাহাড়ী গোঁড়া হিঁদু লশুনে-ঘাস প্যাজ-লশুনের জায়গায় ধরলে। ও-দুটোর নিষেধ তো আর পুঁথিতে নেই!!"

বর্মাদেশের উল্লেখ স্বামীজী করেন নি—ওদের বিখ্যাত বা কুখ্যাত ফল 'ডুরিয়ান'-এর বা মাছ-পচানো 'নাপ্পি'র গন্ধ যাঁরা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে নিতে পেরেছেন, তাঁরা 'অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসা' সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন। মোটের উপর নানা দেশে নানাভাবে পচা বা দুর্গন্ধ জিনিসের সমাদর। সভ্যতার বিচারে এ সত্যও উপেক্ষণীয় নয়।

এই যেমন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে, তেমনি পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও স্বামীজী দুই সভ্যতার তুলনা করেছেন তাঁর নিজস্ব মজাদার ভঙ্গীতে। কথায় কথায় প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ-যুগের পোশাক সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য—"বৌদ্ধদের সময়ের যে সকল ভাস্কর্যমূর্তি পাওয়া যায়, তারা মেয়ে-মদ্দে কৌপীন-পরা। বুদ্ধদেবের বাপ কপনি প'রে বসেছেন সিংহাসনে; তদ্বৎ মাও বসেছেন—বাড়ার ভাগ, এক-পা মল ও এক-হাত বালা; কিন্তু পাগড়ি আছে!! সম্রাট ধর্মাশোক ধুতি প'রে, চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে একটা ডমরু-আকার আসনে ব'সে নাচ দেখছেন। নর্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ; কোমর থেকে কতকগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে। মোদ্দা পাগড়ি আছে। নেবু টেবু সব ঐ পাগড়িতে।"

পাগড়ির ব্যবহার সেকালে এবং একালেও যথেষ্ট। সেদিক থেকে মাথায় পাগড়ি সত্ত্বেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরাভরণ থাকা এদেশে আশ্চর্য নয়। হয়তো রৌদ্রপ্রধান দেশ বলেই এই কাণ্ড। তবে 'নেবু টেবু সব পাগড়িতে' —কথাটির একালে একটু ব্যাখ্যা দরকার।

গল্পে আছে—গৃহস্থ বাড়ীতে এক অতিথি এসে বললেন, আমার থলেতে নেবু টেবু সব আছে। কেবল রান্নার জোগাড়টা করে দিলেই আমি দুটি সিদ্ধ করে নেব। অতিথিকে কাঠ, চাল, তরকারি —সবই একে একে হাঁড়িকুড়ি সমেত দিতে হ'ল। সব দেওয়ার পর রান্না হয়ে গেলে গৃহকর্তা বললেন, আপনি যে বলেছিলেন, নেবু টেবু সব আছে, তা আপনাকে তো সবই দিতে হ'ল। উত্তরে অতিথি বললেন, এই যে দেখুন থলেতে নেবু রয়েছে। এই বলে থালা সাজিয়ে দিব্যি নেবুটি কেটে খেতে বসলেন।

সেই থেকে 'নেবু টেবু সব আছে' অর্থে সামান্য কিছু সামনে রেখে সব আদায় করার ফন্দী। স্বামীজী অবশ্য নর্তকীদের পাগড়ীতে 'নেবু টেবু সব আছে' অর্থে তাদের লজ্জাশরম যা কিছু ওই পাগড়ীতে বুঝিয়েছেন। প্রবাদ-প্রয়োগে স্বামীজীর সিদ্ধহস্ততার এ এক মোক্ষম উদাহরণ। [ক্রমশঃ]

মহাভূত মহাতীর্থ

শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ

[ফাল্গুন ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

তেজ

তিরুচিরাপল্লীকে বিদেশীরা বলতেন ত্রিচিনোপোলি। বস্তুতঃপক্ষে এ শহরের নাম ত্রিশিরাপল্লী। পুরাকালে তিন-শির এক দৈত্য ছিল এ-অঞ্চলের অধীশ্বর। এখন তিরুচিরাপল্লীর চলতি নাম তিরুচি। ট্রেনের সময়তালিকা ও রেলগাড়ীর নামেও 'তিরুচি' শব্দটিরই উল্লেখ থাকে।

তিরুচিরাপল্লী স্টেশন থেকে রাত ৯-৪০ মিনিটের তিরুচি-তিরুপতি এক্সপ্রেস ধরলে ভোর ৫-৫০-এ তিরুভন্নামালাইতে পৌছানো যায়। তিরুভন্নামালাইতে আছেন তেজোমহাভূতলিঙ্গম্। মাদ্রাজ থেকে তিরুভন্নামালাই-এর দূরত্ব ১৬৭ কিলোমিটার। ভিল্লুপুরম্-জংশনকে কেন্দ্র ক'রে যাঁরা পণ্ডিচেরী, চিদম্বরম্, তাঞ্জোর, তিরুভন্নামালাই প্রভৃতি তীর্থ ঘুরতে চান, তাঁরা ভিল্লুপুরম্ থেকে কাঠপাড়ি-শাখার ট্রেন ধরবেন। এই জংশন থেকে তিরুভন্নামালাই মাত্র ৬৮ কিলোমিটার। রেল-স্টেশনের এক মাইলের মধ্যেই মন্দির। গাড়ী স্টেশনে ঢোকার বহু আগে থেকে আন্নামালাই পর্বতের উচ্চচূড়া আর পর্বতের পাদদেশে মন্দিরের আকাশচুম্বী গোপুরম্ তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করতে থাকে।

পুরাণে আছে, একবার ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মধ্যে কে বড় এই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। ব্রহ্মা বলেছিলেন—'জগৎসৃষ্টিকারী আমি সমস্ত দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' বিষ্ণু বলেছিলেন—'কখনই না। সৃষ্টিরক্ষাকারী আমিই শ্রেষ্ঠ।' শিব ভাবলেন, এঁদের একটু শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। তিনি ২৬৬৮ ফুট উঁচু এই আন্নামালাই পর্বতশীর্ষে মহাজ্যোতির্ময় অগ্নিরূপে আবির্ভূত হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সেই তেজোময় অগ্ন্যুদ্ভব মূর্তির দিকে অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। বহুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ব্রহ্মা বললেন—'বিষ্ণু! চল, আমরা এঁর আদি-অন্ত খুঁজে দেখি।' তখন বিষ্ণু শূকর-রূপে শিবের পাদ-অনুসন্ধানে গেলেন। আর ব্রহ্মা গেলেন তাঁর শীর্ষ-অন্বেষণে, রাজহংসরূপে আকাশে ডানা মেলে। খানিকবাদে বিষ্ণু ফিরে এলেন বিরসবদনে। কিন্তু ব্রহ্মা এলেন সহাস্যমুখে, হাতে নিয়ে একগুচ্ছ কেতকী। বললেন—'আমি এই জ্যোতিষ্মানের অন্ত দেখে এসেছি। প্রমাণস্বরূপ এই দেখ এঁর কর্ণমূল থেকে নিয়ে এসেছি পুষ্প-গুচ্ছ।' ব্রহ্মার এই মিথ্যাভাষণে শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। অভিশাপ দিয়ে বললেন—'আজ থেকে মর্তে তোমার পূজা বন্ধ হ'ল।'

অপর এক পুরাণে আছে, পার্বতীর কাহিনী। কৈলাস থেকে নির্বাসিতা পার্বতী বহু তীর্থ ঘুরে অবশেষে এলেন এই তিরুভন্নামালাইতে। মর্ত-বাসিনী পার্বতীর নাম হ'ল অপিতকুচাম্বল। শিবপদকামী অপিতকুচাম্বল আন্নামালাই পর্বতের পাদদেশে এক বকুল বৃক্ষের তলায় বসে কঠিন

তপস্যায় রত হলেন। কত ঋতু তাপসীকে দেখে ফিরে গেল, কত বর্ষ, কত যুগ অতীত হ'ল, কিন্তু একনিষ্ঠ অপিতকুচাম্বলের তপস্যা ভঙ্গ হ'ল না। একদিন দেবীর ক্লিষ্ট মুখখানি দেখে শিবের হৃদয় আর্দ্র হ'ল। তিনি আন্নাপর্বতের চূড়া ভেদ ক'রে অগ্নি-আকারে পার্বতীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। আশীর্বাদ ক'রে বললেন—'দেবী! বর প্রার্থনা কর।' দেবী বললেন—'প্রভু, আর কিছুই চাই না। শুধু আপনার পরমপদে আমায় আশ্রয় দিন।' শিব 'তথাস্তু' বলতেই পার্বতী হর-অঙ্গে মিলিতা হলেন, জগতে অর্ধনারীশ্বররূপের প্রকাশ হ'ল। তিরুভন্নামালাই-মন্দিরে অর্ধনারীশ্বর-মূর্তির নিত্য-পূজা, নিত্য-আরতির ব্যবস্থা রয়েছে। এই অপূর্ব মূর্তিটি দর্শন করা মাত্র বালক সন্ন্যাসী তিরুজ্ঞান-সম্বন্ধরের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল এক অমৃতময় সঙ্গীত। তিনি গেয়েছিলেন—

'আন্নামালাই পুণ্যতীর্থে
প্রভু বিরাজেন পূর্ণ চিত্তে।
একাধারে তিনি পুরুষ ও নারী,
সৎ-এর হরষ, অসতের অরি।'

আন্নাপর্বতে আদিদেবের অরুণরূপ প্রকাশিত হয়েছিল। সেইজন্য পাহাড়টির নাম হয়েছে 'অরুণাচল'। মন্দিরে তেজোমহাভূতলিঙ্গমের নাম 'অরুণাচলেশ্বর'। অরুণাচলেশ্বরের আবির্ভাব-তিথিটি আজও মন্দিরের পুরোহিতরা পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন—কার্তিক মাসের কৃত্তিকাতিথিতে 'আন্নামালাইক্কু হরোহর' মন্ত্রে আন্নাপাহাড়ের চূড়ায় জ্বেলে দেন অগ্নিমশাল। দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে ভক্তজন অরুণগিরির সেই আলোকদীপ্তি দর্শন ক'রে অগ্নীশ্বরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মনে মনে প্রার্থনা ক'রে বলেন—'অগ্নীশ্বর! দগ্ধ বস্তুর মত আমায় নির্মল ও পবিত্র কর। আমার চিত্তের সব মলিনতা সকল অহঙ্কার দূর কর।' কৃত্তিকাতিথিতে অর্ধনারীশ্বর আসেন মন্দিরের বাইরে, অবিশ্বাসী-চিত্তে স্মরণ করান অপিতকুচাম্বলের একনিষ্ঠতার কথা।

পুরাকালে এই অরুণাচলে অগ্নি-আবির্ভাবের যথার্থতা আধুনিক কালের ভূতাত্ত্বিকরাও অনুমোদন করেছেন। আন্নামালাই ও আশপাশের মাটি পরীক্ষা ক'রে তাঁরা বলেছেন, বহু বছর আগে এখানে অগ্ন্যুদ্গার হয়েছিল। ভূপৃষ্ঠের তলদেশ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে এসে পর্বত ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। তাঁদের ভাষায় 'Annamalai is an igneous rock.' অগ্নি-ভূতলিঙ্গম্-মন্দিরটি তৈরি হওয়ার আগে লোকে আগ্নেয়গিরি আন্নামালাইকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করত, প্রদক্ষিণ ক'রে পুণ্য অর্জন করত। এখনও দাক্ষিণাত্যের আবালবৃদ্ধবনিতা বহু ভক্তিমান তীর্থ-যাত্রী সংকল্প ক'রে সুদীর্ঘ সাড়ে আট মাইল পর্বত-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেন। যাঁদের এই পুণ্য পদযাত্রা করবার সামর্থ্য নেই, তাঁরা মন্দিরচৌহদ্দী প্রদক্ষিণ ক'রেই সান্ত্বনা পান।

চব্বিশ একর জমি নিয়ে এই তেজোমহাভূত-লিঙ্গম্-মন্দিরের চৌহদ্দী। এখানে একের পর এক পাঁচটি প্রাকার, প্রাকারে সংলগ্ন কতকগুলি সু-উচ্চ গোপুরম্, আর দশটি তীর্থ আছে। প্রাকারগুলির নির্মাতা বিজয়নগরের রাজন্যবর্গ। প্রধান চারটি গোপুরমের মধ্যে পূর্ব গোপুরমটি পৃথিবীবিখ্যাত এবং আপন উৎকর্ষে অনুপম। তোরণটির নাম 'রাজগোপুরম্'। রাজগোপুরম্ উচ্চতায় ২১৭ ফুট, দক্ষিণদেশে সর্বোচ্চতম। এটির নির্মাণকাজ আরম্ভ করেছিলেন কৃষ্ণদেবরায়, সমাপ্ত করেছেন অস্তসেবাপ্পা নায়কার। ভূমির ওপর রাজগোপুরম্ দৈর্ঘ্যে ১৩৫ ফুট, প্রস্থে ৯৮ ফুট। সুবিশাল তোরণটির একাদশ 'তলছন্দ'। প্রথম পাঁচটি তল-গবাক্ষ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং পরবর্তী পাঁচটি তল-গবাক্ষ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ—এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের

প্রতীক। সর্বশেষ গবাক্ষটি হ'ল মন। মনের সঙ্গে সংযুক্ত মানুষের দশ ইন্দ্রিয় বহির্মুখী। এদের সংযত ক'রে অন্তর্মুখী করতে পারলেই আধ্যাত্মিক-মার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। অপিতকুচাম্বলের মত একাগ্রচিত্ত হয়ে পরমপদের ধ্যান করতে পারলেই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন হয়। ভক্ত-ভগবানের মিলিতরূপই তো হলেন অর্ধনারীশ্বর!

এখানে প্রত্যেকটি গোপুরমেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। অন্য তিনটি মুখ্য গোপুরমের নাম 'পে'-গোপুরম্, 'তিরুমঞ্চন্'-গোপুরম্, 'আম্মানিঅম্মল'-গোপুরম্। ছোট ছোট গোপুরমগুলির মধ্যে হোয়সলাদের তৈরি 'বল্লাল'-গোপুরম্ ও 'কিলি'-গোপুরম্ শিল্পে সৌন্দর্যে ভাস্কর্যে গুণিজনসমাজে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

প্রথম প্রাকার পার হ'লেই দেখতে পাওয়া যাবে প্রধান তীর্থ শিবগঙ্গা। এ ছাড়া অন্য নয় দিকে রয়েছে নয়টি পবিত্র পুষ্করিণী,—ব্রহ্মতীর্থ, ইন্দ্রতীর্থ, অগ্নিতীর্থ, ইমায়া, নৈঋ'ত, বায়ু, বরুণ, কুবের ও অশ্বিনী তীর্থ। প্রতি তীর্থের পাশে-পাশেই আছেন শিব, নাম শুধু তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন। পুণ্যার্থী যে পথ দিয়েই আসুন না কেন, যে দিক পানেই তাকান না কেন সর্বত্রই দেখবেন দেবাদিদেব শিবকে। শিবময় পুণ্যভূমি এই তিরুভন্নামালাই। তৃতীয় প্রাকারের মধ্যে পাওয়া যাবে সেই পৌরাণিক বৃক্ষ বকুল (Mimumsops elengi), একদা যাঁর ছায়ায় বসে তপস্যা ক'রে শিবপদকামী অপিত-কুচাম্বল তাঁর আপন অভীষ্ট লাভ করেছিলেন। ফলকামীরা এখন এ বৃক্ষের শাখায় শাখায় কাপড়ের টুকরো, সুতোর অংশ বেঁধে রাখেন। মনস্কামনা পূর্ণ হ'লে সুতো খুলে নিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে দেবতার পুজো দিয়ে যান।

অরুণাচলেশ্বর-মন্দিরেও সহস্রস্তম্ভের মণ্ডপ, শতস্তম্ভের মণ্ডপ আছে, স্তম্ভে স্তম্ভে খিলানে খিলানে দক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়া আছে, সর্বোপরি আছে বিত্তবান রাজাদের ভক্তি ও রুচির পরিচয়। অধিকাংশই কৃষ্ণদেবরায়ের কীর্তি। তবে মূলমন্দিরের চূড়াটি সোনার পাতে মুড়ে দিয়ে-ছিলেন মগদইমণ্ডলমের সামন্ত রাজা 'রাজরাজ-দেবন্'। এই পুণ্যকর্মের জন্য লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'পোন্পারাপ্পিনা মগদ্দেশন্'—অর্থাৎ মগদই দেশের সোনাছড়ানো রাজা। কিন্তু সকল বৈভব সকল প্রাচুর্যের মধ্যে যাঁর বসবাস তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী,—মহাতপস্বী মহাদেব। সামান্যতম পত্র-পুষ্প ফলে-জলেই তাঁর সন্তুষ্টিবিধান করা যায়। স্বর্ণমন্দিরের মধ্যে শিলাসনে বসে আছেন তেজো-মহাভূতলিঙ্গম্ অরুণাচলেশ্বর,—সনাতন শিবমূর্তি। এ-মূর্তির কথা স্মরণ করলেই চিত্তশুদ্ধি হয়, পুনর্জন্ম হয় না।[১]

অন্যান্য মহাভূততীর্থের মত এ-তীর্থও রঞ্জিত হয়েছে বহু সাধু, বহু নায়নারের পদধূলিতে। এসেছেন আপ্পার, তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর, মাণিক্যবাচকর্, সুন্দরর্, অরুণগিরিনাথর্। অরুণগিরিনাথরের তো সাধনক্ষেত্রই হ'ল এই তিরুভন্নামালাই, এখানেই তাঁর সিদ্ধিলাভ। সংসারে বীতরাগ হয়ে একদিন তিনি এসেছিলেন এই অরুণাচলতীর্থে। মনের গ্লানিতে বল্লাল-গোপুরমের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু লম্ফনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাঁকে দর্শন দিয়ে-ছিলেন সুব্রহ্মণ্যস্বামী (কার্তিক)। তাঁর তীরের ফলা দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর জিহ্বায় লিখে দিয়ে-ছিলেন 'সদাক্ষর মন্ত্র'। মন্ত্রলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মস্তিষ্কে কাব্যশক্তির উন্মেষ ঘটেছিল। আন্না-

---

১ তামিলভাষাভাষীরা বলেন—যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন তিরুভারুরে, যাঁর মৃত্যু হয় কাশীতে, যিনি চিদম্বরম্-মন্দিরে শিবারাধনা করেন তাঁর মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে পুণ্যবান অরুণাচলেশ্বরকে কেবলমাত্র স্মরণ করেন তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।

পর্বতের চূড়ায় বসে মহাকবি অরুণগিরিনাথর রচনা করেছিলেন তামিলভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্ভার 'তিরুপ্পুগল'। মানবদেহ ত্যাগ করবার পরও তিনি টিয়াপাখির রূপ নিয়ে কিলি-২ গোপুরমশীর্ষে বসে আবৃত্তি করতেন 'কান্দার অনুভূতি' কাব্য।

এ-যুগের আর এক মহাত্মারও সারাজীবন কেটেছিল এই তীর্থে। তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য সাধক মহর্ষি রমন। আন্নাপাহাড়ের গায়ে রমন-মহর্ষির আশ্রমটি অতি রমণীয়। আগে থেকে চিঠি লিখলে আশ্রমে রাত্রিবাসের সুবিধা মেলে। যাত্রীশালাটির ব্যবস্থাও অতি চমৎকার।

পাহাড়ের পূবঢালে অরুণগিরিনাথরের তপস্যা-ক্ষেত্র। সেখানে ছোট মন্দিরের মধ্যে আছেন তাঁর আরাধ্যদেবতা শ্রীসুব্রহ্মণ্যমস্বামী। এ মূর্তিটি অবশ্যই দর্শনীয়। অপরূপ সুব্রহ্মণ্যমমূর্তির শিল্প-চাতুর্য অবিস্মরণীয়।

[ক্রমশঃ]

২ তামিলভাষায় 'কিলি'-শব্দের অর্থ টিয়াপাখি।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষ

শ্রীমতী অনুভূতি বসু*

রাষ্ট্রসংঘ ১৯৮১ সালকে প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে আর সেটিকে উদ্‌যাপিত করার জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে ও হচ্ছে আর বিভিন্ন কর্মসূচীকে রূপায়িত করার তৎপরতাও চলছে। এখানে 'প্রতিবন্ধী' শব্দটিকে সীমিত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে তাদেরই জন্যে, যাদের রয়েছে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা। এদের মধ্যে আছে প্রধানতঃ দৃষ্টিহীন, বধির ও মূক, পঙ্গু, জড়বুদ্ধি, কুষ্ঠব্যাধিতে দৈহিক বিকল প্রভৃতিরা। যদিও এদের সঠিক পরিসংখ্যান নেই, তবু অনুমান করা হয়েছে যে, বিশ্বের প্রতি দশ জনের মধ্যে রয়েছে অন্ততঃ একজন প্রতিবন্ধী। সুতরাং এই বিপুল-সংখ্যক প্রতিবন্ধীর সীমাহীন সমস্যায় বিশ্বের সকল দেশই আজ জর্জরিত। সেই সমস্যা-গুলির উপলব্ধি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অনুকম্পামিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, গঠনমূলক পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগবিধি এবং সমতার ভিত্তিতে সমাজে প্রতি-বন্ধীর পূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবন্ধী বর্ষটি উৎসর্গীকৃত। যদিও একটি নির্ধারিত বৎসর-কালের মধ্যে এই সব প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব নয়, তবু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বর্তমানের চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প ও কর্মপ্রকল্প ভাবীকালে রূপায়িত হয়ে চির-উপেক্ষিত প্রতিবন্ধী জীবনকে সর্বার্থসার্থক করে তুলবে। সেই কারণেই এই প্রতিবন্ধী বর্ষকে মানুষের জয়যাত্রার একটা বিশেষ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

আবহমান কাল ধরে প্রতিবন্ধীরা সমাজের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয়, ঘৃণা ও বিদ্রূপের পাত্র হয়ে এসেছে, যদিও বর্তমানকালে সেই মনোভাবে কিছুটা শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। প্রাচীনকালে অনেক দেশে এদের প্রাণধারণের মৌলিক অধিকারটুকুও ছিল না, কোথাও বা এরা অপদেবতা বলে পরিগণিত হত। মধ্যযুগে ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী

* ই. সি. টি. ডি. (ম্যাঞ্চেস্টার)। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, বালিকা বিভাগ, কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয় এবং তদন্তর্গত শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা।

এরা পুণ্যার্থীদের চোখে দয়া ও করুণার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। ফলে এদের জীবন কিছুটা স্বীকৃতি লাভ করলেও তার দ্বারা কিন্তু প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভবপর হ'ল না। বর্তমানকালের বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন আনছে বলেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের দেহমনের নানা অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে। অক্ষমতার অন্তরালে যে সক্ষম ও বিপুল সম্ভাবনাময় দিকটি আছে তার পূর্ণ বিকাশের জন্যে উন্নত দেশগুলি উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করে অভাবিত সাফল্যলাভ করেছে। সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুনর্বাসনের বিভিন্ন দিকগুলিকে সমন্বিত করা হয়েছে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। শৈশবে রোগনির্ণয়, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসা, বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষা, সহায়ক যন্ত্রপাতি ও কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার, জীবিকা-অর্জনের সুযোগ ও জনশিক্ষার সুব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীরা সে সব দেশে দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠেছে আর তাদের অবদানে সমাজ সমৃদ্ধ হতে পেরেছে।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপর অনেকটা নির্ভর করে জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা ও সমাজ-সচেতনতা-বোধ। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আজ দারিদ্র্যে জর্জরিত, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে যে আমাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থাকবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! আমরা এদের দেহবৈকল্যটাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি, এদের অভিশপ্ত ও নিষ্ফল জীবনের জন্যে কখন-বা অনুকম্পা দেখাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। অথচ মানবসভ্যতার ইতিহাস যে বহু প্রতিবন্ধীর দ্বারা রচিত সেকথা ভুলে যাই। আমরা আত্মবিস্মৃত বলেই অষ্টাবক্রমুনি, হেলেন কেলার, মিলটন, রুজভেল্ট প্রভৃতি প্রতিভাধর প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ পরিচয় রাখি না।

প্রতিবন্ধী যেমন বিভিন্ন ধরনের হয়, তেমনি তাদের প্রতিবন্ধকতার কারণ, সূচনাকাল, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ তারতম্য থাকে। কারণ হিসাবে বলা যায় যে, মাতৃজঠরে শিশু থাকা কালে ও জন্মের সময় নানা অসাবধানতার জন্যে, জন্মের পর সংক্রামক ব্যাধি, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অপুষ্টির ফলে অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। আমাদের দেশে পোলিও একটা নিদারুণ রোগ, যার মারাত্মক আক্রমণে বহু শিশুই অচিরেই পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। মানুষ যাতে প্রতিবন্ধী না হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত। সেইজন্যে দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে সুচিকিৎসা লাভ করে তার ব্যবস্থা করা চাই। উপযুক্ত-সংখ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা দরকার, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে এই সুযোগ একান্তভাবেই সীমিত। প্রতিবন্ধীসৃষ্টি-কারী রোগ—যেমন পোলিও, বসন্ত, হাম ইত্যাদির সম্যক্ ও সত্বর চিকিৎসার প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাদ্য ও ওষুধপত্র সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে সরকারী, বেসরকারী ও জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

সুচিন্তিত কর্মসূচী ছাড়া প্রতিবন্ধীদের সার্বিক পুনর্বাসন সম্ভব নয়। সেইজন্যে শৈশবে রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার, ক্ষেত্র-বিশেষে বিশেষ ধরনের শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জীবিকার সংস্থান ইত্যাদির সুব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই মহতী প্রচেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই জনশিক্ষার মাধ্যমে দেশবাসীর সমাজ-সচেতনতাবোধকে জাগ্রত করা একান্তভাবেই অপরিহার্য। সুদীর্ঘকাল প্রতিবন্ধীদের বঞ্চিত করে মানবশক্তির অপচয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত ও রিক্ত হয়ে উঠেছে। আজকের এই প্রতিবন্ধী বর্ষ তারই অবসান প্রার্থনা করে আহ্বান জানাচ্ছে মানুষের শুভচেতনাকে, যাতে বিশ্ব-মানবের জয়যাত্রা সার্থক হতে পারে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

শ্রীশুভেন্দুমোহন ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রাচীন চীনা গ্রন্থাগার: কোনো চীনা গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি বটে তবে এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে যার থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, গ্রন্থাগার ছিল এবং তা চীনা সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ ছিল। শ্রীমা চিয়েনের (Sree-ma Chien) 'হিস্টরিকাল রেকর্ড' থেকে জানা যায় যে, চীনা দার্শনিক লাও-ৎসে একটি গ্রন্থাগারের পুস্তকরক্ষক (Keeper of books) ছিলেন। 'হিস্ট্রি অব্ দ্য ফরমার হান ডাইনাস্টি' (২০৬ খ্রীঃ পূঃ—২৩ খ্রীঃ) এই গ্রন্থে সূচীকরণের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন চীনদেশে গ্রন্থাগার ছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে গ্রন্থাগার: প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে, হাজার খ্রীঃ পূর্বাব্দের আগে পাথর, ধাতু, গাছের ছাল, তালপাতায় লেখা হ'ত এবং এই সমস্ত পুঁথিগুলি মন্দির-মঠ ও অভিজাতদের গৃহ-সংলগ্ন বাগ্‌দেবী-ভাণ্ডারে রক্ষিত হ'ত। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোনো গ্রন্থাগার নির্মাণের কথা শোনা যায়নি। বৌদ্ধযুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত ছিল। এই গ্রন্থাগারে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ, টীকা এবং এছাড়া অ-বৌদ্ধ বহু বিষয় যেমন বেদ, সাংখ্যদর্শন, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্র, কৃষি, চিকিৎসাশাস্ত্র, teleology (উদ্দেশ্যবাদ) ইত্যাদি সংরক্ষিত ছিল। খননকার্যের ফলে জানা যায় যে, গ্রন্থাগারটি সুনির্মিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, একটি সুবিস্তৃত স্থান নির্বাচিত করা ছিল গ্রন্থাগারের জন্য যার নাম ছিল 'ধর্মগঞ্জ'। বেশীর ভাগ গ্রন্থাগার-গৃহই ছিল বহুতল-বিশিষ্ট—এদের মধ্যে 'রত্ন-সাগর', 'রত্ন-দধি' ও 'রত্ন-রঞ্জক' এই তিনের নাম স্মরণীয়। সিংহল, চীন, তিব্বত, বর্মা, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে পণ্ডিতরা ও সাধুরা আসতেন জ্ঞান আহরণ ও আলোচনার জন্য। এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ, ই-ৎসিং ও ইউয়ান-চোয়াং। ই-ৎসিং ৪০০ মূল সংস্কৃত পুঁথির নকল করেছিলেন। তুর্কী হানাদার বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণে (ত্রয়োদশ শতাব্দী) নালন্দার গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হয়।

সৌরাষ্ট্রের বলভী (৭ম শতাব্দী), মধ্যভারতের বিক্রমশীলা (১২শ শতাব্দী), গান্ধারের (অধুনা পশ্চিম পঞ্জাব) তক্ষশীলা (৩য় শতাব্দী দক্ষিণ ভারতের নাগার্জুন—এই সমস্ত অঞ্চলে সুগঠিত গ্রন্থাগার ছিল জানা যায়। এতদ্ব্যতীত কাশী, মিথিলা, নদীয়ায় গ্রন্থাগার ছিল।

মুসলিম যুগ: খিলজী ও তুঘলক-বংশীয় শাসকরা (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী) সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল রাজপ্রাসাদে অথবা মসজিদে। আমীর খসরু (সুপণ্ডিত, সুকবি ও সুগায়ক) নিজে ছিলেন একজন গ্রন্থাগারিক। বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, গুজরাত, খান্দেশ এই সব রাজ্যের শাসকদের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল, কিন্তু এই সব গ্রন্থাগারে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না।

মুসলিম ভারতে শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়াই প্রথম সর্বসাধারণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থাগারে বহু পুঁথি ছিল এবং সকলের প্রবেশাধিকার ছিল।

ব্রিটিশ রাজত্বকাল: ১৮৩৬ সালে ক্যালকাটা

পাবলিক লাইব্রেরীর জন্ম হয় এবং মেট্‌কাফ হলে এই লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। ১৮৯১ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পত্তন হয়। ১৯০১ সালে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সংযুক্তি সাধন হয় লর্ড কার্জনের উদ্যোগে। ১৯০৩ সালে এই সংযুক্তীকৃত গ্রন্থাগার জনসমক্ষে উন্মুক্ত হয় এবং পরিশেষে ১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নব-নামকরণ হয় ন্যাশনাল লাইব্রেরী

আধুনিক কালের ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা করেন বরোদার শাসক দ্বিতীয় সায়াজিরাও। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরোদার রাজ্য গ্রন্থাগার-বিভাগের পরিচালক ও সংগঠক নিযুক্ত করেন আমেরিকার মিঃ ই. এ. বর্ডেনকে। দ্বিতীয় সায়াজিরাও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার (তিনি শকট-যানে গ্রন্থবহনের ও সেখান থেকে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন) ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার উন্নয়নেও মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের উদ্যমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (Bengal Library Association or BLA) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৩ সালে Indian Library Association স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সালে দিল্লীতে সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার (Public Library) নির্মাণের পরিকল্পনা নেয় যুগ্মভাবে Unesco ও ভারত সরকার। গ্রন্থাগারটি ১৯৫১ সালে দেশরাজকালিয়ার পরিচালনাধীনে ও তত্ত্বাবধানে খোলা হয়। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার Delivery of Books and Newspapers Act পাশ করেন। পরে ১৯৫৬ সালে বিধিটি পুনঃসংশোধিত হয় (amended) এবং Serialsও বিধিভুক্ত হয়। এই বিধি অনুসারে গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশের সাথে সাথে প্রকাশকরা তাঁদের প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা সেরা তিনটি কপি তিন স্থানে (কলকাতার National Library, মাদ্রাজের Connemara Public Library ও বোম্বাইয়ের Central Reference Library) পাঠাতে আইনতঃ বাধ্য। প্রেরিত গ্রন্থ ইত্যাদি সর্বভারতীয় প্রকাশনাসমূহের গ্রন্থপঞ্জী (INB or Indian National Bibliography) প্রতি মাসে প্রকাশ করা হয় [পূর্বে এটি ত্রৈমাসিক ছিল।]। অসমীয়া, বাংলা, ইংরেজী, গুজরাতি, হিন্দী, কানাড়া, মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, উর্দু, সিন্ধি—এই সব ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সূচীকরণের হদিস পাওয়া যায়। এছাড়া serial-এর প্রথম প্রকাশ লিপিবদ্ধ করা হয়। কেবলমাত্র শিশুপাঠ্যগ্রন্থ, মানচিত্র, সঙ্গীত, বোধিনী-জাতীয় গ্রন্থ, টেলিফোন-ডাইরেক্টরী ইত্যাদির নামের সূচী থাকে না।

১৯৫৬ সালে সংসদের (Parliament) বিধি অনুসারে University Grants Commission (U. G. C.) গঠিত হয় এবং এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসমূহের বিকাশ ও প্রসারের কাজকে অগ্রাধিকার দেয়।

লাইব্রেরী (Library) শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে কারোর মতে ল্যাটিন শব্দ 'Libraria' থেকে, যার অর্থ যে-স্থানে গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা রাখা হয়। আবার কারোর মতে ল্যাটিন শব্দ 'Liber' থেকেও 'Library' শব্দের উৎপত্তি [প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ার সেমিটিক উপজাতি ক্যাল্‌ডিয়রা গাছের ভিতরের ছালকে (inner bark or rind of tree) লেখার কাজে ব্যবহার করত এবং এই ছালকে তারা বলত 'leber'—এর থেকে ল্যাটিন শব্দ liber-এর জন্ম, যার অর্থ Book (গ্রন্থ) এবং তা থেকে ইংরেজী 'Library' শব্দের উদ্ভব।] ইংরেজী Book শব্দের ব্যুৎপত্তি Old English (অ্যাংলো-স্যাক্সন অর্থাৎ ইংরেজী ভাষার আদি

রূপ) ‘bōc’ শব্দ থেকে, যার অর্থ বীচ বৃক্ষ (Beech বৃক্ষ লেখার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হ’ত।)।

বর্তমানকালে, গ্রন্থাগার কেবলমাত্র গ্রন্থ দিয়ে ঠাসা একটি আলয় নয়। গ্রন্থাগার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার লীলাভূমি বা আবাসভূমি। বলা হয়, ‘library is a treasure-house with an open door।’ বর্তমানযুগে, শহর, মহকুমা, পল্লী, শিল্পালয়, হাসপাতাল, বিচারালয়, পত্রিকা-দপ্তর, সংগ্রহশালা—সর্বত্র গ্রন্থাগার রয়েছে এবং তা অপরিহার্য। চলিষ্ণু গ্রন্থাগার বা mobile library’র কথা আমরা জানি। [Mobile library বা ‘libra-chine’-এর মধ্যে স্থিত গ্রন্থাগার, যা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গ্রামবাসীদের কাছে গ্রন্থ আদান-প্রদান করে। পাশ্চাত্যদেশে mobile library খুবই স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের দেশে mobile library-র বিশেষ কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেই।]। গ্রন্থকে যারা যোগ্য মর্যাদা-দানে সদা-উৎসুক এবং যাঁরা গ্রন্থপ্রেমী তাঁদেরই মনোরঞ্জন করবার জন্য গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। সমাজ-জীবনের এক অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ হ’ল গ্রন্থাগার। এছাড়া, সার্বিক ও বয়স্ক শিক্ষার অনুকূল প্রসারের কাজে ও গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণে গ্রন্থাগারের একটি পালনীয় ভূমিকা আছে। তথ্যসঞ্চয় ও পরিবেশন গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্তব্য। যে-গ্রন্থাগারিক এই কাজ সুষ্ঠু ও নিখুঁত-ভাবে করতে সক্ষম হবে তথ্যসম্মিলন তথা সুবিন্যস্ত সজ্জিতকরণের মাধ্যমে সেই গ্রন্থাগারিকই আদর্শ গ্রন্থাগারিক।

পরিশেষে, গ্রন্থাগারের প্রতি কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটে সে সম্পর্কে দুই মনীষী রবীন্দ্রনাথ এবং লেনিন কি ভাবনা-চিন্তা করেছেন সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

‘লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ; নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অল্প চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে। যার অনেক টাকা আমাদের দেশে তাকে বড়ো-মানুষ বলে; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ-দানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহঙ্কার তৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়।…লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায় না। তার কারণ, সঞ্চয়বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।

“লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়িঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।…লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়।…যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। শুধু

পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে।"

সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যতম জনক—প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (লেনিন) বলতেন যে, গ্রন্থ একটি প্রচণ্ডতম শক্তি। আনাতোলি লুনাচারস্কি (সোভিয়েত জনগণের শিক্ষাবিষয়ক প্রথম প্রতিনিধি) মহামতি লেনিনের বক্তব্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেন—"আমাদের যত দ্রুত সম্ভব, পুস্তকসমূহকে জনগণের অভিগম্য করতে হবে। আমাদের অবশ্য প্রয়াসী হতে হবে রাশিয়ার সর্বত্র অধিকসংখ্যায় পুস্তক বিতরণ বা দানের জন্য।"

১৯৭০ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত IFLA (International Federation of Library Association)-এর সমাবেশের ৩৬তম পূর্ণ অধিবেশনে (Plenary Session) 'লেনিন ও গ্রন্থাগার' শীর্ষক একটি আলোচনা হয়। এই আলোচনা-সভায় সুইডেন, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইৎজারল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাব্লিক, পোল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া থেকে গ্রন্থবিজ্ঞানীরা এসে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। এছাড়া চল্লিশটি দেশ থেকে আটশো'র মত প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন

লেনিন গ্রন্থাগারের প্রতি প্রযত্ন ও গ্রন্থাগার-পরিচালনা সম্পর্কে সুচিন্তিত মতপোষণ করেছেন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করার কাজে গ্রন্থাগারের অনন্যসাধারণ ভূমিকার কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। লেনিন গ্রন্থাগার-আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন, যে আন্দোলন জনগণের জ্ঞান-আহরণের ঐকান্তিক আগ্রহকে বাড়াবে। তিনি চাইতেন যে, প্রতিটি সর্বসাধারণের গ্রন্থাগার বা Public library দেশের বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে অন্বিত হোক। জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থ-সরবরাহ, নতুন পাঠক-সভ্যবর্গের গ্রন্থাগারে সদস্যভুক্তি, কী দ্রুতির (Speed) সঙ্গে পাঠক-সভ্যের গ্রন্থ-চাহিদাকে মেটানো হচ্ছে, কতসংখ্যক গ্রন্থ বাড়িতে পড়ার জন্য দেওয়া হবে, শিশুরা কত-সংখ্যায় পাঠের প্রতি আসক্ত—ইত্যাদি ব্যাপারকেই লেনিন বলেছেন গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা পালন। অধিকসংখ্যক মানুষের সামনে গ্রন্থাগারের দ্বারোন্মোচন, গ্রন্থ-সংগ্রহের বৃদ্ধি, পাঠের সময়ের নির্ধারণ (রবিবার ও ছুটির দিন সমেত দৈনিক সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ১১টা অবধি), ১—১½ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা—ইত্যাদি দিক নিয়ে সুগভীর চিন্তার ফসল লেনিন আমাদের দিয়ে গেছেন। এছাড়া, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন, integrated library network (অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থাগার-পরিসেবা), রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ—এই সব প্রসঙ্গেরও অবতারণা করে গেছেন লেনিন।

বর্তমানকালে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে—'Information Science'। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়েও, 'গ্রন্থাগার ও তথ্য-বিজ্ঞান' (Library and Information Science, সংক্ষেপে Lib. Infor. Sc.)—এই অভিধা ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে।

কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারের নামোল্লেখ করছি:

১। Bibliotheque Nationale (Paris)
২। Bibliotheque Royale (Brussels)
৩। British Museum
৪। Lenin State Library
৫। Library of Congress (Washington D. C.)
৬। National Library (Calcutta)
৭। National Diet Library (Tokyo)

সমালোচনা

ইতিহাস মানচিত্রে : শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন। **প্রকাশক :** চণ্ডীচরণ দাস এণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫০, লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩। (ডিসেম্বর, ১৯৭৯)। পৃঃ ১১২, মূল্য : ২০.০০

যে কোন দেশের ইতিহাস ভালভাবে বোঝবার জন্য ঐতিহাসিক মানচিত্রের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য। কোন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার, এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক, বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রভৃতি সম্যক্ অনুধাবন করতে হলে আমাদের মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করতেই হবে। ইংরেজী ভাষায় এ ধরনের মানচিত্র অনেক আছে, যেমন **Pelican Atlas of World History, Chambers Atlas of World History, Hammond's Historical Atlas** ইত্যাদি। অবশ্য এই সব মানচিত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়েও ইংরেজী ভাষায় ভালো ঐতিহাসিক মানচিত্র রচিত হয়েছে, যেমন, C. Collin Davies রচিত **An Historical Atlas of the Indian Peninsula** (**প্রকাশক :** অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)। কিন্তু বাংলা ভাষায় এতদিন এ ধরনের মানচিত্রের একান্ত অভাব ছিল। অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন বহুদিনের এই অভাবটি দূর করে আমাদের দেশের সকল ইতিহাস-প্রেমিকের অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। এ-ব্যাপারে পথিকৃৎ-এর সম্মান অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।

অধ্যাপক সেনের গ্রন্থে ভারতীয় ইতিহাস পর্যায়ে ৩২টি মানচিত্র, বিশ্ব-ইতিহাস পর্যায়ে ২০টি মানচিত্র এবং প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার একটি মানচিত্র, সর্বসমেত ৫৩টি মানচিত্র স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া ভারতের নানা স্থানের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিল্প-নিদর্শন, বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তির প্রতিকৃতি এবং নানা যুগের ভারতীয় মুদ্রার আলোকচিত্রও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে বইটি বহুদূর সক্ষম হবে, সন্দেহ নেই। তবে আলোচ্য বইটিতে সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। পরবর্তী সংস্করণে সহজেই এগুলি দূর করা সম্ভব হবে মনে করে সংক্ষেপে এগুলির উল্লেখ করছি।

প্রথমত, কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক মানচিত্রের অভাব বইটিতে দেখা যায়। ভারতীয় ইতিহাস পর্যায়ে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের বিস্তার এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ-বিভাজনের সম্পর্কে কোন মানচিত্র এখানে নেই। ইউরোপীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মধ্যযুগ এবং আধুনিকযুগের প্রথম পর্বের প্রায় কোন মানচিত্রই বইটিতে স্থান পায়নি। আধুনিকযুগেও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের মানচিত্র এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মানচিত্র বইটিতে স্থান পেলে ইতিহাসের ছাত্রেরা উপকৃত হত। দ্বিতীয়ত, বইটির ৪৪ ও ৪৬ পৃষ্ঠায় মধ্যযুগের ভারতের মানচিত্র দুটিতে 'বাংলা দেশ' কথাটির ব্যবহার বর্তমানে বিভ্রান্তিসূচক হতে পারে। এর পরিবর্তে 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' লেখাই বোধ হয় সমীচীন হবে। ৯২ পৃষ্ঠায় উত্তর কোরিয়া ও আফগানিস্তানকে জোট-নিরপেক্ষ দেশ বলে দেখানো হয়েছে। এটা কি বর্তমানের বাস্তব চিত্র? মানচিত্রগুলির সঙ্গে অধ্যাপক সেন ছাত্রছাত্রীদের উপকারার্থে কিছু ঐতিহাসিক টীকা সংযোজন করেছেন। কিন্তু এই টীকাগুলির মধ্যে কোন

বিতর্কিত মন্তব্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ৬৯ পৃষ্ঠায় তাঁর বক্তব্য—'গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিনা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে এ স্বাধীনতা অর্জিত হল'—বহু ঐতিহাসিকের কাছেই গ্রহণ-যোগ্য হবে না। বইটির মধ্যে বহু ভুল বানানও আমাদের চোখে পড়েছে। 'উদিচ্য' (পৃঃ ১২), 'পদ্মপাণী' ও 'প্রতিদ্বন্দী' (পৃঃ ৩১), 'প্রাপ্তী' (পৃঃ ৮৬), 'সমেৎ' (পৃঃ ৯৫) প্রভৃতি ভুল বানান মুদ্রাকরপ্রমাদের নিদর্শন হলেও ছাত্রদের পক্ষে বিভ্রান্তিকর হবে। ১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত দুটি সংস্কৃত শ্লোকও ব্যাকরণগত অশুদ্ধিতে পূর্ণ। যে কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখালেই সঠিক পাঠ জানা যাবে। ৩৩ পৃষ্ঠায় 'কর্পূর মঞ্জুরী'র স্থলে 'কর্পূরমঞ্জরী' এবং ১৯ পৃষ্ঠায় 'মহিষমতি'র স্থলে 'মাহীষ্মতী' বোধ হয় শুদ্ধ পাঠ হবে (জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধান দ্রষ্টব্য)। ১১ পৃষ্ঠায় লেখক 'আর্য' লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু ৯ ও ২৩ পৃষ্ঠায় 'মৌর্য্য' কেন 'মৌর্য' হবে না? ৭০ পৃষ্ঠায় প্রাচীন গ্রীসের মানচিত্রে 'বাইজানসিয়ামের' স্থলে 'বাইজান্টিয়াম' বা 'বাইজান্তিয়াম' লেখা উচিত। পৃঃ ৩৫, ৫৩, ১০৭, ১০৯ ও ১১১-তে 'অতিরিক্ত পাঠের' বইগুলির নাম অতিরিক্ত ক্ষুদ্র হরফে মুদ্রিত হয়েছে। বইয়ের মধ্যে দুই পৃষ্ঠা-ব্যাপী (পৃঃ ৬-৭) ভারতীয় চিত্রশিল্পের নিদর্শন ও দুই পৃষ্ঠাব্যাপী (পৃঃ ৫৪-৫৫) মুঘল যুগের মুদ্রার ছবি বোধ হয় ছাত্রদের কাছে এর আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে, কিন্তু ঐতিহাসিক মানচিত্রে এগুলি অনাবশ্যক। মানচিত্রের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনে লেখক পরবর্তী সংস্করণে এগুলি বাদ দিলেও বইয়ের কোন অঙ্গহানি হবে না

উপরে যে ত্রুটিগুলির উল্লেখ করা হল সেগুলি কিন্তু এই বইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে সামান্যই ক্ষুণ্ণ করেছে। সমস্ত ইতিহাস-সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের কাছে, বিশেষত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে, বইটি দীর্ঘকাল একান্ত প্রয়োজনীয় সহায়ক পুস্তক হিসাবে আদৃত হবে। মুদ্রণ-পারিপাট্যের কথা বিবেচনা করলে বইটির মূল্যও অল্প বলেই এখন মনে হবে। আমি সর্বান্তঃকরণে এই বইয়ের দ্রুত ও বহুল প্রচার কামনা করি।

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ভক্ত নরসী: শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। প্রকাশিকাঃ শিউলি চৌধুরী, এ-৯।৪০৭ কল্যাণী, নদীয়া-৩৫। প্রথম প্রকাশ (২৬শে মাঘ, ১৩৮৭), পৃঃ ২০ + ১২৪, মূল্যঃ দশ টাকা।

সাধিকা মীরাবাঈ-এর সমসাময়িক গুজরাটে আর একজন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা সাধক নরসী মেহতার কথা শোনা যায়। তিনি ছিলেন গুজরাটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত-কবি। শোনা যায়, এই সাধকের ভজনের ভক্তি-আপ্লুত সুর মীরাবাঈকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। মহাত্মা গান্ধীও ভক্ত নরসীর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

'নিবেদনে' লেখক লিখেছেন, বই-এর ঘটনাবলীর উৎস 'ভক্তমাল' ও শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্যের 'ভক্ত নরসী মেহতা'। বই-এর আকারে গ্রথিত হওয়ার পূর্বে এটি 'আর্যদর্পণ' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

ভক্ত নরসী ভজনপাগল ছিলেন। ভজন গাইতে গাইতে তিনি এতই তন্ময় হয়ে পড়তেন যে, বাহ্যিক তাঁর কোন জ্ঞান থাকত না, ভজনের সুর ও ভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। তাঁর জীবনটিও ছিল যেন একটি সঙ্গীত। তাঁর জীবন-সঙ্গীতে সুর ও ভাব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সুর ও ভাব যখন ঐকতান সৃষ্টি ক'রে শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন ভক্তহৃদয় আপনা থেকেই ভক্তিরসে

আপ্লুত হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি ভক্তিমান উদার পাঠকমাত্রেই তাঁর জীবনচরিত পাঠে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠবেন, নিঃসন্দেহে।

গীতায় শ্রীভগবান বলছেন: যে-ভক্ত অন্য কোন চিন্তা না ক'রে সদাসর্বদা তাঁরই চিন্তা করেন, তিনি তাঁর সব ভার গ্রহণ করেন। তিনিই ভক্তকে সর্বদা রক্ষা করেন বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে। ভক্ত নরসীর জীবনে শ্রীকৃষ্ণই সর্বস্ব—তাঁর ধ্যানে-জ্ঞানে কৃষ্ণই বিরাজিত। তাঁর জীবনের এই শরণাগতির ভাবটি লেখক তাঁর সাবলীল ভাষায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক তাঁর যে-চিত্রখানি অঙ্কন করতে চেয়েছেন, তা অতি সুনিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। তাঁর শ্রম সার্থক হয়েছে। 'উজ্জীবন' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনৃসিংহ রামানুজদাস একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লেখায় বইটির মূল্য আরও বর্ধিত হয়েছে।

প্রচ্ছদপটে মুরলীধরের স্মিত হাসি ও ভক্ত নরসীর ভজনগানের তন্ময়তা যেন জীবন্ত। বইটির মধ্যে প্রুফ দেখার অসাবধানতার জন্য অল্প-কিছু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়লেও মুদ্রণাদি প্রশংসনীয়। ভক্ত পাঠক 'ভক্ত নরসী'র জীবন-কথা পড়ে নিঃসন্দেহে বিমল আনন্দ অনুভব করবেন এবং সাধনার পথে বইটি সহায়ক হবে ব'লে আশা করি। —ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

মোরভির বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে শ্রীসারদানগরের উদ্বোধন

বিগত ২১শে জানুআরি ১৯৮১, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মোরভির ভানালিয়া গ্রামের বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন করেন (ফাল্গুন ১৩৮৭ সংখ্যার পৃঃ ১০২-এ সংক্ষিপ্ত সংবাদ দ্রষ্টব্য)। এই উপলক্ষে তিনি গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বলেন:

'মোরভির বন্যা-বিপর্যয়ের কয়েক দিন পরেই আমি সেখানে যাই। সে-সময় এই গ্রামটি আমি দেখতেই পেলাম না। কিন্তু মোরভি শহরের কয়েকটি রাস্তা দেখে জনসাধারণের দুরবস্থায় আমি গভীর বেদনা অনুভব করি। আর স্বামী ব্যোমানন্দজী যেমন বলেছেন, সমস্ত দেশের পক্ষেও এটি ছিল একটি গভীর আঘাত এবং সমস্ত জাতি একযোগে আপনাদের দুঃখদুর্দশার ভাগ নিতে এগিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন যাতে মোরভি আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু গুজরাত ও ভারতের জনগণ যে-সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তারই ফলে আমরা মোরভির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা অতিক্রম করেছি। এই সাহস আমাদের জনগণের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, ভারত বহুবার সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে পড়েছে, তমিস্রাচ্ছন্ন দিনের দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করেছে, কিন্তু আমাদের জনসাধারণ, তাঁদের শ্রদ্ধা, সাহস ও শক্তির বলে এই সংকটের দিনগুলি অতিক্রম করেছেন। জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সাহায্য করার মতো লোকেরও কখনও অভাব হয়নি।

'রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার কথা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ। যেখানেই বিপদগ্রস্ত মানুষ দেখেন সেখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা এগিয়ে যান। দূরদুরান্তরে তাঁদের আশ্রম আছে, স্কুল আছে, হাসপাতাল আছে এবং সবরকমের সেবাই তাঁরা করেন, বিশেষ করে বন্যা বা খরা বা ভূমিকম্পের মতো বিপর্যয় যখন দেখা দেয়, তখন তাঁরাই সর্বপ্রথম সেইস্থানে গিয়ে চমৎকারভাবে ত্রাণকার্য শুরু করেন। দেখুন, কি করে এই

বিধ্বস্ত গ্রামটিকে আবার পুনর্নির্মিত করা হয়েছে—এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! আমি শুধু তাঁদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারি যে, এই গ্রামের অধিবাসী, যাঁরা নতুন জীবন, নতুন সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা যেন জীবনে নতুন উদ্দীপনা লাভ করেন, তাঁরা যেন তাঁদের কাজে সফল হন এবং সেবাভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

'যাঁরা এখানে এত কাজ করেছেন, আপনাদের সেবা করেছেন, তাঁদের আমি আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর এখানকার অধিবাসী আপনাদেরও আমার তরফ থেকে, ভারত সরকারের তরফ থেকে এবং সমগ্র ভারতের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যে সাহসের সঙ্গে আপনারা এই দুর্ঘটনার মোকাবিলা করেছেন, সেই সাহসের সঙ্গে যদি আপনারা দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যান, তাহলে নিঃসন্দেহে শুধু এই গ্রাম বা শহর নয়, সমগ্র দেশকেই উন্নত করতে পারবেন।

'আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ এবং আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

(সংক্ষেপিত ভাষণ)

ভক্তসম্মেলন

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিগত ২১শে হইতে ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮০ পর্যন্ত তিন-দিনব্যাপী তৃতীয় বর্ষের ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ৭২ জন ভক্ত যোগদান করিয়া দৈনন্দিন অনুষ্ঠানসূচীর কার্যে সাহায্য করেন। ২১শে প্রত্যুষে আশ্রমবিদ্যার্থিভবনের ছাত্রগণ স্তবপাঠ করে এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বেদশাস্ত্রী বেদপাঠ করেন। এরপর স্বামী বিশোকাত্মানন্দজী সমবেত ভক্তগণের উদ্দেশে স্বাগত ভাষণ দেন। সকালে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ গীতাপাঠ ও কথামৃতপাঠ এবং বিকালে ঈশোপনিষদ্‌পাঠ ও আলোচনা করেন। রাত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ করেন স্বামী গহনানন্দ ও স্বামী স্মরণানন্দ। ২২শে গীতাপাঠ করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। বিকালে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করেন স্বামী গহনানন্দ ও স্বামী স্মরণানন্দ। রাত্রে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' এবং স্বামী অমলানন্দ 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৩শে সকালে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ গীতাপাঠ এবং স্বামী অমলানন্দ কথামৃতপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারতির পর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল ভজনসঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ সমাপ্তি-ভাষণ দেন।

আবির্ভাব-তিথি ও পূজা-তিথির সূচী

বাংলা ১৩৮৮ সাল, ইংরাজী ১৯৮১-৮২ খ্রীঃ

আবির্ভাব-তিথি

শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	২৫ বৈশাখ	শুক্রবার	৮ মে	১৯৮১
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	৪ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	১৮ মে	„
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	১৩ শ্রাবণ	বুধবার	২৯ জুলাই	„
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৩০ শ্রাবণ	শনিবার	১৫ আগষ্ট	„
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	৭ ভাদ্র	রবিবার	২৩ আগষ্ট	„
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১২ ভাদ্র	শুক্রবার	২৮ আগষ্ট	„
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	৬ আশ্বিন	মঙ্গলবার	২২ সেপ্টেম্বর	„

স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	১২ আশ্বিন	সোমবার	২৮ সেপ্টেম্বর	১৯৮১
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী	২৩ কার্ত্তিক	সোমবার	৯ নভেম্বর	„
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২৫ কার্ত্তিক	বুধবার	১১ নভেম্বর	„
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	২০ অগ্রহায়ণ	রবিবার	৬ ডিসেম্বর	„
শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	২ পৌষ	বৃহস্পতিবার	১৭ ডিসেম্বর	„
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	৬ পৌষ	সোমবার	২১ ডিসেম্বর	„
শ্রীযীশুখৃষ্ট	—	৯ পৌষ	বৃহস্পতিবার	২৪ ডিসেম্বর	„
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	১৭ পৌষ	শুক্রবার	১ জানুয়ারী	১৯৮২
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	২৪ পৌষ	শুক্রবার	৮ জানুয়ারী	„
শ্রীশ্রীস্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	২ মাঘ	শনিবার	১৬ জানুয়ারী	„
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	১৩ মাঘ	বুধবার	২৭ জানুয়ারী	„
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	১৫ মাঘ	শুক্রবার	২৯ জানুয়ারী	„
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	২৫ মাঘ	সোমবার	৮ ফেব্রুয়ারী	„
শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	১৩ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	২৫ ফেব্রুয়ারী	„
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		১৬ ফাল্গুন	রবিবার	২৮ ফেব্রুয়ারী	„
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২৫ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	৯ মার্চ	„
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২৯ ফাল্গুন	শনিবার	১৩ মার্চ	„

পূজা-তিথি

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	১৮ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	১ জুন	১৯৮১
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	২ আষাঢ়	বুধবার	১৭ জুন	„
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	১৯ আশ্বিন	সোমবার	৫ অক্টোবর	„
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১০ কার্ত্তিক	মঙ্গলবার	২৭ অক্টোবর	„
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১৬ মাঘ	শনিবার	৩০ জানুয়ারী	১৯৮২
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১০ ফাল্গুন	সোমবার	২২ ফেব্রুয়ারী	„

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ৮ই জুলাই ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ১৯শে জুলাই ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত-

এই পরিচ্ছেদের (১।৪।১) শুরুতেই মাষ্টার-মশাই গীতা থেকে 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা' (২।২০) শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শ্লোকটির তাৎপর্য : আত্মা কখনও জন্মান না বা মরেন না। আত্মা নিত্য, শাশ্বত, পুরাতন। দেহ হত হলেও আত্মা হত হন না।

এই উদ্ধৃতিটি কেন দেওয়া হ'ল, সেটি আমরা পড়তে পড়তে বুঝতে পারব।

পরিচ্ছেদটি আরম্ভ হচ্ছে চিত্রময় বর্ণনের মাধ্যমে। অপূর্ব লেখন-ভঙ্গির দ্বারা মাষ্টারমশাই পরিবেশ ও ঘটনাবলীর একটি নিখুঁত চিত্রপট আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশের ওপর, ভক্তেরা মেঝেতে। পশ্চিমের দরজা দিয়ে শীতের স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। জীবন্ত বর্ণনা! যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর দর্শন করেছেন, তাঁদের কাছে এই বর্ণনা আরও সুন্দর মনে হবে, তাঁদের স্মৃতিকে উদ্দীপিত করবে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা বলা হচ্ছে। তিনি ছিলেন অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর। চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে আছে, অদ্বৈতাচার্যের আকর্ষণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বলা হয়েছে তাঁর হুংকারে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। পরম বৈষ্ণব বংশে জন্ম হলেও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মধ্যে প্রথম দিকে বৈষ্ণবভাবের বিকাশ দেখা যায় নি। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের বেতনভুক্ আচার্য ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সব মত মেনে নিতে না পারার জন্য মানসিক কষ্টে ভুগছিলেন। সে যাই হোক, তাঁর মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের বীজ সুপ্তাকারে অপেক্ষা করছিল—মাষ্টারমশায়ের মতে—ভবিষ্যতের জন্য। ঠাকুরের ভক্তিভাব তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো, শিষ্যের মতো, ছাত্রের মতো, তাঁর কাছে এসে বসে থাকেন তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবতী কথা শোনেন, তাঁর সঙ্গে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য করেন। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে তাঁর সুপ্ত ভক্তিভাব বিকাশলাভ করল।

'বিষ্ণু' নামে একটি ভক্তের এঁড়েদয়ে বাড়ি। সে আত্মহত্যা করেছে। আজ তারই কথা প্রথমে উঠেছে। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ঈশোপনিষদে আছে :

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

(তৃতীয় মন্ত্র)

—যে-সব লোকেরা আত্মহত্যা করে, তারা মৃত্যুর পরে অসুরদের সেই সব লোকে যায় যা গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন।

অবশ্য আচার্য শংকর এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আত্মা বিদ্যমান থাকলেও অবিদ্যার-জন্য যাদের আত্মবিষয়ক জ্ঞান নেই, সেই অবিদ্বানেরাই আত্মঘাতী। এই দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা প্রায় সবাই আত্মঘাতী। আমরা কজন আর আত্মজ্ঞানের জন্য চেষ্টা করি এবং পাই? আমাদের মৃত্যুর পরে কি দুর্দশা হবে? না, অন্ধতমসাবৃত সেই সব আসুরিক লোকেই আমাদের গতি হবে। কাজেই আত্মজ্ঞানলাভ ক'রে আমাদের ঐ আত্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে। কিন্তু সাধারণ অর্থে আমরা একথা বলি যে, যে লোক আত্মহত্যা করে, তার আসুরিক গতি হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। সেই কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে বলছেন : 'বোধ হয়—শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হয়ে গেল।'

ঠাকুর দেখেছেন যে, ঐ ছেলেটির আধ্যাত্মিক সম্পদ ছিল, যেটি আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা যাবে না। তার পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার ছিল, সেই জন্মে অনেক কিছু করা ছিল। যেটুকু বাকী ছিল সেইটুকু শেষ হয়ে যেতেই সে এজন্মে শরীরটা ছেড়ে দিল। এই শরীরের আর কোন দরকার ছিল না তার।

সংস্কারের প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, কিভাবে পূর্বসংস্কার কাজ করে। একটি সুন্দর উপমা দিয়ে সেটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন : "পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শবসাধন করছিল, গভীর

বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগলো ; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। শব আর পূজার অন্যান্য উপকরণ তৈরী দেখে, সে নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ করতে করতে মা দর্শন দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও।' মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে, 'মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি! যে-লোকটি এত খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এতদিন ধরে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হল না। আর আমি কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'ল!' ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, 'বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা মনে নেই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এমন জোটপাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল কি বর চাও?'"

তন্ত্রে শবসাধনার কথায় বলা হয়েছে, এটি অত্যন্ত কঠিন, বিপদসংকুল গুহ্য সাধন ; তবু এর দ্বারা শীঘ্র দেবীর দর্শন পাওয়া যায়। এই সাধনার স্থান, কাল, অধিকারী ইত্যাদি সম্বন্ধে তন্ত্রে অনেক বিধি-বিধান আছে। বিধি অনুসারে একটি শব সংগ্রহ ক'রে আনতে হবে। সাধারণতঃ শ্মশানেই এই সাধনা করতে হয়। শবকে স্নান করিয়ে তার উপর আসন রেখে তাতে বসে শবের চুলে শক্ত করে ঝুঁটি বেঁধে যথাবিধি আনুষঙ্গিক ক্রিয়াদির পরে জপ করতে হবে। এতে শবের চেতনা আসবে। তার মধ্যে দেবতার আদেশ হবে। অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি না হ'লে এ সাধনা সম্ভব হয় না, সাধক ভয়ে পালিয়ে যায়। নানারকম বিভীষিকাও দেখা যায়। সাধক যদি নির্ভয়ে যথাকৃত্য সম্পন্ন করতে পারেন, তাহলে দেবী আবির্ভূত হয়ে তাঁকে অভীষ্ট বরদান করেন। শবসাধনায় সিদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত সাধক মৌনাদিব্রত পালন করবেন। এই হচ্ছে শবসাধনার মূল কথা।

আমরা দেখলাম শবসাধককে বাঘে নিয়ে গেল আর যে-ব্যক্তি ভয়ে গাছের ওপর উঠেছিল সে শবসাধনার ফল পেয়ে গেল। দেবী জানিয়ে দিলেন যে, সে তার জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফল এ-জন্মে পেয়ে গেল। কাজেকাজেই ইহজন্মের যে ক্রিয়মাণ কর্ম, কেবলমাত্র সেইটিই সব ফলের কারণ নয় ; প্রাক্তন যে-কর্ম সেটিকেও হিসাবে আনতে হবে। পূর্বপূর্বজন্মে যে-কর্ম করা ছিল, তার কিছু ফল হয়তো আগেই ভোগ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই প্রাক্তন কর্মের অবশিষ্ট ফল পর-জন্মে ভোগ হয়। আবার এ-জন্মের যা করা হচ্ছে, তার কিছু অংশ পরজন্মে ফলপ্রসূ হবে। সেইজন্য এই জন্মে যাতে ভাল কাজ করতে পারি, পুরুষকারের দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে পারি, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কারণ, পূর্বপূর্বজন্মের কর্ম যা এ-জন্মে ফল দেবেই, সেই প্রারব্ধফল কর্মের ওপর আর হাত নেই। তার ফল ভোগ করতেই হবে।

এখন আবার সেই প্রথম প্রসঙ্গ—বিষ্ণুর কথায় ফিরে গিয়ে এক ভক্ত বলছেন, আত্মহত্যার কথা শুনলে ভয় হয়। বিষ্ণুর কথা আলাদা—ঠাকুর তা বলেছেন। এখন সাধারণ লোক আত্মহত্যা করলে তার ফল কি হবে তাই বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন যে, 'আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, আর সংসারযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।' বিষ্ণুর কথা স্মরণ ক'রে ঠাকুর বলছেন: 'তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোনার

প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙ্গে ফেলতেও পারে।' অর্থাৎ বিষ্ণুর আত্মহত্যায় কোন দোষ হয় নি। এই কথা ব'লে আবার আর একজনের কথা নিয়ে আসছেন। বলছেন: 'অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটি ছোকরা আসতো, উমের কুড়ি বছর হবে, গোপাল সেন। যখন এখানে আসতো তখন এত ভাব হতো যে হৃদয়কে ধরতে হতো—পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে যায়! সে ছোকরা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে—আর আমি আসতে পারবো না—তবে আমি চললুম। কিছুদিন পরে শুনলুম যে, সে শরীর ত্যাগ করেছে।' এখানে খুব স্পষ্টভাবে কিছু বলা না হলেও যে-প্রসঙ্গের মধ্যে এটিকে এনে ফেলা হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে সেই গোপাল সেনও শরীর ছেড়ে দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। এখন আমরা বুঝতে পারছি প্রথমেই কেন মাষ্টার-মশাই বললেন, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—যিনি জ্ঞানী তিনি বুঝতে পারেন যে, শরীর গেলেও তিনি মরেন না। সাধারণের মনে হয় শরীর গেলেই সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু যাঁর ঈশ্বর-দর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকার হয়েছে, তাঁর সে-বুদ্ধি হয় না। তিনি দর্শনের শেষে এইটাই বোঝেন যে, এই শরীরের যে উদ্দেশ্য ভগবানলাভ সেটি সিদ্ধ হয়েছে—এখন শরীর থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে সেইজন্য স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগে পাপ তাঁদের স্পর্শ করে না। (১।৪।১)

গীতা—

আমরা আগের দিন আলোচনা করেছি: 'যে-ব্যক্তি আত্মার দ্বারা অর্থাৎ বিবেকী মনের দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি জয় করতে পেরেছেন, সেই ব্যক্তির আত্মাই অর্থাৎ শুদ্ধ মনই নিজের বন্ধু হয়। আর যে-ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, তার আত্মাই অর্থাৎ অসংযত মনই তার শত্রুর মতো।' (৬।৬) এখন বিবেকী মনের দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করলে কি হবে, সেই কথাই শ্রীভগবান বলছেন: 'দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলকে যিনি জয় করেছেন ও যাঁর অন্তঃকরণ প্রসন্ন, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে সেই ব্যক্তির হৃদয়ে পরমাত্মা বিরাজমান থাকেন।' (৬।৭) অর্থাৎ, জীবনের সর্বাবস্থায় সেই ব্যক্তি পরমাত্মাকে হৃদয়ে অনুভব করেন। এইভাবে শ্রীভগবান অর্জুনকে উৎসাহ দিচ্ছেন, তোমার নিজের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করতে হবে। আত্মাতে অর্থাৎ মনে অবসন্নভাব রাখবে না, উৎসাহ নিয়ে, নিজের উপর বিশ্বাস এনে, নিজের কামনাবাসনা জয় ক'রে নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিজের মনকে জয় করতে পারলে পরমাত্মা আর দূরে থাকবেন না—তোমারই অন্তরে প্রকাশিত থাকবেন।

তারপর শ্রীভগবান বলছেন: 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা যাঁর আত্মা তৃপ্ত, যিনি কূটস্থ, যাঁর ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত, মৃত্তিকা প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁর সমতাবুদ্ধি হয়েছে, সেই যোগীই যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত ব'লে অভিহিত হন।' (৬।৮) জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রের মধ্যে যে সব বিষয় বলা হয়েছে তা জানা। একে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। বিজ্ঞান হচ্ছে শাস্ত্রোক্ত বিষয়কে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। একে অপরোক্ষ জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা যিনি পরিতৃপ্ত, যিনি কূটস্থ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় নির্বিকার, যিনি বিজিতেন্দ্রিয়, যাঁর কাছে মাটি, পাথর ও সোনা তুল্যমূল্য, সেই যোগীকেই যুক্ত অর্থাৎ যোগারূঢ় বলা হয়। এই যোগারূঢ় হওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য। এরূপ যোগীর আরও লক্ষণের কথা শ্রীভগবান বলছেন: 'সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু এবং পাপীতে যাঁর সমবুদ্ধি, তিনিই সকল যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' (৬।৯) যোগারূঢ় অবস্থায় likes and dislikes—পছন্দ অপছন্দ ব'লে কিছু থাকে না।

সবার প্রতি সমান মনোভাব। এটি শুধু মুখে বলা নয়, এই রকম একটা অবস্থা বাস্তবিকই আসে। এই অবস্থা লাভ করতে যোগীকে কি করতে হবে সেকথা শ্রীভগবান বলছেন : 'যোগী সতত নির্জন স্থানে থেকে একাকী নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হয়ে দেহ ও মন সংযত ক'রে অন্তঃকরণকে সমাহিত করবেন।' (৬।১০) আচার্য শংকর বলছেন : যোগী বলতে ধ্যায়ী—ধ্যানপরায়ণ। সেই ব্যক্তি সর্বদা নির্জন স্থানে একাকী থেকে দেহ ও মনকে সংযত ক'রে—সকল প্রকার প্রলোভন থেকে মুক্ত ক'রে, কোন কিছু তৃষ্ণা আশা মনে না রেখে, প্রাণধারণের অতিরিক্ত কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ না ক'রে অন্তঃকরণকে সমাহিত করবেন।

সমাহিত হ'তে গেলে যোগসাধকের প্রাথমিক কি বিধি-বিধান পালনীয়, সে-সম্পর্কে শ্রীভগবান এখন বলছেন : 'পবিত্র স্থানে, নীচে কুশ তার উপর মৃগচর্ম এবং তার উপরে বস্ত্র এই প্রকার না অতি উঁচু, না অতি নীচু নিজের আসন স্থাপন ক'রে, সেই আসনে উপবেশন ক'রে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত ক'রে, মনকে একাগ্র ক'রে, চিত্তশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবে।' (৬।১১-১২)

আসন কিভাবে স্থাপন করতে হবে এবং কি উদ্দেশ্যে তা ব'লে চিত্তের একাগ্রতার উপযোগী শরীরের অবস্থানাদির কথা শ্রীভগবান এখন বলছেন : 'দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সরল ও নিশ্চলভাবে ধারণ ক'রে নিজের নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রেখে এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না ক'রে প্রশান্তচিত্ত, নির্ভয়, গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি ব্রহ্মচারিব্রতে রত, মদ্‌গতচিত্ত, মৎপরায়ণ হয়ে মনের সংযম ক'রে সমাহিতভাবে অবস্থান করবে।' (৬।১৩-১৪) শরীরের মধ্যভাগ, গ্রীবা ও মস্তক এক সরল রেখায় রাখলে ধ্যানানুকূল আসীন হওয়া যায়। ফলে চিত্ত সহজেই স্থির হয়। নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখার প্রসঙ্গে শংকর বলছেন, এখানে 'ইব' শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ, 'যেন নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রেখে'। তা না হ'লে যদি নাসিকাগ্র দেখাই লক্ষ্য হয়, তাহলে মন নাসিকাগ্রেই থাকবে—আত্মাতে নয়। প্রশান্তচিত্ত—যাঁর চিত্ত বিক্ষেপশূন্য, অবিকম্পিত দীপশিখাবৎ নিশ্চল ও শান্ত। নির্ভয়—যিনি সকলপ্রকার ভয়শূন্য হয়েছেন। ব্রহ্মচারিব্রতে রত—গুরুসেবা এবং কায়মনোবাক্যে যিনি ব্রহ্মচর্য পালন করেন। যদি সাধকের মনে কামভাব থাকে তাহলে তার পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। যে-শক্তি কাজ করছে কামরূপে, তাকেই ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। আসলে কায়মনোবাক্যে পবিত্র হ'তে হবে। ব্রহ্মচর্যব্রতে দৃঢ় হয়ে মদ্‌গতচিত্ত অর্থাৎ পরমেশ্বরে চিত্ত সংলগ্ন ক'রে সমাধি অভ্যাস করতে শ্রীভগবান বলছেন।

এইভাবে যোগাভ্যাস করলে কি ফল হবে, শ্রীভগবান এখন সেই কথাই বলছেন : 'এই সব বিধি অনুসারে সংযতচেতা হয়ে যোগী মনকে সর্বদা আত্মবিষয়ে সমাহিত করলে, আমার অধীন যে নির্বাণরূপ শান্তি, তা লাভ করতে সমর্থ হন।' (৬।১৫) 'মৎসংস্থা' অর্থাৎ, আমাতে যা অবস্থিত—আমার অধীন। শংকরাচার্য বলছেন, নির্বাণ বা মুক্তি যে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান ছাড়া আর কিছুই নয়, 'মৎসংস্থা' বলাতে সেই কথাই বোঝানো হয়েছে।

যিনি যোগাভ্যাস করবেন, তার জীবনযাত্রাটা কি রকম হবে? সাধারণ সাধক কর্ম করছেন, যুদ্ধ করছেন, ব্যবসা করছেন—ভগবানে কর্মফল অর্পণ ক'রে করছেন, নিষ্কামভাবে করছেন। এ একরকম; এতে খাওয়া-দাওয়ার ততো বাছবিচার করা হয় না। কিন্তু যিনি যোগ অবলম্বন করবেন, তাঁকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এবং অন্যান্য বিষয়েও খুব হিসাব ক'রে চলতে হবে। সেটা কেমন সেই কথাই শ্রীভগবান এবার বলছেন : 'হে অর্জুন, যে খুব বেশী ভোজন করে, তার যোগ

হয় না ; যে একেবারে ভোজন করে না, তারও যোগ হয় না ; যে খুব বেশী নিদ্রালু তারও যোগ হয় না এবং যে খুব বেশী জাগরণ করে তারও যোগ হয় না।' (৬।১৬) একজন কর্মী সে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করছে ; তাকে কর্ম অনুযায়ী যথেষ্ট আহার গ্রহণ করতে হবে, তা না হ'লে সে কর্ম করার শক্তি পাবে না। কিন্তু তারপক্ষে ধ্যানযোগ করা সম্ভব হবে না। ধ্যানযোগ অভ্যাস করতে হ'লে কি করতে হবে, সেটি আমরা ভগবান বুদ্ধের জীবনে দেখেছি। তিনি প্রথমে কঠোর তপস্যা করেছেন, শরীর শীর্ণ হয়ে গিয়েছে, পিঠের সঙ্গে পেট ঠেকে গিয়েছে, চক্ষু কোটরগত, সেই অবস্থায় এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে, একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। সেই সময় একদিন সুজাতা নামে একটি গ্রাম্য রমণী একবাটী পায়েস তাঁকে এনে দেন। সেই পায়েস খেয়ে নিয়ে সংকল্প ক'রে আসনে বসে তিনি তাঁর প্রার্থিত নির্বাণ লাভ করেন। তার পরেই তিনি প্রচার করলেন, 'মজ্ঝিম্ পন্থা' অর্থাৎ, মধ্যম পন্থা, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়। একেবারে চরম ভোগও নয়, আবার অত্যন্ত কঠোরতাও নয়। মধ্যম পন্থাই অবলম্বনীয়। সেই কথাই শ্রীভগবান বলছেন : 'যাঁর আহার ও ভ্রমণ পরিমিত, যাঁর বিহিত কর্মে চেষ্টা পরিমিত, এবং যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত, সেই যোগীর যোগই দুঃখহর হয়ে থাকে।' (৬।১৭)

বিবিধ সংবাদ

জন্মজয়ন্তী

বারাসত রামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর ১২৫তম শুভ আবির্ভাবতিথি ১।১।৮১ হইতে ৪।১।৮১ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে ধর্মীয় গীতিনাট্য, রামায়ণ-কীর্তন, ভক্তিমূলক গান হাজার হাজার ভক্তকে প্রভূত আনন্দদান করে। ১লা বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। মধ্যাহ্নে ৪।৫ হাজার ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অজজানন্দ, শ্রীঅমিয়-কুমার মজুমদার ও সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। সমাপ্তি-দিবসে সংকীর্তন ও শোভাযাত্রা সহ বারাসত-তীর্থ পরিক্রমা করা হয় এবং ১০ হাজার ব্যক্তিকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। এদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী পরেশানন্দ। বিভিন্ন বক্তাগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা ও মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য জীবনী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। প্রতিদিন অগণিত ভক্ত নরনারী এই আনন্দোৎসবে যোগদান করেন ও ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইয়া অনাবিল শান্তি ও আনন্দলাভ করেন।

এই আশ্রমে একটি অতিথিভবন নির্মাণকল্পে একটি তহবিল খোলা হয় এবং এই বৎসরেই নির্মাণকার্য শুরু করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই শুভ সংকল্পের সফলতার জন্য সহৃদয় ভক্ত ও দেশবাসীর নিকট মুক্তহস্তে দানের আবেদন ও অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

কল্পতরু-উৎসব

ভাংগড় (২৪ পরগণা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের উদ্যোগে ১লা জানুআরি ১৯৮১, মহা-সমারোহে কল্পতরু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, প্রভাতী কীর্তন, কথামৃত ও ভাগবত পাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, মধ্যাহ্নে পনেরো হাজার ভক্তের প্রসাদধারণ এবং রাত্রে দুইটি কীর্তন-সম্প্রদায়ের পরিবেশিত লীলাকীর্তন উৎসবের অঙ্গ ছিল।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ২০৲ টাকা সম্পূর্ণ সেট ১৯৫৲ টাকা

বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১৬৲ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র

দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে

পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী

সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)

অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন

দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ— পৃঃ ১৪১, মূল্য ৫·০০
ভক্তিযোগ— পৃঃ ৯৬, মূল্য ৩·০০
ভক্তি-রহস্য— পৃঃ ৯৮, মূল্য ৩·৪৫
জ্ঞানযোগ— পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০·৫০
রাজযোগ— পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬·৫০
সন্ন্যাসীর গীতি— পৃঃ ২৩, মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট— পৃঃ ২৯, মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ— পৃঃ ৩৬, মূল্য ১·২৫
পত্রাবলী—প্রথমার্ধ— পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০·০০
শেষার্ধ— পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০·৫০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)— মূল্য ২৭·০০
ভারতীয় নারী— পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩·৫০
পওহারী বাবা— পৃঃ ১৮, মূল্য ১·২৫
স্বামীজীর আহ্বান— পৃঃ ৮০, মূল্য ১·২৫
ধর্ম-সমীক্ষা— পৃঃ ১০০, মূল্য ৫·০০
ধর্মবিজ্ঞান— পৃঃ ১০২, মূল্য ৫·৫০

বেদান্তের আলোকে—পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫·০০
ভারতে বিবেকানন্দ—পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০·০০
দেববাণী— পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬·৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ— পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪·০০
কথোপকথন— পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১·২৫
মদীয় আচার্যদেব— পৃঃ ৬২, মূল্য ২·২৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে— পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা— পৃঃ ৫২, মূল্য ১·৭৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ— পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬·০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক— পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— পৃঃ ১৩৬, মূল্য ৩·১০
ভাববার কথা— পৃঃ ৬৪, মূল্য ২·৩০
বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭·০০
বর্তমান ভারত— পৃঃ ৪০, মূল্য ২·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪'০০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৫'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩'২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৪'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'২০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০

২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫'০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ৬'৫০

আরত্রিক-স্তব— পৃঃ ৩১, মূল্য ১'০০

পুণ্যস্মৃতি— স্বামী স্বানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৩, মূল্য ...

সৎকথা—পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "দ্রুতপাঠ্য" সংস্করণ- পৃঃ ৭০, মূল্য ...

শঙ্কর-চরিত — ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৫'০০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৭০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ — পৃঃ ১১০, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৫'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬'২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

শ্রুগশালপ্যাজের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩৯, মূল্য ০'৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩'৫০

Udbodhan—Phone : 55-2447 APRIL 1981 Regd. No. WB/NC-17

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮

৮৩তম বর্ষ

৫ম সংখ্যা

উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও: বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬

সুমুদ্রিত বোর্ড বাঁধাই, মূল্য—২০৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ: অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। ...মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এযুগে বিরল।

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, সুমুদ্রিত বোর্ড বাঁধাই—১৪৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা: বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদাহরণ।

ষষ্ঠ মুদ্রণ—দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬

মূল্য—১৪৲

সাধনা

দেশ: সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা...প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক...সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম সংস্করণ—১৪৲

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

ভাল চা বলতে
টসের
চা
TOSH'S
AIR TIGHT
এ, টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা—১

৮৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ‌ ‌ ‌ ‌ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

ভক্ত বলেন, 'আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে মৃতবৎ থাকিতে হইবে', এবং ইহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ শরণাগতি। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—এই বাক্যের অর্থই ঐ আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। ··প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখন কিছু ইচ্ছা করেন না বা কোন কার্য করেন না। 'প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে; আমি দরিদ্র, আমার কিছু নাই, তাই আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।' ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ—জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমন কি মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগসুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত 'এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত' ও অমূল্য। আত্মসমর্পণ হইতে এই অপ্রাতিকূল্য-অবস্থা লাভ হইলে সাধকের আর কোনরূপ স্বার্থ থাকে না; আর স্বার্থই যখন নাই, তখন আর তাঁহার স্বার্থহানিকর বস্তু জগতে কি থাকিতে পারে? এই পরম নির্ভরের অবস্থায় সর্বপ্রকার আসক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, কেবল সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা ও আধারস্বরূপ ভগবানের প্রতি সর্বাবগাহী ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে। ভগবানের প্রতি এই আসক্তি জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নয়, বরং উহা নিঃশেষে তাহার সর্ববন্ধন মোচন করে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৪।৬৮-৬৯]

কথাপ্রসঙ্গে

প্রপত্তি

সপ্তদশ শতকে রচিত 'যতীন্দ্রমতদীপিকা' গ্রন্থে শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীনিবাসদাস প্রপত্তি সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

> প্রপত্তি হইতেছে ন্যাসবিদ্যা (আত্মসমর্পণবিদ্যা)। (ঈশ্বরের ইচ্ছার) অনুকূল বিষয়ে সংকল্প করা; প্রতিকূল বিষয় বর্জন করা; (ঈশ্বর) আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস; (ঈশ্বরকে) রক্ষাকর্তা হিসাবে বরণ করা এবং দীনভাবে নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করা—প্রপত্তির এই পাঁচটি অঙ্গ। প্রপত্তি বর্তমান দেহের অন্তে প্রপন্ন ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়া থাকে। প্রপত্তি একবারই করণীয়। 'ন্যাস', 'শরণাগতি' ইত্যাদি শব্দবেদ্য প্রপত্তি একপ্রকার জ্ঞানবিশেষ। রহস্যশাস্ত্রে নিবদ্ধ এই প্রপত্তি সম্প্রদায়ক্রমে গুরুমুখ হইতে জ্ঞাতব্য বলিয়া প্রবর্তকদের জন্য রচিত এই গ্রন্থে প্রকাশ করা উচিত নহে, এইজন্য আমি বিরত হইতেছি।[১]

রহস্যশাস্ত্রে কি আছে, তাহা জানা নাই। তবে আচার্য রামানুজের 'শরণাগতিগদ্যে' প্রপত্তির গোপনতত্ত্বটি উদ্ঘাটিত বলিয়াই মনে করি। প্রপত্তি সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে, 'শরণাগতিগদ্যে'র বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।[২] এইজন্য উহার তাৎপর্যমাত্র নিম্নে দেওয়া হইল :

শ্রীমন্নারায়ণের প্রপন্ন হইবার পূর্বে সাধক শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রপন্ন হইবেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রপন্ন হইয়া সাধক প্রার্থনা করিবেন যে, শ্রীমন্নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার প্রপত্তি যেন অটুট থাকে। এইরূপ প্রার্থনায় প্রীত হইয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রপন্ন সাধককে আশ্বাস দেন যে, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।

অতঃপর সাধক শ্রীমন্নারায়ণের প্রপন্ন হইবেন। তিনি বলিবেন, 'হে প্রভু, আমি পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, সখা, গুরুজন, ধনধান্য, গৃহসম্পদ্ প্রভৃতি এবং সর্বধর্ম ও সর্ববিষয়ে সুখ সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনিই মাতা, পিতা, বন্ধু, গুরু, বিদ্যা, ধন—হে দেবদেব, আপনিই আমার সর্বস্ব।'

এইরূপে প্রপন্ন হইয়া সাধক দণ্ডবৎ ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীমন্নারায়ণকে প্রণামপূর্বক তাঁহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবেন এবং নিজের কৃত, ক্রিয়মাণ ও করিষ্যমাণ যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিবেন। ভগবৎকৃপায় তিনি যেন পরা ভক্তি লাভ করিয়া অন্তিম সময়ে ভগবৎকৈঙ্কর্যই কামনা করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন, এই প্রার্থনা করিবেন।

সাধক এইভাবে প্রপন্ন হইলে শ্রীমন্না-

---

১ "ন্যাসবিদ্যা প্রপত্তিঃ। প্রপত্তির্নাম—'আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনং / রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা / আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যম্' ইতি অঙ্গপঞ্চকযুক্তা। এতদ্দেহাবসানে মোক্ষপ্রদা, সকৃৎ কর্তব্যা, 'ন্যাসঃ' 'শরণাগতিঃ' ইত্যাদি শব্দবেদ্যা জ্ঞানবিশেষরূপা। এষা প্রপত্তিঃ গুরুমুখাৎ রহস্যশাস্ত্রেষু সম্প্রদায়তয়া বেদিতব্যা ইতি ইহ বালবোধার্থং প্রবৃত্তে গ্রন্থে ন প্রকাশ্যা ইতি বিরম্যতে।" (পরিচ্ছেদ ৭, অনুচ্ছেদ ২৮)।

২ শ্রীসম্প্রদায়ের লোকাচার্য-রচিত 'শ্রীবচনভূষণ' গ্রন্থে প্রপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। স্থানাভাবে সে-আলোচনা এখানে আদৌ উপস্থাপিত করা গেল না।

রায়ণ প্রীত হইয়া বলেন যে, সমস্ত-সাধন-বিহীন হইলেও, অশেষ-অপরাধী হইলেও তাঁহার কৃপাতেই সাধক পরা ভক্তি লাভ করিবেন এবং শরীরপাতকালে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

'শরণাগতিগদ্যে'র শেষে আচার্য রামানুজ লিখিয়াছেন: 'এই শরণাগতিগদ্য জগতের হিত-সম্পাদক ও শরণাগতিমন্ত্রের সারস্বরূপ। ইহা আমাদের নিকট প্রাচীন পরম রহস্য প্রকাশিত করুক।'

এই 'শরণাগতিগদ্য' বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অশরণশরণ্যা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর আশীর্বাদ ব্যতীত কেহই শ্রীমন্নারায়ণের প্রপন্ন হইতে পারেন না। এই জগতেও আমরা দেখি, পিতা বিপথগামী পুত্রকে কঠোরভাবে শাসন করেন, কিন্তু মাতা তাহাকে ক্ষমা করিয়াই থাকেন; আর যদিই বা শাসন করেন, সেই শাসনে শাসনের তীব্রতা থাকে না, ক্ষমারই প্রাধান্য থাকে। ফলতঃ মাতার শাসনকে শাসন বলা যায় না। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক জগতেও শ্রীমন্নারায়ণ সাধককে নিগ্রহ করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন—অবশ্য সাধকেরই কল্যাণের জন্য। কিন্তু শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী 'নিত্যম্ অজ্ঞাতনিগ্রহা'—নিগ্রহ করা সর্বদাই তাঁহার অজানা। এইজন্যই শতসহস্র অপরাধে অপরাধী সাধক সর্বাগ্রে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীরই প্রপন্ন হন। ইহাই শ্রীরামানুজ-প্রবেদিত প্রপত্তির পরম রহস্য।

আচার্য রামানুজ যেরূপ প্রপত্তির উদ্গাতা, আচার্য নিম্বার্কও সেইরূপ। তিনি তাঁহার 'মন্ত্র-রহস্যষোড়শী' ও 'দশশ্লোকী'তে সংক্ষেপে, এবং 'প্রপন্নকল্পবল্লী'তে বিস্তারিতভাবে, প্রপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। 'মন্ত্ররহস্যষোড়শী'তে তিনি লিখিয়াছেন যে, সর্বাগ্রে গুরুতেই আত্মসমর্পণ করিতে হয় ('আদৌ গুরৌ ন্যসেৎ প্রাণান্ আত্মানং ধনমেব চ'—শ্লোক ১৫) এবং শ্রীগুরুর মাধ্যমেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হয়—শিষ্য হবিঃস্থানীয়; যে-হাতার সাহায্যে আহুতি দেওয়া হয়, গুরু সেই 'অর্পণ'স্থানীয় এবং ব্রহ্ম অগ্নি-স্থানীয়। সাধক ব্রহ্মে 'আত্মনিক্ষেপ' করিবেন প্রথমে গুরুতে 'আত্মনিক্ষেপ' করিয়া। সুতরাং সাধকের সাধনযজ্ঞ আত্মার প্রপত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই দ্বিবিধা প্রপত্তির ফলে তিনি ভববন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন।[৩]

'দশশ্লোকী'র অষ্টম শ্লোকে নিম্বার্কাচার্য লিখিয়াছেন: 'নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ।' অর্থাৎ, শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই। অন্য ভাষায় বলা যায়, প্রপত্তি ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই। 'দশশ্লোকী'র নবম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন: 'কৃপাস্য দৈন্যা-দিযুজি প্রজায়তে।' অর্থাৎ, শ্রীভগবানের কৃপা দীনতা প্রভৃতি গুণযুক্ত ব্যক্তির উপরই বর্ষিত হয়। দীনতা প্রভৃতি গুণ প্রপত্তিরই অঙ্গ। ইহা প্রবন্ধারম্ভেই উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্বার্কাচার্যের 'প্রপন্নকল্পবল্লী' অবলম্বনে আরও বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। 'প্রপন্নকল্পবল্লী'তে তিনি লিখিয়াছেন:

> আত্মনিক্ষেপণং চাত্র সর্বাঙ্গৈঃ সহ প্রোচ্যতে।
> আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্ ॥
> রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
> পঞ্চমং কৃপণত্বং চ পঞ্চরাত্রবিদো বিদুঃ ॥
> (শ্লোক ১০, ১১)

—সমস্ত অঙ্গসহ আত্মনিক্ষেপ (প্রপত্তি) কথিত হইতেছে: অনুকূল বিষয়ে সংকল্প; প্রতিকূল

৩ চরমার্থং হবিঃ কৃত্বা মধ্যমঞ্চার্পণং তথা। প্রথমার্থে চ ব্রহ্মাগ্নাবাত্মানং জুহুয়ান্নরঃ ॥
হুত্বাত্মানং বুধশ্চৈবং কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে। ভববন্ধবিনির্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

বিষয়ের বর্জন; ভগবান রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস; ভগবানকে রক্ষাকর্তা হিসাবে বরণ করা এবং কৃপণতা (দীনতা)—পঞ্চরাত্রশাস্ত্রজ্ঞগণ জানেন যে, এই পাঁচটি প্রপত্তির অঙ্গ।

প্রবন্ধের সূচনায় আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, আচার্য শ্রীনিবাসদাসও প্রপত্তিকে পঞ্চ-অঙ্গযুক্তা বলিয়াছেন। অহির্বুধ্ন্যসংহিতার যে-পাঠ (পাদ-টীকা ১ দ্রষ্টব্য) তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট হয় নাই। এ-পর্যন্ত আমরা যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, 'আত্মনিক্ষেপ'ই প্রপত্তি। 'ন্যাসবিদ্যা' বলিয়া শ্রীনিবাসদাস প্রপত্তিকে অভিহিত করিয়াছেন। 'ন্যাস' ও 'নিক্ষেপ' এক।র্থক। সুতরাং 'আত্মনিক্ষেপ', 'আত্মনিবেদন', 'আত্ম-সমর্পণ' কথাগুলির যে-কোন একটি পাইলেই আমরা প্রপত্তিকে অনায়াসে সনাক্ত করিতে পারি। শ্রীনিবাসদাস 'আত্মনিক্ষেপ' ও 'কার্পণ্য'কে একটি-মাত্র ধরিয়া প্রপত্তিকে পঞ্চাঙ্গিকা বলিতেছেন। কিন্তু অহির্বুধ্ন্যসংহিতার বহুল-প্রচলিত যে-পাঠ আমরা পাই, তাহার শেষ দুইটি চরণ হইতেছে: 'আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে / ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।'[৪] এখানে 'আত্মনিক্ষেপ' ও 'কার্পণ্য'কে পৃথক্ ধরিয়া শরণাগতি অর্থাৎ প্রপত্তিকে 'ষড়্‌বিধা' বলা হইতেছে। ইহাতেও বুঝিতে সামান্য অসুবিধা হয় এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এইজন্যই আচার্য নিম্বার্ক 'আত্মনিক্ষেপ'ই যে প্রপত্তি ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রথমেই ব্যক্ত করিলেন: 'আত্ম-নিক্ষেপণং চাত্র সর্বাঙ্গৈঃ সহ প্রোচ্যতে' এবং 'কৃপণত্ব'কে প্রপত্তির পঞ্চম অঙ্গ বলিলেন: 'পঞ্চমং কৃপণত্বং চ পঞ্চরাত্রবিদো বিদুঃ'—আচার্য শ্রীনিবাসদাসের ন্যায় 'আত্মনিক্ষেপ' ও 'কার্পণ্য' এই দুইটিকে একত্র করিয়া প্রপত্তিরই একটি অঙ্গ বলিলেন না। আর অহির্বুধ্ন্যসংহিতার পূর্বোক্ত বহুল-প্রচলিত পাঠ অনুযায়ী শরণাগতি বা প্রপত্তি যে 'ষড়্‌বিধা' ইহাও নিম্বার্কমতে সিদ্ধ হয়, যদি পাঁচটি অঙ্গসহ অঙ্গী প্রপত্তিকে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং আচার্য নিম্বার্ক অহির্বুধ্ন্যসংহিতার পাঠ অর্ধেক হুবহু গ্রহণ করিয়া এবং বাকী অংশ আগে-পরে করিয়া যে-দুইটি অনবদ্য শ্লোক আমাদের উপহার দিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ ও সহজবোধ্য।

প্রপত্তির উল্লিখিত পাঁচটি অঙ্গের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন আচার্য সুন্দর ভট্ট 'প্রপন্ন-কল্পবল্লী'র উপর রচিত তাঁহার 'প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী' টীকায়। বিস্তারভয়ে সেগুলির উল্লেখ করা হইল না।

প্রপত্তিবাদ শুধু যে রামানুজ-সম্প্রদায় ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়েই সীমাবদ্ধ, তাহা নহে। ইহা অতি প্রাচীন মতবাদ। সুপ্রাচীন কাল হইতে ভক্তির আচার্যগণ কর্তৃক নানা দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। ফলে বিষয়টি যেমন উপভোগ্য হইয়াছে, মত-মতান্তরের দ্বারা জটিলও হইয়াছে। আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে দুই-একটি দৃষ্টিকোণের আলোচনা করিব। তৎপূর্বে প্রপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা হইতেছে।

উপনিষদেই আমরা প্রপত্তির কথা পাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে:

> যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
> যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
> তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
> মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ (৬।১৮)

৪ ষোঢ়া হি বেদবিদুষো বদন্ত্যেনং মহামুনে। আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্॥
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥
(অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ৩৭।২৭, ২৮)

—যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার উদ্দেশে বেদসমূহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, মুমুক্ষু হইয়া আমি আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

পরবর্তী কালে অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, লক্ষ্মীতন্ত্র, ভরদ্বাজসংহিতা ও অন্যান্য পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে এবং মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে প্রপত্তির প্রসঙ্গ আলোচিত বা উল্লেখিত হইয়াছে। প্রাচীন আগমশাস্ত্রের মধ্যে অহির্বুধ্ন্যসংহিতার দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রপত্তির আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ২১২ এবং পাদটীকা ৪ দ্রষ্টব্য)। বিস্তারভয়ে ইহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

মহাভারতের অন্তর্গত আমাদের নিত্যপঠনীয় গীতাকে মধুসূদন সরস্বতী[৫], কেশব কাশ্মীরী[৬] প্রমুখ টীকাকারগণ প্রপত্তিশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গীতার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে প্রপত্তির কথা আছে। সুতরাং ইহাকে প্রপত্তি-শাস্ত্র বলিয়া চিহ্নিত করিবার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। অর্জুনের প্রপত্তির পরেই গীতার মূল উপদেশের প্রারম্ভ। কী করণীয়, কী শ্রেয়স্কর—নির্ণয় করিতে অসমর্থ 'ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ' অর্জুন শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন: 'আমি আপনার শিষ্য; আপনার প্রপন্ন আমাকে উপদেশ দিন' ('শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—২।৭)।

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন: 'ত্রিগুণময়ী আমার এই দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া। আমারই যাহারা প্রপন্ন, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে' ('দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া / মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'—৭।১৪)।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান শিক্ষা দিতেছেন—সংসারবৃক্ষের মূল ছিন্ন করিয়া কীভাবে তাঁহার প্রপন্ন হইতে হয়: 'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে / যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।' (১৫।৪)—অনাদিকালের এই সংসারধারা শ্রীভগবান হইতেই প্রবাহিত, তিনিই ইহার উৎস। তাই ইহার পারে যাইতে হইলে প্রপত্তির আশ্রয় লইতে হয়, নিবেদন করিতে হয়: 'আমি সেই আদিপুরুষের প্রপন্ন, যাঁহা হইতে এই অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহ নিঃসৃত।'

আর গীতার সমস্ত উপদেশের পর্যবসান এই প্রপত্তিতেই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন:

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(১৮।৬৬)

—বিধিকৈঙ্কর্য পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

গীতার আরও অনেক স্থলে প্রপত্তির কথা আছে। বাহুল্যভয়ে সেগুলির উদ্ধৃতি দিলাম না। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'প্রপন্ন', 'প্রপদ্যতে', 'প্রপদ্যন্তে', 'প্রপদ্যে' ইত্যাদি শব্দগুলি প্রপত্তিরই বোধক, কারণ এইগুলি একই 'প্র'-উপসর্গযুক্ত পদ্ ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। আর শরণাগতি এবং প্রপত্তি সমানার্থক বলিয়া গীতায় (অন্যান্য অধ্যাত্মশাস্ত্রেও) যেখানেই শরণাগতির কথা পাওয়া যাইবে, সেখানেও বুঝিতে হইবে প্রপত্তিরই কথা বলা হইতেছে

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি (পৃঃ ২১২ দ্রষ্টব্য),

---

৫ গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি শ্লোকের (১৮।৬৬) টীকা দ্রষ্টব্য। মধুসূদনের মতে শরণাগতি ত্রিবিধা: (১) আমি তোমার, (২) তুমি আমার, এবং (৩) তুমিই আমি। সাধনরূপা ও ফলরূপা এই প্রপত্তিই গীতার প্রতিপাদ্য।

৬ কেশব কাশ্মীরীও ঐ শ্লোকটির এবং ১৮।৭৩ শ্লোকের টীকায় প্রপত্তি সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়া গীতাকে শরণাগতিশাস্ত্র বলিয়াছেন।

'আত্মনিক্ষেপ', 'আত্মসমর্পণ', 'আত্মনিবেদন', ইত্যাদি শব্দ প্রপত্তির সমার্থক। ভগবৎপ্রসঙ্গে এই শব্দগুলি পাইলেই আমরা প্রপত্তিকে সনাক্ত করিতে পারি। 'আত্মনিবেদন' কথাটি আমরা নারদভক্তিসূত্রে পাই। নারদ বলিতেছেন, ভক্তি এক হইয়াও একাদশ রূপে প্রকাশিত হয় ('একধা অপি একাদশধা ভবতি')। যথা—গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্ম-নিবেদনাসক্তি, তন্ময়তাসক্তি ও পরমবিরহাসক্তি। (সূত্র ৮২)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই 'আত্মনিবেদনে'র কথা আছে। সপ্তম স্কন্ধে পিতা হিরণ্যকশিপুকে প্রহ্লাদ বলিতেছেন :

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

(৭।৫।২৩, ২৪)

—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যা, পূজা, স্তুতি, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি সর্বব্যাপী পরমাত্মাতে অর্পণ করিয়া যদি করা হয়, তাহা হইলে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি।

এই সপ্তম স্কন্ধেই প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছিলেন যে, স্বীয় সুহৃৎ পরমপুরুষে আত্ম-সমর্পণই সার সত্য ('সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ'—৭।৬।২৬)।

একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন :

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

(১১।২৯।৩৪)

—মানুষ যখন সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মনিবেদন করে, তখন সে আমার বিশেষ প্রিয় হয় এবং মোক্ষলাভের যোগ্য হইয়া আমার সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হয়।[৬]

অন্যান্য পুরাণেও এই প্রপত্তির কথা আছে। যেমন মার্কণ্ডেয় পুরাণে : 'শরণং চ প্রপন্নাঃ স্মঃ' (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২।৮), 'দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ' (ঐ, ১১।৩), 'শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে' (ঐ, ১১।১২) ইত্যাদি।

আধুনিক যুগের শাস্ত্র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' প্রপত্তি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই পাই। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র গুরুভাব-পূর্বার্ধের প্রারম্ভে 'বকলমা দেওয়া' সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বামী সারদানন্দ সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। এই 'বকলমা দেওয়া' আর 'প্রপত্তি' একই কথা। গিরিশচন্দ্র একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে "সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন—'এখন থেকে আমি কি করব?'" শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন—'যা করচ, তাই ক'রে যাও।...তবে সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।' গিরিশচন্দ্র দেখিলেন, অতটুকুও করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই নীরব রহিলেন। গিরিশের মনের ভাব বুঝিয়া পুনরায় আদেশ হইল, 'আচ্ছা, তা যদি না পার ত খাবার-শোবার আগে তাঁর একবার স্মরণ ক'রে নিও।' গিরিশ তখনও নীরব। কারণ, তাঁহার আহার ও শয়নের নির্দিষ্ট সময় না থাকায় ভগবানকে স্মরণ করিতে ভুল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব

৬ শ্রীমদ্ভাগবতে শরণাগতি সম্বন্ধে অসংখ্য শ্লোক আছে। আমরা 'আত্মনিবেদন', 'আত্মসমর্পণ' ইত্যাদি শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনটি উদ্ধৃতি দিলাম।

হাসিতে হাসিতে অর্ধবাহ্যদশায় বলিলেন—"তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা, তবে আমায় বকলমা দে।" গিরিশচন্দ্র তখন নিশ্চিন্ত হইলেন। কারণ, ঠাকুর তাঁহার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন—তাঁহাকে সাধনভজন আর কিছুই করিতে হইবে না। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, গিরিশচন্দ্র দেখিলেন যে, 'সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকলমা দিয়েছে, তার কাজের আর অন্ত নেই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া আমি-টার জোরে সেটি করলে।'

এই ভার দেওয়াই প্রপত্তি ৩০।১১।১৫ তারিখে লিখিত স্বামী প্রেমানন্দের একটি পত্রে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেব গাহিতেন :

'চল ভাই ভার লয়ে যাই
অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব ভার, লব শরণ
বলব তাঁর ধরে চরণ' ইত্যাদি।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'ও আছে, এই ভার দেওয়া-নেওয়ার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন : "নাবালকেরই অছি। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না; রাজা ভার ল'ন। অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার ল'ন না। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন; বললেন, 'ঠাকুর, কোথা যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।' এই ব'লে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ঠাকুর, এত শীঘ্র ফিরলে যে?' নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল; ধোপারা কাপড় শুকাতে দিয়েছিল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল! দেখে ধোপারা লাঠি নিয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।' লক্ষ্মী আবার বললেন, 'ফিরে এলেন কেন?' নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে, দেখলাম। তাই আর আমি গেলাম না।'" (৩।১৭।৪) বলা বাহুল্য ভক্তটি প্রপন্ন ভক্ত ছিলেন না।[৮]

প্রপত্তির যে-উপদেশ শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনেই জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি বলিতেন, 'আমার বেড়াল-ছানার স্বভাব। বিড়ালছাঁ কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে—কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়।' (কথামৃত, ২।৯।২) তাঁহাকে বেদান্তের উত্তম অধিকারী দেখিয়া তোতাপুরী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বেদান্তসাধন করিবেন কি-না, তখন ঠাকুর বলিলেন, 'কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না—আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।' তাহার পর মা ভবতারিণীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শুনিলেন, 'যাও শিক্ষা করো, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।' শুধু বড় ব্যাপারে নহে, ছোট-বড় সকল ব্যাপারেই জগন্মাতার উপর এইরূপ একান্ত নির্ভরতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। প্রপত্তির মূর্ত বিগ্রহ তিনি! 'শরণা-

৭ রক্ষাকর্তা শ্রীগুরুরূপী ঈশ্বরই প্রপন্ন শিষ্যের সকল ভার বহন করেন—একথা আচার্য নিম্বার্কও বলিয়াছেন ('গোপ্তা বোঢ়া ভরস্য হি'—প্রপন্নকল্পবল্লী, শ্লোক ৪)।

৮ আচার্য নিম্বার্কের মতেও প্রপন্ন ভক্ত হন—অকিঞ্চন, অনন্যগতি ও সর্বসাধনবর্জিত ('অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ সর্বসাধনবর্জিতঃ'—প্রপন্নকল্পবল্লী, শ্লোক ২৪)।

গত, শরণাগত', 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্ত্র!

প্রপত্তির ইতিহাসের একটি অসম্পূর্ণ আলেখ্য আমরা উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পর্যন্ত অবলম্বনে উপস্থাপিত করিলাম। এখন যে-সকল দৃষ্টিকোণ হইতে পূর্বাচার্যগণ প্রপত্তিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাদেরই দুই-একটি আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা আচার্য শ্রীনিবাস-দাসের যতীন্দ্রমতদীপিকা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রপত্তি একবারই করণীয় ('সকৃৎ কর্তব্যা'—পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য)। এ-বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে। বাল্মীকি-রামায়ণে আছে, বিভীষণ যখন রাবণকে ত্যাগ করিয়া বানরসৈন্যগণের নিকটে আসিয়া বলেন যে, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত, তখন সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণ তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন :

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

(যুদ্ধকাণ্ড, ১৮।৩৩)

—কেহ যদি একবার মাত্র শরণাগত হইয়া বলে, 'আমি তোমার', তাহা হইলে সর্বপ্রাণী হইতে আমি তাহাকে অভয়দান করি, ইহাই আমার ব্রত।

শ্রীরামচন্দ্রের এই আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের যামুনাচার্য তাঁহার বিখ্যাত 'স্তোত্র-রত্নে' লিখিয়াছেন :

ননু প্রপন্নঃ সকৃদেব নাথ
তবাহমস্মীতি চ যাচমানঃ।
তবানুকম্প্যঃ স্মর তৎপ্রতিজ্ঞাং
মদেকবর্জং কিমিদং ব্রতং তে॥

(শ্লোক ৬৪)

—হে প্রভু, 'আমি তোমার' বলিয়া প্রার্থনা করিয়া যে-ব্যক্তি একবার মাত্র তোমার শরণ গ্রহণ করে, সে তোমার করুণার অধিকারী, ইহাই তোমার প্রতিজ্ঞা—ইহা স্মরণ করো এবং বলো—তোমার এই ব্রত কি আমাকে বাদ দিয়া?

সাবিত্রী সত্যবানকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ এই কথা শুনিয়া বলেন যে, অশেষ গুণবান হইলেও এক বৎসর পূর্ণ হইলে সত্যবানের মৃত্যু অবধারিত। তখন পিতা অশ্বপতি সাবিত্রীকে অন্য কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিতে বলিলে সাবিত্রী উত্তর দেন :

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥[৯]
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোহপি বা।
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥

(মহাভারত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং, বনপর্ব, অধ্যায় ২৪৮, শ্লোক ২৬, ২৭)

—পৈতৃক সম্পত্তির অংশ একবারই পাওয়া যায়, কন্যাকে একবারই সম্প্রদান করা যায়[১০], 'দিই' ('দানের প্রতিশ্রুতি দিতেছি') কথাটি একবারই বলা যায়। এই তিনটি এক-একবার মাত্রই হয়। দীর্ঘায়ুই হউন বা অল্পায়ুই হউন, গুণবানই হউন বা গুণহীনই হউন—পতি আমি একবারই বরণ করিয়াছি, দ্বিতীয় কাহাকেও বরণ করিব না।

---

৯ এই শ্লোকটি মনুসংহিতাতেও আছে (৯।৪৭)। তবে শেষাংশে 'সকৃৎ সকৃৎ'-এর স্থলে 'সতাং সকৃৎ' পাঠ আছে।

১০ 'কন্যা সকৃৎ এব প্রদীয়তে, পিত্রাদিনা, কন্যয়া আত্মনা বা; ন দ্বিতীয়বারম্।' [কন্যা একবারই প্রদত্তা হয়—পিতা প্রভৃতির দ্বারা অথবা নিজেরই দ্বারা]। সাবিত্রী এত তেজস্বিনী ছিলেন যে, কোন যুবকই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই। এইজন্য পিতার নির্দেশে সাবিত্রী স্বয়ং পতি-অন্বেষণে নির্গত হন। তিনি মনে মনে সত্যবানকেই পতিরূপে বরণ করেন।

সাবিত্রী সত্যবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। উহার ফলে তাঁহার নিজের উপর আর কোন স্বত্ব ছিল না। সুতরাং দ্বিতীয়বার আর কাহাকেও আত্মসমর্পণের প্রশ্নই উঠে না। সাবিত্রী 'আত্ম-হারা', কারণ প্রপত্তি সাবিত্রীর আত্মহরা। প্রপন্ন সাধকেরও অবস্থা অনুরূপ। একবার নিজেকে শ্রীভগবানে সমর্পণ করায় নিজের উপর তাঁহার কোন স্বত্ব থাকে না। তিনি অনন্যশরণ হন—তাঁহার দ্বিতীয় কোন শরণ্য থাকিতে পারে না। 'বকলমা' জীবনে একবারই দেওয়া যায়, দুইবার নহে। 'গীতাঞ্জলি'র—

'একটি নমস্কারে প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক
তব ভবনদ্বারে।'

—গানটিতেও প্রপত্তির এই 'সকৃৎ' করণীয়ত্বের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রপত্তিতে কোন সাধনভজন করিতে হয় না বলিয়া কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, ভক্তি হইতে প্রপত্তি পৃথক্। কেশব কাশ্মীরী গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি শ্লোকটির (১৮।৬৬) টীকায় মহাভারত হইতে কয়েকটি মনোরম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে যে, যিনি শ্রীভগবানের প্রপন্ন হন, তাঁহার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তাঁহার দ্বারা সমস্ত তপস্যা, সমস্ত দান, সমস্ত যজ্ঞ ও সমস্ত তীর্থদর্শন তৎক্ষণাৎ কৃত হয়, মোক্ষ নিঃসন্দেহে তাঁহার করায়ত্ত হয়; মুমুক্ষু ব্যক্তি সাংখ্যের দ্বারা, যোগের দ্বারা এবং ভক্তির দ্বারা যে পরম ধাম প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে যতির পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাও 'ন্যাসে'র দ্বারাই অর্থাৎ প্রপত্তির দ্বারাই পাওয়া যায়; প্রপত্তিই পুরুষোত্তম পরমাত্মার সাধন; পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের জন্য যে-সাধনসম্পত্তির প্রয়োজন, মানুষ নারায়ণের প্রপন্ন হইলে সেই সাধনসম্পত্তি ব্যতিরেকেই উহা লাভ করিয়া থাকে।

কেশব কাশ্মীরী কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রপত্তি একটি স্বতন্ত্র পথ। কিন্তু ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের মতে ভক্তি ও প্রপত্তি একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ—একই ব্যাপারের দুইটি দিক মাত্র।[১১] প্রহ্লাদ-কথিত 'নবলক্ষণা' ভক্তি এবং নারদভক্তিসূত্রোক্ত 'একাদশধা' ভক্তির যে-আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে (পৃঃ ২১৪ দ্রষ্টব্য), তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, একই ভক্তি বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রপত্তি সেই সকল রূপেরই অন্যতম একটি রূপ মাত্র।

প্রপত্তিকে আমরা দুইটি দিক হইতে দেখিতে পারি—(১) অসহায়ের প্রপত্তি এবং (২) নিরুপায়ের প্রপত্তি। অসহায়ের প্রপত্তি কী, তাহা আমরা পূর্বে আলোচিত গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারি। নিরুপায়ের প্রপত্তি বুঝাইতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী তুরীয়া-নন্দের প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি। ২৭।৭।১৬ তারিখে আলমোড়া হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি পত্রে লিখিতেছেন: "ঠাকুর একদিন আমায় কাঁদিয়ে ভাসিয়েছিলেন এই গানটি গেয়ে— 'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে।' এইতেই একেবারে আকুলি-বিকুলি ক'রে দিয়েছিলো। সেইদিনই স্থির ধারণা ক'রে দিয়েছিলেন যে, সাধন ক'রে নিজের চেষ্টায় তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি ধরা দিলেই তবে

১১ 'Supreme devotion and complete self-surrender, or bhakti and prapatti, are the different sides of the one fact.'—Indian Philosophy, Vol. I., 2nd Edn, p. 563.

তাঁকে পাওয়া যায়।”[১২]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই শিক্ষা স্বামী তুরীয়ানন্দ নিঃসন্দেহে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবল-পুরুষকারসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি কঠোর তপস্যা ও সাধনভজনেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জপতপ, ধ্যানধারণা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: ‘হরি ভাই, ভগবান কি শাক মাছ যে এত দাম দিয়া অর্থাৎ এত জপ, এইরূপ তপ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবে? তাঁহাকে লাভ করিতে কেবল তাঁহার কৃপা!’ (স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ১৪|৮|১৬)। পরবর্তী কালে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তুরীয়ানন্দজী স্বয়ং বলিয়াছিলেন: ‘গভীর ধ্যান করছি। এক পা এগুলেই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাই। কিন্তু ঠাকুর তা করতে না দিয়ে টেনে আনলেন। তিনি তাঁর লীলার জন্য নূতন recruitও করেন।’ ‘স্বামী তুরীয়ানন্দ’, ভূমিকা, পৃঃ ১৫)।

এইরূপ উচ্চাবস্থাপন্ন মহাপুরুষও ১২|৯|১৫ তারিখে আলমোড়া হইতে একটি পত্রে লিখিতেছেন: ‘নিধি লাভ হলে কি আমার এই দশা হতো? তবে হাঁকুপাঁকু ক’রে কিছু হয় না—এটা একটু যেন বুঝতে পেরেছি। তাঁর দয়া, তাঁর কৃপা বিনা তাঁকে লাভ অসম্ভব—এইটা যেন স্থির সত্য এই মনে হয়।’

‘নিধি’ শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নহে। ইহার অর্থ ‘সপ্তম ভূমি’ অথবা আত্মারাম মুক্ত মুনিগণের কাম্য ‘অহৈতুকী ভক্তি’ হইতে পারে অথবা অন্য কিছু। তবে ১৪|৮|১৫ তারিখে খুব সম্ভব একই ব্যক্তিকে লিখিত একটি পত্রে আছে: ‘জ্ঞাননিধি-লাভের জন্য প্রাণান্তপরিচ্ছেদ করছেন। আর ভক্তিনিধি সংগ্রহ ক’রে তাঁকে ভালবাসছেন। নিধিও—আমাদের পরম সৌভাগ্যবলে অথবা তাঁহার অহেতুক দয়াপ্রভাবে যেরূপেই হোক, নিধিও—আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং আমাদের সেই নিধিতেই এখন প্রাণ মন অর্পণ ক’রে ভালবাসা চাই। তা হলেই সমস্ত আপনি হয়ে যাবে।’ এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত পত্রের ‘নিধি লাভ’ বলিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভের কথাই মনে হয়। যাহা হউক, যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রীঃ একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন: ‘হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি, তখনই নূতন বল পাই’, সেই অসাধারণ মানুষটিও শেষ পর্যন্ত লিখিতেছেন: ‘বিচার তপস্যা দ্বারা কিছু হওয়া (যার হয় তার হোক)—আমরা তো সে বিষয়ে নিরাশ হইয়া তাঁহার চরণকমল আশ্রয় করেছি। এখন তিনি যা করেন, তাই সার ভেবে তাঁর দ্বারে পড়ে আছি!’ (১৪|৮|১৫ তারিখের পত্র) এবং ‘সাধন-ভজন কেবল ডানা-বেদনা করিবার জন্য। ডানা-বেদনা হইলেই বসিবার ইচ্ছা হয়। তখন পক্ষী মাস্তুল ভিন্ন অন্য কোন বিশ্রামের স্থান না থাকায় সেই মাস্তুলেই আশ্রয় লইতে হয়। আকাশে উড়িয়া উড়িয়া কোথাও কোন বিশ্রামের স্থান নাই নিশ্চয় না হইলে, অনন্যশরণ হওয়া যায় না।’ (১৪|৮|১৬ তারিখের পত্র)। তাই স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রপত্তিকে আমরা নিরুপায়ের প্রপত্তি বলিতে পারি।

ভাবিয়া দেখিলে গৃহী গিরিশচন্দ্রের ‘অসহায়ের প্রপত্তি’ এবং ত্যাগী তুরীয়ানন্দের ‘নিরুপায়ের প্রপত্তি’—কোনটিই সহজ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ‘গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।’ পূর্বাচার্যগণ সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি, অপার করুণা, সর্বাতিশায়ী মহিমা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না হইলে কেহই ‘সর্বসাধনবর্জিত’ প্রপত্তি

১২ বিস্তারিত বিবরণের জন্য ‘লীলাপ্রসঙ্গ’, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের প্রপত্তিও সহজসাধ্য নহে। বস্তুতঃ প্রপত্তিও করুণানির্ভর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন : 'যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথে চলেছে, সে ছেলে বরং অসাবধান হয়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।' গিরিশচন্দ্র কাহারও হাত ধরেন নাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেবই অপার অহৈতুকী করুণায় তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজে বকলমা দেন নাই—শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহাকে বকলমা দেওয়াইয়াছিলেন। তাই আমাদেরও নিরন্তর এই প্রার্থনাই থাকুক—ঈশ্বর যেন আমাদের হাত ধরিয়া থাকেন। প্রার্থনা অকপট হইলে আমরা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট অনুভব করিব ঈশ্বর সর্বাবস্থায় আমাদের হাত ধরিয়া আছেন—আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন এবং তখনই আমাদের নিকট প্রপত্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইবে।

ভগবৎপ্রসঙ্গ

স্বামী দেবানন্দ

এই সংসারে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করেও যে-ব্যক্তি ভগবানকে ভুলে অনিত্য কামনাবাসনায় ডুবে থাকে, তার সম্বন্ধে আমাদের আর্য ঋষিরা বলেছেন যে, সেই দুর্মতি নরাধমের জন্মে ধিক্। সে স্থানে না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই শাশ্বত নির্দেশ : 'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'—এই অনিত্য, অসুখকর মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে আমার আরাধনা করো। ঈশ্বরকে ভুলে থাকলে, তাঁর আরাধনা না করলে এই সংসারে শান্তি পাওয়া যাবে না—দুঃখ ভোগই সার হবে। যাঁরা বিবেকী, যাঁদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, যাঁদের অন্তরে সদ্‌বাসনা ও ঈশ্বরানুরাগ জেগেছে 'তে ভূরিদা জনাঃ'—তাঁরা পূর্ব পূর্ব জন্মে অনেক দান-ধ্যান, সুকৃতি করে এসেছেন জানতে হবে। জন্মজন্মান্তরের ঐ সব পুণ্যকর্মেরই ফলে তাঁদের এ-জন্মে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়েছে। যাঁদের ঠিক ঠিক ঈশ্বরে অনুরাগ হয়েছে, যাঁরা ভগবদানন্দের সামান্যতম আস্বাদও পেয়েছেন, তাঁরা কখনও বিপথে গমন করতে পারেন না। প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগীরা তুচ্ছ ক্ষণিক সুখের জন্য তাঁদের অনন্ত সুখকে কখনও বিসর্জন দেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় বলা যায় : 'ওলা মিছরির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা আর কেউ খেতে চায় না।' কিন্তু অনেক লোক আছে যারা মদমত্ত লোকের মত সংসারে আবদ্ধ। সত্যিকারের যাঁরা ভক্ত তাঁরা কখনও সংসারজালে আবদ্ধ হন না। কোন আঘাতে বা ঈশ্বরের কথায় একটু উদ্দীপনা হলেই সংসারের সমস্ত মোহ কাটিয়ে তাঁরা ঈশ্বরান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলা যায় :

কবি তুলসীদাস তাঁর স্ত্রী রত্নাবলীর মোহে অত্যধিক আসক্ত ছিলেন। একদিন তুলসীদাসকে বিশেষ কাজে দূরের এক গ্রামে যেতে হয়েছিল। এই সময় রত্নাবলীর কাছে খবর আসে যে, তাঁর পিতার অন্তিম সময় উপস্থিত। এই অবস্থায় রত্নাবলী পাশের বাড়ির লোকদের জানিয়ে পিতাকে দেখবার জন্য চলে গেলেন। রাতে তুলসীদাস ফিরে এসে স্ত্রীকে ঘরে না দেখে প্রতিবেশীদের বাড়িতে খোঁজ করে জানলেন সে তার পিতাকে দেখতে গেছে। তুলসীদাস

অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তিনি রত্নাবলীকে দেখবার জন্য শ্বশুরালয়ে ছুটলেন; বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর দিক্‌বিদিক্ কোন হুঁশ নেই। ময়লা ছেঁড়া কাপড়, সিক্ত দেহে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে গিয়ে 'রত্না' 'রত্না' বলে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্ হল! রত্নার কানে এল তুলসীদাসকে ঘিরে সবার শ্লেষ এবং বিদ্রূপ-বর্ষণ! দুঃখব্যথায় রত্নার আয়ত চক্ষু দুটি ক্রোধে জ্বলে উঠল এবং ভর্ৎসনার স্বরে স্বামীকে বললেন: 'আজ আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার এই আকর্ষণ হাড়-মাসের দেহটার পিছনে, তা শুধু মোহের, প্রেমের নয়। তোমার এই মোহগ্রস্ত আকর্ষণের টানটুকু যদি ভগবান রামচন্দ্রের চরণে দিতে তাহলে ধন্য হতে, জীবন সার্থক হত তোমার। মুক্তি দাও আজ আমায়।'

তুলসীদাস রত্নাবলীর কাছ থেকে অতর্কিতে এই নিদারুণ কঠোর ভর্ৎসনা শুনে অন্তরে তীব্র আঘাত পেলেন এবং তখনই সমস্ত সাংসারিক মায়া-মোহের আসক্তি ত্যাগ করে তপস্যা করতে চলে গেলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

ঠাকুর বলতেন 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যেমন একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।' রত্নাবলীর দেওয়া তীব্র আঘাতেই তুলসীদাসের মায়া-মোহের আবরণ শ্রীভগবানের কৃপায় কেটে গিয়েছিল, বের হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের খোঁজে। সিদ্ধিলাভ হয়েছিল তাঁরই অনুগ্রহে।

সর্বান্তঃকরণে ডাকলে ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দেন। তিনি ভক্তাধীন। কথিত আছে, এক রাজা একবার তাঁর বিষ্ণুমন্দিরের জন্য একজন পুরোহিত খুঁজছিলেন। যত ব্রাহ্মণই আসেন সকলেই প্রয়োজনে কিছু মিথ্যা কথা বলতেন বলে রাজার পছন্দ হত না। তিনি এক মূর্খ ব্রাহ্মণের সংবাদ পেলেন যিনি পূজাপদ্ধতি বা মন্ত্রোচ্চারণ ভাল না জানলেও কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না। রাজা এই সত্যবাদী মূর্খ ব্রাহ্মণকেই পূজারী নিযুক্ত করলেন। সেবাপূজা ভালই চলছে জানলেন। পরে একদিন রাত্রিতে ঠাকুরকে শয়ন দিতে যাওয়ার আগে মন্দিরে কোন ভক্ত না থাকায় পুরোহিত নিজেই ঠাকুরের নির্মাল্যটি এনে গলায় পরেছেন। এমন সময় রাজা মন্দিরে প্রণাম করতে এলেন এবং ঠাকুরের গলার নির্মাল্যটি চাইলেন। ব্রাহ্মণ তখনই নিজের গলা থেকে গোপনে নির্মাল্যটি খুলে এনে রাজার হাতে দিলেন। এই সময় পূজারীর চুল বড় হয়েছিল এবং পেকেও গিয়েছিল। তাই গলা থেকে মালাটি খোলার সময় পূজারীর কয়েকটি পাকাচুল মালার সঙ্গে জড়িয়ে এল। রাজা সেই পাকাচুল দেখতে পেয়েই তার কারণ জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে বলে ফেললেন, 'তাহলে বোধ হয় স্বয়ং কৃষ্ণেরই চুল পেকে গেছে।' রাজা তা পরীক্ষা করবার জন্য পরের দিন প্রাতে পূজার পর আসবেন এই কথা জানিয়ে চলে গেলেন। পুরোহিত এইবার ভয়ে কেঁদে ফেললেন, কারণ আজ তিনি প্রাণের ভয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন এবং তার শাস্তিস্বরূপ রাজা নিশ্চয়ই পরদিন তাঁর প্রাণদণ্ড দেবেন। সারারাত ধরে ঈশ্বরের কাছে আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলেন: 'ঠাকুর, ধ্রুব প্রহ্লাদকে তুমি রক্ষা করেছ, দুর্বাসার কোপ হতে পাণ্ডবদের রক্ষা করেছ, আজ এ অধমকে তুমি কি রক্ষা করবে না? তুমি ছাড়া কে আছে আমার?' পরদিন সকালবেলা ব্রাহ্মণ মন্দিরের দরজা খুলে কৃষ্ণের রূপদর্শন করে মুগ্ধ ও বিস্মিত! ভগবান ভক্তের জন্য আজ পক্বকেশ হয়েছেন। দেখলেন কৃষ্ণের সব চুলগুলি পাকা।

তাঁর করুণা ও দীনবৎসলতার পরিচয় পেয়ে পূজারী প্রেমে বিহ্বল এবং আনন্দে মূর্ছিত হলেন। পরে পূজারী পূজা সাঙ্গ করে রাজার পথ চেয়ে বসে আছেন, এমন সময় রাজা এলেন। পূজারী রাজাকে কৃষ্ণের সেই পাকাচুল দেখালেন। রাজা কিন্তু মনে করলেন যে পূজারী নিজ জীবন-রক্ষার জন্য কৃষ্ণের মাথায় পরচুলা পরিয়েছেন। তখন তিনি কৃষ্ণের সেই চুলের একটি গোছা ধরে যেই টান দিয়েছেন তৎক্ষণাৎ বিগ্রহের মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে ছিটকে রাজার গায়ে লাগল। রাজা তখন ভয়ে, বিস্ময়ে সংজ্ঞা হারালেন। পরে রাজার সংজ্ঞা ফিরে এলে দৈববাণী শুনতে পেলেন যে, সেদিন থেকে আর কোন রাজা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ রাজারা সংশয়াত্মা। তাদের ভক্তি-বিশ্বাসের অভাব। যারা শুদ্ধ সরল তাদেরই শুধু এই মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থাকবে। পূজারী ব্যাকুল হয়ে মন-প্রাণ দিয়ে ডেকে-ছিলেন বলেই ভগবান তাঁকে রক্ষা করলেন। ষোল আনা মন তাঁকে দিতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেন। আমাদের সংঘ-জননী সারদামণি বলতেন: 'মন স্থির ক'রে একবার ডাকলে লক্ষ জপের কাজ হয়।' ঠাকুর বলেছেন: 'আমি বলি, তিন টান হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।' সুতরাং মনের টান থাকা চাই ষোল আনা। মন না থাকলে পূজা, জপ যা-ই করা যাক না কেন, তাতে কোন ফল হবে না। ভক্তি-বিশ্বাস ছাড়া শুধু বাইরের আচরণ নোঙর ফেলে নৌকা চালানোর সমান। বৃথা পরিশ্রমই সার হয়। মোহ, আসক্তি না গেলে ভোগ কাটে না। সংসারে বার বার আসতে হয় মায়া-মোহের টানে

ঠাকুর বলতেন, উত্তম বৈদ্য ও উত্তম আচার্যের কথা। উত্তম বৈদ্য যেমন রোগীর ইচ্ছা না থাকলেও জোর করে ঔষধ খাওয়ান তার মঙ্গলের জন্য, তেমনি উত্তম আচার্যও শিষ্যের কল্যাণের জন্য তাকে বার বার উপদেশ দেন এবং টেনে তোলেন মায়া-মোহময় এ-সংসারসাগর থেকে। এ-বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে: এক ব্যক্তি অত্যন্ত ধার্মিক ছিল। সে প্রত্যহ সাধুসেবা না করে অন্নগ্রহণ করত না। তার বাড়ির নিকটেই ছিল তীর্থযাত্রার একটি পথ। সুতরাং সে প্রতিদিনই ঐ পথে সাধুসেবার সুযোগ পেত। একদিন অনেক বেলা পর্যন্ত কোন সাধুকে না পেয়ে সে অপেক্ষা করে বসেছিল। এমন সময় সে এক ত্যাগী মহাপুরুষকে আসতে দেখল। তিনি কাছে এলে ভক্তটি তার সাধুসেবার বাসনা জানাল। মহাপুরুষ একটু জলপান করতে চাইলেন। মহাপুরুষ কারও গৃহে যেতেন না বলে পথের পাশে একটি স্থানে তাঁকে বসিয়ে লোকটি বাড়ি গেল এবং বাড়ি থেকে মহাপুরুষের জন্য ফল, মিষ্টি, জল এবং বড় একটি আসন নিয়ে এল। তিনি সেই সকল খাবার খেয়ে গায়ের চাদরটি খুলে রেখে একটি গাছের ছায়ায় সেই লম্বা আসনটি পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। লোকটি দেখল যে, মহাপুরুষের গায়ের চাদরটি ছেঁড়া, বহু ছিদ্র। লোকটি তখনই বাড়িতে গিয়ে সুঁচ সুতো নিয়ে এসে চাদরটি রিপু করে ফেলল। মহাপুরুষ ঘুম ভেঙে উঠে চাদরের রিপু দেখে অবাক হয়ে গেলেন। চাদরটি এত সুন্দর রিপু করা হয়েছে যে, কোথায় যে ছেঁড়া ছিল তা আর বোঝবার উপায় নেই। মহাপুরুষ অত্যন্ত প্রীত হয়ে ভক্তটিকে আশীর্বাদ করলেন। ভক্তটি তাঁকে বলল, 'প্রভু আজ হতে আপনিই আমার গুরু।' মহাপুরুষ তার সেবাযত্নে এত খুশি হয়েছিলেন যে, ভক্তটিকে বললেন, 'আমি বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি, তুমিও আমার সঙ্গে চল।' ভক্তটি বলল, 'নিশ্চয়ই যাব প্রভু, কিন্তু আমার ছেলে দুটি নাবালক, তাদের মানুষ করে

আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই। দয়া করে আমাকে সাতটি বছর সময় দিন।' গুরুদেব রাজী হয়ে চলে গেলেন। সাত বছর পরে যখন এলেন তখন শিষ্যটি বলল, গুরুদেব, আমার বড় ছেলেটিকে মানুষ করেছি, কিন্তু ছোটটি এখনও নাবালক, তাকে মানুষ করার জন্য আমাকে দয়া করে আরও সাতটি বছর সময় দিন।' গুরুদেব এবারেও চলে গেলেন। সাত বছর পর তিনি এসে জানলেন শিষ্যটি মারা গেছে। বাড়ির লোকের কাছে তিনি শুনলেন যে, লোকটির ছোট ছেলের প্রতি খুবই মায়া ছিল। তার চিন্তা করতে করতেই লোকটি মারা গেছে। গুরুদেব যোগবলে জানতে পারলেন যে, লোকটি মায়া-মোহে আচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুর পর বলদ হয়ে জন্মগ্রহণ করে ঐ ছোট ছেলের জমিতে লাঙ্গল টানছে। গুরুদেব তার গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে বলদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। শিষ্য তখন গুরুদেবকে চিনতে পারল। কিন্তু ছেলের প্রতি অত্যধিক মায়ায় সে এবারেও বৈকুণ্ঠে যেতে চাইল না। ছেলের জমি ভালভাবে চাষ করে ছেলের উন্নতি করার জন্য সে আরও সাতটি বছর সময় চেয়ে নিল। সাত বছর পরে এসে গুরুদেব দেখলেন গরুটি মরে গিয়ে এবার কুকুর হয়ে জন্মে ছেলের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। তখন আবার তিনি মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে কুকুরের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে কেঁদে বললে, 'প্রভু, আমি যাব, তবে দয়া করে আরও সাত বছর পর আসুন। ওকে মানুষ করেই চলে যাব।' এত মায়া যে কুকুর হয়ে থাকবে তবু গুরুদেবের সঙ্গে যাবে না। সাত বছর পরে এসে গুরুদেব দেখলেন এবার কুকুরটি মরে সাপ হয়ে জন্মে ছোট ছেলের মাটিতে পোঁতা গুপ্ত ধনসম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে। এবার গুরুদেব শিষ্যের ঐ ছোট ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তোমার মাটিতে পোঁতা অনেক ধনসম্পত্তি আছে। এবার তুলে নাও। কিন্তু সাবধানে তুলবে ওখানে একটি বিষধর সাপ আছে।' ছোট ছেলে তখন সাপটিকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে রেখে নির্ভয়ে তার ধনসম্পত্তি তুলে নিল। গুরুদেব ঐ মৃত সাপের প্রাণ ও জ্ঞান সঞ্চার করে বললেন, 'এখন মায়া-মোহের ফল বুঝতে পারলে তো? যে ছেলের মোহে তুমি এত দুঃখকষ্ট বরণ করলে, সেই ছেলেই অর্থলালসায় তোমাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেললে।' এ-সব শুনে শিষ্য বলল, 'গুরুদেব, এবার আমার শিক্ষা হয়েছে, আপনি আমাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে চলুন।' গুরুদেব শিষ্যকে নিয়ে বৈকুণ্ঠে যাত্রা করলেন। কর্মভোগ কাটল গুরুর কৃপায় বহুজন্মের পর।

গুরুদেব উত্তম আচার্য ছিলেন বলেই শিষ্যকে শেষ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেন। উত্তম গুরু না হলে শিষ্যের এই মায়ার আবরণ সরিয়ে দিতে পারতেন না। 'গহনা কর্মণো গতিঃ॥'—কর্ম দুর্বিজ্ঞেয়। মায়া-মোহ আসক্তির কি শোচনীয় পরিণাম দেখুন! 'অবশ্যমেবভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।'—শুভাশুভ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তবে যারা তাঁর শরণাগত তাদের তিনি কৃপা করেন। শোকে-মোহে তারা বিচলিত হয় না। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বিচার ও সাধুসঙ্গের ফলে তারা নির্লিপ্ত থাকে। মোহাচ্ছন্ন হয় না এ মর-সংসারে। ঠাকুর বলতেন: 'সংসারী জীব মনেতে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ মনন করতে পারলে তাদের আর অন্য কোন সাধনের দরকার হয় না।', 'নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।', 'সরল হলে, ঈশ্বরকে শীঘ্র পাওয়া যায়।' মায়া-মোহ থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করতে হয় এবং সাধুসঙ্গ ও সদসৎ বিচারও থাকা চাই। ঈশ্বরকে ভুলে থাকে বলেই জীবের দুঃখ। এই ক্ষণস্থায়ী জীবন কখন যে শেষ হবে তা কেউ বলতে পারে না। এজন্য দুর্লভ আয়ু নষ্ট না

করে সর্বদাই ভগবানকে স্মরণ করা উচিত। যমরাজ যখন নিতে আসেন, তখন সমস্ত সম্পত্তি উজাড় করে তাঁর পায়ে দিলেও তিনি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেন না। 'নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্।'—কর্ম শেষ হোক বা না হোক কোন কিছুর জন্যই মৃত্যু অপেক্ষা করে থাকে না। সুতরাং সময় থাকতে ঈশ্বরকে ডেকে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ

ঈশ্বরানন্দলাভের চেষ্টা করাতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আসক্তি ও অহংরূপী নোঙর তুলে নিয়ে সরল ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে ডাকতে হবে। তিনি ভাবগ্রাহী। ভক্তিভাবে তাঁকে ডাকলেই তাঁর মায়ার পর্দা তিনিই সরিয়ে নিয়ে মুক্তির পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি ভক্তবৎসল। শুদ্ধ প্রেম ও ভক্তিতেই তিনি তুষ্ট। যেখানে ব্যাকুলতা ও অনুরাগ, সেখানেই তাঁর প্রকাশ।*

* ৩০।১১।৮০ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ। শ্রীসুভাষ মিত্র কর্তৃক অনুলিখিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

৪

ঠাকুরের সারদা-সাধনা

আজ যে রামকৃষ্ণ সাতবছর পরে কামারপুকুরে ফিরে এসেছেন তিনি এক নবাবির্ভাব। গঙ্গোত্রীর অতল হৃদয় থেকে প্রবহমাণা মহাসাগরের গভীরে অনুপ্রবিষ্টা পরিপূর্ণা গঙ্গার মতো এসেছেন নূতন ঠাকুর। কূলে কূলে ভরা। কূল ছাপিয়ে মহাসাগরে একাকারকারিত রামকৃষ্ণ।

যে সারদা-শিল্পী রামকৃষ্ণ পূর্ব পরিচয়ে সারদা প্রতিমাকে 'এক-মেটে' করে রেখে গিয়েছিলেন আজ সে শিল্পী নিজে বিবর্তিত হয়েছেন বহু দিব্য দ্বৈত ও অদ্বৈত সিদ্ধির আনন্দ-ধন্য হয়ে। নিজ অস্তিত্বে আহিত বহু দেবদেবীর সমারোহে সমৃদ্ধ রামকৃষ্ণ। সর্বোপরি বহু সাধনার অন্তে নিজ অনুভূতিতেও জেনেছেন যে একদিন উষ্ণ-মস্তিষ্ক ভৈরবী ব্রাহ্মণী শাস্ত্র-প্রমাণসহ রামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে দক্ষিণেশ্বরে আহূত পণ্ডিতসভায় যে ঘোষণা করেছিলেন, তা সর্বথা সত্য।

এমনি-এই রামকৃষ্ণের আগমনে এল সারদার প্রাণের দুয়ারে : "তুমি এস।" পূর্ণতার হৃদি-কেন্দ্র থেকে এমন অতিপবিত্র আহ্বান কোন কালে কোন কিশোরীর প্রাণের দুয়ারে এসে এমন সুস্মিত মৃদু আঘাত করেছিল বলে তা আমরা জানিনি।

সারদা কামারপুকুরে এসে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে দেখেন আশ্চর্যপুরুষ সদানন্দময় রামকৃষ্ণকে যেমনটি পূর্বে কখনো দেখেননি। তাই বলেছিলেন :

> "তাঁকে কখনও নিরানন্দ দেখিনি। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি—সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। কখনও বাপু নিরানন্দ দেখিনি।"[৮]

সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভের এই উত্তরকালটিতে ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুর যখন কামারপুকুরে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি নিজ জীবনে যে অভিনব

৮ তদেব, পৃঃ ৩৯

সাধনাটির অবতারণা করলেন তার ইষ্ট-লক্ষ্য হল শ্রীমা সারদা।

তাই এ সাধনাকে যথার্থভাবে ঠাকুরের সারদা-সাধনা বলা চলে।

নিজেকে অবতারপুরুষ জানার পরেও যে তিনি এই পল্লী কিশোরীকে তাঁর আরাধ্যা নিরূপণ করে, তাঁর সকল পুঞ্জীভূত সাধন-সিদ্ধির শক্তিকুশলতার দ্বারা, তাঁর দেবীত্ব বিকাশে যত্নপর হলেন, এ সারদা-রামকৃষ্ণের যুগ্ম-জীবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

ঠাকুরের সারদা-সাধনা কোন প্রস্থশাস্ত্রের অনুশাসনগতভাবে আরম্ভ হয়নি। যিনি 'ধর্মস্য গোপ্তা' তিনি নব-ধর্মস্য হোতাও বটেন। ধর্মে প্রামাণিক নবাবতারণা শুধু তিনিই করতে পারেন। যে সারদা-সাধনা আরম্ভ হয়েছিল একান্ত ঘরোয়াভাবে তার পরিসমাপ্তি কিন্তু হয়েছিল এক শাস্ত্রবিহিত অথচ অশ্রুতপূর্ব সম্পূর্ণাহুতিতে।

সনাতন ধর্মের অধ্যাত্ম-সাধন বিবর্তনে ঠাকুরের এই সাধন-প্রবর্তন একটি মৌলিক অবদান, যা করবার শক্তি-জ্ঞান-সাধ্যতা শুধু অবতারপুরুষে সম্ভবে।

ঠাকুর তন্ত্রবেদান্ত সাধনায় সিদ্ধ হয়ে, নরলীলায় মন নাবিয়ে নিয়ে সারদা-সাধনায় রত হয়েছিলেন। এ সাধনা তাঁর অপরূপার সাধনার উদ্বৃত্ত পরিশিষ্ট নয়। এটি তাঁর সকল সাধনার ভাবারোহ, চরম পরিণতি। এ সাধনার আদিকাণ্ড শুরু হয়েছিল ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আনুষ্ঠানিক সাধনার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার মধ্যবর্তী কালে। প্রথম থেকে তাঁর এই অতি ঘরোয়া সাধনাটি এমন ব্যক্তিগতভাবে চলছিল যে কারো মনে হয়নি, ঠাকুরের সাধনময় জীবনের এও আর এক এমন প্রবহমাণ সাধনা যার ফল্গুস্রোতে কালে সকল সাধনার স্রোত মিলিত হবে। এ সাধনার কেন্দ্রমণি ছিলেন 'কুটোবাঁধা' কনেটি।

আজ এক সাধন-পর্যায়ের বিরামভূমি থেকে অন্য পর্যায়ে অনুপ্রবেশের পূর্বে, ঠাকুর ঐ অভিনব ঘরোয়া সাধনাটির প্রবাহকে কামারপুকুরের পুণ্য-অঙ্গনে সহজ স্নিগ্ধ পরিবেশে এগিয়ে নিয়ে চললেন আলোকমোহনার অভিমুখে সারদা কিশোরীর মাধ্যমে। সর্বতোভাবে তাঁর মুখাপেক্ষিণী সারদার পূতপবিত্র হৃদয়খানি নিজের অতি সাত্ত্বিক প্রেমে আপন করে নিয়ে, ঠাকুর তাতে সঞ্চারিত করতে থাকেন তাঁর বহু সাধনায় আহৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্যাস।

'চাঁদামামা'র কথা কোন বালিকা কবে না শুনেছে? কোন বালিকা কবে পেয়েছে সকল শাস্ত্রের সরলতম মর্মকথা সুমুখে আসীন স্বয়ং চাঁদামামার হাসি-কৌতুক-মধুর মুখ থেকে? ঠাকুর সারদাকে বললেন:

> "চাঁদামামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমন ঈশ্বর সকলের আপনার, তাঁকে ডাকবার সকলের অধিকার আছে। যে ডাকবে, তিনি তাঁকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন। তুমি ডাকো তো তুমিও দেখা পাবে।"[১]

নিজেকে হাতে পাইয়ে দিয়ে সারদাকে 'চাঁদামামা' এই কথাটি বললেন! তবে সাধন করে হাতে-পাওয়া চাঁদামামাকে চিনতে হয়েছিল সারদাকে। যুগে-যুগে সাধন করেই কাছের ভগবানকে চিনতে হয়েছে। এমন না হলে কি লীলা-খেলা জমে?

ঠাকুরের শিক্ষায় প্রকাশিত এই ঈশ-সনদটি, পরবর্তী কালে শ্রীমা আপনার অনুভূতির সুষমায় মণ্ডিত করে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে ঈশ্বর আমাদের অতি আপনার জন। সেই সুবাদে এ ধরার সকলেই আমাদের আপনার জন। সকলকে

১ তদেব, পৃঃ ৫১

আপনার করে নিতে হয়।

এ নিয়ে পরে আমাদের বিশদ আলোচনা হবে।

এই বিচিত্র রহস্যটি অনুধাবনযোগ্য: শ্রীমা ঠাকুরের প্রথম-প্রধান শিষ্যা হলেও একই সঙ্গে ছিলেন তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধিতা। কাজেই এই বন্দিতার গুরু হলেও ঠাকুর শ্রীমাকে তাঁর সমানধর্মিণীর আসনে আসীন রেখেই শিক্ষা দিয়েছেন।

আর শ্রীমাকে অনেক উপদেশ দিয়ে তাঁকে শিক্ষা দিতে হত না। শ্রীঠাকুরের উপস্থিতির পরিমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে একটি অতি-সক্রিয় দিব্য আবির্ভাব ছিল ও আছে, শক্তিরূপিণী সারদা অবলীলায় ও অনেক সময় এমন কি নিজের অজ্ঞাতে, আপন অস্তিত্বে টেনে নিতেন। একথা যেন আমরা কখনো না ভুলি যে আজন্মই সারদা ছিলেন জ্ঞানদায়িনী। তাই গুরুমুখে যেমনি যা শুনেছেন, তেমনি তা হয়েছেন। কারণ, সকল জ্ঞানের অফুরন্ত উৎস যে নিজ অন্তরে। তবে মানুষীরূপে আসায় মায়ার যে আভাস-আবরণীতে তাঁকে নিজেকে জড়াতে হয়েছিল, তাতে আপাত-আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়োজন ছিল। গুরুরূপে ঠাকুর তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের সহায়ক হয়েছিলেন।

সদানন্দময় ও সদারঙ্গময় ঠাকুরের শিক্ষা-দীক্ষা দানের ধারা ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। হাসি-সরস মাধুর্যে ঠাকুর ধর্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বকে এমন সুস্বাদু ও সহজ-পাচ্য মানস-আহার্যে পরিণত করতেন যে, তা গ্রহণ করতে হৃদয় উল্লাস উন্মুখ হয়ে থাকত।

"শ্রীমা সারদাদেবী"র জীবনী-লেখকের ভাষায়:

> "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) একদিকে যেমন স্বীয় ত্যাগোজ্জ্বল জীবনাদর্শ শ্রীমায়ের সুমুখে তুলিয়া ধরিলেন এবং উচ্চ ধর্মজীবনলাভের জন্য কিরূপে চরিত্র গঠন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিলেন, অপর দিকে তেমনি দৈনন্দিন গৃহস্থালি কর্ম, দেব-দ্বিজ-অতিথি সেবা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা, পরিবারের সেবায় আত্ম-সমর্পণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিতে থাকিলেন। যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন—এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া লোকব্যবহার, পরিবারের প্রত্যেকের রুচি, স্বভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার সহিত আদান-প্রদান, নৌকায় বা গাড়ীতে যাইবার সময় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা, এমন কি প্রদীপের পলিতাটি কেমন করিয়া রাখিতে হয়, ইত্যাদি কিছুই সেই অপূর্ব শিক্ষা হইতে বাদ পড়িল না। এই কামগন্ধহীন, স্বার্থ-হীন, আনন্দমিশ্রিত, সাগ্রহ উপদেশলাভে সরলা পূতচরিত্রা, ধর্মপ্রাণা, পতিব্রতা পল্লীবালা কিরূপ আনন্দবিভোর হইয়া-ছিলেন, তাহা তিনি পরে স্বয়ং স্ত্রীভক্তদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন—'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।'"[১০]

ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুরের সঙ্গে কামারপুকুরে এসেছিলেন তাঁর গুরু ও অভি-ভাবিকারূপে। তিনি সারদার প্রতি ঠাকুরের সপ্রেম ঘনিষ্ঠ ব্যবহার লক্ষ্য করে, শিষ্যের আধ্যাত্মিক ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিতা হলেন। এমন কি ঠাকুরকে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে এরূপ ব্যবহারে তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চভূমি থেকে

১০ তদেব, পৃঃ ৩৭

নিম্নে পতনের সম্ভাবনা সূচিত হচ্ছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে ঠাকুরের উপদেষ্টা ও শিক্ষাদায়ক ছিলেন তাঁর অদ্বৈতগুরু তোতাপুরী, যিনি বলেছিলেন :

"স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে ব্যক্তি যথার্থ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।"[১১]

তিনি আরও বলেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় ব্রহ্মবিজ্ঞানী পুরুষ যদি নির্বিকার চিত্তে সহধর্মিণীর প্রতি কর্তব্য পালন করেন, তবে তাতে ধর্মহানি হয় না।

সাধকরূপে, বহুসাধনায় সিদ্ধরূপে ও অবতাররূপে শ্রীরামকৃষ্ণের মাঝে সদাজাগ্রত ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক-মনীষা-জাত গবেষণা-চিকীর্ষা। তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই তিনি এখন নিজ জীবনের একটি সুদুরূহ চরম গবেষণায় ব্রতী হলেন। তাঁর অন্যান্য সাধনার সাধক ছিলেন একক রামকৃষ্ণ। কিন্তু এই পরম সাধনার পূর্ণাংশভাগিনী হলেন সহধর্মিণী সারদা।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী এতকাল শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। তাই আপন শিষ্যকে আশু বিপদ থেকে রক্ষা করার একটি মাতৃসুলভ আকুলতায় ব্রাহ্মণী কখনো আবিষ্টা হতেন। সে সময়ে তাঁর স্বঘোষিত ও প্রতিপাদিত সেই সত্যটি মনে থাকত না যে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারপুরুষ ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মহাযোগী। অতএব তাঁর পতনের সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

তাছাড়া তিনি এটি সম্যক্ অবধারণা হয়ত করতে পারেন নি যে শক্তিরূপিণী, জ্ঞানদায়িনী শ্রীমাকে ঠাকুর তাঁর সকল সাধন-সিদ্ধির উত্তরবিবর্ধিনীরূপে, ও জগতে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিকাশের জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

একথা বলা প্রমাণসহ হবে না যে ঠাকুর কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নিয়ে কোন কর্মে অগ্রসর হতেন। ভবতারিণীর যন্ত্ররূপেই তাঁর দ্বারা সব কাজ সাধিত হয়েছে। আজ যখন তাঁর সমগ্র জীবনখানি আমাদের সুমুখে সুপ্রকাশিত, ভেবে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়, নেপথ্যবাসিনী ভবতারিণী কেমন বিশদভাবে দফায় দফায় ঠাকুরের ও তৎসহ যথাকালে সারদার যুগ্ম জীবনখানি প্রস্ফুটিত করেছিলেন। ইচ্ছাময়ীর সকল ভাবনার নিগূঢ় ছন্দ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর বোধিগোচর না হওয়া একান্ত অপ্রত্যাশিত নয়।

উচ্চকোটির সাধিকা বলে তিনি অবশ্যি নিজের ভ্রান্তি অল্পদিনেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই অবিলম্বে নিজের দোষ স্বীকার করে, প্রাণভরে ঠাকুরকে তাঁর পূজা নিবেদনান্তর তপস্বিনী নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন কাশীর পথে। এসেছিলেন অজ্ঞাত ঠিকানা থেকে গঙ্গার স্রোতে, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ধূলিধূসর পথে।

ভৈরবী-বিদায়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করলেন দক্ষিণেশ্বরে। সারদা ফিরে গেলেন কামারপুকুর থেকে নিজ পিত্রালয়ে জয়রামবাটীতে।

এই হল ঠাকুরের সারদা-প্রতিমাকে দো-মেটে করে রেখে যাওয়া।

স্বামী-তীর্থ-যাত্রিণী সারদা

'দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ' দিন, রাত্রি, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—ঘুরে ঘুরে আসে যায়। এমনি করে

১১ স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৩২০

দেখতে দেখতে চারটি বছরের অধিক ভেসে গেল দুর্বার কালস্রোতে। সারদা কিশোরী, যাঁর হৃদি-কন্দরে আনন্দের পূর্ণঘটটি বসিয়ে রেখে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিছলেন, তিনি আজ আঠার বছরের তরুণী।

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগত ঠাকুর অবিশ্বাস্যভাবে সারদাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে থেকে আবার অচিরে ভগবদ্‌ভাবে উন্মত্ত হলেন। তাঁর উন্মাদনার বহু বিচিত্র বার্তা জয়রামবাটীতে সারদার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানতে লাগল। গাঁয়ে রটে গেল রামকৃষ্ণ এবার নিরেট উন্মাদ হয়েছেন। কাজেই সারদা হলেন পাগলের স্ত্রী! পল্লীরমণীদের নির্মম ব্যঙ্গতার তিক্ত পুনরাবৃত্ত ধারালো উক্তিগুলি: 'ও মা, শ্যামার মেয়ের ক্ষেপা জামাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে', আর শুনতে অক্ষম হয়ে সারদা নিজেকে করলেন স্বগৃহবন্দিনী।

এ কি করে সম্ভব? সেই সদানন্দময়, জ্ঞান-প্রেম ভাস্বর, হাসিকৌতুকরসময় অনুপম স্বামীকে সারদা জেনেছিলেন নিকটতম আপনজনরূপে তাঁর চোদ্দ বছর বয়সে,—তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন—, এ কি বিশ্বাস্য? তবে, তবে কেমন করে এতদিন তাঁকে এমনি করে একেবারে ভুলেই বা আছেন? তাঁর মন-প্রাণ বেদনায়, শঙ্কায়, ক্রন্দনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। যদি তিনি সত্যি-সত্যি পীড়িত হয়ে থাকেন তবে কে তাঁর সেবা করবে?

এ সময়ে নিশ্চয় সারদাকে তাঁর চাই।

'আমাকে তাঁর চাই'—এটি সারদার চিরন্তন জীবনসঙ্গীতের মূল রাগিণী। 'তাঁকে আমার চাই' এ শ্রুতি-বিচ্যুত সুর সারদার কণ্ঠে কখনো একটিবার ধ্বনিত হয়নি। তিনি যে রামকৃষ্ণের আর সকল জীবের 'চিরকালের মা'।

নিজের স্বরূপোদয়ের পূর্ব-রাগ-রঞ্জিতা কুণ্ঠিতা-ব্যথিতা সারদা তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকল্প গ্রহণ করলেন—তিনি যাবেন স্বামী-সকাশে দক্ষিণেশ্বরে। তাঁকে চাক্ষুষ দেখে নিশ্চিন্ত হবেন। এই তরুণীর এই সংকল্পের ফলশ্রুতি ভাবীকালে কি অভাবনীয় ও অমেয়ভাবে সকল মানবজাতির ধর্মবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ করে-করে চলেছে সে তত্ত্ব এক অতি গম্ভীর ধ্যানের বস্তু।

উদারহৃদয় ধীমান পিতা রামচন্দ্র নিজে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে গঙ্গা-স্নানাভিলাষী অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরের পথে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে রওনা হলেন। প্রায় ষাট মাইল পথ হেঁটে গেলে তবে দক্ষিণেশ্বর।

উন্মুক্ত প্রান্তরের নবপরিবেশে পায়ে হেঁটে পথ চলতে প্রথমে দুদিন আনন্দে বেশ কাটল। উদার সীমাহীন সুনীল আকাশ। অপরিচিত কত গাছ, লতা, গুল্ম, পাখী। অপস্রিয়মাণ সুদূর চক্রবালে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বহুচেনা তালগাছগুলি আপন-জনের মতো। নূতন নূতন গাঁয়ে কত নূতন মানুষ, ছেলেমেয়ে। এই প্রথম দূরের পথে সারদার গাঁয়ের বাইরে আসা। আর যাওয়া হচ্ছে স্বামী-তীর্থে। সারদার হৃদয়খানি উদ্দীপনায় ভরে উঠল। কিন্তু এত পথ পায়ে হেঁটে চলতে অনভ্যস্তা সারদা ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ায়, অন্যান্য যাত্রীদের এগিয়ে যেতে বলে কন্যাসহ রামচন্দ্র পথের পাশের চটিতে আশ্রয় নিলেন। [ক্রমশঃ]

দুখের সাথী

শ্রীশান্তশীল দাশ

দুঃখ যতই গভীর হবে
ডাকবো আমি ততই তোমায় ;
যেমন করে আঁধার হলে
তাকিয়ে থাকি আলোর আশায় ।
দুঃখদিনের তুমি সাথী ;
নামে যখন আঁধার রাতি,
তখনি তো তোমাকে পাই—
আপন করে নাও যে আমায় ।

সুখের দিনের কোলাহলে
তোমায় আমি ভুলেই থাকি,
কত-না জন আসে ও যায়,
ভুলেও তোমায় কই গো ডাকি
আঁধার হ'লে কেউ-না থাকে,
তখন এ-মন তোমায় ডাকে
আকুল হ'য়ে সেই আঁধারে
চোখের জলে তোমাকে পায় ।

চেতনায় তুমি

ডক্টর গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়

তোমাকে চেয়েছি আমি
হে অনন্ত, সত্যকাম, গুণের আকর !
অযুতবছর ধরে
যুগে যুগে জন্মান্তরে চেয়েছি তোমায়
আমার মনুষ্যজন্ম সংগোপনে
কোন্ বোধির আদেশে
অনুগামী হ'য়ে থাকে স্বরূপে তোমার ?

হে শৌর্য, হে সৌম্য, হে তপোধন !
আসমুদ্রহিমাচলে আমার অন্বেষ্টা মন
ব্যাপৃত হয় সে কোন্ সত্যের সন্ধানে ?
হেথা-হোথা খুঁজে মরি তব প্রত্যাশায়
অথচ সে অকায়-সত্তা আমারি হৃদয়ে
উপলভ্য-অস্তিত্ব নিয়ে সতত বিরাজে !

হে শ্রেয়ঃ, হে জ্যোতিঃ, হে প্রেমময় !
তোমাকে মূর্তি ক'রে অনুক্ষণ-ধ্যানে
পেতে চাই সত্যরূপে নিত্যের মননে
সে সূর্য-প্রতীক্ষা মোর সার্থক হোক্
মূর্ত হও হে প্রজ্ঞা অনুভূতি-কায়ে ।

চির-অনুরাগী

শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি ত প্রেমের উৎস,—প্রেমের স্বরূপ
বিতৃষ্ণা কোথায় ?
জীবনবৈরাগ্য যদি শেষ সত্য হোতো
তাহলে বৃথাই—
জীবনলীলায় প্রেমে নররূপ নিলে।
বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে
ভুবনের সর্বজীব লাগি বেদনায়
না যদি আকুল হোতে
তাহলে অযথা—
নেমে কেন এলে তুমি ধুলার ধরায়
মূর্তজ্যোতি মূর্তপ্রেম রামকৃষ্ণরূপে ?
পাপী তাপী ভ্রষ্ট সিদ্ধ আবালবনিতাবৃদ্ধ
স্থান দিলে শ্রীপদে তোমার সমবেদনায় ?
জীবনপিপাসাক্লিষ্ট
ধরণীবাসীর যত জ্বালা যত দুঃখ
না যদি বাজিত তব প্রাণে শেলসম
তাহলে কেন-বা
মানুষের দ্বারে দ্বারে অযাচিত গেলে
মুক্তিমন্ত্র দিতে—
মৃত্যুঞ্জয়ী অনুরাগে সিক্ত করি দিতে
এ মর্ত্যবাসীরে ?

ব্যক্তির সীমানালুপ্ত সর্বব্যাপী প্রেম
সমদরশন
পাপে পুণ্যে কলুষে অমৃতে —নিরাসক্ত
এই তব পরিচয়।
অম্ল তিক্ত মধুর কষায় অমৃত গরল—
এ সবার মাঝে
অনাদি অনন্ত কাল তুমি প্রবাহিত।

তুমি ত বৈরাগী নও, চির-অনুরাগী।
এ-সৃষ্টি তোমারি ছায়া ;
এর প্রতি বিন্দু ক্রান্তি সীমা সংজ্ঞা মাঝে
প্রমূর্ত তোমারি প্রেম।
জীবনস্বরূপ তুমি
জীবনেরে তাই ভালবাসো।

মা সারদামণি

শ্রীব্রজদুলাল দে

মা সারদামণি, করুণার খনি
অধমতারিণী পতিতপাবনী
নররূপ ধরি এলে নারায়ণী
কৃপাময়ী মাগো ভক্তিমুক্তিপ্রদা

'দোষ কারো তুমি, ধরোনাক আর
নিজের দোষেরে স্মর বারে বার
কেউ পর নয়, জগৎ তোমার'
শেষ বাণী তব পূরিল বসুধা

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূর্ব সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, ভারতীয় 'কর্মবাদ' ও 'ঈশ্বরমোক্ষদাতৃত্ববাদ' বা 'ঈশ্বর-প্রসাদবাদ' স্ববিরোধদোষদুষ্ট নিশ্চয়ই—যেহেতু যদি আমরা আমাদের নিজেদের নিষ্কাম কর্ম ও সাধনা দ্বারা মুক্তিলাভ করি, তাহলে ঈশ্বর মোক্ষদাতা হবেন কিরূপে; এবং তাঁর প্রসাদ বা করুণার আবশ্যকতাই বা কোথায়?

অতি ন্যায্য কথা। কিন্তু তাহলেও, যে 'ঈশ্বরমুক্তিদাতৃত্ববাদ' ও 'ঈশ্বরপ্রসাদবাদ' এতদিন ধ'রে এতজনের দ্বারা এতস্থানে প্রপঞ্চিত হয়েছে, এবং এত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চিত করেছে, তা ত একেবারে অবহেলা করা যায় না অযৌক্তিক ব'লে। কঠিন ন্যায়ের দিক থেকে অযৌক্তিক হলেও, তাদেরও মূল্য আছে যথেষ্ট; এবং সেজন্য যে ক'রেই হোক না কেন, তাদেরও 'কর্মবাদ' এবং 'আত্ম-নির্ভরশীলতাবাদে'র সঙ্গে মেলাতেই হবে আমাদের। সে প্রচেষ্টাই এখন একটু করা যাক।

অবশ্য নিঃশর্ত কঠোর যুক্তির দিক থেকে এ স্থলে কিছু করবার আছে ব'লে মনে হয় না। সেজন্য ভারতবর্ষীয়গণ সাধারণতঃ নিজেদের, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জগতের কাছেও অতিশয় ঈশ্বর-ভক্ত ধর্মপ্রাণ জাতি ব'লে পরিচিত হ'লেও, কোনো কোনো জ্ঞানিজন এই সার্বজনীন ভাবভাবনার মধ্যেও সাহসভরে বলেছেন যে, প্রকৃতকল্পে ভারতীয় দর্শন 'ঈশ্বরবাদ'ও নয়, সাধারণ অর্থে, ধর্মমূলও নয়; বরং কেবলমাত্র 'আত্মবাদ', আত্ম-নির্ভরমূল। কারণ, সামান্যমাত্রও চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, যে কর্মবাদকে ভারতবর্ষ অনেক ভাবনাচিন্তার পরই গ্রহণ করেছে, বহু দার্শনিক সমস্যার অন্য কোনো সমাধান খুঁজে না পেয়ে—যথা, নিত্যতৃপ্ত নিত্যপূর্ণ ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করবেন; পরমকরুণাময় দীনত্রাতা যিনি, তাঁর জগতে কেন এরূপ অসংখ্য দুঃখক্লেশ; পরমন্যায়বান নিত্যানিরপেক্ষ যিনি, তাঁর জগতে কেন এরূপ অসংখ্য সুখিদুঃখী-পণ্ডিত-মূর্খ-ধনীদরিদ্র-প্রমুখ ভেদ থাকবে ইত্যাদি—সেই 'কর্মবাদ'কে রাখতে গেলে, আর অন্য কোনো 'বাদে'র স্থান, ভারতদর্শনে থাকতেই পারে না, যেহেতু 'Reason is a jealous master'—'যুক্তি'র মধ্যে কোনো ফাঁক নেই বিন্দুমাত্রও, 'যুক্তি' যুক্তিই; 'যুক্তি' একমাত্র বিচার-বিবেচনার একেবারে একটিমাত্র সোজা পথেই চলতে পারে, এদিক ওদিক না চেয়ে।

কিন্তু এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হ'ল অনুভূতি বা ভক্তি। অনুভূতি অত কঠিন নয়, প্রস্তরবৎ অনড় অটল নয়; কিন্তু তা জলধারার ন্যায় উদ্বেলিত, নির্ঝরিণীর ন্যায় উচ্ছ্বসিত—যার কোমল-শীতল ক্রোড়ে প্রবেশ করতে পারে, নিমজ্জিত হতে পারে অনেক কিছুই। সেজন্য, এই দিক থেকেই কেবল আমরা কঠিন 'কর্মবাদ' ও কোমল 'ঈশ্বরপ্রসাদবাদ'কে হয়ত সমন্বিত করতে পারি কোনোক্রমে।

প্রথমতঃ, যে জিনিস আমাদের ন্যায্য দাবী ও ন্যায্য প্রাপ্য, তা-ও ত আমরা সাক্ষাৎভাবে পাই একজনের মাধ্যমে। যেমন, আমরা যখন কোনো পুরস্কার লাভ করি কোনো বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য,

তখন কিন্তু তা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মাধ্যমেই পাই। সেজন্য, বলা হয়—অমুকে আজ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করবেন। এক্ষেত্রে সেই ছাত্রগণ তাঁদের পরীক্ষায় স্ব স্ব কৃতিত্বের জন্যই ত ঐসব পুরস্কার পেয়েছেন। তাহলেও তাঁরা সানন্দে সেই সব পুরস্কার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর নিকট থেকে হাতে পেয়ে আনন্দিত ও কৃতার্থ বোধ করেন নিজেরাই। একই ভাবে, ভারতীয় দর্শনেও 'কর্মবাদ' ও 'ঈশ্বর-সৃষ্টিবাদ' রক্ষা ক'রেও ভক্তিবাদীরা বলতে পারেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে অসংখ্য জীবের আরো অসংখ্য কর্ম যাতে যথাযথভাবে সেই সেই বিশেষ বিশেষ জীবের সঙ্গে তাদের 'অদৃষ্ট'রূপে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাদের সেই জন্মের সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সেজন্য তখন ঈশ্বরের ন্যায় একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান জনের প্রয়োজন, যাতে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' না চাপতে পারে; যাতে রামের কর্ম শ্যামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ন্যায়ের বিধান 'কর্মবাদে'র অলঙ্ঘ্যতা ক্ষুণ্ণ করতে না পারে অযথা। কারণ, 'কর্ম' একটি জড় বস্তু, জীবও সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান নয়। সেজন্য এরূপ ভ্রম এক্ষেত্রে অতি স্বাভাবিক, যদি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁর কল্যাণহস্ত প্রসারিত ক'রে রামের সঙ্গে রামের, শ্যামের সঙ্গে শ্যামের স্ব স্ব প্রাক্তন অভুক্ত কর্ম সংযোজিত করে না দেন, যাতে সেই সেই কর্ম অনুসারে তাদের পুনর্জন্ম হতে পারে। বলা যেতে পারে যে, এই অর্থেই কেবল পরমেশ্বর 'সৃষ্টিকর্তা'।

একই ভাবে, মোক্ষকালেও, সেই একই ঘটনা ঘটছে। সেক্ষেত্রেও, স্ব স্ব সাধন অনুসারে রাম, শ্যাম প্রভৃতি মুক্তিলাভ করছেন; এবং পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে, 'সাধন' জড় বস্তু এবং মুক্তিযোগ্য জীব ত এখনও বদ্ধ, এখনও একেবারে মুক্ত হয়ে যাননি ব'লে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমানও নন। সেজন্য এক্ষেত্রে, বিভিন্ন সাধনের সঙ্গে বিভিন্ন মুক্তিযোগ্য, অথচ এখনও বদ্ধ, জীবের সংযোগ স্থাপন ক'রে দেন স্বয়ং পরমেশ্বরই যাতে তাঁরা যথাযোগ্য মুক্তিফল পেয়ে যান—কারণ, সাধারণতঃ, মোক্ষেরও প্রকার-ভেদ (যেমন বলদেবের পঞ্চবিধা মুক্তি প্রভৃতি) স্বীকার করা হয়। বলা যেতে পারে যে, এই অর্থেই কেবল, পরমেশ্বর 'মুক্তিদাতা'।

অবশ্য যাঁরা কর্মবাদী হয়েও, নিরীশ্বরবাদী (যথা, জৈন ও সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ) বা অজ্ঞেয়বাদী (যথা, বৌদ্ধ-মতাবলম্বিগণ), তাঁরা এক্ষেত্রে বলবেন যে, ঈশ্বরের প্রয়োজন কি এদিক থেকেও? কারণ, 'কর্মবাদ'-অনুসারে স্বয়ং কর্মের মধ্যেই ত এমন শক্তি নিহিত হয়ে আছে, যাতে কর্ম জড় বস্তু হয়েও, নিজে নিজেই তার কর্মকর্তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে অনায়াসেই। যেমন, বীজের মধ্যেই যে মহামহীরুহ লুক্কায়িত হয়ে আছে, তা নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়ে উঠবে তার নিজেরই অন্তর্নিহিত বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তিতে—আর অন্য কোনো সহায়কের কি প্রয়োজন এস্থলে?

উত্তরে ভক্তিবাদী বলবেন—না, বীজের অন্তর্নিহিত শক্তি আছে নিশ্চয়ই। তাহলেও, সেই শক্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় অনেক কিছুই—যথা, আলো, বাতাস, জল; এবং একজন মালী, যিনি এই সব এনে দেবেন। শ্রীভগবানকেও সেজন্য প্রয়োজন, যেজন্য তাঁকে বলা হয়েছে 'পর্জন্যবৎ' (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪) —'মেঘের মত' (পূর্ব সংখ্যায় পৃঃ ১৭৮, ২য় স্তম্ভ দ্রষ্টব্য)। মেঘের মতই তিনি নিরপেক্ষভাবে বারিবর্ষণ করেন সব বীজের উপরই, যার জন্যই সেই সেই বীজ স্ব স্ব অন্তর্নিহিত শক্তিতে আম্রবৃক্ষ, বিষবৃক্ষ ইত্যাদিতে পরিণত হয় যথাসময়ে।

নিরীশ্বরবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীরা (Atheists ও Agnostics) পুনরায় বলবেন—বীজের যদি অন্তর্নিহিত শক্তিই থাকে নিজে নিজেই বিকশিত হয়ে

উঠবার, তাহলে তার এরূপ শক্তিও আছে নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় পরিবেশও সৃষ্টি করার। বিশেষ ক'রে, এসব উপমা ত্যাগ ক'রে সোজাসুজি কর্মের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে বলা যায় যে, কর্মের এরূপ শক্তিও নিহিত হয়ে আছে যে, তা স্বীয় ন্যায্য কর্মকর্তার দিকেও স্বতঃই ধাবিত হয়; অথবা, জীব তাকে স্বতঃই আকর্ষণ করে—যেমন লৌহ স্বতঃই চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, চুম্বকও লৌহকে স্বতঃই আকর্ষণ করে। সেজন্য কর্ম ও কর্মকর্তা দুজনেই দুজনের নিকট ধাবিত হয়ে যথাযোগ্যরূপে পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়।

যেমন, নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শনেও বলা আছে, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ না হ'লে সৃষ্টি হয় না। কিন্তু প্রকৃতি চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট হ'লেও জড়, জ্ঞান-বুদ্ধিহীন; সেজন্য সে পুরুষের দিকে ধাবিত হতে পারে না। অপর পক্ষে, পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ হ'লেও, চলচ্ছক্তিবিহীন; সেজন্য সেও ইচ্ছা থাকলেও প্রকৃতির দিকে ধাবিত হতে পারে না। তাহলে উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে কিরূপে? এর একমাত্র উত্তর হ'ল এই যে, তা কর্মবাদের অন্তর্নিহিত ন্যায়শক্তির দ্বারাই যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন সাধিত হয়, অন্ধ ও খঞ্জের উপমা অনুসারে। অন্ধ 'প্রকৃতি' খঞ্জ 'পুরুষ'কে স্কন্ধে ক'রে বহন ক'রে নিয়ে যায় 'পুরুষে'র নির্দেশানুসারে—এবং এই ভাবে, তারা উভয়েই সংসারারণ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

সে যা হোক, এই সব অনন্ত তর্কাতর্কি ছেড়ে দিয়ে 'কর্মবাদ' ও 'ঈশ্বরমুক্তিদাতৃত্ববাদ' বা 'ঈশ্বর-প্রসাদবাদ'—এই উভয়কেই রক্ষা করার হয়ত একটি—যে কোনো প্রকারেরই হোক না কেন—একটি উপায় পাওয়া গেল।

আরেকটি উপায় হয়ত পাওয়া যেতে পারে এইভাবে: কেবল শুষ্ক কঠোর অনড় অটল দাবীদাওয়ার কথা তুললে, শ্রদ্ধা-স্নেহাদি অনেক মধুরমোহন ভাবকে আমাদের বাদ দিতে হয়—যা নিশ্চয়ই আমাদের শুষ্ক শূন্য জীবনে অনেক ক্ষতি করবে অনিবার্যভাবেই। যেমন, আমরা জানি যে, দেশের বর্তমান আইন অনুসারে, আমরা আজকাল সব কিছুই দাবী করতে পারি ন্যায্যভাবেই, জন্মগত অধিকাররূপেই। যেমন, এমন কি, পুত্র পিতার নিকট থেকে, আইনের দিক থেকেই সব কিছুই দাবী করতে পারেন—ভরণপোষণ, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সবই—পত্নীও পতির নিকট 'খোরপোষ' বা যথোপযুক্ত ভরণপোষণ দাবী করতে পারেন। কিন্তু কোন্ পুত্র বা পত্নী তা করেন? বরং তাঁরা পিতা বা পতির নিকট তা আবদার করেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, পিতা বা পতিও তা পূর্ণ করেন স্নেহ বা প্রীতির সঙ্গে। এতে তাঁদের মধ্যে সুমধুর প্রাণের সম্পর্কও অক্ষুণ্ণ থাকে; এবং পরিবারের সুখ শান্তিও সম্পূর্ণ রক্ষা পায়। নয়তো প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের নিকট থেকে চোখ রাঙিয়ে, হুঙ্কার ছেড়ে, বিবাদবিসংবাদ ক'রে, ক্রমাগত এই সব দাবীদাওয়া আদায় করতে থাকেন—তাহলে একদিনেই ত গেল পরিবার ধ্বংস হয়ে! পরিবার তখন হয়ে উঠবে একটি কারখানাই মাত্র—যেখানে আছে কেবল Labour ও Management-এর মধ্যে কঠোর দাবীদাওয়ার সম্পর্ক, প্রাণের মধুরমোহন কোমলশীতল সম্পর্ক নয় একেবারেই। কিন্তু শ্রীভগবানের সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক কি আমাদের হতে পারে কোনোদিনও? নিশ্চয়ই না। যদি আমরা ঈশ্বরকে মানি, তাহলে নিশ্চয় একথা বলতেই হবে যে, তিনি ও তাঁর সৃষ্ট জীব-জগৎ একটি সুবৃহৎ সুখী পরিবার—যেখানে ঈশ্বর আমাদের পিতা, বা মাতা, বা সখা, বা প্রিয়তম—তাঁকে যে যেভাবেই দেখি না কেন। তাহলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দাবীদাওয়ার সম্পর্ক হতে পারে না নিশ্চয়ই। সেজন্যই ভক্তিবাদে বলা হয়েছে যে, যে মুক্তি আমাদের অবশ্যপ্রাপ্য

আমাদের নিজেদের সাধনবলে, তা যেন আমরা ভিক্ষাই ক'রে চেয়ে নিচ্ছি আমাদের পরমপ্রিয় পরমেশ্বরের নিকট থেকে; তিনিও যেন কৃপা ক'রেই আমাদের তা দান করছেন—এ বললে আর ক্ষতি কি অনুভূতির দিক থেকে? বরং লাভই ত সমধিক। কারণ, রইল একদিকে শ্রদ্ধায় প্রার্থনা; রইল অন্যদিকে স্নেহে দান; রইল সব মিলিয়ে জীবেশ্বরের মধ্যে নিকটতম মধুরতম কোমলতম প্রাণের সম্পর্ক; রইল সর্বশেষে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ—চাওয়ার আনন্দ, পাওয়ার আনন্দ। একাকী বসে বসে দাবীদাওয়া আদায়ের কথা ভাবলে, এই আনন্দ থেকে হতাম আমরা বঞ্চিত নিশ্চয়ই। একজন অতি প্রিয়জন, শ্রদ্ধেয়জন, যোগ্যজন আদর ক'রে স্নেহভরে আমাকে একটি জিনিস দিচ্ছেন; এবং আমি সেই জিনিসটিকেই নিজের অধিকার ব'লে একলা একলা আদায় করে নিচ্ছি—এই দুটি অবস্থার মধ্যে প্রভেদ অনেক। প্রথমটিতে রয়েছে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি স্নেহ আদর—কতই না সুমধুর সুকোমল সুললিত ভাবলহরী! কিন্তু দ্বিতীয়টিতে এসব কিছুই না—রয়েছে কিছু গর্ব, কিছু আত্মতৃপ্তি নিজের শক্তির জন্য; কিন্তু এই কি সব, এই কি যথেষ্ট? ভক্তিবাদী বলবেন—না, বরং যুক্তি বাদ দাও ভক্তি আন; পাবে অনেক বেশী তৃপ্তি শান্তি আনন্দ। এইজন্যই 'ঈশ্বরপ্রসাদবাদ' ভক্তিবাদে এরূপ কেন্দ্রীভূত স্থান পেয়েছে সর্বদা। ঈশ্বর আমাদের জন্য চিন্তা করছেন, আমাদের কল্যাণের জন্য কার্য করছেন, সর্বোপরি আমাদের ভালবাসছেন কি রোমাঞ্চকর রমণীয় রসঘন এই অনুভূতি—তা কি কেবলমাত্র কঠোর শুষ্ক যুক্তির জন্য ত্যাগ করা যায়? নিশ্চয়ই না।

পাশ্চাত্য দর্শনের দিক থেকে এই সমস্যাটির বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করা হয়েছে—কি করে স্বপ্রচেষ্টা ও ঈশ্বরকৃপাকে একত্রে রাখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় ভক্তিবাদে তার চিহ্ন অতি অল্প। বরং ভারতীয় দর্শনে এটি যেন একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য ব'লেই ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর আমাদের সাধনায় তুষ্ট হয়ে কৃপা করলে তবেই আমরা শ্রেষ্ঠ ধন মুক্তি পাব—সেজন্য তিনি অবশ্যই 'মুক্তিদাতা'। শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী বলদেবও এই পথের পথিক।

[ক্রমশঃ]

সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে উল্কি

ডক্টর বেলা দত্তগুপ্ত

উল্কি সম্বন্ধে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। উল্কি-পরা মানুষও দেখেছি কম নয়। ছোট, বড়, হরেক রকম উল্কি-পরা সব মানুষ। এদের দেখে মনে হয়েছে দেহসজ্জার এও বুঝি এক ধরন! কারণ, মানুষ নিজেকে সাজাতে ভালবাসে, ভালবাসে অন্যের সাজসজ্জা দেখতে। তাই না, যুগে যুগে এত বিভিন্ন, বিচিত্র ধরনের ফ্যাশানের সৃষ্টি হয়েছে! কখনো মানুষের মনে হয়েছে 'তোমায় সাজাব যতনে, কুসুমে রতনে, কেয়ূরে কঙ্কণে, কুমকুমে চন্দনে', আবার কখনো বা মানুষ নিজেকে সাজিয়েছে হরেক রকম উল্কিতে। সর্বাঙ্গ উল্কি শোভিত মানুষের একটা ছবি দেখেছিলাম বিলেতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে। ছবিটার নাম 'ফ্লোরিডার যোদ্ধা', শিল্পী জন হোয়াইট। এই যোদ্ধার সর্বাঙ্গ, পায়ের নখ থেকে মাথা অবধি সর্বত্র, বিভিন্ন ধরনের উল্কি দিয়ে কারুকার্য করা। বিভিন্ন রং, বিভিন্ন নকশা ব্যবহার করা ঐ উল্কিতে। দেখতে খুবই চমকপ্রদ। দেহসজ্জার এক অনবদ্য

উদাহরণ বটে! কিন্তু, উল্কি কি শুধু দেহসজ্জার জন্যই, না এর পিছনে, চেতন ও অবচেতন মনের আরও অনেক কারণ আছে? উল্কি কি শুধু আদিম অধিবাসীদেরই দেহসজ্জার উপকরণ না সভ্য মানুষেরাও উল্কি-আসক্ত? উল্কি-পরা কি বিশেষ কোন মানসিকতার লক্ষণ না সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষও একই ভাবে উল্কি-পাগল হয়ে উঠতে পারে? এসব প্রশ্ন আলোচনার জন্য এই ছোট্ট প্রবন্ধের অবতারণা। এই প্রবন্ধের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে যদি কেউ উল্কি নিয়ে গবেষণা করেন তাহলে নিজের এই পরিশ্রম সার্থক মনে হবে।

না, শুধু সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যই উল্কি ব্যবহার করা হয় না। এর পিছনে মানুষের মনের বহু ধরনের ভাবনা-চিন্তা কাজ করে—যেমন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া, শত্রু পর্যুদস্ত কিংবা নিধন করা, সন্তান-কামনা, ইত্যাদি। প্রেমে সাফল্যলাভ, ক্ষেতে ভাল শস্য-উৎপাদন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিধন—এ সব কিছু অভীপ্সার পিছনেও উল্কির অবদান আছে বলে মনে করা হয়।[১]

উল্কির ইতিহাস তাই দীর্ঘদিনের। আদিম ও সভ্য, দুই দুনিয়াতেই এর প্রভাব। এবং আজকের জগতে মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকের কাছেও উল্কি এক নতুন দিগন্তের সন্ধান এনে দিয়েছে। আগেই বলেছি, 'উল্কি'র ইতিহাস অতি প্রাচীন। আদিম অধিবাসী ছাড়া সভ্য জগতেও উল্কির ব্যবহার দেখা গেছে সুদীর্ঘ অতীত থেকে। মিশরীয় 'মামি'র দেহে উল্কি পাওয়া গেছে ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়। প্রাচীন গ্রীস, রোম, জার্মানী, ইংলণ্ডের মানুষ উল্কি পরতে ভালবাসতো, পুরোনো সাহিত্য, ইতিহাস থেকে একথা জানা যায়। গ্রীস, রোমের ইতিহাস থেকে একথাও জানা যায় যে, অপরাধী ও দাসদের চিহ্নিত করবার জন্য উল্কি বহুলভাবে ব্যবহার করা হত।

খৃষ্টধর্মের সূত্রপাতে উল্কি সম্বন্ধে বাধা-নিষেধ দেখা দিল। বাইবেলে উল্লিখিত[২] উল্কি-বিষয়ক নিষেধার্থক আজ্ঞার ফলে ইওরোপে উল্কির ব্যবহার কিছুটা কমে আসলেও একেবারে লোপ পায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আবার নতুন করে উল্কি-সচেতন হয়ে ওঠে ইওরোপের মানুষ। ১৭৬৯ সালে ক্যাপ্টেন জেমস কুক পলিনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল পরিক্রমা করে আসেন। সঙ্গে করে আনলেন তাহিতি থেকে 'টাটু' বা 'উল্কি' শব্দটি এবং উল্কি ছাপ দেবার কৌশলটিও। সেই থেকে উল্কি সম্বন্ধে আবার মেতে উঠে ইওরোপের মানুষ। চারদিকে অসংখ্য উল্কি পরবার দোকান গজিয়ে ওঠে। এদের বলা হত Tattooing Parlour এবং উল্কি ছাপ দেবার কারিগরটিও বেশ জুৎসই এক নাম পেলেন—'প্রোফেসর'। উল্কির চল এত বেড়ে যায় যে, ১৮৯১ সালে উল্কি আঁকার যন্ত্রটির প্রথম পেটেণ্ট নেওয়া হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এখন আর অভিজাত-অনভিজাত, ভদ্র-ইতরে বাধা রইল না উল্কি পরার বিষয়ে। অভিজাত পরিবারের ডিউক অব ক্ল্যারেন্স ও ডিউক অব ইয়র্ক নৌবিভাগে শিক্ষানবিসির সময় জাপান থেকে উল্কি পরে আসেন। তাঁদের দেখাদেখি উল্কি ছড়িয়ে পড়ে

১ 'Tattoos are inflicted as protection against danger, as love-charms, to restore youth, to insure good health and long life, to induce pregnancy, to kill an enemy, to cure the ill, to divest a corpse of its malevolent powers, to insure a happy after-life, to propitiate supernatural powers, and to acquire supernatural powers of all sorts.'

২ 'You shall not make any cuttings in your flesh on account of the dead or tattoo any marks upon you···' (Leviticus XIX, 28)

ইওরোপের তাবৎ রাজন্যবর্গ ও অভিজাত পরিবারের মধ্যে। রাশিয়ার দ্বিতীয় জার নিকোলাস, জার্মানীর দ্বিতীয় কাইজার হিবলহেলম্, ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড, গ্রীসের যুবরাজ জর্জ—এঁরা প্রত্যেকেই উল্কি-আসক্ত হয়ে পড়েন। ডেনমার্কের রাজার বক্ষদেশ অত্যন্ত বিচিত্র উল্কিতে শোভিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এক অসাধারণ বিত্তশালী ভদ্রলোক তাঁর পৃষ্ঠদেশে লিওনার্দো-দা-ভিনচি'র বিখ্যাত চিত্র 'লাস্ট সাপার' উল্কিতে এঁকে নেন। মেয়েরাও বিশেষ পিছনে ছিল না এ বিষয়ে। লেডী র‍্যানডল্‌ফ্ চার্চিলের বাহুতে একটি বিচিত্র উল্কি ছিল—যেন দীর্ঘ একটি সাপ তাঁর বাহুটি বেষ্টন করে আছে। উল্কি-কারিগর বিখ্যাত জর্জ বার্চেট তাঁর জীবনীতে লিখেছেন যে, ১৯১৪-১৮'র মহাযুদ্ধের সময় তাঁর স্ত্রী নিজের বক্ষদেশে পৃথিবীর সমস্ত দেশের জাতীয় পতাকার উল্কি এঁকে নিয়েছিলেন। এঁদের অনুসরণে, অনুকরণে বহু পুরুষ ও নারী উল্কি-পাগল হয়ে ওঠে। বার্চেট তাঁর স্মৃতিচারণায় এ সম্বন্ধে লিখেছেন।[৩] বার্চেট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেখেননি। দেখলে তিনি হয়ত আরও নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের পরিবেশন করতে পারতেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নতুন করে আবার উল্কির প্রাবল্য দেখা গেল। যুদ্ধরত সৈন্যদের মধ্যে উল্কির ব্যবহারটা ছিল আশ্চর্যরকম বেশী। তাদের অবচেতন মনে হয়ত এটাই কাজ করেছে যে, উল্কি-ধারণ করলে শত্রুকে নিধন করা, বিনাশ করা সহজ হবে। কে জানে? কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যরা আদিম অধিবাসীদের মত তীর, ধনুক, সড়কি, বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করেনি। যুদ্ধ করেছে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। তবে? তাহলে বলতে হয়, পুরোনো আদিম মানসিকতা থেকে রেহাই পায়নি আধুনিকতম মানুষ, সৈন্যেরাও। সেই পুরোনো মানসিকতাই হয়ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল যে উল্কি তাদের সহায়ক হবে শত্রুনিধনে, শত্রুধ্বংসে এবং তাদের পরাজয়ে। চতুর্দিকে সৈন্যদের উল্কি পরতে দেখে সাধারণ মানুষও মেতে ওঠে উল্কি নিয়ে, যদিও উল্কি পরবার পদ্ধতিটি কম ক্লেশকর নয়।

১৮৯১ সালে উল্কি-যন্ত্রটি তৈরী হবার আগে উল্কি বেশ কষ্ট করেই আঁকতে হত মানুষের দেহে। গ্রাহকের ইচ্ছা অনুযায়ী তার দেহের নির্দিষ্ট জায়গায় একটি নকশা আঁকা হত। উল্কি-কারিগর সেই নকশার রেখা বরাবর একটি পিন ফুটিয়ে ফুটিয়ে রং ঢুকিয়ে দিত গ্রাহকের দেহে। নকশাটি সম্পূর্ণ হলে কারিগরের কাজ শেষ। রং-এর ব্যাপারে গ্রাহকের পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নিশ্চয়ই ছিল। সেইজন্যই একরঙা এবং বহুরঙা এই দুই ধরনের উল্কিই মানুষের দেহে দেখা গেছে। এই ধরনের, অর্থাৎ একটি পিন ফুটিয়ে ফুটিয়ে উল্কি দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাই দেখা যায় যে, উল্কি-যন্ত্রটির অনেক উৎকর্ষ-সাধন হয়েছে—এক কথায় বলা যায় যে, যন্ত্রটি sophisticated হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে উল্কি পরলে কষ্ট অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং বিভিন্ন ডিজাইনের উল্কিও সম্ভব হয়। যুদ্ধের সময় উল্কির হিড়িক থাকলেও, যুদ্ধের পর উল্কির ব্যবহার বিশেষভাবে কমে যায়। বিশেষজ্ঞ-মহলে এই অভিমত দেখা দেয় যে, Skin Cancer এবং Hepatitis রোগ উল্কি-যন্ত্রের মাধ্যমেই

৩ "Love not only makes the world go round but keeps the tattooist's needle busy. On four continents, on the bodies of every race, I have tattooed flaming hearts, cooing doves and pretty girls. 'True Love Mary' and 'I love Amy' were my stock-in-trade and bread and butter whether I was working in London, Hongkong, or Johannesburg."

সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং ১৯৬১ সালে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উল্কি-যন্ত্রের ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। তবুও, কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও যে উল্কি প্রবলভাবে দেখা যায়, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব।

এতক্ষণ আমরা উল্কির বিদেশীয় ছবি ও উপাখ্যান পেয়েছি। আমাদের দেশেও উল্কির ব্যবহার নিতান্ত কম নয়। উপজাতিদের বাদ দিলেও, সভ্য জগতের মানুষের মধ্যে উল্কির ব্যবহার নেহাৎ নগণ্য নয়। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত উপজাতির মধ্যেই উল্কির ব্যবহার আছে—অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে। আসামের আবর উপজাতির মধ্যে পুরুষের পক্ষে উল্কিধারণ অবশ্য কর্তব্য, কারণ দেহে উল্কিচিহ্ন না থাকলে সে পুরুষের পক্ষে বিয়ে হওয়া অসম্ভব। উল্কিচিহ্ন তার পক্ষে সম্মান ও মর্যাদা-সূচক। এক সময় পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশ) স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে উল্কির ব্যবহার দেখা যেত। 'গান্ধানি' নামে পরিচিত ছিল এই এখনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে, উল্কির চল আছে। উল্কির কাজ সবাই করতে পারে না। 'হাবরি' নামে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মেয়েরাই উল্কির কাজে পারদর্শী ছিল। এরা যাযাবর-সম্প্রদায়ভুক্ত হবার কারণে বছরের কোন বিশেষ সময়ে, (বিশেষ করে বর্ষাকালে) এরা গ্রামাঞ্চলে আসতো এবং তখনই উল্কি পরার ধুম পড়ে যেত। অবশ্য সে অনেক দিনের কথা। দেশের নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে যাযাবর-সম্প্রদায় এখন প্রায় অন্তর্হিত। ফলে, সভ্য জগতের নীচুস্তরের মানুষের মধ্যেও উল্কির প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় আজও উল্কি সগৌরবে বিরাজমান। গোন্দ, সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি উপজাতির মেয়েদের কাছে উল্কি এক পরম আদরের জিনিস। তাদের মতে উল্কি পরলে সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়। নীলগিরি অঞ্চলে টোডা উপজাতির বাস। তাদের জীবনযাত্রা ভারতবর্ষের অন্য উপজাতির জীবনযাত্রার চেয়ে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। কিন্তু, উল্কির সম্বন্ধে টোডাদের অন্যদের মতই অসম্ভব দুর্বলতা। বিশেষ করে সন্তানবতী মেয়েরা উল্কি ছাড়া কখনই থাকে না। হাতে ও বুকে উল্কি পরে তারা মনে করে যে, তাদের সন্তান বিপদমুক্ত থাকবে, সন্তানের মঙ্গল হবে।

উল্কি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও, উল্কির নিজস্ব একটি ব্যাকরণ আছে, কারণ সমস্ত উপজাতিই এক ভাবে, এক অর্থ নিয়ে উল্কি পরে না। এবং দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উল্কিচিহ্ন বিভিন্ন উপজাতির কাছে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার বিষয়। নৃতত্ত্বের ছাত্রছাত্রী, গবেষক, অধ্যাপক এদিকে এখনও নজর দেননি। নজর দিলে প্রাথমিক ভাবে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠত। প্রথমতঃ, উল্কির বিভিন্ন ধরনের নকশা থেকে আদিম মানুষের শিল্পী মন ও চারুকলা পারদর্শী মনের পরিচয় মিলত। দ্বিতীয়তঃ, তাদের চেতন ও অবচেতন মনের ভাবনা, চিন্তা, সংঘাত প্রভৃতি সমস্ত ছবি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। নৃতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান চর্চার প্রথম সোপানটি নির্মিত হতে পারতো তাহলে। দুঃখের তথা আক্ষেপের বিষয় যে, এদিকে নৃতত্ত্ব-বিদেরা এগোননি। তবে সমাজবিজ্ঞানীরা পিছিয়ে নেই, পিছিয়ে নেই অপরাধতত্ত্ববিদেরাও।

সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধতত্ত্ববিশেষজ্ঞরা দেখতে পেয়েছেন যে, আধুনিক মার্কিন, ব্রিটিশ, ইওরোপীয় তথা প্রাচ্য দেশের সমাজে উল্কির ব্যবহার সমাজবিরোধীদের মধ্যেই বেশী। প্রায় প্রতিটি সমাজবিরোধী দলেরই একটি করে নিজস্ব উল্কি আছে। এটি তাদের সংকেতচিহ্ন হিসেবে কাজ করে। দলের বা গোষ্ঠীর সব সদস্য পরস্পরকে মুখোমুখি বা চাক্ষুষ না চিনলেও বা না

দেখলেও কোন অসুবিধে নেই। উল্কিচিহ্ন দেখলেই তারা বুঝতে পারে যে, কেউ বাইরের লোক না নিজে দলেরই সদস্য। উল্কিচিহ্ন দেখেই তারা দলের আনুগত্য মেনে নেয় এবং দলের জন্য করতে পারে না, এমন কুকাজ পৃথিবীতে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'পাচুকো' উল্কি-গোষ্ঠীর লোকেরা তো নিজেদের এক ধরনের অভিজাত মনে করে। অন্যেরাও 'পাচুকো'দের অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখে। নানা কাজের জায়গায়, যথা হাসপাতালে, নার্সিং হোমে, খেলার মাঠে—'পাচুকো'দের কাজ করে দিতে পারলে, কেউ কেউ ধন্য মনে করে নিজেদের। অবশ্য এই কেউ কেউ-র মধ্যে সজ্জন, রুচিমান নাগরিকেরা নিশ্চয়ই পড়েন না!

সমাজবিরোধীদের মধ্যে উল্কি-প্রীতি সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা এক সুদীর্ঘ গবেষণায় লিপ্ত আছেন। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও উল্কির মধ্যে এক আশ্চর্য যোগসূত্র তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। মার্কিন প্রবাসী জনৈক পোলিশ মনস্তত্ত্ববিদ্ সোলোজেওয়া (Solowjewa) ১৯৩০ সালে ১৩৬ জন অপরাধী নিয়ে গবেষণা-অন্তে একথা জানান।[৪] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জনৈক Parry উল্কির নকশার রকমফের নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণা করেন। তাঁর মতে 'Prostitutes and perverts'-দের বিশেষ মানসিকতার সঙ্গে উল্কির নকশার যোগাযোগ আছে। যুদ্ধকালীন সময়ে Lander ও Kohu নামে দুই মনোবিজ্ঞানী মার্কিন সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত কিছু লোকের উল্কি নিয়ে গবেষণা চালান। তাঁদের মতে উল্কিওয়ালা সৈন্যরা উল্কিবিহীন সৈন্যদের থেকে অনেক বেশী মানসিক ভারসাম্যহীন। বর্তমান সময়েও এ ধরনের গবেষণা অব্যাহত আছে এবং গবেষকদের মতে উল্কির ব্যবহারটি প্রচলিত রীতি-বিধির বিরুদ্ধে জেহাদসূচক। যারা জেহাদ ঘোষণার মনোভাব নিয়ে উল্কি পরে, দেহের যে কোন অংশেই তারা উল্কি চিহ্ন দিতে রাজী। জানা গেছে, জননেন্দ্রিয়ও, কি পুরুষের, কি মেয়ের উল্কি থেকে বাদ পড়েনি।

সভ্য দুনিয়ার এই বিকৃত মানসিকতার রূপটি 'উল্কি' গবেষণার সাহায্যে অনেকেই প্রকট করতে চেষ্টা করছেন। আমাদের দেশের সমাজবিজ্ঞানী, অথবা মনোবিজ্ঞানী এদিকে এখনও এগিয়ে আসেননি। এই নিয়ে আলোচনা হলে social construction of reality'র আরেকটি dimension যুক্ত হত বলে আমার বিশ্বাস। উৎসাহী পাঠকের জন্য দু'একটি বইয়ের নাম সংযোজিত হল:

১। W. D. Hambly: **The History of Tattooing and Its Significance,** 1917

২। H. Ebenstein: **Pierced Heart and True Love, an Illustrated History of the Origin and Development of European Tattooing and a Survey of Its Present State,** 1953

৩। George Burchett: **Memoirs of a Tattooist** (ed) Peter Leighton, 1958

৪ '…tattooing is one of the first indications that a child or youth has started to go astray.'

মহাভুত মহাতীর্থ

শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মরুৎমহাভুতলিঙ্গম্

অবিস্মরণীয় নৈসর্গিক দৃশ্য হ'ল শ্রীকালহস্তীর। শ্রীকালহস্তী দক্ষিণের কৈলাস, মরুৎমহাভুতলিঙ্গমের স্থলাবাস।

তিরুভন্নামালাই থেকে শ্রীকালহস্তী যেতে হ'লে তিরুপতি হয়ে যাওয়াই সুবিধা। এক্সপ্রেস্ ট্রেনে তিরুপতি থেকে ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। 'তিরুপতি-পুরী এক্সপ্রেস্' বা 'তিরুপতি-তিরুমালা এক্সপ্রেস্' শ্রীকালহস্তীতে থামে। ভিল্লুপুরম্ জংশন থেকে শ্রীকালহস্তীর দূরত্ব ১৮৫ মাইল। এ ছাড়া মাদ্রাজ থেকে রেণিগুণ্টা হয়েও শ্রীকালহস্তীতে যাওয়া যায়। রেণিগুণ্টায় সবসময় শ্রীকালহস্তীর বাস মিলবে। মাদ্রাজ থেকে টানা বাসে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে ওখানকার বেসিন্‌ব্রিজ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে গাড়ী ধরতে হবে। বাস তিরুপতি হয়ে শ্রীকালহস্তী নিয়ে যাবে। অন্যান্য ভূতক্ষেত্রের তুলনায় শ্রীকালহস্তী কলকাতা থেকে সব চাইতে কাছে। সুতরাং আগে শ্রীকালহস্তী দেখে তারপর অন্য তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে হাওড়া স্টেশন থেকে ৩নং আপ মাদ্রাজ-মেলে ওঠাই ভাল। একরাত্রি একদিন ট্রেনে কাটাবার পর দ্বিতীয় রাত ২-১৫ মিনিটের সময় গুডুর স্টেশনে নেমে পড়তে হবে। আড়াই ঘণ্টা পর ভোর পৌনে পাঁচটায় আসবে 'তিরুপতি-তিরুমালা এক্সপ্রেস্'। এই ট্রেনটি মাত্র এক ঘণ্টায় শ্রীকালহস্তীতে পৌছে দেয়। রেলস্টেশন থেকে মন্দিরের দূরত্ব মাইল দুই। থাকবার জায়গা হিসাবে শ্রীকালহস্তীতে তিরুপতি-দেবস্থানম্ ও অন্য ধর্মশালা পাওয়া যাবে। তাছাড়া ভীমা লজ্, মধু লজ্, শ্রীরাম কাফে এ্যাণ্ড লজ্ প্রভৃতি কতগুলি হোটেলও রয়েছে।

নাগরী পর্বতমালার সর্বশেষ দুই শৃঙ্গের নাম শ্রীপুরম্ আর মুম্মুড়িচোলপুরম্। শ্রীপুরম্-শীর্ষে আছেন দুর্গাম্মা, মুম্মুড়িচোলপুরম্-শীর্ষে আছেন কুড়িমিদেবর, আর এই দুই পর্বতের মাঝখানে পোন্‌মুখরি নদীতীরে অবস্থান করছেন বায়ু-মহাভূতলিঙ্গম্ শ্রীকালহস্তীনাথ। মুম্মুড়িচোল-পুরমের পশ্চিমপাদদেশে তাঁর মন্দির। পুণ্য পর্বতশৃঙ্গের এই অঞ্চলে আবির্ভাব নিয়ে সুন্দর একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। একবার আদিশেষ অনন্তনাগ দেবতা বায়ুকে বলেছিলেন—'কি হে! তুমি তো খুব শক্তির বড়াই কর। এই মেরুপর্বতের মূলোৎপাটন কর দেখি? কেমন ক্ষমতা!' তাচ্ছিল্যভরে বায়ু বললেন—'ওঃ, এই কথা?'—তিনি বলদর্পে এগিয়ে এলেন, এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন মেরুপর্বত। বায়ুর ফুৎকারে বিরাট মেরু বায়ুবেগে শূন্যে উঠল। আকাশে ঘুরপাক খেতে খেতে তিন টুকরো হয়ে আছড়ে পড়ল এই পৃথিবীর মাটিতে। এক অংশ পড়ল ত্রিশিরাপল্লীতে, এক অংশ পড়ল শ্রীলঙ্কার ট্রিঙ্কোমালিতে, অপর অংশ পড়ল এই শ্রীকালহস্তীতে। তাঞ্জোর-ত্রিশিরাপল্লীর চোলরাজারা সিংহল, শ্রীকালহস্তীতেও রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। রাজরাজ চোল ও অন্যান্য কয়েকজন নৃপতি উপাধি নিয়েছিলেন 'মুম্মুড়িচোল'। মুম্ শব্দের অর্থ তিন, আর মুড়ি মানে মুকুট। তিন মেরুমুকুট ছিল চোলরাজ্যের শোভা। সৌভাগ্যবান ছিলেন পর্বতাংশগুলির অধীশ্বররা, দেবপ্রেরিত পর্বত-শৃঙ্গগুলি লাভ ক'রে তাঁদের গর্বের অন্ত ছিল না। চোলরাজদের ইষ্টদেবতা ছিলেন শিব, তাই তিন

পর্বতেই শিবের অধিষ্ঠান।

মুম্মুড়িচোলপুরমের প্রচলিত নাম হ'ল কান্নাপ্পাপর্বত। নায়নার কান্নাপ্পার এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এককালে কান্নাপ্পাপর্বত ঘন অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। অরণ্যের মাঝখানে এক বৃদ্ধ বটের নিচে ছিলেন স্বয়ম্ভূ শিব। নিকটবর্তী গ্রামের কোন এক ব্রাহ্মণ নিত্য তাঁর পূজা ক'রে যেতেন। একদিন তিন্নন্ নামে এক শিবভক্ত ব্যাধ জঙ্গলে শিকার করতে এসে সেই লিঙ্গমূর্তিটি আবিষ্কার করে। আবিষ্কারের পর থেকে প্রত্যহ সে কাঁধে তীরধনুক, পিঠে মৃত শিকার, অঞ্জলিতে বনপুষ্প, আর মুখের মধ্যে পোন্‌মুখরির নীর নিয়ে শিবের কাছে উপস্থিত হ'ত। মুখের জলে শিবকে স্নান করাতো, বনপুষ্পে তাঁর পূজা করত, ঝলসানো পশুপাখীর মাংস তাঁকে নিবেদন করত। তারপর প্রসাদীমাংসে উপবাস ভঙ্গ ক'রে গৃহে ফিরত। এদিকে ব্রাহ্মণ যখন পূজায় আসতেন তখন তাঁকে সেই ছড়ানো রক্তমাংসলোমপালক সব পরিষ্কার ক'রে নিয়ে পূজায় বসতে হ'ত। এইভাবে শিবস্থান অপবিত্র করবার অপরাধে একদিন ব্রাহ্মণ তিন্নন্‌কে তিরস্কার করলেন। মহাযোগী মহাদেবকে মাংস নিবেদন করতে নিষেধ ক'রে দিলেন। তিন্নন্ কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না, বলল এ দেবমূর্তি তার প্রাণের ঠাকুর। তার মন যেমনটি চাইবে ঠিক তেমনিভাবেই সে তাঁর সেবা করবে। বলবান ব্যাধকে নিবৃত্ত করবার আর কোন উপায় না দেখে ব্রাহ্মণ নীরবে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। ভক্তের অশ্রুধারা এবার দেবতার চোখে নেমে এল। লিঙ্গদেহে দু'টি ক্ষীণ জলধারা দেখা গেল। অন্তরীক্ষে থেকে দেবতা বললেন—'ব্রাহ্মণ! তোমার মনঃকষ্টের কারণ আমি বুঝি। তিন্ননের পথ তোমার পছন্দ নয় তাও জানি। কিন্তু সে অত্যন্ত ভক্তিমান, তোমার চেয়ে অনেক বেশী অনুগত প্রাণ।' ভগবান যখন ভক্তকে এইভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে শিকার ঘাড়ে নিয়ে তিন্নন্ সেখানে উপস্থিত হ'ল। তাকে দেখা মাত্র ব্রাহ্মণ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, দেবদেহের ধারাচিহ্ন দেখিয়ে বললেন—'দেখ মূর্খ, তোর অনাচারে দেবতা কত দুঃখিত হয়েছেন! তোর অত্যাচারে তাঁর দুই চোখে অশ্রুধারা নেমে এসেছে।' ব্যথিত ব্যাধ দেখল দেবতাকে, দেখল তাঁর নয়নাশ্রু। কিন্তু ব্রাহ্মণের মন্তব্য মেনে নিতে পারল না। ভাবল—'আমি তো কোনদিন এঁর অবমাননা করিনি? তবে কেন তাঁর এই মনোবেদনা? এই জলধারার কারণ তাহলে নিশ্চয়ই কোন কমের চক্ষুঃপীড়া।'—ভাবনাটি মাথায় আসা মাত্র ব্যাকুল ব্যাধ নিজের একটি সুস্থ চোখ উৎপাটন ক'রে শিবের চক্ষুস্থানে বসিয়ে দিল। দ্বিতীয় চোখটিও তুলে ফেলবার মুহূর্তে তার মনে হ'ল—'এখনি তো আমি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ব। তাহলে শিবের অপর চক্ষুস্থানটি চিনব কি ক'রে?' সুতরাং সে নিজের বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলটি শিবের চক্ষুস্থানে চেপে রাখল। তারপর দুই হাতে তীরধনুক নিয়ে দ্বিতীয় চোখটি উৎপাটনে উদ্যত হ'ল। দেবতা তখন আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তিন্নন্‌কে দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সেইদিন থেকে তিন্নন্ হলেন সিদ্ধ নায়নার কান্নাপ্পার। তামিল ভাষায় 'কন্ন' শব্দের অর্থ চোখ, 'অপ্প' অর্থ অর্পণ করা, আর 'অর্' শব্দটি সম্মানসূচক। চক্ষু-অর্পণকারী মহাত্মা তিন্ননের আরাধ্য দেবতা কান্নেশ্বর বা কুড়ুমিদেবর আছেন পাহাড়ের চূড়ায়। কাছেই রয়েছে স্থলবৃক্ষ বট। আবার পর্বতের পাদদেশে শ্রীকাল-হস্তীনাথের মন্দিরেও আছেন নায়নার কান্নাপ্পার।—দেবদ্বারে সদাজাগ্রত ভক্তের প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি। কান্নেশ্বর আর শ্রীকালহস্তীশ্বর দুই বিগ্রহেরই সমান মর্যাদা। দু'টি মন্দিরের প্রতিই পুণ্যার্থীদের সমান আকর্ষণ। কান্নাপ্পারের কাহিনী

না জানলে, বা কুড়িমিদেবরকে না দেখলে শ্রীকাল-হস্তীনাথদর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যা'বে।

মহাভূতলিঙ্গম্ শ্রীকালহস্তীনাথের চরণতলে লুণ্ঠিতা রয়েছেন পুণ্যসলিলা পোন্‌মুখরী, মন্দিরের পশ্চিমপ্রাকার স্পর্শ ক'রে তিনি প্রবাহিতা। এই পোন্‌মুখরী বা স্বর্ণমুখী নদীই এখানকার পবিত্র তীর্থ। স্রোতস্বিনীর প্রতি পরমস্নেহে তাকিয়ে আছেন শিব। এ-মন্দিরের প্রধান প্রবেশতোরণ দক্ষিণমুখী হ'লেও বিগ্রহ শ্রীকালহস্তীনাথ কিন্তু পশ্চিমমুখী, তিনি শ্বেত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, ভক্তগতপ্রাণ। ভক্তদের একান্ত যত্নে বক্ষে আলিঙ্গন ক'রে আছেন, যুগ যুগ ধরে তাদের ভক্তিকথা ইহলোকে প্রচার ক'রে চলেছেন। দেববিগ্রহের শরীরে জড়ানো রয়েছে একটি সাপ, দু'টি গজদন্ত, আর এক মাকড়সার ছায়া। প্রাচীনকালে কান্নাপ্পাপর্বতে বাস করত এক হাতী। সে এই শ্বেত স্বয়ম্ভূলিঙ্গের পরমভক্ত ছিল। প্রত্যহ স্বর্ণমুখী নদীর জলে সে শিবকে স্নান করাতো। জঙ্গলে ছিল এক মাকড়সা, সে সূক্ষ্ম সুতোর সুন্দর পোশাকে স্বয়ম্ভূকে আবৃত ক'রে রাখতো। নিকটেই বিচরণ করত এক বিষধর সাপ, সে নিজের উজ্জ্বল মণিটি দিয়ে শিবকে সাজিয়ে দিত। দেবশিরে মণিটি স্থাপন ক'রে চতুর্দিক আলোকিত ক'রে রাখতো। দেবানুগ্রহে তিনটি প্রাণীই মোক্ষলাভ করেছে। পশু কীট সরীসৃপ সকলকেই শ্রীকালহস্তীনাথ সমান মর্যাদায় নিজ অঙ্গে আশ্রয় দিয়েছেন। সর্বজীবের মুক্তি-দাতা মরুৎমহাভূতলিঙ্গমের প্রকৃত নাম তাই 'সিকালাত্থীনাথর'। 'সি' হ'ল মাকড়সা, 'কালম্' সাপ আর হাতী এই তিন প্রাণীর তিনি নাথ, পরিত্রাতা পরমেশ্বর। উত্তর ভারতীয়দের মুখে মুখে সিকালাত্থীনাথর হয়ে গেছেন শ্রীকালহস্তীনাথ। দেববিগ্রহের চক্ষুস্থানে তিন্নন্ ব্যাধের একটি চোখও খোদাই করা আছে। পাশেই তীরধনুক হাতে নিয়ে আছেন তিন্নন্, প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু প্রতিমূর্তি। নির্বাণকালে নায়নার কান্নাপ্পার শিবের দক্ষিণ-অঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, সেইজন্য শ্রীকালহস্তী-নাথের দক্ষিণ-অঙ্গে কান্নাপ্পারের ছায়া। বাম-অঙ্গে সদাসর্বদা পার্বতীর অধিষ্ঠান। গর্ভমন্দিরের কোথাও সামান্যতম বাতাস চলাচলের মতও উন্মুক্ত স্থান নেই, অথচ দীপাধার বা আলোর মশাল শ্রীকালহস্তীনাথের সামনে আনলেই অগ্নি-শিখাটি আন্দোলিত হ'তে থাকে। বায়ুমহা-ভূতলিঙ্গমের নিঃশ্বাসবায়ুতে প্রকম্পিত প্রদীপশিখা মহাদেবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে।

শিবের মত এখানকার নন্দীও শ্বেতবর্ণ। শিবশক্তি পার্বতীর নাম জ্ঞানপুষ্কোদৈ। জ্ঞান-পুষ্পস্বরূপা পার্বতীর জন্য এখানে পৃথক মন্দির আছে। নিত্য দুই বেলা তাঁর পূজা ও আরতি হয়। আদি শংকরাচার্য দেবীর সামনে এক শ্রীচক্রযন্ত্র স্থাপনা ক'রে গেছেন। শংকরাচার্য পূজিত একটি শিবলিঙ্গও দেবীমন্দিরে সংরক্ষিত আছে। মকরসংক্রান্তির তৃতীয় দিনে জ্ঞানপুষ্কোদৈ-এর বিজয়বিগ্রহ শ্রীকালহস্তীনাথের সঙ্গে চতুর্দোলায় চড়ে শোভাযাত্রায় বার হন, মন্দির ও পর্বত নিয়ে প্রায় কুড়ি মাইল পথ পরিক্রমা করেন।

অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে এখানে আছেন অন্নপূর্ণা, কাশী বিশ্বনাথ, মহিষমর্দিনী, শক্তিবিনায়ক, পাতালবিনায়ক ও আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে শক্তিবিনায়ক, মহিষমর্দিনী ও ভরদ্বাজমুনির মূর্তি তিনটি অতি প্রাচীন। পাতালবিনায়ক আছেন দ্বিতীয় প্রাকার বেষ্টনীর মধ্যে, প্রায় ত্রিশ ফুট মাটির তলায় তাঁর মন্দির। স্বর্ণমুখী নদীবক্ষের সঙ্গে সমতা রক্ষা ক'রে এই গণেশমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। শ্রীকালহস্তীনাথকে দর্শন করবার আগে পাতালবিনায়ককে দর্শন করতে হয়। সব চাইতে আকর্ষণীয় হ'ল ৬৩ জন নায়নারের ৬৩টি ধাতুমূর্তি। অনেক কাল আগে অতি নিপুণ

হাতে মূর্তিগুলি তৈরি করা হয়েছিল।

শ্রীকালহস্তীনাথ-মন্দিরেও রয়েছে কৃষ্ণদেবরায়ের কীর্তি। তাঁর তৈরি সুউচ্চ 'কালী-গোপুরম্' ও শতস্তম্ভমণ্ডপ সকলের মন কেড়ে নেবে। এ-মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথ দক্ষিণগোপুরমটি নির্মাণ করেছিলেন চোলরাজ প্রথম কুলতুঙ্গ, সেই একাদশ শতাব্দীতে। দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল মরুৎমহাভূতলিঙ্গম্ মন্দিরের বহিঃপ্রাকার ও অন্যান্য চারটি গোপুরম্, নির্মাণ করেছিলেন বীর নরসিংহ যাদবরায়। ঐতিহাসিকরা বলেছেন শ্রীকালহস্তীনাথ-মন্দিরের ভিত গড়া হয়েছিল কিন্তু সেই পল্লববংশীয় রাজাদের আমলে। পরবর্তী-কালীন সংযোজন তোণ্ডামন চক্রবর্তীর, এবং তারও পরে এ-মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন চোল ও বিজয়নগরের রাজারা।

বায়ুমহাভূততীর্থে বহু পুরোনো কাল থেকেই পুণ্যার্থীদের আসা-যাওয়া। মহাভারতের নায়ক অর্জুন নাকি এখানে একবার এসেছিলেন। পর্বতের পাদদেশে বসে ভরদ্বাজমুনির কাছ থেকে ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শুনেছিলেন, এবং অনুপ্রাণিত হয়ে মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। তারও আগে এখানে আসেন মহাঋষি অগস্ত্য, উত্তরভারতীয় সংস্কৃতির বার্তাবাহী সর্বপ্রথম তীর্থযাত্রী। তিনিই নাকি তপঃপ্রভাবে এই স্বর্ণনদী স্বর্ণমুখীকে নিয়ে এসেছিলেন তৃতীয় মেরুর পদপ্রান্তে। মেরুপর্বতের তৃতীয় শিখরে বসেই একদিন তপস্যা করেছিলেন জগৎস্রষ্টিকারী ব্রহ্মা। যুগযুগান্ত ধরে সৃষ্টিকর্ম ক'রে যাওয়ার পর হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর সৃজনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল তাঁর কৈলাসপতিকে। কালবিলম্ব না ক'রে ছুটে গেলেন শিবের কাছে, দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হলেন। কৈলাসপতি অমনি কৈলাস-পর্বতের একখণ্ড পাথর তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—'যাও, দক্ষিণদেশের এক নিভৃত স্থানে বসে এই প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে তুমি আমাকে চিন্তা কর। তোমার একাগ্রতাই তোমাকে শক্তি যোগাবে, আমার শক্তি তোমাতে সঞ্চারিত হবে। আবার তুমি পূর্ব ক্ষমতা ফিরে পাবে।' ব্রহ্মা বেছে নিলেন এই মেরুশৃঙ্গটি, একান্তে কৈলাস-প্রস্তরখানি প্রতিষ্ঠা ক'রে শিবধ্যানে মগ্ন হয়ে রইলেন। কৈলাসপ্রস্তর স্পর্শধন্য এ-শিখরের অপর নাম তাই কৈলাসগিরি। কৈলাসগিরির দক্ষিণঢালে দর্শক দেখতে পাবেন তপস্বী ব্রহ্মাকে। সেখানে তাঁর জন্য ছোট মন্দির তৈরি করা হয়েছে।

ব্রহ্মার মন্দিরের পাশেই 'নটরাজরঙ্গস্থলমণ্ডপ'। ৭১ ফুট দীর্ঘ ও ২৬ ফুট প্রস্থ গ্র্যানাইট পাথরের পর্বতগাত্রে, সামনের মণ্ডপে শিবপুরাণের নানা-কাহিনীর ছবি উৎকীর্ণ ক'রে রাখা হয়েছে। ভাস্কর্য লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে মূর্তিগুলি পল্লব রাজন্যবর্গের শাসনসময়ে অর্থাৎ খ্রীস্টপর ৬৩০ থেকে ৬৬০-এর মধ্যে খোদাই করা হয়েছিল। প্রায় সাড়ে তেরোশো বছরের প্রাচীন এই অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির মধ্যে দর্শক আনন্দতাণ্ডবমূর্তি, আলিঙ্গন-মূর্তি, ভিক্ষাদানমূর্তি, পঞ্চমুখলিঙ্গমূর্তি ও কল্যাণ-সুন্দরমূর্তি দেখে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন। কল্যাণসুন্দরমূর্তিতে দর্শক লক্ষ্য করবেন ভগবান বেঙ্কটেশ্বরের ভগ্নীদানভঙ্গী। বেঙ্কটেশ্বর ভগ্নী জ্ঞানপুষ্পোদেকে কল্যাণসুন্দর শিবের করে সমর্পণ করছেন, আপন কমণ্ডলুর জলে অতি যত্নে শিবের হাত ধুইয়ে দিচ্ছেন, শিবপার্বতীর বিবাহসভায় সভাপতিত্ব করছেন স্বয়ং ব্রহ্মা।

নটরাজরঙ্গস্থলমণ্ডপের খানিকটা দূরেই মণি-কান্তেশ্বরের মন্দির। এ-মন্দিরটি তৈরি করে-ছিলেন বীর রাজেন্দ্র চোলদেব। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে তিনি কান্নাপ্পারের কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন।

কান্নাপ্পা পাহাড়ের দক্ষিণপূর্বাংশে মানুষের হাতে তৈরি একটি গুহা আছে। লোকে বলে

মণিগাম্বিয়াগত্তম্ নামে এক পুণ্যবতী মহিলা এখানে নাকি তারকমন্ত্র লাভ করেন। শিব নিজে মহিলাটির কানে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। মণিগাম্বিয়াগত্তমের নামানুসারেই গুহামণ্ডপটির নামকরণ হয়েছে। স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসী অধিবাসীরা আজও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের দেহ বহন ক'রে এই গুহায় নিয়ে আসেন। মুমূর্ষুর দক্ষিণ-কান ভূমিতে স্পর্শ করিয়ে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রাখেন। মৃত্যুর মুহূর্তে মহাযাত্রীর দেহটি অদ্ভুতভাবে বাঁ-দিকে ঘুরে যায়। প্রাণবায়ু মন্ত্রলব্ধ কান দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়।

তৃতীয় মেরুর চূড়া থেকে নদী পর্বত দেবালয় জনবসতি সবই অপরূপ দেখায়। সুদূর পূবে নীল আকাশের কোলে কুমারস্বামী মালাই, উত্তরপাহাড় শ্রীপুরমের চূড়ায় দেবী দুর্গাম্মার মন্দির, দক্ষিণপর্বত কান্নাপ্পারের পাদদেশে মহাভূতপুণ্যভূমি, শিবপ্রণাম শেষে পোন্‌মুখরির উত্তরযাত্রা, পাহাড়ছায়ায় শ্রীকালহস্তীর দোকান বাজার নিভৃত লোকালয়—সব মিলিয়ে শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক তুলনাহীন তৈলচিত্র। নদীকূল থেকে গিরিপথ উঠে এসেছে জনবসতিতে। এ-পথ পরম পবিত্র। এ-পথের পাথর কাটা বা নুড়ি কুড়ানো সম্পূর্ণ নিষেধ। পবিত্র পথের প্রতিটি নুড়ি, প্রত্যেকটি কঙ্করই হলেন শিবশঙ্কর।

শিবরাত্রির সময় শ্রীকালহস্তীতে দশদিনব্যাপী উৎসব, বিরাট মেলা। তখন গ্রাম গ্রামান্তের লোক শ্রীকালহস্তীনাথকে প্রণাম জানিয়ে পাহাড়ের কোলে পসরা সাজিয়ে বসেন, দেশবিদেশের মানুষ দেবদর্শন সারা হ'লে হাটে বাজারে কেনাকাটা করেন। মেলায় গরু বাছুর ছাগল ভেড়া হাতী মোষের তখন মেলাই ভীড়, তাদের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কেনাবেচার কত কথা। জনারণ্য শ্রীকালহস্তী তখন কলরবময়। অন্য সময় শ্রীকালহস্তী নীরব নিথর শান্তিমগ্ন এক স্বর্গলোক।

[ক্রমশঃ]

বেদান্তপ্রচারে 'রামচরিতমানস'

স্বামী পুরাণানন্দ

[পৌষ ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

মানবহৃদয়ে নিগূঢ়রূপে অবস্থিত বেদান্তোক্ত তত্ত্বের স্ফূর্তি গুরুকৃপাসাপেক্ষ। গুরুকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে স্বকর্মজনিত অবশ্যম্ভাবী জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হয় এবং মানুষ মোক্ষলাভ করে। উপনিষদের ঋষি তাই মোক্ষাভিলাষী বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে সদ্‌গুরুর কৃপালাভের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

> পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
> নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
> তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
> সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
> (মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।২।১২)

—নিত্যবস্তু (মোক্ষ) কর্মদ্বারা উৎপন্ন হয় না—এইরূপে কর্মলভ্য ফলসমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। সেই নিত্যপদ জানিবার জন্য তিনি যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সকাশেই গমন করিবেন।

দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ভগবৎপরায়ণতার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের গুরুভক্তি থাকাও একান্ত প্রয়োজন, যথা—

> যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
> তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
> প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
> (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৬।২৩)

—পরমেশ্বরের প্রতি যাঁহার পরা ভক্তি আছে এবং গুরুর প্রতিও যাঁহার অনুরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই উপনিষদুক্ত বিষয়সকল প্রকটিত হয়।

তুলসীদাসের গুরু ছিলেন শ্রীনরহরি দাস। 'রামচরিতমানসে'র সূচনায় মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে গুরুকৃপার মহিমা কীর্তন করিয়া তুলসীদাস বলিতেছেন:

বন্দউঁ গুরু-পদ-কঞ্জ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।
মহা-মোহ-তম-পুঞ্জ জাসু বচন রবি-কর-নিকর॥
(বালকাণ্ড, ৫)

—যিনি কৃপাসিন্ধু, নররূপে যিনি সাক্ষাৎ শ্রীহরি, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিতে যাঁহার উপদেশ সূর্যকিরণসদৃশ, আমি সেই শ্রীগুরুর চরণ-কমল বন্দনা করি।

বন্দউঁ গুরু-পদ-পদুম-পরাগা…।
শমন সকল-ভব-রুজ-পরিবারূ॥
(ঐ, ৬)

—সকল প্রকার ভবব্যাধির নাশক শ্রীগুরুর পাদপদ্ম-রজ বন্দনা করি।

গুরু-পদ-রজ মৃদু-মঞ্জুল-অঞ্জন।
নয়ন-অমিয় দৃগ-দোষ-বিভঞ্জন॥
তেহি করি বিমল বিবেক-বিলোচন।
বরনউ রামচরিত ভবমোচন॥
(ঐ, ৭)

—শ্রীগুরুর চরণরজরূপ কোমল ও সুন্দর অঞ্জন নয়নামৃতসদৃশ ও দৃষ্টিদোষনাশী, তাহার সাহায্যে বিবেকরূপ নেত্র নির্মল করিয়া সংসারবন্ধন-মোচনকারী শ্রীরামচরিত বর্ণনা করিতেছি।

লঙ্কায় যুদ্ধের সময় মেঘনাদ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্র নাগপাশে আবদ্ধ হইলে, দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধনমুক্তির জন্য নাগারি, বিষ্ণুবাহন গরুড়কে পাঠাইলেন। (বাল্মীকি-রামায়ণমতে রাম ও লক্ষ্মণ, উভয় ভ্রাতাই ইন্দ্রজিৎ-নিক্ষিপ্ত নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বাং রাঃ, যুদ্ধকাণ্ড, ৪৪শ সর্গ, ৩৬-৩৭ শ্লোক, গীতাপ্রেস দ্রঃ)। কিন্তু রামচরিতমানসে কেবল রামের আবদ্ধ হইবার কথা আছে। (লঙ্কাকাণ্ড, ৯৬।৫) গরুড় আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বন্ধনমুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এক গভীর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন:

ব্যাপক ব্রহ্ম বিরজ বাগীসা।
মায়ামোহ পার পরমীসা॥
সো অবতার সুনেউঁ জগ মাঁহী।
দেখেউঁ সো প্রভাব কছু নাহিঁ॥
(উঃ কাঃ, ৮২)

—শুনিয়াছি, নির্দোষ বাণীপতি, মায়ামোহের অতীত সর্বব্যাপী পরমেশ্বর সংসারে (শ্রীরামচন্দ্র-রূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু আমি তো তাঁহার কোন প্রভাব দেখিতেছি না।

ভববন্ধন তেঁ ছূটহিঁ নর জপি জা কর নাম।
খর্ব নিসাচর বাঁধেউ নাগপাস সোই রাম॥
(ঐ, ৮২)

—যাঁহার নাম জপ করিয়া মানুষ জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই শ্রীরামকে এক তুচ্ছ রাক্ষস নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিল!! এই গভীর দ্বন্দ্বজনিত সংশয়মুক্তির উদ্দেশ্যে গরুড় নারদের নিকট গমন করিলেন।

নারদ গরুড়কে শ্রীভগবানের দুর্নিবার মায়ার প্রভাব সম্বন্ধে বলিলেন:

জো জ্ঞানিন্হ কর চিত অপহরঈ।
বরিআঈঁ বিমোহ মন করঈ॥
জেহিঁ বহু বার নচাবা মোহী।
সোই ব্যাপী বিহঙ্গপতি তোহী॥
(ঐ, ৮৩)

—চিত্ত (বিবেক) হরণ করিয়া যে মায়া জ্ঞানি-পুরুষকেও বলপূর্বক মোহগ্রস্ত করে, আমাকেও যে মায়া বহুবার নাচাইয়াছে, হে পক্ষিরাজ, সেই

মায়াই এখন তোমাকে মোহগ্রস্ত করিয়াছে।*

পরে দেবর্ষি নারদ গরুড়কে বলিলেন, আমার কথায় তোমার মোহ দূর হইবে না, তুমি চতুর্মুখ ব্রহ্মার নিকট যাও। ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি গরুড়কে সংশয় অপনোদনের জন্য ভগবান শংকরের শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিলেন এবং পরে শিবের নির্দেশে গরুড় উত্তর দিকে অবস্থিত নীলগিরি পর্বতে আসিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীরাম-গুণ-কীর্তনরত, পরমভক্ত ও জ্ঞানী কাকভুশুণ্ডীর সহিত মিলিত হইলেন। ত্রিকালদর্শী, মহাজ্ঞানী কাকভুশুণ্ডীর আশ্রমের এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে ঐ স্থানে পৌঁছিবামাত্রই গরুড়ের সংশয়রূপ মোহ অপগত হইল এবং তিনি প্রসন্নমনা হইলেন। (ঐ, ৯০)

অনন্তর শ্রীরামমহিমা কীর্তন করিয়া কাকভুশুণ্ডী গরুড়কে বলিলেন :

জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোঈ।
সোঈ সোঈ ভাব দেখাবঈ আপুন হোঈ
ন সোঈ॥
(ঐ ১০৫)

অসি রঘুপতি লীলা উরগারী।
দনুজবিমোহনি জনসুখকারী॥
জে মতিমলিন বিষয়বস কামী।
প্রভু পর মোহ ধরহিঁ ইসি স্বামী॥
(ঐ, ১০৬)

—ভিন্ন ভিন্ন বেশভূষা ধারণ করিয়া নৃত্যজীবী নৃত্য প্রদর্শন করে, কিন্তু গৃহীত বেশ অনুসারে তত্তৎ-চরিত্রানুরূপ নৃত্য প্রদর্শন করিলেও নৃত্যজীবী তাহার স্বতন্ত্র এবং যথার্থ ব্যক্তিত্বের কথা ভোলে না। হে নাগারি, শ্রীরামচন্দ্রের লীলাও সেইরূপ জানিবেন—অসুরগণের পক্ষে তাহা মোহকারী কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পক্ষে সুখকর। হে স্বামী, মলিনবুদ্ধি, বিষয়ী ও কামী মনুষ্যেরাই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপর মোহ আরোপ করে।

পরে তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষীর পক্ষে গুরুকৃপার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে কাকভুশুণ্ডী বলিলেন :

বিনু গুরু হোঈ কি জ্ঞান
জ্ঞান কি হোঈ বিরাগ বিনু।
গাবহিঁ বেদ পুরান সুখ কি
লহহিঁ হরিভগতি বিনু॥
(ঐ, ১৩১)

গুরুকৃপা এবং বিষয়বৈরাগ্য না হইলে কি জ্ঞান হয়? (অর্থাৎ হয় না)। বেদ-পুরাণাদি সর্ব-শাস্ত্রে ইহাই সিদ্ধান্ত যে, হরিভক্তি ছাড়া সুখলাভ হয় না।

সদ্গুরুরূপী কাকভুশুণ্ডীর উপদেশ শ্রবণে দ্বন্দ্বাতীত, গতসংশয়, স্থৈর্যপ্রাপ্ত ও কৃতার্থ গরুড় সানন্দে বলিলেন :

গুরুবিনু ভবনিধি তরই ন কোঈ।
জৌঁ বিরঞ্চি শঙ্কর সম হোঈ॥
সংসয় সর্প গ্রসেউ মোহি তাতা।
দুখদ লহরি কুতর্ক বহু ব্রাতা॥
(ঐ, ১৪৪-১৪৫)

—ব্রহ্মা বা শিবের সমান হইলেও, গুরুকৃপা বিনা ভবসাগর অতিক্রম করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। হে তাত, সংশয়-সর্প আমাকে দংশন করিয়াছিল, নানা কুতর্ক-তরঙ্গ আমাকে দুঃখ দিতেছিল।

ভবসিন্ধু অতিক্রম করিয়া উপদ্রবরহিত বিমল চিরশান্তি লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর কৃপালাভ অপরিহার্য—নানা শাস্ত্রোক্ত এই বাণী, তুলসীদাস কেমন সুন্দরভাবে আপামর জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তাহা আমরা দেখিলাম।

ইহাও সর্বজনবিদিত যে শাস্ত্রে সৎসঙ্গের

*তুলনীয় : জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৫)

প্রয়োজনীয়তা ও মহিমা বহুধা কীর্তিত হইয়াছে। সরল অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের পক্ষেও সহজ-বোধ্য ও আকর্ষণীয় করিয়া এই তত্ত্ব সন্ত তুলসীদাস কেমন প্রচার করিয়াছেন তাহা আমরা এইবার 'রামচরিতমানস' অবলম্বনে ক্রমশঃ দেখিব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার অতিপ্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন :

তততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥
(১১।২৬।২৬)

—অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সজ্জনের সঙ্গ করিবেন। তাঁহারা সদুপদেশসহায়ে বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মনোগত আসক্তিদোষ দূর করিয়া দেন।

আবার বলিতেছেন :

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥
(১১।২৬।৩২)

—জলে ডুবিয়া যাইতেছে এমন ব্যক্তিদের পক্ষে দৃঢ় নৌকা যেমন পরম অবলম্বন, সেইরূপ ঘোর সংসারসাগরে যাহারা হাবুডুবু খাইতেছে—স্বকর্মবশে বারবার যাহারা নীচ ও উচ্চ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে—তাহাদের উদ্ধারের জন্য শান্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মাগণই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

এই প্রসঙ্গে তুলসীদাস বলিতেছেন :

বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হোঈ।
রামকৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ ॥
সতসঙ্গতি মুদ মঙ্গল মূলা।
সোঈ ফল সিধি সব সাধন ফূলা ॥
(বালকাণ্ড, ৮।৯)

—সৎসঙ্গ না করিলে বিবেক জাগ্রত হয় না, আবার ভগবৎকৃপা ব্যতিরেকে সৎসঙ্গ লাভ হয় না। সৎসঙ্গ আনন্দ ও মঙ্গলের মূল। সাধনা সৎসঙ্গ-বৃক্ষের পুষ্পস্থানীয় এবং সিদ্ধি ঐ বৃক্ষের ফল।

সঠ সুধরহিঁ সতসঙ্গতি পাঈ
পারস পরসি কুধাতু সোহাঈ ॥
বিধিবস সুজন কুসঙ্গতি পরহীঁ।
ফনি মনি সম নিজ গুন* অনুসরহীঁ ॥
(ঐ, ৮।৯)

—নিকৃষ্ট ধাতু যেমন স্পর্শমণির সংস্পর্শে স্বর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ শঠ ব্যক্তি সৎসঙ্গে শুদ্ধ হয়। বিষের সান্নিধ্যে সর্পের মস্তকস্থিত মণির স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য যেমন হ্রাস পায় না, সেইরূপ দৈবক্রমে অসৎসঙ্গে পড়িলেও সজ্জনের সচ্চরিত্রতার ব্যাঘাত হয় না।

মেঘনাদ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্র নাগপাশে বদ্ধ হইলে, রামরূপী পরমাত্মার মহিমা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া গরুড় দেবর্ষি নারদের নিকট যান। নারদ তাঁহাকে ব্রহ্মার নিকটে পাঠান। ব্রহ্মা তাঁহাকে সংশয় অপনোদনের জন্য আশুতোষ শ্রীমহাদেবের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন। গরুড় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমহাদেব বলিলেন :

তবহিঁ হোই সব সংসয় ভঙ্গা।
জব বহু কাল করিয় সতসঙ্গা ॥
(উঃ কাঃ, ৮৫)

—দীর্ঘকাল সৎসঙ্গ করিলে তবেই সকল সংশয়ের নিরসন হয়।

সুনিয় তঁহা হরিকথা সুহাঈ।
নানা ভাঁতি মুনিনহ জো গাঈ ॥
জেহি মহঁ আদি মধ্য অবসানা।
প্রভু প্রতিপাদ্য রামু ভগবানা ॥
(ঐ, ৮৫)

—মুনিগণ নানাভাবে যে পরম রমণীয় হরিকথা কীর্তন করেন—যাহার আদি, মধ্য এবং অন্তে

* পূর্বে আমরা বলিয়াছি 'রামচরিতমানসে' তালব্য 'শ'য়ের ব্যবহার প্রায় নাই—সেইরূপ তুলসীদাস 'ণ'-এর স্থানে প্রায় সর্বত্র 'ন' প্রয়োগ করিয়াছেন।

সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই প্রতিপাদ্য বিষয়—তাহা শ্রবণ কর। পরে শ্রীমহাদেব গরুড়কে বলিলেন :

বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা
তেহি বিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গয়ে বিনু রামপদ
হোঈ ন দৃঢ় অনুরাগ॥

(ঐ, ৮৫)

—সৎসঙ্গ ব্যতীত হরিকথা হয় না, হরিকথা না হইলে মোহ দূর হয় না এবং মোহাতীত না হইলে ভগবচ্চরণে দৃঢ় অনুরাগ জন্মে না।

সীতার উদ্ধারের পর শ্রীরামচন্দ্র সদলবলে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। দিকে দিকে যেন আনন্দলহরী বহিতেছে। এমন সময় একদিন ভ্রাতৃবৃন্দ ও সদানুগত ভক্ত শ্রীহনুমানকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামচন্দ্র নগরীর উপকণ্ঠে বিদ্যমান মনোরম উপবন-শোভা নিরীক্ষণে নির্গত হইলেন। ইত্যবসরে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তেজঃপুঞ্জকায়, ব্রহ্মানন্দে সদামগ্ন সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার—এই মুনিচতুষ্টয় শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষে তাঁহার নিকট আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং স্বীয় উত্তরীয় পাতিয়া সাদরে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া বলিলেন :

আজু ধন্য মৈঁ সুনহু মুনীসা।
তুম্হরে দরস জাহিঁ অঘ খীসা॥
বড়ে ভাগ পাইয় সতসঙ্গা।
বিনহিঁ প্রয়াস হোঈ ভবভঙ্গা॥

(উঃ কাঃ, ৫৬)

—হে মুনীশ্বরগণ, নিখিল পাপবিধ্বংসী আপনাদের পুণ্যদর্শনে আজ আমি ধন্য হইলাম। অনায়াসে ভববন্ধন ছিন্নকারী সৎসঙ্গ পূর্বজন্মের সুকৃতিবলেই কাহারও কাহারও লাভ হয়। তিনি আরও বলিলেন :

সন্ত পন্থ অপবর্গ কর কামী ভব কর পন্থ।
কহহিঁ সন্ত কবি কোবিদ শ্রুতি পুরান সদ্‌গ্রন্থ॥

(ঐ, ৫৬)

—সাধু, কবি, জ্ঞানী, বেদ, পুরাণ এবং যাবতীয় সদ্‌গ্রন্থ এই কথাই বলেন যে, সাধু-উপদিষ্ট পথে চলিলে জীবের সদানন্দময় পরমপদ লাভ হয় আর বিষয়াসক্তিবশতঃ নানা কাম্যবস্তুর অনুসরণ করিয়া চলিলে ত্রিতাপপূর্ণ সংসার বন্ধন লাভ হয়।

অনন্তর মুনিগণ ভগবানের স্তবান্তে বিদায় লইলেন।

[ক্রমশঃ]

সমালোচনা

বেদান্ত প্রবেশ : রামপদ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২। (১০৮৭) পৃঃ ১২+৪+২০২, মূল্য : ১৮ টাকা।

স্বর্গত রামপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সমন্বয়মন্ত্রের উদ্‌গাতা। আমাদের শাস্ত্রে অনেকে অনেক ক্ষেত্রেই অকারণে বিরোধ সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসু পাঠককে, মোক্ষার্থী সাধককে পথভ্রষ্ট করেছেন। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন মোক্ষমার্গী যথা জ্ঞানবাদী, ভক্তিবাদী, কর্মবাদী প্রভৃতিরা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনেও জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম প্রমুখ বিভিন্ন মার্গাবলম্বিগণের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করেছেন—যেন এই তিনটি মার্গ পরস্পরবিরোধী এবং সহাবস্থানে অপারগ। কিন্তু হায়, তাঁরা কি ভুলে যান যে, মানবজীবন ত সেই একটিই, একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্তা—তার মধ্যে এরূপ কৃত্রিম ভেদ একেবারেই অসম্ভব। অতএব এ-কথা

সানন্দে স্বীকার করে নিতে হবেই যে, শতদলের রঙ, মধু ও সৌরভকে যেমন পরস্পর থেকে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করা যায় না, ঠিক তেমনই চিত্তশতদলের জ্ঞান-ভক্তি-কর্মকেও পরস্পর থেকে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করা যায় না কোনক্রমেই।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এই মহাসত্যটিকে, এই পরম তত্ত্বটিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে তাঁর বিদগ্ধ রচনাসম্ভারের সর্বত্রই এই সমন্বয়ের সুরই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করেছেন উদাত্ত উদার তান-লয়-ছন্দে।

'বেদান্ত প্রবেশ' এরই আর একটি সমুজ্জ্বল উদাহরণ। সাধারণ মতানুসারে বেদান্ত প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ জ্ঞানমূলক, যদিও বৈষ্ণব-বেদান্ত-সম্প্রদায়েরও অভাব নেই। সেই বেদান্তদর্শনকে জ্ঞানের রঙে ভক্তির মধুতে কর্মের সৌরভে সুসজ্জিত সুসমৃদ্ধ করে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার আমাদের অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন নিঃসন্দেহে।

দার্শনিক বিষয়ে ঐকমত্যে উপস্থিত হওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার। সেজন্য পুণ্যশ্লোক গ্রন্থকর্তার সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ কোন কোন স্থলে থাকাই স্বাভাবিক। তা হলেও সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের নিকট তিনি চিরদিন প্রতিভাত হবেন একজন সাম্য-ঐক্য-সমন্বয়-সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রতিচ্ছবিরূপে।

শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতৃদেবের এই অমূল্যগ্রন্থটি প্রকাশ করে সকলের অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন।

ডক্টর রমা চৌধুরী

আরাত্রিক-ভজন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদানামামৃতম্‌ঃ সংকলক: স্বামী অপূর্বানন্দ। **প্রকাশক:** সম্পাদক, রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, পোঃ বারাসত, জেলা ২৪ পরগণা। পৃঃ ৪+৯৬, মূল্য: ১·২৫।

ছোট্ট এই অষ্টোত্তরশতনামামৃতম্‌ নামক গ্রন্থটি ভক্তজনের নিত্যসঙ্গীরূপে ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নামামৃত' (স্বামীজী প্রদত্ত শতনামের সাহায্যে রচিত), ধ্যান, প্রার্থনা, প্রণাম, সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনামামৃতমাহাত্ম্য। প্রদত্ত স্বরলিপির সাহায্যে গাইতে একঘণ্টা সময় লাগে। প্রথমাংশের শেষে আছে 'শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টোত্তর-শতনামস্তোত্রম্‌'। গ্রন্থটির শেষ অংশে 'শ্রীশ্রীসারদা-ষ্টোত্তরশতনাম', শ্রীসারদা-নবকম্‌, দেবী-ধ্যানম্‌, শ্রীমত্যাঃ সারদাদেব্যাঃ স্তোত্রম্‌, মাতৃপ্রশস্তিঃ, দেবী-স্তুতিঃ, দেবী-অভ্যর্থনম্‌—প্রভৃতি অনুবাদ ও স্বরলিপিসহ সংযোজিত হয়ে গ্রন্থটিকে মনোজ্ঞ করেছে। এই অংশও প্রদত্ত স্বরলিপির সাহায্যে গাইতে একঘণ্টা সময় লাগে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত শতনামের সাহায্যে সংস্কৃতে রচিত—অনুবাদ সমেত 'শ্রীরামকৃষ্ণা-ষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্‌'টি সংযোজনার ফলে গ্রন্থটির উপযোগিতা অনেক বেড়েছে। ১৮টি ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতও গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; ছাপা, বাঁধাই, গ্রন্থমূল্য সবই সুসঙ্গত। স্বামী অপূর্বানন্দজীর সদাজাগ্রত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা-অনুধ্যানের সুন্দর উদাহরণ।

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের পুনর্বাসন-প্রকল্প

১৯৭৮ সালের অভূতপূর্ব বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বালি কৃষ্ণভামিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি, স্কুল কমিটি কর্তৃক ক্রীত নিরাপদ উচ্চতর ভূমিতে, রামকৃষ্ণ মিশন সহৃদয় জনসাধারণের নিকট প্রাপ্ত অর্থে, বৃহত্তররূপে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যালয়টির নূতন নাম হইয়াছে সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীপার্থ দে হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত দীঘড়া গ্রামে রবিবার, ১৭ই মে ১৯৮১ সকালে কলিকাতার এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য লোকের উপস্থিতিতে এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন।

অন্যান্য ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) অন্ধ্রপ্রদেশ : শ্রীকাকুলাম জেলায় (বন্যায়) গৃহনির্মাণকার্য প্রাগ্রসর।

(খ) গুজরাত : (১৯৭৯'র বন্যায়) পুনর্বাসন-কার্য : লালবাগে গৃহনির্মাণকার্য অব্যাহত আছে।

(গ) উড়িষ্যা (১৯৮০'র বন্যায়): বন্যা-বিধ্বস্ত গুমুপুরে (কোরাপুট) ২৫০টি গৃহের নির্মাণকার্য শুরু হইয়াছে।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ : মালদা (১৯৮০'র বন্যায়) : বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে কালিয়াচকের ৬,৫৪৫টি পরিবারের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সরজমিনে সমীক্ষণ সমাপ্ত। সমীক্ষাকার্য এখনও অব্যাহত।

(ঙ) কেওঞ্জরগড়ে (উড়িষ্যা) ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ : ১৮ই এপ্রিল, ১৯৮১-তে সংবাদপ্রাপ্তির পর ১১টি গ্রামের ৪৬৩টি দুর্গত পরিবারবর্গের মধ্যে ৩০০টি ধুতি, ৩০০টি শাড়ী, ফ্রক ৩০৬টি, ইজার ২০০টি, ৩২২টি শার্ট, প্যাণ্ট ৩০০টি, ৩০০টি গামছা, বালতি ৩০০টি এবং লোটা ৩০০টি বিতরিত হইয়াছে।

(চ) তামিলনাড়ু খরাত্রাণ : মিশন নট্টরাম-পল্লী রামকৃষ্ণ মঠের মাধ্যমে খরাত্রাণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। পাঁচটি কূপ গভীরতরভাবে খনিত হইয়াছে এবং ১,৫০০ ব্যক্তিকে পানীয়, রন্ধনের ও অন্যান্য নিত্যকর্মে প্রয়োজনীয় জল মঠ হইতে সরবরাহ করা হইতেছে।

বাংলাদেশে :

দুইটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বস্ত্রবিতরণ, তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা (অ্যালোপ্যাথি) যথাপূর্ব চলিতেছে।

জন্মজয়ন্তী

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৬তম আবির্ভাবতিথি ৮ই মার্চ ১৯৮১, যথারীতি ভাব-গম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে রান্না-করা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। ১৫ই মার্চ সারাদিনব্যাপী সাধারণ-উৎসবে প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত হাতে-হাতে প্রসাদ পান। বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

দ্বারোদ্‌ঘাটন

২৫শে মার্চ ১৯৮১, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী **তিরুভল্লা** আশ্রমের নবনির্মিত পাঠাগার-গৃহ ও বিবেকানন্দ হলের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

ভিত্তিস্থাপন

১লা এপ্রিল ১৯৮১, স্বামী ভূতেশানন্দজী মাদ্রাজের গ্রিফিথ রোডস্থিত প্রস্তাবিত প্রাথমিক বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন।

মর্মরমূর্তিপ্রতিষ্ঠা

মরিশাস কেন্দ্রে **১১ই এপ্রিল** ১৯৮১, নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী। এই অনুষ্ঠানে সংঘের সন্ন্যাসিগণ, বহু ভক্ত নরনারী ও অনুরাগিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় আয়োজিত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী স্যার রামগুলোম। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী।

ভক্তসম্মেলন

কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৫ই ও ৬ই ডিসেম্বর (১৯৮০) ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই মঠের ইতিহাসে এই সম্মেলন প্রথম। ৫৩ জন স্থানীয় পুরুষ ও মহিলা ভক্তের উপস্থিতিতে ৫ই ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী আপ্তকামানন্দের স্বাগত-ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশোকাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের আদর্শ ও কর্মধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমরূপানন্দ, স্বামী অমেয়ানন্দ, কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জ্ঞানরূপানন্দ এবং বেলুড় মঠের স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ভক্তবৃন্দের প্রধান আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল প্রশ্নোত্তরের অধিবেশন। উল্লিখিত সন্ন্যাসিবৃন্দ ভক্তগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব, গার্হস্থ্যধর্ম সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ, ভারতবর্ষে নারীজাগরণের গুরুত্ব ও সমাজসেবায় নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এই সম্মেলনের অন্যতম অঙ্গ ছিল। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ ভক্তপ্রতিনিধিবৃন্দের আহার ও বাসস্থানের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন সমাপ্তিভাষণ প্রসঙ্গে স্বামী আপ্তকামানন্দ ভবিষ্যতে বৃহত্তর আকারে ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করিবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা, ২রা ও ৩রা জানুআরি ১৯৮১, মহাসমারোহে কল্পতরু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১লা কল্পতরু দিবসে প্রত্যুষ হইতে উদ্যানবাটীতে ভক্তবৃন্দের সমাগম শুরু হয় এবং চলে রাত্রি পর্যন্ত। হাজার হাজার ভক্ত নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণচরণে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করেন। মধ্যাহ্নে হাতে-হাতে সকলকেই প্রসাদ দেওয়া হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনা করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নানা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। উৎসবের আনন্দে মঠের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া ওঠে।

তৃতীয় দিন গীতিনাট্যাভিনয়, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত এবং যাত্রাভিনয় হয়। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানের পরিচালনায় মঠ-কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় ছাত্র ও যুবকবৃন্দ, কলিকাতা পুরসভা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশবাহিনী, স্থানীয় হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ, আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং সংবাদপত্রপত্রিকাসমূহ যথোচিত সহায়তা করেন।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

১৯৮০-র বি. এসসির পার্ট টু পরীক্ষায় **নরেন্দ্রপুর** কলেজের জনৈক ছাত্র বি. এসসির

(অনার্স) পরিসংখ্যানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছে।

১৯৮১-তে শিশুদের জন্য আয়োজিত রাজ্য-স্তরীয় সপ্তম বিজ্ঞানপ্রদর্শনীতে রামহরিপুর বিদ্যালয় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

দেহত্যাগ

স্বামী নির্বিকল্পানন্দ (পূর্ণানন্দ মহারাজ) গত ৫ই মার্চ ১৯৮১, বেলা ১২-১০ মিনিটে ৬৬ বৎসর বয়সে রাজমুন্দ্রী আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিছুদিন ধরিয়া তিনি পাণ্ডুরোগে পীড়িত ছিলেন এবং যকৃতে ক্যান্সার হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৩ সালে ভুবনেশ্বর মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাজমুন্দ্রী আশ্রমের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি বিশাখাপত্তনম্‌, বরানগর, কাঁথি, মাদ্রাজ মঠ, পুরী ও বেলুড় মঠে কাজ করেন। তিনি মাদ্রাজ মঠের তেলেগু পত্রিকা 'শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভা'র সম্পাদক ছিলেন।

স্বামী আপ্তানন্দ (অনিল মহারাজ) গত ১২ই মার্চ ১৯৮১, ভোর ৪টায় ৬০ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৪৩ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠে যোগদানের কিছু দিন পর তিনি বরানগর আশ্রমের কাজে নিযুক্ত হন। সেখানে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কাজ করিয়া তিনি বেলুড় মঠে আসেন এবং শরীর যাওয়ার পূর্ব দিন পর্যন্ত বাড়ী তৈরী ও মেরামতের কাজের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

স্বামী স্বানুভবানন্দ (গোপাল মহারাজ) গত ৩০শে মার্চ ১৯৮১, বেলা ১১-৪৫ মিনিটে ৭৭ বৎসর বয়সে রামহরিপুর আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে রামহরিপুর আশ্রমে আসিয়া হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২১ সালে শ্রীহট্ট (বর্তমান বাংলাদেশে) আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৩২ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি বাঁকুড়া, রামহরিপুর, বেলুড় মঠ, মালদা ও কাটিহার আশ্রমে কাজ করেন।

স্বামী দয়াত্মানন্দ (সনৎ মহারাজ) গত ৩০শে এপ্রিল ১৯৮১, দুপুর ১-৫৫ মিনিটে ৭২ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হৃৎপিণ্ডে রক্ত-সংবহনে আকস্মিক বিপর্যয় ও তৎসহ ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়াহেতু তাঁহার দেহান্ত হয়

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে টাকী আশ্রমে যোগদান করিয়া আমৃত্যু তিনি সেখানেই ছিলেন। ১৯৪৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল তিনি টাকী আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই মে (১৯৮১) শনিবার, রবিবার ও সোমবার উদ্বোধনের 'সারদানন্দ হলে' প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শনিবার বিকাল চারটায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হয়। শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের স্বাগত-ভাষণের পর স্বামী বন্দনানন্দ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী গহনানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতার পর শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিবেশন করেন।

প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় বিকাল পাঁচটায়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন। তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ জহর সেন।

প্রথম অধিবেশনের উত্তরার্ধে 'স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারা' সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ভাষণাকারে উপস্থাপিত করেন ডঃ রমা চৌধুরী। তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় দিন ১৭ই মে রবিবার সকাল নয়টায় দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। 'ইংরেজী সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান' সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী। তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক সুধাংশু মণ্ডল, শ্রীবিপ্রদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রকুমার ঘোষাল ও অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় অধিবেশনের উত্তরার্ধে 'বাংলা গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ উজ্জ্বল-কুমার মজুমদার। তাঁহার প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী ও শ্রীতাপস বসু।

দ্বিপ্রহরের বিরতির পর তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় বিকাল তিনটায়। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার। অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত 'শ্রীশ্রীমায়ের বাণী: সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণে' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন ডঃ জলধিকুমার সরকার, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ও ডঃ চামেলী বসু।

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্ম আন্দোলন'। তাঁহার আলোচনার উপর বক্তব্য রাখেন ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন ও অধ্যাপক সমরেন্দ্র পাল। এই অধিবেশনের শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'সুরসাধক বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয় সুরপীঠের শ্রীঅরুণ-কৃষ্ণ ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ কর্তৃক।

তৃতীয় দিন ১৮ই মে সোমবার বিকাল সাড়ে চারটায় চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দ। 'বিবর্তনবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন ডঃ চামেলী বসু, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও ডঃ ধ্রুব মার্জিত।

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে 'স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ রমেন্দ্র-নারায়ণ সরকার। তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ও শ্রীতাপস ভট্টাচার্য।

এই অধিবেশনের পর শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ 'জীবন যখন শুকায়ে যায় / করুণাধারায় এস' সংগীতটি পরিবেশন করেন।

তাহার পর বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে 'বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। তিনদিনব্যাপী এই সাহিত্য-সম্মেলন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুরাগী বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে।

* * *

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত **১৫ই জুলাই ১৯৭৯**, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং **২৬শে জুলাই ১৯৭৯**, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (১।৪।২) শুরু করছেন মাষ্টারমশাই গীতা থেকে 'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্' (৯।৩৩) এই শ্লোকার্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে। শ্লোকার্ধের তাৎপর্য এই যে, অনিত্য এবং সুখহীন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের শরণ নেওয়া, তাঁর উপাসনা করা। এই উদ্ধৃতিটি মাষ্টারমশাই কেন দিয়েছেন, তা আমরা পড়তে পড়তে বুঝতে পারব।

জীবের প্রকৃতি নানারকম। গীতাতে তো ঈশ্বরের ভজনা করতে, শরণ নিতে বলা হয়েছে, কিন্তু কোন কোন মানুষের প্রকৃতি এমনই যে, হাজার উপদেশ দিলেও তাদের মন ভগবানের দিকে যাবে না। তারা ভগবানকে চাইবে না। তাদের সমস্ত মন আবদ্ধ হয়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়সুখে। দুঃখকষ্ট পেলেও তারা সংসারেই সুখ খোঁজে—সংসারে যে শান্তি নেই এটা বোঝে না। আবার এমন মানুষও আছেন, যাঁদের শৈশব থেকেই সংসার ভাল লাগে না—ভগবানকেই আপনার বোধ হয়। এইরকম নানা প্রকৃতির মানুষ এ-সংসারে আছে। এই বিষয় নিয়েই ঠাকুর বলছেন : 'জীব চার থাক ব'লেছে—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্য।' শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে জীব যে চার থাকের সেটা সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন : "সংসার যেন জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষু জীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা করছে, তাদের সকলেই পালাতে পারে না। দু-চারটা মাছ ধপাঙ্ শব্দ ক'রে পালায় ; তখন লোকেরা বলে, 'ঐ মাছটা বড় পালিয়ে গেল !' এই দু-চারটা লোক মুক্ত জীব। কতকগুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসার জালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে ; অথচ এ বোধ নাই যে, জালে পড়েছে মরতে হবে। তারা জালে পড়েই জালশুদ্ধ চোঁ-চা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে লুকাবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে হেথায় বেশ আছি। বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনে—আসক্ত হয়ে আছে। কলঙ্ক সাগরে মগ্ন হ'য়ে র'য়েছে ; কিন্তু মনে করে বেশ আছি ! যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয় ; ভাল লাগে

না। তাই কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর, ভগবান লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ অনেক দূরের কথা।"

তা'হলে সংসারী জীবের উদ্ধারের উপায় কি? না, সাংসারিক সুখে সর্বদা দোষ দেখতে হবে। তাতে মনে বৈরাগ্য আসবে। এই হ'ল শাস্ত্রের বিধি। যাঁরা মুমুক্ষু বা মুক্তিলাভেচ্ছু তাঁরা এই দোষ দেখে এই সংসারের দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চান। কিন্তু যারা বদ্ধজীব তারা ভাবে বেশ আছি! বেশ যে নেই এ-বুদ্ধিটুকুও আসে না। যাঁদের জ্ঞানলাভ হয়ে গেছে তাঁরা জানেন যে, এই দুঃখকষ্টময় সংসারে আর তো কিছু প্রয়োজন নেই, এ-শরীরের একমাত্র প্রয়োজন ছিল ভগবানলাভ, জ্ঞানলাভ। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা শরীরটা ত্যাগও করতে পারেন। কিন্তু এটা যে সকলের জন্য নয়, তা আমরা আগের পরিচ্ছেদে (১।৪।১) আলোচনা করেছি।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলছেন: 'বদ্ধ-জীবের—সংসারী জীবের—কোন মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।' এই তো বদ্ধজীবের অবস্থা। বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আসা। কাজেই তাদের জ্ঞানদান করার জন্যই এই সব কথা বিশদভাবে বলছেন। একটি অনুপম উপমা দিচ্ছেন: 'উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দর দর ক'রে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছু-দিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হলো, তবু আবার বিয়ে ক'রবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল, সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো! এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। মোকদ্দমা ক'রে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে! যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়!' এই বর্ণনাটা ইংরেজীতে যাকে বলে realistic description, ঠিক তাই। একেবারে নিখুঁত বাস্তব চিত্র সংসারের! অবতারপুরুষ তিনি। তাঁর প্রত্যেকটি কথা একেবারে মনে দাগ কেটে যায়। যাতে সংসারী জীবের চৈতন্য হয় তাই তিনি বলছেন এই তো সংসার! কত দুঃখকষ্ট এখানে। তবু কেন তাতে এত মত্ত হয়ে থাকা! একটা মানুষ মনে করছে বেশ আছে বিয়ে-থা করেনি, সংসারের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু সে কি তা পারে? সংসার না করেও নানান উটকো কাজে জড়িয়ে পড়ে।

ঠাকুর আবার বলছেন: 'আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয়তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবু ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।' ঠাকুর অন্য এক জায়গায় বলেছেন, বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে দিয়েছে। এখন উপায় কি?—ফেলতেও পারে না গিলতেও পারে না।

বয়স হয়ে যাচ্ছে, মৃত্যুর ছায়া দেখা যাচ্ছে, তবু মানুষ সচেতন হচ্ছে না। অন্য কাজে সময় নষ্ট করছে তবু ঈশ্বরের নাম করার সময় পাচ্ছে না। সে দিকে খেয়ালই নেই। ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এসব এড়িয়ে যেতে পারত না। তিনি বলছেন: 'কেশব সেনের একজন আত্মীয়, পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখি তাস খেলছে! যেন

ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই

এমনও লোক আছে, তাকে হয়তো সংসার থেকে সরিয়ে রাখা হ'ল। তাকে বলা হ'ল তুমি উত্তরকাশীতে গিয়ে ধ্যানভজন করে কাটাও। কিন্তু সে তা পারবে না। কারণ মনে যদি বৈরাগ্য না আসে, তবে সে সাধনভজন করতে পারবে না। যদি সে মুমুক্ষু হয় তবে সাধনভজন করতে পারবে। নচেৎ সেখানে গিয়ে স্বভাবমত পরিবেশ খুঁজে নেবে। ত্যাগবৈরাগ্যের কথা তার মোটেই ভাল লাগবে না। ঠাকুর তাই বলছেন : 'বদ্ধজীবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই আনন্দ। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তাহ'লে মরে যাবে।' (১।৪।২)

গীতা—

আমরা আগের দিনের আলোচনায় দেখেছি যে, ধ্যানযোগী হ'তে গেলে জীবনে balance আনতে হবে—শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক পরিশ্রম বর্জন করতে হবে, মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। কর্মে দিনরাত মেতে থাকা নয়। আহার-বিহার, কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকবে। কোন কিছুই অতিরিক্ত হবে না। নিদ্রা ও জাগরণ দুটোই পরিমিত হবে—এইভাবে যিনি জীবনটাতে একটা ছন্দ নিয়ে আসতে পারবেন, তিনিই নির্বিঘ্নে ধ্যানযোগে সিদ্ধ হতে পারবেন। (৬।১৭)

যোগীকে কোন্ অবস্থায় ধ্যানযোগসিদ্ধ বলা যায়, সে-বিষয়ে শ্রীভগবান এখানে বলছেন : 'যখন চিত্ত সংযত হয়ে আত্মাতেই স্থিতি লাভ করে, এবং যোগী সমস্ত কাম্যবিষয়ে নিঃস্পৃহ হন, তখনই তাঁকে ধ্যানযোগসিদ্ধ বলা হয়।' (৬।১৮) চিত্ত সংযত হবে, অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে একাগ্র হবে। এই একাগ্রতা লাভের উপায় সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে—কিভাবে নির্জনস্থানে উপযুক্ত আসনে বসে শরীরকে দৃঢ় স্থির রেখে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির ক'রে মন থেকে সব চিন্তা দূর ক'রে যোগ অভ্যাস করতে হবে। (৬।১২-১৪) এইভাবেই সংযত চিত্ত কেবলমাত্র আত্মাতেই স্থিতিলাভ করে। মূলে আছে 'সর্বকামেভ্যঃ'। এখানে 'কাম' মানে কাম্যবিষয়। তা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, দুই-ই। অর্থাৎ ইহলোকের ও পরলোকের —ব্রহ্মলোকের পর্যন্ত—সমস্ত ভোগ্য বিষয়ে যোগী নিঃস্পৃহ হয়ে যান। তখনই তিনি যোগসিদ্ধ।

আত্মাতে এইভাবে সমাহিত চিত্তের অবস্থাটি শ্রীভগবান একটি উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন : 'বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপ [শিখা] যেমন কাঁপে না, স্থির থাকে, তেমনি সংযতচিত্ত যোগী, যিনি আত্মাতে সমাহিত হন, তাঁরও চিত্ত অচঞ্চল থাকে।' (৬।১৯)

এই পর্যন্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলা হ'ল। এখন শ্রীভগবান অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলছেন : 'চিত্ত যখন যোগানুষ্ঠানের দ্বারা নিরুদ্ধ হয়ে উপরত হয়, অর্থাৎ বিষয়সমূহ থেকে নিবৃত্ত হয় এবং যোগী যখন শুদ্ধ চিত্তের দ্বারা আত্মাকে অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি নিজ আত্মাতেই তুষ্ট হন।' (৬।২০) যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিবাতদীপশিখাবৎ একাগ্র হ'লে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তারপর চিত্তের সমস্ত বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। এরই নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন যোগী পরমা তুষ্টি লাভ করেন, তাঁর আর চাইবার কিছু থাকে না, জানবারও কিছু থাকে না।

এই সমাধিস্থ যোগীর অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীভগবান আরও বলছেন : 'এই যোগী শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় অনন্ত সুখ অনুভব করেন। এবং সে-অবস্থায় একবার স্থিতিলাভ হ'লে আত্মস্বরূপ থেকে আর কখনও বিচলিত হন না।' (৬।২১) 'যা লাভ ক'রে যোগী অন্য কোন লাভকে তার থেকে অধিক মনে করেন না, এবং যাতে স্থিত হ'লে অত্যধিক দুঃখকষ্টেও যোগী বিচলিত হন না।' (৬।২২) আত্মলাভ হ'লে যোগী অন্য কোন কিছু পাওয়া এই পাওয়ার থেকে বেশী মনে করেন না। এখানে আচার্য শংকর বলছেন, আত্মতত্ত্বে স্থিত হ'লে শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণ মহাদুঃখেও যোগী বিচলিত হন না।

বিবিধ সংবাদ

জন্মজয়ন্তী

শ্যামপুকুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণসারদা-সংসদে ১০ই জানুআরি হইতে ১৩ই ও ২০শে জানুআরি ১৯৮১, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ১০ই প্রাতে পূজা, শ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ হয়। কথামৃত ও লীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী পুরুষানন্দ। সন্ধ্যায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। রাত্রে শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণগান করেন। ১১ই হইতে ১৩ই ও ২০শে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী পরমাত্মানন্দ, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ও প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। ভজন ও লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীমতী কৃষ্ণা মিত্র ও গৌরী শ্রীমতী, 'জোড়াসাঁকো কালীকীর্তন সম্প্রদায়', 'শ্রীরামকৃষ্ণসারদাসংসদে'র ভক্তবৃন্দ, ভবানীপুর 'গিরিশ-ভবন', এবং 'সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্মিলনী'। পরমা ভট্টাচার্য, রঞ্জনা পাল, গার্গী মুখোপাধ্যায় ও মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য স্তোত্রাদি পাঠ করেন।

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক ১৮ই জানুআরি ১৯৮১, শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি-স্মরণে সংঘগৃহে আয়োজিত এক ধর্ম-সভায় সভানেত্রী প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যলীলা ও 'দেবী-মানবী' ভাবটি সবিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত ভক্তদের অনুপ্রাণিত করেন। অনুষ্ঠানশেষে ভক্তদের হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

খিদিরপুর সুরবিতান এবং 'রবি বসু গীতায়নে'র সংযুক্ত উদ্যোগে ২৭শে জানুআরি ১৯৮১, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু অনুষ্ঠান পরি-চালনা করেন এবং স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সংগীত-মাধ্যমে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

করোনারি অসুখের প্রতিরোধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে রক্ত-সরবরাহের জন্য যে-রক্তনালী আছে, তার নাম করোনারি আর্টারি (coronary artery)। বহু শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে এটি মাংসপেশীতে রক্ত-সরবরাহ করে। কোন শাখার রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে হৃৎপিণ্ডের অংশবিশেষ বিনষ্ট হলে সেই অবস্থাটিকে বলা হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন (myocardial in-farction)। এরূপ অবস্থায় ৪০ শতাংশ রোগীর ২৮ দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়। আবার এই ৪০ শতাংশের ৬০ শতাংশ পর্যন্ত রোগী এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। অর্থাৎ, চিকিৎসাব্যবস্থা তা যত উন্নত ধরনেরই হোক না কেন, সমস্যাটির সমাধানে বিশেষ কার্যকরী হয় না। সেইজন্য এই রোগের প্রতিরোধের ব্যাপারে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

করোনারি অসুখ, যা করোনারি রক্তনালীর রক্ত-চলাচল ব্যাহত হওয়ার ফলে হয়, তা প্রতিরোধ করতে হ'লে এর তিনটি প্রধান কারণ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে: খাদ্য, ধূমপান ও রক্তচাপ (blood pressure)।

কোলেস্টেরল (Cholesterol): আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে যতগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে,

সবগুলিতেই কোলেস্টেরল (যেটি একটি চর্বি-জাতীয় দ্রব্য) ও করোনারি অসুখের মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া গেছে। কিন্তু রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণের সঙ্গে খাদ্যে চর্বির কি কোন সম্পর্ক আছে? এর উত্তরে বলা যাবে, হ্যাঁ। যে কোন স্থানের অধিবাসীদের খাদ্যে পরিপূর্ণ চর্বির (saturated fat) পরিমাণ এবং তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ও করোনারি অসুখ হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যখন ব্যক্তিবিশেষের উপর এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়, তখন তার খাদ্যের চর্বির সঙ্গে রক্তের কোলেস্টেরলের তথা করোনারি অসুখের ঐরূপ কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এরূপ হওয়ার কারণ যাই হোক, এটা বলা যেতে পারে যে, অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য খাওয়া উচিত নয় এবং চর্বি কম খেলে কোন ক্ষতি হয়ই না, সম্ভবতঃ উপকারই হয়।

ধূমপান : যে সব দেশে করোনারি অসুখ বেশী হয়, সেখানে এই অসুখের উপর ধূমপানের প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। আবার দেখা গেছে যে, ধূমপান-ত্যাগ যত আগে হয় করোনারি অসুখের সম্ভাবনাও তত কমে যায়।

হাইপারটেনসন (Hypertension) বা **রক্তচাপবৃদ্ধি :** উচ্চরক্তচাপ করোনারি অসুখের একটি পূর্বগামী কারণ (predisposing factor)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) যদি হৃৎপিণ্ডের প্রসারিত অবস্থার রক্তচাপ (diastolic blood pressure), ১১৫'র (115 m.m. of mercury) বেশী হ'লে রক্তচাপবৃদ্ধি ব'লে ধরা হয়, তাহলে ওখানকার অধিবাসীদের শতকরা ২ বা ৩ শতাংশ এই পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু যদি রক্তচাপবৃদ্ধির নিম্নতম মান ৯০ ধরা হয়, তাহলে ও-দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ এই পর্যায়ে এসে যাবে। সে যাই হোক, এটি নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রক্তচাপ ১১৫ (diastolic) হ'লে চিকিৎসা দরকার; তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে রক্তচাপ ১০৫—১১০ হ'লেই চিকিৎসার প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলির প্রত্যেকটি অন্যের সঙ্গে যোগ হয়ে করোনারি অসুখের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলে। এ-বিষয়ে বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে যে, যদিও ঝুঁকিগুলির সঙ্গে করোনারি অসুখের সম্পর্ক আছে তবু দেশ-ভেদে এদের প্রভাব বিভিন্ন। মনে হয়, দেশ, সমাজ ও স্ত্রীপুরুষের বিভিন্নতায় করোনারি অসুখের যে পার্থক্য দেখা যায়, তার অন্যান্য নিদানগত কারণ আছে।

আগেকার কয়েকটি অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, যে-সব লোক শ্রমভিত্তিক কাজে নিযুক্ত, তাদের এ-অসুখ কম হয়। যে-সব সমৃদ্ধ সমাজে করোনারি অসুখ বেশী হয়, সেখানে কঠোর পরিশ্রমের কাজ কম এবং সেখানে অবসর-সময়ে শারীরিক পরিশ্রমই এ-ব্যাপারে বিবেচ্য। সে যাই হোক, সকল ক্ষেত্রেই নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম উপকারী এবং তাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

করোনারি অসুখ নিবারণে শারীরিক স্থূলতা কমানও একটি অবশ্যকর্তব্য কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে। স্থূলতা পূর্বোক্ত অনেকগুলি বিপদের ঝুঁকির সঙ্গে সম্পৃক্ত—যেমন উচ্চরক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরলের প্রাচুর্য, রক্তে শর্করাবৃদ্ধি বা বহুমূত্র রোগ।

[WHO Chronicle, Vol. 34, No. 1, January 1980, p. 36]

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪'০০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩'২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০

২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫'০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, মূল্য ১'০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

সৎকথা—পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "দ্রুতপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬'২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা— শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩'৫০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা—স্বামী দেবানন্দ। পৃঃ ৬০, মূল্য ১'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪'০০

সংস্কৃত

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮'০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮'৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ৯'২৫

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায়, ৩য় খণ্ড ৪'০০, ৪র্থ খণ্ড ৩'০০ ; ২য় অধ্যায় ১৩'০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩'০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮'০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩'০০।

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিদ্যাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

আষাঢ় ১৩৮৮

৮৩তম বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮৩তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৫৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৩৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪·০০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৩·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২·৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা— স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৬·০০

২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫·০০

ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩·২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫·০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১·৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭·৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫·৫০

২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫·০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪·০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬·৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, মূল্য ১·০০

পুণ্যস্মৃতি— স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩·০০

সৎকথা—পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭·৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩০, মূল্য ৪·৫০

[illegible] —স্বামী [illegible]। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "[illegible]" [illegible]

শঙ্কর-চরিত [illegible] ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬, [illegible] ২·[illegible]

দশাবতার চরিত—৮ম সংস্করণ, পৃঃ ১০৮ মূল্য ৩·৭৫

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫·০০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫·০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪·০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬·২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা— শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০·০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১·২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৪৮, মূল্য ০·৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪'০০

সংস্কৃত

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮'০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮'৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ৯'২৫

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত মূল্য: ১ম অধ্যায়, ৩য় খণ্ড ৪'০০, ৪র্থ খণ্ড ৩'০০; ২য় অধ্যায় ১৩'০০; ৩য় অধ্যায় ১৩'০০; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮'০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩'০০।

ঘরে বেদান্ত—স্বামী বিদ্যাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

৮৩তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

'অনবসাদ' বা বল ভক্তিলাভের সাধন। শ্রুতি বলেন, 'বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।' এখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দৌর্বল্য লক্ষিত হইয়াছে। 'বলিষ্ঠ, দঢ়িষ্ঠ' ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য হইবার উপযুক্ত। **দুর্বল,** শীর্ণকায়, [illegible] ব্যক্তি কী সাধন করিবে? শরীর ও মনের মধ্যে যে **অদ্ভুত** শক্তিসমূহ লুক্কায়িত আছে কোনরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা তাহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রত হইলেও দুর্বল ব্যক্তি একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। যুবা, **সুস্থকায়,** সবল ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন। সুতরাং সিদ্ধিলাভের জন্য মানসিক বল যে পরিমাণে প্রয়োজন, শারীরিক বলও সেই পরিমাণে চাই। ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহই সহ্য করিতে পারে। নৈরাশ্য আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। **সর্বদা** হাসিমুখে প্রফুল্ল থাকিলে কোন স্তবস্তুতি বা প্রার্থনা অপেক্ষা শীঘ্র ঈশ্বরের নিকট যাওয়া যায়। যাহাদের মন সর্বদা বিষণ্ণ ও তমোভাবে আচ্ছন্ন, তাহারা আবার ভালবাসিবে কি করিয়া? তাহারা যদি ভালবাসার কথা বলে, তবে জানিবেন, উহা মিথ্যা, অতএব যে ব্যক্তি সর্বদাই নিজেকে দুঃখিত বোধ করে, সে কখনও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না 'আমি বড় দুঃখী!'—এরূপ বলা ধার্মিকের লক্ষণ নয়, উহা শয়তানি। প্রত্যেককেই নিজ নিজ দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়। বাস্তবিকই যদি আপনার দুঃখ থাকে, সুখী হইবার চেষ্টা করুন, দুঃখকে জয় করিবার চেষ্টা করুন। দুর্বল ব্যক্তি কখনই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না।—অতএব দুর্বল হইবেন না। আপনাকে শক্ত সবল হইতে হইবে—অনন্ত শক্তি আপনার ভিতরে। নতুবা কোন কিছু জয় করিবেন কিরূপে? ঈশ্বরলাভ করিবেন কিরূপে?

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৪।৪৯, ১০০-০১]

কথাপ্রসঙ্গে

মনুসংহিতায় চিরকালের ধর্ম : ধৃতি

মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের একটি শ্লোকে[১] যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :

> ইঁট কাঠ মাটিতে পড়িয়া থাকে। নিষ্প্রাণ তাহারা। তাহাদেরই মতো নিষ্প্রাণ যে-দেহ, তাহা অগ্নিতে উৎসর্গ করিয়া বান্ধবগণ বিপরীতমুখে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কেবলমাত্র ধর্মই সেই মৃতব্যক্তির অনুগমন করে।

জনৈক টীকাকার লিখিয়াছেন : এখানে 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ শুভাশুভ-অদৃষ্ট ; কারণ ভোগের জন্য শুভ ও অশুভ (ধর্ম ও অধর্ম) উভয়ই মৃতব্যক্তির অনুগমন করে। অর্থাৎ, টীকাকারের বক্তব্য হইল : 'ধর্ম' বলিতে এখানে 'অধর্ম'ও বুঝিতে হইবে। কারণ, কেবলমাত্র ধর্মই যে মৃতব্যক্তির অনুগমন করে তাহা নহে, অধর্মও করে।

কথাটা ঠিকই। ধর্মাধর্ম অর্থাৎ পাপপুণ্য, যাহা ইহজীবনে—শুধু ইহজীবনেই নহে, পূর্ব পূর্ব জন্মেও করা হইয়াছে এবং যাহাদের ফল এ-যাবৎ অভুক্ত রহিয়াছে, সেগুলি সবই প্রয়াত ব্যক্তিকে অনুসরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু মহর্ষি মনুর বক্তব্য তাহা নহে। তাঁহার বক্তব্য হইল—ধর্মই 'সহায়রূপে' অনুগমন করে। উক্ত টীকাকারও প্রথমে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শেষে উল্লিখিত মন্তব্য করিয়াছেন। ফলে মহর্ষি মনুর বক্তব্যটি ব্যাহত হইয়াছে। সুতরাং অধর্মের প্রসঙ্গ না আনিলেই সমীচীন হইত। অধর্ম তো আর 'সহায়রূপে' অনুগমন করে না!

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ধর্ম 'সহায়-রূপে' অনুগমন করে—একথাটি আসিল কোথা হইতে।

'সহায়রূপে' কথাটি আসিল অব্যবহিত পূর্ব-বর্তী দুইটি শ্লোক হইতে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে : জীব একাকীই জন্মায়, একাকীই মরে, একাকীই শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করে।[২] অর্থাৎ, জীব একান্ত অসহায়—জন্ম ও মৃত্যুতে, সুখ ও দুঃখের ভোগে।

ইহারও অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে : পরলোকে সাহায্য করিতে পিতা বা মাতা নাই, পুত্র বা কলত্র নাই, জ্ঞাতিরাও নাই—কেবলমাত্র ধর্মই আছে।[৩]

ধর্মই যে পরকালের একমাত্র সহায়—একথা মহর্ষি মনু অনেক পরে অষ্টম অধ্যায়েও অতি স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলিয়াছেন : ধর্মই একমাত্র সুহৃৎ, যিনি মৃত্যুর পরও আমাদের অনুগমন করেন। শরীরের সহিত অন্য সব কিছুই বিনষ্ট হয় (শরীর বিনষ্ট হইলে কাহারও সহিত বা কোন-কিছুর সহিত সম্পর্ক থাকে না)।[৪]

এইজন্য মহর্ষি মনু বলিতেছেন : অতএব পরলোকে সাহায্যের জন্য সর্বদা ধীরে ধীরে ধর্মসঞ্চয় করিবে—ধর্মরূপ সহায়ের দ্বারাই মানুষ দুস্তর তমঃ অতিক্রম করে। তপস্যার দ্বারা নিষ্পাপ, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ধর্মই ভাস্বর ব্রহ্মশরীরী করিয়া

---

১ মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ। বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ (৪।২৪১)
২ একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ (৪।২৪০)
৩ নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ। ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ (৪।২৩৯)
৪ এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥ (৮।১৭)
[এই শ্লোকটি 'হিতোপদেশে'ও আছে (মিত্রলাভ, ৬৫)। সেখানে 'হি' স্থলে 'তু' পাঠ আছে।]

সত্বর পরলোকে উপনীত করে।[৫]

যে-ধর্মের এত মহিমা, সেই ধর্ম কী? সংক্ষেপে বলা যায়, সেই ধর্ম হইতেছে অনুষ্ঠেয় কর্ম, যাহার বিধিবিধান মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতায় দিয়াছেন। তিনি অবশ্য যে-ধর্মের বিধান দিয়াছেন, তাহা বেদভিত্তিক। মহর্ষি ভৃগু বলিতেছেন: যাহার যাহা কিছু ধর্ম মনু ঘোষণা করিয়াছেন, সে-সকলই বেদে কথিত হইয়াছে; মনু 'সর্বজ্ঞানময়' (অথবা বেদ 'সর্বজ্ঞানময়')।[৬]

যাহা হউক, মনুসংহিতায় ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর ধর্ম; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বেদবহির্ভূত ব্যক্তিগণের ধর্ম, দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম, রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম, মোক্ষধর্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মের বিধান দেওয়া হইয়াছে। (১।১১১-১৯) এই সকল বিধিবিধানের অনেক-গুলিই বর্তমান যুগে অচল হইয়া গিয়াছে। যুগে যুগে 'মানব' ধর্মের অর্থাৎ মনূক্ত ধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, সেগুলি 'চিরকালের ধর্ম' নহে। কিন্তু আমরা মনুসংহিতায় বহু অমূল্য শ্লোক পাই, যেগুলিতে চিরকালের ধর্ম উল্লিখিত হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে মাত্র একটি শ্লোককে প্রধান উপজীব্য করিয়া আমরা মনুসংহিতায় চিরকালের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

মহর্ষি মনু বলিতেছেন:

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥ (৬।৯২)

—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

একাধিক টীকাকার 'ধৃতি'র অর্থ করিয়াছেন 'সন্তোষ'। 'ধৃতি'র অন্যতম অর্থ 'সন্তোষ' হইলেও প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অর্থটি গ্রহণ না করার কারণ স্পষ্ট নহে। ভাষ্যকার মেধাতিথি অবশ্য প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

> ধনাদির সম্যক্ নাশ হইলে মনোবলকে আশ্রয় করাই ধৃতি। ধনসম্পত্তির নাশ হইয়াছে, তাহাতে কি? পুনরায় অর্জন করিবার শক্তি আমার আছে। প্রিয়জনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতেই বা কি? সংসারের এইরূপই ধারা!—এইভাবে [চিন্তা করিয়া] বিচলিত চিত্তকে পূর্বাবস্থায় আনয়ন করার নামই ধৃতি।[৭]

মেধাতিথির ব্যাখ্যা কুল্লূক ভট্ট প্রমুখ পরবর্তী কালের টীকাকারগণ কেন বর্জন করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, আমরা লক্ষ্য করি 'ধর্ম' ও 'ধৃতি'র মধ্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর মন্-প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম' শব্দটি ব্যুৎপন্ন। ঐ একই ধাতুর উত্তর ক্তিন্-প্রত্যয় করিয়া 'ধৃতি' শব্দটি ব্যুৎপন্ন। 'ধর্মে'র অর্থ—যাহা ধারণ করে। 'ধৃতি'র অর্থও অনেকটা তাহাই—অর্থাৎ, যাহার দ্বারা মানুষ নিজেকে ধারণ করে। সুতরাং 'ধর্মে'র লক্ষণ বলিতে গিয়া মহর্ষি মনু যে প্রথমেই 'ধৃতি'র উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা খুবই সঙ্গত হইয়াছে।

---

৫ তস্মাদ্ধর্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ। ধর্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্॥
ধর্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষম্। পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণম্॥ (৪।২৪২-৩)

৬ যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ। স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥ (২।৭)

৭ 'ধৃতির্নাম ধনাদি-সংক্ষয়ে সত্ত্বাশ্রয়ঃ। যদি ক্ষীণং ততঃ কিং, শক্যম্ অর্জয়িতুম্ ইতি। এবং ইষ্ট-বিয়োগাদৌ সংসারগতিঃ ইয়ম্ ঈদৃশী ইতি প্রচলতঃ চিত্তস্য যথাপূর্বম্ অবস্থাপনম্।' (মনুসংহিতা, ৬।৯২, মেধাতিথির ভাষ্যাংশ)

গীতাতে 'ধৃতি' শব্দটি আমরা বিভিন্ন বিভক্তিতে এবং সমাসে ত্রয়োদশবার পাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 'ধৃতি' শব্দটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বহু ভাষ্যকার ও টীকাকারও উহার উপর আলোকপাত করিয়াছেন। আমরা সেই সকল ব্যাখ্যার কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি।

শ্রীভগবান গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে ছাব্বিশটি দৈবী সম্পদের উল্লেখ করিয়াছেন। 'ধৃতি' উহাদের অন্যতম (১৬।৩)। 'ধৃতি'র ব্যাখ্যায় শংকরাচার্য লিখিয়াছেন: দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই অবসাদের প্রতিষেধক, অন্তঃকরণের একটি বিশেষ বৃত্তির নাম ধৃতি—ধৃতির দ্বারা উজ্জীবিত হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ আর অবসন্ন হয় না।[৮]

শ্রীধরস্বামী সংক্ষেপে লিখিয়াছেন: দুঃখাদির দ্বারা অবসন্ন চিত্তের স্থিরীকরণই ধৃতি।[৯]

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে ধৃতি ত্রিবিধা। আমরা সাত্ত্বিকী ধৃতিরই উল্লেখ করিতেছি, কারণ উহাই আদর্শ:

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
(১৮।৩৩)

—হে পার্থ, যে অব্যভিচারিণী ধৃতির দ্বারা যোগের সাহায্যে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের ক্রিয়াসমূহ [শাস্ত্রীয় মার্গে] বিধৃত হয়, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি।

এই সকল ব্যাখ্যা হইতেও পাওয়া যায় যে, ধৃতি ধারণার্থক; ধর্মও ধারণার্থক—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এবং মনে হয়, এই কারণেই ধর্মের দশটি লক্ষণের মধ্যে 'ধৃতি'র উল্লেখ প্রথমেই করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ 'সাধনসপ্তক'ও স্মরণীয়। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যভূমিকায় আচার্য রামানুজ 'বাক্যকার' (শ্রীসম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য) কর্তৃক প্রবেদিত বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ—এই সাতটি সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন।[১০] (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১, শ্রীভাষ্য, অনুচ্ছেদ ২৬)। ষষ্ঠ সাধন 'অনবসাদ' সম্পর্কে বাক্যকার লিখিয়াছেন: 'দেশ-কাল-বৈগুণ্যাৎ শোকবস্ত্বাদ্যনুস্মৃতেশ্চ তজ্জন্যং দৈন্যম্ অভাস্বরত্বং মনসঃ অবসাদঃ, তদ্বিপর্যয়ঃ অনবসাদঃ ইতি।' অর্থাৎ, প্রতিকূল দেশ ও কালের প্রভাবহেতু শোকপ্রদ বিষয়ের স্মরণের জন্য মানসিক দুর্বলতা ও দীপ্তির অভাব—ইহারই নাম অবসাদ; অনবসাদ উহার বিপরীত।

বাক্যকারের এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনা ও তাঁহার একটি কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। খেতড়িরাজ অজিত সিংহ স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'স্বামীজী, জীবনটা কি?' স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, 'প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি চেষ্টা করছে জীবকে দাবিয়ে রাখতে, আর তাদের দ্বারা অবসাদগ্রস্ত না হয়ে আত্মস্বরূপের আবরণ উন্মোচিত হয়ে প্রকাশ ঘটছে—এরই নাম জীবন।' (ভাবানুবাদ। মূলে আছে: 'Life is the unfoldment and development of a being under circumstances tending to press it down.')

'ধৃতিঃ দেহেন্দ্রিয়েষু অবসাদং প্রাপ্তেষু তস্য প্রতিষেধকঃ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ, যেন উত্তম্ভিতানি করণানি দেহঃ চ ন অবসীদন্তি।' (গীতা, ১৬।৩, শাংকরভাষ্যাংশ)

'ধৃতিঃ দুঃখাদিভিঃ অবসীদতঃ চিত্তস্য স্থিরীকরণম্।' (ঐ, শ্রীধরী টীকা)

এই সাতটি সাধন সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'ভক্তিযোগ' ও 'ভক্তিরহস্য' গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪৫-৫০ এবং পৃঃ ৯২-১০১ দ্রষ্টব্য।

স্বামীজী-কথিত জীবনের এই সংজ্ঞা হইতে ধৃতির উপযোগিতা আমরা বুঝিতে পারি। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও জীবনে অবসাদ আসে—যেমন কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে মহাবীর অর্জুনের আসিয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে 'ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য' ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ উহা 'ধৃতি'রই উপদেশ। স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, গীতার ঐ শ্লোকটি (২।৩) পাঠ করিলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ ঐ শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত। (বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫।২৫৩)। মনের যে-শক্তির দ্বারা 'অনবসাদ' সাধিত হয়, সেই শক্তিই 'ধৃতি'। ধৃতিরূপ ধর্ম মানবমাত্রেরই পরম সম্পদ। [পরবর্তী সংখ্যায় 'ক্ষমা']

আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্য আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আমি বেশী কথা বলব না, যদিও এই প্রতিষ্ঠানের একেবারে গোড়া থেকে, অর্থাৎ ১৯১৬ থেকে যখন আমি মাদ্রাজ মঠে একজন ব্রহ্মচারী, সে সময় থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি যুক্ত।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কিছু বলব। আমরা যেদিকে তাকাই, সেদিকে হতাশা ও অবক্ষয়। রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা সামাজিক সম্পর্ক এবং সর্বশেষে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও পরিস্ফুট সেই একই করুণ চিত্র। শিক্ষাক্ষেত্রেই এই অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ে যত বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় দেখা যায়, তার মূলে রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক গলদ। ছেলেদের যেমন শিক্ষা দেওয়া যায়, তারা তেমনিই গড়ে ওঠে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলে সে সকল ত্রুটি পরিস্ফুট হবে সে শিক্ষায় শিক্ষিত প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এবং সেজন্য আমরা তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারব না। এই দেশে এসে ইংরেজরা আমাদের ঘাড়ে একদা যে ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল আমরা এখনও তারই অল্পবিস্তর অনুসরণ করে চলেছি। সেই শিক্ষাব্যবস্থা পাশ্চাত্যের সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম; কিন্তু আমাদের সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। এখনও পর্যন্ত আমরা মোটামুটি ঐ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যের সঙ্গে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন যোগ নেই। যুগযুগান্ত ধরে জাতির জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে চরম সত্যের উপলব্ধি। আমাদের সমাজ বিবিধ পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তার সাংসারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে চলেছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ঐ একই উদ্দেশ্যমুখী। এদেশে পরা বিদ্যার উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে অপরা বিদ্যা কখনও নিষিদ্ধ বা অবহেলিত হয় নি এবং ভারতবর্ষ সেই যুগে অপরা বিদ্যাতেও শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল

* মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখে প্রদত্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ইংরেজী আশীর্ভাষণের স্বামী প্রভানন্দ-কৃত অনুবাদ।—সঃ

পরা বিদ্যা এবং চরিত্রগঠন, নীতিবিজ্ঞান ও সমজাতীয় বিষয়ের উপর। শিক্ষার্থীদের চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠত যে, তারা জাতির অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হত। আধুনিককালের মত সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় ছিল না। পাঠ্যতালিকার অতিরিক্ত কার্যসূচীর মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হত শিক্ষার্থীদের মনবুদ্ধি, এর ফলে তাদের অন্তঃকরণ হত নির্মল, চিত্ত হত দৃঢ়, গড়ে উঠত খাঁটি চরিত্র। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে অটুট ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত এবং একটি সুনির্দিষ্ট নৈতিক মানের আচারব্যবহার অনুসরণ করতে হত। এ সবই সাহায্য করত তাদের মনকে পরিমার্জিত করতে। মনের সাহায্যেই মানুষ জ্ঞান আহরণ করে থাকে। সেই মন দোষদুষ্ট হলে বা সযত্নে সুরক্ষিত না হলে তার পক্ষে জ্ঞানার্জন করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

তোমরা লক্ষ্য করেছ যে, স্বামীজী অত্যল্প সময়ে মোটা মোটা বই পড়ে ফেলতেন। কারণ তাঁর মন ছিল সুগঠিত। পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজী একবার একটি বাগানে বাস করছিলেন। নিকটেই ছিল একটি গ্রন্থাগার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন গুরুভাই। স্বামীজী তাঁর গুরুভাই অখণ্ডানন্দকে পাঠান গ্রন্থাগার থেকে কয়েকটি বই আনতে। স্বামীজীর নির্দেশ অনুসারে তিনি প্রতিদিন গ্রন্থাগার থেকে একটি বা দুটি বই[১] নিয়ে আসতেন। পরের দিনই সেই বইগুলি ফেরত দিয়ে নতুন বই নিয়ে আসতেন। গ্রন্থাগারিক ভাবলেন: ব্যাপার কি? এই সব এক একখানা বই পড়তে অন্যলোকের কয়েক মাস লেগে যায় আর প্রত্যেকদিনই দেখছি বই ফেরত দিচ্ছে ও নিচ্ছে। এ সবই কি লোকদেখান পড়ার ভানমাত্র? গ্রন্থাগারিক তাঁর মনের সন্দেহ প্রকাশ করেন স্বামীজীর গুরুভাইয়ের কাছে। একথা শুনে স্বামীজী একদিন নিজেই গ্রন্থাগারিকের কাছে যান। স্বামীজী তাঁকে বলেন: 'বেশ তো আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করুন, যে বইগুলি আপনার কাছ থেকে এনেছি তা থেকে যে কোন প্রশ্ন করুন।' তিনি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজীও তাঁকে সমুচিত উত্তর দেন। স্বামীজী বলেন: 'দেখুন, আপনারা শব্দ পড়েন। একটি বই পড়তে গেলে আপনারা তার প্রতিটি শব্দ ধরে পড়েন। আমি শব্দ ধরে পড়ি না, আমি গোটা এক একটা পৃষ্ঠা ধরে পড়ি। যে-কোন পৃষ্ঠার প্রথম কয়েকটি শব্দ ও শেষ কয়েকটি শব্দ পড়ি এবং বুঝে ফেলি সেই পৃষ্ঠার মর্মকথা।' এইভাবে স্মৃতিশক্তি তথা মনের বিশেষ বিকাশ ঘটলে আমরা সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান আহরণ করতে পারি। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এ ধরনের মন গঠনের কোন ব্যবস্থাই নেই। পরা বিদ্যার অবজ্ঞা এবং পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে বিভেদই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যাবতীয় সমস্যা আনয়ন করেছে। সে কারণেই আমরা দেখতে পাই এত সব বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়।

উপরন্তু, রাজনৈতিক দলগুলি চেষ্টা করছে ছাত্ররা যাতে তাদের হয়ে প্রচারকাজ করে, এর কুফলও ফলছে। এই সব কিছু আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। তোমরা লক্ষ্য করেছ যে, উত্তর ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কয়েক বছর আগে, তাদের ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয় নি। যে সকল ছাত্র পরবর্তী কালের পরীক্ষাগুলি দিয়েছিল, তাদের পরীক্ষার ফল আটকে রাখা হয়েছে, কারণ পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয় নি। এভাবে চলেছে আমাদের বর্তমানের শিক্ষার ধারা। যদি আমরা শিক্ষার মৌল-দর্শন পরিবর্তিত না করি এবং যদি পরা বিদ্যার দিকে অর্থাৎ চরিত্রগঠন, মানসিকতার সংস্কার প্রসঙ্গে

১ স্যার জন লাবকের গ্রন্থাবলী

গুরুত্ব না দিই, তাহলে একটি মহৎ ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হব। একবার জনৈক বিজ্ঞানের অধ্যাপক আমাদের একটি মহাবিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি দেখতে এসেছিলেন। বিভাগীয় অধ্যক্ষ অতিথিকে নিয়ে যান মহাবিদ্যালয়টিকে দেখাবার জন্য। যেখানে অনুবীক্ষণ-যন্ত্রগুলি (Microscope) রাখা ছিল, সেখানে গিয়ে একটি যন্ত্র নিয়ে তিনি দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন না। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের লেন্সটি খুলে তাঁর রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে যন্ত্রের মধ্যে বসাতেই তিনি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তোমরা সূক্ষ্ম জিনিস দেখতে পাও, এবং তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ কর। সেই যন্ত্রটির যদি যত্ন না নাও, যদি সেটি অপরিষ্কার হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে তা দিয়ে কিভাবে পরীক্ষার্থ বস্তুটি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হবে? লেন্সটি পরিষ্কার রাখতে হবেই। তেমনি কয়েকটি চারিত্রিক রীতিনীতি পালন করে মনটিকে স্বচ্ছ, সজাগ ও সুদৃঢ় করে রাখতে হবে। তাহলেই সেই মন দিয়ে সহজেই বস্তুর সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমরা ধারণা করতে পারব। শিক্ষার এই দিকটির চর্চা হত প্রাচীন ভারতে, বর্তমানে আমরা সেটি হারিয়ে ফেলেছি।

এই ধরনের ছাত্রাবাসের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতিগুলি ছাত্রাবাসেই পূরণ করা সম্ভব। এবং সেই অভাব পূরণ করা হয়েছেও। সে কারণে এখান থেকে অনেক প্রতিভাবান ছাত্র পড়াশুনা শেষ করে জাতির জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শুধু এখানকার ছাত্রাবাসেই নয়, সর্বত্র, যেখানেই আমরা আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছি, সেখানেই এটি লক্ষ্য করা গেছে। এই সকল ছাত্রাবাসে ঐহিক বিষয়ের অবহেলা করা যে হয় নি, তার প্রমাণ ছাত্রদের অনেকেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করছে। কিন্তু এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় পরা বিদ্যার উপর। যতদিন না চরিত্রবান মানুষ গঠনের দায়িত্ব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই সকল চরিত্রবান মানুষই দেশের সকল সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হবে।

সুতরাং যাঁরা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সবাইকে অনুরোধ করছি এই আদর্শকে বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তির জন্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করুন। তিনি এই প্রতিষ্ঠান, এখানকার ছাত্র, কর্মী ও অন্যান্য যারাই এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ,—তাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। তাঁর কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা তিনি যেন উপরোক্ত সকলকে আশীর্বাদ করেন।

আমাদের এখন প্রয়োজন সেই প্রাচীনকালের 'গুরুগৃহবাস' ও তদনুরূপ প্রথাসকলের। চাই পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।·· কেহই কাহাকেও শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষক শিখাইতেছি মনে করিয়াই সব নষ্ট করে। বেদান্ত বলে এই মানুষের ভিতরেই সব আছে। একটি ছেলের ভিতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগাইয়া দিতে হইবে—এইমাত্র শিক্ষকের কাজ।···এখন চাই স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ান, চাই technical education (কারিগরি বিদ্যা), আর যাহাতে industry (শিল্প) বাড়ে, লোকে চাকরি না করিয়া যাহাতে কিছু উপার্জন করিতে পারে। —**স্বামী বিবেকানন্দ**

এসো প্রাণে

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

বসে আছি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে
চাহি ওই পশ্চিম গগনে,
সূর্যদেব রক্তরাগে সাজিয়া সুন্দর
অস্তাচলে হইতেছে লীন,
জীবনভাস্কর সারি পরিক্রমা
ডুবে যায় গভীর আঁধারে।
কোথা যায়, কেন যায়, কি আছে সেথায়-
রহস্যের অন্ধকারে আবৃত সকল।
চলে যায় নূতন জগতে।
গভীর আঁধার ধীরে গ্রাসে চারিধার
মনে ভাবি এই তো জীবন,—

এরি তরে কত হানাহানি,
হিংসা, দ্বেষ, বঞ্চনা কেবল!
বিধাতার এই কি বিধান?

ভগবান এসো প্রাণে—
সমস্যার কর সমাধান।
বৃথা কাজে কেটে গেল সারাটি জীবন।
বহু দুঃখ, বহু ক্লেশ, যন্ত্রণা অশেষ,
কর্মপথে দহিয়াছে—
সুশীতল সমীরণে কৃপা বিতরিয়া
জুড়াইয়া দাও মোর তাপিত জীবন।

সবাই রাজা

শ্রীমতী মানসী বরাট

খেয়ালী, তোর এ কি রকম
রাজা রাজা খেলা?
রাজা, সে তো একটা হবে,
এক রাজ্যে হয় বা কবে
হাজার রাজার মেলা?
সোনার মুকুট পরালি তুই
সবার শিরে শিরে,
এধার থেকে ওধার, ধীরে ধীরে।
অবাক চোখে সার হল মোর খোঁজা,
চতুঃসীমায় একটিও নাই প্রজা

নীড়ফেরা এক পাখি,
বললে মোরে ডাকি—
অবুঝ পরদেশী,
দিনের শেষাশেষি
নে বুঝে নে, প্রকৃতি-মার
এই রাজ্যমাঝে,
নাইকো প্রজা
সবাই রাজা
তাইতো সবার শিরে শিরে
সোনার কিরীট রাজে।

বাত

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

'ডাক্তারবাবু, হেঁট হতে গেলে শিরদাঁড়ায় ব্যথা লাগে। এটা কি বাত?' ডাক্তার কিছুটা ইতস্তত ক'রে বললেন, 'হাঁ, তাও হতে পারে।' তাঁর ইতস্তত করা এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কারণ সাধারণভাবে 'বাত' কথাটা আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি, কিন্তু ডাক্তারিশাস্ত্রে ঐরূপ ব্যাপক অর্থের কোন একটি বিশেষ রোগ তিনি পাননি।

লোকে যে কোন গাঁটের ব্যথাকে 'বাত' বলে অভিহিত করে, বিশেষতঃ যদি ব্যথাটা কিছুদিনের পুরান হয়, রোগীর বয়স খুব কম না হয় এবং অতীতে গাঁটে চোট লাগার কোন ইতিহাস না থাকে। মনস্তত্ত্বের দিক হতে, রোগী 'বাত' কথাটি শুনে, চিকিৎসায় সুফল-না-পাওয়া তাঁর রোগটির একটি নামকরণ বা ডায়াগনোসিস (diagnosis) পেয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পান, কারণ তিনি শুনেছেন 'বাত' রোগটি থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ সহজ না হ'লেও রোগটি মারাত্মক নয়।

ডাক্তারিশাস্ত্রের বিচারে, তথাকথিত 'বাত' নামধেয় রোগটির মধ্যে যে যে অসুখকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেগুলি হচ্ছে: রিউম্যাটিক জ্বর (Rheumatic fever), গাউট (Gout), রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস (Rheumatoid arthritis), অস্টিও-আরথ্রোসিস (Osteo-arthrosis) যেটিকে আগে বলত—অস্টিও-আরথ্রাইটিস (Osteo-arthritis), এ্যাঙ্কাইলোসিং স্পণ্ডিলাইটিস (Ankylosing Spondylitis) এবং আরও কয়েকটি। বর্তমান প্রবন্ধে এই শ্রেণীর বিশেষ কয়েকটি রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

(ক) রিউম্যাটিক জ্বর: এই রোগ শিশু ও কিশোরদের সাধারণতঃ হয়। হঠাৎ জ্বর হয়ে এক বা একাধিক গাঁট যন্ত্রণাদায়কভাবে ফুলে উঠে। বড় গাঁটগুলিই, যেমন হাঁটু, কনুই প্রভৃতি এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং অনেক সময় পর পর একটি করে গাঁট ফুলতে থাকে। প্রায়ই গাঁটের ভিতরে জল জমতে দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় এবং রোগীর বুক ধড়ফড় করে। গাঁটের ভিতরের যে পাতলা পরদা (Synovial membrane) আছে সেটিতে প্রদাহ হয়। এইরূপ প্রদাহ হতে পারে হৃৎপিণ্ডের ভিতরের পরদায় (endocardium), আবরণী পরদায় (pericardium) এবং মাংসপেশীতে (myocardium)। বেশীর ভাগ রোগী তিনচার সপ্তাহে আরোগ্যলাভ করে; তবে কারও কারও হৃৎপিণ্ডে স্থায়ী ক্ষতি-সাধন ক'রে 'মাইট্র্যাল স্টেনোসিস' (mitral stenosis—হৃৎপিণ্ডের দুটি প্রকোষ্ঠের মাইট্র্যাল নামক দ্বারটি কুঁচকে ছোট হয়ে যাওয়া) প্রভৃতি রোগের সূচনা করে। পৃথিবীর সব দেশেই যে সব হৃৎপিণ্ডের রোগী আছে, তাদের বেশ কিছু অংশ অতীতে রিউম্যাটিক জ্বরে ভুগেছে। আমেরিকায় প্রতি বৎসর একলক্ষ শিশুর ও সতেরো লক্ষ প্রাপ্তবয়স্কের রিউম্যাটিক হৃৎপিণ্ড রোগ (Rheumatic heart disease) হয় এবং তেরো হাজার রোগী এই রোগের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১] এই অসুখের ঠিক কারণ জানা নেই, তবে গলায় বাসাবাঁধা এক ধরনের জীবাণু—স্ট্রেপটো-কক্কাস বিটা-হিমোলিটিকাস (Streptococcus β-hæmolyticus)-এর সঙ্গে যে এই রোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। রোগের প্রারম্ভে অনেকের গলদেশে ব্যথা

---

১ World Health Organisation Chronicle, September 1980, p. 336.

হয়। পেনিসিলিন ওষুধ চালু হওয়ার পরে এই রোগের বিভীষিকা কিছুটা কমেছে।

এই রোগে জর ও গাঁটব্যথা ভাল হ'লেও যতদিন না হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনসংখ্যা সাধারণ হয়, ততদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

(খ) গাউট : এই অসুখে প্রথমে একটি গাঁট (অনেক সময় পায়ের বুড়োআঙুলের) পরে অন্য গাঁটগুলি ফুলে ব্যথা হয়। রোগটি খুব যন্ত্রণাদায়ক। মেয়েদের এবং চল্লিশ বছরের নীচে পুরুষদের মধ্যে এই অসুখ বিশেষ দেখা যায় না। অনেক সময় রোগটি পারিবারিক ধারা অনুসরণ করে। প্রোটিন (আমিষ)-জাত পিউরিন (Purine) অংশের হজমপ্রণালীর জন্মগত গলদ থাকার জন্য বয়সকালে এই অসুখ দেখা দেয়। এই অসুখে রক্তে ইউরিক এ্যাসিড (Uric acid) বৃদ্ধির ফলে এই এ্যাসিড গাঁটের মধ্যে ও চারপাশে (এবং বৃক্কে) জমে। এর ফলে গাঁটের সংলগ্ন হাড়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কয়েকদিন রোগভোগের পরে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার আক্রান্ত হয়; এইরূপ চলতে থাকে। বহুবার আক্রমণের ফলে আঙুলটিতে বিকৃতি (deformity) দেখা দেয়। মোটা রোগী ছাড়া অন্যদের খাদ্যের বাছবিচার ততটা আবশ্যক নয়, তবে যদি দেখা যায় যে, কয়েকপ্রকার খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে রোগসূচনার সম্বন্ধ আছে (যেমন মদ; অধিক পিউরিনযুক্ত খাদ্য :—মেদপ্রধান মাছ, মাছের ডিম, যকৃত, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি) তাহলে সেগুলি বর্জন করা উচিত।

(গ) রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস : আরথ্রাইটিস (arthritis) শব্দটির অর্থ গাঁটে প্রদাহ। এই অসুখটিতেও গাঁটে প্রদাহ হয়, তবে গাঁটের মধ্যে কোন রোগ-জীবাণু পাওয়া যায় না। কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রদাহ সৃষ্টি করার মূলে জীবাণু ছিল, তবে পরে তাদের পাওয়া যায় না আবার অন্যেরা মনে করেন যে, আক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগপ্রতিরোধক্ষমতা অস্বাভাবিক হওয়ায় এই রোগের সৃষ্টি হয়। মানসিক কারণেরও এই রোগের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে কারও কারও ধারণা।

এই রোগ ধীরে ধীরে আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাতের ও পায়ের আঙুলের গাঁটে রোগের প্রথম সূচনা হয়। পরে বড় গাঁটেও ছড়িয়ে পড়ে। অসুখের বৃদ্ধির সময় সামান্য জর, রক্তাল্পতা ও বুক ধড়ফড় করা দেখা দিতে পারে।

জীবাণুরা রোগের কারণ নয় বলে পেনিসিলিন বা অন্য কোন এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এই অসুখে কার্যকরী নয়। অন্য কোন নির্দিষ্ট কার্যকরী চিকিৎসাপদ্ধতি না থাকায় রোগীর কষ্টের লাঘব করা সম্ভব হ'লেও রোগ চলতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত অঙ্গে বৈকল্য দেখা দেয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন ওষুধের সাহায্যে রোগকে প্রতিহত করা সম্ভব।

(ঘ) অস্টিও-আরথ্রোসিস : এটি বেশী-বয়সের অসুখ। এটি প্রদাহজনিত অসুখ নয়। গাঁটের মধ্যে দুটি হাড়ের সংযোগস্থলে যে কার্টিলেজ (cartilage—প্লাস্টিকের মত নরম হাড়, যেমন কানে আছে) থাকে, সেটি নষ্ট হওয়ায় এবং সংলগ্ন দুটি হাড়ের মধ্যে ছোট ছোট হাড়ের টুকরা গজাবার ফলে এই অসুখের সৃষ্টি হয়। শিরদাঁড়ায়, কোমরে ও হাঁটুতে সাধারণতঃ এই রোগ হয়। এ অসুখ বড় একটা ভাল হয় না, তবে সু-চিকিৎসায়, বিশেষতঃ শুরুতে চিকিৎসা করালে অসুখের বৃদ্ধি প্রতিহত করা যায় এবং কষ্টের লাঘব করা যায়। হাঁটু ও শিরদাঁড়ায় এই রোগ হ'লে শরীরের ওজন কমান দরকার এবং ভারী জিনিস তোলা উচিত নয়।

(ঙ) এ্যাঙ্কাইলোসিং স্পণ্ডিলাইটিস : শিরদাঁড়ার হাড়গুলির সংযোগস্থলে প্রদাহের ফলে

এই অসুখ হয়। রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস-এর মতই এর আরম্ভ, কিন্তু পরে দুটি সংলগ্ন হাড় জুড়ে যাওয়ার ফলে শিরদাঁড়ার সেই অংশ আর নাড়া-চাড়া করা যায় না। যুবকবয়সে বার বার শিরদাঁড়ায় ব্যথা হলে এই অসুখ সন্দেহ করা উচিত। অসুখের সূচনার আর একটি লক্ষণ—সকালে ঘুম হতে উঠবার সময় পিঠে ব্যথা ও আড়ষ্টভাব।

অসুখের গোড়ার দিকে চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়, তবে দেরীতে চিকিৎসা আরম্ভ করলে মাত্র কাজ-চলা-গোছের নাড়ান-চাড়ান সম্ভব।

(চ) সার্ভাইকেল স্পণ্ডিলোসিস (Cervical Spondylosis): এই অসুখে ঘাড়ে হঠাৎ অথবা ধীরে ধীরে ব্যথা হয় এবং হাতে অসাড়ভাবও আসতে পারে। ঘাড়ে শিরদাঁড়ার হাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে যে কার্টিলেজ আছে, তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা হিসাবে অনেক সময় কার্টিলেজের উপর চাপ কমাবার উদ্দেশ্যে ঘাড়কে টেনে সোজা রাখবার জন্য গলার চারধারে একটি বেষ্টনী (collar) পরতে হয়।

(ছ) লাম্বাগো-সায়াটিকা সিণ্ড্রোম (Lumbago-Sciatica syndrome): 'লাম্বাগো' অর্থে শিরদাঁড়ার নীচের দিকে (Lumbar region) ব্যথা। 'সায়াটিকা' অর্থে সায়াটিকা স্নায়ুর গতিপথে (কোমর হতে পায়ের ডিম হয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত) ব্যথা। এ দুটি অসুখের প্রধান কারণ, শিরদাঁড়ার হাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে যে কার্টিলেজ আছে তা নষ্ট হয়ে তার সীমানা হতে বেরিয়ে এসে নির্গমনরত স্নায়ুগুলির উপর চাপ দেওয়া। তার ফলে সেই সেই স্নায়ু শরীরের যে যে স্থানে কাজ করে (এমন কি পায়ের আঙুল পর্যন্ত) সেখানে ব্যথা হয়।

(জ) সিস্টেমিক লিউপাস ইরিথেমা-মেটোসাস (Systemic Lupus Erythromatosus) এই রোগ কুড়ি হতে চল্লিশ বৎসরের মেয়েদের বেশী হয়। এতে জ্বরের সঙ্গে একটির পর একটি গাঁটে ব্যথা হয়। তা ছাড়া এই অসুখে বুকে, হৃৎপিণ্ডে এবং প্লীহা প্রভৃতিতেও রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এতে জ্বর হয়, প্লীহা বড় হয় এবং কখনও কখনও হৃৎপিণ্ডের বা ফুসফুসের আবরণীর মধ্যে জল জমে।

চিকিৎসার ফল তেমন সন্তোষজনক নয়।

উপরি-উক্ত রোগগুলি ছাড়াও, গাঁটের চারধারে সংযোজক জীবকোষে (Connective tissue) প্রদাহের ফলে কয়েকটি গাঁটে ব্যথার সৃষ্টি হয়। গাঁটে যক্ষ্মা (Tuberculosis), প্রমেহ (Gonorrhoea) বা ভাইরাস (virus) আক্রমণের ফলেও ব্যথা হতে পারে। কখনও কখনও লুকিয়ে-থাকা হাড়ের টিউমার গাঁট-ব্যথা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'ফ্রোজেন শোল্ডার' (Frozen Shoulder বা জমাট স্কন্ধ) অসুখের কারণ হচ্ছে গাঁটের মধ্যে থাকা পরদায় প্রদাহ (Synovitis), গাঁটের চারধারের আবরণী পরদা (Capsule) ছিঁড়ে যাওয়া, কিংবা গাঁটের সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীতে কোন ধরনের অসুখ হওয়া। তা ছাড়া আছে নিউরোপ্যাথি (neuropathy), অর্থাৎ, অন্য কারণে স্নায়ুর অসুখ হয়ে ব্যথার সৃষ্টি। এই শ্রেণীতে পড়বে বহুমূত্রজনিত ও কুষ্ঠজনিত নিউরোপ্যাথি।

এই সব আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, রোগী তার গাঁটে বা শরীরাংশে ব্যথা জানালেই ডাক্তারের পক্ষে রোগনির্ণয় সহজ নয়। তা ছাড়া, বাতরোগের মধ্যে যে সব অসুখকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের অনেকগুলির সঠিক কারণ জানা নেই, কারণ-নির্ণয় করাও কঠিন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসা সন্তোষজনক নয়। এর ফলে 'বাত' নামটি রোগীর মনে মৃত্যুর বিভীষিকা না আনলেও কিছুটা হতাশার সৃষ্টি করে।

সে যাই হোক, এখন বোঝা যাচ্ছে যে, প্রবন্ধের শুরুতে ডাক্তারকে উত্তর দিতে যে ইতস্তত করতে দেখা গিয়েছিল তা অস্বাভাবিক বা অকারণে নয়।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মের সপ্তম প্রধানগুণ : সৌন্দর্য

বলদেবের মতে ব্রহ্মের সপ্তবিধ প্রধান গুণের শেষ হ'ল : 'সৌন্দর্য'। সেই সঙ্গে এটি হ'ল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, যাকে অনায়াসে বলা যায়, তাঁর 'স্বরূপস্য স্বরূপম্', 'স্বরূপের স্বরূপ'।

এই প্রসঙ্গে, একটি প্রয়োজনীয় কথা পূর্বে ব'লে নিলে নিশ্চয় সুবিধা হবে। সে সম্বন্ধে পূর্ব এক সংখ্যায় অবশ্য বলা হয়েছে (শ্রাবণ ১৩৮৭, পৃঃ ৩৪৭-৪৮)। তাহলেও, তার পুনরুল্লেখ বিশেষভাবে আবশ্যক এই কারণে যে, এই সপ্তবিধ প্রধান গুণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা-প্রপঞ্চনা করা হয়েছে এস্থলে এবং প্রত্যেকটিকেই নানাদিক থেকে ব্রহ্মের অতি নিজস্ব, অতি বিশেষ, অতি অনুপম স্বরূপের সুষ্ঠু, সুন্দর পরিপূর্ণ দ্যোতক ব'লেই গ্রহণ করা হয়েছে নিঃসংশয়ে। সেজন্য এস্থলে বৈষ্ণব মতবাদের এই তত্ত্বটিকে স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, এতে বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বন্দিত করা হয়েছে—যথা, আনন্দ, প্রেম, রস, মাধুর্য, লীলাময়ত্ব, ভক্তবাৎসল্য, করুণা প্রভৃতি। অথচ সেজন্য বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ স্ববিরোধদোষদুষ্ট ব'লে নিন্দিত হননি কোনোদিনও। বরং তাঁদের এই আচরণ প্রকৃত ভক্তজনোচিত মনোরম আচরণরূপেই সর্বত্র অভিনন্দিত হয়েছে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-মতে প্রকৃত-প্রকৃষ্ট ভক্ত ও প্রকৃত-প্রকৃষ্ট জ্ঞানীর মধ্যে এইটিই ত হ'ল প্রধানতম প্রশংসনীয় প্রভেদ। কারণ, জ্ঞানী তাঁর জ্ঞানের একেবারে স্থির-ধীর, অনড়-অটল, অপরিবর্তনীয়-অলঙ্ঘনীয় গরিমায় কেবল একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হন বহু চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিবেচনার বাধা অতিক্রম ক'রে। এই কারণে, সেই সিদ্ধান্ত থেকে এক কণামাত্রও সরে আসবার জ্ঞানীর উপায়ই নেই কোনোক্রমেই। কিন্তু ভক্ত? ভক্ত এরূপ 'বাঁধাধরা' নিয়মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে সম্মতও নন, সমর্থও নন। তাঁর প্রীতি, তাঁর ভক্তি, জ্ঞানের ন্যায় একমুখী নয়—সর্বমুখী—যেদিক থেকেই হোক না কেন, তা তাঁর প্রাণপ্রতিম জনকে স্পর্শ করবেই; এবং এইভাবে ভক্তের ভগবান ভক্তের নিকট বহুরূপধারী; জ্ঞানীর ব্রহ্মের ন্যায় একরূপধারী নন। সেজন্য ভক্তের নিকট ব্রহ্মের 'সর্বশ্রেষ্ঠ' গুণ একটিমাত্রই নয়—যা 'সর্বশ্রেষ্ঠ' শব্দটির মুখ্য অর্থ, বরং বহু—যে অর্থেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ' কথাটিকে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন। সুতরাং কঠোর নৈয়ায়িকের ভ্রূকুঞ্চন উপেক্ষা ক'রে বৈষ্ণব ভক্ত নির্দ্বিধায় কখনো 'আনন্দ'কে কখনো বা 'প্রেম'কে ইত্যাদিরূপে শ্রীভগবানের বহু গুণকেই তাঁর 'সর্বশ্রেষ্ঠ' গুণ ব'লে ভালবেসে ও শ্রদ্ধা ক'রে পরমানন্দ লাভ করেন। —তাতে কঠোর নৈয়ায়িকের আপত্তি যতই থাকুক না কেন, অন্যান্য সকলেই, যা উপরেই বলা হ'ল, ভক্তের ভক্তি-প্রীতির প্রাবল্যে ও প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত হন।

সুতরাং, অন্যত্র যাই বলা হয়ে থাকুক না কেন, এক্ষেত্রে—এই সপ্তবিধ প্রধান ব্রহ্মগুণের ক্ষেত্রে—'সৌন্দর্য'কে ব্রহ্মের আনন্দ, প্রেম, রস, লীলা, করুণাদির ন্যায় 'সর্বশ্রেষ্ঠ' গুণ ব'লে নির্দিষ্ট ক'রে

ভক্তশ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবপ্রবর বলদেব এই প্রসঙ্গ শেষ করছেন সানন্দে সগৌরবে সশ্রদ্ধায়।

সত্যই, সামান্যমাত্রও চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যাবে যে, 'সৌন্দর্য' ব্রহ্মের 'সর্বশ্রেষ্ঠ' গুণ হতে অনায়াসে পারে। 'সৌন্দর্য' কি? প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সৌন্দর্যশাস্ত্রে (Aesthetics) এ-সম্বন্ধে প্রচুর মতবাদ ও মতভেদ আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে, সব ছাপিয়ে, 'সৌন্দর্য' হ'ল যা মনপ্রাণকে ভ'রে তোলে, তৃপ্ত করে—দরদী কবির মরমী ভাষাতে—

'আমি কেমন করিয়া জানাব
আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব
আমার পরান কী নিধি কুড়ালো—
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে॥

আজ যেখানে যা হেরি সকলেরই মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো॥'

(রবীন্দ্রনাথ—ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৫।৮, স্বরবিতান ২৪)

এই 'জুড়ালো' কথাটিই হ'ল 'সৌন্দর্যে'র লক্ষণ—যাতে আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-আত্মা জুড়িয়ে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ হচ্ছে, শান্ত হচ্ছে, শীতল হচ্ছে, তৃপ্ত হচ্ছে, পূর্ণ হচ্ছে, তা-ই ত 'সৌন্দর্য'— এবং বলাই বাহুল্য, আমাদের প্রাণের ঠাকুর, আমাদের প্রিয়তম জন এর চেয়ে শতসহস্রলক্ষ-কোটিগুণ অধিকভাবে আমাদের সর্বজীবন জুড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁর সৌন্দর্য দিয়ে, মাধুর্য দিয়ে, কোমলতা দিয়ে, সরসতা দিয়ে, করুণা দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, সর্বোপরি আমাদের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ দিয়ে। এই কারণেই ভক্তশ্রেষ্ঠ, প্রেমিকপ্রবর বলদেব অনেক বলার পরে এই 'সৌন্দর্যে'র তীরে এসে তাঁর জীবন-তরণী বেঁধেছেন নিঃশব্দ পরিপূর্ণতায়।

এক্ষেত্রে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সুবিশাল বেদোপনিষদ্-সাহিত্যে ব্রহ্মের 'সৌন্দর্যে'র কথা একবারও উল্লিখিত হয়নি, একবারও পরমতত্ত্বকে আমরা ডাকিনি 'পরমসুন্দর' ব'লে।

সে যাহোক, ভক্ত হ'লেও, ভক্তির উত্তাল প্লাবনে জ্ঞানকে চিরতরে ভাসিয়ে দেবার চির-বিরোধী বলদেব, তাঁর প্রবলা ভক্তির সঙ্গে প্রখরা যুক্তিকে মিশিয়ে নিয়ে 'সৌন্দর্যে'র একটি যথাসাধ্য ন্যায়ানুমোদিত সংজ্ঞা দেবার প্রচেষ্টা করেছেন এইভাবে: 'সৌন্দর্য' ব্রহ্মের 'স্বরূপের স্বরূপ'রূপে তাঁর সকল গুণের একটি সুশোভন সমাহার হ'লেও, বিশেষ ক'রে, নিম্নলিখিত সপ্ত মহাগুণের একটি অভিনব অপরূপ অত্যাশ্চর্য সমন্বয়— (১) মাধুর্য (২) ঐশ্বর্য (৩) শৌর্য (৪) বীর্য (৫) সৌকর্য (৬) সৌকুমার্য (৭) গাম্ভীর্য।

এই অদ্ভুত তালিকা দেখেই কিন্তু আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী বলদেব কি সত্যই আমাদের অনেক উঠিয়ে নামিয়ে শেষকালে একটি 'অচিন্ত্য' অবস্থার মধ্যে এনে ফেললেন? কারণ, এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, আরম্ভ করা হ'ল বেশ সুন্দরভাবে—কোমল-শীতল 'মাধুর্য' দিয়ে। কিন্তু তারপরে হঠাৎ এ কি ব্যাপার—'সৌন্দর্যে'র মধ্যে এসে পড়েছে 'ঐশ্বর্য', 'শৌর্য', 'বীর্য', 'সৌকর্য', 'গাম্ভীর্য'! কিরকম এই 'সৌন্দর্য' যার মধ্যে সদর্পে বিরাজ করছে এইসব গুরুগম্ভীর কঠিন-কঠোর ভাবসমূহ! এক্ষেত্রে, একমাত্র সান্ত্বনাস্থল 'সৌকুমার্য', 'মাধুর্যে'র পরেই।—সেই 'মাধুর্য' নিয়েই আরম্ভ করা যাক।

মাধুর্য

'মধু' বা 'মধুর' শব্দ থেকেই আমরা পেয়েছি আমাদের পরমাদরের এই 'মাধুর্য' শব্দটিকে। 'মধু' বা 'মধুর' হ'ল 'রস' এবং 'রস' হ'ল 'আস্বাদন-চমৎকারিত্ব', বৈষ্ণব মতানুসারে। বস্তুতঃ, বৈষ্ণব

দর্শনে, 'মধু', 'সুধা', 'রস', 'আনন্দ', 'অমৃত', 'প্রেম' প্রভৃতিকে সমার্থক ব'লে ধরা হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। সেজন্য সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, 'মাধুর্য' হবে সর্বজীবনব্যাপী—জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব-ভাবনার কথা না তুলে সাধারণ-ভাবে গৃহীত জীবনের যে তিনটি দিক আছে, তাদের কথাই ধরা যাক—অর্থাৎ, জ্ঞান-অনুভূতি-প্রবৃত্তির (Thinking-Feeling-Willing-এর) দিক।

প্রথমতঃ, জ্ঞানের 'মাধুর্য' কি? হঠাৎ শুনলে মনে হয়—এ যেন এক স্ববিরুদ্ধ কথা শুনছি—কঠিন-কঠোর, দীপ্ত-দৃপ্ত, ভাবাবেগহীন, ন্যায়ের কণ্টকাকীর্ণ পথগামী, দর্শনের অনন্ত-অসীম কঙ্করাচ্ছন্ন প্রস্তর-প্রান্তরানুসারী জ্ঞানের মধ্যে 'মাধুর্যে'র কণামাত্রও প্রবেশাধিকার কিরূপে হতে পারে?

কিন্তু পণ্ডিতেরা বলবেন অন্য কথা—বলবেন, জ্ঞানের মদিরা কি ভক্তিপ্রীতির মদিরার অপেক্ষা অল্প উন্মাদনাময়ী, অল্প প্রাণ-মন-আত্মাকে জুড়াবার শক্তিধারী, অল্প আনন্দদায়ক, শান্তিদায়ক, পূর্তি-দায়ক? নিশ্চয়ই না। বরং বেশী। এর তৃপ্তির, এর শান্তির, এর পূর্তির তুলনা কোথায়? কারণ অজ্ঞান-অবিদ্যাই ত সর্ববাদিসম্মতিক্রমে আমাদের ভীষণতম, দুর্ধর্ষতম, দুষ্টতম শত্রু—তাকে পরাজিত না করতে পারলে, আর রইল কি আমাদের জীবনে? 'জ্ঞান' না হ'লে, কোথায় রইল 'ভক্তি', কোথায় রইল 'নিষ্কাম কর্ম'? আর যখন জ্ঞান হ'ল--কি মধুর সেই অবস্থা—আত্মাকে জানছি, বিশ্বকে জানছি, ব্রহ্মকে জানছি। কেবল জানছি নয়, ব্রহ্মকে দেখছি সর্বত্র সর্বদা—কোনো ভেদ নেই, কোনো ভয় নেই। বারংবার শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্‌-সমূহ 'মধুবিদ্যা'র মাধ্যমে প্রকাশ করছেন এই মধুবাণী—বিদ্যা মধু, জ্ঞান মধু, আত্মোপলব্ধি মধু, ব্রহ্মোপলব্ধি মধু—পৃথিবীর সব কিছু মধু, কেবল আবেগোচ্ছ্বাসবাহিত ভক্তের কাছেই নয়—স্থির-ধীর, শান্তসমাহিত জ্ঞানীর কাছেও সমভাবে। ভক্তশ্রেষ্ঠ হ'লেও বলদেব জ্ঞানের এই মাধুর্যের কথা বিস্মৃত হননি মুহূর্তের জন্যও; এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, জ্ঞানের দৃষ্টিতে সমগ্র জগৎকে দেখে তিনিও আমাদের আধুনিক মধু-কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে দ্বিধা করবেন না যে—

'তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন—
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন ॥
তরুণ অরুণ নবীনভাতি,
পূর্ণিমাপ্রসন্ন রাতি,
রূপরাশি-বিকশিত-তনু-কুসুমবন ॥'

(রবীন্দ্রনাথ—ব্রহ্মসঙ্গীত
স্বরলিপি ২, স্বরবিতান ২২)

[ক্রমশঃ]

বেদান্তপ্রচারে 'রামচরিতমানস'

স্বামী পুরাণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সৎসঙ্গ লাভ করিয়া আমরা সাধারণ মানুষেরা যাহাতে আমাদের দুঃখপূর্ণ সুদীর্ঘ বদ্ধাবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি—সাধুসঙ্গের ফলে মোহাতীত হইয়া আমরা যাহাতে আমাদের মানব-শরীর ধারণ সার্থক করিয়া তুলিতে পারি তজ্জন্য আমাদের চির-দরদী, আমাদের প্রতি সদা অনুকম্পাপরায়ণ শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

সাধুর লক্ষণ বর্ণনপ্রসঙ্গে ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন :

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥
(১১।২৬।২৭)

—সাধুগণ অনপেক্ষ হন অর্থাৎ, স্বপ্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির অপেক্ষা করেন না, অথবা, তাঁহাদের সন্তোষ কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নহে ; আমাতেই তাঁহাদের চিত্ত নিবেদিত, তাঁহারা প্রশান্ত ও সমদর্শী, কোন কিছুতেই তাঁহাদের 'ইহা আমার' এইরূপ বোধ নাই। তাঁহারা অহংকারশূন্য, সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বাতীত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুগ্রহণে সদা পরাঙ্মুখ।

'রামচরিতমানস' গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-মুখে তুলসীদাস সাধুবন্দনা করিয়াছেন :

বন্দউঁ সন্ত সমানচিত হিত অনহিত
নহিঁ কোউ।
অঞ্জলি গত সুভ সুমন জিমি সম সুগন্ধ
কর দোউ॥
(বাঃ কাঃ ৮, ৯)

—শত্রুমিত্র-ভেদবোধরহিত, সমচিত্ত সাধুদিগকে বন্দনা করি। অঞ্জলিগত সুগন্ধিপুষ্প যেমন দক্ষিণ ও বাম—উভয় হস্তকেই আপনার সৌরভদানে আপ্যায়িত করে, আপন ও পর ভেদরহিত সাধুগণও সেইরূপ সকলের সেবায় নিরত থাকেন।

তুলসীদাস শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বগুলিকে কাব্যরসসিক্ত করিয়া পরিবেশন করায় পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়, যুগপৎ সত্যের স্নিগ্ধ বিমল দ্যুতিতে উদ্ভাসিত ও কাব্যের মাধুর্যরসে আপ্লুত হইয়াছে।

গোদাবরীর তটে মনোরম পঞ্চবটীর পর্ণকুটির হইতে সীতা অপহৃতা হইয়াছেন। বিরহ-ব্যাকুল শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে বন হইতে বনান্তরে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ সাধু-হৃদয়তুল্য নির্মল-জল-সমৃদ্ধ পম্পা সরোবরের তীরে পৌঁছিলেন। (সন্তহৃদয় জস নির্মল বারী। অরঃ কাঃ ৫০-৫১) এমন সময় দেবর্ষি নারদ বীণাহস্তে রামগুণগানকীর্তন করিতে করিতে তথায় আসিয়া ভক্তিভরে শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

সন্তন্হ কে লচ্ছন রঘুবীরা।
কহহু নাথ ভঞ্জন ভবভীরা॥
সুনু মুনি সন্তন্হ কেগুন কহউঁ।
জিন্হ তেঁ মৈঁ উন্হ কে বস রহউঁ॥
(অরঃ কাঃ, ৫৮)

—হে নাথ, হে ভবদুঃখহারী, কৃপা করিয়া আমাকে সাধুর লক্ষণ বলুন। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—যে সকল গুণের জন্য আমি সাধুদের প্রতি সর্বদা প্রসন্ন থাকি, তাহা বলিতেছি, শোন :

ষটু বিকার জিত অনঘ অকামা।
অচল অকিঞ্চন সুচি সুখধামা॥
অমিত বোধ অনীহ মিতভোগী।
সত্যসন্ধ কবি কোবিদ জোগী॥*
সাবধান মানদ মদহীনা।
ধীর ভগতিপথ পরম প্রবীনা॥
(ঐ, ৫৮)

—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ছয়প্রকার বিকারজয়ী (এখানে নিরুক্তকার যাস্ক-কথিত ষড়বিকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় ও নাশ তুলসীদাসের বিবক্ষিত নয়) সাধুগণ নিষ্পাপ, কামনাশূন্য, স্থিরচিত্ত, ধনহীন, পবিত্র, আনন্দময়, জ্ঞানী, ইচ্ছারহিত, মিতাহারী, সত্য-প্রতিষ্ঠ, দ্রষ্টা, পণ্ডিত, যোগী, সতর্ক, মানদানকারী, অহংকারশূন্য, ধীর এবং ভক্তিপথে প্রবীণ।

গুনাগার সংসার দুখ রহিত বিগতসন্দেহ।
তজি মম চরণসরোজ প্রিয় জিন্ হ কহুঁ
দেহ ন গেহ॥
(ঐ, ৫৮)

* 'য'-এর পরিবর্তে তুলসীদাস অনেক ক্ষেত্রে 'জ' ব্যবহার করিয়াছেন।

—নানা গুণের আলয়, সংশয়রহিত সাধুগণ সাংসারিক দুঃখস্পর্শশূন্য। আমার শ্রীপাদপদ্ম ছাড়া তাঁহাদের নিকট কি দেহ কি গৃহ—কিছুই প্রিয় নহে।

নিজ গুন শ্রবন সুনত সকুচাহীঁ।
পরগুন সুনত অধিক হরষাহীঁ॥
সম সীতল নহিঁ ত্যাগহিঁ নীতী।
সরল সুভাব সবহিঁ সন প্রীতী॥
(ঐ, ৫৯)

—নিজগুণের প্রশংসা শুনিলে সাধুগণ সঙ্কুচিত হন, কিন্তু অপরের প্রশংসায় হর্ষানুভব করেন। তাঁহারা সমবুদ্ধি, শান্ত এবং কখনও নীতি লঙ্ঘন করেন না। তাঁহারা সরল ও সকলের প্রতি প্রেমসম্পন্ন।

বিরতি বিবেক বিনয় বিজ্ঞানা।
বোধ জথারথ বেদপুরানা॥
দম্ভ মান মদ করহিঁ ন কাউ।
ভূলি ন দেহিঁ কুমারগ পাউ॥
(ঐ, ৫৯-৬০)

—সাধুগণ বেদ ও পুরাণের মর্মার্থদর্শী এবং বৈরাগ্য, বিবেক, বিনয় ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হন। দম্ভ ও অভিমানশূন্য, তাঁহারা ভুলিয়াও কুমার্গে প্রবৃত্ত হন না।

অনন্তর সাধুর লক্ষণ বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র নারদকে উপসংহারে বলিলেন :

গাবহিঁ সুনহিঁ সদা মমলীলা।
হেতুরহিত পরহিত রত সীলা॥
সুনু মুনি সাধনু কে গুন জেতে।
কহি ন সকহিঁ সারদ শ্রুতি তেতে॥
(ঐ, ৫৯।৬০)

—তাঁহারা সর্বদা আমার লীলা কীর্তন ও শ্রবণ করেন এবং নিঃস্বার্থ পরহিতে ব্যাপৃত থাকেন। হে নারদ, স্বয়ং সরস্বতী বা বেদও সাধুগণের গুণাবলী বলিয়া শেষ করিতে পারেন না।

* * *

উত্তরকাণ্ডে আবার দেখি শ্রীরামচন্দ্র সাধুর লক্ষণ বর্ণনা করিবার জন্য ভরত কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

অবতীর্ণ হইবার মুখ্য প্রয়োজন, রাবণবধ সমাপনান্তে শ্রীরামচন্দ্র দীর্ঘ ১৪ বৎসর পর অযোধ্যায় ফিরিলে সাড়ম্বরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইল এবং সকলে রামরাজ্যে মহাসুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় একদিন ভক্তোত্তম ভরত রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

সন্ত অসন্ত ভেদ বিলগাঈ।
প্রনতপাল মোহি কহহু বুঝাঈ॥

—হে প্রণতপালক, দয়া করিয়া আপনি সাধু ও অসাধুর ভেদ আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন :

সন্তন্হ কে লচ্ছন সুনু ভ্রাতা।
অগিনিত শ্রুতি পুরান বিখ্যাতা॥
(উঃ কাঃ ৬০)

—বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্রে সাধুর অগণিত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, আমি বলিতেছি, শোন ভাই :

সন্ত অসন্তন্হ কৈ অসি করনী।
জিমি কুঠার চন্দন আচরনী॥
কাটই পরসু মলয় সুনু ভাঈ।
নিজ গুন দেই সুগন্ধি বসাঈ॥
(ঐ, ৬০)

—সাধু ও অসাধুর পরস্পর সম্পর্ক চন্দন ও কুঠারের মত। (অসাধুস্থানীয়) কুঠার, (সাধুস্থানীয়) চন্দনগাছ কাটিলেও, চন্দনগাছ কুঠারকে প্রতিদানে সুগন্ধই দেয়।

বিষয় অলম্পট সীল গুনাকর।
পরদুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর॥
সম অভূতরিপু বিমদ বিরাগী।
লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাগী॥
(ঐ, ৬১)

—শীল ও গুণের আকরস্বরূপ সাধুগণ বিষয়ভোগে

সদা অলিপ্ত, পরদুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী, সমচিত্ত, কাহাকেও তাঁহারা শত্রু মনে করেন না। তাঁহারা নিরহংকার, বৈরাগ্যবান এবং লোভ, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয়হীন।

কোমলচিত দীনন্হ পর দায়া।
মন বচ ক্রম মম ভগতি অমায়া॥
সবহিঁ মানপ্রদ আপু অমানী।
ভরত প্রানসম মম তেঁ প্রানী॥
(ঐ, ৬১)

—কোমলচিত্ত সাধুগণ দীনের প্রতি সতত দয়াদ্র্ চিত্ত। অকপটে ও কায়মনোবাক্যে তাঁহারা আমাকে ভক্তি করেন। স্বয়ং সংকৃত হইবার অভিলাষশূন্য সাধুগণ অপর সকলকে সম্মান করিতে তৎপর থাকেন। হে ভরত, তাই তাঁহারা আমার প্রাণতুল্য প্রিয়।

বিগতকাম মম নাম পরায়ন।
সান্তি বিরতি বিনতী মুদিতায়ন॥
সীতলতা সরলতা মইত্রী।
দ্বিজ পদ প্রীতি ধরমজনয়িত্রী॥
(ঐ, ৬১

—সাধুগণ নিষ্কাম এবং সর্বদা আমার মঙ্গলময় নামস্মরণে কালাতিপাত করেন। শান্তি, বৈরাগ্য, বিনয়, প্রসন্নতা, স্নিগ্ধতা, সরলতা ও প্রেমরসে তাঁহাদের হৃদয় নিরন্তর আপ্লুত থাকে। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, যাহা ধর্মজনক।

যে সব লচ্ছন বসহিঁ জাসু উর।
জানহু তাত সন্ত সন্তত ফুর॥
সম দম নিয়ম নীতি নহিঁ ডোলহিঁ।
পরুষ বচন কবহুঁ নহিঁ বোলহিঁ॥
(ঐ, ৬১)

—হে অনুজ, এই সকল লক্ষণ যাঁহাদের মধ্যে আছে, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সাধু বলিয়া জানিবে। অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহবান সাধুগণ সংযম ও নীতি লঙ্ঘন করেন না এবং কখনও কাহাকেও কঠোর বাক্য বলেন না।

নিন্দা অস্তুতি উভয় সম মমতা মম পদকঞ্জ।
তে সজ্জন মম প্রানপ্রিয় গুনমন্দির সুখপুঞ্জ॥
(ঐ, ৬১)

—আমার পাদপদ্মে প্রীতিযুক্ত, নানা সদ্‌গুণ-সম্পন্ন, সদানন্দময় সাধুগণ নিন্দাস্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি করেন। তাঁহারা আমার প্রাণতুল্য প্রিয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোক হইতে ২০শ শ্লোক পর্যন্ত তাঁহার প্রিয় ভক্তের যে লক্ষণাবলী নির্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীরামমুখে তুলসীদাস সাধুর যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন—এই উভয়ের ভাবগত ও বহুলাংশে শব্দগত সাদৃশ্য দর্শনে ইহাই মনে হয় যে, তুলসীদাস তাঁহার জীবন-সর্বস্ব শ্রীরামচন্দ্রের প্রেরণায় বহুজন-হিতায়, বহুজনসুখায় বেদান্তপ্রচারে উল্লেখযোগ্য ও সন্তোষজনক সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[ ]

৬

সারদার পথে-পাওয়া কালো বোনটি

প্রবল জ্বরে বেহুঁশ হয়ে সারদা পড়ে আছেন রোগশয্যায়, চটিতে। পিতা চিন্তিত। তবে রামচন্দ্র ছাড়া এ বিশ্বের আর একজন তাঁর কন্যার অতিরুগ্নাবস্থার খোঁজ রেখেছিলেন। তিনি এসে হাজির হলেন। তিনি হচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের ঐ রহস্যময়ী কালো মেয়েটি। আমরা সারদার মুখ

থেকেই ভদ্রকালীর এই অবিশ্বাস্য ভদ্রতার কাহিনীটি শুনি :

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জা-সরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম পার্শ্বে একজন রমণী বসিল—মেয়েটির রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই!—বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আসচ গা?' রমণী বলিল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি।' শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়াতে আমার ভাগ্যে ঐসব আর হল না।' রমণী বলিল, 'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।' আমি বলিলাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটি বললে, 'আমি তোমার বোন হই।' আমি বলিলাম, 'বটে? তাই তুমি এসেছ!' ঐরূপ কথাবার্তার পর ঘুমাইয়া পড়িলাম।"[১২]

এটি সারদার স্বপ্ন-কথা নয়। জাগ্রত অবস্থায় শ্যমানা কালো মেয়েটির সঙ্গে অতি রম্য কান্ত রোয়া সংলাপের বর্ণনা। এ মন্তব্যের প্রমাণ-ভিত্তি সারদার উক্তিতেই রয়েছে : "ঐরূপ কথা-র্তার পর ঘুমাইয়া পড়িলাম।" নিদ্রার অনাবেশে তা আর স্বপ্ন দেখা যায় না!

আমরা অনেকে এই খেয়ালী কালো মেয়েটির কথায় বিশেষ আমল দিতে অভ্যস্ত নই। ভাবি : ওঁর কাণ্ডকারখানা বা কথাবার্তা কে বুঝবে? রহস্যময়ী বেশী কাছে না এসে একটু দূরে সরে থাকলেই বাঁচি। আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে না জড়িয়ে গেলেই রক্ষে!

আমাদের বিপরীত-বুদ্ধির চাতুর্য এমনি যে সহজ সরল কথা বিশ্বাস করা আমরা মস্তিষ্কের দুর্বলতা মনে করি। রহস্যময়ী কিন্তু কয়েকটি সাদা-সিধে কথাই বলে গেলেন—কোন প্যাঁচ নেই তাতে। তাই ঐ কথাগুলি আমাদের অবোধ্য!

কিন্তু একটি কথা গভীরভাবে ভাবতে হবে। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের জীবিত-প্রকাশের মর্মমূলে কালীর সুগহন অবস্থিতি-ব্যাপ্তি সম্বন্ধে একেবারে অনবহিত থেকে তাঁদের দিব্য জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারণ করা অসম্ভব।

কোন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এ রহস্য কিঞ্চিৎ অনাবৃত করেছিলেন। "শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সর্বদা কালীর অবতার মনে করি। ভবিষ্যতের মানুষ তাঁকে কি তাই বলবে না?" নিবেদিতার এই প্রশ্নের জবাবে স্বামীজী বলেছিলেন :

"হাঁ, এ বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ যে, কালী শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ভর করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। মার্গট দেখ, আমি বিশ্বাস না করে পারি না, কোথাও একটি মহাশক্তি আছে যা নিজেকে নারীপ্রকৃতি বলে অনুভব করে—কালী বা 'মা' নামে নিজেকে আখ্যাত করে।—আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী—ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই—বুঝতেই পারছ সর্বদা এমনিই হয়। শরীরের অগণ্য কোষসমষ্টিতেই ব্যক্তির আকার—বহু মস্তিষ্ককেন্দ্র তৈরী করে অখণ্ড

১২ তদেব, পৃঃ ৩৫৭-৫৮

চৈতন্য—"[১৩]

এ প্রসঙ্গের সূচনাতে নিজের আন্তর জীবনের কালীরহস্যের আভাস মাত্র দিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন :

"ওঃ! কালীকে ও কালী-ব্যাপারকে কী ঘৃণাই না করতাম! ৬ বছর ধরে সেই লড়াই—কেন না কালীকে কিছুতে মানব না।

"নিবেদিতা—কিন্তু এখন আপনি তাঁকে বিশেষভাবে মেনে নিয়েছেন, তাই না স্বামীজী?

"স্বামীজী—মানতে বাধ্য হয়েছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে আমাকে উৎসর্গ করে দিলেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজেও তিনি (মা) আমাকে চালিত করেন—আমার এই বিশ্বাসের কথা তুমি জানো। তিনি আমাকে নিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করান।...

"নিবেদিতা—কেন মেনে নিতে হল, তাকি বলবেন না স্বামীজী—কিসে আপনার এত বিরোধিতা চূর্ণ হল?

"স্বামীজী—না; সে রহস্য আমার সঙ্গেই চলে যাবে। সে সময়ে আমার দুর্ভাগ্যের চরম; পিতার মৃত্যু ও নানা দুর্বিপাক; 'মা' দেখলেন এই সুযোগ—আমাকে গোলাম করার। মা'র একেবারে মুখের কথা—'তোকে গোলাম করে রাখব।' আর রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর হাতেই আমাকে তুলে দিলেন।—বিচিত্র, এরপর তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) মাত্র দু'বছর বেঁচেছিলেন, আর তার বেশী সময় ভুগেছিলেন। ৬ মাস যেতে না যেতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হল—সে উজ্জ্বলতা কোথায় চলে গেল!"[১৪]

নরেনকে গোলাম বানাতে কালীকেও ছয় বছর ধৈর্য ধরতে হয়েছিল। নরেন এত ঝামেলা বাধিয়ে ছিল বলেই বুঝিবা কালীর কথায় এত মাত্রাতিরিক্ত ঝাঁঝ—"তোকে গোলাম করে রাখব"!

নরেনের দক্ষিণেশ্বরে আসার বার বছর পূর্বে সারদা যখন প্রথমবার পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে আসার পথের পাশের চটিতে রুগ্নাবস্থায় শয্যাশায়ী, এ বিশ্বে পিতা রামচন্দ্র ছাড়া একমাত্র ভবতারিণী সে খোঁজ রেখেছিলেন। তাই শুধু নয়, এত পথ যেয়ে কত প্রাণ-জুড়ানো সহমর্মিতার সঙ্গে, কত সুভদ্রাভাবে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে স্বাগত জানিয়ে এসেছিলেন। আমাদের নিরেট স্থূল দৃষ্টিতে এ সব আজগুবি ব্যাপার মনে হতে পারে। কিন্তু কালী সেদিন সারদাকে যা বলে এসেছিলেন সে কথার তাৎপর্য সারদা-রামকৃষ্ণের যুগ্মজীবনে কালে উন্মোচিত করেছিল এক গভীর সার্থকতাপূর্ণ নূতন অধ্যায়। কালী বলেছিলেন: "তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।"

এইভাবেই ভবতারিণী নিজে রামকৃষ্ণের ভাবী জীবনকে সারদা-কেন্দ্রিত করে রেখেছিলেন, জগতে ধর্মসংস্থাপনের অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগ-প্রয়োজনে। সারদার জন্যে যে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণকে ধরে রেখেছিলেন, তার পূর্ণার্থ অভিব্যক্ত হতে থাকে কিছুদিন পরে থেকেই।

৭

"তুমি এসেছ? বেশ করেছ!"

দুদিন পরে স্বয়ং জগজ্জননীর অভ্যর্হিতা ক্লান্তকায়া রাজরাজেশ্বরী সারদেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে এলেন রিক্তহস্তে আপন স্বামীজের ভার নিতে।

---

১৩ শঙ্করীপ্রসাদ বসু : নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ৩৩৫

১৪ তদেব, পৃঃ ৩৩৪-৩৫

তাঁর সদ্য আগমনে অনাগত ভবিষ্যতে এটি হয়ে থাকলেও আত্মসচেতনতাহীনা সারদা এ বিষয়ে অনবহিতাই ছিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস। রাত্রি তখন নয়টা হবে। তাঁর জীবনের একটি চূর্ণ মহামুহূর্তে সারদা এসে দাঁড়ালেন সোজা ঠাকুরের ঘরে, স্বামীর সমুখে।

"তুমি এসেছ? বেশ করেছ!", বললেন ঠাকুর সারদাকে দেখবা মাত্র। জগৎজোড়া তমিস্রার ঘনিমাকে দ্বিখণ্ডিত করে বিশ্বজোড়া একখানি স্তম্ভিত বিদ্যুৎ প্রকাশ করল আলোক-ভাস্বর যুগযুগান্তকে।

সারদার প্রাণের সব দুশ্চিন্তা, দ্বন্দ্ব, ভীতি নিমিষে মিলিয়ে গেল অলীক স্বপ্নের মত। চারটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। আর তাতেই দক্ষিণেশ্বরে সারদা আবির্ভাবের হল কী উদার-গভীর স্তুতি। যেন সদা প্রতীক্ষমাণ ছিলেন এই ক্ষণটির জন্য। তাই সারদার আবির্ভাবে ঠাকুরের এত পরিপূর্ণ তৃপ্তি: "তুমি এসেছ? বেশ করেছ!"

ঠাকুর সকল সাধনায় সিদ্ধের-সিদ্ধ হয়েও, আবার কিসের অপেক্ষায় ছিলেন? "তুই ভাবমুখে থাক্!" এই বলে ভবতারিণী রামকৃষ্ণকে নিজের দাওয়ায় বসিয়ে রেখে বিশ্বজোড়া আপন ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যেমন মায়ের বলা, ছেলের তেমনি থাকা। নিজের কোন প্রয়োজন সম্বন্ধে এ সময়ে ঠাকুর তাঁর চেতনমনে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। "মা জানেন"—এই জলন্ত বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত ঠাকুর কোন জানাজানির বালাই রাখতেন না। তাছাড়া ব্রহ্মশক্তি-অভেদ-তত্ত্ব অনুভূতিতে পাবার পর জানার বা পাবার বাকিই বা ছিল কি? কাজেই ঠাকুর এখন কিসের অপেক্ষায় ছিলেন, এ প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছ থেকে আশা করা বৃথা। তবু আমাদের নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। ঠাকুরের যে "মা জানেন", তিনি নিজেই তো সারদাকে স্পষ্টাক্ষরে বলে এলেন: "তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।" অর্থাৎ কালীর ভাষায়-ভাবার্থে রামকৃষ্ণ এখন সারদার অপেক্ষায় ছিলেন। রামকৃষ্ণকে জানতে-বুঝতে চেষ্টা করতে হলে কালীর এই পড়াটি আমাদের শিখতে হবে। নিজের বুদ্ধি বেশী খাটিয়ে খুব একটা এগোনো যাবে মনে হয় না!

রামকৃষ্ণের সবখানি সাধন-সিদ্ধির জীবনকে কালী যে পর্যায়ে পর্যায়ে স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন তার প্রমাণ ঠাকুরের বহু উক্তিতে-ইঙ্গিতে রয়েছে।

সারদা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ কোন গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করার পূর্বে কালী যে সারদার দক্ষিণেশ্বরে নীয়মানা হওয়ার রহস্যটি ব্যক্ত করলেন, এতে এই দুরধিগম্য জীবনের একটি অমূল্য দিক্-দর্শন মিলল: "তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।" এ সময় থেকে ঠাকুরের জীবনে সারদার মুখ্য ভূমিকার উপক্রমণিকাখানি কালী স্বয়ং আরাবিত করলেন।

যে কালীর আপন কার্যসিদ্ধির জন্য রামকৃষ্ণের দেহযন্ত্রটি সৃষ্টি করা, সেই কালীই যথাসময়ে আপন উদ্দেশ্য সাধনে সারদার জন্য সে যন্ত্রটিকে দক্ষিণেশ্বরে আটকে রাখলেন। "তোমার জন্যই তো"—কথাটি কালীর একটি অতি আধুনিক রসিকতাই শুধু নয়; এই তিনটি শব্দে রয়েছে সারদার জীবন-তত্ত্বের সবচেয়ে প্রামাণিক দৈব প্রকাশ।

পল্লীবালা সারদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তখনই দক্ষিণেশ্বরে এলেন যখন তাঁর বহু-শ্রুত স্বামী-নিন্দা-জনিত তাঁর প্রাণের অসহ বেদনা দূর করার উপায়ান্তর ছিল না। জন্মাবধি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত, সারদা একমাত্র চিত্তশুদ্ধি ও ভগবদ্-অনুভূতি

ছাড়া, নিজের জন্য আর কিছু চাইতে শেখেন নি।

সারদা আহূত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসেন নি। স্বামী-সেবায় নিজে আহুতি হতে স্বতঃ প্রবর্তয়িত্রী হয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু সারদার বিশ্ব-পরিচালিকা কালো বোনটি তেমন সরলা ছিলেন, এমন ভাববার কোন ভিত্তি নেই। জগৎ-ব্যাপারের ও যুগধর্ম সংস্থাপনে রামকৃষ্ণ-জীবনকে একটি শাশ্বত আধার ও পূর্ণাঙ্গ দক্ষ যন্ত্ররূপে বিশ্বকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করার বহু ভাবনা-জল্পনা তাঁর গুরুমস্তিষ্কে ছিল। এ তত্ত্ব কোন প্রোৎসাহী গবেষক যত্নপূর্বক কালী-রামকৃষ্ণ-সংলাপের যে সব ফুট্ অর্ধবাহ্য দশায় ঠাকুরের শ্রীমুখে স্ফুরিত হয়েছে তা চয়ন করলেই হয়ত নির্ণেয় তথ্য বেরিয়ে আসবে।

রামকৃষ্ণকে একটি অতিকুশলী সর্বার্থসাধক মহাযন্ত্র করে নিয়ে কালী যে একটি অবিরোধ্য, সর্বাবয়বজয়ী, নবপ্রাণসঞ্চারী, ভক্তি-জ্ঞান-মোক্ষদায়ী ধর্মনির্যাস মহাশক্তি এ ভোগ-বিষ-জর্জর ধরায় মহাবেগে প্রচালিত করবেন, সে যোজনা অবলীলায় করে চলছিলেন। আর সে উদ্দেশ্যে তাঁকে সারদার জন্য রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে ধরে রাখতে হয়েছিল। সারদা বিনা এ পর্বের পূর্ণাপ্তি হতে পারত না।

কালীর বহুযত্নে পরিবর্ধমান সিদ্ধাতিসিদ্ধ রামকৃষ্ণের জীবনে এই তিনটি জরুরী অবশ্যকৃত্য অকৃত ছিল: ১. তাঁর সকল সিদ্ধির প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করা; ২. তাঁর পূর্ণতার পূর্ণাহুতি দেওয়ান; ৩. এবং, প্রমাণসিদ্ধ ও পূর্ণাহুতি-সার্থক পূর্ণতা অনাগত কালের মর্মস্রোতে পাবনী গঙ্গারূপে প্রবাহিত করে দেওয়া।

এই তিন উদ্দেশ্য সার্থক করতে সারদাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসা। তাই সারদার দক্ষিণেশ্বরে আগমনে রামকৃষ্ণের এমন পূর্ণতৃপ্তি: "তুমি এসেছ? বেশ করেছ!"

"তারপর খড়ি, তারপর রঙ"

অকস্মাৎ স্বসমীপে সমাগতা সারদাকে মাদুর পাতিয়ে সমাসীনা করে যখন বার্তালাপে জানলেন পথশ্রমে তিনি অসুস্থা হয়ে এসেছেন, তখন নিজের ঘরে তাঁকে রেখে, নিজের তত্ত্বাবধানে সুচিকিৎসায় প্রথমে সুস্থ করে তুললেন।

ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ দর্শনে শুধু যে সারদার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচল তাই নয়, নূতন করে অনুভূতিতে পেলেন তিনি ঠাকুরের পূর্ণতর কৃপা।

সুস্থ হয়ে, জীবনের নবোন্মোচিত অধ্যায়ে অচিরে আপন কর্তব্য বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে মহোল্লাসে ও মহোৎসাহে সারদা ঠাকুর ও তাঁর জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এটিই হল তাঁর প্রথম ও প্রধান সাধনা। সারাদিন নহবতে থেকে 'সংসারের' কাজকর্ম সেরে, রাত্রিতে তিনি ঠাকুরের ঘরে তাঁর শয্যায় শয়নের অনুমতি পেয়েছিলেন।

একান্তে পেয়ে পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর একদিন সারদাকে এই প্রশ্নটি করলেন: "কি গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?"

মুহূর্তমধ্যে সারদার যে অভাবিত ও অভাবনীয় জবাব এল তাতে সকল মানুষের ধর্মদিগন্ত তৎক্ষণাৎ এক নবীন মহাসম্ভাবনার আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে আলোকে সারদাসুন্দরীর শ্রীমুখ নূতন ভাবে দেখে ঠাকুর ক্ষণিকের জন্য নিশ্চয় বিস্ফারিত-নয়ন হয়েছিলেন।

নিজের অতি স্বতঃস্ফূর্ত সারল্যে স্পষ্টতম ভাষায় সারদা বললেন: "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।"

কত জন্ম ধরে এই মহাযোগিনী কত সার্থক সাধনার ফলশ্রুতিরূপে যে অবলীলায় এ যুগান্তকারী আর্ষ ঘোষণাটি করতে পেরেছিলেন তা কে বলতে

পারবে ?

তাৎক্ষণিক এমন সম্পূর্ণ সংসারত্যাগের নজির ধর্মের ইতিহাসে আরো আছে বলে আমাদের জানা নেই। ত্যাগীশ্বরের সহধর্মিণী তাঁর পাশে অনায়াসে ত্যাগীশ্বরীরূপে সমাসীনা হলেন নিজের অজ্ঞাতে। এই ত্যাগীশ্বরীর বৈরাগ্য-বৈভবেই হল ঠাকুরের ত্যাগীশ্বরত্বের চিরসংপ্রতিষ্ঠা।

আজ আমরা যে আমাদের অতুলনীয় কপাল-মোচন ভবভয়ভেদকারী অভয়শরণ জগজ্জন-দুঃখহারী, "চির-উন্মদ প্রেম-পাথার" শ্রীরামকৃষ্ণকে জগৎজুড়ে হৃদয়ভরে পেয়েছি, ভেবে যদি দেখি বুঝতে পারব, তাঁকে এমন ভাবে আমরা পেয়েছি সারদার মঙ্গলহস্তের সর্বস্ব দানরূপে। সারদার ত্যাগ অমন সম্যক্ সম্পূর্ণ না হলে, আমাদের অমন "ভঞ্জন-দুঃখ-গঞ্জন", "প্রেমার্পণ, সমদরশন" অবতারবরিষ্ঠ রামকৃষ্ণকে আমরা পেতে পারতুম না—তা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাক্-সারদা-আবির্ভাবের সকল সাধন-সিদ্ধি সত্ত্বেও।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদার ত্যাগের মহিমশক্তিতে কি করে এক অভিনব সিদ্ধের সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে মহীয়ান হলেন সে কথা আমরা আলোচনা করব। তৎপূর্বে সারদার ঐ সরল উদার ঘোষণার আরো কিছু মননের প্রয়োজন আছে।

সারদা বললেন: "না। আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব ? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।"

এ যে একেবারে পরমা প্রকৃতির শ্রীমুখের কথা। কে পারেন, কার সাধ্য আছে, সিদ্ধের সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী রামকৃষ্ণকে 'ইষ্টপথে' সাহায্য করতে? তিনি সামান্যা নন। তিনি অনন্যা, অতি অনন্যা। তাই দক্ষিণেশ্বরের কালো মেয়েটি পথ এগিয়ে গিয়ে সারদাকে বলে এসেছিলেন: "আমি তোমার বোন হই", "তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি

ভবতারিণীর এই বাণী ও সারদার এই বাণী: "তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" —এই দুই বাণীর প্রাণের যে সংগীত একটি অতি-গম্ভীর এক সুরে মন্দ্রিত তার আভাস মাত্র দেওয়া চলে।

ঠাকুরের ইষ্টলাভ বহু পূর্বেই হয়ে গেছে সে বিষয়ে ভবতারিণী তাঁকে সর্বক্ষণ যথাপ্রয়োজ সাহায্য করে এসেছেন রামকৃষ্ণ পূর্ণাতিপূ হয়েছেন।

সারদা এখন আবার এই অবেলায় তাঁকে কো ইষ্টপথে সাহায্য করতে এলেন ? তার জন্য আবার রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরেই বা ধরে রাখ কেন ?

এ প্রশ্ন দুটির জবাব আমরা স্বামীজীর ঐ উক্তির আলোকেই পেতে পারি। স্বামীজী বলেছিলেন: "...এ বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ যে, কালী রামকৃষ্ণের উপর ভর করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন।"

কালী তো প্রথম থেকেই জানতেন যে রামকৃষ্ণ অবতারপুরুষ এবং সেরূপেই জগদম্বা তাঁকে লাল করে এসেছেন। তাঁর সকল সাধন ও সিদ্ধি তাঁ 'ইষ্টপথের' অন্ত নয়, তাঁর 'ইষ্টপথের' অবতারণা তাঁর আসল ইষ্টপথ, অবতারের ধর্মসংস্থাপ ও জীবোদ্ধারের পথ। এ পথে সাহায্য করতেই সারদার দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও সারদার জন্য ভবতারিণীর রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে ধরে রাখা।

সারদার জন্য কেন ধরে রাখা ? এটি বিশে প্রণিধানযোগ্য।

জন্মাবধি রামকৃষ্ণ যে অবতারপুরুষ একথা জান থাকা সত্ত্বেও ভবতারিণী ঠাকুরকে নিজের হাতে যন্ত্রমাত্র করে নিয়ে এত বহুপ্রকারের সাধনা দীর্ঘ-কাল ধরে নিজের ত্রিনয়নের তীক্ষ্ণ ও সস্নেহ দৃষ্টি রেখে যে করালেন, তার ফল দেখে আমরা তাঁ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এটুকু ধারণা করতে পারি যে

ামকৃষ্ণের অবতারত্বে তিনি সর্ব দেবদেবীর শক্তি ংহৃত করে, যুগপ্রয়োজনে, তাঁকে নিজের প্রতিভূ-প এ ধরায় ধর্মসংস্থাপনার্থ ও জীবোদ্ধার-কর্মে লিত করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

এই প্রস্তুতির পেছনে ভবতারিণীর অপার রুণার যে একটি শক্তিদ্যোতনা ছিল, তার তীকরূপেই যেন তিনি ঘটালেন সারদার ক্ষিণেশ্বরে আবির্ভাব ও তাঁর দ্বারা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিশ্বাস্য ঘোষণা।

ভবতারিণী যেমন জানতেন রামকৃষ্ণ-সম্ভাবিতকে মন জানতেন সারদা-সম্ভাবনাকে। তিনি নতেন রামকৃষ্ণের স্বল্পায়ু দেহাবসানে সারদা ণ করবেন তাঁর মাধ্যমে প্রবাহিত ঈশশক্তিধারা।

সারদার যে রামকৃষ্ণকে "ইষ্টপথে সাহায্য করতে সা" সে সাধনের খেলাঘরের ইষ্টপথের সাহায্য া নয়। এ অবতারবরিষ্ঠের ধর্মসংস্থাপনের ও বোদ্ধারের ইষ্টপথে সাহায্য করতে আসা।

নগরের উপকণ্ঠে নবাগতা একটি পল্লীতরুণীর । এত বড় দিব্য তত্ত্বকথা? এ কোন গাঁয়ের ণী এটি জানতে হবে তো! আসল ঠিকানাটি লন ভবতারিণী: "আমি তোমার বোন হই।"

অঘটনঘটনপটীয়সী নিজেই তো সব করতে তেন। আবার বোনটিকে নিয়ে এলেন কেন? পরম রহস্যটি সম্বন্ধে হলপ করে কে কথা ে? তবু এটুকু ভাবা চলে না কি: আপন নটিকে যে তাঁর শৈশবেই খেলাচ্ছলে গদাধরের স্বয়ংবরা করিয়েছিলেন তাও কি ভবতারিণীর র ও অবোধ্য করুণার একটি ফল্গুপ্রবাহ?

ভবতারিণীকে আপন লীলা-নিয়মনে প্রত্যক্ষে ণীরূপেই থাকতে হচ্ছিল। চিন্ময়ী হয়েও কে তিনি নেপথ্যচারিণী রেখে চলাতেই তাঁর স্থিতি-প্রলয় যোজনায় অধিকতর সৌকর্য। জন্য কি ভবতারিণী নিজের বোনটিকে ঠাকুরের সাধন-সিদ্ধির ভূমিতে নিয়ে এলেন?

ঠাকুরের অমৃতকথায় আছে: "মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা।"[১৫]

"চিত্তে রূপা", অথচ "সমরনিষ্ঠুরতা"। তাই ভবতারিণী বহু কাজে নিজেকে সুদুর্লভা রেখেই চলবেন, অথচ চিত্তে রূপা। করেন কি? তাই সারদার জন্য রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে ধরে রাখা ও রামকৃষ্ণের জন্য, অর্থাৎ নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সারদাকে পায়ে হাঁটিয়ে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসা।

ঠাকুর যে আবার পাকা গুটি কাঁচিয়ে নিয়ে, নূতন করে মহামায়ার আরাধনা সারদাতে করলেন, তাতে এই সম্ভাব্য সূচিত হল যে ভবতারিণী আপাত সুদুর্লভাই থাকলেন অথচ অন্যরূপা মহামায়া ঠাকুরের সাধনবলে আমাদের অতিসুলভ্যা শ্রীমারূপে মানুষের জীবনাঙ্গনে সচলা হলেন।

তা না হলে সাধনভজনহীন জীব এই নিঃসীম বিভুঁই বিশ্বে কোথায় পেত শাস্ত্র-কথিত মহামায়াকে খুঁজে? তাই লীলাবিলাসিনী ভবতারিণী আপন চিত্তের রূপা বশে নিজের বোন হয়ে নূতন বেশে এলেন সকলের ঘরে ঘরে। এসে বললেন: আমি তোমাদের চিরকালের মা। সত্যিকারের মা। পাতানো মা নই, সত্যি সত্যি, সত্যিকারের মা। এ মায়ের ঘরের সন্তান সহজে হিস্সে ফেলে আপন অংশ আদায় করে নিতে পারে। হিস্সে ফেলে চাওয়ারও প্রয়োজন হয় না। সকলের জন্য পরমায় বেঁধে বসেই আছেন পথ চেয়ে।

ঠাকুরকে ইষ্টপথে সাহায্য করতে সারদা যে এলেন, এটি শুধু তাঁর ঘোষণা থেকেই যে আমরা জানলুম তা নয়। সারদার এই আসাকে ঠাকুর যে ঠিক একই রূপে আবিষ্কার করলেন, তা আমরা

---

১৫ 'শ্রীম-কথিত', শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ, ১৩৭৪, পৃঃ ১১২

ঠাকুরের সুস্পষ্ট ঘোষণা থেকেও জানলুম।

দক্ষিণেশ্বরে আসার কিছুদিন পরে একদিন ঠাকুরের পদসংবাহন করতে করতে সারদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন : "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয় ?" ঠাকুর তদুত্তরে বললেন : "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই !"[১৬]

অপরোক্ষানুভূতি-প্রতিষ্ঠ ঠাকুর এমন কিছু আর দেখতে পেতেন না যা যা নয়। সম্পূর্ণ মায়ানির্মুক্ত ঠাকুর যা যা, তা সাক্ষাৎ সেইরূপই কেবল দেখতেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী বলেই সারদাকে সর্বদা আনন্দময়ী রূপেই সত্যি সত্যি দেখতেন।

এটি সারদা সম্বন্ধে ঠাকুরের একটি অতি-বিস্ময়কর উক্তি ও প্রকটিতকরণ, যা কিছুকালের জন্য সীমিত রইল শুধু সারদা-রামকৃষ্ণের পারস্পরিক জানাজানির মধ্যে, অথবা একটি অতি ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর মধ্যে।

'খড়ি' হয়ে গেছে। এখন রঙ চলছে। সে কী রঙ! নয়নে যে লেগেছিল দিব্য অঞ্জন, এ সেই রঙ। ছুটলে কি হবে? এ রঙ কোন দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। এ ভগবানের ভব-রঙ্গালয়ের সজ্জাপ্রকোষ্ঠে রাখা লীলাভিনয়ের রঙ। [ক্রমশঃ]

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৩৬২

পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় আদর্শ

শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

অতীতে 'ভারতবর্ষ' বলিতে একমাত্র বেদ-ভিত্তিক, হিন্দুজীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত জনসমাজের আবাসভূমি একটি উপমহাদেশ বুঝাইত। কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে ঐস্লামিক ও খ্রীষ্টীয় অধ্যাত্মচেতনায় প্রাণবন্ত এক বিশাল জনধারা এই উপমহাদেশের মূল জীবনপ্রবাহের সহিত মিলিত ও একীভূত হইয়া গিয়াছে। 'ভারতবর্ষ' বলিতে এখন আর শুধু বেদভিত্তিক হিন্দুসভ্যতার লীলাভূমি একটি উপমহাদেশ বুঝায় না। কাল-প্রবাহে 'শক-হুন-দল পাঠান মোগল' ভারতবর্ষের বিরাট অস্তিত্বে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মধ্য এশিয়া তথা ইউরোপের আধ্যাত্মিক সাধনা ভারত-বর্ষকে একেবারে প্রভাবিত করে নাই—একথা বলা যায় না। আজ ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরাও ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের বৃহৎ সমাবেশের একাংশ ; সম্মিলিতভাবে ভারতীয় জনসমষ্টির জীবনসংগ্রামের, তাহাদের দুঃখ-সুখের শরিক এই মুসলমান এবং খ্রীষ্টানরাও, ইহা অনস্বীকার্য। শিখ, পারসীক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য প্রযোজ্য। ইহারা সকলেই ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে ভারতবর্ষের লোক—অর্থাৎ, 'ভারতীয়' বলিয়া পরিগণিত।

কিন্তু 'ভারতীয়ত্বে'র সংজ্ঞা অনুযায়ী আজ অসংখ্য 'ভারতীয়' থাকিলেও, কোথায় সেই আদর্শ 'ভারতীয়', যিনি নিজ জীবন ও বাণীর দ্বারা, আপাতবিরোধী ধর্মীয় চিন্তা ও কর্মের দ্বারা চিহ্নিত ভিন্ন ভিন্ন 'ভারতীয়' জনগোষ্ঠীকে একসূত্রে গাঁথিয়া সমভাবে অনুপ্রাণিত করিবেন? কোথায় সেই আধ্যাত্মিক মিলনমন্ত্রের উদ্গাতা, যিনি

হিন্দুর নিকট আদর্শ হিন্দু, মুসলমানের নিকট আদর্শ মুসলমান, খ্রীষ্টানের নিকট আদর্শ খ্রীষ্টান—সকল ধর্মের আদর্শ প্রাণ-পুরুষ? আজও বহু ভারতীয় হিন্দু মনে করেন, বেদ-পুরাণ-তন্ত্র-ভিত্তিক জীবনদর্শনই আধ্যাত্মিক সাধনার একমাত্র পথ ও একমাত্র সত্য। ভারতীয় মুসলমান মনে করেন, ইসলামীয় ধ্যানধারণাই জীবনজিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর দিতে পারে। ভারতীয় খ্রীষ্টান মনে করেন, ভগবান যীশুপ্রদর্শিত অধ্যাত্মসাধনাই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ।

কোন সন্দেহ নাই যে, উপরি-উক্ত চিন্তাধারার কোনটিই মননসমৃদ্ধ বিচারে বর্তমান কালে সর্ব-ভারতীয় আধ্যাত্মিক মতবাদ বা জীবনাদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে না। এই বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী সকলেই জড়াতীত চৈতন্যের অথবা অতীন্দ্রিয় এক বিশ্ববিধায়কের অস্তিত্বে বিশ্বাসী; কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবজীবনের আপেক্ষিক সত্যের মূল্যায়ন এবং চরম সত্যে উপনীত হইবার পথনির্দেশ বিষয়ে ইহারা আদৌ একমত নন; ঐ ঐ বিষয়ে ইহারা পূর্ব-পশ্চিমের মতই পরস্পর-বিরোধী। তবে পথ কী? এই সমস্যার সমাধান কোথায়? ভারতবর্ষ অর্থাৎ এই উপমহাদেশের জনগণ কোনদিনই শুধু জড়বাদী জীবনাদর্শ এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা লইয়া বাঁচিতে পারিবে না; নিছক জড়বাদের শৃঙ্খলে ইহারা নিজেদের চেতনাকে আবদ্ধ করিতে সম্মত হইবে না।

কমবেশী বিগত চারি হাজার বছরের ইতিহাস এই সত্যের প্রমাণ বহন করে। ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষ হইয়া বাঁচিতে হইলে এই বিবিধ গোষ্ঠী ও সমষ্টির পরস্পরের সহিত আপাত-সমতাবিহীন অথচ মূলতঃ এক জীবনজিজ্ঞাসার সর্বজনগ্রাহ্য একটি উত্তর বাহির করিতেই হইবে। ভারত-বর্ষকে তাহার কালসমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক চেতনা লইয়া বাঁচিতে হইলে সর্বজনগ্রাহ্য একটি প্রাণবন্ত আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং সেই আদর্শে পৌঁছিবার একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দু, মুসলমান, পারসীক, খ্রীষ্টান তথা অপরাপর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গড়া বিরাট মনুষ্যগোষ্ঠীর জনমানসের আধ্যাত্মিক চেতনার একটি অনন্য আদর্শ, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবেদ কী হইবে? তাহার পথ কে বলিয়া দিবে? কোথায় সেই সর্বভাবগ্রহণকারী, সর্বমত ও পথ রক্ষাকারী আধ্যাত্মিক জননায়ক? ভারতবর্ষ এই প্রশ্নের একটি সদুত্তরের দীর্ঘ প্রতীক্ষায় উন্মুখ ছিল। মহাকালের নির্দেশে আজ সেই উৎসুক-উন্মুখ প্রতীক্ষার ক্রান্তিমুহূর্ত সমাগত। ভক্তের প্রতি অনুকম্পাভরে অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনে ভারতবর্ষ তাহার দীর্ঘদিনের জীবন-জিজ্ঞাসার সদুত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছে। ভারতবর্ষের এক অখ্যাত পল্লীতে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সেই পুরুষোত্তম আসিয়াছেন। মানব-ইতিহাসের দীর্ঘ শক্তিসংঘাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এবং সম্পূর্ণ সমাধানরূপে তিনি আসিয়াছেন। তিনি নিজ অলৌকিক জীবনযাত্রায় বিশ্বজীবনের অনন্তপ্রবাহের মূল সঙ্গীতটি অপূর্ব মূর্ছনায় স্বদেশে-বিদেশে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত জীবনপ্রবাহে তিনি সমগ্র ভারতভূখণ্ডের আপাত-বিরোধী বিভিন্ন অধ্যাত্মচিন্তার ধারাগুলি এক সম্মিলিত ধারায় প্রবাহিত করিয়াছেন। নিজ স্বল্পপরিসর পার্থিব জীবনের গণ্ডীর মধ্যেই তিনি সব অধ্যাত্মমতকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, সব পথকেই সশ্রদ্ধচিত্তে আপনার পথ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। হিন্দুর কাছে তিনি অবতার, ভক্ত মুসলমানের তিনি পীর, ভক্ত খ্রীষ্টানের কাছে তিনি পরিত্রাতার প্রতিবিম্ব। মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও সঙ্ঘারামের পরস্পরের ব্যবধানের প্রাচীর তাঁহার জ্যোতির্ময় সর্বব্যাপী চিন্ময় সত্তার মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গোষ্ঠীগত ধর্মমতের গণ্ডী

তাঁহার নিঃসীম উপলব্ধির মধ্যে সীমা হারাইয়াছে। জড়বাদী সভ্যতার অন্তিম মুহূর্তে জগৎকে চরম বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব ভারতবর্ষেরই এবং সেইজন্যই শত সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতবর্ষ আজও তাহার অধ্যাত্মজ্ঞান লইয়া বাঁচিয়া আছে। এবং সেই শাশ্বত অধ্যাত্মজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণই আধ্যাত্মিকতার পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় আদর্শ।

বিবেকানন্দ ও মানুষের ধর্ম

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়*

মানুষ আজ ধর্মভ্রষ্ট, তাই তার দুর্দশার শেষ নেই। অন্য অনেক মনীষীদের মতো স্বামী বিবেকানন্দও মানুষকে পথের নিশানা দিয়েছেন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি তা জানিয়েছেন। মানুষের ধর্ম মন্দির-মসজিদ-গির্জার চত্বরে লুকিয়ে নেই, তা রয়েছে মানুষের নিজের অন্তরের অন্তস্থলে। সে-ধর্মের বাণী বৃহস্পতি, শুক্র বা রবি—সপ্তাহের এ-রকম কোনো বিশেষ দিনের জন্য নয়। সে-বাণী অহরহ মানুষের হৃদয়-কন্দরে ধ্বনিত হচ্ছে। সে-বাণী মানুষের বিবেকের বাণী। এই বিবেকের বাণীর দিকেই বিবেকানন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদের বিবেক আমাদের বারংবার একটা কথাই বলে চলেছে, আমাদের ঈশ্বরাভিমুখী হতে হবে, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ভিতরের এই তাগিদ কোনো পশু বা পাখি এভাবে অনুভব করে না। এ-প্রেরণা শুধু মানুষেরই অন্তরসঞ্জাত। তাই যখন আমরা বলি, বেদের ভাষায়, 'চরৈবেতি', কিংবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আগে চল্, আগে চল্ ভাই', তখন চলার চরম লক্ষ্য আমাদের একটাই। ঈশ্বরের কাছে যদি আমরা না যেতে পারি, অন্নময় প্রাণের স্তর থেকে চিন্ময়ী সত্তার স্তরে আমাদের উত্তরণ যদি ব্যাহত হয়, তা হলে আমাদের মানব-জন্ম ব্যর্থ হল। বিবেকানন্দ মনে করেন, মানব-জন্মের চরম পরিণতি ও পরম সার্থকতা ঈশ্বরলাভে। অনন্তের সুরে হৃদয়তন্ত্রীকে বেঁধে রাখা, এটাই মানুষের প্রধান ধর্ম।

এই ধর্ম থেকে বিচ্যুতি মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক এবং সেটাই মানুষের সব অশান্তির মূলে। শুধু জাগতিক ঐশ্বর্য বা ঐহিক সুখ কোনো দিন মানুষকে শান্তি দিতে পারে না; ইন্দ্রিয়ের পোষণে কামনা কখনও প্রশমিত হয় না বরং আগুনে ঘৃতাহুতির মতো ক্রমশঃ সেটা বেড়ে যায়। গভীর কোনো আনন্দ কিংবা অন্তরের শান্তি লাভ করার জন্য কোনো পার্থিব পথ নেই, আধ্যাত্মিক পন্থাই একমাত্র অবলম্বন। দক্ষিণ ভারতের ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতির সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে স্বামীজী তাই বলেছেন: 'আমাদের শাস্ত্র বার বার বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা কখনও ধর্মানুভূতি লাভ করা যায় না। যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎ করায় তাহাই ধর্ম; আর এই ধর্ম সকলেরই জন্য। যিনি সেই অতীন্দ্রিয় সত্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন, যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি ভগবান্‌কে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি ঋষি হইয়াছেন।' (স্বামী বিবেকানন্দের

* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'সাহিত্য: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'রোমান্টিক কবি ও কাব্য', 'Mysticism in English Poetry', 'Aspects of Literature' এবং Sidney's 'An Apology for Poetry' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৭৯)। এই ঋষিত্ব যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন সন্ত অগাস্টিন, তাঁর 'স্বীকারোক্তি' গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখেছেন: 'তুমি আমাদের তোমার জন্যই সৃষ্টি করেছ, আর আমাদের হৃদয় শান্তি পেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার মাঝে সে তার বিরাম খুঁজে পাচ্ছে।' এই বিরাম খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টাই মানুষের সারা জীবনের সাধনা।

সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য প্রয়োজন আত্ম-বিশ্বাসের। আত্মবিশ্বাসই সব শক্তির উৎস। নিজের উপর বিশ্বাস না থাকার জন্য মানুষের যত কিছু দুর্বলতা ও ব্যর্থতা। যারা নিজেদের প্রতি আস্থাশীল তাদের অগ্রগতি কোনো দিন বাধা পায় না। জীবনে যাঁরা উন্নতি করেছেন তাঁরা সকলেই আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন। ইতিহাসের পাতায় যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা কখনও আত্মবিশ্বাস হারান নি। প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসের, প্রয়োজন শ্রদ্ধার। শ্রদ্ধা-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আমাদের কঠোপনিষদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন (কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭)। এক যজ্ঞানুষ্ঠানে যখন নচিকেতার পিতা অতি বৃদ্ধ কতকগুলি গাভী দক্ষিণা দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করে। শ্রদ্ধা জাগবা মাত্র নচিকেতার হৃদয় আত্মবিশ্বাস ও সাহসে পূর্ণ হয়। যমসদনে যাওয়াও তখন তাঁর কাছে কিছুমাত্র কঠিন মনে হয় নি।

মানুষের চাই এই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার অভাবে আজ মানুষের এই দুরবস্থা। শারীরিক বলে শ্রদ্ধাশীল হয়ে যে জাগতিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করা যায় পাশ্চাত্যে সে প্রমাণ রয়েছে। আত্মিক শক্তিতে শ্রদ্ধা রাখলে তার সম্ভাবনা অপরিসীম। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন: 'তোমরা যদি আত্মাতে বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ একবাক্যে যাহা প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার আত্মায় বিশ্বাসী হও—যে আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, যাঁহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। কেবল আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব আসিবেই আসিবে।' (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭)।

তাঁর 'জ্ঞানযোগে' বিবেকানন্দ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, অন্য কারও কাছে আমাদের যেন কোনো প্রত্যাশা না থাকে। নিজেদের অতীত জীবন স্মরণ করলে আমরা দেখব, সব সময় অন্যের সাহায্য পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছি কিন্তু কখনও কিছু পাই নি। যেটুকু সাহায্য পেয়েছি সব নিজের ভিতর থেকে। আমাদের কর্তব্য, অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা না করা। আমাদের নিজেদের অন্তরে রয়েছে অমেয় ঐশ্বর্য, আমরা কেন ভিক্ষার্থী হব? আত্মার বলে আমরা বলীয়ান্, আমাদের সাম্রাজ্য অনন্তে বিস্তৃত, অন্যের উপর নির্ভর করা কি আমাদের শোভা পায়? আত্মবিশ্বাস প্রথমে, আত্মবিশ্বাস শেষে, আত্ম-বিশ্বাস সব সময়ে। এর অভাবে আমরা জীবন্মৃত। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কুম্ভকোণমে বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় এই সত্য তুলে ধরেছেন: 'বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস - নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। তোমার যদি এদেশীয় পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহাদের সবগুলির উপরই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাস-সম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাস-বলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও এবং বীর্যবান্ হও। ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক।' (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৯)।

আত্মবিশ্বাসের জন্য প্রয়োজন আত্মধ্যানের, আর আত্মজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। প্রাচীন ভারতে বলা হয়েছিল, 'আত্মানং বিদ্ধি', গ্রীসে সক্রেটিস্ বললেন, 'নিজেকে জানো'। আপনাকে জানা মানুষের কখনও ফুরাবে না। আমাদের ভিতরে কত তেজ, কত উদ্যম, কত প্রাণশক্তি সুপ্ত আছে, তার কতটুকুর আমরা খবর রাখি? হঠাৎ বড় কোনো বিপদের মুখোমুখি হলে এই উপলব্ধি আসতে পারে। এক শতাব্দীরও আগে মার্কিন কবি এমিলি ডিকিন্‌সন্ একটি কবিতায় লিখেছিলেন :

'We never know how high we are
Till we are called to rise
And then, if we are true to plan
Our statures touch the skies.'

এই কথাই ৬ মে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম জেম্‌স্ একটি চিঠিতে লিখেছেন :

'Most people live, whether physically, intellectually or morally, in a very restricted circle of their potential being…Great emergencies and crises show us how much greater our vital resources are than we had supposed.'

এ-সব 'vital resources'-এর সন্ধান বৈজ্ঞানিক কিংবা মনোবিজ্ঞানী এখনও দিতে পারেন নি; এর জন্য প্রয়োজন অধ্যাত্ম-জ্ঞানের। এই জন্য বিবেকানন্দ বার বার সকলকে সতর্ক করেছেন যে, নিজেকে কোনো দিন ক্ষুদ্র, ছোট, দুর্বল ভাববার আমাদের অধিকার নেই। বাইরের দুর্গতির অন্তরালে সম্ভাবনার কোন্ বীজ লুকিয়ে আছে তার আমরা কীই বা জানি? আমাদের পশ্চাতে রয়েছে অন্তহীন শক্তি ও আনন্দধারার মহাসমুদ্র। আমাদের দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা দূর করার উপায় আমাদের হাতেই রয়েছে। পাহাড়-প্রমাণ উঁচু কোনো ঢেউ এবং একটি ছোট জলকণিকার পিছনে একই সাগরের উত্তাল জলরাশির শক্তি ঘনীভূত রয়েছে :

'যদি জড়জগতে বড় হইতে চাও, তবে বিশ্বাস কর—তুমি বড়। আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্, তুমি হয়তো পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডার-স্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি।'

(বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩-৩৪)।

নিজের উপর বিশ্বাস হারানোর অর্থ, ঈশ্বরের উপর ভক্তি হারানো। আত্মপ্রত্যয় ভক্তির উৎস। যে-আত্মজ্ঞান থেকে আত্মবিশ্বাস আসছে সেই পরোক্ষ আত্মজ্ঞান রয়েছে শিক্ষার মূলে। বিবেকানন্দ তাই বলেন, 'Education is the manifestation of the perfection already in man'. সব শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বিকাশ ত্বরান্বিত করা। চকমকি পাথরের ভিতর যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে, জ্ঞান থাকে সেইভাবে মনের অভ্যন্তরে। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ঘর্ষণের ফলে সেটা বেরিয়ে আসে। যেটা কেউ 'শেখে' সেটা আসলে সে নিজের অন্তরের আবরণ উন্মোচন করার পরে 'আবিষ্কার' করে। এই অন্তর অন্তহীন জ্ঞানের খনি। জগতে যা-কিছু জ্ঞানের চর্চা হয়েছে সব এসেছে মনের ভেতর থেকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পাঠাগারের অবস্থিতি মানুষের মনে। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব নিউটনের মনের মধ্যে সব সময় বিরাজ করছিল কিন্তু বিশেষ একটা মুহূর্তে তিনি সেটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। আপেল-পড়া দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর মনের একটা

পর্দা সরিয়ে দিতে সাহায্য করে মাত্র, আপেলের মধ্যে কোনো তত্ত্ব নিহিত ছিল না। জাগতিক কিংবা আধ্যাত্মিক সব জ্ঞানেরই উৎস মানব-মন। অনেক সময় এই জ্ঞান আবিষ্কৃত হয় না, আবৃত থাকে। আবরণ যত সরতে থাকে আমরা তত 'শিখতে' থাকি। আবরণের ক্রম-উন্মোচনই শিক্ষার ক্রমোন্নতি। 'আবিষ্করণ' ও 'শিক্ষণ' তাই সমার্থক বললেও ভুল হবে না।

সব চেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে বিশ্বজনীন ঐক্যের বোধ। নিখিল জগতে এক পরিপূর্ণ ঐক্য বিরাজমান। ক্ষুদ্রতম কীট থেকে মহত্তম মানুষ পর্যন্ত দেহগত বিভিন্নতা থাকলেও আত্মিক কোনো অনৈক্য নেই; তারা একই পরম আত্মসত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। তাই বিশ্বপ্রেমের আদর্শ কোনো অলীক আদর্শ নয়, মহান্ সত্য। সকলের মুখ দিয়ে আমি আহার করছি, সকলের হাত দিয়ে আমি কাজ করছি, সকলের চোখ দিয়ে দেখছি, সকলের কান দিয়ে শুনছি; সকলের থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারি না। ইংরাজ কবি ডান্ (Donne) তাই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন:

> 'No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent.'

যদি শুধু স্বার্থপরের দৃষ্টি নিয়ে দেখি, তা হলেও দেখব, স্বতন্ত্রভাবে কেউ বাঁচতে পারে না। শুধু আপনাকে নিয়ে বিব্রত থাকার অর্থ, স্বখাত সলিলে ডুবে মরা। রোমক কবি হরেস্ তাঁর একটি পত্র-কবিতায় লিখেছেন: 'তোমার প্রতিবেশীর দেওয়ালে যখন আগুন লাগে তখন তোমার নিজের নিরাপত্তা ব্যাহত হয়।' এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মার্চ 'The New York Times Magazine'-এ লেখেন:

> 'Mankind has become so much one family that we cannot insure our own prosperity except by insuring that of everyone else. If you wish to be happy yourself, you must resign yourself to seeing others also happy.'

অন্য মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে আমি নিজেরও সেবা করব কারণ আমার জীবন অন্য সকলের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর মানুষের সেবার অর্থ ঈশ্বরের সেবা; তাঁর এর চেয়ে বড় পূজা অন্য কিছু হতে পারে না। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—এই মন্ত্রে স্বামীজী আমাদের দীক্ষিত করেছেন। ঈশ্বরকে আমরা দেখব তাঁর সৃষ্টির মধ্যে; সব কিছু ঈশ্বরে অনুস্যূত ও বিধৃত হয়ে রয়েছে, 'সূত্রে মণিগণা ইব'। দারা-সুত-পরিবার আমাদের বন্ধন হয় তখনই যখন আমরা তাদের পৃথক্ ক'রে দেখি; যদি তাদের মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে দর্শন করি তখন তারাই আমাদের মুক্তির কারণ। আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র, সুজন-দুর্জন, স্বদেশীয়-বিদেশীয় সকলের মধ্যে সমভাবে ঈশ্বর রয়েছেন; তিনি সমভাবে রয়েছেন সুখে ও দুঃখে, জীবনে ও মরণে। এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে তবেই আমরা মানুষের মতো বাঁচতে পারব। বিবেকানন্দ মনে করেন, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করাই মানুষের সব চেয়ে বড় ধর্ম।

ঋষিকৃষ্ণ-আখ্যায়িকা

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

[শ্রীরামকৃষ্ণ যীশুখ্রীষ্টকে ঋষিকৃষ্ণ বলে উল্লেখ করেছেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।৩১।২)। যীশু-কথিত আখ্যায়িকা-প্রসঙ্গে ঐ অনুপম নামটিই গৃহীত হয়েছে।]

এক

গল্প শোনবার আগ্রহ যেন মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে। শিশুরা রূপকথা শুনতে ভালবাসে, কিশোররা অভিযানের কাহিনী পড়তে চায়, যৌবনে প্রেমের গল্প উপন্যাস একান্ত উপাদেয়, বার্ধক্যে পুরাণ-কথা বা সাধকচরিতই মনোজ্ঞ।

নিছক তত্ত্বকথা না বলে যা বক্তব্য তা যদি কাহিনী দিয়ে সরস করে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে তা হৃদয়গ্রাহী হয় তো বটেই, অনেকটা সুবোধ্যও হয়।

কেনোপনিষদের প্রথম দুখণ্ডে যে সব মন্ত্র আছে তাতে গভীর তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। তা অবশ্যই বহুমূল্য। তৃতীয় খণ্ড থেকে (চতুর্থ খণ্ডের কিছু অংশ পর্যন্ত) কিন্তু একটি উপাখ্যান শুরু হয়েছে, দেবযক্ষসংবাদ নামে যেটি প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে করতে গল্পের অবতারণা কেন করা হল তার কারণ দেখিয়ে আচার্য শংকর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন—ব্রহ্মকে স্থূল প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না, সুতরাং ব্রহ্ম অসৎ অর্থাৎ আদৌ নেই, অল্পবুদ্ধি লোকেদের মনে পাছে এইরকম একটা আশঙ্কা জাগে, এইজন্যই এই আখ্যায়িকা শুরু করা হয়েছে। [কেন-ভাষ্য ৩।১]

অবশ্য আচার্য শংকরের অলোকসামান্য প্রজ্ঞার কথা স্মরণ করলে বলতে হয়, লক্ষ লোকের মধ্যে নিরানব্বুই হাজার নশো নিরানব্বুই জনই মন্দ-বুদ্ধি। সোজাসুজি তত্ত্বকথা বললে সাধারণের পক্ষে তা বোধগম্য হবে বলে আশা করা যায় না। সঙ্গে গল্পগাথা থাকলে তত্ত্বকথা হয়তো বা কিছু সরল বলে মনে হবে, অন্ততঃপক্ষে সরস বলে মনেও থাকবে।

বৈদিক সাহিত্যের নানা আখ্যায়িকার কথা বাদ দিলেও মহাভারত থেকে শুরু করে ভাগবত-প্রমুখ অষ্টাদশ পুরাণ বা অসংখ্য উপপুরাণাখ্য গ্রন্থে মূল কাহিনীর সঙ্গে অজস্র উপাখ্যান সংযোজন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য—আখ্যায়িকা-বিশেষের পটভূমিকায় বক্তব্য বিষয়কে স্ফুটতর করে তোলা। মহাপুরুষগণও সাধারণ মানুষকে উপদেশ দেবার সময় কোনো ইতিবৃত্ত বা গল্প বলেছেন, যাতে উপদেশ বা নির্দেশ সহজবোধ্য হয়। বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত জাতককথা থেকে শুরু করে একালে শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প-সহযোগে সুরস অমৃতময়ী কথা পর্যন্ত অনেক বাণীসঞ্চয়নই এর দৃষ্টান্ত বা প্রমাণও বলা যায়।

যীশু তাঁর শিষ্যদের বা ভক্তমণ্ডলীকে যে উপদেশ দিয়েছেন, দিব্যকথা-চতুষ্টয়ে তার অল্পই রক্ষিত হয়েছে। তবে যতটুকু পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই সহজ সরল ভাষায় পরিচিত বিষয় অবলম্বন করেই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি যাঁদের উপদেশ দিয়েছেন তাঁরা পুঁথিপোড়ো পণ্ডিত নন। তত্ত্বের কচকচি বা তর্কবিচারের খচমচি এড়িয়ে তিনি যেমন কী করণীয় সে সম্পর্কে সোজাসুজি বলেছেন, তেমনই খুবই চেনাজানা দৃষ্টান্ত দিয়ে গল্পের অবতারণা করেছেন, যাতে তাঁর অনুরাগীদের সহজ প্রত্যয় হয়।

অবশ্য চেনা জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করলেও তার মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধ আর বীক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঈশপের কথামালার গল্প বা পঞ্চতন্ত্র-

হিতোপদেশের আখ্যায়িকার সঙ্গে তাঁর গল্প বা দৃষ্টান্তের মৌলিক পার্থক্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বা গল্পের মতোই তা সংকেতময়, বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থকে অতিক্রম করে তা গভীরতর সত্যের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'পরোক্ষ-প্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ'—দেবগণ যেন পরোক্ষপ্রিয়, তাঁরা প্রত্যক্ষকে দ্বেষ করেন। [৪।২।২]—মনে হয়, মন্ত্রাংশটির গভীর তাৎপর্য আছে। যা সরাসরি আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর, বাহ্যভাবে ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করেই তা ফুরিয়ে যায়; কিন্তু যা পরোক্ষ—প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে যার প্রতিষ্ঠাভূমি, তার ক্রিয়া গভীর। সাহিত্যশাস্ত্রীরা যাকে রসধ্বনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকথা বা যীশু-কথায় সেই অন্তর্ময় সঞ্চার অনুভব করা যায়।

বীজবপকের রূপক দিয়ে প্রসঙ্গ শুরু করা যেতে পারে। [ম্যাথিউ ১৩, মার্ক ৪, লুক ৮] —এক বীজবপক বীজ ছড়াতে ছড়াতে গেল। কয়েকটা বীজ পথের পাশে পড়ল; সেখানে মাটি বিশেষ ছিল না। সেজন্য অল্পকালের মধ্যেই সেখানে চারা গজিয়ে উঠল, কিন্তু সূর্যের তাপে সেগুলো শুকিয়ে গেল, কেননা শিকড় গাড়তে পারেনি। কতকগুলো কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; কাঁটাবন বেড়ে উঠে সেগুলোকে ঢেকে ফেলল। কতকগুলো বীজ ভালো জমিতে পড়ল। সেখানে তা থেকে গাছ হয়ে ফল দিল—কোনটায় একশোটা, কোনোটায় ষাটটা, কোনোটায় বা তিরিশটা।

এ আখ্যায়িকা তিনি গ্যালিলি হ্রদের কূলের কাছে একটি নৌকায় বসে হ্রদের তীরে সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে বলেছিলেন। সাধারণ শ্রোতারা তাঁর এই কথা শুনেছেন, কিন্তু এর তাৎপর্য বোঝবার আগ্রহ বা সে রকম মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের ছিল না। তাঁর শিষ্যরাই শুধু উৎসুক হয়ে তিনি কেন জনমণ্ডলীর কাছে এভাবে সংকেতকথা বলেছেন একথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন। যীশু জানিয়েছেন যে যাদের আছে তারাই পাবার অধিকারী। যারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না তারা বুঝতে পারবে না

বলেছেন, তোমাদের চোখ কৃপাধন্য, কেননা দেখতে পায়; তোমাদের কান কৃপাধন্য, কেননা শুনতে পায়। বলছি আমি তোমাদের- তোমরা যা দেখছ বা শুনছ অনেক মহাপুরুষ অনেক ধর্মনিষ্ঠ লোকও তা দেখতে পায়নি, শুনতে পায়নি।—বীজবপকের আখ্যায়িকার ভাবমর্ম শোনো।—যখন কেউ ভাগবত লোকের কথা শোনে, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে না, তখন তার অন্তরে যে ভাবটি রোপণ করা হয়েছিল কুভাব এসে তা নষ্ট করে দেয়। এই হল পথের পাশে ছড়ানো বীজের অর্থ। অল্পই মাটি আছে এমন পাহাড়ে জমিতে বীজ ছড়ানোর মানে এই যে কোনো কোনো লোক সানন্দে ভাগবতী কথা শোনে, কিন্তু তাদের অন্তরে গভীরতা থাকে না, তাই তা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে পারে না; ভাগবত সত্যের অনুবর্তী হওয়ার জন্য জীবনে যখন দুঃখকষ্ট বা অভিঘাত আসে তখন তাদের পদস্খলন হয়। কাঁটাঝোপের মধ্যে বীজ পড়া কী? না কেউ হয়তো সৎপ্রসঙ্গ শোনে, কিন্তু সংসারের ভাবনা-দুশ্চিন্তা, সম্পদের প্রলোভন এই সবে সৎপ্রেরণা একেবারে চাপা পড়ে গিয়ে নিষ্ফলই হয়ে যায়। আর ভালো জমিতে বীজ পড়া? যে দিব্য কথা শোনে, সে তা উপলব্ধি করে। তার জীবনে ভাগবতী বাণী ফলবতী হয়। কেউ বা একশোটা ফল ফলায়, কেউ বা ষাটটা, কেউ তিরিশটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব আর নিত্যজীব। যীশু সাধারণভাবে মানুষকে দুভাগে ভাগ করেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দিষ্ট বিভাগ অনুসারে—বদ্ধজীব আর মুমুক্ষুজীব। যাদের জীবনে ভাগবত বীজ ফলবান হয় না তারা বদ্ধজীবের পর্যায়ে পড়ে। যারা আধারের গুণে অবশ্যই প্রযত্ন-সহযোগে ফল ফলাচ্ছে তারা মুমুক্ষু; যথাকালে মুক্ত হবার সম্ভাবনা তাদের আছে। হয়তো জনমণ্ডলী বা অনুগামীদেরও সীমিত সামর্থ্য বিবেচনা করে সুস্পষ্টভাবে মুক্তজীব আর নিত্যজীবের প্রসঙ্গ তোলেন নি।

যীশু বীজবপনের আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন [ম্যাথিউ ১৩, মার্ক ৪]—এক গৃহস্থ ভালো জাতের গমের বীজ পেয়ে নিজের জমিতে তা বপন করল। কিন্তু যখন তার লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল তার শত্রুরা এসে সেই গমের খেতে কাঁটাগাছের বীজ ছড়িয়ে দিল। যখন সেই খেতে চারা জন্মাল তখন দেখা গেল গমের চারার সঙ্গে কাঁটাগাছও গজিয়েছে।

গৃহস্থের লোকজন তখন তাকে বলল, 'কর্তা-মশায়, তুমি কি খেতে ভালো বীজ বোনো নি? কাঁটাগাছ হল কী করে!'

গৃহস্থ বলল, 'কোনো শত্রু এ কাজ করেছে।'

'তাহলে বলো, আমরা গিয়ে কাঁটাগাছগুলো তুলে ফেলি।'

'না, এখন থাক। হয়তো কাঁটাগাছ তুলতে গিয়ে সেইসঙ্গে গমের চারাও উপড়ে ফেলবে। যতদিন পর্যন্ত না ফসল পাকে ততদিন পর্যন্ত দুটোই বাড়ুক। ফসল তোলার সময় আমি আমার ফসলকাটুনিদের বলব, তোমরা আগে কাঁটাগাছ-গুলো তুলে পোড়াবার জন্য তাড়া বেঁধে রেখে দাও। তারপর গম নিয়ে আমার খামারে তুলে দাও।'

যীশু শিষ্যদের কাছে এই আখ্যায়িকার ভাবার্থ শুনিয়েছেন।—যিনি সুবীজ বপন করেছেন তিনি স্বয়ং মানবপুত্র। দিব্যধামের সন্তানরা সুবীজ। কাঁটাগাছের বীজ পাপসন্ততি—শত্রু পাপপুরুষ। শস্যচয়ন এই জগতের অবসান—দেবদূতেরা ফসল-কাটুনি। কাঁটাগাছ জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলা হয়; মহাপ্রলয়ের দিন মানবপুত্র দেবদূতদের পাঠিয়ে দিব্য লোকের যা কিছু প্রতিবন্ধক সব কিছুকেই নরকাগ্নিতে দগ্ধ করবেন। যারা ধর্মপ্রাণ, তারা পিতৃভবনে সৌরপ্রভার মতো দীপ্তিমান হবে।

শেষের দিনে পাপীদের নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ আর পুতাত্মাদের স্বর্গলোকে স্থান দেওয়ার কল্পনার মূল ইহুদী জাতির পৌরাণিক ধর্মসংস্কৃতি। যীশুর দৃষ্টান্তের তাৎপর্য এই যে অধ্যাত্মসাধনবীজ কালে ফলপ্রসূ হয়। ভিন্নতর সংস্কারে আচ্ছন্ন হলেও ঐ সাধনবীজ যদি সযত্নে লালিত হয়, তাহলে যথা-কালে প্রতিকূল বা অননুকূল সংস্কার থেকে পৃথক্ করে তার ফলপরিণামের বিশিষ্টতা অনুভব করা যাবে।

যীশু আর একটি দৃষ্টান্তে সরষের দানার সঙ্গে দিব্য লোকের তুলনা করেছেন। দিব্য লোক বা স্বর্গরাজ্য (Kingdom of heaven) বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন, মনে হয় ভারতীয় অধ্যাত্মসাধন-শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকে বলা যায় গুরুদত্ত মহামন্ত্র—সজীব বীজ অথবা অধ্যাত্মতত্ত্ববোধ।—তিনি বলেছেন, একজন লোক সব শস্যের চেয়ে ছোটো সরষের দানা নিয়ে তার খেতে বপন করল। তা থেকে চারা জন্মাল, ক্রমে বেড়ে তা এত বড়ো গাছ হল যে তা অন্য গাছগাছড়াকে ছাপিয়ে গেল। শেষে স্বর্গের পাখিরা এসে সেখানে বাসা বাঁধল।

সরষের ছোট্ট দানা বলে যীশু আসলে কোন্ গাছের কথা বলতে চেয়েছেন তা জানা যায় না। তবে আমাদের ছান্দোগ্য উপনিষদের ন্যগ্রোধফল অর্থাৎ বটফলের বীজের কথা মনে আসে। [৬।১২]—যাঁকে জানলে সব জানা যায় সেই ব্রহ্মের উপদেশ দিতে দিতে ঋষি আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বটফল ভেঙে অণুপরিমাণ বীজ দেখিয়ে বলেছেন

যে এই অতি ক্ষুদ্র বীজ থেকে যেমন মহাবট জন্মায়, তেমনই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৎ থেকে সব কিছুই উদ্ভূত হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবন থেকে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত চয়ন করে যীশু দিব্য প্রেরণার অমোঘতা আর মহার্ঘতার ধারণা শিষ্যদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করতে চেয়েছেন। বলেছেন, স্বর্গরাজ্য রুটি তৈরির তাড়ির মতো। এক নারী তার একটু নিয়ে তিন কাঠা ময়দার মধ্যে রেখে দিল—শেষে সব ময়দাতেই তাড়ি হয়ে গেল।—দিব্য প্রেরণা যেন গুপ্তধন—কোন এক জমিতে যে তা দেখতে পেল, সে সেই-খানেই তা লুকিয়ে রাখল। পরে তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে ঐ জমি কিনে নিল।—দিব্য প্রেরণা মুক্তাসন্ধানী বণিকের কাছে বহুমূল্য মুক্তার মতো, যার সন্ধান পেয়ে সে তার সর্বস্ব বিক্রি করে সেটা কিনে নিল।—দিব্য প্রেরণা জালের মতো। সমুদ্রে জাল ফেলে তারপর ডাঙায় তুলে যা কিছু সেরা তা দিয়ে নৌকা ভরে বাকি সব সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল।

'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু' [কথামৃত ১।১০।৬]—শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই এই সার কথাটি যীশু তাঁর অনুসারীদের বা ভক্তসাধারণের অন্তরে বসিয়ে দিতে চেয়েছেন। সাধারণভাবে বিচার করলে বলা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে এই সত্য সম্পর্কে ধারণা অস্ফুট আকারে ছিল। যাদের জীবন ধর্মবিমুখ তাদের কথা বাদ দিলেও সমকালের ইহুদী জীবনসংস্কারে লালিত হয়ে যারা ধর্মসাধনার নামে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের আড়ম্বরেই মেতে ছিল, তাদের হৃদয়ে ঐশী ভাবনা ভাগবতী প্রেরণা সম্পর্কে যথার্থ চেতনা জাগাবার জন্য যীশুকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিতে, আখ্যায়িকার পর আখ্যায়িকা বলে যেতে হয়েছে।

দুই

আচার্য শংকরের 'বিবেকচূড়ামণি'র একটি পরিচিত শ্লোক—

> দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
> মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবানের অনুগ্রহলাভের হেতুস্বরূপ এই তিনটি বিষয় দুর্লভ—মনুষ্যজন্মলাভ, মুক্তির ইচ্ছা আর মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ।—এ তিনের মধ্যে, মনে হয়, শেষের দুটির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। যথার্থ মুমুক্ষা থাকলে ঈশ্বরেচ্ছায় মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ ঘটে যায়। আবার মহাপুরুষের আশ্রয় পাওয়ার সৌভাগ্য হলেও অন্তরে মুক্তির বাসনা জাগে। অবশ্য ঐ আকাঙ্ক্ষা সাধারণত অস্ফুট আকারে থাকে। মহাপুরুষের একান্ত শরণাগত হলে অন্তরে শ্রীভগবানের করুণালাভের আকুতি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ভাগবত জীবন লাভের উপায়স্বরূপ যে সাধুসঙ্গ আর ব্যাকুলতার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন তা যেন আচার্য শংকরের এই উক্তিরই কালোপযোগী স্ফুটতর নির্দেশ। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

শ্যাম নটরাজ : (১৩৮৪), পৃঃ ২৮০+১০, মূল্য : পনেরো টাকা। **সঙ্গীতাঞ্জলি :** (১৩৮৬), পৃঃ ১০৮+১০, মূল্য : পাঁচ টাকা। বই দুটির লেখক শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এবং প্রকাশক মহালয়া প্রকাশনী, ১০৩ লেক টাউন, কলিকাতা-৭০০০৫৫।

বাংলার শ্যামল মৃত্তিকায় শ্যামসুন্দরের আরাধনার নৈবেদ্য রচনা হয়। আবার 'শস্য-শ্যামলাং মাতরম্' বলে মাতৃবন্দনারও মহাতীর্থ বঙ্গভূমি। শ্যাম ও শ্যামার অভেদ সাধনার কিংবা

সব-একাকার-করা মানবতার সাধনার প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম বঙ্গজননীর কোলে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত যেমন জেগে উঠেছিলেন তেমনি শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের ও রাধাকৃষ্ণ-কীর্তনের বন্যা-ধারায় বাংলার দিগ্‌দিগন্ত মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই হৃদয়ভরা ভক্তির আর অন্তরের আকুতির প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র ভাবে বাঙালী কবি-কুলের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে। রবীন্দ্র-অনুজ বহু কবির মধ্যেও সেই ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত দেখা যায়। করুণানিধান, কুমুদ-রঞ্জন বা কালিদাস রায়ের কথা স্বভাবতই আমাদের স্মরণে আসবে। সেই ধারারই কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়।

'শ্যাম নটরাজ' ও 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে স্বরচিত কবিতা ও গানের সংকলনে কবির প্রজ্ঞাদৃষ্টির আলোক আমাদের বিমুগ্ধ করে। 'শ্যাম নটরাজ' গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির নামও শ্যাম নটরাজ। সেই কবিতার প্রথমেই কবি উদ্ধৃতি দিয়েছেন মধুসূদন সরস্বতীর উক্তি—'কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।' কবির মনের মৌল চেতনাটিই এই বচনে বিচার্য। কবি বলছেন—

'শান্ত-সমাধি-শয়নে, হে বিরাট! একান্ত একাকী
কত কল্প নির্বিকল্প নিরন্তর নিস্তরঙ্গ থাকি
অবশেষে নিরঞ্জন রসাঞ্জনে নয়ন রঞ্জিয়া
উন্মীলিলে আঁখিপক্ষ্ম মহাশূন্যে দেখিলে চাহিয়া
প্রথম-উড্ডীন পক্ষী শূন্যে লক্ষি উড়ে যেইমত
সেইমত বোধ করি বিশ্বসৃষ্টি করিতে উদ্যত
করিলে ঈক্ষণ ক্ষেপ।' (পৃঃ ১)

এই বোধে উপনীত হয়েও কবি বলছেন—

'অপরূপ শ্যাম নটরাজ!
ঊর্ধ্বে নীল নিম্নে নীল,—নীলিমায় করিছ
বিরাজ,—
কভু অশ্রুভারাতুর শ্রাবণের শ্যামল জলদে
কভু বা কৌমুদীধৌত শরতের লাবণ্য-সম্পদে
ঊষীরে শিশির-নীরে নিষিক্ত শ্যামল শষ্পতৃণে
দূর্বাদল বিছাইয়া বাঁধিয়াছো আতিথ্যের ঋণে
পৃথিবীর প্রজাগণে।' (পৃঃ ৫)

আবার কবির শৈব চিন্তার কবিতা 'নটরাজ'। সেখানেও বলছেন—

'হে শ্যামসুন্দর বন্ধু!
অম্বর-চুম্বিত সিন্ধু নভোনীলে অবলীন
সিন্ধুনীলে রূপ মিলে মিতা—' (পৃঃ ৯)

কবির 'শ্যাম নটরাজ' সংকলনে অনেক ধারার ও অনেক ধাঁচের কবিতা গ্রথিত হয়েছে। তাঁর প্রকৃতিপ্রেমিক দৃষ্টিও অনেকস্থলেই পাঠকচিত্তে আলোড়ন তোলে। তিনি তারই মধ্যে শ্যাম-শোভা দেখেছেন। একটা চিরন্তন অনুভূতি।

'ভারত-সারথি' কবিতাটি এর মধ্যে অন্যভাব ও ভাবনায় অপূর্ব। কবি লিখছেন—

'এই ভারতের অতীত দিনের বল্গা ধরিল যারা
চক্রবর্তী মহারাজা কেউ মহারথী ন'ন তারা।
তা'রা বৈরাগী ঋষি তপস্বী সাধু ও সন্তজন
রাজা মহারাজা ভৃত্য যাঁদের পদানত হ'য়ে রন।'
(পৃঃ ২০২)

'সঙ্গীতাঞ্জলি' সংকলনে ছোট ও বড় বেশ কয়েকটি গানে কবির ভক্তিমানস ও সরস সামাজিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গাইছেন—

'কোলে তুলে মা দিলে দোল
আদরে হই ভাবে বিভোল
শেষের বেলা এই ক'রো মা
(যেন) মা-মা বলে ডেকে মরি।' (পৃঃ ৫)

গানে গানে ভক্তহৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্যকুসুমা-ঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে। ভাবের উত্তুঙ্গে যেমন তিনি ঐ সব গানে পৌছেছেন তেমনি হালকা চালের গানও অনেকগুলি রচনা করেছেন যার মধ্যে তাঁর রসিক হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তিনি সমাজজীবনের ক্ষয়-ক্ষতিকেও চিন্তা করেছেন।

কবির হাসির গানও কয়েকটি সংকলিত।

নানান সুরে নানান ভাবের গানের মধ্যে দুটি স্তোত্রসঙ্গীত রচিত দেখা যায়। একটি 'শ্রীশ্রীরাম-নামায়নম্' অপরটি 'শ্রীশ্রীশ্যামনামায়নম্'। দুটিই সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে রচিত—যে-কোনো আশ্রমিক গীতাঞ্জলির আগে বা পরে যথার্থই স্তোত্রসঙ্গীতরূপে সমাদৃত হবার মতো। রামগানের কয়েক ছত্র এইরকম—

'ব্রহ্মাক্ষর পরমেশ্বর রাম
অন্তর্যামী পরাৎপর রাম
নারায়ণ পুরুষোত্তম রাম
রাম রাম জয় সীতারাম।' (পৃঃ ৬১)

আবার শ্যামগান গাইছেন এইভাবে—

'জয় জয় ভুবনসুমঙ্গল নাম
নিত্যসুখপ্রদ চিন্ময় নাম।
পুরুষোত্তম পরমাশ্রয় নাম
হরে কৃষ্ণ জয় রাধে শ্যাম॥' (পৃঃ ১০৬)

প্রবীণ কবি ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁর একদিকে প্রজ্ঞান আরেকদিকে রসজ্ঞান। সব মিলিয়ে তাই 'শ্যাম নটরাজ' ও 'সঙ্গীতাঞ্জলি' জ্ঞান ও ভক্তি উভয় মার্গেরই সমন্বিত সুরবাহার। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করানোর মতোই মাধুর্যমণ্ডিত এবং যথেষ্টই উপভোগ্য

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

গৌরাঙ্গগতপ্রাণা গৌরী-মা : শ্রীসুহৃদ রুদ্র। **প্রকাশক :** শ্রীগৌরচন্দ্র হাজরা, সাধারণ সম্পাদক, সারদাপীঠ, ২৪ পরগণা। (১৩৮৬), পৃঃ ৭৩+৬, মূল্য : তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটির 'পূর্বাভাষ'-এ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যা গৌরী-মার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : 'একটা কিছু ঠিক ভাবে গড়ে তুলতে হ'লে যে উৎসাহ ও নিষ্ঠা এবং যে সংযম ও সেবা প্রয়োজন হয় মা'র মধ্যে তার প্রাচুর্য ছিল। সাধক নিজের চেষ্টায় ও গুরুর উপদেশে সিদ্ধিসোপানে আরোহণ করে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে পরিণামে তত্ত্বসাক্ষাৎকার করে তুলে ধন্য হয়—এ এক কথা ; কিন্তু স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জেনে গুরুমন্ত্রে নির্ভরশীল হয়ে সমাজের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা—আর এক কথা।' শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের যুগে যুগ-প্রয়োজনেই গৌরী-মার আবির্ভাব হয়। তিনি সাধনার অত্যুচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াও স্বীয় মুক্তির জন্য লালায়িত হন নাই। তিনি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত তথা গুরুমন্ত্রে নির্ভরশীল হইয়া তমিস্র যুগের অবহেলিত অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন—রান্নাঘরের চারি দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে চির-আবদ্ধ নারীসমাজের মুক্তির জন্য কতই-না অনলস সাধনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি : "গৌরী-মা তাঁর সকল কাজে এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমৃতময় কথা কয়টিকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কাজের ছলে যে কথা কয়টি বলেছিলেন তাতে গৌরী-মার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মযজ্ঞের ইঙ্গিতই ছিল। দক্ষিণেশ্বরে ফুলের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'গৌরদাসী, তুই কাদা চট্‌কা, আমি জল ঢালছি।' গৌরী-মার এই বিশ্বাস ছিল অটল যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জ্যান্ত জগদম্বার সেবার আদেশ করে গেছেন এবং এই সেবা কাজের সফলতার জন্য তাঁর ঠাকুর জল ঢালবেনই।" (পৃঃ ৪০) গৌরী-মার অটল বিশ্বাসই তাঁহার কর্মজীবনের সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি উত্তরণের মূল ভিত্তি।

গৌরী-মার দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অভেদ।

পথিক ব্রাহ্মণ (শ্রীরামকৃষ্ণ) গৌরী-মার বাল্য-

কালেই খেলার মাঠে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন: 'কৃষ্ণে তোমার ভক্তি হোক, মা।' (পৃঃ ১১) পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেই গৌরী-মার দীক্ষা হয়।

কিছুদিন পরে এক ব্রজরমণীর কাছ থেকে গৌরী-মা লাভ করেন একটি দামোদর-শিলা। এই শিলা কণ্ঠলগ্ন করিয়া, হাতঝোলার মধ্যে মা কালীর ও শ্রীগৌরাঙ্গের পট এবং গীতা-চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ লইয়া গৌরী-মা হিমালয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে ও ভারতের বহু তীর্থে সাধন-ভজন করেন।

একদা বলরাম বসুকে গৌরী-মা বলিয়াছিলেন: 'তোমার সাধুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) যদি ক্ষমতা থাকে, তবে তিনিই আমায় টেনে নিয়ে যান। তার আগে কিন্তু যাচ্ছি না আমি।' (পৃঃ ৪৩) লেখক পরে বলিতেছেন: "বুকের মধ্যে যেন কিছু একটা আটক হয়ে আছে। তাঁর মনে হ'ল, কে যেন ওঁর বুকে সুতো দিয়ে বেঁধে টানছেন অবিরত।... রাত্রি গভীর হ'ল।...কে এক আনন্দময় পুরুষ হঠাৎ অভিমানের সুরে বলে উঠলেন, 'কি রে! আমি না টেনে আনলে তুই নাকি আসবি না?'" (পৃঃ ৪৬)

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই গৌরী-মা আবিষ্কার করিয়াছিলেন জীবন্ত ভগবানকে। যিনি 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্', যিনি অসীম অনন্ত, পরব্রহ্ম, তিনিই দেহধারী জগৎ-পরিত্রাতারূপে দক্ষিণেশ্বরে বিরাজিত। আর নহবতখানায় বাসরতা শ্রীশ্রীমা নিখিল জগতের মূলাধার সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি, যিনি পরম নিষ্ঠাভরে ধর্মপথের সহায়িকারূপে নিত্য স্বামীসেবায় নিরতা,—তিনিই ছিলেন গৌরী-মার আরাধ্যা দেবী!—তাইতো স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইঁহারই সেবায় নিজেকে করেন উৎসর্গিত পরবর্তী কালে তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার আশীর্বাদধন্য 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' তাহারই ফলশ্রুতি। লেখক বলিতেছেন: 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের তিনি ছিলেন একাধারে প্রাণ ও প্রেরণা, পথ ও পথিক, প্রেম ও প্রত্যয়।... তাঁর আদর্শ হ'ল—মানবসেবাই মাধবসেবা।...ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরী-মাকে উচ্চ আধার জেনেই তাঁর মধ্যে করেছিলেন ঐশীশক্তির সঞ্চার।' (পৃঃ ৭৩)

লেখক অল্প পরিসরে পরমনিষ্ঠাসহকারে গৌরী-মার দিব্যজীবন সার্থকভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। বর্তমানে কাগজের দুর্মূল্যতা ও মুদ্রণের ব্যয়াধিক্য সত্ত্বেও সামান্যমাত্র মূল্যে গ্রন্থটির বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রকাশক ও লেখকের ভক্তমনেরই পরিচয়বাহী। আর্ট পেপারে ছাপা 'শ্রীগুরুর চরণযুগল' চিত্রটি ভাব-ব্যঞ্জনায় অপূর্ব ও পরবর্তী পৃষ্ঠায় গৌরী-মার চিত্রটিও সুমুদ্রিত। প্রচ্ছদে জগন্নাথমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গের পট অতি হৃদয়গ্রাহী। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। তবে গ্রন্থটির নামকরণে 'গৌরাঙ্গ-গতপ্রাণা' শব্দটি ব্যবহারে হয়তো কিছু পাঠক-পাঠিকা প্রথমে সংশয়ান্বিত হইতে পারেন। তবে আদ্যোপান্ত গ্রন্থপাঠে সে-সংশয় দূরীভূত হইবে। কারণ স্বয়ং গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক তিনি 'গৌরদাসী' নামে সম্বোধিতা। শ্রীশ্রীমা-ও তাঁহাকে ঐ নামে সম্বোধন করিতেন। গৌরী-মার কণ্ঠে সদা-সর্বদা যে দামোদর-শিলা ঝুলিত তাহাকে শ্রীশ্রীমা বলিতেন —'জামাই-ছেলে'। কারণ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ কাহারও ভাব নষ্ট করার বিরোধী ছিলেন। স্বামীজীর নিকট গৌরী-মা ছিলেন 'গৌর-মা'। সুতরাং, নামকরণটি সার্থক ও সুসংগত। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কাম্য।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে:

(ক) অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯৮০'র বন্যায়): শ্রীকাকুলাম জেলায় গৃহনির্মাণকার্য অব্যাহত।

(খ) গুজরাত (১৯৭৯'র মোরভির বন্যায়): গৃহনির্মাণকার্য অব্যাহত।

(গ) উড়িষ্যা—(১) (১৯৮০'র বন্যায়): গুমুপুরে গৃহনির্মাণকার্য সংগঠিত হইতেছে। (২) ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ: কেওঞ্ঝরগড়ে ত্রাণকার্য সমাপ্ত।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ—(১) আরামবাগ (হুগলী) (১৯৭৮-এর বন্যায়): 'সারদা বালিকা বিদ্যালয়'-ভবনের নির্মাণকার্য অব্যাহত। (২) মালদা (১৯৮০'র বন্যায়): ৮,৪১৪টি বন্যাবিধ্বস্ত পরিবারের সমীক্ষাকার্য সমাপ্ত।

(ঙ) তামিলনাড়ু খরাত্রাণ: নটরামপল্লীতে জলাভাব দূরীকরণের জন্য জলসরবরাহ-ব্যবস্থা অব্যাহত।

(চ) বিহার শরীফ দাঙ্গাত্রাণ: পাটনা আশ্রম কর্তৃক চারিটি দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার ১,৩০৫ জন দুর্গত মানুষের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরিত।

বাংলাদেশে:

দুইটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বস্ত্রাদি-বিতরণ, তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধ-বিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা (অ্যালোপ্যাথি) চলিতেছে।

নূতন ভবন

৮ই মে ১৯৮১, **নরেন্দ্রপুর** ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমির নূতন ভবনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি বলেন:

১৯৫৩ সালে যখন এই আশ্রম পাথুরিয়াঘাটায় ছিল, নরেন্দ্রপুরে আসেনি তখনই কার্যতঃ প্রতিবন্ধী বালকদের এই বিদ্যালয়টি শুরু হয়েছিল। একটি প্রতিবন্ধী ছেলেকে রাখা হয়। তাকে রাখবার সময় আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল, আমার বেশ মনে আছে। ছেলেটি খুব উন্নতি করেছিল। বিলাতেও গিয়েছিল।

তারপর নরেন্দ্রপুরে এই বিদ্যালয়টির অগ্রগতি হতে লাগল। আজকে এখানে ১৪৩টি ছাত্র আছে। এখানে যারা প্রতিবন্ধী আছে, তাদের শিক্ষা দিয়ে, তারা যাতে সমাজে কাজের মানুষ হতে পারে তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এখানে যারা প্রতিবন্ধী আছে, তারা তা হ'ত না, যদি ছেলেবেলায় ভাল খাওয়া-দাওয়া পেত, ওষুধপত্র পেত। ছেলেবেলায় পুষ্টির অভাবে, ওষুধের অভাবে অনেকে অন্ধ হয়ে যায়। আমাদের দেশে এটা সকলের জানা কথা।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী কাল না পরশু জেনিভাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা অনেক প্রকল্প করেন, যাতে অনগ্রসর শ্রেণী ও উপজাতি ওষুধ পায়, খাওয়া-দাওয়া পায়; যাতে অন্ধ না হয় তার জন্যে চেষ্টা করা হয়। প্রকল্প অনেক আছে, কোটি কোটি টাকাও মঞ্জুর করা হচ্ছে, কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় না।

প্রকল্প করলে হবে না, টাকা মঞ্জুর করলে হবে না, কাজ করবে কারা? আমরা। আমরা যদি উপযুক্ত লোক না হই, নিঃস্বার্থভাবে কাজ না করতে পারি, তাহলে কোন প্রকল্প সফল হতে পারে না। সব বড় বড় প্রকল্পের অবস্থা হচ্ছে এখন এ-রকম।

মানুষ নেই। মানুষের অভাব। মানুষ স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে। তাই বড় বড় প্রকল্প হ'লেও ঠিক ঠিক ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এটা সরকারের দোষ নয়, এটা আমাদেরই দোষ। আমরাই এইজন্য দায়ী কিন্তু এটা হচ্ছে কেন? —শিক্ষার অভাবে।

যে-শিক্ষা আমরা পাচ্ছি, সে-শিক্ষা থেকে ভাল লোক বের হ'তে পারে না। পূর্ব কালে এদেশে যে-শিক্ষা ছিল, তার সঙ্গে পরমার্থ বিদ্যাও ছিল। আমাদের আদর্শ ছিল অন্য রকম। সেই আদর্শ ছেড়ে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। জীবনের যে-আদর্শ তার সঙ্গে আমাদের শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা আর আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান মানুষের অভাব।

স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণ দেশে একটা জায়গায় একজন বলেছিলেন, 'স্বামীজী, আপনি রাজনীতিক হন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রে দিন। তারপরে সব কাজ হ'তে পারে।'

তার উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, 'দেখ, ভারতবর্ষকে স্বাধীন কালকেই ক'রে দিতে পারি, কিন্তু তোমরা সে-স্বাধীনতা রাখতে পারবে কি? তোমাদের মানুষ কোথায়? মানুষ আগে তৈরী কর।' খাঁটি কথা বলে গিয়েছেন স্বামীজী।

আজকে আমাদের এই দুর্দশা কেন? মানুষ নেই ব'লে। কেন মানুষ নেই? শিক্ষা একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে ব'লে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। সেটাই নেই। শুধু লেখাপড়া শিখলুম, বিজ্ঞানী হলুম, আকাশে উড়তে শিখলুম, চাঁদে গেলুম, এতে কোন লাভ নেই, যদি মনের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে, মানুষ যদি একেবারে জঙ্গলের জানোয়ার হয়ে যায়, তার কোনরকম মনুষ্যত্ব যদি না থাকে।

শিক্ষাকে আজ ঢেলে সাজাতে হবে। তবেই আশা আছে। স্বামীজী বলেছেন, 'Education is the manifestation of the perfection, already in man.' মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা আছে সেটাকে বের করার জন্যেই শিক্ষা। লেখাপড়া শেখা এক কথা আর শিক্ষিত হওয়া আর এক কথা। আমরা শিক্ষা এবং সাক্ষরতা—দুটিকে এক ক'রে ফেলেছি। Literacy is one thing and education is another. একজন খুব পণ্ডিত হ'তে পারে, কিন্তু তার মনুষ্যত্ব নাও থাকতে পারে। সেইজন্যে আমাদের যে-শিক্ষা, সে-শিক্ষা যদি আমরা ঢেলে না সাজাই, আমাদের কোন আশা নেই। মূল ভিত্তিটায় গোলমাল। মূল ভিত্তিটা যদি ঠিক না থাকে, কোনকিছুই হ'তে পারে না।

আমাদের মূল আদর্শ ছিল, ভগবানলাভ করতে হবে, মোক্ষলাভ করতে হবে। অপরা-বিদ্যা আর পরাবিদ্যা—দুয়েরই চর্চা করতে হবে। কিন্তু এখন শুধু অপরাবিদ্যার চর্চা হচ্ছে, পরাবিদ্যার কোন স্থান নেই। ফলও তেমনি হচ্ছে। যতক্ষণ না শিক্ষাব্যবস্থা বদলে যাচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের দেশের উন্নতির আশা করা বৃথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী এসেছেন, এঁদের কৃপায়, এঁদের আশীর্বাদে আমাদের মতিগতি বদলে যাক, যথার্থ শিক্ষার প্রবর্তন করা হোক—এই আমি কামনা করি। আর এই বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধীরা নানারকম শিক্ষা পেয়ে যাতে সমাজের উপযুক্ত মানুষ হ'তে পারে, যে-সব প্রতিবন্ধীরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তারাও যাতে শিক্ষার সুযোগ নিতে পারে, যাতে এই বিদ্যালয় আরও বড় হয়, তা-ও আমি তাঁদের কাছে কামনা করি।

এর পর শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেন:

এত সব মূল্যবান কথা শোনার পর,

আর শোনার কী আছে? আমি কী বলব! হ্যাঁ, আমি বলব, প্রতিবন্ধীদের জন্যে এই যে বিদ্যালয় হয়েছে এবং এর যে এত উন্নতি হয়েছে, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

যাদের দিকে লোকে ফিরেও চাইত না, বোঝা মনে করত, তাদের কিন্তু আজকাল দেখতে পাচ্ছি লেখাপড়া শিখতে এবং হাতেনাতে কাজকর্ম করতে। কলকারখানাতে দেখি আমাদের এখান থেকে সব ছেলেদের বেছে বেছে নিয়ে যায়, কাজ দিয়ে দেয়—যথেষ্ট টাকাও দেয়।

কাজেই এদের দিকে এখন মানুষ যে ফিরে তাকাচ্ছে, এরা যে এখন শিক্ষার গুণে নিজেরাই নিজেদের ভার নিচ্ছে, এমনকি একটা পরিবারেরও ভরণপোষণ করছে, এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এবং এদের উপরে যে দৃষ্টি পড়েছে সর্বসাধারণের, এটাই হচ্ছে শুভলক্ষণ।

রামহরিপুর কেন্দ্রের জেলা-স্কুলবোর্ড-পরিচালনাধীন জুনিয়ার বেসিক বিদ্যালয়টি নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলা-স্কুলপরিদর্শকের উপস্থিতিতে ২৯শে মার্চ ১৯৮১, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী উহার উদ্বোধন করেন। পরিত্যক্ত বিদ্যালয়-ভবনটিকে বর্তমানে প্রার্থনাকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

সুবর্ণজয়ন্তী

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি তাঁহাদের কেন্দ্রের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ৮ই মার্চ ১৯৮১, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব-দিবস হইতে শুরু করিয়া সারা বর্ষব্যাপী উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন।

জন্মজয়ন্তী

মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক ৮ই, ৯ই ও ১০ই মার্চ ১৯৮১, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ৮ই শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ ও ভজনগানের মধ্য দিয়া উৎসবের সূচনা হয়। বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগারতির পর প্রায় তিন হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী মহানন্দ। পরে শিবপুর প্রফুল্ল তীর্থের শিল্পিবৃন্দ 'নদের গোরা' গীতি-নাট্য পরিবেশন করেন। ৯ই সন্ধ্যায় শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী মহানন্দ। পরে শিবপুর প্রফুল্ল তীর্থ 'সাধক রামপ্রসাদ' গীতি-নাট্য পরিবেশন করেন। ১০ই সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ইহাতে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির ও শহরের অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, অগণিত ভক্ত নরনারী এবং আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ যোগদান করেন। সংগীত, জয়ধ্বনি ইত্যাদিতে শহরের পথগুলি মুখরিত হয়। অপরাহ্ণে নাটমন্দিরে শ্যামাসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীলক্ষ্মণ দাস বৈরাগ্য। সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন স্বামী মহানন্দ। পরে বাউলসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীলক্ষ্মণ দাস বৈরাগ্য। তাঁহার সহযোগী ছিলেন শ্রীঅরূপ ঘোষ ও শ্রীসুকুমার রায়। এই অনুষ্ঠানে তিন হাজারেরও অধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ৮ই হইতে ১১ই মার্চ ১৯৮১, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। চারিদিনের ধর্মসভায় মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দ, স্থানীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাসহ বিভিন্ন বক্তারা আধুনিক যুগসমস্যায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বাণীর গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীসত্যব্রত মাইতি প্রথমদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। শেষদিন প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমার ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ কাঁথি শহর

পরিক্রমা করেন। প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ যাত্রাগান, সংগীত, নাটক ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ, বরবড়িয়া দুর্বার সংঘ, বনমালীচটা হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ, বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল ও স্থানীয় কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিবিধ সংবাদ

সর্বভারতীয় বিশ্ব-ঐক্য সম্মেলন

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ত্রিচিনপল্লী বেতার কেন্দ্র হইতে সম্প্রচারিত একটি ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন: 'My third dream was a World Union, forming the outer basis of a fairer, brighter and nobler life for all mankind.' (14. 8. 47).

তদনুসারে পণ্ডিচেরীতে সর্বপ্রথম একটি বিশ্ব-ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সালের জুন মাসে (৭–৯ তারিখে) বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সর্বভারতীয় বিশ্ব-ঐক্য সম্মেলনে সমগ্র ভারত হইতে পাঁচশতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল শ্রীগোবিন্দনারায়ণ। 'Identification of Disintegrating Forces', 'Oneness of Mankind', 'Instrumentation' এবং 'The Programme for Work'—এই চারিটি শাখার সভানেত্রী ও সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ডক্টর রমা চৌধুরী, শ্রীতাণ্ডবেশ্বর, শ্রীনরসিংহ মূর্তি ও শ্রীগোবিন্দ রাও। বিশ্ব-ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর রমা চৌধুরী বলেন যে, একমাত্র আধ্যাত্মিক ভিত্তিতেই বিশ্বমানবের মধ্যে সাম্য ও ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে এবং বর্তমান যুগে সেই আধ্যাত্মিক ভিত্তি আমরা পাই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীসারদামণি দেবী ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে। তাঁহাদের প্রপঞ্চিত কর্মপরিণত বেদান্তই সকলকে সকলের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিতে শিক্ষা দেয় এবং সেই ভিত্তিতেই বিশ্বমানব প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

প্রধান বিচারপতি শ্রীশ্রীনিবাস রাও, আন্তর্জাতিক World Union-এর সভাপতি এবং কর্মসচিব শ্রীপ্যাটেল, ডক্টর লক্ষ্মীনারায়ণ, ডক্টর বর্মা, ডক্টর রাও, মহেশ্বর, স্বামী পূর্ণানন্দ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দেন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দাক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি হয়। ডক্টর রমা চৌধুরী বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'পল্লীকমলমে'র লোকসংগীত ও নৃত্য সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরলোকে

শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যধন্য ডাঃ চুনীলাল বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য সুরেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্মিণী সরযূবালা সেন গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ সজ্ঞানে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৭ বৎসর।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ সালে তাঁহার জন্ম। ১৯০১ সালে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে দীক্ষা দেন। ১৯২০ সালে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী সরযূবালা ও সুরেন্দ্রনাথকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন। সরযূবালা গৌরী-মা ও দুর্গা মার সান্নিধ্যেও আসেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য দুর্গাপ্রসন্ন মজুমদার বিগত ২১শে জুলাই ১৯৮০ অপরাহ্ণে আনুমানিক চার ঘটিকায় পরলোকগমন করেন।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪'০০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩'২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫'০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

আরত্রিক-স্তব—পৃঃ ৩১, মূল্য ১'০০

পুণ্যস্মৃতি— স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৬'০০

সৎকথা—পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'৫০

[illegible] — স্বামী নিখিলানন্দ [illegible]। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" [illegible]

শঙ্কর-চরিত — [illegible] ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬, মূল্য ২'৫

দশাবতার চরিত—৮ম সংস্করণ, পৃঃ ১০৮ মূল্য ৩'৭৫

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'৮০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬'২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা— শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩'৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪·০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১·৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪·৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩·৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩·৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬·০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭·০০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪·০০

সংস্কৃত

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮·০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫·০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১·০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১·০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮·৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ৯·২৫

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত

মূল্য: ১ম অধ্যায়, ৩য় খণ্ড ৪·০০, ৪র্থ খণ্ড ৩·০০; ২য় অধ্যায় ১৩·০০; ৩য় অধ্যায় ১৩·০০; ৪র্থ অধ্যায় ৯·০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২·০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২·০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০·০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮·০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩·০০।

ঘরে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩·৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪·০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

শ্রাবণ ১৩৮৮

৮৩তম বর্ষ

৭ম সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮৩তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৫৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৩৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৮৮

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও: বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬

সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই, মূল্য—২০৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ: অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। ...মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এযুগে বিরল;

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই—১৪৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা: বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদাহরণ।

ষষ্ঠ মুদ্রণ—দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬

মূল্য—১৪৲

সাধনা

দেশ: সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা...প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক...সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নবম সংস্করণ—১৫৲

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

৮৩তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

সকল মহাপুরুষেরই উপদেশ—অশুভের প্রতিরোধ করিও না, অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। আমরা সকলেই জানি, যদি আমরা কয়েকজনও এই নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, সমুদয় সমাজগঠন ভাঙিয়া পড়িবে, আমাদের সম্পত্তি দুষ্ট লোকের হস্তগত হইবে, আমাদের জীবনও তাহারাই পরিচালিত করিবে—আমাদের লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। মাত্র একটি দিন যদি এইরূপ 'অপ্রতিকার-নীতি' কার্যে পরিণত করা হয়, তবে সমাজ ধ্বংসের পথ ধরিবে। তথাপি আমরা বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে 'অপ্রতিকার'-রূপ উপদেশের সত্যতা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাকি। উহাকে আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কেবল ঐ মত প্রচার করিলে মানবজাতির এক বিরাট অংশকে নিন্দিত করা হয়। শুধু তাহাই নয়, উহাতে তাহাদের বোধ হইবে যে, তাহারা সর্বদাই অন্যায় করিতেছে এবং তাহাদের সকল কাজেই মনে বিবেকের সঙ্কোচ অনুভব করিবে। ইহা তাহাদের দুর্বল করিয়া দিবে, এবং অন্যান্য দুর্বলতা অপেক্ষা প্রতি-নিয়ত এইরূপ আত্মগ্লানি হইতে অধিকতর পাপ উদ্ভূত হইবে। যে ব্যক্তি নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অবনতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। জাতি সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য।···

কর্তব্য ও সদাচার অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। অন্যায়ের প্রতিকার করিলে সর্বক্ষেত্রেই যে অন্যায় করা হইল—তাহা নয়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই মানুষের কর্তব্য হইতে পারে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১।৫৩-৫৪]

কথাপ্রসঙ্গে

মনুসংহিতায় চিরকালের ধর্ম : ক্ষমা

মনূক্ত চিরকালের ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে 'ক্ষমা'। 'ক্ষমা' শব্দটি আমাদের অতি পরিচিত এবং ইহার অর্থও সুবিদিত। সুতরাং 'ক্ষমা'র আবার ব্যাখ্যা কী, আলোচনাই বা কী? —এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বস্তুতঃ 'ক্ষমা' বিষয়টি বেশ জটিল। এবং আমাদের মনে হয়, মনূক্ত দশটি ধর্মলক্ষণের মধ্যে সম্ভবতঃ 'ক্ষমা'ই সর্বাপেক্ষা জটিল লক্ষণ।

প্রথমতঃ আমরা মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকারগণ ক্ষমা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিব এবং পরে গীতাদি শাস্ত্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য অবলম্বনে বিষয়টির উপর আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইব।

আমাদের আলোচ্যমান শ্লোকটির (মনুসংহিতা, ৬।৯২) অন্তর্গত 'ক্ষমা' শব্দটির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন: 'ক্ষমা অপরাধ-মর্ষণম্; কস্মিংশ্চিৎ অপরাদ্ধরি প্রত্যুদ্বেজনানারম্ভঃ।' অর্থাৎ, ক্ষমা হইতেছে অপরাধ-সহন; কেহ অপরাধী হইলে (অপরাধ করিয়া অন্যের উদ্বেগের কারণ হইলে), তাহাকে পালটা উদ্বেগ দিতে শুরু না করা। কুল্লূক ভট্ট তাঁহার 'মন্বর্থমুক্তাবলী' টীকায় লিখিয়াছেন: 'পরেণ অপকারে কৃতে, তস্য প্রত্যপকারানাচরণং ক্ষমা।' অর্থাৎ, অন্যে অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার (পালটা অপকার) না করাই ক্ষমা। কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার 'চিরপ্রভা' টীকায় লিখিয়াছেন: 'ক্ষমা অপকারসহত্বম্।' অর্থাৎ, অপকার সহ্য করাই ক্ষমা।

কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যায় একটি কথা অনুক্ত থাকিয়া যায়। সেটি হইল এই যে, দণ্ডদানের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি তাহা না করিয়া অপকার সহ্য করা যায়, তবেই তাহা 'ক্ষমা'পদবাচ্য। এই কথাই কালিদাস রঘুবংশীয় রাজা দিলীপের গুণাবলীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: 'ক্ষমা শক্তৌ' (রঘুবংশ, ১।২২)। ভর্তৃহরিও ঐ একই কথা তাঁহার 'নীতিশতকে' লিখিয়াছেন: 'ক্ষমা প্রভবিতুঃ' (শ্লোক ৮২)—ক্ষমা ক্ষমতাবানেরই ভূষণ। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার 'কর্মযোগে' বিশদভাবে বলিয়াছেন: "একজন কোন অন্যায়ের প্রতিকার করে না, কারণ সে দুর্বল, অলস ও প্রতিকারে অক্ষম; প্রতিকারের ইচ্ছা নাই বলিয়া প্রতিকার করে না, তাহা নয়। আর একজন জানে, ইচ্ছা করিলে সে দুর্নিবার আঘাত হানিতে পারে, তথাপি সে শুধু যে আঘাত করে না—তাহা নয়, বরং শত্রুকে আশীর্বাদ করে। যে ব্যক্তি দুর্বলতা-বশতঃ 'প্রতিকার' করে না, সে পাপ করিতেছে; সুতরাং এই 'অপ্রতিকার' হইতে সে কোন সুফল অর্জন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি যদি প্রতিকার করে, তবে পাপ করিবে।... আগে সযত্নে বুঝিতে হইবে, প্রতিকার করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা। শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিকারচেষ্টা-শূন্য হই, তবে আমরা বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের কাজ করিতেছি; কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, এবং নিজেদের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি যে, আমরা অতি উচ্চ প্রেমের প্রেরণায় কার্য করিতেছি, তবে আমরা ঠিক উহার বিপরীত আচরণই করিতেছি।" (বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১।৫৪-৫৫)

'ক্ষমা' শব্দটি গীতায় তিনবার পাওয়া যায়—দশম অধ্যায়ে দুইবার (১০।৪, ৩৪) এবং ষোড়শ

অধ্যায়ে দৈবী সম্পদের প্রসঙ্গে একবার (১৬।৩)।[১] শেষোক্ত ক্ষেত্রে শংকরাচার্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন: 'ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা অন্তর্বিক্রিয়ানুৎপত্তিঃ।' অর্থাৎ, কেহ অবমাননা করিলে বা তাড়না করিলে মনের মধ্যে বিকার উৎপন্ন না হওয়াই ক্ষমা। সুতরাং শংকরাচার্যের ব্যাখ্যাতে আমরা ক্ষমা সম্বন্ধে এই তথ্য বা তত্ত্ব পাইলাম যে, ক্ষমা করিয়া যদি মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত ক্ষমা নহে। মহর্ষি মনুও একটি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেই জাগরিত হয় এবং সুখেই এই পৃথিবীতে বিচরণ করে, কিন্তু যে-ব্যক্তি অপমান করে, সে বিনষ্ট হয়।[২] বলা বাহুল্য, মনু নির্বিকার সেই আদর্শ মানুষের কথা বলিতেছেন, যথার্থ ক্ষমা যাঁহার ভূষণ। এই প্রসঙ্গে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা হইতে 'তিতিক্ষা'-বিষয়ক একটি উদ্ধৃতি দিতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হইবে, 'ক্ষমা'র আলোচনা চলিতেছে, অকস্মাৎ 'তিতিক্ষা'র প্রসঙ্গের অবতারণার প্রস্তাব কেন? এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। সুতরাং প্রথমেই 'তিতিক্ষা'র সহিত 'ক্ষমা'র সম্পর্ক কী, তাহা বলা প্রয়োজন।

'তিতিক্ষা' 'ক্ষমা' অপেক্ষা ব্যাপক

শংকরাচার্য লিখিয়াছেন: 'সহনং সর্বদুঃখানাম-প্রতীকারপূর্বকম্। চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥' (বিবেকচূড়ামণি, ২৪)। [প্রতিকার না করিয়া সকল দুঃখের চিন্তা-বিলাপহীন সহনই তিতিক্ষা বলিয়া কথিত হয়।]। দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক (শারীরিক ও মানসিক), আধিভৌতিক (মানুষ বা অন্য প্রাণী হইতে প্রাপ্ত) এবং আধিদৈবিক (দৈবদুর্বিপাক—ভূমিকম্প, বজ্রপাত, বন্যা, খরা ইত্যাদি)। তিতিক্ষার ক্ষেত্র এই ত্রিবিধ দুঃখ।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ: "সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নেই। সকলেরই সহ্যগুণ থাকা চাই। যেমন কামারবাড়ীর নাইয়ের ওপর কত জোর করে বড় বড় হাতুড়ি পেটে, তথাপি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, সেইরূপ কূটস্থবৎ বুদ্ধি থাকা চাই। যে যাই বলুক ও যে যাই করুক না কেন, সমুদয় সহ্য করে লবে। যে সয়, সেই রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটে—শ, ষ, স।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মনে হয়, সহজ সরল ভাবেই তিনটি 'স'-এর সাহায্যে সহ্যগুণের গুরুত্ব বুঝাইয়াছেন। কিন্তু টীকাভাষ্যকারগণের শাস্ত্র-ব্যাখ্যার প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি যে, 'সহ্য কর', 'সহ্য কর', 'সহ্য কর' বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখকেই সহ্য করিতে বলিতেছেন। ব্যাখ্যার তো শেষ নাই! যদি কোন ব্যাখ্যা কাহারও কাজে লাগে, তবেই উহার সার্থকতা; নতুবা উহার কোনই মূল্য নাই। সে যাহা হউক, পূর্ব প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া আমরা বলি, তিতিক্ষার ক্ষেত্র ত্রিবিধ দুঃখ হইলেও, ক্ষমার ক্ষেত্র কিন্তু আধিভৌতিক দুঃখেই সীমাবদ্ধ। সদানন্দযোগীন্দ্র-রচিত 'বেদান্তসারে' তিতিক্ষার সংজ্ঞা: 'শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা'। ইহার ব্যাখ্যায় রামতীর্থ তাঁহার 'বিদ্বন্মনোরঞ্জনী' টীকায় লিখিয়াছেন: " 'শীতোষ্ণাদি' ইতি 'আদি'-

---

১ 'ক্ষান্তি' শব্দটি গীতায় দুইবার পাওয়া যায়: ১৩।৭-এ উহাকে জ্ঞানের কুড়িটি সাধনের অন্যতম সাধন এবং ১৮।৪২-এ উহাকে ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম বলা হইয়াছে। 'ক্ষান্তি' ও 'ক্ষমা' সমানার্থক।

২ সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখং চ প্রতিবুধ্যতে। সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥ (২।১৬৩)

পদাৎ মানাপমান-লাভালাভ-শোকহর্ষাদিগ্রহঃ।" ['শীতোষ্ণাদি' শব্দটিতে 'আদি' শব্দ থাকায় মানাপমান, লাভালাভ, শোকহর্ষ প্রভৃতিও গ্রহণ করিতে হইবে।]। 'মানাপমান', 'লাভালাভ' ইত্যাদির উল্লেখ করায় 'ক্ষমা' তিতিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইল। সুতরাং 'ক্ষমা'র আলোচনায় 'তিতিক্ষা'-বিষয়ক উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক নহে।

এখন আমরা আমাদের প্রস্তাবিত স্বামী বিবেকানন্দের তিতিক্ষা-বিষয়ক কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা উপস্থাপিত করিতেছি। স্বামীজী বলিয়াছিলেন: 'সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ বলিতে যে অন্যায়ের অপ্রতিরোধ বুঝায়, তিতিক্ষা বলিতেও ঠিক তাহাই বুঝায়। বিষয়টি একটু পরিষ্কারভাবে বোঝানো দরকার। বাহ্যতঃ অন্যায়ের প্রতিরোধ না করিলেও আমরা অন্তরে অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করিতে পারি। কোন ব্যক্তি আমার প্রতি অত্যন্ত রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, সেজন্য বাহ্যতঃ তাহাকে ঘৃণা না করিতে পারি, তাহার কথার প্রত্যুত্তর না দিতে পারি এবং নিজেকে সংযত করিয়া আপাততঃ ক্রোধ প্রকাশ করিতে না পারি, তথাপি আমার অন্তরে ক্রোধ ও ঘৃণা থাকিতে পারে এবং আমি ঐ লোকটির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারি। ইহা আদর্শ অপ্রতিরোধ নয়। এই আদর্শানুসারে আমার মনেও কোন ঘৃণা অথবা ক্রোধের ভাব থাকা উচিত নয়, এমন কি প্রতিরোধের চিন্তাও নয়; আমার মন এত স্থির ও শান্ত থাকিবে যেন কিছুই ঘটে নাই। কেবল সেই অবস্থায় উপনীত হইলেই আমি অপ্রতিরোধ-অবস্থা প্রাপ্ত হই; ইহার পূর্বে নহে। দুঃখ প্রতিরোধ করিবার অথবা দূর করিবার চিন্তামাত্র না করিয়া, মনের মধ্যে কোন প্রকার দুঃখময় অনুভূতি বা অনুশোচনা না রাখিয়া সর্ববিধ দুঃখের যে সহন—তাহাই তিতিক্ষা।' (বাণী ও রচনা, ৩য় সং, ২।৩৮৪-৮৫)।

* * *

ক্ষমা তথা তিতিক্ষার যে উত্তুঙ্গ আদর্শ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিলাম, যুগে যুগে তাহা বিস্ময়করভাবে রূপায়িত হইয়াছে অবতার ও মহামানবগণের জীবনে। পৌরাণিক কাহিনীতেও এই রূপায়ণের অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ক্রুশবিদ্ধ অবতারপুরুষ যীশু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন: 'পিতা, এদের অপরাধ ক্ষমা কর—কারণ এরা জানে না এরা কি করছে।' ('Father, forgive them; for they know not what they do.'—St. Luke, 23 : 34)। কথিত আছে, মহাপুরুষেরা স্বয়ং অপরাধীদের ক্ষমা করিলেও ঈশ্বর অপরাধীদের ক্ষমা করেন না। যীশু স্বয়ং অপরাধীদের ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরও যাহাতে তাহাদের ক্ষমা করেন, সেইজন্যই ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে, যবন হইয়া হরিনাম গ্রহণ করাতে কাজীর বিচারে বাইশ বাজারে হরিদাসকে বেত্রাঘাত করা হয়। হরিদাস নির্বিকার চিত্তে শুধু যে সেই নিদারুণ নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন তাহা নহে, উপরন্তু প্রার্থনাও করিয়াছিলেন:

'এ সব জীবের কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সভার অপরাধ॥'

(আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়)

পৌরাণিক কাহিনীতেও আছে, প্রহ্লাদের স্তবে তুষ্ট শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে প্রহ্লাদ প্রথমতঃ কামনারাহিত্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং পরে হরি-দ্বেষী যে-পিতা তাঁহাকে নানাভাবে নির্যাতিত করিয়া বারংবার বধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে যাহাতে শ্রীভগবান ক্ষমা করিয়া পাপমুক্ত

করেন, সেই প্রার্থনাই করিয়াছিলেন।

(ভাগবত, ৭।১০।১৭)

ঠিক এই ধরনের না হইলেও ক্ষমার আরও দৃষ্টান্ত হিসাবে ভাগবতের ঋষভদেবের কাহিনী (৫।৫।৩০) এবং অবন্তিদেশীয় ব্রাহ্মণের কাহিনীও (১১।২৩।৪০-৪১) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ঋষভদেব যখন দুর্জনগণের দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াও তাহাদের ক্ষমা করিতেন, তখন তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। অবন্তিদেশীয় ব্রাহ্মণ যখন শান্তচিত্তে সর্ববিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া অপরাধীদের ক্ষমা করিতেন, তখন তিনিও যাবতীয় অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া ভিক্ষান্নে জীবন-যাত্রানির্বাহকারী সন্ন্যাসীই। ভগবান যীশু ও ভক্ত হরিদাসও প্রকৃতকল্পে সন্ন্যাসীই। বস্তুতঃ ক্ষমার যে উচ্চতম আদর্শ আমরা তাঁহাদের জীবনে বাস্তবায়িত হইতে দেখি, তাহা গৃহস্থদের জীবনে সম্ভব নহে বলিয়াই মনে হয়। আরও কথা এই যে, মনুপ্রমুখ শাস্ত্রকারগণ বলিতেছেন, গৃহস্থ অন্যায়ের প্রতিবিধান করিবেন। স্বামী বিবেকানন্দ এ-সম্বন্ধে তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। স্বামীজী লিখিয়াছেন: "শাস্ত্র বলছেন—তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং' ইত্যাদি। হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নেই—মনু বলেছেন।[৩]...ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় ক'রো না, অত্যাচার ক'রো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।" (বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৬।১৫৩-৫৪)।

এই উদ্ধৃতি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, গৃহস্থের জীবনে ক্ষমার স্থান একেবারেই নাই—ক্ষমা সন্ন্যাসীরই ধর্ম। লক্ষণীয়, স্বামীজী মনুসংহিতার 'আততায়িনম্ আয়ান্তং' উদ্ধৃত করিয়াছেন। আততায়ী কে?—যাহারা অন্যের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, অন্যকে বিষ দেয়, যাহারা হত্যা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করে, যাহারা ধনাপহারী, ভূমি-অপহারী ও দারাপহারী, তাহারাই আততায়ী।[৪] এই সকল গুরুতর অপরাধীদের সমুচিত দণ্ডবিধান করা গৃহস্থের ধর্ম—ইহাই স্বামীজীর বক্তব্য এবং এ-বিষয়ে স্বামীজী ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণও দিয়াছেন। সুতরাং গৃহস্থদেরও যে ক্ষমাগুণের অধিকারী হইতে হইবে—অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করিতে হইবে, অনেক ছোট-খাটো অন্যায়-অবিচার সহ্য করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা; 'সংসারী ফোঁস করবে', 'ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।' (কথামৃত, ২।৮।১)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই প্রসিদ্ধ গল্প—ব্রহ্মচারী ও সাপের কাহিনীও (তদেব, ১।১।৬) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।' কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা 'ফোঁস' করিতে দেখি। তাঁহার জীবনী হইতে এ-বিষয়ে বেশ

---

৩ গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন। মনুসংহিতা, ৮।৩৫০-৫১

৪ অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েত আততায়িনঃ॥
বসিষ্ঠ-সংহিতা, ৩।১৯

কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিস্তারভয়ে এখানে আমরা একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। স্বামীজী যখন প্রথমবার পাশ্চাত্য হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন জাহাজে দুইজন সহযাত্রী অকথ্য ভাষায় হিন্দুধর্মের নিন্দা করিতে থাকে। স্বামীজী "ধীর পদক্ষেপে একজনের নিকটে গিয়া অকস্মাৎ শক্ত করিয়া তাহার জামার কলার ধরিলেন এবং কৌতুকভরে অথচ দৃঢ়তাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'আবার আমার ধর্মের নিন্দা করলে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' ভীত মিশনরী তখন ভয়-কম্পিতদেহে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, 'মশায়, ছেড়ে দিন; আর কখনো এমন করব না।' ইহার পর তিনি কৃতাপরাধের দণ্ডস্বরূপ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই অত্যন্ত বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করিয়া তাঁহার বন্ধুত্বলাভে যত্নপর থাকিতেন।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় সং, ২।৩৪১-৪২)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক প্রশ্ন : স্বামীজী কি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ নিষেধ সমাজত্যাগী একক সন্ন্যাসীর জন্য, সমাজ-সচেতন—সমাজকে যাঁহারা 'মহামায়ার ছায়া' জানিয়া সম্মান দিতেছেন, সেবা করিতেছেন, সেই সকল সন্ন্যাসীদের জন্য নহে। আরও কথা এই যে, স্বামীজীর ন্যায় আধিকারিক আচার্য সর্ববিধ বিধি-নিষেধের পারে। সাধারণ জীবন্মুক্তও যখন বিধি-নিষেধের পারে, তখন স্বামীজী সম্বন্ধে আর কথা কি! [পরবর্তী সংখ্যায় 'দম' ও 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ']

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

৯

যোগাগ্নিপরীক্ষা

এবার আবার অসমসাহসিক অধ্যাত্মবিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ এই আবিষ্কারের সত্যতা পরীক্ষা করতে প্রজ্বালিত করলেন এমন এক যোগাগ্নি যাতে অবলীলায় নিজে স্বয়ং জ্ঞাতে ও সারদা হয়ত তাঁর অজ্ঞাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন।

এই যোগাগ্নির লেলিহান স্বর্ণ-জিহ্বার রঙের স্পর্শে পঞ্চবটীর সবুজ পাতাগুলি আবার শিহরিত হয়ে উঠল। সীতার সম্পূর্ণ এক অন্যপ্রকার অগ্নিপরীক্ষার পর ভারতভূমিতে এমন পূতাগ্নি যোগাগ্নি আর কেউ প্রজ্বালিত করেন নি, যাতে স্বয়ং আনন্দময়ীকে অনুপ্রবিষ্ট হতে হল ও তৎসঙ্গে যুগাবতারকেও।

এ দিব্যলীলার কিঞ্চিৎ অনুধ্যান না করে সারদা-মহিমার ধারণা করা অসম্ভব ও একই কারণে রামকৃষ্ণ-মহিমার অবধারণা করাও সম্ভব নয়।

একটি রাতের দিব্য ঘটনা। শয্যাসঙ্গিনী সারদা পার্শ্বে নিদ্রিতা। ধর্মবিজ্ঞানী অতিসাহসী গবেষক রামকৃষ্ণ আপন মনকে সম্বোধন করে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন :

> "মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়; সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে

একখানা রাখিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও তো এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, গ্রহণ কর "[১৭]

এরূপ বিচারপূর্বক ঠাকুর সারদার অঙ্গ স্পর্শ করতে উদ্যত হওয়া মাত্র কুণ্ঠিত হয়ে সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হয়ে গেলেন যে সে রাত্রিতে আর সাধারণ ভূমিতে অবতরণ করা সম্ভব হল না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করিয়ে পরদিন বহু যত্নে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করান হয়েছিল।

এইরূপে মাসের পর মাস অতীত হয়ে ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতিক্রান্ত হল; তবু এই অশ্রুতপূর্ব দাম্পত্যজীবনে সংযমের বাঁধ ভাঙল না। এককণের জন্যও প্রেয়সের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা দেহের সুখ কামনা করলেন না।

একি শুধু রামকৃষ্ণের তপোবলে সম্ভব হয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাব কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর নিজেই দিয়েছিলেন :

"ও (শ্রীসারদা) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম, 'মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে'—ওর সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।"[১৮]

১০

ষোড়শীপূজার জ্যোতির্ভাস্বর তাৎপর্য

এই অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে গিয়ে ঠাকুর যখন নিজের দিব্যভাবভূমিতে ব্রহ্মভাবে সুস্থিত, নিম্ন ভাবান্তরে অবতরণের অক্ষমতা ও পবিত্রতাস্বরূপিণী সারদার স্ফুটনোন্মুখ মহাশক্তিময়ী দেবীত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হলেন, তখন "শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে তাঁহার প্রাণে একটি অদ্ভুত বাসনার উদয় হইল এবং কিছু মাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি উহা কার্যে পরিণত করিলেন।"

"শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে", শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ-প্রণেতার এই কথাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁর জন্য ভবতারিণী ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে আটকে রেখেছিলেন, তাঁর দিব্য মহিমার প্রকাশ ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনও হয়ত অনুভব করেছিলেন।

ঠাকুরের এই "অদ্ভুত বাসনার পূর্তি" হল, তাঁর পরিণীতা ব্রহ্মচারিণী সারদাকে ত্রিপুরসুন্দরী ষোড়শীরূপে শাস্ত্রবিহিত ষোড়শোপচারে পূজা করে।

৫ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অমাবস্যার কৃষ্ণা-নিশায় ফলহারিণী-কালিকাপূজার রাত্রিতে ঠাকুর শ্রীসারদাকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা করে এই অপূর্ব যে পূজাটি করেছিলেন তাতে যেমন শ্রীমায়ের গুরুগম্ভীর মহিমা চিরতরে মন্ত্রিত হয়েছিল অন্য কিছুতে তেমন হতে পারত না।

জগদম্বা ভবতারিণীর মন্দিরে ফলহারিণী-কালীপূজার বিশেষ সমারোহ। হৃদয়রাম পূজা করতে গেলেন।

এদিকে ঠাকুরের ঘরেও তাঁর ইঙ্গিতে জনান্তিকে বিশেষ পূজার আয়োজন হয়েছে। বহুদিন পূর্বে ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজা উঠে গিয়ে থাকলেও আজ তিনি আবার পূজারীর আসনে সমাসীন হয়েছেন। তাঁর আহ্বানে শ্রীসারদা আলিম্পনভূষিত দেবীর পীঠে অর্ধবাহ্যদশায় সমাসীনা। কলসের মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চনে যথা-বিধানে শ্রীমাকে বার বার অভিষিক্ত করে, মন্ত্র শ্রবণ করিয়ে ঠাকুর প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন :

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৩৬২ ১৮ তদেব, পৃঃ ৩৬৪

"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীসারদা দেবীর) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর !"

অতঃপর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে যথাবিধানানুযায়ী ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা করে ভোগ নৈবেদ্য নিবেদন করলেন ও স্বহস্তে দেবীর মুখে ভোগাংশ প্রদান করলেন। ভাবস্থা দেবী সে ভোগ গ্রহণান্তর সম্পূর্ণ সমাধিস্থা হলেন। অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে ঠাকুরও সমাধিস্থ হলেন। দেবী সমাধিস্থা, পূজারী সমাধিস্থ।

ভবতারিণী একরূপে মন্দিরে পূজা গ্রহণ করছিলেন, অন্যরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে। দেবীর যে যুগপৎ দুই আবির্ভাব সে রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে সংঘটিত হয়েছিল, সেই আবির্ভাবে চিরপ্রতিষ্ঠিতা হয়ে শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে 'সরু', রামচন্দ্রের দুহিতা 'সারদা' হলেন, সকল জীবের চিরকালের 'শ্রীমা'—দেবী-মানবী, মানবী-দেবী।

ঐ মহানিশার দ্বিপ্রহর গত হয়েছে। আত্মারাম শ্রীঠাকুর পুনঃ অর্ধবাহ্যদশায় প্রত্যাবর্তন করে দেবীকে এখন আত্মনিবেদন করলেন। অনন্তর আপনার সহিত, সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীর পাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তাঁকে প্রণাম করলেন :

"হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিবমোহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।"[১৯]

এ যে কার পূজা কে করলেন সে সম্বন্ধে পুঁথিতে লিখিত হয়েছে—

"মা না হোলে মহাশক্তি কার হেন গায়ে শক্তি,
লইবেন শ্রীপ্রভুর পূজা।
প্রভু যে পরমেশ্বর, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর,
সর্বেশ্বর সকলের রাজা॥
প্রভু সঙ্গে এইবার, জগমাতা অবতার,
সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।
কৃপাময়ী কলেবরে, করুণার ধারা ঝরে,
শান্তিমূর্তি মঙ্গলরূপিণী॥"[২০]

পূজা শেষ হল। মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হল—তাঁর দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করল।

পুঁথির ভাষায় :

"এ পূজা পূজার ইতি, আর দেবদেবী মূর্তি,
কভু না পূজিলা পরমেশ।
যেন পূজা শ্রীশ্রীমার, পরম চরম সার,
পরিণাম সকলের শেষ॥"[২১]

ঐ মহারাত্রিতে মানুষের ধর্মের ইতিহাসে এমন একটি সার্থক, বহুমুখী আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা-ভূয়িষ্ঠ, সাধনযজ্ঞ ও সিদ্ধির অভিযান সূচিত হয়ে রইল যে তার ফলশ্রুতি যুগযুগান্তর ধরে অত্যাশ্চর্য-ভাবে ফলিত হতে থাকবে পৃথিবীর যত্রতত্র।

এই সব হল যেন অনাগত দিনের কথা, যদিও ইতিমধ্যে সেই সব অনেক অনাগত দিন বস্তুসমৃদ্ধ হয়ে বিগত হয়ে-হয়ে চলেছে।

সেই রাত্রিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য আপ্তকাম জীবনে পূর্বে উল্লিখিত তিনটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োজন সিদ্ধ হল :

১. ঠাকুরের সকল আধ্যাত্মিক সিদ্ধির

১৯ তদেব, পৃঃ ৩৬৭
২০ অক্ষয়কুমার সেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭২, পৃঃ ১৮২
২১ তদেব, পৃঃ ১৮২

প্রামাণিকতা চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠ হল।

২. তাঁর পূর্ণতার পূর্ণাহুতি দেওয়া হল।

৩. তাঁর প্রামাণিক সিদ্ধি ও পূর্ণাহুতি-সার্থক পূর্ণতা অনাগত কালের মর্মখাতে পাবনী ধর্ম-গঙ্গারূপে প্রবাহিত করে দেওয়া হল।

শ্রীমায়ের সম্ভাব্য দেবীত্ব অবতারপূজিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে রইল, যদিও দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিতা শ্রীমা অতঃপর অতি-আত্ম-অসচেতন মানবীত্বে বিরাজমানা থেকেও দেবীর কাজ অবলীলায় করে চললেন। তিনি যে শুধু সকলের আকাশের চাঁদামামাকে অতি-নিজস্ব নিজঅঙ্গনবিহারী চাঁদামামারূপে পেলেন, তিনি যে শুধু শ্রীঠাকুরের সকল উপদেশ আপন আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে সংহৃত করে নিলেন তাই নয়, তিনি অবতারবরিষ্ঠ রামকৃষ্ণের শাস্ত্রানুগ আনুষ্ঠানিক পূজা পরিপাক করে, ইতিপূর্বে রামকৃষ্ণদৃষ্টিতে দৃশ্যমানা "মা আনন্দময়ী", এখন সত্যি সত্যি আনন্দময়ী হয়ে জগতে বিহার করতে থাকলেন।

সম্ভবতঃ ষোড়শীপূজার মহারাত্রিতে যখন দেবী সারদা ও পূজারী রামকৃষ্ণ উভয়ে পূজাকালে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন, তখনই শ্রীমা অনুভূতিতে এই তত্ত্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন: "যেই ঠাকুর সেই আমি।"[২২], যে তত্ত্ব তিনি পরবর্তী কালে ১৩২৩ সালের ৩০শে চৈত্রের পত্রে কোন ভক্তকে লিখেছিলেন।

এ সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে দুটি কথা মা বলেছিলেন। "স্বামী কেশবানন্দ শ্রীমায়ের মুখে ঠাকুরের কথা শুনিতে শুনিতে যেমন আক্ষেপ করিলেন যে, ঠাকুর জগতে অবতীর্ণ হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাঁহার দর্শন পাইলেন না, অমনি শ্রীমা নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন, 'এর ভিতর তিনি সূক্ষ্মদেহে আছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন, 'আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।' "[২৩]

নিজেকে সামান্যতার এমন বিভ্রান্তকারী মায়াবৃতা করে শ্রীমা আমাদের গৃহাঙ্গনে এমন আটপৌরে ভাবে হয়ত জীবনযাপন করে চলে যেতেন যে, মুনিঋষিরাও তাঁর আত্মস্বরূপ ধারণা করতে সমর্থ হতেন না, যদি না "শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে" ষোড়শীপূজার মাধ্যমে ঠাকুর তাঁর দেবীত্ব প্রকট করতেন। যদিও ষোড়শীপূজা সম্বন্ধে ভক্তগণ বহুদিন পরে অবহিত হয়েছিলেন, তবু ভবতারিণী তো আর আমাদের মত কালকের জন্য আজকে কাজ করেন না। তিনি কালের ভাঁজে ভাঁজে করা-কাজ সাজিয়ে-সাজিয়ে রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বললেন: আমি তো সব মেরেই রেখেছি। তুমি এখন শুধু অস্ত্র-টস্ত্র একটু ছোঁড়। নিমিত্তমাত্র হও।

কথাটা হচ্ছে এই, ভবতারিণীর ইচ্ছায় ঠাকুর কিভাবে শ্রীমায়ের দেবীত্ব প্রকট করতেন তা 'তত্ত্বতঃ' বোঝা যাবে না। "যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি", এটি ঠাকুরের মুখের কথা ছিল না, এটি ছিল তাঁর মজ্জার অভিব্যক্তি।

এমনি ভাবে গোলাপ-মাকে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন: "ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"[২৪] অন্য সময়ে বলেছিলেন: "জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!"[২৫]

[ক্রমশঃ]

২২ স্বামী গম্ভীরানন্দ, শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪৮৯
২৩ তদেব, পৃঃ ৪৮৯　　২৪ তদেব, পৃঃ ১২৭　　২৫ তদেব, পৃঃ ১২৭

'আবার আসিবে'

'শ্রীম'

হেরিলাম অপূর্ব মূরতি, যবে
প্রথম রাজীবপদ করি দরশন।
ধন্য রাণী! ধন্য দেবালয় তব! একি
সচল প্রতিমা হেথা করে বিচরণ!!
কোথা হতে আসিলা এ মানুষ-রতন!
হায়! প্রেমে মাতোয়ারা দুটি আঁখি
সদা হাসিতেছে বদন-কমল!
পঞ্চমবর্ষীয় বালক যেমতি
থাকে সদা আনন্দেতে ভোর!
দেব কি মানব বুঝা ভার;
যেন এ মর্তের নাহি হবে; কিন্তু
আপনার কেহ হবে; নহে প্রথম দর্শনে
কেন প্রাণ টানে! মিটিল গো আজি
প্রাণের সে তৃষা, পূরিল বা বুঝি
এতদিনে জীবন-সমস্যা; গেল দূরে
কি আশ্চর্য! অন্ধকার হৃদয়ের;
সার্থক হইল বুঝি মানব-জনম
পরশে পরশমণি।
ভাবিলাম কে হে তুমি হৃদয়রঞ্জন,
প্রেম নয়নের তারা! কেমনে যাইব
ফিরি ঘরে! তুমি ছাড়া ঘর কোথা আছে?
ফিরে যেতে হবে ভেবে বুক ফাটে।
হে অন্তরযামী! মম ব্যথা সকল জানিলে
হাসিলে অপূর্ব হাসি; মনপ্রাণ করিলা শীতল।
নীরব থাকিলে কতক্ষণ, ভাবিলে দাসের তরে;
কহিলে, 'আবার আসিবে।'

* শ্রীঅনিল গুপ্তের সৌজন্যে

দাও দেখা পুনঃ

শ্রীবীণাপাণি ভট্টাচার্য

[গান]

তোমারি চরণে শ্রীরামকৃষ্ণ
আমারে আজি সঁপিতে চাই।
আভাসে হৃদয়ে জাগ ক্ষণে ক্ষণে,
নয়ন-সমুখে দেখিতে না পাই।
ধন্য হয়েছে কামারপুকুর,
লভিয়া তোমারে প্রেমের ঠাকুর,
গৃহী ও সন্ন্যাসী পেয়েছে যে কৃপা
জগতে তাহার তুলনা নাই।
এসো মা সারদা
ভক্তজননী,
ব্যথিতের প্রাণে
শান্তি দায়িনী,
ব্যাকুল এ হিয়া বারে বারে চায়
দাও দেখা পুনঃ দোঁহে এ ধরায়
শিব ও শিবানী হেরি এক সাথে
তৃষিত এ দুটি নয়ন জুড়াই॥

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূর্ব সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৮৮) বলা হয়েছে যে, বলদেবের মতানুসারে ব্রহ্মের সপ্তবিধ প্রধান গুণের মধ্যে শেষ ও সর্বপ্রধান গুণ হ'ল 'সৌন্দর্য'। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানের 'সৌন্দর্য' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছিল। এই সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ও ছান্দোগ্যোপনিষদের কথা আমরা একটু চিন্তা ক'রে দেখতে পারি।

এই উভয় উপনিষদেই 'মধুবিদ্যা' শীর্ষক অধ্যায়টি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে এরূপ 'মধুবিদ্যা' প্রপঞ্চিত করা হয়েছে বিস্তৃতভাবে তার নিজেরই মূলীভূত তত্ত্বানুসারে (২।৫।১-১৯)।

এস্থলেও উপনিষদের মূল সুরটি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে পূর্ণতম মহিমায় গরিমায় মধুরিমায়—সেই প্রাচীনতম প্রধানতম প্রকৃষ্টতম তত্ত্ব—

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১৪।১)

'সব কিছুই ব্রহ্ম।'

সেজন্য, বৃহদারণ্যকোপনিষদেও বলা হয়েছে স্থির বিশ্বাসভরে, ধীর উপলব্ধিসহকারে, গভীর আনন্দসঞ্চারে যে, সেই পরম মধুময়, পরম সুধাঘন, পরম রসস্বরূপ, পরম আনন্দনির্ঝর, পরম অমৃত-প্রবাহ পরমেশ্বর স্বয়ং জগতের সর্বত্র, এবং জীবের অন্তঃস্থলে পরিণত, লীলায়িত, রূপায়িত হয়েছেন সানন্দে সাদরে সাগ্রহে, সানুগ্রহে। অতএব এই চিরসুন্দর চিরমধুর—পরমদেবতারই অনন্ত সৌন্দর্য, অসীম মাধুর্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, জীব-জগতে সর্বত্রই সর্বদাই প্রতিফলিত শাশ্বতকাল।

এই কারণেই, বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'মধুবিদ্যা' আরম্ভ করা হয়েছে এইভাবে—

'ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং, শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৫।১)

'এই পৃথিবী সমুদয় ভূতের মধু; সর্বভূতও এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, এবং এই দেহে যে তেজোময়, অমৃতময় শারীর পুরুষ—এই (উভয় পুরুষই) তা, এই আত্মা যা। এই ত অমৃত, এই ত ব্রহ্ম, এই ত সমুদয় বস্তু।'

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকোপনিষদে সর্বসমেত চোদ্দবার ঠিক এই একই মন্ত্র অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধে। যথা—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য (সূর্য), দিক্‌সমূহ, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন, আকাশ, ধর্ম, সত্য, মানবজাতি ও আত্মা।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৫।১-১৪)

প্রভেদ এইমাত্র যে, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে, অর্থ

বোঝাবার জন্য একটি বিশেষ, ক্ষেত্রোপযোগী বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। যথা—

(১) পৃথিবীর ক্ষেত্রে—
'শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ

(২) জলের ক্ষেত্রে—
'রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(৩) অগ্নির ক্ষেত্রে—
'বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(৪) বায়ুর ক্ষেত্রে—
'প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(৫) আদিত্যের ক্ষেত্রে—
'চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(৬) দিক্‌সমূহের ক্ষেত্রে—
'শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(৭) চন্দ্রের ক্ষেত্রে—
'মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(৮) বিদ্যুতের ক্ষেত্রে—
'তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(৯) মেঘগর্জনের ক্ষেত্রে—
'শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ

(১০) আকাশের ক্ষেত্রে—
'হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(১১) ধর্মের ক্ষেত্রে—
'ধার্মস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(১২) সত্যের ক্ষেত্রে—
'সাত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(১৩) মনুষ্যজাতির ক্ষেত্রে—
'মানুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ।'

(১৪) আত্মার ক্ষেত্রে—
'আত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ

এস্থলে বলদেব-প্রপঞ্চিত পরম সৌন্দর্যশালী পরব্রহ্মের মধুময় রূপ সর্বত্র, অন্তরে বাহিরে, দর্শন ক'রে সাধক ধন্যাতিধন্য হচ্ছেন।

বস্তুতঃ, ভারতীয় ধর্ম-দর্শনানুসারে সৌন্দর্য, মাধুর্য, মধু, সুধা, রস, আনন্দ, অমৃত, প্রেম (বৈষ্ণববেদান্তের সংযোজন) প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায় সমার্থক। সেজন্য, ব্রহ্মের মধু যখন সর্বত্র সিঞ্চিত, তখন তাঁর সৌন্দর্যও সমভাবে সর্বত্র উদ্‌ভাসিত, নিঃসন্দেহে।

এই প্রসঙ্গে প্রথম অতি সুন্দর মন্ত্রটিই ধরুন। এস্থলে বলা হচ্ছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে মধু আছে, তা উভয়তঃ প্রসারী। অর্থাৎ, পৃথিবী সর্বভূতের মধুরূপে সর্বভূতকে মধুময় ক'রে তুলছে। সর্বভূতও একইভাবে পৃথিবীর মধুরূপে পৃথিবীকেও মধুময় ক'রে তুলছে। এস্থলে অংশী হ'ল পৃথিবী, ও তার অংশসমূহ হ'ল ভূতসমূহ; এবং অংশী ও অংশ উভয়ই সমানভাবে মধু। সেজন্য, অংশী অংশকে, অংশ অংশীকে সমানভাবে মধুময় ক'রে তুলছে।

এস্থলে এই কথা বিশেষ ক'রে বলবার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, অংশী স্বতন্ত্রভাবে কোন একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন নয়; কিন্তু অংশসমূহের সমাহার হ'লে তবেই অংশী সেই বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হয়। একইভাবে স্বতন্ত্র অংশসমূহও স্বতন্ত্রভাবে কোন একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন না হতে পারে—সকল অংশের সমাহার হ'লেই তা হতে পারে। কিন্তু এস্থলে পৃথিবীর মধুময়ত্ব দ্বিগুণ—অংশীরূপে নিজের দিক থেকে; অংশরূপে ভূতসমূহের দিক থেকে। এই মধুরতম তত্ত্বটিকে বোঝাবার জন্যই এইভাবে অংশী ও অংশসমূহের মধুময়ত্ব স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

সর্বাপেক্ষা অধিক মধুময় তত্ত্ব এই হ'ল যে, বাইরে অংশী পৃথিবীতে যেমন রয়েছে মধু, এবং অংশ ভূতসমূহেও সমভাবে, ঠিক তেমনি অন্তরে দেহের মধ্যেও ঠিক সেই একই মধু একইভাবে প্রবাহিত অহরহ সেই একই আনন্দভরে।

পরিশেষে, সর্বাপেক্ষা অধিক মধুময় তত্ত্ব এই

যে, সেই পৃথিবীর, সেই ভূতসমূহের, সেই প্রাকৃতিক দেহের অন্তঃস্থিত মধুরসঘন যে আত্মা, সেই আত্মাই আমাদেরও অতি নিজস্ব আত্মা ; এবং সেই আত্মাই স্বয়ং পরব্রহ্ম।

অতএব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই আদ্যোপান্ত, শাশ্বতকাল মধুময়, সুধাঘন, রসস্বরূপ, আনন্দ-নির্ঝর, অমৃতপ্রবাহ, প্রেমবিগ্রহ (বৈষ্ণববেদান্তের সংযোজনা)।

এই কারণেই, ভক্তিবাদী অথচ আবেগোচ্ছ্বাস-দমনকারী বলদেবও বলেছেন যে, পরমেশ্বরের প্রধানতম গুণাবলীর মধ্যেও প্রধানতম গুণ যে 'সৌন্দর্য', তার প্রমাণ আমরা চোখ মেললেই তথাকথিত জড়-মর জগৎ ও মর জীবের মধ্যেই সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করি। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য, জড়-মর জগৎ ষড়্‌বিকারাধীন—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, জরা ও মরণের অধীন। সমভাবে, মর জীবও ষড়্‌রিপুশাসিত—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের বশীভূত। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যেও কি আমরা দেখি না এক অপূর্ব সৌন্দর্য—সূর্যের দীপ্তিতে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, বায়ুর স্নিগ্ধতায়, আকাশের নীলিমায়, নদীর শীতলতায়, কুসুমের পেলবতায়, বিহগগানের সুমিষ্টতায় ; এবং মনের সততায়, চিত্তের উদারতায়, হৃদয়ের আনন্দে ? সংসারে নিশ্চয়ই দুঃখ আছে, শোক আছে, নীচতা আছে, নিষ্ঠুরতা আছে, অন্যায় আছে, অবিচার আছে, অত্যাচার আছে। কিন্তু তাহলেও সব ছাপিয়ে আছে সুখ, আছে শান্তি, আছে তৃপ্তি ; এবং সর্বোপরি, জীবনধারণের জন্য প্রবল ইচ্ছা।—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !'

(রবীন্দ্রনাথ—'প্রাণ'—কড়ি ও কোমল)

উপনিষদের ঋষিরাও স্থিরবিশ্বাসভরে বলেছেন—

'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ।
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৭)

'কেই বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতেন, কেই বা প্রাণধারণ করতেন, যদি এই আকাশে সেই আনন্দ না থাকত ?'

সেজন্য, শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে আনন্দ, রয়েছে সৌন্দর্য, রয়েছে রস, সুধা, মধু, অমৃত।

এই কারণেই, বলদেবও বেছে নিয়েছেন 'সৌন্দর্য'কে শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ গুণ, শ্রেষ্ঠ রূপ, শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও শ্রেষ্ঠ পরিণামরূপে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'মধুবিদ্যা'র পরে আরেকটি সর্বজনপ্রিয় মধুমন্ত্র আছে, যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৬।৩।৬) যার অর্থ ফলতঃ এই যে, ধরণীর আকাশে বাতাসে নদীতে বৃক্ষলতায় ওষধিতে দিনে রাত্রে সূর্যে চন্দ্রে পশুপক্ষীতে, এমন কি, প্রতি ধূলিকণায় মধু ক্ষরিত হচ্ছে অহরহ।

বলদেব এবং অন্যান্য বৈদান্তিক তথা ভারতীয় দার্শনিকদের মতানুসারে এরূপ 'মধু'ই পরমসুন্দর পরমেশ্বরের অনন্ত-অসীম সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রতীক।

ছান্দোগ্যোপনিষদের 'মধুবিদ্যা'তেও এরূপ মধু বা সৌন্দর্যের বিষয় অতি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে অন্য উপায়ে (৩।১।১—৩।১১।৬)।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর-বাহিরের কয়েকটি বস্তুকে স্বতন্ত্রভাবে মধুময় ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদে একই বস্তু বা আদিত্যকে নানাভাবে মধুমণ্ডিত ব'লে বন্দনা করা হয়েছে। যেমন, প্রথমেই বলা হয়েছে—

'অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু' প্রভৃতি (৩।১।১)

'ঐ আদিত্যই দেবগণের মধু। দ্যুলোক তার বক্রাকার বংশ। অন্তরিক্ষই মধুচক্র। কিরণ-

সমূহই ভ্রমরের পুত্রগণ ॥'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১।১-২)

এস্থলে সেই একই আদিত্য বা সূর্য পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চতুর্দিকেই তার সুবর্ণ কিরণমালার মাধ্যমে 'মধু' বর্ষিত করছে; এবং সেই মধুই 'অমৃত'।

এই প্রসঙ্গে উপমা-রূপকের মাধ্যমে অন্যান্য বহু কথা বলা হয়েছে, যা এস্থলে প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু মূল কথা সেই একই, যা এই 'মধুবিদ্যা'র পরিশেষে বলা হয়েছে—

'অথ তত উর্ধ্ব উদেত্য নৈবোদেতা নাস্ত-মেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা তদেষ শ্লোকঃ— ॥

'ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণা।
ইতি ॥

'ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১১।১-৩)

'তারপর যখন সূর্য উর্ধ্ব দিকে উদিত হবেন, তখন তিনি আর উদিতও হবেন না, অস্তও যাবেন না—একাকীই মধ্যস্থলে অবস্থান করবেন।

'এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—

'নিশ্চয়ই নয়—সেখানে উদিতও হননি, অস্তও যাননি। হে দেবগণ! এই সত্যের দ্বারা আমি যেন ব্রহ্মলাভে সমর্থ হই।

'যিনি ব্রহ্মোপনিষদকে এরূপে জানেন, তাঁর পক্ষে সূর্য উদিতও হন না, অস্তও যান না; তাঁর পক্ষে সর্বদাই দিবা।'

তারপর এই 'মধুবিদ্যা' যে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গুহ্য তত্ত্ব, যা অনধিকারীর নিকট প্রকাশযোগ্য নয়, সে কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা হচ্ছে, হয়ত এই কারণে যে, এর ফলে যাকে রামানুজ-বেদান্তে বলা হয়েছে, 'অনুদ্ধর্ষে'র অভাবজনিত দোষ, তার উদয় হতে পারে।

রামানুজ তাঁর সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শ্রীভাষ্যে'র প্রারম্ভে (১।১।১), চিত্তশুদ্ধিকে মোক্ষপথের, অথবা জ্ঞান ও ভক্তির প্রারম্ভিক শর্তরূপে ঘোষণা করেছেন অন্যান্য বৈদান্তিক ও ভারতীয় দার্শনিকগণের সঙ্গে এক সুরতানলয়ে; যেহেতু মলিন দর্পণে যেরূপ জ্যোতির্ময় সূর্যের প্রদীপ্ত কিরণও প্রতিফলিত হতে পারে না, সেরূপ মলিন অশুদ্ধ চিত্তেও জ্ঞান ও ভক্তির আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে না। সেজন্য, চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের নিমিত্ত রামানুজ 'সপ্তসাধনে'র উল্লেখ করেছেন। যথা—'বিবেক' অথবা অশুদ্ধ পানাহার বর্জন; 'বিমোক' অথবা কামনাভাব; 'অভ্যাস' অথবা দুঃসাধ্য সাধনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুশীলন; 'ক্রিয়া' অথবা দেবযজ্ঞ-পিতৃযজ্ঞ-ব্রহ্মযজ্ঞ-নৃযজ্ঞ-ভূতযজ্ঞরূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠান (মনুস্মৃতি ৩।৭০); অথবা, দেবগণের অর্চনা; পিতৃপুরুষগণের অর্চনা; অধ্যয়ন-অধ্যাপনা; সকল মানবের সেবা; সকল ভূত অথবা পশুপক্ষিকীটপতঙ্গবৃক্ষলতাদি সকল প্রাণী সমেত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেবা; 'কল্যাণ' অথবা সত্য আর্জব (সরলতা) দয়া দান অহিংসা ও অনভিধ্যা (পরদ্রব্যে নির্লোভতা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গুণ; 'অনবসাদ' অথবা অতি-নৈরাশ্য বা অতি-অবিশ্বাসের (over-pessimism-এর) অভাব; এবং 'অনুদ্ধর্ষ' অথবা অতি-সন্তোষ ও অতি-বিশ্বাসের (over-optimism-এর) অভাব।

এক্ষেত্রে, এই অত্যাশ্চর্য অচিন্তনীয় 'মধুবিদ্যা' হয়ত উপযুক্ত-উপলব্ধিহীন বিচারবুদ্ধিহীন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে,—তাঁর মনে অতি-সন্তোষের উদ্রেক ক'রে—যে, মধুময় পরব্রহ্ম যখন আছেন, তখন আর স্বতন্ত্র সাধনাদির ও মোক্ষপ্রচেষ্টার কোনোরূপ প্রয়োজন নেই একেবারে।

সে যাহোক, ছান্দোগ্যোপনিষদের 'মধুবিদ্যা'র

পরিশেষে এইভাবে বলা হয়েছে—

'প্রথমে ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতিকে (বিরাট্‌কে) এই 'মধুবিদ্যা' সম্বন্ধে বলেছিলেন। তারপরে প্রজাপতি (বিরাট্) মনুকে ; মনু নিজ সন্তানগণ (ইক্ষ্বাকু প্রভৃতিকে); এবং পিতা অরুণ জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্দালক আরুণিকে এই ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বলেছিলেন (অর্থাৎ শিক্ষাদান করেছিলেন)।

'এই ব্রহ্মবিদ্যা পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে অথবা গুরু যোগ্য শিষ্যকে বলবেন (অর্থাৎ উপদেশ দেবেন)।

'অন্য কাকেও বলবেন না—যদি এঁকে (গুরুকে) সমুদ্রবেষ্টিতা বা সসাগরা ধনপূর্ণা পৃথিবী কেউ দান করেন, তাহলেও নয় ; যেহেতু এই মধুবিদ্যাই এ সমুদয় অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ—এই ব্রহ্মবিদ্যাই এ সমুদয় অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১১।৪-৬)

এইভাবে, ছান্দোগ্যোপনিষদের সুপ্রসিদ্ধ 'মধুবিদ্যা'র মতেও সেই একই পরমমধুময় পরমদেবতার মধুই সর্বত্র নিরন্তর ক্ষরিত হচ্ছে জীবজগতে পূর্ণতম গৌরবে। পূর্বেই যা বলা হ'ল —বৈষ্ণব বৈদান্তিকেরা এই 'মধু'কেই সানন্দে সশ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছেন সেই পরমসুন্দর পরমমধুর প্রাণপ্রতিম জনের স্বরূপের স্বরূপভূত সৌন্দর্য-মাধুর্যের নিত্যোৎসারিত নির্ঝররূপে। সেজন্য, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মার সৌন্দর্য-মাধুর্যের উল্লেখমাত্রও না থাকলেও, বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ তাঁদের প্রাণপ্রিয় এই সৌন্দর্য-মাধুর্য-তত্ত্বকে অবৈদিক ও অনৌপনিষদিক ব'লে গ্রহণ করতে কোনোক্রমেই সম্মত নন। সেজন্যই, তাঁরা 'মধুবিদ্যা'র 'মধু'কে এরূপ সযত্নে তাঁদের দর্শনশাস্ত্রের মূলীভূত যে সৌন্দর্য-মাধুর্য-তত্ত্ব, তারই একটি সুন্দরতম সরলতম দ্যোতক ব'লে গ্রহণ করেছেন বহু ভক্তজনের প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ ক'রে।

বৈষ্ণববেদান্ত-দর্শনে এইভাবে জ্ঞানের মাধুর্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, জ্ঞানের পশ্চাতে রয়েছে বহু জটিল চিন্তা-ভাবনা, বহু তিক্ত বাদানুবাদ, বহু শুষ্ক আলোচনা-প্রপঞ্চনা প্রভৃতি, যাদের মধ্যে স্বভাবতই মাধুর্যের কোনো আস্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু সব মিলিয়ে, সব ছাপিয়ে যখন একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।২।১), সেই এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই একাধারে 'সত্য' ও 'সৌন্দর্য'রূপে সর্বত্র বিলসিত, তখন সেই জ্ঞানের মাধুর্যের তুলনা কোথায়? কারণ, তখন জ্ঞানীর মন থেকে পূর্ববর্তী সমস্ত কঠিনতা তিক্ততা শুষ্কতা প্রভৃতি অবলুপ্ত হয়ে যায়, এবং তাঁর সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এক নির্মল-নিরুপম সৌন্দর্যানুভূতিতে ; এক স্থির-ধীর রসোপলব্ধিতে ; এক শান্ত-স্নিগ্ধ আনন্দাস্বাদনে। সেজন্য, প্রকৃষ্ট ভক্তিবাদী হয়েও এবং শেষ পর্যন্ত, জ্ঞানের দিক থেকে নিজের অজ্ঞতা সবিনয়ে স্বীকারপূর্বক 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে'র নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ ক'রেও বলদেব সর্বদাই জ্ঞানের মাধুর্য সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কারণ, তিনি জানতেন যে, জ্ঞানের মাধুর্য নিয়ে আরম্ভ না করলে, ভক্তির মাধুর্যে উপনীত হওয়া যায় না, যার পরেই কেবল আসতে পারে কর্মের মাধুর্য। [ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রাহ্ম আন্দোলন

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়*

ব্রাহ্ম আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায়, তথা ভারতবর্ষে, প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত উল্লেখযোগ্য ধর্ম-আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবর্তক মনীষী রাজা রামমোহন রায় [১৭৭৪-১৮৩৩] ভারতে আধুনিক যুগের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচিত হন। রামমোহন যে বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমকালীন বহু প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রবিৎ, যথা সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, শঙ্কর শাস্ত্রী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহনের নিকট শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হন।[১] খ্রীষ্টধর্মেও রামমোহনের ব্যুৎপত্তি এত গভীর ছিল যে শ্রীরামপুরের পাদ্রী কেরী ও মার্শম্যান সাহেব তাঁর সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দেন।[২] কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস ও বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও রামমোহন সাধু, মহাত্মা, ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষ বা ভারতীয় অর্থে ধর্ম-প্রবর্তক ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অনুধাবন করলেই এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। রামমোহন নিজেও নানাভাবে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় হিন্দুদের সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি ও তাদের রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করা। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর **Translation of An Abridgement of The Vedant** বই-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন যে হিন্দুদের মূর্তিপূজার আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি তাদের সমাজ-বিন্যাসকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।[৩] তাঁর ধারণা হয়েছিল যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা, বহু দেবদেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের স্বীকৃতি হিন্দু-সমাজের নানা কুসংস্কার ও দুর্নীতির জন্য মূলত দায়ী। মূর্তি-প্রতীকে উপাসনার প্রকৃত অর্থ হিন্দুসমাজের অতি সামান্যসংখ্যক লোকই উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করতেন, সাধারণ লোকেরা বিনা বিচারে তাই গ্রহণ করত, এবং আপন উদরপূর্তির জন্য এই পুরোহিতকুল নানা লৌকিক কুসংস্কার এবং নীতিবোধবিরহিত সামাজিক অনুষ্ঠানকে ধর্মের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হতেন না।[৪] এঁদের কার্যকলাপের ফলেই হিন্দুধর্ম এক প্রাণহীন আচার-সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়েছিল। মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি এই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানলেও লোকাচার লঙ্ঘনের সাহস বা প্রবৃত্তি তাঁদের ছিল না। তা ছাড়া হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথাও তাদের সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে তাদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটতে দেয় নি। তাই ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিদেশী বন্ধুকে লেখা চিঠিতে রামমোহন বলেছেন, 'It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.'[৫] এই কারণে রামমোহন হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র বেদান্ত বা উপনিষদের অনুবাদ করে তাঁর দেশবাসীকে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করে [১৮২৮] শিক্ষিত হিন্দুদের নিরাকার একেশ্বর উপাসনা বা ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করেছিলেন। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম উপাসনার

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

বেদপাঠের অধিকার সম্ভবত শুধু ব্রাহ্মণদেরই ছিল,[৬] কিন্তু অন্য কোনভাবে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এতে স্বীকৃত হয় নি, পুরোহিতদেরও এতে কোন ভূমিকা ছিল না। ধর্ম-সংস্কারের পাশাপাশি রামমোহন সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনেও লিপ্ত হয়েছিলেন। সতীদাহ-নিরোধ এবং নানাভাবে হিন্দুসমাজে নারীর ক্লেশমোচন এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠানগত-ভাবে এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে জড়িত না হলেও রামমোহনের অনুগামীরাই ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে এ আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন।[৭]

রামমোহনের যুগ হতেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই দ্বিমুখী ধারা প্রবাহিত ছিল। ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার দুই ব্যাপারেই ব্রাহ্মদের উৎসাহ লক্ষিত হত। তার কারণ ব্রাহ্মধর্ম ছিল মূলত সামাজিক ধর্ম, অধ্যাত্ম-সাধনার প্রেরণা এখানে ছিল গৌণ। তবে কোন কোন ব্রাহ্ম নেতার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল, সমাজ-সংস্কারের চেয়েও ধর্মজীবনে উন্নতিকে তাঁরা বেশী গুরুত্ব দিতেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রধান নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের [১৮১৭-১৯০৫] মধ্যেই আমরা ধর্মভাবের এই বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। রাম-মোহনের বিলাত-যাত্রার পরবর্তী বারো বৎসরে [১৮৩১-৪৩] ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কোনরকমে সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার কাজ চালিয়ে গেলেও খুব অল্পসংখ্যক লোকই এই উপাসনায় যোগ দিতেন, এবং যাঁরা যোগ দিতেন তাঁরাও বিশেষ ধর্মভাবে ভাবিত ছিলেন বলে মনে হয় না।[৮] দেবেন্দ্রনাথ এই অবস্থায় সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়ে [১৮৪৩] একে একটি সুসংবদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠীর রূপ দান করেন। উপনিষদ্ হতে শ্লোক সঙ্কলন করে দুই খণ্ডে ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ রচিত হয় [১৮৪৮-৪৯], সমাজের সভ্যদের বিবাহাদি অনুষ্ঠানের জন্য পৌত্তলিকতার ভাব সম্পূর্ণ বর্জন করে নতুন ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সঙ্কলিত হয়, এবং খ্রীষ্টধর্মের মতো ব্রাহ্মধর্মের বহুল প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন প্রচারকও নিয়োগ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ব্রাহ্ম ভাবধারা প্রচারের ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।[৯] সমাজ-সংস্কারের তুলনায় ব্রহ্মোপাসনাকে অধিক গুরুত্ব দিলেও দেবেন্দ্রনাথ প্রথমোক্ত বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হিসাবে প্রথম দিকে তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আপন উপবীত ত্যাগ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের সকল আচার্য ও উপাচার্যই উপবীত ত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১০] অনুজপ্রতিম রাজনারায়ণ বসুকে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন।[১১] পরবর্তী কালে অবশ্য মহর্ষি সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে কিছুটা রক্ষণশীল হয়ে পড়েন, এবং ব্রাহ্ম সমাজ যাতে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের গণ্ডীর বাইরে চলে না যায় সে বিষয়ে যত্নবান হন।[১২]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রাহ্ম সমাজে কেশবচন্দ্র সেন [১৮৩৮-৮৪] যোগদান করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সমাজের একজন সক্রিয় কর্মীরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। ধর্মজীবন যাপনে এবং ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রচারে তাঁর গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে মহর্ষি তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কেশবচন্দ্র সত্যই সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্ম সমাজের ৫৪টি শাখা প্রতিষ্ঠিত

হয়, এবং সুদূর মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবেও ব্রাহ্ম আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।[১৩] প্রথম দিকে কেশবচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারক রূপটিই বেশী প্রকটিত হয়েছিল। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে সমাজের আচার্যদের উপবীত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় [১৮৬১] এবং সমাজে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন হয় [১৮৬৪]। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় মহিলারা প্রকাশ্যে যোগ দিতে আরম্ভ করেন ও স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের বিষয়েও কেশবের অনুগামীরা উদ্যোগী হন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে কেশবচন্দ্র ভারত-সংস্কার-সভা স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচলন এই সভার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানত মহিলাদের জন্যই 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে একটি বাংলা পত্রিকাও প্রকাশ করা হয় উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায়।[১৪] সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে কেশবের অতিরিক্ত আগ্রহ কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করতে পারে নি। ফলে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, সমাজের আচার্যদের পক্ষে উপবীত ত্যাগ আবশ্যিক কিনা এই প্রশ্নে ব্রাহ্ম সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশব ও তাঁর অনুগামীরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[১৫] দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত আদি ব্রাহ্ম সমাজ রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের মিলন-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকেও কেশব ও তাঁর অনুগামীরা অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহের প্রচলন এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসারের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান, এবং প্রধানত তাঁদেরই উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিন নম্বর আইনের (Act III of 1872) সাহায্যে অহিন্দু ও অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের দৃষ্টিতে সিদ্ধ হয়।[১৬] কৌলীন্যপ্রথা ও বাল্যবিবাহ নিবারণের ব্যাপারেও কেশবের অনুগামীরা উদ্যোগী হন। কিন্তু ঐ সত্তরের দশকেই ধীরে ধীরে কেশবের অধ্যাত্মজীবন গভীরতা লাভ করে এবং তাঁর এই আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের [১৮৩৬-৮৬] সঙ্গে তাঁর মিলন ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়ীতে কেশবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।[১৭] এর পূর্বেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে ধ্যানরত অবস্থায় দেখেছিলেন, এবং তাঁর মনে হয়েছিল যে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্ম উপাসকদের মধ্যে কেশবের ধ্যানই গভীরতা লাভ করেছে।[১৮] কিন্তু সে সময় কেশবের সঙ্গে তাঁর কোন বাক্যালাপ হয় নি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নিজে উদ্যোগী হয়ে কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন ধর্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক রূপে কেশবের খ্যাতি শুধু ভারতের সর্বত্র নয়, তার বাইরেও বিস্তার লাভ করেছে। বাংলা দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের কাছে কেশব তখন এক বিরাট আদর্শ হিসাবে বিরাজমান। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ তখনো এক অখ্যাত সাধক, যাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় কিছু সাধু-সন্ন্যাসী, সনাতনপন্থী পণ্ডিত ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সংশ্লিষ্ট কিছু ভক্ত ছাড়া আর কেউই বিশেষ পান নি।[১৯] সম্পূর্ণ নিরক্ষর না হলেও কেশবের তুলনায় তাঁকে অশিক্ষিতই বলা চলে, অবশ্য প্রচলিত অর্থে। যে বাচনভঙ্গীতে তিনি বাক্যালাপ করতেন তা-ও অপেক্ষাকৃত অমার্জিত। কিন্তু প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের চিত্ত জয় করলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে এক নতুন যুগের এখানে সূচনা হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে যে শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট করেছিলেন তা হচ্ছে আসলে তাঁর অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক প্রভাব। এই প্রভাব তিনি অর্জন

করেছিলেন দ্বাদশ বৎসরব্যাপী দীর্ঘ ও সুকঠিন সাধনার মাধ্যমে [১৮৫৫-৬৭], যার তুলনা পৃথিবীর যে কোন দেশ ও কালেই ছিল দুর্লভ। এই সাধনার অবসানে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি ঈশ্বরাবতার বা আধিকারিক পুরুষ, এবং তাঁর অদৃষ্টপূর্ব সাধনা আধ্যাত্মিক রাজ্যে নতুন আলোকপাত এবং জীবের কল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়েছে।[২০] সাধনার সময় আধ্যাত্মিক রাজ্যের যে সব সত্যগুলি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেগুলি সংসারী জীবের কল্যাণের জন্য তাদের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজনও তিনি অনুভব করে-ছিলেন, এবং সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমে কেশব, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমকালীন বাঙালী চিন্তানায়কদের সংস্পর্শে আসেন[২১], এবং পরে নিজের এক অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী গড়ে তোলেন, যার মধ্যে গৃহী ও ত্যাগী দুই-এর উপস্থিতিই আমরা লক্ষ্য করি [যদিও শেষোক্তরাই যে তাঁর বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই]। কেশবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে একদিনেই এই সংযোগের অবসান হয় নি, এবং এই সংযোগের মাধ্যমে পরবর্তী কালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আরও বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন, এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন।

বেলঘরিয়ার বাগানবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-বিষয়ক আলোচনা শুনে কেশবচন্দ্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও কেশবকে বলেন যে, তিনি আধ্যাত্মিক বিকাশের যে স্তরে পৌঁছিয়েছেন তাতে তাঁর মন ইচ্ছা করলে সংসারে থাকতে পারে, আবার তা সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে।[২২] এই প্রথম সন্দর্শনের পর কেশব তাঁর কয়েকজন অনুগামীকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য, এবং পরে তিনি নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের জন্য সদলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যেতে আরম্ভ করেন। ক্রমে উভয়ের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, একে অন্যকে কয়েকদিন দেখতে না পেলেই বিচলিত বোধ করতেন। কেশব দক্ষিণেশ্বরে না এলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কলকাতায় কেশবের বাড়ী 'কমল কুটিরে' এসে উপস্থিত হতেন। এ ছাড়া প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের সময় কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রাহ্ম মন্দিরে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতেন, অথবা নিজে কয়েকজন অনুগামীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ঈশ্বর-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করতেন। কখনো কখনো তিনি ঐ উপলক্ষে সদলবলে স্টীমারে চড়ে কীর্তন করতে করতে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হতেন, এবং পরমহংসদেবকে স্টীমারে তুলে নিয়ে তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনতে শুনতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করতেন।[২৩] লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে বাগ্মী কেশব কখনো ধর্মবিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ বা নিজের ভাব প্রচারের চেষ্টা করতেন না। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম পত্রিকা 'ধর্মতত্ত্বে'র সাক্ষ্যই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার কিছু দিন পরে [১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬] 'ধর্মতত্ত্ব' লিখছে, 'পরম ধার্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্যায় কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীত ভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সকল কথা শ্রবণ করিতেন। কোনদিন কোনরূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না।'[২৪] কেশবের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজের আরো অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও অমৃতলাল বসুর নাম বিশেষ স্মরণীয়। কেশব শুধু ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আবদ্ধ রাখতে

চান নি। 'সুলভ সমাচার', **The Indian Mirror, Theistic Quarterly Review** প্রভৃতি পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী ও উপদেশাবলী প্রকাশ করে কেশব শিক্ষিত বাঙালী সমাজের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের পরিচয় ঘটিয়ে দেন।[২৫] শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি-সংগ্রহ প্রথম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ হতেই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় [জানুআরি, ১৮৭৮]।[২৬]

কালে কেশবের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরে। সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে কেশবের উৎসাহে মন্দা দেখা দেয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ভিতরেই ভারত-সংস্কার-সভার অকাল-মৃত্যু ঘটে এবং কেশবের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয়েরও একই পরিণাম দেখা যায়।[২৭] স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে কেশবের মতামত কারো কারো কাছে রক্ষণশীল মনে হয়। তা ছাড়া ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালনার ব্যাপারে কেশব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ করছেন, এই অভিযোগও শোনা যায়। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহার বিবাহের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সমাজের মধ্যে তুমুল ঝড় ওঠে, এবং কেশব তাঁর নিজের স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করে অংশত পৌত্তলিক মতে কুচবিহারের নাবালক মহারাজার সঙ্গে নিজের অপ্রাপ্তবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় তাঁর অনুগামীদের একাংশ তাঁকে পরিত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন [মে, ১৮৭৮]। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই নতুন সমাজে যোগ দেন।[২৮] শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু কেশবের এই চরম সঙ্কটের দিনে তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি, বরং সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে বলেছিলেন যে, গৃহী কেশব ধর্ম লঙ্ঘন না করে কন্যার প্রতি পিতার কর্তব্য পালন করেছেন মাত্র, এতে অন্যায়ের কিছু নেই।[২৯] কেশব এর পর নববিধান সমাজ স্থাপন করে নানা ধর্ম সমন্বয়ের এক অভিনব প্রচেষ্টা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে এই সমাজের উপাসনাতেও যোগ দিতেন। তিনি ব্রাহ্ম মন্দিরে উপস্থিত হলে কেশব কখনো কখনো তাঁর উপদেশ দান বন্ধ রেখে বেদী থেকে নেমে এসে বিশিষ্ট অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতেন।[৩০] কেশবের শেষ অসুখের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন, এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে কেশব দেহরক্ষা করলে তিনি বলেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে যেন তাঁর একটি অঙ্গ পক্ষাঘাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।[৩১] অপর দিকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণের যোগাযোগ দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ সমাজের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন এবং তাঁরা উভয়েই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন। বিজয়-কৃষ্ণ ও তাঁর একান্ত অনুগামীরা পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করে সাকারোপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হলে শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত কমিয়ে দেন, এবং এর পর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব হতে অনেকটা মুক্ত হয়ে সমাজ-সংস্কার এবং স্বদেশসেবার কাজে প্রধানত নিজেকে নিযুক্ত রাখে। শিবনাথের শেষোক্ত আচরণ সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখেছেন যে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন সদস্য নরেন্দ্রনাথ [পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ] শিবনাথকে তাঁর আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি নাকি বলেছিলেন যে দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘনঘন যাতায়াত করলে তাঁর দেখাদেখি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্য সকলেও তাই করবে এবং পরিণামে সমাজই ভেঙ্গে যাবে।[৩২] শিবনাথ নিজে কিন্তু লিখেছেন যে, তিনি প্রধানত দুটি কারণে দক্ষিণেশ্বরে ঘনঘন

যাতায়াত বন্ধ করে দেন,—প্রথম কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কিছু অভিনেতার ঘনিষ্ঠতা, যাঁদের শিবনাথ দুশ্চরিত্র বলেই মনে করতেন, এবং দ্বিতীয় কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্যের তাঁর প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপের প্রবণতা।[৩৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ সমকালীন ব্রাহ্ম নেতাদের কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের উপর তিনি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন কিনা, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জাগে। ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে এসেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম বুঝতে পারেন তাঁর শিক্ষিত দেশবাসীর উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাবধারার প্রভাব কতটা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তিনি দেখেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের নায়কেরা অনেকেই তাঁদের জীবনে সমাজ-সংস্কারকে মুখ্য এবং অধ্যাত্ম-সাধনাকে গৌণ উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[৩৪] ধর্ম বলতে তাঁরা প্রধানত সামাজিক জীবন যাপনের আদর্শ রীতিনীতিকেই বোঝেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ছিলেন মুখ্যত সাধক, ঈশ্বরোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধিকেই তিনি জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনাবৃত্তের কেন্দ্রে ছিলেন ঈশ্বর, পরিধিতে মনুষ্যসমাজ; আর ব্রাহ্ম নেতাদের ভাবনাবৃত্তের কেন্দ্রে ছিল মনুষ্যসমাজ, পরিধিতে ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জগৎ ছিল ব্রহ্মময়, আর ব্রাহ্ম নেতাদের কাছে ব্রহ্ম ছিলেন দূরস্থ আরাধ্য পুরুষ। যাই হোক, ব্রাহ্ম সমাজের যে সব ব্যক্তির মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি যথার্থ সাধনানুরাগ জাগ্রত করার চেষ্টা করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চলতে তাঁদের উৎসাহিত করেন। তবে তিনি জানতেন যে, তাঁর সব উপদেশ ভোগবাসনাযুক্ত ব্রাহ্ম নেতাদের কাছে রুচিকর হবে না, তাঁরা সেগুলি ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি যা হয় বললাম, তোমরা ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে নিও।' ব্রাহ্ম সমাজের নিরাকার উপাসনার ভাবকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কাঁচা নিরাকার' ভাব বলে বর্ণনা করতেন। ঈশ্বরকে সাকার বলে বর্ণনা করলে যেমন তাঁর উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়, নিরাকার কিন্তু সগুণ বলে বর্ণনা করলেও তেমনি তাঁর পরিপূর্ণ বর্ণনা হয় না। ঈশ্বর-স্বরূপের ইতি করতে নেই—এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ। ব্রাহ্ম ভক্তেরা উপাসনার সময় ঈশ্বরের শক্তি ও ঐশ্বর্যের কথাই বেশী আলোচনা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার পরিবর্তে তাঁদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার ভাব আনতে পরামর্শ দেন, কারণ ঈশ্বরের শক্তি ও ঐশ্বর্যের কথা বেশী চিন্তা করলে ভক্তের পক্ষে ঈশ্বরকে আপন বলে কল্পনা করা কঠিন হতে পারে।[৩৫] তবে এ সব পার্থক্য সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মকে ঈশ্বরলাভের জন্য জগতে প্রচারিত বিভিন্ন মত ও পথের অন্যতম বলে মনে করতেন। কীর্তনের শেষে তিনি যখন ঈশ্বর ও তাঁর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তদের উদ্দেশে প্রণাম জানাতেন, তখন 'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম' বলে ব্রাহ্মমণ্ডলীকে প্রণাম জানাতে কখনো ভুলতেন না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর কোন আন্তরিক বিরাগ বা দ্বেষ ছিল না।[৩৬] বরং ঐ সমাজের কোন কোন নেতার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আন্তরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় **Theistic Quarterly Review** পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে [অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৮৭৯, পৃঃ ৩২-৩৯] লিখেছেন, 'We cannot be like him. Our ideal of religious life is different, but so long as he is spared

to us, gladly shall we sit at his feet to learn from him the sublime precepts of purity, unworldliness, spirituality and inebriation in the love of God.'[৩৭] শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁর **Men I Have Seen** পুস্তিকায় তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর ভালোবাসার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলনকে শ্রীরামকৃষ্ণ কতদূর প্রভাবিত করেছিলেন তা এখন বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তির ভাব এনেছিলেন, একথা বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেশবচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হতেই বৈষ্ণব-পদ্ধতিতে সঙ্কীর্তন করার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তখনো তাঁর পরিচয়ই হয় নি। আশৈশব শাক্ত পরিবেশে লালিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই কারণে দীর্ঘকাল কেশবের দলে যোগদান করা থেকে বিরত ছিলেন বলে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।[৩৮] ব্রাহ্ম সমাজে মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনাও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রবর্তিত হয় নি। মহর্ষির সময় হতেই ব্রাহ্ম মন্দিরে আচার্যের উপদেশে এবং সঙ্গীতে মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনার কথা মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এইভাবে রচিত কয়েকটি ব্রাহ্ম সঙ্গীতের উল্লেখ গৌরগোবিন্দ রায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়।[৩৯] কেশবের অপর এক অনুরাগী দেখিয়েছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবার আগে কেশব তাঁর বক্তৃতায় অন্ততঃ বত্রিশবার ঈশ্বরের মাতৃভাবের উল্লেখ করেছেন।[৪০] কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কেশবের ঘনিষ্ঠ পার্ষদ ও নববিধান সমাজের অন্যতম নেতা গৌরগোবিন্দ রায় স্বীকার করেছেন যে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হতেই ব্রাহ্ম সমাজে প্রকাশ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। গৌরগোবিন্দের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের অন্তরে যোগ, বৈরাগ্য ও ভক্তির উন্মেষে এবং তাঁর মাতৃভাবের সাধনায় বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন, যদিও দক্ষিণেশ্বরের সাধকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই কেশবের মনে এই সব ভাবের সঞ্চার হয়েছিল।[৪১] শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অল্পকাল পরে [১৬।৯।১৮৮৬] কেশবের প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকাই কিন্তু অন্যরকম মন্তব্য করে, 'পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়...পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে সরস করিয়া তোলে।'[৪২] প্রায় একই সময় [আগস্ট, ১৮৮৬] 'পরিচারিকা' পত্রিকাও লেখে, 'ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষরূপে পরমহংসের জীবনের প্রভাবেই সঞ্চারিত হয়।'[৪৩] এরপর এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কেশবের মনোভাব তাঁর পরিচালিত পত্রিকাগুলিতেই সুপরিস্ফুট। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবের প্রথম মিলনের ঠিক দুই মাস পরে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা লিখছে, 'তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। তাঁহাকে দেখিলে ঘোর সাংসারিকের মনও টলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।... একজন লোক লেখাপড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কতদূর ধার্মিক হইতে পারে রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল।'[৪৪] ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুআরি **The Indian Mirror** পত্রিকায় লেখা হয়, 'Several Brahmo missionaries who have visited him from time to time speak highly of his devotion and purity and his deep insight into the realities of the inner world.'[৪৫] ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে ভাঙ্গন ধরার পর কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের আরো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন।

এর ফলে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই কেশবের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়, 'আমরা দেখিতেছি তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে।'[৪৬] বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন যে, কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে এতদূর ভক্তি করতেন যে তাঁকে একবার নিজের বাড়ীতে পূজার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন।[৪৭] কেশব যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, তা বহু সমসাময়িক ব্যক্তির সাক্ষ্য থেকে জানা যায়।[৪৮]

তবে সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা সত্ত্বেও কেশব যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি, তাও সুস্পষ্টই দেখা যায়। সাকার উপাসনা সম্বন্ধে কেশবের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হলেও এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ দূর হলেও[৪৯] কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ আন্তরিকভাবে তাঁর জীবনে গ্রহণ করেন নি। মধ্যে মধ্যে তিনি গৈরিক বস্ত্র ধারণ করে নির্দিষ্ট কালের জন্য সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সে যুগের সম্পন্ন বাঙালী গৃহস্থের জীবনযাত্রা। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই কেশব তাঁর একটি ধর্মোপদেশে বলেন, 'Some think that to touch money or to behold the face of a woman is rank sin ;...It is to lay axe at the root of this mistaken opinion that the New Dispensation is born.'[৫০] কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' উপদেশটির তাৎপর্যও ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করে চললে মানুষ শেষ পর্যন্ত একই সত্যে উপনীত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ এ কথা বারংবার ঘোষণা করলেও প্রতিটি ধর্মের যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে এ কথা তিনি মানতেন, এবং সেই কারণেই বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে একটি সঙ্কর ধর্ম সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি। কেশবের নববিধান এই ধরনের সঙ্কর ধর্ম সৃষ্টিরই একটি অভিনব প্রয়াস ছিল।[৫১] এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতা বা সদিচ্ছা প্রশ্নাতীত হলেও তাঁর এই কৃত্রিম ধর্ম মহামতি আকবরের দীন-ই-ইলাহির মতোই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কেশবের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই নববিধান বিলুপ্ত হয়, এবং তার জন্য কেউই বিশেষ শোক প্রকাশ করে নি।

কেশবের অনুগামীদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণী শক্তির কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তাঁর রচনা পড়েই মনে হয় যে, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মনে যে বিরুদ্ধ ভাব ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ভবত তার কিছুটা দূর করতে পেরেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র লিখেছেন, 'He unconsciously throws a flood of marvellous light upon the obscurest corners of the Puranic Shastras, and brings out the fundamental principles of the popular Hindu faith and notions with a philosophical clearness which strangely contrasts itself with his simple and illiterate life...To him each of these [Hindu] deities is a force, an incarnated principle tending to reveal the supreme relation of the soul to that eternal and formless being who is unchangeable...'[৫২] হিন্দুদের বহু দেবদেবী পূজার তাৎপর্য যে প্রতাপচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন উপরের উদ্ধৃতিটি তারই স্বীকৃতি।

প্রথম জীবনে কেশবের অনুচর এবং পরবর্তী কালে তাঁর বিরোধী দলের অন্যতম নায়ক বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের বাসনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, এবং ক্রমশ তিনি সাকার-উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এর জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যপদে ইস্তফা দিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ঐ সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভের কথা বিজয়কৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন।[৫৩]

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অপর এক স্তম্ভ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আর কোন মানুষ ধর্ম সাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কিনা জানি না…এই রূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। তদ্-ভিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইতেন।'[৫৪] শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি সম্বন্ধে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন শিবনাথের এই ধারণার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও জানতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সাক্ষাতে এই প্রসঙ্গ তুলে একবার তাঁকে লজ্জা দিয়েছিলেন।[৫৫] তবে পরবর্তী কালে শিবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবসমাধির সঙ্গে চৈতন্য, হজরত মহম্মদ এবং বহু খ্রীষ্টান সাধু-সন্তদের ভাবসমাধির তুলনা করেছেন, তাঁর মতে এই ধরনের স্নায়বিক বিকার ('a strange nervous disorder') এক শ্রেণীর সাধকের মধ্যেই দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ শিবনাথের কাছে আদৌ রুচিকর হয় নি, কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, সাধক মাত্র নয়।[৫৬] শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মবিশ্বাসের উদারতার কথা উল্লেখ করে শিবনাথ তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন 'ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন।…রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করিয়াছি।'[৫৭] ব্যক্তিগতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য যে তাঁর অন্তরে অধ্যাত্মভাবকে দৃঢ়তর করেছিল একথাও শিবনাথ স্বীকার করেছেন, 'My acquaintance with him, though short, was fruitful by strengthening many a spiritual thought in me.[৫৮] শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে [৩১৮।১৮৮৬] সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' মন্তব্য করে, 'যে সকল ধর্মাত্মা বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন।'[৫৯]

নববিধান সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালও [চিরঞ্জীব শর্মা নামেও পরিচিত] শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নানা রকম দর্শন, ভাব ও সমাধি দেখেই ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভাবোদ্দীপক পদ রচনা করেছিলেন। 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি', 'গভীর সমাধিসিন্ধু অনন্ত অপার', 'চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় রে', 'আমায় দে মা পাগল করে' ইত্যাদি সঙ্গীতগুলি ঐ পর্যায়ের, সন্দেহ নেই। সুকণ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথের গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় সমাধিস্থ হতেন বলে জানা যায়।[৬০] এই সব নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদের কথা বাদ দিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ বেলঘরিয়ার জয়গোপাল সেন, সিঁথির বেণীমাধব পাল, [কলকাতার] সিদুঁরিয়া-পটির মণিমোহন মল্লিক, নন্দন বাগানের কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তদের বাড়ীতে উৎসবের সময় এবং কখনো কখনো অন্য সময়েও যাতায়াত করতেন,

তবে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল জানা যায় নি।[৬১] একমাত্র আদি ব্রাহ্ম সমাজের কোন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। মহর্ষির সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণা,—আগে ভোগী, পরে যোগী—সম্ভবত তাঁদের মনঃকষ্টের কারণ হয়েছিল।[৬২] তাছাড়া পৌত্তলিকতাকে মহর্ষি বোধ হয় কোনভাবে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনও যে ব্রাহ্ম সমাজের কাছে ঋণী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ব্রাহ্ম নেতারা কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম বা নিরাকার ঈশ্বরের সাধনার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বে'র ভাষায়, 'পরমহংসও আচার্যের [কেশবচন্দ্র] জীবনের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন, ধর্মের উদারতা ও কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার নিয়ম নিষ্ঠা লাভ করেন।'[৬৩] যাঁরা এ ধরনের দাবী করেছিলেন তাঁরা, বলা বাহুল্য, তোতাপুরীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বৈদান্তিক ভাবে সাধনার কথা অবগত ছিলেন না। ধর্মীয় উদারতার বিষয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রাহ্ম সমাজের কাছে শিক্ষণীয় কিছু ছিল না, কারণ তিনি নিজেই ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় ভাব সহ আঠারোটি বিভিন্ন ভাবের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এবং এ সবই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের অনেক আগেকার কথা।[৬৪] ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যোগদানের সময় বেশভূষার ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ তথাকথিত সভ্য সমাজের রীতিনীতি কিছুটা মেনে চলবার চেষ্টা হয়ত করতেন, কিন্তু একবার ভাবাবিষ্ট হলে তাঁর পক্ষে আর কোন সাবধানতা বজায় রাখা সম্ভব হত না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, কেশবচন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী প্রথম বৃহত্তর জনসমাজে প্রচার করেন, এবং পরবর্তী কালে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্ত হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁরা অনেকেই প্রথমে কেশবের পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পড়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ কোন-না-কোন সময় ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যতালিকাভুক্ত ছিলেন। তাঁর গৃহী শিষ্যদের মধ্যেও মাষ্টার মহাশয় [মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত], সাধু নাগ মহাশয়, বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, অধরলাল সেন ও আরো অনেকে হয় ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করার ফলে, অথবা কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে বা তাঁর পত্রিকা পাঠ করে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম জানতে পেরেছিলেন।[৬৫] স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গে' মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, 'ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তিলাভে ধন্য হইয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকে ঐ বিষয়ের জন্য নববিধান ও সাধারণ উভয় ব্রাহ্মসমাজের নিকটেই চিরঋণে আবদ্ধ।'[৬৬] তবে কেশবচন্দ্র সম্ভবত এ কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি যে, তাঁর এই প্রচারকার্যের ফলে বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে যে নতুন ধর্ম-আন্দোলনের সূচনা হবে তার প্রতাপে তাঁর বহু আদরের ব্রাহ্ম সমাজ শীঘ্রই নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। এরই নাম বোধ হয় নিয়তির পরিহাস।*

---

* ১৭ই মে ১৯৮১, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের সারদানন্দ হলে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।

নির্দেশিকা

১। D. K. Biswas and P. C. Ganguli (eds.) S. D. Collet's **The Life And Letters of Raja Rammohun Roy** (Calcutta, 1962), pp. 73-75.

২। **Ibid.**, Chapter IV.

৩। **The English Works of Raja Rammohun Roy** (Calcutta, 1958), Part II, p. 60.

৪। **Ibid.**, Introduction to the Translation of the Moonduk Opunishud.

৫। **Ibid.**, Part IV, pp. 95-96.

৬। D. K. Biswas and P. C. Ganguli (eds.), **Op. Cit.**, p. 226.

৭। **Ibid**., Chapters III and VII.

৮। S. C. Chakrabarti (ed.) **The Father of Modern India**, Part II, Devendra Nath Tagore's article on "Reminiscences of Rammohun Roy", p. 177.

৯। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' [বিশ্বভারতী, ১৯৬২], পৃঃ ৪৩-৫৪, ১৩১-'৩৬, ১৪০-'৪৯, ২৯৬-৩০৩।

১০। Sivanath Sastri, **History of The Brahmo Samaj**, 2nd Edition, (Calcutta, 1974), pp. 83, 87.

১১। রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', ৪র্থ সংস্করণ [কলিকাতা, ১৯৬১], পৃঃ ৬৪-৬৫।

১২। Sivanath Sastri, **Op. Cit.**, pp. 96-97, 119.

১৩। Sivanath Sastri, **History of The Brahmo Samaj**, (Calcutta, 1911), 1st Edn., Vol. I, p. 181. ১৪। **Ibid.**, pp. 136-137, 143-144, 151-152.

১৫। **Ibid.**, pp. 158-178. ১৬। **Ibid.**, pp. 244-251.

১৭। গৌরগোবিন্দ রায়, 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' [কলিকাতা, ১৯৩৮], ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪১।

১৮। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত [শ্রীম], 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', তৃতীয় ভাগ [কলিকাতা, ১৩৮১], পৃঃ ১৪৪-১৪৫।

১৯। স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' [কলিকাতা, ১৩৮৩], প্রথম খণ্ড, 'সাধকভাব' দ্রষ্টব্য। ২০। ঐ, পৃঃ ৩৭৬।

২১। **Life of Sri Ramakrishna** (Mayavati, Almora, 1943), pp. 268-289, 411-419, 502-512. ২২। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'সাধকভাব', পৃঃ ৪০০।

২৩। ঐ, পৃঃ ৪০০-৪০১, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১০৮।

২৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' [কলিকাতা, ১৩৭৫], পৃঃ ৬২।

২৫। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃঃ ৮।

২৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৯।

২৭। David Kopf, **The Brahmo Samaj And The Shaping of The Modern Indian Mind** (Princeton, 1979), p. 268,

২৮। Sivanath Sastri, **Op. Cit.**, pp, 274-293.

২৯। **Life of Sri Ramakrishna**, p. 272. ৩০। **Ibid**., p. 273.

৩১। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃঃ ১৭।

৩২। ঐ, পৃঃ ২০-২১।

৩৩। Sivanath Sastri, **Men I have Seen** (Calcutta, 1948), p. 79

৩৪। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃঃ ১১।

৩৫। ঐ, পৃঃ ১১-১৫, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৯, ৬৪-৬৫।

৩৬। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃঃ ২৪; 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬৬।

৩৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২০০।

৩৮। Meredith Borthwick, **Keshub Chunder Sen, A Search For Cultural Synthesis** (Calcutta, 1977), p. 155; Sivanath Sastri, **Men I have Seen**, p. 84.

৩৯। গৌরগোবিন্দ রায়, 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০২৬।

৪০। G. C. Banerjee, **Keshab Chandra And Ramakrishna** (Calcutta, 1942), p. 7. ৪১। গৌরগোবিন্দ রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৪৩।

৪২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬১।

৪৩। ঐ, পৃঃ ৩৯। ৪৪। ঐ, পৃঃ ৫। ৪৫। ঐ, পৃঃ ৭। ৪৬। ঐ, পৃঃ ১৯।

৪৭। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, 'সাধকভাব', পৃঃ ৪০৪।

৪৮। ঐ, পৃঃ ৪০১-৪০২, ৪০৪, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮১। 'বেদব্যাস' পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৮ সংখ্যা হতে উদ্ধৃতি: "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেশববাবু পরমহংসদেবকে গুরু অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করিতেন।"

৪৯। Meredith Borthwick, **Op. Cit.**, pp. 157-158, 160. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কেশব ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ঈশ্বরের ১০৮টি নাম নিয়ে একটি সঙ্গীত রচনা করেন এবং পরে এটিকে একটি সংস্কৃত স্তোত্রের রূপ দেওয়া হয়। ব্রাহ্ম সমাজের উপর পৌরাণিক উপাসনা পদ্ধতির প্রভাবের এটি একটি নিদর্শন।

৫০। **The Sunday Mirror**, dated 1.8.1880, quoted in Meredith Borthwick, **Op. Cit.**, p. 221.

৫১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৬-৭৭, ['তত্ত্বমঞ্জরী', আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ হতে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য] ৫২। ঐ, পৃঃ ১৯৯।

৫৩। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃঃ ১৮-১৯।

৫৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের পূর্বোক্ত গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' হতে উদ্ধৃতি, পৃঃ ১০১।

৫৫ **Life of Sri Ramakrishna**, p. 281; 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২৩।

৫৬ Sivanath Sastri, **Men I Have Seen**, pp. 64-68.

৫৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১০১-১০২।

৫৮ Sivanath Sastri, **Op. Cit.**, p. 80.

৫৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭১।
স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩। ৬১। ঐ, পৃঃ ৯।

৬২ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৪২; **Life of Sri Ramakrishna**, p. 404.

৬৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬১। দুইজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কামাক্ষ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনীয় উক্তির জন্য এই গ্রন্থের পৃঃ ১০৩ ও ১০৬-১০৭ দ্রষ্টব্য।

৬৪। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, 'সাধকভাব', ১০-১৬ ও ২১ অধ্যায়।

৬৫। স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' [কলিকাতা, ১৩৮৪], প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৬, ১৫, ৯৯, ১৫০, ২৫৫, ৩০৪, ৩৪৭; দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৫, ১৬৫, ১৯৫, ২১৬, ২৩৮, ২৫০, ২৫৭, ২৯৪, ৩৩৫, ৩৫৪।

৬৬। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃঃ ২৪।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[বৈশাখ ১৩৮৮ সংখ্যার পর]

'নেবু টেবু সব ঐ পাগড়িতে' অর্থাৎ পোশাকে—সেকালে পাশ্চাত্যেই বেশী ছিল। একালে আমাদের দেশেও কম নয়। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সব দেশেই আমেরিকান পোশাকের অনুকরণে কাপড়চোপড়ের বাহুল্য কমে এসেছে। আমেরিকার কোথাও কোথাও বেশ গরম, (স্বামীজী নিউইয়র্কে কলকাতার চেয়ে বেশী গরম লক্ষ্য করেছিলেন,) ফলে পোশাকপরিচ্ছদে সরলীকরণের দিকে ঝোঁক। কিন্তু সে-পোশাকের এদেশে অনুকরণের কারণ বোধ করি অর্থনৈতিক। অত অল্প খরচে প্যাণ্ট-জামা ইত্যাদি একালের মানুষের কাছে অনেকটা সাশ্রয়। কিন্তু যখন প্রৌঢ় বৃদ্ধদের পোশাকেও হাতকাটা নানারঙের বাহারে ফতুয়াজাতীয় শার্ট দেখা যায়—তখন তারুণ্যের বাড়াবাড়ি বেশ দৃষ্টিকটু ঠেকে বই কি! প্রত্যেক জাতির নিজস্ব মনোভঙ্গীর মতো নিজস্ব পোশাকের সংস্কৃতিও বরণীয়—একথা সেকালের মতো একালেও সমান সত্য।

পোশাকের ছাঁটকাট গ্রীক-রোমানদের মধ্যে তেমন ছিল না। স্বামীজীর মতে (অনুমানে) চীনাদের কাছ থেকে ইরানীয়া এ-কায়দা শেখে। ইরান জয় করতে এসে আলেকজাণ্ডার বা সিকন্দর শা এই ইজের-পরা পাশ্চাত্যদের মধ্যে চালু করলেন।—'তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্যরা এমন চ'টে গেল যে বিদ্রোহ হবার মতো হয়েছিল। যোদ্ধা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ—ইজার-জামা চালিয়ে দিলেন।'

শীত-গ্রীষ্মের পার্থক্য দেশে দেশে পোশাকের বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। কিন্তু এ সব বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্বামীজীর মন্তব্য—'পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের পা দেখানো বড়ই লজ্জা···আমাদের দেশে মুখ দেখানো বড়ই লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে শাড়ি কোমরে ওঠেন উঠুন, তায় দোষ নেই। রাজপুতানার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখানো!' স্বামীজীর এ মন্তব্যের একশো বছর পরে পাশ্চাত্য মেয়ের লজ্জা ও বাঙালী মেয়ের লজ্জার ধরন অনেক বদলেছে। লজ্জার রকমারি অসঙ্গতিই স্বামীজীর পরিহাসের লক্ষ্য।

"এক চীনে ছাড়া সর্বদেশেই এ লজ্জা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় দেখছি—কোন বিষয়ে বেজায় লজ্জা, আবার তদপেক্ষা অধিক লজ্জাকর বিষয়ে আদতে লজ্জা নেই। চীনে মেয়ে-মদ্দে সর্বদা আপাদমস্তক ঢাকা। চীনে কনফুছের চেলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নীতি-দুরস্ত; খারাপ কথা, চাল, চলন—তৎক্ষণাৎ সাজা। ক্রিশ্চান পাদ্রী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেললে। এখন বাইবেল পুরাণ হচ্ছেন হিঁদুর পুরাণের চোদ্দ পুরুষ—সে দেবতা মানুষের অদ্ভুত কেলেঙ্কার প'ড়ে চীনে তো চটে অস্থির। বললে, 'এই বই কিছুতেই এ দেশে চালানো হবে না, এ তো অতি অশ্লীল কেতাব'; তার উপর পাদ্রিনী বুকখোলা সান্ধ্য পোশাক প'রে, পর্দার বার হয়ে চীনেদের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন। চীনে মোটাবুদ্ধি, বললে—'সর্বনাশ! এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আদুড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোঁড়া বইয়ে দিতে এ ধর্ম এসেছে।' এই হচ্ছে চীনের ক্রিশ্চানের উপর মহাক্রোধ। নতুবা চীনে কোনও ধর্মের উপর আঘাত করে না। শুনছি যে, পাদ্রীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ ক'রে

বাইবেল ছাপিয়েছে; কিন্তু চীনে তাতে আরও সন্দিহান।”

এমনি করে ‘দেশবিশেষে লজ্জাঘেন্নার তারতম্য’ দেখিয়ে স্বামীজীর স্নিগ্ধ কৌতুকের সাবলীল প্রকাশভঙ্গিমা পাঠককে বিশ্বসভ্যতার রকমারি বুঝতে কতভাবেই সাহায্য করে চলেছে! যেমন ধরুন, আচার-আচরণগত ভদ্রতার দেশে দেশে তারতম্য। মলমূত্রের ব্যাপারে আমাদের দেশের লোক খোলাখুলি কথাবার্তা বলে। যে দেশে ‘এক কাঁড়ি ঘাসপাতা আহার’, ছাতু খাওয়ার পর যেখানে ‘পাতকোকে পাতকোই খালি ক’রে ফেললে জল খাওয়ার চোটে’ সে ‘দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা?’ কিন্তু পাশ্চাত্যে এ সব বিষয়ের উল্লেখও অচল। (সম্প্রতি কলকাতার হালচাল দেখে এক বিদগ্ধ জাপানী ভদ্রলোক এ শহরকে পৃথিবীর ‘বৃহত্তম শৌচাগার’ বলে মন্তব্য করেছেন!)

‘ঠাণ্ডা দেশে সর্দি লাগবার সদাই সম্ভাবনা; গরম দেশে খেতে ব’সে ঢক ঢক জল। এরা কাজেই না হেঁচে যায় কোথা, আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা?’

“ইংরেজ ও আমেরিকানরা কথাবার্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। সে ‘ঠ্যাঙ’ বলবার পর্যন্ত জো নেই। ফরাসীরা আমাদের মতো মুখখোলা; জার্মান রুশ প্রভৃতি সকলের সামনে খিস্তি করে।”

এমনি বলিষ্ঠ আঁচড়ে নানা দেশের রীতকরণের পার্থক্য ফুটিয়ে তুলতে তুলতে স্বামীজী গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে নারী-সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীর সশ্রদ্ধ মনোভঙ্গীর বিশেষ তারিফ করেছেন। ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’-গ্রন্থে ‘পাশ্চাত্যে শক্তিপূজা’ শিরোনামে চিহ্নিত এই অংশটি স্বামীজীর শক্তিবাদী চিন্তাধারার একটি কবিত্বমণ্ডিত রসোজ্জ্বল উদাহরণ।

‘ধর্ম এদের শক্তিপূজা, আধা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে।... প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার, —মাতৃভাবও যথেষ্ট।...আর মেয়ের পুজো। এ শক্তিপুজো কেবল কাম নয়। কিন্তু যে শক্তি-পুজো কুমারী-সধবা-পুজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তিপুজো। তবে আমাদের পুজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণ মাত্র; এদের দিনরাত, বার মাস।’ স্বামীজীর দৃষ্টিতে ক্যাথলিক ইউরোপে মেরীর পূজার প্রাধান্য ওই শক্তি-পূজার মনোভাবেরই ফল।

এই শক্তিপূজার আলোচনা করতে করতেই ‘ইউরোপের নবজন্ম’ নিয়ে স্বামীজীর ইতিহাস-দৃষ্টির অনন্তবিস্তারী অপূর্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বভাবসুলভ রঙ্গব্যঙ্গ-পরিবেশন পাশাপাশি চলতে লাগলো। ইউরোপের মধ্যযুগে (ভারতে ‘আকবর’, ‘জাহাঁগির’, ‘শাজাহাঁ’ প্রভৃতির রাজত্বের সময়) নবজন্ম প্রথম দেখা দেয় ইতালিতে। কিন্তু সে-নবজন্মের প্রভাব ইতালিতে স্থায়ী হয় নি।

ইতালি ও ভারতের তুলনা করে স্বামীজী লিখছেন—‘ইতালি বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হ’তে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যাবুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো।

‘ইউরোপে ইতালির পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো বলবান অভিনব নূতন ফ্রাঁ জাতিতে।’ এই নব-জন্মের যৌবন-জল-তরঙ্গ ইংরেজের মাধ্যমে ভারতে এসেছে, জাপানের জাগরণও সে বন্যারই ফল—‘জাপান আশিয়ার নূতন জাত।’

ফরাসী জাতি ও সভ্যতার বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত স্বামীজীর বর্ণনা—‘এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি

মুক্তা প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রাঁস ইউরোপের কর্মক্ষেত্র।...এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ-নগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ—না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক, বিদ্যাবুদ্ধি থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও থাক—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক ম'রে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।'

ফরাসী চরিত্রের সঙ্গে বাঙালী চরিত্রেরও বেশ কিছুটা মিল। স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তার চির-তারুণ্যের আনন্দময় দিকটি ফরাসী সভ্যতা ও জাতির সঙ্গে সুগভীর সহমর্মিতার ফলে উপরের উদ্ধৃতিটিতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপ্রতিভার দ্বারা রূপায়িত।

'পারি' (বা প্যারিস) সম্বন্ধে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়বিলাসের প্রাধান্য নিয়ে যে-সব কথা শুনতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে স্বামীজীর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে মেশা সুতীক্ষ্ণ অথচ সকৌতুক মন্তব্য—'আমাদের দেশে এই পারি নগরীর বদনামই শুনতে পাওয়া যায়, এ পারি মহাকদর্য বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা ইংরেজরাই ব'লে থাকে, এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অবশ্য বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে!

'কিন্তু লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ; তবে তফাত এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া; বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাত।'

কিন্তু এই ভোগবিলাসের 'সপ্তমে' পৌঁছেও ফরাসীরা নিজেদের গাঁটের কড়ি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার। ফরাসী চরিত্রের আর একটি দিক স্বামীজীর দৃষ্টি-দর্পণে উদ্ভাসিত—'ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরচ করে না। এই ঘোর বিলাস, এই সব হোটেল কাফে, যাতে একবার খেলে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়, এ-সব বিদেশী আহাম্মক ধনীদের জন্য। ফরাসীরা বড় সুসভ্য, আদব-কায়দা বেজায়, খাতির খুব করে, পয়সাগুলি সব বার ক'রে নেয়, আর মুচকে মুচকে হাসে।'

ফরাসীর মুখের ঐ 'মুচকি হাসি'টুকুতে স্বামীজী এক কথায় এ জাতির চাতুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এ হেন ফরাসীজাতিও কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে ঘোর রক্ষণশীল। সহজে এরা বিদেশী বা স্বল্পপরিচিত কাউকে অন্দরে ঢুকতে দেয় না। উৎসবে-পার্বণে নর্তকীদের নাচগান আমাদের দেশের মতো ওদেশেও খুবই চলে। স্বামীজীর ভাষায় ওদের 'নেংটি নাচ'। এই নাচ প্রসঙ্গেও স্বামীজী ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজ-আমেরিকানদের তুলনা করে একহাত নিয়েছেন—'ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হ'লে আর দোষ নেই। এ কথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্বত্র, ও গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।' এখনকার দিনেও বিলাসকলায়

কুতূহলীরা 'পারি'-কে জগতের সেরা ভোগের জায়গা মনে করে থাকেন। স্বামীজী ফ্রান্সের সভ্যতার অন্দর ও বাহির দুইই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কেবলমাত্র ভোগের পরিচয়টাই এদের আসল পরিচয় নয়, সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক এই ফ্রান্স। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আজকের আমেরিকাও ফরাসী সভ্যতার কাছে অশেষ ঋণী।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিকথা দার্শনিক পরিণাম-বাদ ও অদ্বৈতবাদ, সমাজের ক্রমবিকাশ, দেবতা ও অসুর অথবা তথাকথিত সভ্য ও বর্বর জাতিদের ধরনধারণ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের বর্ণনায় স্বামীজীর বাক্‌ভঙ্গী সব সময় চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত। এ হাসি কখনো অন্তরঙ্গ, কখনো প্রখর সমালোচনামুখর, কখনো সৃষ্টির অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি-উদ্‌ঘাটনে আপনাতে আপনি স্মিতপ্রসন্ন! সমাজবিবর্তনে শ্রম-বিভাগের নিহিত অসঙ্গতিকে স্বামীজী আপাতদৃষ্টিতে হালকাভাবে উপস্থাপিত করেন—'একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগলো—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি ক'রে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগলো, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে।' এ অবধি বর্ণনার পর সমাজ ও রাষ্ট্রের বঞ্চিত সাধারণের স্বরূপটি স্বামীজীর ভাষায়—"একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম ; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম ক'রে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে সে এ সকলের দাম দিয়ে ম'লো!! পাহারাওয়ালার নাম হ'ল রাজা, মুটের নাম হ'ল সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিস তৈরি করতে লাগলো, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগলো।" সমাজশোষণের করুণ কাহিনী এখানে বলার গুণে হাস্যরসের উপাদানে পরিণত।

তারপর ক্রমবর্ধমান সমাজব্যবস্থার জটিলতা স্বামীজীর ভাষায়—'ক্রমে এই সকল ভাব—প্যাঁচাপেঁচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্য গেরো হয়ে বর্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হলেন।' চলতি কথায় শব্দব্যবহারের বৈচিত্র্যে হাস্যরসের এ এক অপূর্ব উদাহরণ। যারা বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে খাদ্যসংস্থান করতো তারা পরে বন-জঙ্গলাদির অভাবে ডাকাত হ'লো। যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হ'তো সেই স্বাধীনভর্তৃকাদের পরিণাম—"সে 'প্রাতঃ-স্মরণীয়া'দের কালের মেয়ে, এ জন্মে তো আর একসঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা।" স্বল্পকথায় ব্যঙ্গ কতদূর ইঙ্গিতবাহী হ'তে পারে—তার নমুনা। 'সকল সমাজে এই নানারূপে ভগবান বিরাজ করছেন —সাধু-নারায়ণ, ডাকাত-নারায়ণ ইত্যাদি।' হাস্যকৌতুকের অন্তরালেও এমনিভাবে স্বামীজীর 'নারায়ণ' উঁকি দিয়ে গেলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা শেষ অবধি এ দুই সভ্যতার মূল লক্ষণ-নির্ণয়ে অগ্রসর। স্বামীজী দেখিয়েছেন যে, ইউরোপ অসভ্যজাতিদের বিনাশ করে তাদের সাম্রাজ্য-বিস্তার করেছে বলে ভারতবর্ষেও তাই ঘটেছিল এমন মনে করার কোনো যুক্তি নেই। ভারত-বর্ষের সমাজব্যবস্থায় বর্ণাশ্রমাচার অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সভ্যদের ধীরে ধীরে উচ্চতম শ্রেণীতে আরোহণের সিঁড়ি হিসাবে সৃষ্ট।

"ইউরোপীরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ ক'রে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্যরাও তাই করেছে!! ওরা হা-ঘরে, 'হা-অন্ন হা-অন্ন' করে, কাকে লুঠবে মারবে ব'লে ঘুরে বেড়ায়—আর্যরাও তাই করেছে!! বলি, এর প্রমাণটা কোথায়—আন্দাজ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখগে।

"কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া তো হয়নি, খামকা এক বৃহৎ গল্প—রামায়ণের উপর—কেন বানাচ্ছ?

"রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হ'ল কোথায়? তারা হ'ল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বলো না?" বঙ্কুসস্মিত বিতর্কের অন্তর্লীন হাস্যরসের আভাস এখানেও লক্ষণীয়। বিদেশীর বুদ্ধি ধার করে যাঁরা ভারতে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের গল্প খাড়া করে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশে স্বামীজীর মনীষাদীপ্ত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এ অংশে সমুজ্জ্বল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের অনুসরণে দেশের ইতিহাসের অপব্যাখ্যার ফল আজ ছোটখাট অজস্র গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অবাস্তব হাজারো স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা! যে ঐক্যমূলক সংহতি ভারতীয় সভ্যতার মূল কথা সে সম্বন্ধে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র উপসংহারে স্বামীজী যে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে সাবলীল ভাষাপ্রয়োগে সুনিপুণ বিশ্লেষণে উপস্থাপিত করেছেন, তার সঙ্গে তুলনীয় কোনো কিছু আজ অবধি বাংলাসাহিত্যে লেখা হয় নি—'ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ ক'রে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান ক'রব, আমাদের চেয়ে বড় ক'রব। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্যের উপায়—বর্ণবিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান—বর্ণ-বিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।' ইতিহাসের প্রাণসত্য এখানে স্বমহিমায় স্বল্পতম কথায় গভীরতম প্রত্যয়ে উচ্চারিত।

ভারতীয় সভ্যতার এই নিজস্ব পদ্ধতিটি বুঝতে না পেরেই স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতমূর্খেরা অন্ধ পাশ্চাত্যানুসরণের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই ভারতধর্মকে যিনি যত পরিমাণে উপলব্ধি ও অনুসরণ করবেন, তিনি সেই পরিমাণে স্বামীজীর 'নূতন ভারত' গড়ায় সহায়ক হয়ে উঠবেন।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরসের একটি অংশমাত্র আমরা তাঁর লেখা চারটি বাংলা গ্রন্থ অবলম্বনে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছি। তাঁর আনন্দময় সত্তার বিচ্ছুরণ আরো নানাভাবে তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে প্রতিভাত। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিদগ্ধ অথচ অন্তরঙ্গ, মননশীল—সেই সঙ্গে বঙ্কুসস্মিত, সাধু গদ্য ও বিশেষভাবে চলতি গদ্যে দীপ্তিমান স্বামীজীর হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতা অলোকসামান্য।*

* উদ্ধৃত অংশগুলি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে গৃহীত।

ঋষিকৃষ্ণ-আখ্যায়িকা

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

যীশু তাঁর শিষ্যদের আলাদা করে সাধুসঙ্গ করার কথা বলেন নি—তাঁরা তো তাঁরই নিবিড় সাহচর্য পেয়েছেন। তা ছাড়া সেকালের বাহ্য ধর্মাচরণসর্বস্ব ইহুদীসমাজে সাধুসঙ্গের উপদেশ দেওয়াও সমীচীন হত না। তাই যীশু ব্যাকুলতার কথা—নিয়ত আর্তির কথা বার বার বলেছেন। উপযোগী দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। [ম্যাথিউ ৭, লুক ১১]—

'তোমাদের কারও হয়তো বন্ধু আছে। মাঝরাতে তার বাড়ির সামনে গিয়ে বলবে, "মিতে, আমাকে খানতিনেক রুটি দাও। ভিন গাঁ থেকে আমার এক বন্ধু এসে পড়েছে; তাকে খেতে দিই এমন কিছু আমার নেই।"

'বন্ধু ভিতর থেকেই উত্তর দিয়ে বলবে, "ঝামেলা কোরো না। দোর টোর সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ছেলেপুলেরা সব বিছানায় আমার সঙ্গে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

'বলছি আমি তোমাদের—বন্ধু হলেও সে প্রথমটা রুটি দেবার জন্য উঠবে না, কিন্তু বার বার চাইলে সে উঠে পড়বে, যতগুলো রুটি দরকার দেবে।

'তাই বলি—চাইতে থাকো, দেওয়া হবে তোমাদের; খুঁজে চলো, সন্ধান পাবে; দরজায় ঘা দিয়ে যাও, তোমাদের জন্যই খোলা হবে।'

যারা সুকৃতিমান অথবা কৃপাবৃত তারাই ভাগবত-জীবনসাধনার অধিকারী। এ বিষয়ে যীশুকথিত একটি আখ্যায়িকা। [ম্যাথিউ ২২, লুক ১৪]—

এক রাজা ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করে বহু লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভোজের সব কিছু প্রস্তুত হলে তিনি আমন্ত্রিতদের আহ্বান করার জন্য ভৃত্যদের পাঠালেন। কিন্তু সকলেই কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেল। কেউ বলল, 'আমি একটা জমি কিনেছি; সেটার তদারক করবার জন্য আমাকে যেতেই হবে। মাফ করো, আমার যাওয়া হবে না।' কেউ বলল, 'আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনেছি, সেগুলো পরীক্ষা করাতে যাব। আমাকে মাফ করতে হয়।' আবার কেউ বলল, 'আমি এই বিয়ে করেছি; আমি যেতে পারব না।' কেউ কেউ আবার ভৃত্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করল।

ভৃত্যরা রাজাকে সব কথা জানালে তিনি রেগে গিয়ে যারা দুর্ব্যবহার করেছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। তারপর ভৃত্যদের বললেন, 'যাও, শহরের পথে পথে অলিতে গলিতে গরীবগুরবো কানা খোঁড়া নুলো যাদের পাবে ডেকে নিয়ে এসো'

ভৃত্যরা তাই করে তাঁকে বলল, 'প্রভু, যা বলেছিলেন করা হয়েছে; কিন্তু এখনও জায়গা খালি আছে।'

'বড়ো রাস্তার মোড়ে মোড়ে খেতখামারের বেড়ার আশেপাশে যাদের দেখতে পাবে ডেকে নিয়ে এসো।'

ভোজসভা লোকজনে ভরে গেলে রাজা অতিথিদের দেখতে গেলেন। দেখলেন, একজন লোক উৎসবের উপযোগী পোশাক পরে আসে নি। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী স্যাঙাত, বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণের মতো পোশাক পরে আসনি কেন?'

লোকটা কোন কথাই বলতে পারল না। রাজা ভৃত্যদের বললেন, 'এ লোকটাকে ধরে হাত-পা বেঁধে বাইরে ফেলে রেখে এসো।'

অনেকেই আহূত হয়, কিন্তু অল্প লোককেই বেছে নেওয়া হয়!

ভাগবতজীবনের দিশারী মহাপুরুষরা যখন মানুষকে ডাক দেন তখন সব জায়গায় সে ডাক পৌঁছয় না। যদিও বা সৌভাগ্যক্রমে সে ডাক কানে আসে অনেকেই তাতে মন দেয় না—আসক্তিময় ভোগসর্বস্ব বহিরঙ্গ জীবনযাত্রাতেই মেতে থাকে। কেউ কেউ আবার ভোগময় বাহ্য উপকরণে সুসমৃদ্ধ জীবনের প্রতিবন্ধক বলে ত্যাগাশ্রিত ধর্মময় জীবনাচরণের আদর্শের বিরোধী। ভাগবতজীবনের আহ্বান ধনমান, কুলশীল বা প্রতাপের প্রত্যাশা করে না। যাঁরা সুকৃতির অধিকারী কিংবা আন্তরিক ব্যাকুলতার তীব্রতায় যাঁরা ভগবৎকৃপা লাভ করেছেন, বহির্মুখ লোকদৃষ্টিতে তাঁরা সামান্য জন বলে মনে হলেও তাঁদের অন্তরে, তাঁদেরই জীবনে ঐ আহ্বান-বাণী সঞ্চারিত হয়, সক্রিয় হয়, স্ফুরিত হয়।

অবশ্য সে স্ফূর্তির জন্য প্রয়োজন সর্বাত্মক ভগবন্মুখী জীবনসাধনা। ভগবৎসাধনায় প্রবৃত্ত হলেও জীবনাচরণে যদি ত্রুটি ঘটে, সাধকোচিত শীলব্রতের মর্যাদা রক্ষিত না হয়, তাহলে ঐ উৎসবসজ্জাবিমুখ আমন্ত্রিতের মতো পরিভ্রষ্ট পরিত্যক্ত হতে হয়।

অধ্যাত্মসাধনজীবনে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় প্রমাদ অর্থাৎ কী করণীয় তা জেনেও কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়া। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখি, বেদবিদ্যা শিক্ষা দেবার পর আচার্য শিষ্যদের বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তারা প্রমাদগ্রস্ত না হয়।—

'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥' [১।১১।১] —সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না, ধর্ম থেকে বিচলিত হবে না, কুশলকর্ম থেকে বিরত হবে না, স্বাধ্যায় আর প্রবচনে (অর্থাৎ অধ্যাপনায়) অনবহিত হবে না।

ধর্মসাধনে অপ্রমাদী হবার দুটি সহজ দৃষ্টান্ত যীশু দিয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত সজাগ প্রহরীর—অবধানপরায়ণ ভৃত্যের। [ম্যাথিউ ২৪, লুক ১২] —বলেছেন, 'কোমর বেঁধে প্রদীপ জ্বালিয়ে সজাগ ভৃত্যের মতো তৈরি থাকো। তারা প্রতীক্ষায় থাকে কখন তাদের প্রভু বিবাহোৎসবের ভোজ থেকে ফিরে আসবেন, যাতে তিনি দ্বারে আঘাত করলেই তাঁর জন্য দ্বার খুলে দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পারে। প্রভু এসে যেসব ভৃত্যকে প্রহরারত দেখেন তারা সৌভাগ্যবান। তিনি খুশি হয়ে নিজে উদ্যোগী হয়ে তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করবেন, নিজেই পরিবেশন করবেন। তিনি যদি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বা তৃতীয় প্রহরে এসেও সেই সব ভৃত্যকে সজাগ প্রহরায় দেখেন, তাহলে তারা ধন্য। জেনে রেখো, গৃহস্থ যদি জানতে পারত কখন চোর আসবে, তাহলে সে পাহারার বন্দোবস্ত করত যাতে চোর বাড়িতে ঢুকতে না পারে।—তোমরাও প্রস্তুত থাকো, কেননা এমন এক মুহূর্তে মানবপুত্র আসবেন যা তোমরা ধারণাই করতে পারবে না।

'গৃহপতি তাঁর বিশ্বাসী প্রধান ভৃত্যকেই গৃহস্থালি পরিচালনার ভার, অন্য ভৃত্যদের যথাসময়ে আহারাদির ব্যবস্থা করার ভার দিয়ে যান। ফিরে এসে যদি তিনি দেখেন যে সেই ভৃত্য যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে তাহলে সে সুকৃতিমান। প্রভু তাকে তাঁর যা কিছু আছে তার উপর সমস্ত দায়িত্ব সমস্ত কর্তৃত্ব দেন।—আর যদি ভারপ্রাপ্ত সেই ভৃত্য মনে মনে ভাবে, প্রভুর আসতে দেরি

আছে, সুতরাং দাসদাসীদের প্রহার করে, যথেচ্ছ পানাহার করে মাতাল হয়ে পড়ে, তাহলে সকলের অজ্ঞাত অভাবিত এক সময়ে ফিরে এসে তার প্রভু তার ঐ আচরণ দেখে তার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেন।'

অপর দৃষ্টান্তটি দশ কুমারীর। [ম্যাথিউ ২৫] —দশটি কুমারী বর দেখবে বলে প্রদীপ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে পাঁচজন বোকা, পাঁচজন বুদ্ধিমতী। যারা বোকা তারা প্রদীপ নেওয়ার সময় আর তেল নেয়নি; যারা বুদ্ধিমতী তারা প্রদীপের সঙ্গে পাত্র ভরে তেল নিল। এদিকে বর আসতে দেরি হওয়ায় অপেক্ষা করতে করতে এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে সোরগোলে তাদের ঘুম ভেঙে গেল— 'ঐ তো বর! এসো আমরা বরের কাছে যাই।'

কুমারীরা উঠে পড়ে প্রদীপ সাজাতে লাগল। বোকা কুমারীরা পাঁচজন বুদ্ধিমতীদের বলল, 'তোমাদের তেল থেকে কিছুটা করে দাও; আমাদের প্রদীপ নিবে যাচ্ছে।'

তারা বলল, 'যা তেল আছে তা থেকে দিলে কুলোবে না। তোমরা বরং তেলওয়ালাদের কাছ থেকে কিনে আনো গে।'

তারা তেল কিনতে চলে গেল। এর মধ্যে বর এসে গেল। পাঁচ কুমারী তৈরিই ছিল, তারা বরের সঙ্গে উৎসবসভায় চলে গেল। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

আর পাঁচ কুমারী কিছুক্ষণ পরে এসে বাইরে থেকে বলল, 'প্রভু, আমাদের দরজা খুলে দিন।'

কিন্তু গৃহপতি বললেন, 'সত্য বলছি, আমি তোমাদের চিনি না।'

দুর্লভ সৌভাগ্যের সদুপযোগ যারা করে না, আলস্যে অবহেলায় সুযোগ নষ্ট করে, দিব্য ধামের প্রবেশদ্বার তাদের কাছে চিররুদ্ধ হয়ে যায়।

*　　*　　*

অধ্যাত্মসাধনজীবনে চাই সজাগ বুদ্ধি, নিরন্তর আয়াস, নিয়ত উদ্যোগ। যীশু যে তিন ভৃত্যের আখ্যায়িকা বলেছেন তারও এই তাৎপর্য। [ম্যাথিউ ২৫, লুক ১৯]—

এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বিদেশ যাবার আগে তাঁর ভৃত্যদের কিছু কিছু অর্থ দিলেন। একজনকে তিনি পাঁচ ট্যালেণ্ট মুদ্রা দিলেন (এক ট্যালেণ্টের অর্থমূল্য ২০০ পাউণ্ডের কিছু বেশি), একজনকে দুটি, আর একজনকে একটি। প্রথম ভৃত্য ঐ পাঁচ ট্যালেণ্ট ব্যবসায়ে খাটিয়ে আরও পাঁচ ট্যালেণ্ট অর্জন করল। দ্বিতীয় ভৃত্য ঐভাবে ট্যালেণ্ট দুটি বিনিয়োগ করে আরও দুটি ট্যালেণ্ট অর্জন করল। কিন্তু যে একটি ট্যালেণ্ট পেয়েছিল, সে বাড়ি গিয়ে মাটি খুঁড়ে মনিবের দেওয়া মুদ্রা লুকিয়ে রাখল।

দীর্ঘদিন পরে ফিরে এসে ঐ ভদ্রলোক তাঁর ভৃত্যদের কাছে টাকার হিসাব চাইলেন।

প্রথম ভৃত্য বলল, 'প্রভু, আপনি আমাকে পাঁচ ট্যালেণ্ট দিয়েছিলেন। দেখুন, আমি আরও পাঁচ ট্যালেণ্ট লাভ করেছি।'

মনিব বললেন, 'বেশ করেছ! সৎ আর বিশ্বাসী তুমি। তুমি সামান্য বিষয়েই বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছ; আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের অধিকার দেব। তুমি তোমার মনিবের আনন্দের ভাগীদার হও।'

দ্বিতীয় ভৃত্য বলল, 'প্রভু, আপনি আমাকে দু ট্যালেণ্ট দিয়েছিলেন। দেখুন, আমি আরও দু ট্যালেণ্ট লাভ করেছি।'

মনিব বললেন, 'বেশ করেছ! সৎ আর বিশ্বাসী তুমি। তুমি সামান্য বিষয়েই বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছ; আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের অধিকার দেব। তুমি তোমার মনিবের আনন্দের ভাগীদার হও।'

তৃতীয় ভৃত্য এসে বলল, 'কর্তা, আমি আপনাকে জানি। আপনি ভারি কড়া লোক।

আপনি যেখানে বোনেন না সেখান থেকে ফসল কেটে নেন; যেখানে কিছু ছড়ান না, সেখান থেকে কুড়িয়ে নেন। তাই আমি ভয়ে ভয়ে বাড়ি গিয়ে আপনার দেওয়া মুদ্রা মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিলাম। দেখুন, এই আপনার সেই ট্যালেণ্ট।'

মনিব বললেন, 'পাজি! কুঁড়ের ঢিপি! তুই জানিস আমি যেখানে বুনি না সেখান থেকে ফসল কাটি। যেখানে ছড়াই না সেখান থেকে কুড়োই! তুই যদি আমার টাকা মহাজনদের কাছে জমা রাখতিস, তাহলেও আমি ফিরে এসে টাকাটা সুদসুদ্ধ ফেরত পেতাম।—তোমরা ওর কাছ থেকে ট্যালেণ্টটা কেড়ে নিয়ে যার দশ ট্যালেণ্ট আছে তাকে দিয়ে দাও। কেননা যার আছে সে-ই অনেক পাবে; যার নেই, তার যেটুকু ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হবে। ঐ অকম্মাটাকে একেবারে বাইরে খেদিয়ে দাও, কেঁদে মরুক সেখানে!'

অধ্যাত্মসাধনায়—শুধু অধ্যাত্মসাধনায় কেন, জীবনের যে কোন সাধনায় যার উদ্যোগ আর প্রযত্ন বেশি, সে-ই প্রভূত ফল পায়; আর যে উদ্যমহীন, জড়তাগ্রস্ত, তার সিদ্ধিলাভ তো হয়ই না, উপরন্তু যেটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

স্বদেশ সাহিত্য ও মননশীলতা: শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। প্রকাশক: ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিমিটেড। ২৫৭-বি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। (১৩৮৭), পৃঃ ১২৮+২, মূল্য: বারো টাকা।

গ্রন্থের ভূমিকায় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ-নির্দিষ্ট তিনটি মার্গের কথা বলেছেন—কর্মমার্গ, রসমার্গ ও জ্ঞানমার্গ। লেখক পূর্বেই প্রথম দুটি মার্গে স্বচ্ছন্দ বিচরণের পরিচয় দিয়েছেন; তৃতীয় মার্গেও বিচরণের অধিকার যে তাঁর আছে বর্তমানে তার নিদর্শন পাওয়ায় আনন্দপ্রকাশ করে ভূমিকা-কার মননশীল রচনার ক্ষেত্রে লেখকের বিচরণের স্থায়িত্ব কামনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এ-জাতীয় সাহিত্যের কিছু কিছু লক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

গ্রন্থটি সাতটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য ও মননশীলতা' গ্রন্থটির প্রস্তাবনামাত্র নয়, এ-জাতীয় রচনার প্রকৃতি-পরিচয়ও। 'যোদ্ধার বেশে নয়—একটা বোদ্ধার মেজাজ নিয়ে পাঠকমর্জিকে নিজের মনের মজলিশে বসিয়ে রাখা এবং তাকে রসিয়ে রসিয়ে পাকা রসুইয়ের মতো জারক-রস করে যেতে হয়।'—লেখকের এ মন্তব্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত-কথিত রচনা-সাহিত্যের সংজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দেয়। মনস্বিতা আর সরসতার অদ্বয় প্রকাশ! বাস্তবিক পক্ষে বাংলা সাহিত্যে এর নিদর্শন বিরলই। 'একটা ধ্রুবদৃষ্টি দিয়ে যেন শুভদৃষ্টির জন্য চেয়ে থাকা'—সার্থক প্রবন্ধ-সাহিত্যরচয়িতার এইটাই মূলগত আদর্শ। এই আদর্শচ্যুতির কয়েকটি কারণও লেখক দেখিয়েছেন। পুরোমাত্রায় তত্ত্ব-বা-তথ্যনির্ভর প্রবন্ধের জাত আলাদা। কিন্তু প্রবন্ধ-সাহিত্যকার যদি রচনাকে মনোহারী করবার জন্য লঘু করে ফেলেন, সাংবাদিকসুলভ উপরিচর হন, ব্যক্তি-অথবা-গোষ্ঠীবিশেষের মুখাপেক্ষী হয়ে বক্তব্য বিষয়কে বিশেষ সাজে সাজান, তাহলে তিনি তাঁর দায়িত্বের মর্যাদাহানি ঘটাবেন। 'প্রবন্ধকারের দায় ও দায়িত্ব কিন্তু বড়ই সূক্ষ্মসূত্রে বিধৃত'—লেখকের এই অভিমত যথার্থ। লেখকের স্বকীয় চিন্তাপ্রসূত এই নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধটি প্রশংসনীয়—বিস্তারিত আলোচনা না করেও তিনি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তুলে পাঠক সাধারণের চিন্তা উদ্রেক করতে পেরেছেন।

আর দুটি প্রবন্ধে লেখক মুখ্যত কালবিশেষের পটভূমিকায় সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ভাব-জীবনের পরিচয় দিয়েছেন—পাঁচটিতে সমুচ্চ প্রতিভাবান পুরুষের ভাবসত্তাকে অবলম্বন করে।—'উনবিংশ শতাব্দী ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে 'রবীন্দ্রমানস-চৈতন্যে'র পটভূমিকার পরিচয় প্রসঙ্গে রামমোহন থেকে শুরু করা হয়েছে। রামমোহনের প্রয়াসে 'যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতার উদ্বোধন', মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের ঔপনিষদিক ভাবমণ্ডল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বিভিন্নমুখী উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টা, বিদ্যাসাগর-কৃত 'বোধোদয়', বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্য-প্রতিষ্ঠ নব্যচেতনা—এই ঐতিহাসিক বাতাবরণে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের একটি রেখাচিত্র এই প্রবন্ধে আছে। রবীন্দ্রজীবনে ও সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাধনায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনজিজ্ঞাসা যে উত্তর পেয়েছে তার পরিচয় দিয়ে লেখক বলেছেন, 'পাশ্চাত্ত্য প্রজ্ঞানের স্বীকরণ, ভারত-ঐতিহ্যে আস্থা এবং স্বদেশপ্রেম জাগৃতি নিয়েই ছিল উনিশ শতকীয় মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তারই প্রবক্তা।' প্রবন্ধটির বিষয়বিশ্লেষণ ও পরিবেশনা দুই-ই মনোজ্ঞ। লেখক উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথকে স্থাপনা করেছেন—বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে মুখ্য নন। 'রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে বা নাটকে নবজাগৃতির জয়গান উচ্ছ্বসিত, কিন্তু ঐতিহ্য-বি নয়'—এ মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত ঐ পরিপ্রেক্ষায়ই গ্রহণীয়। তবে মনে হয়, 'মাটির টান' থাকা সত্ত্বেও জীবনের অন্তিমপ্রান্তে 'বোধের চরম সীমায় উপনীত' রবীন্দ্রনাথকে শেষ পর্যন্ত ঐতিহ্যাতিশায়ী বলাই সংগততর।—অবশ্য সে সিদ্ধান্তের জন্য যে আলোচনা বা বিশ্লেষণ প্রয়োজন, তা এ-প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়।

'মনন-জাগৃতি ও মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা অক্ষয়-কুমার সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা খুব অল্পই পাওয়া যায়। উনিশ শতকের নবচেতনার মূলে রামমোহন থাকলেও তাঁর আদর্শ দুই উত্তরসূরীর জীবনে দুটি স্বতন্ত্র শাখায় বিভক্ত হয়েছে। রামমোহনের ব্রহ্মসভার মূল ভাবটি মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ তাঁর জীবনরসে জারিত করে জ্ঞানাশ্রিত ভক্তিপথে অধ্যাত্মসাধনার ধারাটি প্রবর্তন করেন। রামমোহনের জ্ঞানচর্চার আদর্শ অক্ষয়কুমারের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। মননশীলতার দিক থেকে তিনিই রামমোহনের যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁর প্রায় সমবয়সী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যেও জ্ঞানতৃষ্ণা আর বিচারবুদ্ধি প্রবল হলেও তিনি বহুমুখী কর্মে ব্যাপৃত থাকায় তা অসামান্যভাবে বিকশিত হতে পারেনি। এই সমধর্মিতার জন্য দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল—দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের আদর্শের সঙ্গে অক্ষয়-কুমারের দৃগ্‌ভঙ্গির পার্থক্য অনুভব করেছিলেন।—লেখক অক্ষয়কুমারের মানসিক প্রবণতার যথাযোগ্য বিশ্লেষণ করে অক্ষয়কুমারের অধুনা অপরিচিত বিভিন্ন রচনার ভাববস্তুর পরিচয় দিয়েছেন। উদ্ধৃতিগুলি আকর্ষণীয়। বিষয়টি বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ রাখে।

'বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার কয়েকটি দিক আলোচিত হয়েছে। 'বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের বাঙালীজীবনের সর্ব-ক্ষেত্রেরই জীবনদীপ প্রজ্বালনের উদ্ভাবনী শক্তি-স্বরূপ ছিলেন',—লেখকের এই মন্তব্য অবশ্যই সত্য। বস্তুত বিষয়টি ব্যাপক ও বঙ্কিমচেতনার যে কোন দিক সম্পর্কেই বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। প্রবন্ধটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত না হলেও বঙ্কিমমানসের অনেক দিকই পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি—মনে হয় ঐ পরিসরে ঐভাবে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা সম্ভবপরও নয়। সমাজে নারীর স্থান

সম্পর্কে বঙ্কিমের মনোভাবের আলোচনাংশ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সাহিত্যদর্পণে শরৎচন্দ্র' নিবন্ধটি মুখ্যত সাহিত্যরসপিপাসুর দৃষ্টিতে লেখা হয়নি। 'শরৎ-চন্দ্রের সাহিত্যবোধ ও রসানুভূতির গভীরতা এক বিশেষ বোধির আলোকে স্থিতধী ছিল। প্রথম দিকের রচনা বাদ দিলে তাঁর রচনার মধ্যে এমন একটা মনছোঁয়া ভাবনার প্রকাশ ঘটে যা পাঠক-হৃদয়কে সহজেই আকৃষ্ট করে। সাহিত্যরচনায় তাই বলা যায় এক বিশেষ যাদুমন্ত্র তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, যা সহজেই পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করে তোলে।'—সাহিত্যপাঠকের দিক থেকে মন্তব্যটি মূল্যবান ও যথার্থ। এ-প্রবন্ধটির মূল আকর্ষণ অবশ্য সাহিত্য, সমাজ, স্বদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শরৎচন্দ্রের চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ আর হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রচুর লেখা হয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু কিছু শিক্ষায়তনিক আলোচনা বা তথ্যনির্দেশ ছাড়া প্রায় সব রচনাই পুনরুক্তির পুনরুক্তি অথবা অসার। শরৎচন্দ্রের মননের পরিচয় সে-সব গতানুগতিক রচনায় পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের কথা—শরৎসাহিত্যের যথার্থ রসগত বিচারও এখন পর্যন্ত যৎসামান্যই হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের নানা চিন্তার বিশ্লেষণ করে লেখক এ-বিষয়ে পথিকৃতের সম্মান অর্জন করলেন বলা যায়। প্রবন্ধটি ঘননিবদ্ধ ও সুলিখিত। পটভূমিকার বিস্তৃততর পরিচয়সহ বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে একটি গ্রন্থে পরিণত হলে অনুরাগী পাঠকরা আনন্দিত হবেন।

'সুভাষ-মানস স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি, মনে হয়, সুভাষচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ-যোগ্য আলোচনা। লেখক সুভাষ-সাহিত্য ও সুভাষ-মানসের মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের প্রথম জীবনের মানসিক প্রবণতা পটভূমিকা-সহযোগে নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সে তুলনায় পরবর্তী কালে সুভাষ-মানসের বিকাশ বা রাষ্ট্রনৈতিক সংঘাত আর চিন্তার সমবায়ে তার পরিণতির বিবরণ এত অল্প যে তা উৎসুক পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করে না। তবে সুভাষচন্দ্রের ভাবজীবনের পরিচয় পাঠক-মাত্রের কাছে আকর্ষণীয় হবে।

'সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা ও সমাজসেবা'—শেষ প্রবন্ধটি ঐ বিষয়ে যথাযোগ্য আলোচনার একটি খসড়ামাত্র হয়েছে। লেখক কয়েকটি বিষয়ে মূল্যবান সংকেত করেছেন প্রবন্ধের পরিসরের স্বল্পতার মধ্যেই।

বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যপদবাচ্য মননশীল রচনার সংখ্যা খুবই কম। মূলত রসস্রষ্টারূপে সুপরিচিত রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের এই গ্রন্থটি মননশীল পাঠকের আনন্দবর্ধন করবে সন্দেহ নেই। আশা করা যায়, সাধারণ পাঠকের কাছেও আকর্ষণীয় হবে—কারণ প্রথমত এর বিষয়বস্তু, দ্বিতীয়ত এবং প্রধানত এর সাহিত্যরস। মনোজ্ঞ পরিবেশন প্রবন্ধসংকলনটির বিশেষ গুণ।

মুদ্রণাদির পরিপাট্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। সম্ভবত অনবধানতার জন্য কিছু কিছু শব্দাশুদ্ধি থেকে গেছে। **ডক্টর তারকনাথ ঘোষ**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে:

(ক) অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯৮০'র বন্যায়): গৃহ-নির্মাণকার্য অব্যাহত

(খ) উড়িষ্যা (১৯৮০'র বন্যায়): গুরুপুরে গৃহনির্মাণকার্য আরব্ধ।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়): আরাম-বাগে বিদ্যালয়ভবনের নির্মাণকার্য অব্যাহত।

বাংলাদেশে।

দুইটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বস্ত্রাদি-বিতরণ, তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধ-বিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে অ্যালোপ্যাথি ও দুইটি কেন্দ্রের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অব্যাহত।

বিবিধ

১৫ই মে ১৯৮১, স্বামী গম্ভীরানন্দজী **বোম্বাই** রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের নূতন ফিজিওথেরাপি বিভাগের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

২৫শে মে ১৯৮১, রাষ্ট্রপতি শ্রী এন. সঞ্জীব রেড্ডি **নিউ ইটানগর** রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট-গভর্নর ও মুখ্যমন্ত্রী।

৩রা জুন ১৯৮১, উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রী সি. এম. পুনাচা **পুরী** রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

১৯৮১-র মাধ্যমিক পরীক্ষায় **নরেন্দ্রপুর** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্র—প্রথম, পঞ্চম ও নবম স্থান; **পুরুলিয়া** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের চারিটি ছাত্র—তৃতীয়, অষ্টম, একাদশ ও উনবিংশ স্থান এবং **রহড়া** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র চতুর্দশ স্থান অধিকার করিয়াছে।

নিউ দিল্লীর সেণ্ট্রাল বোর্ড পরিচালিত ১৯৮১-র মাধ্যমিক পরীক্ষায় **আলং** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র নবম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭৯-৮০ সালের কার্যবিবরণীর সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অন্তর্বিভাগ : এই বিভাগে ১৮৬টি শয্যা ছিল। (বর্তমানে ২০০)। ৫৩টি শয্যা ছিল নিঃশুল্ক, ২৪টি সশুল্ক এবং ১০৯টি আংশিক সশুল্ক। চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৪,৬৮০ (পুরুষ ২,৩১২, মহিলা ১,৪৭৯, শিশু ৮৮৯)। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,৭২৩। ইনজেক্সনের সংখ্যা ৫৭,২০৪। পথ হইতে আনীত রোগীর সংখ্যা ১৩। গড়ে দৈনিক ১৫৭টি শয্যায় রোগী ছিল।

বহির্বিভাগ (শিবালায় অবস্থিত শাখা সহ): চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২,২৮,৬৩১ (নূতন রোগী ৫৫,৬৯৬, পুরাতন রোগী ১,৭২,৯৩৫)। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৩,৬৩২। ইনজেক্সনের সংখ্যা ১৬,১০০। হোমিওপ্যাথি বিভাগে মোট দশজন চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৩৫,১৩০ (নূতন রোগী ৭,৫০৯, পুরাতন রোগী ২৭,৬২১)। প্রতিদিন গড়ে বহির্বিভাগে আগত রোগীর সংখ্যা ৭৩০। এক্স-রে ও ইলেক্‌ট্রো-থেরাপির সংখ্যা ৩,১৭২। ক্লিনিক্যাল ও প্যাথ-লজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ২৫,৫২৬।

অশক্ত ও নিরাশ্রয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের আশ্রয়-ভবন দুইটিতে ২০ জন পুরুষ ও ২৮ জন মহিলা ছিলেন।

বাহিরের দুঃস্থদের সেবাকল্পে ৪৪ জন দরিদ্র ও অশক্ত বৃদ্ধাকে মাসিক এবং ৬ জনকে সাময়িক অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। ইহাতে মোট ব্যয় হয় ৫,২৯৭ টাকা। ইহা ছাড়া নূতন ও পুরাতন কম্বল এবং পোশাকও দুঃস্থদের মধ্যে বিতরিত হয়। ৮ জন দরিদ্র ছাত্রকে ১৩৬ টাকা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের আয় ১০,০৯,৭৭৩ টাকা ও ব্যয় ১০,৭০,০৭৪ টাকা। ফলে ঘাটতি হয় ৪০,৩০১ টাকা। পূর্ব পূর্ব বৎসরের বকেয়া ঘাটতিসহ মোট ঘাটতির পরিমাণ ২,৬৬,১৮৮ টাকা। সেবাশ্রম-কর্তৃপক্ষ উক্ত ঘাটতি পূরণ এবং সেবাশ্রমের অন্যান্য আশু প্রয়োজনের জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

যুবশিক্ষণ-শিবির

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের বার্ষিক সর্বভারতীয় যুবশিক্ষণ-শিবির গত ২৩ হইতে ২৮ জানুআরি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির হস্টেলে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ।

জন্মজয়ন্তী

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়:

দুর্গাপুর ডি ভি সি, সি টি পি এস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ৪ ২ ৮১

শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি. ৭ ও ৮. ২. ৮১

পিরোজপুর (বরিশাল) রামকৃষ্ণ আশ্রম: ২৩ ও ২৪. ২ ৮১ এবং ৮. ৩. ৮১

রাউরকেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ. ৬ ৩ ৮১—৮. ৩. ৮১

তুফানগঞ্জ (কোচবিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম: ৮ ৩. ৮১

খিদিরপুর সুরবিতান ৮. ৩ ৮১

কলিকাতা গীতিমালা: ৮. ৩. ৮১

ভাগলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ৮ ৩ ৮১

বক্রেশ্বর (বীরভূম) শ্রীরামকৃষ্ণ তপোমঠ ৮. ৩. ৮১

আরারিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম: ৮ ৩ ৮১—১৫. ৩. ৮১

পাণ্ডু (গৌহাটি) বিবেকানন্দ পাঠচক্র: ৯. ৩. ৮১—১৫. ৩. ৮১

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ: ১২. ৩. ৮১—১৫. ৩. ৮১

দক্ষিণ দিল্লী সরোজিনী নগর ও চিত্তরঞ্জন পার্ক স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী গ্রন্থাগার: ১৫. ৩. ৮১, ২৮. ৩. ৮১ এবং ৪. ৪. ৮১

বর্ধমান রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী আশ্রম. ২২ ৩ ৮১—২৪. ৩. ৮১

ভবানীপুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাকেন্দ্র: ২১ ও ২২. ৩. ৮১

গোপালপুর (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম. ২২ ৩ ৮১

সোদপুর (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘ: ২২ ও ২৩. ৩. ৮১

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম: ২২ ৩ ৮১—২৫ ৩ ৮১

কলিকাতা শ্রীসারদা সংঘ (কলিকাতা): ২৫ ৩ ৮১—২৯. ৩ ৮১

চাকদহ (নদীয়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘ: ২৭ ৩. ৮১—৩০. ৩ ৮১

কলিকাতা ইন্দ্রাণী পার্ক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র: ২৮ ও ২৯. ৩ ৮১

কলিকাতা আনন্দধারা: ২৯ ৩. ৮১

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ ৫ ৪ ৮১

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ. ৫ ৮১—৭ ৪ ৮১

বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতি তীর্থ. ১৬ ৪ ৮১—১৭ ৪ ৮১

তপন (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সংঘ: ৩ ও ১১ ৫ ৮১

চাঁদকুণ্ডু (আরামবাগ) শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির: ২০ ৫ ৮১

রাণীচক (মেদিনীপুর) বিবেকানন্দ মিলন সংঘ: ২১ ৫ ৮১

গান্ধী কলোনী (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাশ্রম. ৩০. ৫. ৮১—১. ৬. ৮১

রায়গঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম: ১২. ৬. ৮১—১৪. ৬. ৮১

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপ. ১৭. ৬. ৮১

শিক্ষণ-শিবির

যাদবপুর নিবেদিতা নারী সংঘের বার্ষিক উৎসব ও শিক্ষণ-শিবির ২৬. ৪. ৮১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা—স্বামী দেবানন্দ। পৃঃ ৬০, মূল্য ১'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২'৫০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪'০০

ধ্যান—স্বামী ধ্যানানন্দ। পৃঃ ১০২, মূল্য ৩'৫০

সংস্কৃত

স্তবকুসুমাঞ্জলি—পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২'৫০

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮'০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮'৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০ মূল্য ৯'২৫

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায়, ৩য় খণ্ড ৪'০০, ৪র্থ খণ্ড ৩'০০ ; ২য় অধ্যায় ১৩'০০, ৩য় অধ্যায় ১৩'০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী [illegible]-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ৪, মূল্য ১'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮'০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১০'০০।

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

ভাদ্র ১৩৮৮

৮৩তম বর্ষ

৮ম সংখ্যা

উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৮৮

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।

যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত
জনৈক ভক্ত

ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট ব'সে যে যা প্রার্থনা করে তাই তার লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন-ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত
ভক্ত

●

ভাল চা বলতে
টসের
চা
TOSH'S
AIR TIGHT
এ, টস এণ্ড সন্স

●

রামকৃষ্ণ মিশন

আবেদন

গত ২১শে জুলাই থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে বন্যাবিধ্বস্ত রাজস্থানের জয়পুরে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে রান্না-করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই সেবাকার্য সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এই সেবাযজ্ঞে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া—এই ঠিকানায় একাউন্ট-পেয়ী চেক, ড্রাফট, বা নগদে ঐ দান পাঠিয়ে এই সেবাকার্যে সাহায্য করুন।

স্বামী বন্দনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

৩০শে জুলাই, '৮১
বেলুড় মঠ, হাওড়া

৮৩তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়নিচয় সাধক বা শিষ্যের বশে থাকিবে। যে অবস্থায় মন অনায়াসে ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে, স্বভাবের আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, কঠোর অভ্যাসের দ্বারা সাধক শিষ্য সেই অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে। সে নিজের মনকে আদেশ করিতে সমর্থ হইবে, 'তুমি আমার। আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, কোন কিছু দেখিও না বা শুনিও না।' তৎক্ষণাৎ মন আর কিছু দেখিবে না বা শুনিবে না। কোন রূপ বা শব্দ মনের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে না। সে-অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির আধিপত্য হইতে মন মুক্ত এবং ইন্দ্রিয়গুলি হইতে মন বিচ্ছিন্ন। শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলির সহিত ইহা আর সংযুক্ত থাকে না। বাহিরের বস্তুসকল আর এখন মনকে আদেশ করিতে পারে না। মন ঐগুলির সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে। সম্মুখে সুন্দর গন্ধ রহিয়াছে; শিষ্য মনকে বলিল, 'ঐ ঘ্রাণ গ্রহণ করিও না।' মন আর গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে না। যখন এই স্তরে পৌঁছিয়াছ, তখন জানিবে তুমি ঠিক ঠিক শিষ্য হইতে শুরু করিয়াছ। এইজন্যই যখন কেহ বলে, 'আমি সত্য জানিয়াছি', তখন আমি বলি, 'যদি সত্য জানিয়া থাকো, তবে নিশ্চয়ই তোমার আত্মসংযম হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করিয়া সংযমশক্তির পরিচয় দাও।'

তারপর মনকে শান্ত করিতে হইবে। মন চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। যে মুহূর্তে আমি ধ্যান করিতে বসি, তৎক্ষণাৎ জগতের ঘৃণ্যতম বিষয়গুলি মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমগ্র ব্যাপারটি অত্যন্ত বিরক্তিকর। আমি যেন মনের দাস। মন যতক্ষণ চঞ্চল এবং আয়ত্তের বাহিরে, ততক্ষণ কোনরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্ভব নয়। শিষ্যকে মনঃসংযম শিক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য মনের কার্যই চিন্তা করা। কিন্তু শিষ্যের অনভিপ্রেত হইলে মন নিশ্চয়ই চিন্তা করিবে না; যখনই সে আদেশ করিবে, তখনই মনকে চিন্তা বন্ধ করিতে হইবে। উপযুক্ত শিষ্য হইতে গেলে মনের এরূপ অবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় সং, ৪।৪০৪-০৫]

কথাপ্রসঙ্গে

মনুসংহিতায় চিরকালের ধর্ম : দম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ

মহর্ষি মনু চিরকালের ধর্মের যে-দশটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'ধৃতি' লক্ষণটি কেন সর্বাগ্রে উল্লেখিত হইল, সে-সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি আমরা উপস্থাপিত করিয়াছি। 'ক্ষমা', 'দম', 'অস্তেয়', 'শৌচ', 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ' প্রভৃতি লক্ষণগুলি কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে উল্লেখিত হয় নাই—শ্লোকাকারে গ্রথিত করিতে গিয়াই উহারা ছন্দের প্রয়োজনে বিন্যস্ত হইয়াছে, এইরূপই আমাদের মনে হয়। এইজন্য সুবিধামতো আমরা যে-কোন লক্ষণের একটি বা একাধিক একত্র গ্রহণ করিয়া আলোচনা করিব। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য দুইটি লক্ষণ 'দম' ও 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ'।

যে-পদ্ধতি অবলম্বনে আমরা 'ধৃতি' ও 'ক্ষমা' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি, সেই পদ্ধতি অনুসারেই আমরা বক্তব্য উপস্থাপিত করিব। অর্থাৎ, প্রথমে মনুসংহিতার ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের ব্যাখ্যার কিছু অংশের উল্লেখ করিয়া, পরে গীতাদি শাস্ত্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া কিছু আলোচনা করিব।

'দম' সম্বন্ধে মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন : 'দমঃ অনৌদ্ধত্যম্—বিদ্যামদাদি-ত্যাগঃ।' অর্থাৎ, 'দম' শব্দটির অর্থ হইল অনৌদ্ধত্য (উদ্ধত-না-হওয়ার ভাব)—বিদ্যা, ঐশ্বর্য প্রভৃতির গর্বত্যাগ।

টীকাকার কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন : 'বিকার-হেতু-বিষয়সন্নিধানে অপি অবিক্রিয়ত্বং মনসঃ দমঃ।' অর্থাৎ, বিকারের হেতু যে বিষয়সমূহ, তাহাদের নৈকট্য সত্ত্বেও মনের নির্বিকারভাবই দম।

টীকাকার গোবিন্দরাজের মতে শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহ্য করাই দম ('শীতাতপাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা দমঃ')।

কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার 'চিরপ্রভা' টীকায় লিখিয়াছেন : 'দমঃ মনসঃ নিগ্রহঃ।' অর্থাৎ, মনোনিগ্রহই দম।

বলা যাইতে পারে, মেধাতিথি, কুল্লূক ভট্ট প্রমুখ ব্যাখ্যাকারের টীকা-ভাষ্যের নিষ্কর্ষই কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্নের টীকায় উল্লেখিত হইয়াছে। তবে 'দম' শব্দটির বহুল-প্রচলিত অর্থ হইতেছে, 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ'—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের দমন। কিন্তু আমাদের আলোচ্যমান শ্লোকে (মনুসংহিতা, ৬৷৯২) মহর্ষি মনু 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ'কে পৃথক্ একটি লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করায় ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ 'দম'কে 'মনোনিগ্রহ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহা সুবিদিত যে, শাস্ত্রব্যাখ্যাকারগণ নানা-ভাবে শাস্ত্রার্থ করিয়া থাকেন। কখন কখন তাঁহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়—বিদ্যা-প্রভাবে তাঁহারা 'হয়'-কে 'নয়' এবং 'নয়'-কে 'হয়' করিতে পারেন। সুতরাং আমরাও যদি মনূক্ত 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ'কে 'মনোনিগ্রহ' এবং 'দম'কে দশেন্দ্রিয়নিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে আপত্তির কিছু নাই। 'দম' তো দশেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বলিয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাত দেখা যায় ; আর সাংখ্যদর্শনে (সাংখ্যকারিকা, ২৪) যেরূপ, মনু নিজেও সেইরূপ এগারোটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন। যথা—

একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্বে মনীষিণঃ।
তানি সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ॥ (২৷৮৯)

—পূর্বে [কপিলাদি] মনীষিগণ যে-এগারোটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন, আমি সেগুলি ক্রমানুসারে সম্যক্ বলিব।

এই বলিয়া মহর্ষি মনু প্রথমে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়া শেষে বলিতেছেন :

একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥
(২।৯২)

—মনকে একাদশ [-সংখ্যাপূরক ইন্দ্রিয়] বলিয়া জানিবে। উহা নিজগুণের দ্বারা অর্থাৎ 'সংকল্পে'র দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়েরই পরিচালক। এই মনকে জয় করিলে জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও কর্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক জিত হয়।

এই এগারোটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিবার অব্যবহিত পূর্বে মহর্ষি মনুর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্॥
(২।৮৮)

—সারথি যেমন অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত করে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ অপহরণকারী (আকর্ষণকারী) বিষয়সমূহে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের সংযমে যত্নপরায়ণ হইবেন।

এই শ্লোকটির ঠিক পরেই এগারোটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলায় মনু যে 'বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণ' ('ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং') বলিতে মনকেও গ্রহণ করিতেছেন, ইহা স্পষ্ট। বস্তুতঃ মন ব্যতীত দশেন্দ্রিয় বিচরণশীল হইতে পারে না। সুতরাং যে-শ্লোক লইয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শুরু করিয়াছিলাম, তাহাতে ফিরিয়া গিয়া আমরা বলিতে পারি, আমাদের আলোচ্যমান শ্লোকে (৬।৯২) 'দম'কে 'দশেন্দ্রিয়ের দমন' (যাহা 'দম' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ) এবং 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ'কে 'মনোনিগ্রহ' বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, আমরা কুল্লূক ভট্টের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইব। কারণ, গীতাদি শাস্ত্রে 'দম' যে-অর্থেই প্রযুক্ত হউক না কেন, যাজ্ঞবল্ক্য-প্রমুখ একাধিক ধর্মশাস্ত্রকারের রচিত শ্লোকে 'দম' শব্দের অর্থ 'মনোনিগ্রহ'[১]; মহাভারতেও আছে, 'মনসঃ দমনং দমঃ' (মধুসূদন সরস্বতীর গীতাটীকা ১৮।৪২ দ্রষ্টব্য) এবং শংকরাচার্যও বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৪।৪।২৩) ভাষ্যে অনুরূপ অর্থই করিয়াছেন (এই সংখ্যার পৃঃ ৩৪১ দ্রষ্টব্য)।

এখন আমরা দেখিব, 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ' শব্দটি মনুসংহিতার টীকাভাষ্যে কিভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মেধাতিথির মতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের অর্থ : 'অপ্রতিষিদ্ধেষু অপি বিষয়েষু অপ্রসঙ্গঃ।' অর্থাৎ, [নিষিদ্ধ বিষয়ের তো কথাই নাই] অনিষিদ্ধ বিষয়েও আসক্ত না হওয়াই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শাস্ত্র হইতে আমরা বিহিত কর্ম কী, নিষিদ্ধ কর্ম কী—তাহা জানিতে পারি। কিন্তু এমন অনেক কর্ম থাকিতে পারে এবং আছেও, যেগুলি সম্বন্ধে শাস্ত্র কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। ঐ কর্মগুলিকে অবিহিত-অনিষিদ্ধ (না-বিহিত, না-নিষিদ্ধ) বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঐগুলি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন বিধি-নিষেধ নাই। একজন একটি বাগান তৈরী করিতে ইচ্ছুক। বাগান তৈরী করা শাস্ত্রমতে অনিষিদ্ধ নহে। এখন সে যদি বাগান তৈরী

১ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় মনুসংহিতার অনুসরণে বহু শ্লোক রচিত দেখা যায়। আমাদের আলোচ্যমান মনুসংহিতার শ্লোকটির (৬।৯২) অনুসরণে যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন : 'সত্যমস্তেয়মক্রোধো হ্রীঃ শৌচং ধীর্ধৃতির্দমঃ / সংযতেন্দ্রিয়তা বিদ্যা ধর্মঃ সার্ব উদাহৃতঃ' (৩।৬৬)। এখানেও 'দম' ও 'সংযতেন্দ্রিয়তা' থাকায় 'দম' শব্দের অনায়াসলব্ধ অর্থ মনোনিগ্রহ। বিষ্ণুসংহিতাতেও আছে : 'ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ / অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া' (২।১৭)। এখানেও 'দম' ও 'ইন্দ্রিয়সংযম' উভয়ই একই শ্লোকে উল্লিখিত হওয়ায় 'দম'-এর অর্থ দাঁড়ায় মনোনিগ্রহ।

করিতে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে উহা দোষাবহ নহে, কিন্তু ঐ অনিষিদ্ধ বিষয় লইয়া যদি সে 'মাতামাতি' করে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ'রূপ ধর্ম পালিত হইল না। ইহাই মেধাতিথির বক্তব্য।

'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ' শব্দের ব্যাখ্যায় কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন : 'বিষয়েভ্যঃ চক্ষুরাদি-নিবারণম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।' অর্থাৎ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করাই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।[২]

'চিরপ্রভা'-টীকাকার লিখিয়াছেন : 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ অসদ্‌বিষয়েভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণাং নিবর্তনম্।' অর্থাৎ, অসৎ বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করাই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকারগণ 'দম' ও 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছু অংশ আমরা লক্ষ্য করিলাম। এখন এই দুইটি ধর্মলক্ষণ সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্র হইতে কী পাওয়া যায়, তাহা আমরা দেখিব।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি আখ্যায়িকাতে দম, দান ও দয়া—এই তিনটি সাধনের কথা বলা হইয়াছে। (৫।২।১-৩)। প্রজাপতির তিন প্রকার সন্তান—দেবতা, মনুষ্য ও অসুর। দেবগণ ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে প্রজাপতি বলিলেন, 'দ' এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বুঝিলে তো?' দেবগণ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, বুঝিয়াছি, আপনি আমাদের দমগুণযুক্ত হইতে বলিলেন।' অনুরূপভাবে মনুষ্যগণ এবং অসুরগণ উপদেশ প্রার্থনা করিয়া সেই একই 'দ' উপদেশ পাইলেন এবং প্রজাপতিকে বলিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, 'দ'-এর অর্থ 'দান কর' এবং 'দয়া কর'। আখ্যায়িকাশেষে উপনিষদ্ বলিতেছেন, প্রজাপতির উপদেশের আবৃত্তি করিয়া আজও বজ্রমেঘরূপী দৈববাণী বলে, 'দ—দ—দ' ['দমগুণযুক্ত হও, দান কর, দয়া কর।']—'তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়াম্ ইতি।' [সুতরাং দম, দান ও দয়া, এই তিনটি শিক্ষা করা উচিত।]।

দেবগণ ইন্দ্রিয়ারাম—স্বর্গের সুখভোগেই মত্ত। কিন্তু ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া উপদেশপ্রার্থী হওয়ায় নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছিলেন এবং 'দ'-এর অর্থ করিয়াছিলেন, 'দমগুণযুক্ত হও' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর। মনুষ্যগণ লোভী, কৃপণ—তুচ্ছ বস্তুও দান করিতে তাহাদের প্রাণে লাগে, তাই তাহাদের প্রতি উপদেশ—'দান কর'। অসুরগণ নিষ্ঠুর, ক্রূর। তাহাদের প্রতি উপদেশ—'দয়ালু হও'।

শংকরাচার্য তাঁহার ভাষ্যে এই আখ্যায়িকাটি নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সর্বশেষে লিখিয়াছেন, মানুষের মধ্যেই প্রজাপতির এই তিন প্রকার সন্তান দেখা যায়—ভোগমত্ত, লোভী ও ক্রূর। সেইজন্য দম, দান ও দয়া—এই তিনটি মহৎ সাধন মানুষেরই জন্য বিহিত এবং তাহাদেরই শিক্ষণীয়।

এই আখ্যায়িকার ভাষ্যে শংকরাচার্য 'দম' শব্দটি ব্যাখ্যা করেন নাই। সুতরাং 'দম' বলিতে কী বুঝায়—মনোনিগ্রহ অথবা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—তাহা আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নহে।[৩] কিন্তু এই বৃহদারণ্যক

২ 'ইন্দ্রিয়' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে 'অতিশয় শক্তিশালী'। ইদ্ ('ইদি পরমৈশ্বর্যে') ধাতুর উত্তর রন্ (উণাদি) প্রত্যয় করিয়া 'ইন্দ্র' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়। ইন্দ্র+ঘ= ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি অতিশয় বলবান বলিয়া তাহাদের নিগ্রহ করাও সুকঠিন—'বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি' (মনুসংহিতা, ২।২১৫)।

৩ কেনোপনিষদের 'তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম ইতি প্রতিষ্ঠা' (৪।৮) কথাগুলির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শংকরাচার্য লিখিয়াছেন : 'দমঃ উপশমঃ।' এখানেও ঐ একই ব্যাপার—মনের অথবা ইন্দ্রিয়ের উপশম, তাহা স্পষ্ট নহে।

উপনিষদেই একটি অতি প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, যাহার ভাষ্যে শংকরাচার্য 'শান্তঃ' শব্দটির অর্থ করিয়াছেন, 'বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারতঃ উপশান্তঃ' (বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত) এবং 'দান্তঃ' শব্দটির অর্থ করিয়াছেন, 'অন্তঃকরণতৃষ্ণাতঃ নিবৃত্তঃ' (অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত)। বাক্যটি এই : 'শান্তঃ দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি।' [শান্ত, দান্ত, উপরত (সন্ন্যাসী) তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া স্বীয় দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে আত্মাকে দর্শন করেন।]। এই বাক্যটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে (৪।৪।২৩) আছে এবং পূর্বোক্ত আখ্যায়িকাটি আছে পঞ্চম অধ্যায়ে (৫।২।১-৩)। সুতরাং 'দান্ত' [দম্+ক্ত] শব্দটি পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া শংকরাচার্য আখ্যায়িকাটির প্রসঙ্গে উহার ব্যাখ্যা করেন নাই। তথাপি লক্ষণীয় যে, আখ্যায়িকাটির ভাষ্যে তিনি গীতা হইতে 'কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ' (১৬।২১) শ্লোকার্ধটি দুইবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে, তিনি 'দম' শব্দের অর্থ করিতেছেন 'কাম' (কামনা)-পরিত্যাগ, যে-অর্থ চতুর্থ অধ্যায়ের উল্লিখিত 'দান্তঃ' শব্দটির অর্থের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।' (১।৯)—এই দুইটি বাক্যের ভাষ্যে শংকরাচার্য 'দম' ও 'শম' শব্দের উল্লিখিত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : 'দমঃ বাহ্যকরণোপশমঃ। শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ।' অর্থাৎ, 'দম' হইল বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলির উপশম এবং 'শম' হইল অন্তঃকরণের উপশম।

জ্ঞানের অন্যতম সাধন, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেও [শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তির উৎস—বৃহদারণ্যক উপনিষদের পূর্বোদ্ধৃত বাক্যই (৪।৪।২৩)] শংকরাচার্য 'শম' ও 'দম'-এর এই অর্থই করিয়াছেন। যথা—

সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোঽয়মিতি শব্দিতঃ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে ॥
(অপরোক্ষানুভূতি, ৬)

—'শম' শব্দের অর্থ হইল সর্বদা বাসনাত্যাগ। 'দম' শব্দের অর্থ হইল বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তিসমূহের নিগ্রহ।

'বিবেকচূড়ামণি'তে[৪] এবং গীতাভাষ্যেও[৫] তিনি 'শম' ও 'দম'-এর অবিকল এই অর্থই করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শনের 'শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ ...' ইত্যাদি সূত্রের (৩।৪।২৭) ভাষ্যে শংকর, রামানুজ, নিম্বার্ক, বলদেব প্রভৃতি আচার্য 'শম' ও 'দম'-এর কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের (১।১।১) ভাষ্যে শংকরাচার্য শমদমাদি-সাধনসম্পদের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। অবশ্য টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'রত্নপ্রভা'কার গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন : 'লৌকিকব্যাপারাৎ মনসঃ উপরমঃ শমঃ, বাহ্যকরণানাম্ উপরমঃ দমঃ।' আনন্দগিরির ব্যাখ্যাও অনুরূপ। বাচস্পতি মিশ্র 'মনোবিজয়ঃ শমঃ' লিখিলেও 'দম' সম্বন্ধে নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : 'বিজিতং চ মনঃ তত্ত্ববিষয়-বিনিয়োগ-যোগ্যতাং

---

৪ বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ। স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে ॥ (২২)
বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে। উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ (২৩)

৫ দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ, শমঃ অন্তঃকরণস্য। (১০।৪)
দমশ্চ বাহ্যকরণানামুপশমঃ, অন্তঃকরণস্য উপশমং শান্তিং বক্ষ্যতি। (১৬।১)
শমঃ দমঃ চ যথাব্যাখ্যাতৌ। (১৮।৪২)। অন্তঃকরণোপশমঃ শমঃ,
দমঃ বাহ্যকরণোপরতিঃ ইতি উক্তং স্মারয়তি—যথেতি। (আনন্দগিরি)

নীয়তে। সা ইয়ম্ অস্য যোগ্যতা দমঃ।' অর্থাৎ, 'শম'রূপ সাধনের দ্বারা মন বিজিত হইলে, উহা তত্ত্ববিষয়ে বিনিযুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করে। মনের এই যোগ্যতাই 'দম'।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ভাষ্য, 'অপরোক্ষানুভূতি', 'বিবেকচূড়ামণি', গীতাভাষ্য প্রভৃতি রচনায় শংকরাচার্য 'দম' শব্দের যে-অর্থ করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দও সেই অর্থই করিয়াছেন। 'জ্ঞান-লাভের সোপানশ্রেণী' বক্তৃতায় শম, দম প্রভৃতি ছয়টি সাধনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'মন বা অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম হইল শম এবং চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম দম।' (বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৮৪)। আরও লক্ষণীয় যে, গীতাভাষ্যে শংকরাচার্য 'দম'-এর যে-অর্থ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম) করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, বলদেব প্রমুখ টীকাকারগণও সেই অর্থই করিয়াছেন। ভাষ্যকার রামানুজ গীতার ১০।৪-এ অনুরূপ অর্থ করিলেও ১৬।১ এবং ১৮।৪২-এ উহার বিপরীত অর্থ করিয়াছেন ('দমঃ অন্তঃকরণ-নিয়মনম্' ইত্যাদি)।

মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র-সনৎসুজাত-সংবাদে 'দমে'র বিশেষ প্রশংসা আছে। বলা হইয়াছে, 'দম', 'ত্যাগ' ও 'অপ্রমাদ'—এই তিনটি গুণেই মুক্তি নিহিত ('দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ এতেষ্বমৃত-মাহিতম্'।[৬]) 'দমে'র সাধনে আঠারোটি বিঘ্ন : (১) শাস্ত্রীয় কর্মে অশ্রদ্ধা-আলস্যাদি, (২) অসত্য-ভাষণাদি, (৩) গুণে দোষদৃষ্টি, (৪) কাম, (৫) ধনার্জনে অতিযত্ন, (৬) ধনাদির অভিলাষ, (৭) ক্রোধ, (৮) শোক, (৯) তৃষ্ণা, (১০) লোভ, (১১) খলতা, (১২) মাৎসর্য, (১৩) হিংসা, (১৪) পরিতাপ, (১৫) শাস্ত্রীয় কর্মে অরতি, (১৬) কর্তব্যবিস্মৃতি, (১৭) অধিক কথা বলা এবং (১৮) অহংকার। এই দোষসমূহ হইতে যিনি মুক্ত, সজ্জনগণ তাঁহাকেই দমগুণযুক্ত বলেন। (মহাভারত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং, ৫।৪২। ২৩-২৬)। টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে 'দম' শব্দের অর্থ জিতেন্দ্রিয়ত্ব।

এখন মনূক্ত 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহে'র প্রসঙ্গ। 'দম' শব্দের প্রসঙ্গেই ইহা আলোচিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি আমাদের নিত্য পঠনীয় গীতায় বিষয়টি বারংবার উত্থাপিত হওয়ায় আমরা গীতাসহায়ে কিছু আলোচনা করিব। তৎপূর্বে এ-কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন যে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের তত্ত্ব ও পরাকাষ্ঠা স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগে' এবং একাধিক বক্তৃতায় যেভাবে উদ্ভাসিত, শত টীকা-ভাষ্যেও তাহা আমরা লক্ষ্য করি না। স্থানাভাবে সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলি, 'ততঃ পরমা বশ্যতা ইন্দ্রিয়াণাম্'—যোগদর্শনের এই সূত্রের (২।৫৫) ব্যাখ্যায় স্বামীজী বলিয়াছেন : "যখন ইন্দ্রিয়গণ সর্বতো-ভাবে বশীভূত হয়, তখনই প্রত্যেকটি স্নায়ু ও মাংসপেশী বশে আসিয়া থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়গণই সর্বপ্রকার অনুভূতি ও কার্যের কেন্দ্রস্বরূপ। এই ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং যখন ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইবে, তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কার্যকে জয় করিতে পারিবেন ; সমগ্র শরীরটিই তাঁহার বশীভূত

৬ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে তক্ষশিলার গ্রীক রাজা অন্তিঅলকিডাস বিদিশার [আধুনিক নাম 'ভিলসা' (মধ্যপ্রদেশ)] রাজা ভাগভদ্রের নিকট রাজদূত হিসাবে হেলিওডোরাস নামে জনৈক গ্রীককে পাঠান। তিনি ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশে বিদিশায় একটি গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ নির্মাণ করান। স্তম্ভটি অদ্যাপি বর্তমান। উহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে উৎকীর্ণ আছে যে, তিনি 'ভাগবত ধর্ম' গ্রহণ করিয়াছেন এবং 'ভাগবত ধর্ম' বলিতে 'দম', 'ত্যাগ' ও 'অপ্রমাদ' বুঝায়।

হইবে। এইরূপ অবস্থা লাভ হইলেই মানুষ দেহধারণের আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে ঠিক ঠিক বলিতে পারে, 'জন্মিয়াছিলাম বলিয়া আমি সুখী।' যখন ইন্দ্রিয়গণের উপর এইরূপ শক্তিলাভ হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, বাস্তবিক এই শরীর অতি আশ্চর্য পদার্থ।" (বাণী ও রচনা, ৩য় সং, ১।৩৭৩)। এই সংখ্যার 'দিব্য বাণী'তেও 'শিষ্যের সাধনা' বক্তৃতা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

গীতায় 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ' শব্দটি নাই। না থাকিলেও বহু শ্লোকে বিষয়টি বিশদ করা হইয়াছে। কয়েকটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ (২:৬৮)

—['স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়গণের যেটিকে মন অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টিই অসংযত ব্যক্তির' প্রজ্ঞা হরণ করে।]। সুতরাং হে মহাবাহু অর্জুন! যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়সমূহ হইতে সর্বপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ (২:৫৮)

—কূর্ম যেরূপ নিজের অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যোগীও যখন বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সর্বপ্রকারে প্রত্যাহৃত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
(২ ৬১)

—সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া যোগী মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। ইন্দ্রিয়গুলি যাঁহার বশীভূত, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

এই শ্লোকটির এবং অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকটির ভাষ্যে আচার্য রামানুজ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়া যোগী তাঁহার মনকে শুভাশ্রয় শ্রীভগবানে সমাহিত করিবেন। কারণ, তাহা হইলেই বিষয়ানুরাগরহিত নির্মলীকৃত মন ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিবে। এইরূপ মনই আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ করে। শ্রীভগবানে মন নিবিষ্ট না করিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে অনাদিকালের মলিন সংস্কারের ফলে বিষয়চিন্তা অবর্জনীয় হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ শ্রীভগবানকে সারসর্বস্ব জানিয়া তাঁহাতেই মন সমাহিত করিতে না পারিলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। শ্রীভগবানের কৃপাতেই মানুষ ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করিতে পারে। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তাঁহাকে ডাকিলে—তাঁহার নাম জপ করিলে তিনিই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া দেন এবং তখনই মানুষ শ্রীভগবানের দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দজী এ-বিষয়ে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান নিবন্ধের উপসংহার করিতেছি: 'কুকুর দেউড়িতে লম্ফঝম্ফ করছে, ভয়ে কেউ গৃহস্থের কাছে যেতে পারছে না। বাকী যদি কেউ ভাবে যে, যেমন কোরেই হউক বাড়ীর কর্তার সঙ্গে আলাপ করবো, তাহলে সে দূর থেকেই বাড়ীর কর্তাকে ডাকাডাকি লাগিয়ে দেয়। সে ডাকাডাকিতে কর্তার চমক ভাঙ্গে। তখন বাড়ীর কর্তাই কুকুরকে ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখে। লোকটা তখন তাড়াতাড়ি কর্তার কাছে যাবার সুবিধা পায়। কুকুরও তখন বুঝতে পারে যে, লোকটা কর্তার চেনা। তাই ঘেউ ঘেউ ছেড়ে লোকটার পা চাটতে আসে। ঠিক তেমনি এ ব্যেপারেও (ধর্মরাজ্যে) ঘটে থাকে। প্রাণের ব্যাকুলতা দেখলে জগৎকর্তাই দয়া করে তাঁর কুকুরগুলোকে (ইন্দ্রিয়গুলিকে) চুপ করিয়ে রাখেন, তাই ত জীবজগৎ কর্তার নাগাল পায়।' (শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতি-কথা, ২য় সং, পৃঃ ৪৭৯)। [কার্তিক সংখ্যায় 'সত্য']

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন মহাসম্মেলন (১৯৮০)

ভক্ত ও বন্ধুগণের ভূমিকা

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

আপনারা এইমাত্র রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত ও বন্ধুদের ভূমিকা সম্পর্কে মূল ভাষণ শুনলেন। সেই ভাষণে স্বামী প্রভানন্দ সংঘের উদ্দেশ্য কী এবং কীভাবে সংঘ কাজ করে চলেছেন ও শত শত বৎসর ধরে করে যাবেন তা সবিস্তারে বলেছেন। আপনারা অন্যান্য বক্তার ভাষণও শুনেছেন; তাঁরা তাঁদের বক্তব্য নিজেদের মতো করে প্রকাশ করেছেন এবং রামকৃষ্ণ সংঘের কর্মকাণ্ডে সংঘের বন্ধু ও ভক্তরা কেমন করে অধিকতর সক্রিয়ভাবে আগ্রহশীল হয়ে উঠতে পারেন ও তার সঙ্গে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারেন তা-ও নির্দেশ করেছেন। সংঘ হল কেন্দ্রীয় সত্তা, তাকে ঘিরেই আমাদের জীবন আবর্তিত হওয়া উচিত—সাধু ও গৃহী ভক্ত উভয়ের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। সুতরাং তার জন্য প্রভুর হাতের উপযুক্ত যন্ত্ররূপে আমাদের নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে, কারণ একাজ তাঁর কাজ, প্রভুর কাজ, এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই মিশন দেড় হাজার বছর সক্রিয় থাকবে। আমরা জানি, আমরা কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি; কিন্তু আমরা খণ্ড-কালের অংশকেই অনন্ত কাল বলে মনে করি, তাই যখন বাস্তবিকই বাধা উপস্থিত হয়, তখন আমরা নিরুৎসাহ, নিরাশ হয়ে পড়ি, বিমূঢ় বোধ করি; বুঝে উঠতে পারি না অতঃপর কী ঘটতে চলেছে।

সমগ্র ঐতিহাসিক কালের দিকে চোখ রেখে সর্বত্র বিভিন্ন সংগঠিত ধর্মের ইতিহাস অনুধাবন করে দেখুন। দুটি দৃষ্টান্তের কথা আমার মনে হচ্ছে। একটি বৌদ্ধধর্মের। বৌদ্ধরা ছিলেন অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী। যদিও ভারতীয়রা একান্ত পরমতসহিষ্ণু জাতি, তবু বুদ্ধের জীবৎকালেই বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার হয়েছিল। বারাণসীর রাজা বিরুধক সমগ্র শাক্যবংশ ধ্বংস করে ফেলেছিলেন এবং বুদ্ধ ছিলেন সেই মর্মান্তিক ঘটনার নীরব সাক্ষী। তিনি দেখলেন এবং জানতেন যে, এই পীড়ন-অত্যাচারের মধ্য দিয়েই শক্তির উন্মোচন হবে এবং সেই শক্তি সমগ্র সংঘকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাবে। খ্রীষ্টধর্মের প্রথম অনুগামীদের কথা ভাবুন—কীভাবে রোমকরা এবং অন্যরা, এমন কি ইহুদীরাও, তাদের উপর অত্যাচার করেছে! রোমক ক্রীড়াঙ্গনে সিংহের মুখে এদের নিক্ষেপ করা হয়েছে! সুতরাং পীড়ন-অত্যাচার হয়েই থাকে এবং স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের সময় থেকে এখন পর্যন্ত যে-কাল অতিক্রান্ত—প্রায় আটাত্তর বছর—তার হিসাব নিলে দেখতে পাই, আমাদের সাফল্যের পরিমাণ বিরাট এবং সে-ব্যাপারে আমাদের বিশেষ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। সর্বত্র সাধারণ মানুষ আমাদের পক্ষে—তাঁরা ভক্ত হোন বা না হোন। কিন্তু আমাদের পথে যদি কিছু কাঁটা থাকে তার জন্য কি আমাদের ভীত হওয়া উচিত? প্রত্যেক ধর্মের জন্যই কিছু ব্যক্তিকে আত্মবলি দেবার প্রয়োজন হয়। আমাদের হয়তো আত্মবলি দিতে হবে। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। জীবন অপেক্ষা বিশ্বাস আমাদের কাছে বড়। কেন আমরা ভয় পাব? স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া নূতন মন্ত্র 'অভীঃ'—ভয়হীনতা। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত হয়ে আমরা কিনা ভয়ে কম্পমান! শ্রীরামকৃষ্ণ তো এমন শিক্ষা দেননি! রামকৃষ্ণ-ধর্ম

পুরাতন হিন্দুধর্ম নয়। আবার তা ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মও নয়। এইসব ধর্মের সাধন শ্রীরামকৃষ্ণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এক নূতন হিন্দু-ধর্ম প্রচার করেন, তার উদ্ভব ঘোষিত হয় শিকাগো ধর্মসম্মেলনে। কারণ সেই সময়ে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। তখন হয়ত ছিলেন রামানুজপন্থী, শঙ্করপন্থী, বৈষ্ণব এবং শাক্ত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন হিন্দুধর্মের কথা। প্রাচীন, সীমাবদ্ধ, ক্ষীয়মাণ হিন্দুধর্মের কথা নয়, বললেন প্রকৃত হিন্দুধর্মের কথা। যে-বেদকে হিন্দুরা শাশ্বত জ্ঞান করেন, সেই বেদেরও তিনি নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, যখন তিনি [স্বামী বিবেকানন্দ] বেদ সম্পর্কে আলোচনা করতেন তখন বেদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তার ভাবকে অধ্যাত্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতেন। প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের মতে 'বেদ' শব্দের অর্থ বেদের প্রত্যেকটি কথা শাশ্বত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, না। 'বেদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে মূল 'বিদ্' ধাতু থেকে যার অর্থ জানা। যা জ্ঞান অর্থাৎ বেদের যে-অংশ জ্ঞানবিষয়ক সেটি নিত্য। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, হিন্দুধর্মে সব-কিছুরই স্থান থাকতে পারে। কিন্তু এই যে-হিন্দুধর্ম তিনি প্রচার করেন সেটি ভিন্ন বস্তু। তিনি বলতেন, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ সংগ্রহ করে আমাদের নিজস্ব শাস্ত্র গঠন করে নিতে পারতাম। কিন্তু তা করলে আমরা মূল জীবনধারা থেকে, আমাদের জাতীয় অথবা বিশ্বজনীন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তাম এবং তার ফলে আমরা একটি সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হতাম। কিন্তু তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়নি। তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] সমগ্র মানবজাতির ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এবং তার জন্য আমাদের শাস্ত্র হবে কী? বেদ? হ্যাঁ, বেদের জ্ঞানকাণ্ড—কারণ সেই অংশ বিজ্ঞানসম্মত। শাস্ত্র হবে উপনিষদ্, গীতা -- কিন্তু বিভিন্ন ভাষ্যকার সেসবের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের আলোকে সেগুলি অনুধাবন করতে হবে, তবেই সেসবের প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আমরা প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র। আপনারা জানেন, পাশ্চাত্য দেশ থেকে তাঁর সগৌরব প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুরা কীরকম দুর্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির এলাকায় পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেননি। তিনি [স্বামী বিবেকানন্দ] কি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন? না, তিনি তা ছিলেন না। এবং তিনি যা প্রচার করেছিলেন তাও গোঁড়া হিন্দুধর্ম নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বরণ করে নিয়েছিলেন—তাঁর জীবন ও উপদেশ তার প্রমাণ। সেইসঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছেন অন্যান্য ধর্মকেও। সুতরাং আমরা হিন্দু। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ 'হিন্দুধর্ম' কথাটি পছন্দ করতেন না। তাঁর সব বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, 'হিন্দু' শব্দটি একটি ভৌগোলিক অর্থের দ্যোতক। যারা সিন্ধুনদের অপর দিকে বাস করত, বিদেশীরা তাদের বলত হিন্দু। অতএব আমাদের প্রকৃত ধর্মের নাম হওয়া উচিত বেদান্ত অর্থাৎ যে-জ্ঞান বেদে লভ্য --এবং এই একই জ্ঞান অন্যান্য ধর্মেও আছে। আমরা—বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীরা—মুখ্য বস্তুর সঙ্গে গৌণ বস্তুর মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলি এবং বিবাদ করি।

সুতরাং যে-ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করেছেন এবং যা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে প্রতিফলিত, সেটি অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ নয়। কিন্তু আবার সকল ধর্মই সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য এইখানে। এই কথাটি আমাদের

মনে রাখতে হবে। এখন, সাধারণ মানুষকে, জনসাধারণকে, কী শিক্ষা দিতে হবে সে-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলছেন, এদের জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির শিক্ষা দিতে হবে—যে-ভক্তির সঙ্গে যুক্ত জ্ঞান, যে-ভক্তি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, শেখাতে হবে সেই ভক্তি। সেই ধরনের ভক্তি নয় যাকে তিনি প্রহ্লাদের ভক্তি বলে উপহাস করতেন। প্রহ্লাদ বর্ণমালাটিও আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি শুধু ভগবানকে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরনের ভক্তি সাধারণের উপযোগী নয়। আপনাদের আশ্রয় নিতে হবে বিচারের, ধর্মের অনুশীলন করতে হবে বিচারের মাধ্যমে। কয়জন এইভাবে অগ্রসর হয়ে থাকেন? সন্ন্যাসী এবং গৃহীভক্ত, আমাদের সকলেরই অসুবিধা হল, আমরা সবকিছুই মেনে নিচ্ছি। এতে বিশেষ ক্ষতি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মনীতি সবকিছুই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু দুর্নীতিমূলক অথবা কপট ধর্মবিশ্বাস তো গ্রহণ করা যায় না, করা উচিতও নয়। আপনারা জানেন, একবার ব্রহ্মচারীর বেশে এক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, তখন নরেন্দ্রনাথ, বললেন: 'আমি বামাচারী হব।' একথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হয়ে গেলেন, নীরব হয়ে থাকলেন। কথাটা তাঁর ভাল লাগেনি। পরে অন্য একদিন তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] বলেন, বামাচারও প্রাসাদে উপনীত হবার একটি দ্বার হতে পারে, কিন্তু এটি খাটাদারের দরজা। যাদের ধর্মজীবন কঠোর নৈতিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার সেই সুস্থ স্বাভাবিক ধর্মাচারীদের পক্ষে ওই ধরনের পথ গ্রহণযোগ্য নয়।

ভক্তি অবশ্যই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কারণ শেষে যখন পরম উপলব্ধি হয় তখন দেখা যায় ভক্তি আর জ্ঞান একই। কিন্তু যখন সাধনার পথ হিসাবে আমরা ভক্তি গ্রহণ করব তখন তাকে জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া দরকার। অর্থাৎ এমন যেন ধারণা না হয় যে, আমি যদি ভগবানের নাম করি, গুরুর নিকট দীক্ষা নিই তাহলেই আমার উদ্ধার হয়ে যাবে। কয়েক বছর আগে এক ভক্ত আমাকে বলেছিলেন: 'আপনারা, সন্ন্যাসীরা, বোকা, আপনারা জীবনের সব ভাল জিনিস ত্যাগ করেন। অথচ দেখুন, আমরা সে-সব গ্রহণ করি, ভোগ করি, তারপর গুরুকৃপায় সেখানেই যাই যেখানে নিজেদের সব ভাল জিনিস থেকে বঞ্চিত করে অবশেষে আপনারাও উপনীত হন।' এটা ঠিক কথা নয়। ভক্তদেরও ত্যাগ ও সংযমের জীবন যাপন করতে হবে। তাঁদের অবশ্যই বিষয় নিয়ে থাকতে হবে, বিষয় রক্ষা করতে হবে, কিন্তু সেকাজ তাঁরা করবেন অছির মতো। এই হল প্রভেদ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অর্থে কেবলমাত্র ভক্তির চর্চা নয়, যে-ভক্তি ঈশ্বরের নাম করে যাওয়া আর দিনে দুইবার জপে পরিসমাপ্ত হয়। একে ভক্তি বলে না। ভক্তির অর্থ ইন্দ্রিয়সংযম, মনঃসংযম ইত্যাদি সহযোগে জীবনকে গড়ে তোলা। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভজন করা উচিত—সংগীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের নাম করা। স্বামী বিবেকানন্দের মতে সাধনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সংগীত। কিন্তু গান গাইতে হবে বিশুদ্ধ সুর, তাল এবং লয়ে। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি হল ফলিত অদ্বৈতবাদ। আমাদের জীবনের মূল প্রোথিত হওয়া উচিত অদ্বৈতদর্শনে; যদি সেটি আমরা করতে পারি তাহলে মহৎ কর্ম সম্পন্ন করতে পারব। সুতরাং সন্ন্যাসী এবং গৃহীভক্তদের উপলব্ধি করতে হবে যে, তাঁরা আত্মা এবং ক্রন্দন তাঁদের জন্য নয়। আমরা কাঁদছি, সর্বদা কাঁদছি: 'হায়, আমাদের কিছু হচ্ছে না! হায়, সমাজ জাহান্নমে যাচ্ছে! হায়, জগৎ এবার ধ্বংস হবে!' হ্যাঁ, ধ্বংস তো হবেই, জগতে সবকিছুই

নশ্বর। কিন্তু তার জন্য আমরা অবশ্যই ভীত হব না। না, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের মনোভাব তেমন হতে পারে না। স্বামীজী যেমন বলছেন: 'কিং নাম রোদিষি সখে'—হে বন্ধু, তুমি কাঁদছ কেন? 'ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ'—তোমার মধ্যে রয়েছে সর্বশক্তি; 'আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।'—হে, শক্তিমান, তোমার জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রকাশিত কর। 'আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ।'—একমাত্র আত্মাই শক্তিমান,—জড়বস্তু নয়। অতএব ভাবনা কী? কেন ভয় করবেন? শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী ভক্তদের—সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ উভয়েরই এই হল প্রকৃত জীবনদর্শন এবং আচরণবিধি। এই উচ্চ দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। কদাচ ভাববেন না, আপনারা দুর্বল; আর স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন: পুরাতন ধর্ম শিক্ষা দেয়, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। কিন্তু নূতন ধর্ম [রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ধর্ম] বলে, সে-ই নাস্তিক নিজেকে যে বিশ্বাস করে না। চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস।

কর্মীর অভাব এবং অধিকতর সংখ্যায় শাখা-কেন্দ্র খোলার অসুবিধার কথা উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে রাখা উচিত যে-সংঘকে দেড় হাজার বছর সক্রিয় থাকতে হবে সেটি তার জীবনের মাত্র তিরাশি বছর কাটিয়েছে। আর কত আপনারা প্রত্যাশা করেন? আপনারা বিস্ময়কর কাজ করেছেন। নিরাশ হবেন না। কর্মীর অভাবকে বড় করে দেখবেন না। আমি সেই অভাব বোধ করি না। কারণ এই অভাব সব সময়ে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমাদের অপেক্ষা না রেখেই আমাদের সংঘের প্রসার ঘটবে, আবার সেইসঙ্গে কর্মীর অভাবও থাকবে। কিন্তু যদি আমাদের সন্ন্যাসী-ভ্রাতারা চেষ্টা করেন তবে এই অভাবজনিত অসুবিধা কতক অংশে দূর করতে পারেন—প্রত্যেকে তাঁর কাজের পরিমাণ এখন যা করছেন তার তিনগুণ করে ফেলতে পারেন। কর্মের জন্য জীবনদানই হল আদর্শ। ভক্তদেরও এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীদের কাজে সাহায্য করা উচিত। সুতরাং এইভাবে কর্মীর অভাবও আর থাকবে না। আয়োজনের চেয়ে চাহিদা সর্বদাই বেশী হচ্ছে। সব সময়েই তা-ই হবে। তাই সব সময়ে অভাব থাকবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেখতে হবে ভক্ত এবং বন্ধুদের ভূমিকা কী হতে পারে। মূল ভাষণে এবং অন্য বক্তাদের ভাষণে নির্দেশ করা হয়েছে যে, ভক্তদের এগিয়ে আসা উচিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশবাণী প্রচারের ভার তাঁদেরও নেওয়া কর্তব্য। আপনারা অমৃত আস্বাদন করেছেন, অন্যদের ভাগ না দিয়ে শুধু নিজেরাই তা ভোগ করবেন? যদি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশামৃতের সন্ধান আপনারা পেয়ে থাকেন, তবে তা সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিন না কেন? সুতরাং ওইভাবে আপনারাও প্রচারের চেষ্টা করুন, ভয় পাবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অনুসারে, আপনারা পাপী নন, ক্ষুদ্র নন। স্বামীজী যেমন বলেছেন, আপনারা অমৃতের সন্তান। এই বিশ্বাস রাখুন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করুন। এবং তাঁদের উপদেশ-প্রচারে সহায়তা করুন।

কোনও নাম না করে বলছি, দেশে এখন কত সম্প্রদায়, কত নূতন আন্দোলন! সেসব কারা পরিচালনা করেন? তাঁরা সকলেই সন্ন্যাসী নন। এমন কি সংগঠনগুলির সব কয়টি সন্ন্যাসীদেরও নয়। গৃহীভক্তরা এইসব ধর্মীয় সংগঠনের উপদেশ প্রচার করে থাকেন। অতএব আপনাদের প্রত্যেকেরই শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী প্রচার করা দরকার, প্রত্যেকেরই গৃহ একটি আশ্রমে পরিণত হওয়া উচিত; সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হবে প্রচারিত। স্বামীজী চাইতেন যে, প্রত্যেক

গ্রামেই যেন একটি আশ্রম বা কেন্দ্র থাকে এবং সেখান থেকে এই বাণী প্রচারিত হয়। আপনারা সেই কাজটি করবেন। ধর্মের সাধন ও প্রচার করে আপনারা সেই কাজ করুন। অনুগ্রহ করে সেটি করুন। এটি মনে রাখবেন। নিজেদের অজ্ঞতা এবং অহংকারবশতঃ আমরা মনে করি, আমরাই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করছি। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কে এটি প্রচার করলেন? আমরা শুধু এ-ব্যাপারে যন্ত্র -- এবং এই যে যন্ত্র হতে পেরেছি সেটি সৌভাগ্যের বিষয়। আসলে আমাদের পশ্চাতে রয়েছেন প্রভু, তিনিই সব করছেন। কলকাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। কী দেখছেন? ছোট ছোট সংস্থা গড়ে উঠছে। সেই সব জায়গায় সপ্তাহে সপ্তাহে ক্লাস হচ্ছে, বক্তৃতা হচ্ছে। গোটা পৃথিবী জুড়ে এই কর্মকাণ্ড চলছে। জনসাধারণ যোগ দিতে আসছেন। এ কি আমাদের কীর্তি? নিজেদের অহংকার নিয়ে ভাবি, আমাদেরই। আদৌ তা নয়। জগতের কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত হয়েছেন। সেই শক্তি সক্রিয়। এই শক্তিকে প্রতিরোধ করার সাধ্য কারও নেই। জনসাধারণকে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ব্যাপারটিকে মেনে নিতেই হবে এবং একটি নূতন জগৎ নির্মাণ করতে হবে, রূপায়িত করতে হবে একটি নূতন সমাজব্যবস্থা। অতএব এই ভাগবতলীলায় আপনাদের প্রত্যেককেই ভাগ নিতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাস থেকে আপনারা জানেন, স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে, গৃহস্থরাও যেন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই কারণে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অন্য কয়েকজন মিশনের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কারও কারও মৃত্যু হল, কারও বা স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, কেউ কেউ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এখনও আবার আপনারা এই কাজ নিজেদের হাতে নিতে পারেন, কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাঁর বাণী প্রচার করতে পারেন। যদি তা করেন, আপনারা ধন্য হয়ে যাবেন। এই প্রসঙ্গে বলছি, আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকেই কেন্দ্র স্থাপন করেছেন; বোধ হয়, সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের সহস্রাধিক কেন্দ্র আছে যেগুলি সংঘের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এসব কেন্দ্র তো আমরা গড়ে তুলিনি। এসব গড়ে তোলার জন্য কে প্রেরণা দিচ্ছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। এবং এইসব কেন্দ্র খুবই ভাল কাজ করছে। এদের পরিচালকদের সম্পর্কে আমাদের একমাত্র অনুযোগ এই যে, এঁরা সব সময়ে চাঁদ চাইছেন—চাঁদ অর্থাৎ সংঘের কোনও সন্ন্যাসীকে। কিন্তু দেখুন চাঁদ চাইলে তা পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসীর কাজ আপনাদেরই করতে হবে। আপনারাই করে যান। এবার আমি আপনাদের সতর্ক করে দিয়ে একটি সাবধান-বাণী শোনাচ্ছি। এইসব কেন্দ্রের অধ্যক্ষের আসনে পরিচয়হীন, গৈরিকবসনপরিহিত, ছন্নছাড়া সন্ন্যাসীদের যেন বসাবেন না। এই কেন্দ্রগুলির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন গৃহী-ভক্তরাই। যদি কোনও সন্ন্যাসী কোনও কেন্দ্র স্থাপন করেন তবে সেটি তিনি করবেন নিজের চেষ্টায় ও দায়িত্বে। কিন্তু আপনারা যে যেখানেই থাকুন, আপনাদের নিজেদের কেন্দ্র গঠন করবেন এবং কাজ করে যাবেন আর দেখবেন যেন কোনও কলহের সৃষ্টি না হয়— কথাটা বিশেষ করে বাঙালী ভক্তদের সম্পর্কে বলছি। কারণ যখনই কোনও বাঙালী একটি সংস্থা গঠন করেন, দেখা যায় তিন বছরের মধ্যে সেটি তিন পৃথক্ সংস্থায় পরিণত। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন সমন্বয়ের জন্য, সংযোগ-সাধনের জন্য। মতপার্থক্য ঘটতে পারে, কিন্তু আমাদের সকলের উচিত একসঙ্গে কাজ করা। যদি আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাজ করতে না পারি, তবে ধর্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার করে কী

হবে? অতএব একসঙ্গে কাজ করুন, কেন্দ্রের পর কেন্দ্র গড়ে তুলুন যাতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গ্রামে একটি কেন্দ্রের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। কিন্তু কর্মী সরবরাহের জন্য মূল রামকৃষ্ণ সংঘের উপর নির্ভর করবেন না। সুতরাং এইভাবে এবং একমাত্র এইভাবেই আপনারা সংঘকে এবং আন্দোলনকে প্রকৃষ্টভাবে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু যে-কথা আগেই বলেছি, আসলে কেউই, এমন-কি যিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিও—সন্ন্যাসী হোন বা গৃহী—এই সংঘের জন্য কিছু করছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্ম-কুণ্ডলিনীরূপ যে-বিশ্বশক্তি উন্মোচন করে দিয়েছেন সেই শক্তির ক্রিয়ায় সবকিছু হয়ে যাচ্ছে। উক্ত ক্রিয়ায় তাঁরা আমাদের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করছেন এবং আমরা ধন্য হয়ে যাচ্ছি। অতএব এই মহাসম্মেলনে আপনারা প্রত্যেকে দৃঢ় সংকল্প করুন যে আপনারা পাঠচক্র, কর্মকেন্দ্র, আশ্রম গড়ে তুলবেন এবং আপনাদের কিছু শক্তি নিয়োগ করবেন এইসব কাজে। সংসারের জন্য কতখানি সময় আপনারা ব্যয় করেন? কিছু সময় এইসব কেন্দ্রের কাজে দিন না কেন! সংঘের নিজস্ব শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা আর বেশী বাড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু আদর্শ হিসাবে আপনাদের কাছাকাছি সংঘের শাখাকেন্দ্র তো থাকবেই, তাছাড়া পরামর্শের দরকার হলে সংঘের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেন। এইভাবে আপনারা প্রেরণা লাভ করতে পারেন। সুতরাং আমার অনুরোধ, আত্মতুষ্ট থাকবেন না—এই যে-ভাগবতী লীলা আপনাদের সম্মুখে প্রকটিত হচ্ছে তাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবেন না। চুয়ান্ন বছর আগে বিগত মহাসম্মেলনের সময় আমাদের আটান্নটি শাখাকেন্দ্র ছিল, আর এই মহাসম্মেলনের কালে রয়েছে ১৩৮টি শাখাকেন্দ্র। গত মহাসম্মেলনে পাঁচশত ব্যক্তি যোগ দিয়েছিলেন। আর এবার সেই সংখ্যা দশ সহস্রেরও অধিক। কে এসব করছেন? শ্রীশ্রীঠাকুর। পরবর্তী মহাসম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হবে, আমাদের মধ্যে অনেকেই সেটি দেখবার জন্য এখানে থাকবেন না, কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকেই দেখবেন। বেলুড় মঠ এলাকায় তার ব্যবস্থা করা সহজ হবে না, কারণ তখন এক লক্ষ ভক্তের জন্য আয়োজন করতে হবে। ব্যাপারটা তা-ই হতে চলেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি যুক্তিবাদী, বিশেষ ভাবাবেগ আমার নেই। কিন্তু আপনাদের সকলকে এখানে সমবেত দেখে আমিও ভাবাবেগে আপ্লুত হচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপার অনুভূতি থেকে এই ভাবাবেগের উদ্ভব। কী আশ্চর্য নাটকের অভিনয় তিনি করাচ্ছেন! আর যে-কথা আগেই বলেছি, আমাদের দেশে একটি নূতন ধর্মের আবির্ভাব হতে দেখছি। নূতন ধর্ম, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মাধ্যমে এই ধর্মের ব্যাখ্যা করতে হবে। এই ধর্মে আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টান, মুসলমান ভক্ত আছেন—সন্ন্যাসী এবং গৃহী দুই-ই—তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করেন কিন্তু খ্রীষ্টান বা মুসলমানই থাকেন। এটি একটি নূতন আদর্শ যা প্রাচীন হিন্দুধর্ম অথবা অন্য কোনও ধর্মের প্রবক্তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

এই নূতন ধর্ম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং স্বামীজীর ভাষায়—'সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া মুক্তিমুখে লইয়া যাইবে।'*

---

* ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৮০, পূর্বাহ্ণে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহাসম্মেলনে সভাপতির ইংরেজী ভাষণের শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় কৃত অনুবাদ।

ভাসমান

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

প্রায়ই তো মনে হয় সবি আজ ভাসমান
স্বচ্ছমেঘছায়া লঘুবস্তুভার, স্বপ্ন যেন
ব্যস্ত জীবনের সব কৃতি ; আত্মীয় স্বজন
কলত্র ও পুত্রকন্যা যেন অন্য জগতের,—
ছিল চেনা কবে কোথা কোনো এক
নিম্নমোড়ে।

* * *

বস্তুরসে কখনো মশগুল, বুকে ডাকে তবু
কোন্ ঋতুপাখি কোনো নীল-সমুদ্রের পারে
শুভ্র শৃঙ্গনীড়ে। বহুপরিচিত চেনাপথ
আজ অন্য কোনো চেনাপথ সন্ধানেই ফিরি
ব্যাকুল বাউল। সমস্যাসঙ্কট, জনতার
উত্তেজনা অর্ধস্বচ্ছ দেখি, আর শুনি শুধু
শান্ত কলরব দূর ঘণ্টাধ্বনি।

সংসার-মাঝে তুমি

শ্রীমতী চিত্রা মিত্র

শত ভাবনার বোঝা লয়ে প্রভু, সংসারে পথ চলা।
বলিতে যে কথা গেছি বার বার—দেখি যে হয়নি বলা।
মাঝে মাঝে ভাবি আশ্রয় লব তোমারি চরণতলে,
অন্ধকারের গহনেতে যেন ডুবে যাই পলে পলে।
অসীম শূন্যে অসহায় আমি উপরে কুয়াশা ঘন।
মায়া, মোহ, ভ্রম, মিথ্যা দুরাশা ঘিরে থাকে মম মন।
এ জীবন নয়, শত জীবনের কলুষ কালিমা হায়
হাত ধরে যেন অজানিত পথে কোথা মোরে লয়ে যায়!

স্মরিণু তোমারে ক্ষণেকের তরে ওগো অন্তর্যামী,
লক্ষ যুগের তমসার মাঝে পথহারা বুঝি আমি!
হঠাৎ জ্বলিল আলোকের শিখা বদনচন্দ্র ঘেরি।
শঙ্কা কোথায়? শঙ্কাহরণ, আমি যে তোমারে হেরি!
শুনিলাম তব মধুর কণ্ঠে একটি অমৃতবাণী
'আমারি লাগিয়া সংসার তব, সকলের মাঝে আমি।'

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূর্ব সংখ্যায় মানবিক দিক থেকে জ্ঞানের মাধুর্যের কথা কিছু বলা হয়েছে। তারপরে আসে স্বভাবতঃই মানবিক ভক্তির মাধুর্যের কথা। কারণ, কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে যথার্থ বা পরিপূর্ণভাবে জানলে স্বতঃই তার প্রতি উদয় হয় এক গভীর অনুভূতির, যাকে সাধারণতঃ বলা হয় 'ভক্তি' বা 'প্রীতি'। বলাই বাহুল্য যে, এই দিক থেকে বৈষ্ণব-দর্শনের দান সমধিক, যেহেতু এরূপ 'ভক্তি' বা 'প্রীতি'ই এই দর্শনের প্রাণস্বরূপ।

বস্তুতঃ, সমগ্র বৈষ্ণব-দর্শনই 'ভক্তি' বা 'প্রীতি'র জয়গানে মুখরিত, রসপানে মোহিত, আনন্দাস্বাদনে মোদিত; এবং এই মধুর দর্শনের ভক্তি-প্রীতির মাধুর্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একাধারে বিমুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ ক'রে রেখেছে আন্তন্তকাল।

অবশ্য 'ভক্তি' ও 'প্রীতি'র মধ্যে প্রভেদ যাত অল্পই করা হয় অনুভূতিপ্রধান বৈষ্ণব-দর্শনে। যেস্থলে সম্ভ্রমের স্থান অধিক, সেস্থলে 'ভক্তি'র এবং যেস্থলে সখ্যের স্থান অধিক, সেস্থলে 'প্রীতি'র প্রাবল্য স্বভাবতঃই অবিসংবাদী। কিন্তু কোথায় যে সম্ভ্রমের শেষ ও সখ্যের আরম্ভ; এবং কিরূপে যে সম্ভ্রম সখ্যে, এবং সখ্য সম্ভ্রমে নিমজ্জিত হয়ে একীভূত হয়ে যায়—সে রোমাঞ্চকর ইতিহাস সকলের জানা নেই, জানতে পারা সম্ভবও নয়, জানতে চাওয়া প্রয়োজনীয়ও নয়। সেজন্য জ্ঞানিগুণী বৈষ্ণবগণ সস্নেহে বলেছেন যে, চিন্তা-ভাবনা, তর্কাতর্কি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব না ক'রে নির্ভয়ে নিসংশয়ে নির্বিবাদে নির্বিচারে 'ভক্তি' ও 'প্রীতি'কে সমার্থক ব'লে গ্রহণই করে নেওয়া যাক—প্রকৃত তৃপ্তি শান্তি পূর্তি আছে তাতেই।

ভক্তিবাদীরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, এরূপ ভক্তি-প্রীতির মাধুর্য অন্য যে কোন প্রকারের মাধুর্যকে পরাজিত করে শতসহস্রকোটি যোজন দূরত্বের ব্যবধানে। জ্ঞানের মাধুর্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা যেন বড়ই স্থিরধীর, বড়ই গুরুগম্ভীর, বড়ই কেতাদুরস্ত, বড়ই বাঁধা-ধরা—তাতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য থাকতে পারে, নেই কিন্তু অনুভূতির আবেগ, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, উল্লাস। প্রিয়তমকে কেবল জেনে সন্তুষ্ট হওয়া নয়, তাঁকে পেয়ে অধীর হওয়া; এবং এরূপ অধীরতাই মাধুর্যের নির্ঝরিণী। নির্ঝরিণী যেরূপ একস্থানে আবদ্ধ থাকে না, থাকতে পারে না একমুহূর্তও, তার গতি শতদিকে, সেরূপ ভক্তি-প্রীতির অধীরতাও শতদিক থেকে উদ্বেল হয়ে প্রিয়জনকে ঘিরে ফেলছে—জ্ঞানের স্থিরতা-দৃঢ়তার মত একটি দিকেই কেবল গতিশীল না হয়ে; এবং বৈষ্ণব মতে এইটিই হ'ল মধুরসের পূর্ণতম ব্যাপকতম সত্যতম আস্বাদন। মতভেদ থাকতে পারে এই সম্বন্ধে যে, স্থিরতাই অধিক মধুর অথবা উচ্ছলতা; একাভিমুখিত্বই অথবা শতদিকব্যাপিত্ব; সংযমশীলতা, অথবা বন্ধনহীনতা। তা সত্ত্বেও বৈষ্ণব-বেদান্তের 'ভক্তি-প্রীতি'র মধুময়তা যে কোন হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ ও সঞ্জীবিত করতে বাধ্য।

এরূপ 'ভক্তি-প্রীতি'র আরেকটি সর্বজনবিদিত সর্বজনসমাদৃত নাম 'রাগ'। রূপগোস্বামীকৃত সুবিখ্যাত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে 'রাগে'র সংজ্ঞা এরূপ দেওয়া হয়েছে সংক্ষেপে: 'ইষ্টে স্বারসিকী

রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।' (১।২।১৩১)। অর্থাৎ, অভীষ্ট বস্তুতে যে স্বাভাবিকী প্রেমময়ী তৃষ্ণা থাকে, তা থেকে সেই ইষ্টবস্তুতে গভীর ও ব্যাপক আবিষ্টতার উদয় হয়। এরূপে যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা এই পরমাবিষ্টতার সৃষ্টি করে, তা-ই হ'ল 'রাগ'।

সেজন্য 'রাগ' হ'ল বিহ্বলতা, তদ্‌গতচিত্ততা, তন্ময়তা,—অনুরাগীর নিকট তাঁর অনুরাগের পাত্রই সব কিছু—আর অন্য কোন কিছুই তাঁর জীবনে বিন্দুমাত্রও নেই মুহূর্তমাত্রও।

উপরের 'রাগে'র সংজ্ঞার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জীব-গোস্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন : 'ইষ্টে স্বানুকূল্য-বিষয়ে স্বারসিকী আবিষ্টতা—তস্যাঃ হেতুঃ প্রেমময়ী তৃষ্ণেত্যর্থঃ।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' 'রাগে'র লক্ষণ নির্দিষ্ট করেছেন এইভাবে—

'ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা—এই স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥'
(২।২২।৮৬)

এরূপে বৈষ্ণবমতানুসারে ইষ্টে যে গাঢ় তৃষ্ণা অথবা বলবতী লালসা, তারই নাম 'রাগ'। 'তৃষ্ণা' কি? 'তৃষ্ণা' হ'ল আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে লাভের জন্য অতি প্রবল ইচ্ছা, যা মুহূর্তমাত্রও বিলম্বসহনে অপারগ। যেমন, শরীরে জলাভাব ঘটলে তৎ-ক্ষণাৎ জলপানের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় 'তৃষ্ণা'। এই 'তৃষ্ণা' এরূপ প্রবল যে, তখন আর অন্য কিছুই ভালো লাগে না, অন্য কিছুতেই মন যায় না, অন্য কিছুরই কামনা থাকে না—কেবল কামনা থাকে জলেরই জন্য একমাত্র। শেষে যেন মনে হয়—প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না জল বিনা। এই যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই যে গভীর উৎকণ্ঠা, এই যে 'আকুলি ব্যাকুলি' ভাব, এই যে 'প্রাণ যায় যায়' অবস্থা একেই বলা হয়েছে 'তৃষ্ণা'। সেজন্য 'রাগে'র স্বরূপ লক্ষণ হ'ল এই যে, রাগের পাত্রের জন্য প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, প্রবল বাসনা, প্রখর লালসা, উদ্দাম উৎকণ্ঠা, অন্তহীন আকুলতা, 'প্রাণ যায় যায়'-রূপ তৃষ্ণা—এককথায়, ইষ্টবস্তুকে পাবার জন্য উত্তাল ইচ্ছা। কেন? কোন স্বার্থপর লাভের জন্য নয়, কোন কলুষিত ভোগের জন্য নয়,-কিন্তু ইষ্টবস্তুকে সেবার দ্বারা তাঁকে আনন্দদানের জন্যই কেবলমাত্র।

এরূপ ইষ্টবস্তুর প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রেমময় সেবার দ্বারা, তাঁতে যে পরম আবিষ্টতা বা তন্ময়তা জন্মে, তাই হ'ল 'রাগে'র 'তটস্থ লক্ষণ'। যিনি এইভাবে আবিষ্ট অথবা তন্ময় হয়ে যান ইষ্টপ্রিয়জনের জন্য, তাঁর জীবন থেকে, প্রাণ-মন-আত্মা থেকে অন্য সব কিছুই তিরোহিত হয়ে যায়; তাঁর বাহ্যজ্ঞানও থাকে না,—ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির মত হয়ে যায় তাঁর আচারাচরণ; তাঁর নিজের স্বাভাবিক কার্যকলাপ আর কিছুই থাকে না—কেবল রাত্রিদিন প্রতি নিমেষেই মনে হয় সেই একটি মাত্র ইষ্টজনের কথাই—এই হ'ল 'আবেশ', বা 'আবিষ্টতা'।

বৈষ্ণবমতানুসারে এরূপ 'রাগ' অথবা তৃষ্ণার একটি অপরূপ বৈশিষ্ট্য এই যে, এর কখনও শান্তি বা সমাপ্তি নেই। পার্থিব যে তৃষ্ণা, তা নিবৃত্ত বা তিরোহিত হয়ে যায় লক্ষ্য-বস্তুটি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই। যেমন, জলপান করলেই তৃষ্ণা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ইষ্টবস্তুকে প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শান্তি হওয়া ত দূরে থাক, বরং পূর্বের সেই তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। 'তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।' (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ১।৪।৩০)। অর্থাৎ, ইষ্টবস্তুকে প্রেমময়ী সেবার বাসনা যতই পূর্ণ হয়, ততই তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন, সংসারে, ক্ষুধার উদ্রেক হ'লে যথোপযুক্ত খাদ্যগ্রহণের ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে গেলে, আর খাদ্যের জন্য বিন্দুমাত্রও স্পৃহা থাকে

না—বরং খাদ্যের কথা বললে তখন তাঁর বমনোদ্রেক হয়, খাদ্যকে আর মধুর লাগে না, 'অমৃতেও হয় অরুচি', ও খাদ্যের জন্য কণামাত্রও আকাঙ্ক্ষা থাকে না স্বাভাবিকভাবেই।

কিন্তু আধ্যাত্মিক 'তৃষ্ণা'য় ঘটে ঠিক এর বিপরীত ঘটনা। কারণ, এক্ষেত্রে ইষ্টবস্তুটিকে যতই লাভ করা যায়, ততই তাঁর জন্য আকাঙ্ক্ষা ও তাঁর প্রতি রাগ বর্ধিতই হ'তে থাকে, কোনদিনই তাঁর প্রতি বিরাগ জন্মে না। পূর্বের উদাহরণে দেখি যে, বিষম ক্ষুধার্ত ব্যক্তি একমুহূর্ত আগে পর্যন্ত খাদ্যের জন্য অতি ব্যাকুল ছিলেন; এখন পেটভরে খাবার খেয়ে ক্ষুধা দূর হ'লে পরমুহূর্তেই খাদ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা বা রাগ তাঁর থাকবেই না, উপরন্তু বিরাগ জন্মাবে ঘোরতর। এস্থলে কিন্তু প্রাণভরে ইষ্টবস্তুকে লাভ করলেও, শাশ্বতকাল তাঁকে প্রীতি ও সেবা করলেও, নিরন্তর তাঁকে আস্বাদন করলেও, তিনি কোনদিনও পুরাতন হয়ে যান না, নিঃশেষিত হয়ে যান না, বরং নিত্য-নূতনরূপে অনুভূত হন—মনে হয়, যেন পূর্বে আর কোনদিনও তাঁকে পাইনি, তাঁকে প্রীতি করিনি, তাঁর সেবা করিনি, তাঁর সৌন্দর্যমাধুর্য-রস আস্বাদন করিনি—যেন এই-ই সর্বপ্রথম এই সব করা হচ্ছে।

এইভাবে 'রাগে'র, লক্ষণ নির্দিষ্ট ক'রে 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' 'রাগাত্মিকা ভক্তি'র নিম্নোক্ত সংজ্ঞাদান করেছে:

'ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥'
(১।২।১৩১)

'রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।'
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২।২।৮৭)

'রাগে'র ব্যাখ্যা উপরে করা হয়েছে। এরূপ 'রাগে'র প্রাবল্য যে ভক্তিতে, তা-ই হ'ল 'রাগাত্মিকা ভক্তি'। পূর্বে উল্লিখিত জীবগোস্বামীর টীকা পুনরায় উদ্ধৃত করি, সামান্য সংযোজন সহ—

'ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা তস্যাঃ হেতুঃ প্রেমময়তৃষ্ণেত্যর্থঃ। সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তিরায়ুর্ঘৃত-মিতিবৎ।'　(১।২।১৩১)

"স্বাভিপ্রেত ইষ্টে স্বরসানুসারী যে পরমাবিষ্টতা, তার হেতু যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তা-ই হ'ল 'রাগ'। আয়ুর বর্ধক ব'লে ঘৃতকে যেরূপ 'আয়ু' বলা হয়, সেরূপ রাগের আধিক্যবশতঃই রাগ ও রাগাত্মিকার অভেদের কথা বলা হয়েছে।"

'স্বরসানুসারী' শব্দটির অর্থ হ'ল এই যে, এরূপ পরমাবিষ্টতা ব্যক্তিভেদে, তাঁদের স্ব স্ব রস অথবা ভাব অনুসারে হয়—অর্থাৎ, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর ইত্যাদি ভাবানুসারে। যেমন, মাতা যশোদা তাঁর ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট অথবা তন্ময় হয়ে যান তাঁকে বাৎসল্য রসে সিঞ্চিত করে; গোপীগণ মধুর অথবা কান্তা রসে; গোপবালকগণ সখ্য রসে, ইত্যাদি।

সুবিশাল বৈষ্ণব-দর্শনে তার প্রাণস্বরূপ 'ভক্তি-প্রীতিবাদ' প্রপঞ্চিত করা হয়েছে বিশেষ যত্ন, নিষ্ঠা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে। অবশ্য, 'ভক্তি-প্রীতি'ই 'রাগ'; তা সত্ত্বেও উপরে 'রাগাত্মিকা ভক্তি' ব'লে বিশেষ জোরের সঙ্গে 'ভক্তি-প্রীতি'কে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তারাই যে রাগস্বরূপ—এককথা স্পষ্ট করবার জন্য।

বৈষ্ণব-বেদান্তে 'ভক্তি-প্রীতি' অথবা 'রাগ' সম্বন্ধে অসংখ্য আলোচনা-প্রপঞ্চনা আছে। অতি সংক্ষেপে সে বিষয়ে সামান্য কিছু বলা হ'ল, ভক্তির মাধুর্য বোঝাবার জন্য। যে ভক্তি-প্রীতি অথবা রাগে, তাদের পাত্রের জন্য প্রারম্ভে এরূপ আকুলতা এবং পরিশেষে এরূপ আবিষ্টতা আছে, তা যে আদ্যোপান্ত মাধুর্যমণ্ডিত, মধুরসসিঞ্চিত, তা ত সহজেই বোঝা যায়। কারণ, এমন কি, প্রিয়জনের জন্য আকুলতা-ব্যাকুলতাও দুঃখের

কারণ হয় না, বরং হয় প্রতীক্ষাজনিত, আশাজনিত এক অনুপম আনন্দেরই কারণ। সেজন্য আমরা জানি যে, বৈষ্ণব-দর্শনে, বিরহ মিলনের অপেক্ষা উচ্চতর, কাম্যতর—যেহেতু বিরহেই রয়েছে শাশ্বত মিলনের আভাস।

ভক্তি-মাধুর্যের পরেই অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে কর্ম-মাধুর্যের কথা। কারণ, ভক্তি-প্রীতির অর্থ ই যে সেবা-পূজা, তা উপরেই বলা হয়েছে। প্রিয়জনের প্রতি অন্তরে ভক্তি-প্রীতির অর্থ ই হচ্ছে বাইরে তাঁর সেবা-পূজা এবং ভক্তজনের এই ত শ্রেষ্ঠ আনন্দ। এই কারণে, বৈষ্ণব-দর্শন তথা অন্যান্য সকল দর্শনেও নিষ্কামকর্মের উপর এরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে—যার প্রয়োজন প্রারম্ভে ও পরিশেষে সমান সমান। প্রারম্ভে নিষ্কামকর্মের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হ'লে, তবেই সেই নির্মল চিত্তে উদিত হ'তে পারে জ্ঞান-ভক্তি। পরিশেষে উপাস্যজনের প্রতি ভক্তি-প্রীতিকে প্রকাশিত-প্রমাণিত করতে হবে বাইরের নিষ্কামকর্মের দ্বারা —তাঁর সেবা ক'রে, তাঁর অভিপ্রেত কর্ম ক'রে, তাঁর মূর্ত বিগ্রহ জীবজগতের কল্যাণসাধন ক'রে।

এস্থলে যখন বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব-দর্শনের কথাই বলা হচ্ছে, তখন অন্যান্য দর্শনের নিষ্কাম-কর্মবাদ ও নিষ্কামকর্মের মাধুর্য সম্বন্ধে কিছু না ব'লে, বরং বৈষ্ণব-দর্শনের নিষ্কামকর্ম-মাধুর্যের বিষয়ে সামান্য দু-একটি কথা মাত্র বলা যেতে পারে। অবশ্য, অতি বিস্তৃত এই নিষ্কামকর্ম-তালিকা। সেজন্য কেবল একটি মাত্র সর্বজনপ্রিয় এবং সর্বজন-শ্রদ্ধেয় শ্লোকের উল্লেখ করছি। এই অপূর্ব শ্লোকটি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কর্তৃক রচিত বিশ্ববিশ্রুত 'শিক্ষাশ্লোক' অথবা 'শিক্ষাষ্টকে'র তৃতীয় শ্লোক, যাতে কেবল বৈষ্ণব কেন, সকল সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেরই অবশ্যকরণীয় সম্বন্ধে অতি সুন্দর নির্দেশ-দান করা আছে—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' (শিক্ষাষ্টক, শ্লোক ৩)

অর্থাৎ, তৃণের অপেক্ষাও বিনীত হবে, তরুর মতোই ধৈর্যশীল হবে; সমস্ত দম্ভ অহঙ্কার ঔদ্ধত্যাদি ত্যাগ করবে; সকলকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবে; এবং এইভাবে সর্বদা শ্রীভগবানের মধুনাম কীর্তন করবে।

এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সাধন-তত্ত্ব আলোচনাকালে করা হবে।

ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ গুণ (বলদেব মতে) 'সৌন্দর্যে'র প্রথম অংশ 'মাধুর্য' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে, প্রথমে মানবীয় জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-মাধুর্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে এই কারণে যে, এই থেকেই ব্রহ্মেরও জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-মাধুর্য সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, অতি সামান্য হ'লেও। পরে ঐশ্বরিক জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-মাধুর্যের বিষয় বলা হবে।

[ক্রমশঃ]

ঋষিকৃষ্ণ-আখ্যায়িকা

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্যবহারিক জীবনে যে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, সে-ই আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বাসের অধিকারী হয়। জাগতিক বিষয়ে বিশ্বাসঘাতের পরিণাম ঘোরতর ধর্মহীনতা। অসাধু দেওয়ানের দৃষ্টান্ত দিয়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করে দিয়েছেন। [লুক ১৬]—

এক ধনী ভদ্রলোকের এক দেওয়ান ছিল। ঐ দেওয়ানের নামে অভিযোগ এল যে সে জিনিস-পত্র নষ্ট করে ফেলছে। ভদ্রলোক তখন তাকে

ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমার নামে এসব কী শুনছি! তোমার দেওয়ানির হিসেব দাও, কেননা তোমাকে আর দেওয়ান রাখা হবে না।'

ঐ দেওয়ান তখন মনে মনে ভাবল, 'মনিব যদি আমার দেওয়ানি কেড়ে নেয় তাহলে করবটা কী? মাটি কেটে যে খাব সে সামর্থ্য নেই; ভিক্ষে করতেও মাথা কাটা যায়। তাহলে এমন একটা কিছু করতে হয় যাতে দেওয়ানি গেলেও লোকের বাড়িতে আমার একটু জায়গা হয়।'

মনিবের দেনদারদের একজনের কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমার মনিবের কাছে কত ধারো?'

সে বলল, 'একশো পিপে তেল।'

দেওয়ান বলল, 'তোমার খত নাও—শিগগির পঞ্চাশ পিপে লেখো।'

তারপর আর একজনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কাছে কত পাওনা?'

'একশো বস্তা গম।'

'খত নাও—লেখো, আশি বস্তা।'

মনিব তার এই অসাধুতার কথা শুনেও তাকে বাহবা দিলেন, কেননা সে চালাকচতুরের মতো কাজ করেছে।

অসাধু দেওয়ানের এই আখ্যায়িকা শেষ করে যীশু বলেছেন, 'যে ছোটোখাটো ব্যাপারেও বিশ্বাসের পরিচয় দেয়, গুরুতর বিষয়েও সে তেমনই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর যে ছোটোখাটো ব্যাপারেও অসাধু, বড়ো ব্যাপারেও সে অসাধু। তুমি যদি অপরের বিষয়ে বিশ্বাসী না হও, তাহলে কে তোমাকে তোমার প্রাপ্য দেবে! কেউ একসঙ্গে ঈশ্বর আর শয়তান এই তুইজনেরই সেবা করতে পারে না।'

ধর্মপথেরই অনুসরণ করে শ্রীভগবানের কাছে বারবার ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হবে। নিয়ত আবেদনে অসাধু ব্যক্তিও যে ধর্মসংগত আচরণে প্রবৃত্ত হতে পারে যীশু তার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। [লুক ১৮]—

কোনো এক শহরে এক বিচারক ছিল যে ঈশ্বরকে ভয় করত না, কোনো লোককেও মানত না। সেই শহরের এক বিধবা প্রায়ই তার কাছে এসে বলত, 'অন্যায়ের প্রতিবিধান করে বিপক্ষের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

ঐ বিচারক অনেক দিন পর্যন্ত তার আবেদনমত কাজ করতে আগ্রহী হয়নি। কিন্তু পরে ভাবল, 'আমি ভগবানকে ভয় করি না, কোনো লোকেরও তোয়াক্কা করি না। কিন্তু এই বিধবা স্ত্রীলোকটা আমাকে বড়োই জ্বালাচ্ছে; অন্যায়ের হাত থেকে ওকে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, তা না হলে হরদম এসে এসে আমাকে একেবারে জেরবার করে ফেলবে।'

বারবার আবেদনে অসাধু বিচারক পর্যন্ত অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে প্রবৃত্ত হয়, আর ভক্তের নিয়ত আকুল প্রার্থনায় শ্রীভগবান সাড়া দেবেন না!

প্রার্থনা করলেই, জপতপ করলেই যে ভগবানকে পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নয়। এ দোকানদারি নয় যে এতক্ষণ প্রার্থনা করলে বা এত পরিমাণ জপতপ করলে তিনি দেখা দেবেন! শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবানুসরণে বলা যায়— 'তাঁর কৃপার উপর নির্ভর।' [কথামৃত ১।১৩।৩] —যীশু একটি আখ্যায়িকায় শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণার কথা বলেছেন, মানববুদ্ধি দিয়ে যার চুলচেরা বিচার করা যায় না। [ম্যাথিউ ২০]—

এক গৃহপতি তাঁর আঙুরখেতে মজুর লাগানোর জন্য খুব সকালেই বেরোলেন। কয়েকজন মজুরের দেখা পেয়ে এক পেনি রোজের চুক্তি করে তাদের আঙুরখেতে পাঠালেন।

দিনের তৃতীয় ঘণ্টায় তিনি বাজারে গিয়ে দেখলেন জনকতক মজুর তখনও কাজ না পেয়ে বসে রয়েছে। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমার আঙুরখেতে যাও যা সংগত মনে করব তোমাদের দেব।'

তারা খেতে কাজ করতে চলে গেল। ঐভাবে ষষ্ঠ ঘণ্টা আর নবম ঘণ্টায় তিনি জনকতক করে মজুর খেতে পাঠালেন। দিনের একাদশ ঘণ্টায় তিনি দেখলেন যে কতকগুলো মজুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন. 'তোমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন ?'

তারা বলল, 'আমাদের কাজ জোটেনি।'

তিনি বললেন, 'তোমরাও আমার আঙুর-খেতে যাও।'

সন্ধ্যা হলে আঙুরখেতের মালিক ঐ গৃহপতি তাঁর দেওয়ানকে বললেন, 'মজুরদের ডেকে আনো। শেষ থেকে শুরু করে প্রথম পর্যন্ত সবাইকে মজুরি দাও.

যারা একাদশ ঘণ্টায় এসেছিল তারা প্রথমে এল—প্রত্যেকেই এক পেনি করে মজুরি পেল। শেষে যখন প্রথম থেকেই যাদের খেতের কাজে লাগানো হয়েছিল তারা এল, তখন তারা মনে করল যে তারা বেশি পাবে। কিন্তু তারাও ঐ এক পেনি করে পেল

তখন তারা গজগজ করতে করতে গৃহপতিকে বলল, 'যারা মাত্র একঘণ্টা কাজ করেছে তারা যা পেল আর আমরা যারা সারাদিন রোদে পুড়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটলাম, আমরাও তাই পেলাম !'

কিন্তু গৃহপতি বললেন, 'কী মিতে! তোমরা এক পেনি রোজেই রাজি হওনি! তা তো পেয়ে গেছ, এবার কেটে পড়ো। তোমাদের যা দিয়েছি শেষের লোকটাকেও তাই দেব এ আমার খুশি। আমার নিজের টাকা নিজের ইচ্ছেমত খরচ করবার হক নেই কি ? না কি আমি দরাজ বলে তোমাদের চোখ টাটাচ্ছে।'

শ্রীভগবানের কৃপার প্রত্যাশী হলে হিসেব-নিকেশ করার প্রশ্ন ওঠে না। কৃপা মানেই অহৈতুকী করুণা—যার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা ছাড়া আর কী করণীয় আছে! শুধু সজাগ থাকতে হবে যে প্রতিকূল ভাবনায় বা আচার-আচরণে হৃদয়ের নিরন্তর ব্যাকুলতা যেন না পরিক্ষীণ হয়ে পড়ে।

তিন

মহিমাচরণ চক্রবর্তী দক্ষিণেশ্বরে পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসে অন্য ভক্তদের সঙ্গে 'উচ্চৈঃ-স্বরে শাস্ত্রালাপ' করছেন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ 'ঈষৎ হাস্য' করে মন্তব্য করেছেন, 'ঐ ঝাড়ছে! রজোগুণ! রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেক্‌চার দিতে ইচ্ছা হয়। সত্ত্বগুণে অন্তর্মুখ হয়,—আর গোপন।' [কথামৃত ৪।১২।৩]

গুণ অনুসারে লোকের ভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কে অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের ভিন্ন স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ, অহংকার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশী কাজ জড়ায়; কাপড়, পোষাক ফিট-ফাট, বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় কুইনের ছবি, যখন ঈশ্বর চিন্তা করে তখন চেলী-গরদ পরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটি একটি সোনার রুদ্রাক্ষ; যদি কেউ ঠাকুরবাড়ি দেখ্‌তে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায় আর বলে, এদিকে আসুন আরও আছে, শ্বেত পাথরের, মার্বেল পাথরের মেজে আছে, ষোল-ফোকর নাটমন্দির আছে। আবার দান করে, লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট-শান্ত, কাপড় যা তা; রোজগার পেট চলা পর্যন্ত, কখনও লোকের তোষামোদ ক'রে ধন লয় না, বাড়িতে মেরামত নেই, ছেলেদের পোষাকের

জন্য ভাবে না; মান-সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না, ঈশ্বরচিন্তা, দানধ্যান সব গোপনে—লোকে টের পায় না, মশারীর ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই তাই বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বরলাভের আর দেরী হয় না—একটু গেলেই তাঁকে পাবে।' [কথামৃত ১।১২।৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতীয় ধর্মভাবনার আদর্শে ভক্তের শ্রেণীবিভাগ করেছেন; যীশু সমকালীন ইহুদী সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় একটি আখ্যায়িকায় দুই শ্রেণীর ভক্তের পরিচয় দিয়েছেন। [লুক ১৮]—

দুজন লোক মন্দিরে প্রার্থনা করতে গেল। একজন ফ্যারিসী (গোঁড়া ধর্মাচারী), আর একজন করসংগ্রাহক।

ফ্যারিসী দাঁড়িয়ে উঠে আপনাআপনি প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে চলল, 'ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কেননা আমি অন্য সব লোকের মতো—জুলুমবাজ, অন্যায়ী, লম্পট—বিশেষ করে ঐ গোমস্তাটার মতো নই। আমি হপ্তায় দুদিন করে উপোস করি। আমি যা আয় করি তার শতকরা দশভাগ দানধর্ম করি।'

কিন্তু করসংগ্রাহক বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে, উপরে স্বর্গলোকের দিকে মুখ তুলে তাকাতে সাহসী না হয়ে মুখ নিচু করে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল, 'ভগবান, আমি পাপী, কৃপা করো আমায়!'

নিজেদের ধার্মিক বলে মনে করে এমন কজন লোকের কাছে যীশু এই আখ্যায়িকা বলেছেন। পরিশেষে মন্তব্য করেছেন, 'আমি বলছি তোমাদের, এই লোকটাই (করগ্রাহী) অন্য লোকটার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়নিষ্ঠ। কেননা, যে নিজেকে বড়ো করে, সে নিচু হয়ে যাবে; আর যে নিজেকে নত করে, সে-ই বড়ো হবে।'

অনুরূপ পটভূমিকায় আর একটি ছোট্ট আখ্যায়িকা। [ম্যাথিউ ২১]—

একজন লোকের দুই ছেলে। তিনি বড়ো ছেলেকে বললেন, 'বাপ, আজ আঙুরখেতে কাজ করোগে।'

সে বলল, 'আমি যেতে পারব না।'—কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে সে আঙুরখেতে গেল।

ছোটো ছেলেকেও তিনি আঙুরখেতে কাজ করতে যাবার জন্য বললেন।

সে বলল, 'এই যাচ্ছি, বাবা।'—কিন্তু গেল না।

যীশু সমবেত ধর্মযাজকদের প্রশ্ন করলেন, 'এই দুজনের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছানুসারে কাজ করেছে?'

তারা বলল, 'বড়ো ছেলে।'

যীশু বললেন, 'নিশ্চয় করে বলছি আমি—করগ্রাহী আর বেশ্যারাও তোমাদের আগে দিব্য-ধাম লাভ করবে। জন (ব্যাপটিস্ট) ধর্মনীতি অনুসরণ করে তোমাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করনি। করগ্রাহী আর বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। আর তোমরা! তোমরা তা দেখলে, কিন্তু পরেও অনুতাপ করনি, তাঁকে বিশ্বাসও করনি।'

অধ্যাত্মচেতনাহীন পুরোহিতসম্প্রদায়কে তিনি কঠোরভাষায় তিরস্কার করতে ধিক্কার দিতে দ্বিধা-বোধ করেননি। আর একটি আখ্যায়িকায় তিনি তাদের স্বার্থসঞ্জাত বৈরিভাবের পরিণাম যে কী তা সংকেতে জানিয়েছেন। [ম্যাথিউ ২১, মার্ক ১২, লুক ২০]—

এক ভূস্বামী আঙুরখেত করে সারা জমিটা বেড়া দিয়ে ঘিরলেন, আঙুর পিষে রস রাখবার জন্য একটা কুণ্ড তৈরি করালেন, একটা উঁচু

পাহারাঘরও তৈরি করালেন। তারপর তিনি জনকতক চাষীকে আঙুরখেতটা জমা দিয়ে অন্য দেশে গেলেন।

যখন আঙুর ফলবার সময় এল, তিনি তাঁর প্রাপ্য ফল আনার জন্য কজন চাকরকে পাঠালেন। চাষীরা কিন্তু তাঁর চাকরদের কাউকে বেদম প্রহার দিল, কাউকে বা মেরেই ফেলল, কাউকে বা পাথর ছুঁড়ে মেরে তাড়িয়ে দিল।

ভূস্বামী তারপর আরও কয়েকজন চাকরকে পাঠালেন; কিন্তু চাষীরা তাদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করল।

ভূস্বামী তখন ভাবলেন, 'আমি আমার ছেলেকেই পাঠাই। আমার ছেলেকে ওরা নিশ্চয়ই সমীহ করবে।'

তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে চাষীদের কাছে পাঠালেন।

ছেলেকে দেখে চাষীরা যুক্তি করতে লাগল, 'এ ছেলেটা মালিকের একমাত্র উত্তরাধিকারী। একে মেরে ফেলি, তাহলে এ সম্পত্তি আমাদেরই হবে।'

তারা তাকে ধরে আঙুরখেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেললে।

আখ্যায়িকা শেষ করে যীশু সমবেত পুরোহিতদেরই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ আঙুর-খেতের মালিক এসে ঐ চাষীদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবেন?'

তারা বলল, 'তিনি ঐ হতভাগা লোকগুলোকে মেরে শেষ করে দেবেন। তারপর ঐ আঙুরখেত এমন চাষীদের দেবেন যারা তাঁকে ফল দেবে।'

যীশুর আখ্যায়িকার সংকেত বুঝতে তাদের বাকি থাকল না। তারা বলল, 'ঈশ্বর করুন, এমন না হয়।'

যীশু বললেন, 'ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের অধিকার তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। এমন এক জাতিকে ঐ অধিকার দেওয়া হবে যারা তাঁকে ফলের উপচার সমর্পণ করবে।'

ভিখারি ল্যাজারাসের আখ্যানের মর্মার্থ স্পষ্টতর। [লুক ১৬]—

ধনশালী একজন লোক বেগুনী রঙের লিনেনের পোশাক পরত প্রতিদিন খুব জাঁকজমক করে আমোদপ্রমোদ করত। ঐ ধনীর খাবার টেবিল থেকে ঝড়তিপড়তি কিছু পাবে এই আশায় তার বাড়ির ফটকের কাছে ল্যাজারাস নামে এক ভিখারি থাকত। সারা গা তার ঘায়ে ভর্তি। কুকুরগুলো পর্যন্ত এসে ঐ সব ঘা চেটে দিত।

কালে ঐ ভিখারি মারা গেল। দেবদূতরা এসে তাকে আব্রাহামের কোলে নিয়ে গিয়ে বসাল।

এদিকে ঐ ধনীও মারা গেল, তার দেহ কবর দেওয়া হল।—নরকে গিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে সে চোখ তুলে দেখল, অনেক দূরে আব্রাহামের কোলে ল্যাজারাস বসে রয়েছে।

সে চিৎকার করে বলল, 'পিতা আব্রাহাম, আমাকে করুণা করুন। ল্যাজারাসকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। সে যেন আঙুলের ডগা জলে ডুবিয়ে আমার জিভ ঠাণ্ডা করে; এখানে আগুনের শিখায় আমার যন্ত্রণা হচ্ছে।'

আব্রাহাম কিন্তু বললেন, 'বাপু হে, মনে করে দেখো, তুমি যতদিন বেঁচে ছিলে ততদিন অনেক ভালো ভালো জিনিস ভোগ করেছ আর ল্যাজারাস কেবল খারাপ জিনিসই পেয়েছে। কিন্তু এখন সে সান্ত্বনা পাচ্ছে আর তুমি যন্ত্রণা পাচ্ছ। তা ছাড়া আমাদের আর তোমাদের মধ্যে অনেক ফারাক। যারা এখান থেকে ওখানে যেতে চায় তারাও ওখানে যেতে পারবে না আর ওখান থেকে তো কেউই এখানে আসতে পারবে না।'

তখন সে বলল, 'আমি আপনার কাছে মিনতি করছি পিতা, ল্যাজারাসকে আমার পৈতৃক বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। আমার পাঁচ ভাই আছে। ও সেখানে গিয়ে সাক্ষ্য দিক, যাতে তারাও না এই যন্ত্রণার জায়গায় আসে।'

কিন্তু আব্রাহাম বললেন, 'তাদের কাছে মোজেস আর অন্য মহাপুরুষরা আছেন। তাঁদের কথাই তারা শুনুক।'

সে বলল, 'তা নয় পিতা আব্রাহাম, বরং যদি কেউ মৃতদের মধ্য থেকে সেখানে যায় তার কথা শুনে তারা অনুতাপ করবে।'

তিনি বললেন, 'তারা যদি মোজেস আর মহাপুরুষদের কথা না শোনে, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত কারও কথাও তাদের শোনানো যাবে না।'

ইহুদী পুরোহিত আর ধর্মধ্বজীরা অধ্যাত্ম-চেতনাহীন, বহির্মুখ। বাহ্য আচার-আচরণ, নিয়মনিষ্ঠা, বিশ্রামদিবসযাপন, পূজাপার্বণকেই তারা ধর্ম বলে মনে করে। যীশুর শিষ্যরা লোকাগত আচারবিধি পালনে একান্তভাবে তৎপর নয় দেখে তারা যীশুর কাছে অভিযোগ করেছে—'আপনার শিষ্যরা পুরুষানুক্রমিক নীতির ব্যতিক্রম করে কেন?' [ম্যাথিউ ১৫]—

যীশু প্রত্যুত্তরে অভিযোগ করেছেন, 'তোমরা লোকাচারের দোহাই দিয়ে ঈশ্বরের আদেশ থেকে বিচ্যুত হও কেন?'

যীশু তাদের স্খলনের নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তা অবশ্যই তাদের মনঃপূত হয়নি। সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশে যীশু বলেছেন, 'ওদের পরিহার করো, ওরা অন্ধ পথপ্রদর্শক। যখন অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, দুজনেই গর্তে পড়ে যায়।'

কঠোপনিষদের ভাষায়—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ১।২।৫

—অজ্ঞানের মধ্যে থেকেও নিজেদের প্রজ্ঞাবান আর শাস্ত্রজ্ঞ মনে করে মূর্খরা অন্ধ-পরিচালিত অন্ধ-জনের মতোই কুটিল গতিতে ঘুরে বেড়ায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভিক্ষামাতা ঃ তথ্যানুসন্ধান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১. প্রস্তাবনা

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বর্তমান যুগের এক বিশ্ববন্দিত মহাপুরুষ। তাঁর অপূর্ব আধ্যাত্মিকতাময় জীবনালোক ও বাস্তবধর্মী শিক্ষাদর্শ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুধীমহল তাঁর অভিনব জীবনদর্শন ও শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও আলোচনা করছেন। পরমহংসদেবের সাধারণ কথাবার্তা এবং সামান্য চেষ্টাসমূহও অনুরাগী ভক্তগণের পরম অনুধ্যানের সম্পদরূপে পরিগৃহীত হয়েছে। দেশে ও বিদেশে বহু সুধী সেগুলির উপর নব নব আলোকসম্পাত করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-ইতিহাসের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে মনে হয়, এখনও কিছু কিছু বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে সেইরূপ একটি ঘটনার পর্যালোচনায় সসম্ভ্রমে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

পরমহংসদেবের জীবনী পাঠে জানা যায় যে,

তিনি উপনয়ন-দিবসে শাস্ত্রবিহিত প্রণালীতে উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম ধনী কামারনীর নিকট হ'তে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেইজন্যই এই কামারকন্যা তাঁর 'ভিক্ষামাতা'রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। '

২. বিভিন্ন গ্রন্থের সংবাদ

"কামারকন্যা ধনী ইতিপূর্বে এক সময়ে বালকের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল, সে যেন উপনয়নকালে তাহার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করে। বালকও তাহাতে তাহার অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল।"—স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১

"ধনী কামারনী গদাইয়ের ভূমিষ্ঠ-কাল হইতে কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছে। তাহার নিতান্ত বাসনা—গদাইয়ের ভিক্ষামাতা হয়, এবং উপযুক্ত সময় উপস্থিত ভাবিয়া একদিন গদাইকে অন্তরালে লইয়া আপনার মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, ভক্তবৎসল গদাই তৎক্ষণাৎ ধনীকে ভিক্ষামাতা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। উপনয়নের দিন গদাই সকলকে জানাইলেন যে, তিনি ধনীকে ভিক্ষামাতা করিতে প্রতিশ্রুত, অতএব ধনী অগ্রে ভিক্ষা না দিলে অন্য কাহারও কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না।"—শ্রীগুরুদাস বর্মন্: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, ১ম, পৃঃ ১৭

"আমাদের অনুমান হয়, ধনী গদাধরের উপনয়ন কালে তাঁহার একজন ভিক্ষাদাতা হইবে, এই মাত্র অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু গদাধর তাঁহার সহজ বাল্যভাবের আবেশেই মাতার নিকট ভিক্ষা না লইয়া ধনীর নিকট প্রথম ভিক্ষা যাচ্ঞা করেন।"—শ্রীশশিভূষণ ঘোষ: ।দেব, পৃঃ ৪২

লক্ষ্য করার বিষয়, প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে একই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থটিতে কিছুটা স্বতন্ত্র বার্তা রয়েছে

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তেও গদাধর কর্তৃক ধনী কামারনীকে 'ভিক্ষামাতা'রূপে বরণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তবে, তাঁর উপনয়ন-দিবসে ইনি তাঁকে সর্বপ্রথম ভিক্ষাদান করেছিলেন—এ সংবাদ স্পষ্টভাবে ঘোষিত নেই।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থেও 'ভিক্ষামাতা'রূপে ধনী কামারনীর পরিচয় উল্লেখিত রয়েছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'পূর্বকথা'-প্রসঙ্গে, অর্থাৎ তাঁর নিজের পূর্বজীবনের বিবরণী-সমূহে সে-সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় না

যা হোক, ধনী কামারনী যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভিক্ষামাতা ছিলেন—এ-সম্বন্ধে কেউই ভিন্নমত পোষণ করেন না; এ-সংবাদ সর্ববাদিসম্মত।

৩. 'ভিক্ষামাতা' হওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি

রাঢ়বঙ্গের কোথাও ব্রতী ব্রহ্মচারীকে উপনয়ন-দিবসে সর্বাগ্রে ভিক্ষাদান ক'রে তার ভিক্ষামাতা হওয়ার রীতি প্রচলিত নেই। রাঢ়বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বালকদের উপনয়ন-অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাদের ভিক্ষামাতা হওয়ার সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি এইরূপ:

ব্রতী বালক শুভদিনে শাস্ত্রীয় বিধানে উপনীত হয়ে ঐ-দিন হ'তে ক্রমাগত ত্রিরাত্রি গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকে। ঐ-কালে সে চন্দ্র, সূর্য অথবা কোনও অব্রাহ্মণের মুখ দেখে না। এ-ছাড়া আরও নানা কঠোর নিষ্ঠাচারে তাকে ঐ-ত্রিরাত্রি উদ্‌যাপন করতে হয়। তারপর চতুর্থ দিনে সে ব্রাহ্মমুহূর্তে পবিত্র জলাশয়ে অবগাহন ক'রে যথানিয়মে 'দণ্ড' বিসর্জন দিয়ে নবোদিত সূর্যকে দর্শন ও প্রণাম করে। ঐ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রে সে জলাশয় থেকে উঠে এলে, পূর্ব হ'তে নির্বাচিত কোনও স্ত্রীলোক তাকে সাধ্যানুসারে নতুন বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, অঙ্গুরী, ছত্র, পাদুকা, ফলমূল, মিষ্টান্ন,

মুদ্রা প্রভৃতি ভিক্ষাদান ক'রে তাকে নিজ ভিক্ষাপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ঐ লৌকিক ধর্ম-সংস্কারে সেই ভিক্ষাদাত্রী নারী উক্ত ব্রাহ্মণ-বালকের 'ভিক্ষামাতা' হন।

কুলাচারগত তেমন কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপিত না থাকলে ঐ-অনুষ্ঠানে অব্রাহ্মণকন্যাও ভিক্ষাদাত্রী ভিক্ষামাতা হ'তে পারেন রাঢ়বঙ্গে বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ-পরিবারে ভিন্নবর্ণের নারীকে ভিক্ষামাতারূপে গ্রহণের রীতি সুপ্রচলিত দেখা যায় এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণবংশেই এই প্রথা বর্তমান। বস্তুতঃ ভিন্নবর্ণের নারীকে ঐ-অনুষ্ঠানে ভিক্ষামাতারূপে বরণ করলে তার পরিবারের মর্যাদা অথবা বংশগত কৌলীন্য ক্ষুন্ন হয় না, কিংবা সমাজে নিন্দাভাজনও হ'তে হয় না।

ব্রাহ্মণকুমারদের উপনয়ন-সংস্কার উপলক্ষে ঐ-অনুষ্ঠানে তাদের ভিক্ষামাতা হওয়ার জন্য ধর্মপ্রাণা বহু নারীই লালায়িত হন। পরিবারস্থ এবং আত্মীয়-পরিজনগণের মধ্যেও কোন নারী আকাঙ্ক্ষা করলে ভিক্ষামাতা হ'তে পারেন। যা হোক, ভিক্ষামাতা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট বালকের অভিলাষকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভিক্ষামাতার তিরোধানে ভিক্ষাপুত্রের ত্রিরাত্রি অশৌচপালন বিধেয়। পক্ষান্তরে, ভিক্ষাপুত্র লোকান্তরিত হ'লে ভিক্ষামাতারও অনুরূপ অশৌচপালন কর্তব্য। ভিক্ষামাতা স্ব-বর্ণের হ'লে, প্রয়োজনবোধে, ভিক্ষাপুত্র তাঁর মুখাগ্নি-সংস্কার-কার্য এবং শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কৃত্যগুলিও স্বাধিকারে সম্পাদন করতে পারে।

৪. বৈদিক ও লৌকিক ধর্মাচার

হিন্দুর ধর্মাচার দ্বিবিধ—বৈদিক ও লৌকিক। বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডগুলি, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিয়ম-প্রণালীতে যে-সমস্ত আচার-কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি বৈদিক ধর্মাচার। আর যে-ক্রিয়াগুলি প্রাচীন কাল থেকে লোকপরম্পরায় আচরিত বা সামাজিক আচার-প্রথায় পালিত হয়ে আসছে, সেগুলি লৌকিক ধর্মাচার।

ব্রাহ্মণবালকের উপনয়ন-সংস্কার-কার্য বেদ-বিহিত প্রণালীতে, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধানে অনুষ্ঠিত হয়; এজন্য এই অনুষ্ঠান বৈদিক ধর্মাচারভুক্ত কিন্তু উপনয়ন উপলক্ষে চতুর্থ দিবসের পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবালকের ভিক্ষামাতা হওয়া বা তাকে ভিক্ষাপুত্ররূপে গ্রহণের প্রণালীটি প্রচলিত লৌকিক ধর্মাচারের অন্তর্গত।

৫. উপনয়নকালে ভিক্ষাগ্রহণের নিয়ম

ব্রতী ব্রাহ্মণবালক উপনয়ন-দিবসে শাস্ত্রবিহিত বিধানে উপবীত ধারণ ক'রে উপনয়ন-মণ্ডপে সর্বপ্রথম নিজ গর্ভধারিণী জননীর নিকট "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" ব'লে ভিক্ষা প্রার্থনা করে এবং তাঁর প্রদত্ত ভিক্ষাই সর্বাগ্রে গ্রহণ করে। জননীর ভিক্ষা গ্রহণের পরে সে ঐ-সময় নিজ পরিজন ও পরিবারস্থ মাতৃস্থানীয়াগণ এবং প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণকন্যাদের নিকট হ'তেও ক্রমান্বয়ে ঐ-ভিক্ষা গ্রহণ করে। সেই সময় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের কারও নিকট হ'তে ভিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ।

জননী বর্তমান থাকলে ঐ-সময় উপনীত পুত্রকে সর্বাগ্রে ব্রতভিক্ষা প্রদানের একমাত্র অধিকারিণী তিনিই। তাঁর অবর্তমানে ব্রহ্মচারীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বা মাতৃসহোদরা, অথবা নিজ পরিবারস্থ মাতৃস্থানীয়াগণের মধ্যে যিনি যোগ্যতমা, তাঁর নিকট হ'তে তাকে ঐ-ভিক্ষা সর্বপ্রথম গ্রহণ করতে হয়। এ-বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ—

"মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং নাবমানয়েৎ ॥"

—মনুসংহিতা, ২।৫০

মাতা বা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, অথবা জননীর সহোদরা কিংবা যে মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোকের দ্বারা ব্রহ্মচারীর প্রত্যাখ্যাত বা অবজ্ঞাত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তাঁরই নিকট সে ঐ-সময়

সর্বাগ্রে ব্রতভিক্ষা প্রার্থনা করবে।

প্রসঙ্গতঃ অবশ্যই স্বীকার্য যে, বর্তমান কালে প্রচলিত ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে সেকালের নিয়ম-প্রণালী ও আচার-নিষ্ঠা বিচার করলে আমরা কখনই ঐ-বিষয়ের সুমীমাংসায় উপনীত হ'তে পারব না।

'লীলাপ্রসঙ্গ'-কারের মতে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ উপনয়ন-সংস্কার-কার্য তাঁর নয় বৎসর বয়স-কালে সম্পন্ন হয়। সেই হিসাবে ঐ-অনুষ্ঠানটিকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেকালে শাস্ত্রীয় বিধি-নির্দেশগুলি পালনে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের প্রবল নিষ্ঠা ও অনুরাগ ছিল। ধর্মশাসিত সেই যুগে চিরাচরিত নিয়ম-প্রণালীসমূহ লঙ্ঘন, শুধু নিন্দনীয়ই নয়, সমাজের চোখে অমার্জনীয় অপরাধ ব'লে বিবেচিত হ'ত।

'শ্রীরামকৃষ্ণ দেব' গ্রন্থের প্রণেতা শশিভূষণ ঘোষ মহাশয় পরমহংসদেবের মহাজীবনের ঐ-ঘটনাটির সম্ভাব্যতা বিষয়ে বিশেষ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

"কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, ধনীর ঈদৃশ উৎকট অভিলাষের কি কারণ ছিল? এই ব্রাহ্মণসংসার কিরূপ আচারনিষ্ঠ সে জানিত; সে গদাধরের ধাত্রী—গদাধর তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করে, তাহাকে মাতৃবৎ ভক্তি করে তাহাও জানিত। তথাপি উপনয়ন কালে শূদ্রের ভিক্ষা গ্রহণ করাইয়া পরিজন সকলকে সন্তাপিত করিলে, নিজে অগ্রে ভিক্ষা দিয়া মাতাকে বঞ্চিত করিলে, তাহার কি অধিক ইষ্টলাভ হইবে? আবার এই নিরর্থক অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য গোপনে পূর্বাহ্নে বালককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা,—ধর্মভীরু স্ত্রীলোকের মনে এরূপ কুটিলতা ও ঘৃণ্য স্বার্থপরতার উদয় হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। উপনয়ন কালে গদাধরের শূদ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ, তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করিবার নিমিত্ত বিচারবুদ্ধি প্রসূত দৃঢ়পণ বলিয়া বোধ করা যায় না, এবং সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের বশবর্তী হইয়া তাঁহার দ্বারা বর্ণধর্ম ও শাস্ত্রবিধির অসারতা প্রদর্শনও মনে করা উচিত নয়। তিনি চিরজীবন সর্বান্তঃকরণে শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতেন, কখনও ইচ্ছাপূর্বক শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করেন নাই।" —পৃঃ ৪১-৪২

অবশ্য, এই গ্রন্থকার মহাশয় পরিশেষে, নিজ অনুমানসহায়ে ঐ-ঘটনাটিকে পূর্ববর্তী ('চরিত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ') গ্রন্থদ্বয়ে পরিবেশিত সেই সংবাদেরই অনুকূলে কোনক্রমে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।[১]

৬. 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র বৃত্তান্ত

'পুঁথি' (পৃঃ ২০-২১) পাঠে জানা যায় –

গদাধরের উপনয়নের কাল উপস্থিত দেখে অগ্রজগণ সেই অনুষ্ঠানের শুভদিন নির্ধারিত করেন। ঐ-সংবাদ শুনে গ্রামের যত ব্রাহ্মণকন্যা তাঁকে ভিক্ষাদানের জন্য অভিলাষিণী হন।

"সেই হেতু দ্বিজকন্যা গ্রামে যতজন।
ভিক্ষা দিতে গদাধরে করে আকিঞ্চন॥"

—পুঁথি, পৃঃ ২০

চাটুয্যে-বংশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের ভিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু গদাই বলেন যে, ধনী কামারনী তাঁকে ভিক্ষা দিলে তবে তিনি ভিক্ষা নেবেন; অন্য কারও হাতে কখনই ভিক্ষা নেবেন না। তাতে যদি তাঁর পৈতে নাও হয়, কোন ক্ষতি নেই।

"হেথায় গদাই কন ধনী কামারিনী।
ভিক্ষা যদি দেয় তবে ভিক্ষা লব আমি॥
কখন না লব ভিক্ষা অপরের হাতে।
না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে॥"

—পুঁথি, পৃঃ ২০

১ বর্তমান নিবন্ধের উপশিরোনাম ২. 'বিভিন্ন গ্রন্থের সংবাদ' দ্রষ্টব্য।

গদাধরের অভিলাষ শুনে ও জেদ দেখে অগ্রজেরা তাঁকে নানাভাবে বুঝান এবং কুলাচার-বিরুদ্ধ ঐ-কাজ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি নিজ সংকল্পসাধনে অবিচলিত থাকেন।

"একি কথা গদাধর, কহে ভ্রাতাগণ।
কি লাগিয়া কুল প্রথা কর অতিক্রম ॥
শূদ্রদান কখন গ্রহণ নাই কুলে।
জানিয়া শুনিয়া কথা কেমনে বলিলে ॥
কোন হেতু না শুনেন শিশু গদাধর।
ধনী হবে ভিক্ষামাতা একই রগড় ॥"

—পুঁথি, পৃঃ ২০

ঐ-বিষয়ে অভিভাবকদের সম্মতি না পেয়ে শেষে, গদাই মুখভার ক'রে দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। তাঁর আহারের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবুও তিনি দ্বার খোলেন না।

গদাই অনাহারে ঐভাবে আবদ্ধ রয়েছেন শুনে প্রতিবেশী বহু নরনারী ছুটে আসে। তারা তাঁকে নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের কারও কথাই যেন তাঁর কানে পৌঁছে না। তিনি ভেতর থেকে কোন সাড়া দেন না।

অবশেষে মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর যখন তাঁকে আশ্বাস দেন যে, বংশ-কুলাচার নষ্ট হয় হবে, ধনী কামারনীই তাঁকে ভিক্ষা দেবেন, তখন তিনি দ্বার খুলে বাইরে আসেন।

"মরি কি সৌভাগ্য তব ধনী কামারিনী।
ভিক্ষা দিলে তাঁয়, বিশ্বে ভিক্ষা দেন যিনি ॥

ক'ড়ে রাঁড়ী অপুত্রক ধনী কামারিনী।
না বিইয়ে হৈল এবে রামের জননী ॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুদেব ভক্ত তাঁর প্রাণ।
ভক্তি জোরে, ভক্তে করে তাঁহারে সন্তান ॥"

—পুঁথি, পৃঃ ২০-২১

৭. 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিতে'র বৃত্তান্ত

"উপনয়নের সময় উপস্থিত, বাটীর সকলে নানাবিধ আয়োজন করিতেছেন।...সকলে শুনিয়া অবাক্। শূদ্রের দান বংশের কেহ কখন গ্রহণ করে নাই। আজ শূদ্রাণী ভিক্ষামাতা কি প্রকারে হইবে? রামকুমার ছোট ভাইটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তিনি গদাইকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, 'শূদ্রের মেয়ে কি কারো ভিক্ষে মা হয়? বিশেষ আমাদের বংশে কারো কখন হয় নি। ওরকম কথা বোলতে নেই।' গদাই কোন কথাই শুনিলেন না, বলিলেন, 'ঐ ধনীই আমার ভিক্ষে মা হবে।' ক্রমে ক্ষুদিরামের জমীদার প্রতিবেশী লাহাবাবুদের কাণে ঐ কথা উঠিল।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত ১ম, পৃঃ ১৭

৮. 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র বৃত্তান্ত

"উপনয়নের কাল সন্নিকট দেখিয়া ইতিপূর্বেই সকল বিষয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল, বালকের পূর্বোক্ত জেদে ঐ কর্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ক্রমে ঐ কথা শ্রীযুত ধর্মদাস লাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১২

"কামারকন্যা ধনীও তখন বালকের সহিত ঐভাবে সম্বদ্ধা হইয়া আপনার জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল।" —ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১২

৯. পর্যালোচনা

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত'-কার স্পষ্টই ব্যক্ত করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধনী কামারনীকে তাঁর ভিক্ষা-মাতা করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, সেইজন্যই তিনি উপনয়ন-দিবসে এঁর নিকট হ'তে সর্বাগ্রে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ' পাঠেও সেই একই সংবাদ পাওয়া যায়।[২]

কিন্তু উপনয়ন-দিবসে উপনীত ব্রাহ্মণবালককে ব্রতভিক্ষা প্রদানের শাস্ত্রবিহিত নিয়ম-প্রণালী এবং

২ বর্তমান নিবন্ধের উপশিরোনাম ২. 'বিভিন্ন গ্রন্থের সংবাদ' দ্রষ্টব্য

উপনয়ন-অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাঢ়বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের লৌকিক ধর্মসংস্কারে 'ভিক্ষামাতা' হওয়ার সাধারণ বিধি-পদ্ধতি বিচার করলে, পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের ঐ-সংবাদ যুক্তিযুক্ত ব'লে গ্রহণ করা যায় না।

'শ্রীরামকৃষ্ণ দেব' গ্রন্থ-প্রণেতার পূর্বোদ্ধৃত[৩] অভিমতও তেমন বলিষ্ঠ নয়। কারণ, শ্রদ্ধেয় 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার ও 'পুঁথি'-কার ঐ-অনুষ্ঠানে বালক গদাধরের যে সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ[৪] চরিত্রটি চিত্রিত করেছেন, তার সঙ্গে "তাহার সহজ বাল্যভাবের আবেশেই"—এ-যুক্তিরও কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

লক্ষ্য করার বিষয়, 'চরিত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গে' এ-বিষয়ে একই বিবরণী পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণ দেব' গ্রন্থে ঐ-সংবাদ নির্বিবাদে গৃহীত হয় নি।[৫] এই গ্রন্থকার মহাশয় সে-সম্বন্ধে নানা সংশয়ের অবতারণা ক'রে পরিশেষে নিজের কতকটা অনুমানসহায়ে, কোনক্রমে সেই পক্ষে মীমাংসা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শাস্ত্রীয় নিয়ম-বিধিসমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আচরণ করতেন। তাঁর জীবন-ইতিহাসে শাস্ত্রবাক্যলঙ্ঘনকারী কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মাতৃপ্রীতি ও মাতৃভক্তির আদর্শ সমগ্র বিশ্ববাসীকে পরম চমৎকৃত করে। অতএব তিনি ইচ্ছাপূর্বক শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন এবং গর্ভধারিণী জননীর ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা অগ্রাহ্য ক'রে উপনয়ন-দিবসে ধনী কামারনীর নিকট হ'তে সর্বপ্রথম ভিক্ষা গ্রহণের জন্য ঐরূপ ধনুর্ভঙ্গ পণ করবেন—এ-ঘটনা একান্তই অভাবনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন চন্দ্রা দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র এবং স্বভাবতঃই অত্যন্ত মমতা ও আদরের ধন। সেই পুত্রের উপনয়ন-অনুষ্ঠানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাঁকে সর্বাগ্রে ব্রতভিক্ষা দেবেন না, ধনী কামারনী দেবেন—এরূপ ব্যবস্থা চন্দ্রার পক্ষে নীরবে মেনে নেওয়ারও কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ধনী কামারনী ঐরূপ স্বার্থপরতায় মত্ত হয়ে প্রিয় বয়স্যা চন্দ্রা দেবীর একান্ত অধিকার লুণ্ঠন ক'রে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে সন্তাপিত করবেন, একজন গ্রাম্য ধর্মভীরু নারীর পক্ষে ঐরূপ আচরণ কখন সম্ভব, তা ভাবাও যায় না।

উপনয়ন-দিবসে উপনীত ব্রহ্মচারীকে একটা বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে[৭] ব্রতভিক্ষা দানের বিধি আছে। সেজন্য তার জননী, আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণকন্যারা পূর্ব হ'তেই উপনয়নবাসরে ঐ-উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। সেই সময় ঐ-ভিক্ষাদানের জন্য সাধারণতঃ আতপ

৩ তদেব।

৪ "কিন্তু বংশে কখন ঐরূপ প্রথার অনুষ্ঠান না হওয়ায় শ্রীযুত রামকুমার উহাতে আপত্তি করিয়া বসিলেন। বালকও নিজ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ঐ বিষয়ে বিষম জেদ করিতে লাগিল। সে বলিল, ঐরূপ না করিলে তাহাকে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞসূত্রধারণে কখন অধিকারী হইতে পারে না।"—লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১-১২ উপশিরোনাম ৬. 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির বৃত্তান্ত' দ্রষ্টব্য।

৫ পৃঃ ৩৬২ দ্রষ্টব্য।

৬ উপশিরোনাম ২. 'বিভিন্ন গ্রন্থের সংবাদ' দ্রষ্টব্য।

৭ "প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করম্। প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ভৈক্ষং যথাবিধি॥" —মনুসংহিতা, ২।৪৮।—উপনীত ব্রহ্মচারী মনোমত দণ্ড ধারণ ক'রে সূর্যদেবের উপাসনা করবেন, পরে অগ্নি প্রদক্ষিণ ক'রে বিধানানুসারে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।

তণ্ডুল, পাকা কলা, যজ্ঞোপবীত, হরিতকী, সুপারী, বিবিধ ফলমূল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ও সামান্য মুদ্রা আবশ্যক হয়। বস্তুতঃ এই উপচারসমূহ আয়োজন করা আদৌ সময়সাপেক্ষ বা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়।

'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠে জানা যায়—"দরিদ্রা ধনী তাহাতে বালকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদবধি যথাসাধ্য অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া সাগ্রহে ঐ কালের প্রতীক্ষা করিতেছিল।"—১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণবালকের উপনয়ন-অনুষ্ঠানের পরবর্তী চতুর্থ দিবসে, রাঢ়বঙ্গের লৌকিক ধর্ম-সংস্কারে তার ভিক্ষামাতা হওয়ার জন্য যে-সমস্ত উপকরণ-সামগ্রী প্রয়োজন হয়, সেগুলি সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে সময়সাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ।[৮] এইজন্য ঐ-ভিক্ষাদাত্রী ভিক্ষা-মাতাকে পূর্ব হ'তেই নির্বাচন ক'রে রাখতে হয়, যাতে তিনি সেগুলি তাঁর সাধ্যানুসারে আয়োজন করতে পারেন।

শ্রীমতী ধনী কামারনী গদাধরকে তাঁর উপনয়ন-দিবসে ব্রতভিক্ষা দিলে সে-দেশের প্রথানুসারে কখনই তাঁর 'ভিক্ষামাতা'রূপে স্বীকৃতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারতেন না। লক্ষ্য করার বিষয়, উল্লিখিত জীবনীগ্রন্থসমূহে এই ভাগ্যবতী কামার-কন্যাকে গদাধরের উপনয়ন-অনুষ্ঠানে মুখ্যতঃ তাঁর 'ভিক্ষামাতা'রূপেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

জানি না, কী কারণে এঁকে গদাধরের উপনয়ন-দিবসে সর্বপ্রথম ভিক্ষাদাত্রী এবং সেই হেতু তাঁর ভিক্ষামাতারূপে চিত্রিত ও আখ্যাত করা হয়েছে! এই ব্যবস্থা ব্রাহ্মণবালকের উপনয়ন-সংস্কারের শাস্ত্রীয় বিধি-নির্দেশ এবং ভিক্ষামাতা হওয়ার প্রচলিত লোকাচারের ঘোর পরিপন্থী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমার স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং ধর্মদাস লাহা মহাশয় উপনয়ন-দিবসে কামারকন্যা ধনীর দ্বারা সর্বপ্রথম ব্রতভিক্ষা দেওয়ানোর জন্য তাঁকে পরামর্শ দিলে ঐ-অসঙ্গত নির্দেশ মনে হয়, তিনি কখনই গ্রহণ করতেন না।[৯]

প্রসঙ্গতঃ নিম্নের উদ্ধৃতিদ্বয় প্রণিধানযোগ্য :

"... তিনি [ধর্মদাস লাহা] শ্রীযুক্ত রাম-কুমারকে বলিলেন, ঐরূপ অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের বংশে ইতিপূর্বে না হইলেও উহা অন্যত্র বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ-পরিবারে দেখা গিয়া থাকে।[১০] অতএব উহাতে তাঁহাদিগের যখন নিন্দাভাগী হইতে হইবে না, তখন বালকের সন্তোষ ও শান্তির জন্য ঐরূপ করিতে দোষ নাই। প্রবীণ পিতৃসুহৃৎ ধর্মদাসের কথায় তখন রামকুমার প্রভৃতি ঐ বিষয়ে আর আপত্তি করিলেন না...।"

—লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১২

[লাহাবাবুরা] "গদাইয়ের ভিক্ষামাতা হইবার জন্য ধনীর কাতরতা দেখিয়া এবং গদাইয়েরও ঐ বিষয়ে একান্ত জেদ দেখিয়া সকলকে বুঝাইলেন; তখন কাজেই সকলে গদাইয়ের ইচ্ছামত কার্য করিতে সম্মত হইলেন এবং ধনীকে ভিক্ষামাতা হইতে সম্মতি দিলেন।"—চরিত, ১ম, পৃঃ ১৭

লক্ষ্য করার বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপনয়ন-অনুষ্ঠান উপলক্ষে, 'ভিক্ষামাতা' নির্বাচন ব্যাপারে উদ্ভূত দ্বন্দ্বে গ্রামের জমিদার ও ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট সুহৃৎ লাহাবাবুর মধ্যস্থতার সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু পল্লীর সর্বজনমান্য প্রবীণ বিজ্ঞ ও ধর্মনিষ্ঠ লাহাবাবু ভিক্ষামাতা হওয়ার জন্য ধনীর আবদার এবং ঐ-বিষয়ে বালক গদাধরের

---

৮ উপশিরোনাম ৩. "'ভিক্ষামাতা' হওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি" দ্রষ্টব্য।

৯ উপশিরোনাম ৫. 'উপনয়নকালে ভিক্ষাগ্রহণের নিয়ম' দ্রষ্টব্য।

১০ উপশিরোনাম ৩. "'ভিক্ষামাতা' হওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি" দ্রষ্টব্য।

উক্ত জেদ অন্যায় ও অসঙ্গত বিবেচনা করলে, তিনি সেই বিবাদের ঐভাবে মীমাংসাসাধনের জন্য, মনে হয়, কখনই অগ্রসর হতেন না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজে অব্রাহ্মণ হয়ে নিষ্ঠাবান সুহৃদের বংশের উপনয়ন-সংস্কার-কার্যে বেদবিহিত চিরাচরিত ক্রিয়াকাণ্ডে শ্রীযুক্ত রামকুমারকে শাস্ত্র-বিধির ঘোর বিরোধী এবং সেই সঙ্গে গর্ভধারিণী জননীর একান্ত অধিকার ও মর্যাদা লঙ্ঘনকারী কোন পরামর্শ বা উপদেশ কখন দিতে পারেন, তা কল্পনাই করা যায় না।

১০. মন্তব্য

আমাদের মনে হয়, শ্রীমতী ধনী কামারনীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপনয়নকালে 'প্রথম ভিক্ষাদাত্রী'-রূপে চিহ্নিত না ক'রে ঐ-উপলক্ষে চতুর্থ দিবসের অনুষ্ঠানে রাঢ়বঙ্গের চিরাচরিত লৌকিক ধর্মাচারে ভিক্ষাদাত্রী 'ভিক্ষামাতা'রূপে চিত্রিত করলে আলোচ্যমান ঘটনাটির জটিলতাগুলির বহুলাংশেরই মীমাংসা সহজেই হ'তে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ ঘটনাটিকে এই নিয়মের অধীনে আনয়ন করলে ঐ-সম্পর্কিত পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক বিবরণীসমূহও যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করবে, আশা করি

নৈষ্ঠিক ক্ষুদিরাম চাটুয্যের বংশে শূদ্রের দান গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। সেই বিশেষ নিয়মের বশেই তাঁর পরিবারে উপনয়ন-অনুষ্ঠান উপলক্ষে শূদ্র-কন্যাকে ভিক্ষামাতারূপে বরণের প্রথা অপ্রচলিত ছিল।

সুতরাং রাঢ়বঙ্গের সুপ্রচলিত রীতি অনুসারে[১১] বালক গদাধর এই স্নেহময়ী কামারকন্যাকে চতুর্থ দিবসের লৌকিক অনুষ্ঠানে ভিক্ষামাতারূপে গ্রহণ করলে ঐ-নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশের কেবল পূর্বোক্ত বিশেষ কুলাচার দু'টিই লঙ্ঘিত হয়।

পিতৃহীন ও পরম স্নেহভাজন কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ গদাধরের বিষম জেদ এবং জননীর ঘনিষ্ঠ বয়স্যা ধনীর একান্ত অভিলাষ রক্ষার জন্য পারিবারিক সূক্ষ্ম কুলাচার দু'টি জ্যেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীরামকুমারের পক্ষে ঐ-পরিস্থিতিতে শিথিল করা তেমন অসম্ভব ব্যাপার ব'লে মনে হয় না

কামারপুকুরের ধর্মপ্রাণ চাটুয্যে-পরিবারের সঙ্গে শ্রীমতী ধনী কামারনীর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও সপ্রেম সম্বন্ধ ছিল। ইনি ছিলেন চন্দ্রমণি দেবীর নিত্যসহচরী ও গদাধরের অশেষ স্নেহময়ী ধাত্রী-মাতা। নিঃসন্তানা ও বালবিধবা এই নারী গদাইকে তাঁর জন্মাবধি নিজ পুত্রের মত স্নেহ-মমতা ও যত্ন-পরিচর্যা করেন। এই সমস্ত কারণে তিনি এই কামারকন্যাকে নিজ গর্ভধারিণীর মতই দেখতেন এবং মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করতেন।[১২]

ধনী কামারনী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীল ছিলেন। ইনি ঐ ব্রাহ্মণ-পরিবারের সঙ্গে ঘনি[ষ্ঠ] সম্বন্ধে বিজড়িত থাকার জন্য তাঁদের পারিবারি[ক] সাধারণ নিয়ম-প্রথাগুলিও জানতেন, সন্দেহ নেই তবুও ইনি গদাধরের ভিক্ষামাতা হওয়ার জন্[য] লালায়িত এবং সেই অভিলাষ-সিদ্ধির জন্য সয়[ং] বালককে পূর্বাহ্নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েছিলে[ন] কেন ?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে, উপনয়ন অনুষ্ঠান কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারের নিত্য-নৈমিত্তি[ক] ঘটনা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীযু[ক্ত] রামকুমার তাঁর অপেক্ষা একত্রিশ বৎসরের ব[ড়] ছিলেন। রামকুমারের উপনয়ন-সংস্কার-কার্য দে[...]

১১ উপশিরোনাম ৩. "'ভিক্ষামাতা' হওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি" দ্রষ্টব্য।

১২ "সে [গদাধর] যেন উপনয়নকালে তাহার [ধনীর] নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করে।"—লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১

গ্রামে অবস্থানকালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা দশ বৎসরের বড় ছিলেন। তাঁর ঐ সংস্কার-কার্য কামারপুকুরে অনুষ্ঠিত হ'লেও, গদাধরের উপনয়নের দশ-বার বৎসর পূর্বে সম্পাদিত হয়েছিল। পাঠকবর্গ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, শ্রীমান্ গদাইকে অবলম্বন ক'রেই ঐ চাটুয্যে-পরিবারের সঙ্গে ধনী কামারনীর ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য ক্রমশঃ নিবিড়তর হয়। অতএব রামেশ্বরের উপনয়ন-অনুষ্ঠানের সূক্ষ্ম আচার-নিষ্ঠাগুলি এঁর জ্ঞাত থাকা, মনে হয়, সম্ভবপর নয়।

ধনী বোধ হয় জানতেন যে, ঐ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে গদাধরকে লৌকিক ধর্ম-সংস্কারে 'ভিক্ষাপুত্র'রূপে বরণ করতে, অর্থাৎ তাঁর 'ভিক্ষামাতা' হ'তে কোন বাধা নেই। কারণ, কামারপুকুরে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে সেকালেও[১৩] বহু সদ্ব্রাহ্মণ-পরিবারে ভিন্নবর্ণের নারীকে ভিক্ষামাতারূপে বরণের নিয়ম সুপ্রচলিত ছিল। সুতরাং সেই ধারণার বশেই এই নিঃসন্তানা বালবিধবার অন্তরে বাসনা জাগা একান্তই স্বাভাবিক যে, ঐ-অনুষ্ঠানে প্রিয়তম গদাইকে নিজ 'ভিক্ষাপুত্র'রূপে গ্রহণ করলে কৃতকৃতার্থ হবেন।

কামারপুকুর পল্লীর ব্রাহ্মণকন্যারা অনেকেই ঐ-অনুষ্ঠানে গদাধরের ভিক্ষামাতা হওয়ার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন।[১৪] প্রসঙ্গতঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভিক্ষামাতা নির্বাচনের কার্য পূর্বেই সম্পন্ন করা হয় এবং ঐ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বালকের আকাঙ্ক্ষাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যা হোক, গদাই স্নেহময়ী ধনীকে শৈশবকাল হ'তে মাতৃজ্ঞান করলেও এবং 'মা'-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করলেও এই ধর্মপ্রাণা নিঃসন্তানা বালবিধবা তাঁকে ঐ-অনুষ্ঠানে প্রচলিত লৌকিক ধর্মসংস্কারে একান্ত আত্মীয়ভাবে অর্থাৎ নিজ 'ভিক্ষাপুত্র'রূপে লাভের জন্য অভিলাষিণী হয়েছিলেন। সেইজন্যই ইনি পূর্বাহ্নে গোপনে তাঁর নিকট নিজ অন্তরের কাতরতা জানিয়ে তাঁকে ঐ-বিষয়ে সম্মত করিয়েছিলেন।

বালক গদাধর, মনে হয়, জানতেন যে, মমতাময়ী ধনীকে ঐ-অনুষ্ঠানে ভিক্ষামাতারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ, তাঁদের বংশে ভিন্নবর্ণের নারীকে ভিক্ষামাতারূপে বরণের রীতি অপ্রচলিত থাকলেও স্বগ্রামে এবং অন্যত্র বহু কুলীন বংশে ঐ-প্রথা সুপ্রচলিত ছিল। তা ছাড়া, ঐ-কার্য কোন-ক্রমেই দূষণীয় বা নিন্দনীয়ও নয়। তাই তিনি এই কামারকন্যার ঐ-প্রার্থনায় সাগ্রহে সম্মতি দান করেছিলেন। মনে হয়, তিনি ঐ-বিষয়টি উপনয়ন-দিবসের পূর্বেই যথাসময়ে নিজ অভিভাবকদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের বংশগত বিশেষ নিষ্ঠাচারের বিষয় চিন্তা ক'রে তাঁর ঐ-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রবল আপত্তি জানান।

অবশেষে, গদাই যখন কোনক্রমেই ঐ-বিষয়ে অগ্রজগণের সম্মতি পান না, তখন স্বভাবতঃই সেই সত্যনিষ্ঠ বালক নিজ সঙ্কল্পসাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু তাঁর অভিভাবকগণ তখনও ঐ-বিষয়ে নিজেদের অভিমত পরিবর্তন করতে রাজি হন না।

---

১৩ 'লীলাপ্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১২ ও 'চরিত', ১ম, পৃঃ ১৭—ধর্মদাস লাহার পরামর্শ দ্রষ্টব্য। (উপশিরোনাম ৯. 'পর্যালোচনা' স্তম্ভে পরিবেশিত)।

১৪ "ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভিক্ষা অন্য কোন জাতি। না দেওয়ার সেই বংশে কুলোচিত রীতি॥
সেই হেতু দ্বিজকন্যা গ্রামে যতজন। ভিক্ষা দিতে গদাধরে করে আকিঞ্চন॥
—পুঁথি, পৃঃ ২০

তার ফলে তাঁর শুভ উপনয়ন-অনুষ্ঠানের সমুদয় আয়োজন পণ্ডপ্রায় হ'তে বসে।[১৫]

সেই সংবাদ শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার কানে পৌঁছলে তিনি ঐ-বিবাদের মীমাংসার জন্য অগ্রসর হন। তিনি জানতেন যে, ক্ষুদিরাম চাটুয্যের বংশে ইতিপূর্বে কখন না হ'লেও, বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ-পরিবারে ভিন্নবর্ণের কন্যাকে ঐ-লৌকিক অনুষ্ঠানে ভিক্ষামাতারূপে গ্রহণের রীতি সুপ্রচলিত আছে এবং সেজন্য তাঁদের বংশমর্যাদার হানি ঘটে না এবং নিন্দাভাগীও হ'তে হয় না। সুতরাং বালক গদাধরের ঐ-বিষয়ে সত্যরক্ষা ও সন্তুষ্টির জন্য শ্রীরামকুমার প্রভৃতি তাঁদের পারিবারিক ঐ-সূক্ষ্ম নিষ্ঠাচারটি শিথিল করলে অনায়াসে ঐ-বিরোধের নিষ্পত্তি হ'তে পারে। এই বিবেচনার বশেই বিজ্ঞ লাহাবাবু শ্রীরামকুমারকে ঐরূপ পরামর্শ দেন এবং রামকুমারও ঐ-পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে প্রবীণ পিতৃসুহৃদের ঐ-উপদেশ মেনে নেন।[১৬]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপনয়ন-অনুষ্ঠানের পূর্ববর্তী কোন এক দিবসে ঐ-বিষয়ক উক্ত বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়। 'চরিত'-কার ঐ-বিবাদটিকে উপনয়ন-দিবসের ঘটনা ব'লে বিবৃত করেছেন।[১৭] কিন্তু 'পুঁথি' পাঠে সহজেই জানা যায় যে, ঐ-ঘটনাটি তার পূর্বেই ঘটেছিল। এ-প্রসঙ্গে নিম্নের উদ্ধৃতিটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"ক্ষুধার সময় যায় না খুলেন দ্বার।
নরনারী আসে যত শুনে সমাচার॥
যে গদা'য়ে খাওয়াইয়া মহা সুখ মনে।
সে গদাই অনাহারে আবদ্ধ ভবনে॥
... ...
যবে ভাই রামেশ্বর যাইয়া আপনি।
বলিলেন দিবে ভিক্ষা ধনী কামারিনী॥
না হয় হইবে নষ্ট বংশকুলাচার।
শুনি বাণী তবে মুক্ত করিলেন দ্বার॥"

—পুঁথি, পৃঃ ২০

উপনয়ন-দিবসে সায়ং সন্ধ্যাদি না ক'রে ব্রতী ব্রহ্মচারীর আহার্য গ্রহণের নিয়ম নেই। সংস্কার-কৃত্যাদি সাঙ্গ হ'তে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তারপর অসমর্থ বালক আচার্যের আজ্ঞাক্রমে অপরাহ্ণকালে যজ্ঞের 'চরু' (পায়সান্ন) এবং ফল-মূল-মিষ্টি প্রভৃতি ভোজন করতে পারে। অতএব উল্লিখিত ঘটনাটিকে উপনয়নের পূর্ববর্তী কোন এক দিবসের ঘটনা ব'লে অনুমান করা আদৌ কঠিন নয়।

যা হোক, আলোচ্যমান বিষয়টির বিভিন্ন দিক নানাভাবে পর্যালোচনা ক'রে আমাদের ধারণা যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপনয়নকালে চিরাগত শাস্ত্রীয় নিয়মে নিজ গর্ভধারিণী জননীর নিকট হ'তে সর্বপ্রথম ব্রতভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীমতী ধনী কামারনী তাঁর শুভ উপনয়ন উপলক্ষে পরবর্তী চতুর্থ দিবসে, রাঢ়বঙ্গের সুপ্রচলিত লৌকিক ধর্মাচারে, তাঁকে ভিক্ষা প্রদান ক'রে তাঁর ভিক্ষামাতা হয়েছিলেন।

১১. উপসংহার

পরিশেষে সবিনয়ে নিবেদন করি যে, উল্লিখিত আকর-গ্রন্থসমূহ অবলম্বনেই সমগ্র বিশ্ববাসী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমিয় জীবন-বৃত্তান্ত ও লীলাতত্ত্ব অনুধ্যানে চরিতার্থ। আমরা এই প্রাচীন জীবনীগ্রন্থগুলিকে সর্বদাই অশেষ মান্য

১৫ উপশিরোনাম ৮. "'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র বৃত্তান্ত" দ্রষ্টব্য।

১৬ উপশিরোনাম ৯. 'পর্যালোচনা' অংশে পরিবেশিত 'চরিত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের উদ্ধৃতিদ্বয়ে লাহাবাবুর পরামর্শ (পৃঃ ৩৬৫) দ্রষ্টব্য।

১৭ উপশিরোনাম ৭. "'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিতে'র বৃত্তান্ত" দ্রষ্টব্য।

করি। এজন্য উক্ত গ্রন্থকারগণের প্রতি চির শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তাঁদেরই পরিবেশিত তথ্যসমূহ সহায়ে এই নিবন্ধখানি রচনা করলাম।

তবে পরমপুরুষের মহাজীবন-ইতিহাসে সংশয়-মূলক কোন সংবাদ না থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং সেরূপ কিছু থাকলে, তা বিদূরিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা বিধেয়। যা হোক, সুধী ভক্তমণ্ডলী ও অনুরাগী পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন, তাঁরা যেন বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বিচার ক'রে দেখেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ষোড়শীপূজার মাধ্যমে ও ভক্তসমীপে নানা উক্তিদ্বারা শ্রীমায়ের দেবীত্ব ঘোষণা করার বহু পূর্বে, কামারপুকুরে কিশোরী সারদার নিহিত দেবীত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু সরলা পল্লীরমণীরা সে কথার তাৎপর্য তখন ধারণা করতে পারেননি। ঠাকুর যখন পল্লীরমণীদের উপদেশ দিতেন, সারদা সে সব কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন। অন্য মেয়েরা সারদার এই নিদ্রালুতার জন্য লজ্জিতা বোধ করত আর তাঁকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করার সময় বলত, "এমন কথাগুলি শুনলে না, ঘুমিয়ে পড়ল!"

ঠাকুর বলতেন: "না গো, না, ওকে তুলো না। ওকি সাধে ঘুমুচ্ছে? এসব কথা শুনলে ও এখানে থাকবে না—চোঁচা দৌড় মারবে।"[২৬]

উঠতি-পড়তি-বেলায় ও অতন্দ্র মহানিশায় সারদাকে যে পরবর্তী কালে অনেক জাগা জাগতে হবে, তাঁর রেখে যাওয়া অনেক কাজ যে করতে হবে, একথা কি ঠাকুর জানতেন না? তাই এই অসময়ে তাঁকে একটু ঘুমিয়ে নিতে দেওয়া। আর কী প্রেম মানুষের জন্যে! সারদা যাতে 'চোঁচা দৌড়' না দেন, সেজন্যে ঠাকুরকে জীবন-ভোর অনেক হুঁশিয়ার থাকতে হয়েছে। অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়েছে, যেমন তাঁর নিজের দেহান্তের পরে নিঃসীম নীলাভিলাষিণী উন্মুখপক্ষ বিহঙ্গকে মিনতি করে বলতে হয়েছে, এখনি পক্ষ উন্মুক্ত করো না—অনেক কাজ বাকী আছে।

এককালে নরেন্দ্রকে নিয়েও ঠাকুরের ছিল একই ভাবনা। তারপর যখন শ্রীমায়ের ও নরেন্দ্রের হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেল, তখন ঠাকুরের নিশ্চিন্ত হাসির সময়।

সারদা ও নরেন্দ্রের ব্যাপারে একটা কর্মনাশা সম্ভাবনার আশঙ্কা ঠাকুরের যে ছিল না একথা বলা চলে না। অবেলায় স্বরূপ জেনে বসে ইচ্ছাময়ী যদি চোঁচা দৌড় মেরে বসেন, তবে সখের ও এত শ্রমের লীলাটিই না পণ্ড হয়ে যায়! ঠাকুরকে সারদা-সাধনা ও নরেন্দ্র-সাধনা উভয় ব্যাপারেই যে আত্যন্তিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল তার কারণ, অবতারের জীবোদ্ধারের ও ধর্মসংস্থাপনের কর্মের সহায়ক, ধারক, বাহক ও পরিপোষক হতে পারেন এমন জন ধরায় কদাচিৎ মেলে দু-এক জন। তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে, অনেক করে শিখিয়ে-পড়িয়ে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভগবানের কাজটি করিয়ে নেওয়ার জন্য আয়াস করতে হয়।

তবে এমন একটি সময় আসে যখন তাঁরা নিজেরা সাগ্রহে ঈশানুসঙ্গীর দায়িত্ব সম্বন্ধে

২৬ তদেব, পৃঃ ১২৯

অবহিত হয়ে স্বেচ্ছায় সানন্দে তা নিজেদের বিকশিত শক্তির সক্রিয়তায় তুলে নেন।

যতদিন সারদার এ অবস্থায় ঠিক পৌঁছে যাওয়া হয়নি, ততদিন ব্রাহ্মীস্থিতি সত্ত্বেও ঠাকুর শ্রীমায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত ত্রস্ত।

এই সব সময়ে হয়ত দক্ষিণেশ্বরে সদা ভ্রাম্যমাণ দেবদেবীগণ ঠাকুরের হঠাৎ-উচাটন অবস্থা দেখে কৌতুকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন!

একবার মায়ের মাথা ধরলে ঠাকুর বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং পুনঃপুনঃ রামলালদাদাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন: "ওরে রামলাল, মাথা ধরল কেন রে?" অন্যদিন, প্রসঙ্গান্তরে রামলালের নিকট নিজের এই অবোধ্য উদ্বিগ্নতার কারণ নিজের প্রায় অজ্ঞাতেই ব্যক্ত করে ফেললেন। সাংসারিকতায় অনভ্যস্ত ঠাকুর নিজের অবিদ্যমান সংসার-বিষয়ে কোন কোন সময়ে যেন ভাবিত হয়ে উঠতেন। এটি তাঁর একটি চিন্তাবিলাসের আভাস ছাড়া আর কিছু না হলেও তাঁর ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতো সারদা স্বমহিমায় বিভাসিত হয়ে উঠতেন।

তখন দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত-সমাগম আরম্ভ হয়ে গেছে। কুঠির ছাদ থেকে ঠাকুর, "তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না"[২৭] এই বলে ঈশ-হৃদয়ের যে প্রেম-আহ্বান অন্তরিক্ষে আপন প্রাণ-বেগে মন্দ্রিত করেছিলেন, তার ঐ দুর্নিবার চুম্বকাকর্ষণে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী-গণের ভিড় জমতে থাকল দক্ষিণেশ্বরে। আর এদের অনেকে ভারতীয় প্রভু প্রথানুযায়ী খালি হাতে সন্তদর্শনে আসতেন না। ঠাকুরের কাছে প্রচুর ফল-মিষ্টি আসত। সবই তিনি নহবতে শ্রীমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন শ্রীমা এ সবের অগ্রভাগ ঠাকুরের জন্য উঠিয়ে রেখে, অন্য সব ভক্ত বা পাড়ার বালক-বালিকাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এমন-কি দু-একবার এমনও হয়েছে যে তিনি ঠাকুরের জন্য অগ্রভাগ তুলে রাখতে ভুলে গিয়ে নিজেকে যখন একান্ত বিপন্ন ও লজ্জিত মনে করেছেন, দৈবাৎ কোন ভক্ত ঠাকুরের জন্য কিছু ফল-মিষ্টি সহ উপস্থিত হয়ে, আশু বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন। তবু মাতৃভাবে ভাবিতা সারদার এতেও সাংসারিকতার হাতে-খড়ি পড়ত না।

ঠাকুর শ্রীমায়ের এই স্ব-ভাবের কথা জেনেই হয়ত তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য একদিন অনুযোগের সুরে বলেছিলেন: "এত খরচ করলে কি ভাবে চলবে?"[২৮] কথাটি শুনেই শ্রীমা ঠাকুরের ঘর থেকে বিনা বাক্যব্যয়ে নহবতের দিকে ফিরে গেলেন। তখন ঠাকুর ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে বললেন: "ওরে, রামলাল, যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগ করলে (নিজেকে দেখিয়ে) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।"[২৯]

এটি শ্রীমায়ের স্ফুটনোন্মুখ মাতৃত্বশক্তির নিকট ঠাকুরের স্বেচ্ছা-বৃত পরাজয়ের সূচক তো বটেই; ততোধিক, এখানে শ্রীমায়ের মহিমাপ্রকাশক ঠাকুরের এই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা রয়েছে: সারদা রাগ করলে রামকৃষ্ণের সব নষ্ট হয়ে যাবে।

সবে মাত্র কিছুদিন পূর্বে ষোড়শীপূজা সমাপনান্তে শ্রীমায়ের চরণে নিজের সাধনসিদ্ধির সব ফলাফল, জপমালা ও নিজেকে সমর্পণ করে, রিক্ত করে, নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর অবতারজীবনের নব 'ইষ্টপথে' যাত্রা শুরু করেছেন। এপর্বে যে তিনি অন্নরূপা ভবতারিণী, অর্থাৎ সারদার

২৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ: (সাধকভাবের শেষ কথা), ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৮৪

২৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৯৪ ২৯ তদেব, পৃঃ ৯৪

উপরই সম্যক্-নির্ভর। তাই তাঁকে অপ্রসন্না করলে এপর্বের ইষ্টলাভ সুদূরপরাহত হবে। আর এপর্বের 'ইষ্টপথে' সাহায্য করতেই তো সারদা এসেছেন। তাই সারদার বিরক্তির ঈষৎ ভ্রূকুটিকুঞ্চনে ঠাকুরের এত অসহায় ও করুণ ব্যতিব্যস্ততা : "ওরে, রামলাল, যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগ করলে এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।" সত্যধৃত ঠাকুরের কোন কথায় অণুমাত্র অতিরঞ্জন থাকত না। সারদার অপ্রসন্নতায় তাঁর সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে, একথা ঠাকুর আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করতেন বলেই খুড়ীকে শান্ত করার জন্য রামলালের নিকট তাঁর এই ত্রস্ত-আর্ত মিনতি।

একটি সাংসারিক-বৈষয়িক উপমা দিলেই হয়ত ঠাকুরের ত্রস্ততার কারণটি অধিকতর সহানুভূতির সঙ্গে আমরা বুঝতে পারব। কোন ক্রোড়পতি যদি তার সব অর্থ কোন একটিমাত্র ব্যাঙ্কে রাখে ও তারপর হঠাৎ একদিন দেখতে পায় যে ব্যাঙ্কটি টাল খাচ্ছে, তখন ক্রোড়পতির মনের অবস্থা—'ওরে গেল, গেল ; আমার সব গেল'—হয় না কি? ঠাকুরের ব্যতিব্যস্ততার কারণটি এই : তিনি যে তাঁর সর্বস্ব রেখে বসে আছেন সারদায় !

১১

ঘটনাপ্রবাহে সহজ বিভাসন

শ্রীসারদা-উদ্ভাসক আলোক-রশ্মি-বিচ্ছুরণ যে শুধু শ্রীমা সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি থেকে হয়েছে তা নয়। এ সম্বন্ধে ঠাকুরের মুখের অনেক কথা আমরা শ্রীমায়ের অনুস্মৃত জবানি থেকেও পেয়েছি।

শ্রীমাকে ঠাকুর যে কী শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তার বিশিষ্ট অনুস্মরণটি আমরা মায়ের এই বর্ণনা থেকেই পেয়েছি :

"আহা! তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন! একদিনও মনে ব্যথা পাবার মত কিছু বলেন নি। কখনো ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি।... কখনো আমাকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেন নি। কিসে ভাল থাকবো তাই করেছেন।"

"একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমি তাঁর ঘরে খাবার রাখতে গেছি, লক্ষ্মী রেখে যাচ্ছে মনে করে তিনি বললেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্।' আমি বললুম, 'আচ্ছা।' আমার গলার স্বর শুনে তিনি চমকে উঠে বললেন, 'কে, তুমি? তুমি এসেছ বুঝতে পারি নি। আমি মনে করেছিলুম লক্ষ্মী ; কিছু মনে ক'রো নি।' আমি বললুম, 'তা বললেই বা।'"[৩০] পরদিন নহবতের সামনে গিয়ে মাকে বললেন : "দেখো গো, সারারাত আমার ঘুম হয় নি, ভেবে ভেবে—কেন এমন রূঢ় কথা বলে ফেললুম।"[৩১]

পরবর্তী কালে শ্রীমাকে তিনি কত সম্মানের চক্ষে দেখেন তার দৃষ্টান্তস্বরূপ ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন, শ্রীমা তাঁর পদসম্বাহন করলে পর তিনি আবার শ্রীমাকে নমস্কার করেন।

অন্যসময়ে শ্রীমায়ের উপর তাঁর নির্ভরশীলতার উদাহরণস্বরূপ ঠাকুর বলেছিলেন : "আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞেস করাতে বারণ করলে ; আর যাওয়া হল না।"[৩২]

শ্রীমা কি 'বস্তু', সম্যক্ জানতেন বলেই, কেউ তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে দেখলে ঠাকুর অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন ও অজ্ঞজনের কল্যাণার্থ তাদের অমন ব্যবহার থেকে বিরত করতে চেষ্টিত হতেন এবং ঐ কালে শ্রীমায়ের স্বরূপ-প্রকাশক দীপ্তবাক্য উচ্চারণ করতেন।

চতুর্থবার যখন শ্রীমা আপন জননী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে লক্ষ্মীদিদি ও অন্যান্য পরিজনদের

---

৩০ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, ১৩৮৩, পৃঃ ১২২ ৩১ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১০৮

৩২ দ্রষ্টব্য : শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৯১

নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন কি হল তা আমরা মায়ের মুখ থেকেই শুনি :

"...যেতেই হৃদয় কি ভেবে বলতে থাকে, 'কেন এসেছে? কি জন্যে এসেছে? এখানে কি?'—এ সব বলে তাঁদের অশ্রদ্ধা করে। আমার মা সে কথার কোন জবাব দেন নি। হৃদয় শিওড়ের লোক, আমার মাও শিওড়ের মেয়ে। কাজেই হৃদয় তাঁকে আদৌ মান্য করলে না। মা বললেন, 'চল ফিরে দেশে যাই, এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?' ঠাকুর হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া কিছুই বলেন নি। আমরা সকলে সেই দিনই চলে এলুম। রামলাল পারের নৌকা এনে দিল।"[৩৩]

মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে সেদিন বিদায় নেবার পূর্বে ভবতারিণীর উদ্দেশে শ্রীমা মনে মনে বলেছিলেন : "মা, যদি কোন দিন আনাও তো আসব।"

ঠাকুরের ও মায়ের এই যে অসহায় লীলা-ব্যবহার তা দুর্বোধ্য। তাঁদের কেউ যে এত অসহায় ছিলেন তা নয়। তবে শিক্ষা আছে তো : যখন যেমন, তখন তেমন!

শ্রীমায়ের প্রতি হৃদয়ের অনুরূপ দুর্ব্যবহার অন্য-সময় লক্ষ্য করে ঠাকুর তাঁকে সাবধান করে দিয়ে যে একটি কথা বলেছিলেন তাতে এমন একটি প্রকাশ ছিল, যা হৃদয়ও উপেক্ষা করতে পারেননি। ঠাকুর বলেছিলেন :

"ওরে, হৃদে, (নিজ দেহ দেখিয়ে) একে তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনো এমন কথা বলিস নি। এর ভেতরে যে আছে সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে, তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।"[৩৪]

ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে চিকিৎসার্থ শ্যামপুকুরে গেছেন, শ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরেই আছেন। একে ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি, আর তাঁর সেবা থেকেও শ্রীমা বঞ্চিতা। তাই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে। এমন সময় একদিন কথায় কথায় গোলাপ-মা যোগীন-মাকে বললেন : "দেখ যোগেন, ঠাকুর বোধ হয় মার উপর রাগ করে কলকাতা চলে গেছেন।" যোগীন-মার মুখে ঐ কথা শুনে শ্রীমা গাড়ী করে ঠাকুরের কাছে গিয়ে কেঁদে বললেন : "তুমি নাকি আমার উপর রাগ করে চলে এসেছ?" ঠাকুর বললেন : "না, কে তোমায় একথা বলেছে?" মা বললেন : "গোলাপ বলেছে।" তখন ঠাকুর রেগে গিয়ে বললেন : "হ্যাঁ, সে এমন কথা বলে তোমায় কাঁদিয়েছে? সে জানে না তুমি কে? গোলাপ কোথায়? আসুক না!"

পরে গোলাপ-মা তাঁর কাছে আসা মাত্র ঠাকুর তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন : "তুমি কি কথা বলে ওকে কাঁদিয়েছ? জান না ও কে? এক্ষুণি গিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও গে।" গোলাপ-মা তক্ষুণি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন : "মা, ঠাকুর আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন। আমি না বুঝতে পেরে অমন কথা বলে ফেলেছি।" মা কোন কথা না বলে, শুধু 'ও গোলাপ' বলে তাঁর পিঠে তিনটি হাসি-মিঠে চাপড় দিতেই গোলাপ-মার সব দুঃখ কোথায় যেন চলে গেল। মন শান্ত হল।[৩৫]

১২
ঠাকুরের ইষ্টপথের সহায়িকা শ্রীমা

ষোড়শীপূজান্তে বিকশিত দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিতা

৩৩ তদেব, পৃঃ ৭৩ ৩৪ তদেব, পৃঃ ৭৩-৭৪ ৩৫ তদেব, পৃঃ ১৪৫-৪৬

শ্রীমা এখন দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানায় দীর্ঘ তের বছরের এক অভিনব তপস্যায় অনুপ্রবিষ্টা হয়েছেন। এই কয়েক বছরে তিনি আটবার জয়রামবাটি-কামারপুকুর যাতায়াত করলেও তাঁর মুখ্য তপোভূমি ছিল দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানবাটিতে নহবতখানায়।

এখানকার আদি তপস্যাটির ভিতর দিয়েই তিনি ঠাকুরকে তাঁর ইষ্টপথে সাহায্য করতে আরম্ভ করেন।

[ক্রমশঃ]

সমালোচনা

রসময় শ্রীরামকৃষ্ণ: শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত। প্রকাশক: বিশ্বজিৎ মজুমদার, গ্রন্থগৃহ, ২২সি কলেজ রো, কলকাতা-৯। (১৯৮০), পৃষ্ঠা ৩২০, মূল্য: ১৬ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণযুগে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করে বহু গ্রন্থ রচিত হবে, এতে আর আশ্চর্য কী! তাঁর অনুরাগী ভক্তজন আপন আপন ভক্তিবিশ্বাস অনুসারে নানাভাবে তাঁকে প্রকাশ করতে যে প্রয়াসী হচ্ছেন—ভক্তিরসের রসিকমাত্রেই, যাঁরা ভক্তিগ্রন্থের সন্ধানে থাকেন, তাঁরা তা জানেন। গ্রন্থকার অজয়বাবু 'রসময় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে ভক্তিরসিকদের রসের সন্ধান দিতে প্রয়াসী। 'রসময় শ্রীরামকৃষ্ণ'—সুন্দর নামটি!—তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে-রসের কথা ঋষিমুখে ধ্বনিত হয়েছিল একদিন, সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়: 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।'—'তিনিই রসস্বরূপ। জীব সেই রসস্বরূপকে লাভ করেই আনন্দিত হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ রসস্বরূপ। তাঁকে লাভ করলে জীবের যে পরমানন্দপ্রাপ্তি হবে, এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে আমরা একমত।

তবে গ্রন্থকার প্রথমেই লিখছেন: 'এই একটি গ্রন্থ পড়লেই সকলে সেই রসের সাগরে অবগাহন করে তৃপ্ত হতে পারবেন।' এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে কিছুতেই একমত হওয়া গেল না। অজয়বাবু শ্রীরামকৃষ্ণের কোন্ রস-সাগর থেকে রস সংগ্রহ করেছেন, তার একেবারেই উল্লেখ করেননি। অথচ এ-রসের মূল উৎস শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। পাঠকপাঠিকাগণ এই গ্রন্থ যদি 'কথামৃতে'র সঙ্গে মিলিয়ে পড়েন, তবে দেখতে পাবেন গ্রন্থের ১ পৃঃ থেকে ২৮ পৃঃ, ১ম ভাগের ১ম খণ্ড থেকে; ২৯ পৃঃ থেকে ৪১ পৃঃ, ৩য় ভাগের ১ম খণ্ড থেকে; ৪১ পৃঃ থেকে ৫২ পৃঃ আবার ১ম ভাগের ২য় খণ্ড থেকে; এরপর ৫২ পৃঃ থেকে ৭০ পৃঃ আবার ৩য় ভাগের ১৪শ খণ্ড থেকে; ৭০ পৃঃ, ৩য় ভাগ, ১৫শ খণ্ড থেকে; পৃঃ ৭৬, ১ম ভাগ, ৪র্থ খণ্ড থেকে; এবং ৮২ পৃঃ, ১ম ভাগ, ১২শ খণ্ড থেকে—এইভাবে আলোচ্য গ্রন্থটি আগাগোড়া 'কথামৃত' থেকেই নেওয়া, তবে অবিকৃতভাবে নয়। বর্তমান ডামাডোলের যুগে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের কথাগুলি যেভাবে পরিবেশিত হচ্ছে, তাতে তাদের নিজস্ব সৌন্দর্য, মাধুর্য সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই গ্রন্থে তার অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে। সবগুলি উল্লেখ করলে আর একটি বই হয়ে যাবে। একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি—

'কথামৃতে' আছে, 'সন্ন্যাসীর নির্জলা একাদশী' (৫।১৭।১)। আলোচ্য গ্রন্থের ২৪৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতিচিহ্ন সহ ঠাকুরের ঐ-উক্তিটিই এইভাবে পরিবেশিত হয়েছে: 'সন্ন্যাসীর একাদশী সব সময় জলহীন।' কী চমৎকার ঘষামাজা!

বইটির বিষয়বস্তু আদ্যোপান্ত 'কথামৃত' থেকে

গৃহীত হলেও (অবশ্যই মহামূল্যবান সন-তারিখ, পরিবেশ-বর্ণনাদি বাদ দিয়ে), কোথাও 'কথামৃত' বা 'কথামৃত'-কারের কাছে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়নি। প্রারম্ভে গ্রন্থকার অবশ্য লিখেছেন : 'গ্রন্থটি রচনার জন্য জীবনী রচয়িতা পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল অপরিসীম।' এটা পূজ্যপাদ 'শ্রীম'কে ও 'শ্রবণমঙ্গল' 'কথামৃত'কে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়! যাই হোক, শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বইটিতে রয়েছে। সুতরাং আমরা শ্রদ্ধার চোখেই দেখবো। এই বই পড়ে যদি কারও প্রাণে শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়বার আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহলেই এ-বইয়ের সার্থকতা।

স্বামী সুপ্রসন্নানন্দ

। লেখক ও প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, আদর্শপল্লী, খড়দহ। (১৩৮৭), পৃঃ ৫৬, মূল্য : এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি শ্রীশ্রীমা সারদামণির জীবনী ও বাণীর একটি সমুজ্জ্বল ভক্তিগাথা। বন্দনা, সম্ভাবনা, বাল্যলীলা, বিবাহবন্ধন, উদ্বোধন, সেবা ও সাধনা, আচার্যাণী এবং বাণী—এই আটটি পর্ব পুস্তিকাটিতে বিন্যস্ত। শেষ পর্বটি শ্রীশ্রীমায়ের আটাশটি উপদেশে সমৃদ্ধ। ভক্তগণ কর্তৃক ইহা অবশ্যই সমাদৃত হইবে। পকেট সাইজের এই পুস্তিকাটি নিত্য সঙ্গী হিসাবে থাকিলে ভক্তপাঠক পড়িয়া শান্তি ও শক্তি লাভ করিবেন। সাধারণ পাঠকদেরও ইহা যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ দান করিবে, সন্দেহ নাই। আশা করি, সামান্য ভুলত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হইবে। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীবাসুদেব সিংহ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব ও ভক্তসম্মেলন

নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবাদি পালিত হয় :

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম: ২৭.১.৮১—বিবেকানন্দ-জন্মতিথি ; ৮. ৩. ৮১—শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি ; ৩.৪.৮১ হইতে ৫.৪.৮১—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী।

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম : ৮. ৩. ৮১ হইতে ১৮. ৩. ৮১—

জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম : ১৩. ৩. ৮১ হইতে ১৫. ৩. ৮১—শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম : ২৭.৩.৮১ হইতে ৩০.৩.৮১—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী।

বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রম : ৯. ৪. ৮১ হইতে ১১. ৪. ৮১—শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী।

জামতাড়া রামকৃষ্ণ মঠ : ১১. ৪. ৮১—শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তত্ত্বাবধানে / উদ্যোগে : ১৮. ৪. ও ১৯. ৪. ৮১—তেঁতুলিয়া গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী ; ২২. ৪. ও ২৩. ৪. ৮১—ভগবানগোলা গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম : ২০.৪.৮১ হইতে ২২. ৪. ৮১ আশ্রম-প্রাঙ্গণে এবং ২৪. ৪. ৮১ হইতে ৩০. ৪. ৮১—সুন্দরবনের অন্যান্য স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী

বালিয়াটী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম: ২৪. ৪. ৮১ হইতে ২৭. ৪. ৮১—শ্রীরামকৃষ্ণ-

তমলুক রামকৃষ্ণ মঠ: ২৩. ৫. ও ২৪. ৫. ৮১ —দ্বিতীয় বার্ষিক ভক্তসম্মেলন। সম্মেলনের প্রারম্ভে ও সমাপ্তি-দিবসে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণী পঠিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসমাধি উৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণ যদুলাল মল্লিকের পাথুরিয়াঘাটার ভবনে সিংহবাহিনী দেবীকে দর্শন করিয়া ১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই ভাবসমাধিস্থ হন। ঐ দিনটির স্মরণে ২১শে জুলাই ১৯৮১, ঠাকুরের পদার্পণ-ধন্য উক্ত ভবনের দালানে আয়োজিত এক সান্ধ্য মাঙ্গলিক সমাবেশে স্বামী নিরাময়ানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রতিমাপূজা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রতিমাপূজার ইতিহাস, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিমাপূজার প্রতি শিক্ষিত হিন্দুগণের বিরাগ, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং প্রতিমায় ঈশ্বরীকে পূজা করিয়াই অন্তে চরম সত্যোপলব্ধি ইত্যাদি বিষয়ের উপর তিনি আলোকপাত করেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'যদু মল্লিকের বাড়ী সিংহবাহিনী সম্মুখে সমাধি-মন্দিরে' অংশটুকু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী স্মরণানন্দ। শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় উৎসব উপলক্ষে রমেন্দ্রনাথ মল্লিক-রচিত 'পুণ্য এদিন একুশে জুলাই' এবং 'যদু খুব হিঁদু'—এই দুইটি সংগীত পরিবেশন করেন। 'সাহিত্যতীর্থ'-এর প্রযোজনায় 'দাদু শ্রীরামকৃষ্ণ' নাট্যালেখ্য উপস্থাপিত করা হয়। মূলরচনা: রাসবিহারী মল্লিক। নাট্যালেখ্য-রচনা ও পরিচালনা: মণি দত্ত। গ্রন্থনা: অধ্যাপক কালীপদ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন চরিত্র-রূপায়ণ: শ্রীরামকৃষ্ণে রজত মল্লিক, যদু মল্লিকে গৌতম মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দত্তে দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, লাটু-হ্যারিসন-ডাফরিণে কিরণশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রাখালে পার্থসারথি ঘোষ, হৃদয়রামে রূপক গোস্বামী, রামলালে সুবীর মুখোপাধ্যায়, যদু মল্লিকের জননীতে করবী নন্দী। কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতে সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মীনা চৌধুরী, সুপ্রিয় ঘোষ, চন্দ্রনাথ চৌধুরী, সন্তোষকুমার পালিত, রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, চঞ্চলকুমার ভট্টাচার্য। উৎসবে অর্ধসহস্রাধিক ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হয়।

বিধানচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী

কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবে ১লা জুলাই ১৯৮১, বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয় এবং ঐ উপলক্ষে ডক্টর জলধিকুমার সরকার 'বসন্তরোগ ও তার ভাইরাসের বর্তমান পরিস্থিতি' বিষয়ে 'ডাঃ বি সি রায় স্মারক' বক্তৃতা দেন। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত হৃদরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ ডি. পি. বসু; উদ্বোধনী ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লা এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ মাননীয় কালিমুদ্দিন সাম্‌স্।

সভার প্রারম্ভে ডাঃ বসু তাঁহার স্বাগত ভাষণে কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের বহু বৎসর প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ক্লাবের সঙ্গে ডাঃ রায়ের ঘনিষ্ঠ

সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে হুবিবুল্লা সাহেব পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিকল্পে ডাঃ রায়ের বহুবিধ পরিকল্পনা ও উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা বলেন। তিনি আরও জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার ডাক্তার রায়ের অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়নে সচেষ্ট। তিনি সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করেন ডাঃ রায়ের হৃদয়বত্তার, যাতে রাজনৈতিক ভেদাভেদের কোন স্থান ছিল না। মাননীয় সামস্ সাহেব ব্যক্তিগত উদাহরণসহ ডাঃ রায়ের রাজনীতি-নিরপেক্ষ মানবিকতার উপর আলোকপাত করেন। বিখ্যাত যক্ষ্মারোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি. কে. ঘোষ তাঁর বহু বৎসর ক্লাবের সেক্রেটারির অভিজ্ঞতায় ডাঃ রায়ের কর্মদক্ষতা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেন। কলিকাতার বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসা বিশারদ ডঃ এস. এম. ঘোষ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাইরাসবিশেষজ্ঞ বক্তা ডাঃ সরকারের বিস্তারিত পরিচয় দেন। ডাঃ সরকারকে 'ডাঃ বি. সি. রায় স্মারক' বক্তৃতা পদক সম্মানিত করা হয়। ডাঃ সরকার তাঁর ভাষণে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, বসন্তরোগ পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়েছে, এবং এখন কাকেও ঐ রোগের টিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে পৃথিবীতে পাঁচটি ল্যাবরেটরির বাইরে আর কোথাও বসন্তরোগের ভাইরাস 'ভেরিওলা' (variola) নেই এবং এই ল্যাবরেটরিগুলিতে এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আছে যে, কারও এই ভাইরাস দ্বারা বসন্তরোগ হওয়া সম্ভব নয়। বহু পশুপক্ষীর বসন্তরোগ হয়; তাদের ভাইরাসগুলি ভেরিওলা ভাইরাস থেকে পৃথক্ এবং একটির অন্যটিতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি মধ্য আফ্রিকায় কয়েকটি জায়গায় বসন্তরোগের মতো এক ধরনের রোগ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ভাইরাস ('বানরবসন্ত-ভাইরাস'—monkey pox virus) আগে কেবলমাত্র বানরে পাওয়া গিয়েছিল। এই ভাইরাস ও ভেরিওলা ভাইরাসের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও কিছুটা পার্থক্য আছে। কিন্তু শিম্পাঞ্জি বা ইঁদুরজাতীয় জন্তুর দেহ থেকে 'হোয়াইট পক্স' (white pox) নামে আর এক রকমের ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে, যা ভেরিওলা ভাইরাসের মতো। তবে আজ পর্যন্ত 'হোয়াইট পক্স' ভাইরাস দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়নি। যাই হোক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, বানর-বসন্ত ভাইরাস বা 'হোয়াইট পক্স' ভাইরাস দ্বারা মানুষের মধ্যে বসন্তরোগ ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। ডাঃ সরকারের বক্তৃতার পর ক্লাবের সেক্রেটারি ডাঃ দীপক চক্রবর্তী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সর্বশেষে ক্লাবের ভূতপূর্ব সম্পাদক ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত রচিত 'ভারততত্ত্ব' বিধানচন্দ্র সম্বন্ধে দুইটি কবিতা পাঠ করা হয়। বহু বিশিষ্ট চিকিৎসকের সহিত শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধন কার্যালয়ের কয়েকজন সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারী।

পরলোকে

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য প্রতাপচন্দ্র ধর ১৪ই জুন ১৯৮১, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৭১ বৎসর বয়সে রায়গঞ্জে তাঁহার নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁহার আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলা দেশের) ময়মনসিংহ জেলায়। কর্মজীবনে তিনি কিছুকাল আইনজীবী ও পরে সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত বহু আশ্রমের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি নানারূপ সেবা ও গঠনমূলক কাজ করিয়া গিয়াছেন।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২'৫০

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৫'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৫'২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯০, মূল্য ৫'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত।
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫'০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৩, মূল্য ৬'৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, মূল্য ১'০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ২'৫০

দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ৩'৭৫

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬'২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩'৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৮৮

৮৩তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৮৮

বার্ষিক মূল্য : টা. ১৪·০০
প্রতি সংখ্যা : টা. ১·৫০

এই সংখ্যার মূল্য : টা. ৭·০০

উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়, ৮৩তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৫৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৩৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে, তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্র সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা, বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮৮

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত

জনৈক ভক্ত

৮৩তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　আশ্বিন, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

বাল্যকালে যাহা করা যায়, শুনা যায়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে; এ সময়ে অনন্ত অসীম ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ ভাব বোঝা বড়ই কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এদিকে, নানা প্রকারের পার্থিব অনিত্য ভাবসকলের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'তে লাগল; বড় হয়ে দেখলুম মনের ভিতর কতই আবর্জ্জনা এসে জুটেছে—সাফ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ বুজিয়ে দু'দণ্ড ধ্যান করতে গেলুম—এক প্রকার অন্ধকারই দেখি। বড় হলুম বটে, কিন্তু বিশ্বাস ভক্তিতে বালকের মত—এমন কি সেই নির্ম্মলবুদ্ধি বালকের অপেক্ষাও অধম—রহিলাম। আবার বালকের মত মা বলে যখন কিছু জিনিষ চোখে দেখতে, হাতে স্পর্শ করতে আরম্ভ করলুম, তখন অনেক কষ্টে একটু উন্নতি বোধ করতে লাগলুম। ক্রমশঃ বুঝলুম মায়ের মূর্ত্তি-পূজা দুর্ব্বল মনকে কত সাহায্য করে; অল্পেই কত ফলপ্রদ হয়।

আমাদের মা ত খালি মাটীর বা খেলা-ঘরের মা নয়। শুনেছিলাম, এখন বিশ্বাসও হয়েছে—আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। আমাদের মা সর্ব্বমঙ্গলা, অন্তর্যামিণী, সর্ব্বশক্তিমতী, সর্ব্বশক্তিস্বরূপা।

—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

[উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, পৃঃ ৫৪৮]

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রতিমাপূজা

প্রতিমাপূজা যে পুতুলপূজা নয়—একথা আজও কোন কোন শিক্ষিত মানুষকে বুঝাইয়া বলিতে হয়—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। একদা ছিল, যখন একদল ধর্মান্ধ মানুষ প্রতিমা দেখিলেই তাহা ভাঙিবার জন্য ব্যস্ত হইত, আর একদল গালি ও অভিশাপ বর্ষণ করিতে শুরু করিত। কেন এই মারণমুখ ব্যবহার? কেন এই অসহিষ্ণু গালিবর্ষণ? প্রতিমার কি দোষ? সে কি কাহারও বাড়াভাতে ছাই দিয়াছে বা পাকাধানে মই দিয়াছে? প্রতিমা একজন শিল্পীর কল্পনার অপূর্ব বিকাশ। প্রতিমা একজন সাধকের ধ্যানের ধন। দুইদিক দিয়াই ইহা সভ্য মনুষ্যজাতির এক পরম সম্পদ। ইহা লইয়া দ্বন্দ্বকলহের অবকাশ কোথায়? তোমার প্রতিমাপূজা ভাল লাগে না; আমার ভাল লাগে; শুধু ভাল লাগে নয়, উহা আমার ধ্যানধারণার সহায়ক—এক্ষেত্রে অপরের অসহিষ্ণু মন্তব্যের মূল্য কি?

প্রতিমাপূজা পুতুলপূজা নয়—বার বার একথা বলার তাৎপর্য এই যে পুতুলপূজা ছোট ছেলে-মেয়েরা বিশেষত মেয়েরা করে খেলার ছলে—বড়দের জীবনের অনুকরণে, মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে ঐ বয়সে তাহারও প্রয়োজন আছে; পরিণত বয়সে সে আর পুতুল খেলিবে না—যখন তাহার প্রকৃত জীবনের খেলা শুরু হইবে। যাহারা বিধিমতে প্রতিমাপূজা করিয়াছে তাহারা জানে মৃন্ময়ীমূর্তিতে মন্ত্রদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়,—এইভাবে সাধক মৃন্ময়ীকে হৃন্ময়ী করিয়া হৃদয়মধ্যে আরাধ্যদেবতার চিন্ময়ীমূর্তি দর্শন করে—এবং তন্ময় হইয়া যায়! এই অভিনব রহস্যের ভিতর প্রবেশ না করিয়াই যদি কেহ মন্তব্য করে প্রতিমাপূজা ভুল, মিথ্যা—অনন্ত-ঈশ্বরকে ছোটখাটো করা, তাঁহার অবমাননা করা, তাহা কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি কখনও দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখে নাই বা ব্যবহার করে নাই, সে যদি ঐ ঐ যন্ত্রদ্বারা উপলব্ধ বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য বলিয়া ঘোষণা করে—তাহার কথা কতটুকু গ্রাহ্য?

অবশ্য একথা ঠিক বেদে বা বেদান্তে সাক্ষাৎ-ভাবে প্রতিমাপূজার কথা নাই, কিন্তু নানাবিধ প্রতীক উপাসনা যে সাধকের সহায়ক—একথা নানাভাবে বলা হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকমাত্রকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বলি না, তবু সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রূপের সাধনা সমান্তরাল-ভাবে চলিয়াছে অরূপের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে; কারণ আমাদের দেশে ধর্মজগতে দুই বড় কথা আছে, যা অন্যত্র পাওয়া যায় না—(১) প্রথম অধিকারবাদ, সব সাধনা সকলের জন্য নয়, প্রতিটি সাধনার অধিকার অর্জন করিতে হয়। বেদান্তসাধনার অধিকারীকে একভাবে অগ্রসর হইতে হয়, ভক্তিসাধনার অধিকারীকে অন্যভাবে। (২) তদুপরি আছে রুচি অনুযায়ী সাধনা। সকলের জন্য একপ্রকার সাধনা—এ যেন দোকানের রেডিমেড জামা! আমার রুচি-অনুযায়ী আমি দর্জির কাছে জামা করাইব। তাহাতে কাহার আপত্তি? এই দুইটি বিষয় বুঝিতে পারিলে ধর্মজগতের অনেক কলহের অবসান হয় এবং একটা চলনসই সহিষ্ণুতা সমাজে শান্তি-স্থাপনের সহায়ক হয়। ধর্ম লইয়া বিরোধবিবাদ অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়।

স্বীকার করি উপনিষদে আছে 'ন তস্য প্রতিমা

অস্তি', কিন্তু এসব কথার তাৎপর্য বুঝিতে গেলে আচার্যের সাহায্য লইতে হয়, সামান্য ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল পড়িতে গেলে শিক্ষকের সাহায্য স্বীকৃত, এসব ফলিতবিজ্ঞান কি বাড়িতে বসিয়া প্রাইভেটে পাস করা যায়! ধর্মও একটি ফলিত-বিজ্ঞান; তন্ত্র, রাজযোগ, ভক্তি বা বেদান্ত—যে কোনটির সাধনা করিতে গেলে উপযুক্ত গুরু বা আচার্যের একান্ত প্রয়োজন। যাঁহাদের ভাগ্যে এখনও ঐরূপ শিক্ষকলাভ হয় নাই, তাঁহারা গুরুর অভাবে গীতার সাহায্য লইতে পারেন। গীতায় পরমকারুণিক ভগবান বলিতেছেন:

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

যাহারা দেহাভিমানী, অর্থাৎ যাহারা দেহকেই মনে করে 'আমি' তাহাদের পক্ষে অব্যক্ত বা অরূপের সাধনা ক্লেশকর—কষ্টসাধ্য—প্রায় অসম্ভব, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের কোন না কোন রূপের ধ্যান অবলম্বনীয়—তবেই তাহারা সুখে ও সহজে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইবে। ইহাতে বোঝা গেল সাধনা অধিকারবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং রুচি-অনুযায়ী সাধনার সৌধ নির্মিত হইবে। প্রত্যেককে একরকম প্ল্যানের ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকিতে হইবে—ইহা কোন গণতান্ত্রিক বা স্বাধীন মনোভাবের লক্ষণ নয়। বর্তমান যুগে ধর্মজগতে এই মনোভাবের বীজবপন করিয়া গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবন ও সাধনা দ্বারা; আর স্বামী বিবেকানন্দ সেইভাব কলহবিধ্বস্ত বিশ্বে উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন অনলসভাবে গত শতাব্দীর শেষ দশকে।

ব্যাপারটা শুরু হইয়াছিল অনেক আগেই। সাতশ' বছর ধরিয়া ভারত শুনিয়াছে মূর্তিপূজা পৌত্তলিকতা। এই তিমিরাচ্ছন্ন সাতশতাব্দীতে বহু মূর্তি ভাঙিয়া আবার গড়িয়াছে, অবশেষে যখন পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে ইংরেজ বণিকগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে লাগিল—এই মূর্তিপূজার জন্যই তোমাদের দীর্ঘ দাসত্ব, অতএব উহা ছাড়িয়া আমাদের মতো ধর্ম আচরণ করিয়া আধুনিক সভ্যজাতিতে পরিণত হও।—ইহা যেন উটের পিঠে শেষ খড়ের কুটার মতো অসহ্য হইল। নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কেহ বা পাশ্চাত্যগুরুর শিষ্য বনিয়া গেল, কেহ সন্ধান করিতে লাগিল—আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কি প্রতিমা-পূজা ছাড়া অন্য কিছু নাই। খুঁজিয়া পাইতে কিছুই অসুবিধা হইল না, কারণ শাস্ত্র কামধেনু—যে যেমন চায়, সে তেমন পায়। এইরূপ শাস্ত্রবাক্য চয়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইল—তাঁহারা আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু (enlightened Hindu) নামে পরিচিত হইলেন, তাঁহারা নিজেরা প্রতিমাপূজা করিবেন না; প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে বলিবেন, তবে প্রতিমাভাঙা তাঁহাদের কর্মসূচীতে ছিল না।

এহেন সময়ে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এমন একজন প্রায়-নিরক্ষর পূজারীব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটিল যিনি প্রতিমাপূজা দিয়া সাধনার জীবন শুরু করিলেন এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—পাষাণপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হইয়া যান; সন্তানের আহ্বানে মা যেমন সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেন, তেমনি ডাকার মতো ডাকিতে পারিলে মা আসিয়া দেখা দেন, কথা বলেন; প্রতিমাপূজা মিথ্যা নয়, প্রতিমাপূজা বৃথা নয়।

অদ্বৈতবাদ ও পূজা-অর্চ্চা

স্বামী শুদ্ধানন্দ

বর্ত্তমানকালে আমরা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব চরিত্র আলোচনা করিলে অতি সুন্দরভাবে বুঝিতে পারি, ঘোর অদ্বৈতবাদী হইয়াও কিরূপ নিষ্ঠা-ভক্তির সহিত পূজার্চ্চনা করা চলে। অদ্বৈতবাদ শুধু বাদ নহে, উহা উপলব্ধির জিনিষ—এইটুকু মনে রাখিলেই আমরা তাঁহার জীবনরহস্য বুঝিতে পারিব। তিনি যখন সমাধির উচ্চতম স্তরে উঠিয়া সেই অদ্বৈতভূমিতে বিচরণ করিতেন, তখন তাঁহার দ্বারা পূজার্চ্চা আর সম্ভব হইত না, কিন্তু যখনই আবার নিম্নভূমিতে আসিতেন, তখনই তিনি ভক্তি-ভক্ত লইয়া মাতিয়া থাকিতেন—ভক্তিই সার বলিয়া প্রচার করিতেন।

ভারতের প্রাচীন অদ্বৈতবাদিগণ কোনকালেই পূজার্চ্চনার বিরোধী হন নাই। যাঁহাকে অদ্বৈতবাদের একরূপ প্রবর্ত্তক বলিলেও বলা যায়, সেই ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের রচিত রাশি রাশি স্তবমালা পড়িয়া দেখ। যদি সেগুলি তাঁহার রচিত কিনা এই সন্দেহ হয়, তবে যেগুলিকে নিঃসংশয়ে তাঁহার রচিত বলিয়া জান, সেই শারীরকভাষ্যাদিতে উপাসনা-সম্বন্ধে তাঁহার মতামত আলোচনা করিয়া দেখ।...

কেহ কেহ স্বামী বিবেকানন্দের দোহাই দিয়া অদ্বৈত ও পূজা-অর্চ্চা এই দুইটীকে পৃথক্‌ভাবে রাখিবার আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। তাঁহাদের উক্তিরও আমরা বিশেষ সারবত্তা দেখিতে পাই না। আমরা স্বামিজীর পবিত্র সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিসমূহকে বিশেষ বিশেষ উপদেশ দিবার প্রণালী লক্ষ্য করিয়াছি এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত আচরণসমূহ লক্ষ্য করিবারও সুযোগ লাভ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থ তন্ন তন্ন ভাবে আলোচনাও করিয়াছি। দ্বৈত ও অদ্বৈত যে পরস্পর বিরোধী নহে, বরং উহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে—একটী যেন অপরটীর পরিণতিস্বরূপ, একটি যেন গৃহের স্তম্ভ, অপরটী যেন ছাদস্বরূপ—ইহাই প্রতিপাদন করা তাঁহার এক প্রধান জীবনোদ্দেশ্য ছিল এবং এই তত্ত্ব তিনি তাঁহার গুরুর নিকট হইতেই, তাঁহার জীবনালোকে এবং তাঁহার উপদেশেই লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বয়ং উচ্চ অদ্বৈতজ্ঞানে ও উপলব্ধিতে আরোহণ করিয়াও তিনি সর্ব্বপ্রকার পূজানুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরও ভক্তিযুক্তহৃদয়ে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে, কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে, কাশ্মীরস্থ অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীতে এবং অন্যান্য নানা দেবদেবীর মন্দিরে গমন ও পূজানুষ্ঠানের কথা তাঁহার জীবনচরিতপাঠক মাত্রেই জানেন। এতদ্ব্যতীত আমরা তাঁহাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেলুড়মঠ-মন্দিরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও কালীমাতার বাহ্য পূজা স্বহস্তে অনুষ্ঠান করিতে এবং প্রতিমা আনাইয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণের সাহায্যে দুর্গোৎসব, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা বিশেষ ধুমধামের সহিত করাইতে দেখিয়াছি। সুতরাং স্বামিজীর জীবনালোচনায়ও কি আমরা অদ্বৈতজ্ঞান ও পূজার্চ্চনার সহানুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি না?*

---

* উদ্বোধন, ১৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩২৩) হইতে পুনর্মুদ্রিত (আংশিক)।

জাগ্রত ভারত*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

দূরান্তিকের বন্ধুগণ,

আমার শুভাদৃষ্ট এই যে, আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি গত পরশুদিন এই মন্দিরটি উৎসর্গ করতে এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। হিন্দুর নৈষ্ঠিক রীতিনীতি অনুযায়ী আমাদের কোনো মন্দিরে এই সর্বপ্রথম ব্রোঞ্জমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। এতদিন পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন মন্দিরে শুধু মর্মরমূর্তিই সংস্থাপিত হয়ে এসেছে।

তিন বছর পূর্বে এই মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে সময়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের কৃষ্টিসংস্থা (Cultural Institute) ও চিকিৎসালয়ের ভিত্তির শিলান্যাস করেছিলেন। মনে পড়ে সেই দিনটিতে প্রধানতঃ পূর্বরাত্রির প্রবল বর্ষণের জন্য এই স্থানটিকে দেখাচ্ছিল যেন পরিত্যক্ত প্রান্তরের মত। প্রশস্ত প্রান্তরের এখানে-সেখানে জল জমে ছিল। বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি সে-স্থানের বিরাট রূপান্তর। কয়েকটি অট্টালিকা সহ মন্দিরটি স্থানটিকে করেছে শ্রীমণ্ডিত। এ-সকলই সম্ভবপর হয়েছে সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এবং সেইসঙ্গে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের অশেষ উদ্যম এবং অদম্য শক্তির ফলে।

এই মন্দিরের নাম হয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন মন্দির'। 'বিশ্বজনীন', এই বিশেষণের তাৎপর্য কি? ভারতবর্ষ জুড়ে কত মন্দিরই তো রয়েছে। এই মন্দিরটিকে বিশেষ করে 'বিশ্বজনীন' বলা হচ্ছে কেন? প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্বত্রই শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরগুলি; বিশ্বজনীন কারণ, সকল ধর্মমতাবলম্বীদের জন্য সমস্ত মন্দিরদ্বার অবারিত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন ঈশ্বরাস্তিত্ব এবং তা দিয়ে তিনি বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে দর্শনের সমন্বয়সাধন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি অনুরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সকল ধর্মই মানুষকে এক লক্ষ্যে, ঈশ্বরোপলব্ধির লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে। সেকারণেই শ্রীরামকৃষ্ণকে বলা হয়েছে সর্বধর্মস্বরূপ। অর্থাৎ, সকল ধর্মের তিনি মূর্তপ্রতীক। এখানে সকলেই এসে নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করতে পারেন। হিন্দু হিন্দুই থাকেন, তেমনি খৃষ্টান খৃষ্টানই থেকে যান এবং মুসলমান থাকেন অপরিবর্তিত মুসলমান। এবং এ ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা সকলেই নিজ নিজ শাস্ত্রে বিধৃত আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পান শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মন্দিরটি নিঃসন্দেহে সর্বজনীন। এখানেও জাতি বর্ণ দেশ নির্বিশেষে, এবং ধনী দরিদ্র বিদ্বান মূর্খ নির্বিচারে, সমাজের সকল স্তরের মানুষের ও ভারতীয় সমাজের পটভূমিকায় ব্রাহ্মণ, এবং ভুলবশতঃ 'অচ্ছুৎ' বলে চিহ্নিত শূদ্র---সকলেরই রয়েছে অবাধ প্রবেশাধিকার।

জগতের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের অপর একটি মহতী বাণী হচ্ছে এই যে, মানবসমাজের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে পরিদৃশ্যমান বিভেদ আসলে নেহাত-ই একটা বাহ্যরূপ। কারণ, সকলের পশ্চাতে বিরাজমান সেই একই আত্মা। এর ফলশ্রুতি এই যে, সমগ্র মানবজাতিই এক। ইদানীং

---

* হায়দ্রাবাদে রামকৃষ্ণ মঠে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বজনীন মন্দির' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৬ই ফেব্রুআরি ১৯৮১ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর ইংরেজী ভাষণের স্বামী প্রভানন্দ-কৃত অনুবাদ।

'এক বিশ্ব' গড়ে তোলার কথা প্রচলিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে। কিন্তু কিভাবে গড়ে উঠবে এই 'এক বিশ্ব'? যেখানে আপাতদৃষ্টিতে এত রকমের বিভিন্নতা, সেখানে ঐ ঐক্যসাধনের মূল সূত্রটি কোথায়? শ্রীরামকৃষ্ণ জোর দিয়ে বলেন, একমাত্র আত্মাই সত্য আর তদ্ব্যতিরিক্ত সবকিছুই মায়া। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ হতে 'এক বিশ্ব' গড়ে তোলার জন্য এই আত্মাকেই ভিত্তিপ্রস্তরের মতো গ্রহণ করতে পারি। অন্যথায়, এই আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য অপর কোন সম্ভাব্য সাধারণ ভূমি পাওয়া অসম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত অপর একটি অভিনব ভাবনা যুগ-যুগান্ত ধরে কর্ম ও ভগবানলাভের বিরোধের মীমাংসা করেছে। আমরা চিরকাল ভেবে এসেছি যে, ভগবানলাভের জন্য আমাদের কর্মত্যাগ করতে হবে, নির্জনে গিয়ে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হতে হবে, যাতে আমাদের মন নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত ধ্যানারূঢ় হয়ে অবস্থান করতে পারে। এরূপ ধ্যানারূঢ় মন দিয়েই ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব। যেহেতু কর্ম মনকে বহির্মুখী করে, কর্ম আমাদের ত্যাজ্য। এই ছিল আমাদের চিরাচরিত ধারণা। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে বললেন, না, তোমায় কর্মত্যাগ করতে হবে না; কারণ, একই ঈশ্বর যেহেতু সর্বাতীত সর্বানুস্যূত, সেইহেতু তাঁকে দুইভাবেই উপাসনা করা যেতে পারে। যখন কেউ ঈশ্বরের সর্বাতীত তুরীয় বিষয়ের ধ্যান করে, সেটি হয় এক ধরনের উপাসনা, আবার যখন কেউ এগিয়ে গিয়ে মানুষকে সাহায্য করে, নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সেবা করে, সেটি হয় আর এক ধরনের উপাসনা, কারণ সকল জীবই শিব। তুমি মন্দিরে গিয়ে প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তির পূজা কর এবং তার জন্য তোমাকে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র ক্রিয়ানুষ্ঠান করতে হয়। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য—মূর্তিতে চৈতন্যের আবাহন করে তাঁকে জীবন্ত করে তোলা। অপরপক্ষে আমাদের চারদিকেই তো বর্তমান মানবদেবতা। যেহেতু প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই চৈতন্য রয়েছে, এখানে আর নতুন করে 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা'র প্রয়োজন নেই। সুতরাং এই মানবদেবতাকে বিভিন্নভাবে উপাসনা কর, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার ঈশ্বরোপলব্ধি হবে। কিন্তু এই উপলব্ধির জন্য তোমাকে কর্মত্যাগ করতে হবে না।

এই আদর্শের গভীর তাৎপর্য স্বামীজীর হৃদয়ে ঝলক দিয়ে উঠেছিল। তিনি ঘোষণা করলেন, 'এই তো পথ।' আমার আকাঙ্ক্ষা, আমরা সকলে ভারত-পুনর্গঠনের সংকল্প গ্রহণ করব। আমাদের অভীপ্সিত ভারতবর্ষ শুধুমাত্র সম্পদশালী হলে হবে না। কারণ, তার ধর্মাদর্শ ও শাশ্বত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে যে ভারতবর্ষ, তা আমাদের কখনই আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং মোক্ষের বা আত্যন্তিক আধ্যাত্মিক মুক্তির আদর্শকে অবশ্যই ধারণ করে রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নতুন পদ্ধতি হচ্ছে বাহ্যকর্ম। আমাদের যাবতীয় কর্মের পশ্চাতে আদর্শটি হচ্ছে ঈশ্বরোপলব্ধি। শিবজ্ঞানে মানুষকে ও সমাজকে বিভিন্নভাবে সেবা করে এই আদর্শ উপলব্ধি করতে হবে। চিকিৎসা, শিক্ষা ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে এই সেবার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যেন আমাদের মৌল আদর্শ মোক্ষ থেকে বিচ্যুত না হই। কারণ, একটি আধ্যাত্মিক আদর্শে সনিষ্ঠ না হয়ে কর্ম করলে, সেই কর্ম আমাদের মনকে বহির্মুখী করে তুলবে এবং আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শ মোক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হব।

সারা ভারত পরিভ্রমণের সময় পরিব্রাজক স্বামীজী জনসাধারণের করুণ অবস্থা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে,

দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতি ভিন্ন ভারতের পুনরুত্থান অসম্ভব। পাশ্চাত্যে গিয়েও তিনি দেখেছিলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেখানকার দেশগুলি খুবই সম্পদশালী, সেখানেও ছিল দরিদ্র মানুষ, যারা ধনী ও ক্ষমতাবানদের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছিল। এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, নিপীড়িত জনগণের বিপ্লব আসন্ন। প্রায় আশি বছর পূর্বেকার কথা—তখন সবে মাত্র শুরু হয়েছিল এই নতুন যুগ। তিনি বুঝেছিলেন যে, সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় আগতপ্রায়। তিনি বলেছিলেন, আমি একজন সমাজতন্ত্রী, তার মানে এই নয় যে সমাজতন্ত্র সর্বরোগহর। তিনি একথা বলেছিলেন, কারণ পাশ্চাত্যের কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি সেদেশের জনগণের দুর্দশা অনুভব করে সেখানে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারে নেমেছিলেন। তাঁদের জনগণের উন্নতির প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হল বর্তমানের সোস্যালিজম, কম্যুনিজম প্রভৃতি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সত্যই মহৎ; কারণ, তাঁরা দুঃস্থ দুঃখীদের জন্য অনুভব করেছিলেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও স্বামীজী বলেছিলেন, 'অভুক্ত থাকার চেয়ে আধপেটা খাওয়া ভাল', কারণ, সমাজতন্ত্র আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আমাদের সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান এর দ্বারা সম্ভব নয়। তার কারণ, পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতা থেকে এর উৎপত্তি এবং জড়স্তরেই এটি কার্যকর। জড়স্তর উত্তীর্ণ হতে এটি অসমর্থ। যাহোক, জনগণের সার্বিক উন্নতি আমাদের করতে হবে, অর্থাৎ, তাদের বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হবে। এ সকল থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে উচ্চবর্ণের মানুষ সুভোগ্য বস্তুগুলো নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিল। স্বামীজী বিশেষ করে বলেছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য হবে ব্রাহ্মণকে পারিয়ার পর্যায়ে অবনমিত করা নয়, পারিয়াকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা।

আমাদের সম্মুখে এই কর্তব্য, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে'। বর্তমান ভারতবর্ষে যা কাজকর্ম হচ্ছে, তার অধিকাংশ স্বার্থ-প্রণোদিত। আমরা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে সমীক্ষাভিত্তিক মন্তব্য পড়ে থাকি যে, আমাদের জাতীয় আয় ৩½% বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার ৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই বাড়তি সম্পদ যাচ্ছে কোথায়? এর ফলে দরিদ্রের অবস্থা কি হয়েছে? তাদের অবস্থা হয়েছে আরও অধোগামী। যতক্ষণ না দরিদ্রদের উন্নতি হচ্ছে, ততক্ষণ এই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের গর্ব করা অনুচিত। আমাদের সবাইকে খাটতে হবে দরিদ্রদের জন্য। অন্য সকল কিছু স্বার্থ-প্রণোদিত কাজ, বিশেষতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জনসাধারণ ও গরীবদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মজুত করা গর্হিত কাজ। এ ধরনের স্বার্থে নিয়োজিত কর্ম জাতিকে নিয়ে যাবে সর্বনাশের দিকে।

যেমন উটপাখী (ostrich) বালুতে মাথা গুঁজে মনে ভাবে যে, সে কুকুরের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে, তেমনি আমরাও নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারি; কিন্তু তা বাস্তবে হয় না। স্বামীজী যেমন বলতেন, আমরা কিছু লোককে চিরকাল এবং সকল লোককে কিছুকাল ধোঁকা দিতে পারি, কিন্তু সকল মানুষকে সকল সময়ের জন্য ঠকান যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমরা হাজার বছর ধরে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের ঠকিয়ে এসেছি, অবশ্য তার জন্য আমাদেরও খেসারত দিতে হয়েছে। এর জন্যই আমাদের বিদেশী জাতি ও রাষ্ট্রের পদানত থাকতে হয়েছে। অন্ততঃ এখনও আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত। এই দরিদ্র জনগণকে তুলতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে যে, জাতি হিসাবে তারা আমাদের সঙ্গে এক এবং জাতিগঠনে তাদের

অংশভাগী হতে হবে। এ এক বিশাল ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের বলতে চাই স্বামীজীর আমেরিকায় থাকাকালীন একটি ঘটনা। স্বামীজীর আবাসস্থলের নিকটেই থাকতেন বহুকোটিপতি রকফেলার। উভয়ের একজন বন্ধুর মাধ্যমে ভদ্রলোক স্বামীজী সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন এবং কোন খবর না দিয়েই তিনি একদিন স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। সে সময়ে স্বামীজী তাঁর লেখবার টেবিলের পিছনে বসেছিলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে সামান্য কথার পর স্বামীজী তাঁকে বললেন, 'আপনার উপার্জিত অর্থ আপনার জন্য নয়। এই অর্থ গরীবদের প্রাপ্য, আপনি একজন অছি মাত্র।' রকফেলার অপরের নিকট কোন অযাচিত উপদেশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু স্বামীজীর কথাগুলি তাঁর মনে দাগ কেটেছিল ; কারণ, কয়েকদিন পরেই তিনি স্বামীজীর কাছে এসেছিলেন। সেসময়েও স্বামীজী পূর্বেকার মত বসেছিলেন। রকফেলার স্বামীজীর সামনে একটি কাগজ রাখলেন, তাতে লেখা ছিল যে, বিরাট এক অঙ্কের টাকা একটি জনপ্রতিষ্ঠানে তিনি দান করবেন। রকফেলার বললেন, 'দেখুন, আশা করি এখন আপনি খুবই খুশী হয়ে আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।' স্বামীজী মাথা না তুলেই উত্তর দিলেন, 'এর জন্য বরঞ্চ আপনারই উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া।'

ভারতবর্ষের বিত্তবান লোকদের উদ্দেশ্যে এই গল্পটি বলে আমি তাঁদের নিকট আবেদন করছি, আপনাদের উপার্জিত সম্পদের কিছু অংশ অন্ততঃ দরিদ্র জনগণের উন্নতির জন্য দান করুন। সর্বত্র জনগণের ক্রমজাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের উঠতে যদি সাহায্য না করি, তাহলে ভারতবর্ষে মহাবিপর্যয় ঘটবে এবং এই সর্বনাশা বিপদে আমাদের সংস্কৃতিসহ সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে।

অতএব এই বেলা আমাদের ঐকান্তিকভাবে ভাবতে হবে জনগণের উন্নতির জন্য যাতে তাদের শারীরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে। এটি আমাদের প্রত্যেকের ও সকলেরই কর্তব্য, এবং আমাদের এই কাজ করতে হবেই।

আপনারা জানেন, গত বন্যায় ত্রাণকাজের পর 'গ্রামশ্রী' নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে। জনসাধারণের আর্থিক উন্নয়নের সাহায্যের প্রকল্প হিসাবে ওটি একটি চমৎকার কর্মযোজনা। কিন্তু একটি মাত্র 'গ্রামশ্রী' যথেষ্ট নয়। সারা ভারতবর্ষে হাজার হাজার 'গ্রামশ্রী' গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আমরা একটি মহৎ জাতি গঠনের আশা করতে পারব।

শ্রীরামকৃষ্ণ এসে আমাদের একটি আধ্যাত্মিক আদর্শ দিয়ে গিয়েছেন। এই সেবাদর্শ স্বামীজী শুধু ভারতের মধ্যেই নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রচার করেছেন। আমরা যদি বেঁচে থাকতে চাই এবং আমাদের যদি আর এক নতুন ভারত গড়ে তুলতে হয়, তাহলে আমাদের এই সেবাদর্শ অনুসরণ করতে হবেই। নতুবা কোন আশা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা করি, তাঁরা আমাদের মুক্ত মনন ও মানসিকতার অধিকার দান করুন, এই সময়ে আমাদের সঠিক কর্মযোজনায় সাহায্য করুন, যার ফল শুধু আমাদের কাছে এবং ভারতের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ হবে না, পরন্তু সমগ্র বিশ্বের কাছেও পরম মঙ্গলময় হয়ে উঠবে।

বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

আজ একটি বিশেষ দিন। এই দিন তিনবার করে ধন্য। কেননা, বৈশাখী পূর্ণিমার এই দিনে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই দিনে তিনি নির্বাণলাভ করেছিলেন এবং এই দিনেই তাঁর ঘটেছিল মহাপরিনির্বাণ। অপূর্ব সুন্দর একটি দিব্য জীবন! সেই দিব্য জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী এই দিনে সমাপ্তিলাভ করেছিল। এটা চিন্তা করে বিস্ময়ে ও আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠি। স্মরণীয় বরণীয় দিন এটি। আমাদের দেশে যত মহাপুরুষ, অবতারপুরুষ ও অবতারকল্পপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তার কারণ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য অবতারপুরুষদের অনেকেই হচ্ছেন পৌরাণিক পুরুষ। তাঁদের জীবনের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বুদ্ধই হচ্ছেন প্রথম অবতারপুরুষ, যাঁর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, এমন-কি ভগবান যীশুখ্রীষ্টের ঐতিহাসিকতা অবিসংবাদিত নয়। প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফেরার পথে জাহাজ যখন ভূমধ্যসাগরে ক্রীটদ্বীপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন স্বামীজী একটি স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নে তিনি দেখলেন, ঋষিতুল্য একজন বৃদ্ধকে। তিনি স্বামীজীকে বললেন, 'তুমি এখন ক্রীটদ্বীপে এসেছ—এই দেশেই খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। যে-সব থেরাপুটি এখানে বাস করত, আমি তাদেরই একজন। আমরা যে-সব উপদেশ দিতাম, খ্রীষ্টানরা তা-ই যীশুখ্রীষ্টের বাণী বলে প্রচার করেছেন। যীশুখ্রীষ্ট নামে কোন ব্যক্তিরই কোনকালে জন্ম হয়নি। এখানে খনন করলে এ-কথার প্রমাণ মিলবে।' স্বপ্ন দেখার পরই স্বামীজী জাহাজের একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমরা এখন কোথায়?' উত্তর পেয়েছিলেন, 'ক্রীটদ্বীপ থেকে ঠিক পঞ্চাশ মাইল দূরে।' ঐ স্বপ্নে তিনি দুটি শব্দ শুনেছিলেন। একটি শব্দের উল্লেখ আগেই করেছি—'থেরাপুটি'। দ্বিতীয় শব্দটি খুব সম্ভব 'এসিনি'। 'এসিনি' বলে একটি সম্প্রদায় ছিল, খুব সম্ভব আলেকজান্দ্রিয়াতে। 'থেরাপুটি' শব্দটি 'স্থবিরপুত্র' বা 'থেরাপুত্র' থেকে এসেছে কিনা সে-বিষয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। বয়স্ক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে 'থেরা' বলা হত। অন্যদিকে এইরকম মত আছে যে, যীশুখ্রীষ্ট 'এসিনি' সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এই স্বপ্ন দেখে স্বামীজীর মনে হয়েছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক যীশুখ্রীষ্ট কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না। বাইবেলের 'হায়ার ক্রিটিসিজম'-এও এ-ধরনের কথা আছে।

সে যাই হোক, বুদ্ধ কিন্তু হচ্ছেন প্রথম ঐতিহাসিক অবতারপুরুষ। তিনি ধর্মস্থাপনের জন্য দৈত্যদানব বধ করেননি। অথবা miracles—অলৌকিক ঘটনাও প্রদর্শন করেননি। তিনি সাধারণ মানুষরূপেই ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মতই জীবনযাপন করেছিলেন, যদিও সেই জীবনে তিনি মানুষকে মুক্তিপথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের জীবন আলোচনা করতে গেলে তৎকালীন যে-পরিবেশ, সেই পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ ইতিহাস না পেলেও এটা আমরা অনুমান করতে পারি যে, সে-যুগে যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মাদিই ছিল

মানুষের ধর্ম। উপনিষদ্ তখন আবিষ্কৃত, উদ্গীত ঋষিদের কণ্ঠে। কিন্তু তখনো তা জনসমাজে আসেনি। সেটি লুক্কায়িত ছিল অরণ্যের গভীরে, কতিপয় ব্যক্তির জন্য। সেই সময়ে মানুষ যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মে পশুহত্যাদি করত এবং সেটাকেই ধর্ম বলে মনে করত। কিন্তু ঔপনিষদিক যে-ধর্ম, সে-ধর্ম মানুষকে এই যাগযজ্ঞের ধর্মে আবদ্ধ থাকতে বলেনি। যাগযজ্ঞাদির ফলে যে-স্বর্গাদিপ্রাপ্তি, তার চেয়ে উচ্চাবস্থার কথা বলেছে। সে-অবস্থা হচ্ছে মোক্ষাবস্থা। সেটি হচ্ছে পরমার্থ, পরম পুরুষার্থ। কিন্তু এই মোক্ষধর্ম ছিল জনসাধারণের প্রাপ্তির বাইরে। বুদ্ধদেব এই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বুদ্ধদেবের জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলি তাঁর সময়ের বহু পরে লেখা। তাঁর জীবন সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত, ললিতবিস্তর এবং জাতকের উপক্রমণিকা। এই উপক্রমণিকা নিদানকথা নামে পরিচিত। এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থ আছে। ইতিহাসে কিছু কিছু ছড়ান-ছিটান রয়েছে তাঁর জীবনের ঘটনা। বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে, তাঁর জন্ম ও জীবন সম্বন্ধে নানারকম পুরাণকথার উদ্ভব হয়েছিল। যেমন সংস্কৃতে লেখা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে রয়েছে যে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসীকে দেখে বুদ্ধদেবের মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। একথার উল্লেখ কিন্তু পালিভাষায় লেখা গ্রন্থে নেই। পালিভাষায় লেখা গ্রন্থে রয়েছে, বুদ্ধদেব নিজে বলছেন যে, তিনি প্রাচুর্যের মধ্যে ছিলেন; তারপরে তাঁর মনে নির্বেদ উপস্থিত হল এবং তার ফলে তিনি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। এই সব কথা থেকেই পরবর্তী কালে একটি সুন্দর উপাখ্যান রচনা করে বুদ্ধদেবের জীবনচরিতে গ্রথিত করা হয়েছিল।

বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি ক্ষুদ্র রাজবংশে। যৌবনেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মানুষের জীবনে যে-দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে, তা অতিক্রম করা যায় কিনা? আপনারা জানেন, এরপরে একদিন গভীর নিশীথে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ২৯ বছর। গৃহত্যাগ করে তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন শিক্ষকের সন্ধানে। এবং উপস্থিত হন বৈশালী নগরে। সেখানে আরাড় কালাম নামে একজন সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যতটুকু জানতে পারা যায়, তা থেকে আমরা বুঝি যে, তিনি সেখানেই প্রথম সাংখ্য ও যোগশিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু যোগশিক্ষার ফলে উচ্চ ধ্যানাবস্থা লাভ করলেও তাঁর মনে হয়নি যে, তাঁর পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে। সেইজন্য তিনি আরাড় কালামের আশ্রম ত্যাগ করে রাজগৃহের (রাজগীর) উপকণ্ঠে রুদ্রক রামপুত্রের আশ্রমে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দেখলেন, রুদ্রক যে অতি উচ্চ ধ্যানাবস্থা লাভ করেছেন, তা-ও শেষ কথা নয়। তাই তিনি রুদ্রকের আশ্রম ত্যাগ করে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন পাঁচজন ব্রাহ্মণ তপস্বী। ছ বছর দুষ্কর কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে তাঁর শরীর বিশীর্ণ হয়ে উঠল। একদিন উঠতে গিয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। মৃতকল্প অবস্থায় তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, ঐ-ধরনের তপস্যায় ঈপ্সিত বস্তু পাওয়া যাবে না। তাই তিনি প্রাণধারণের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু আহার গ্রহণের সংকল্প করলেন। এতেই তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ত্যাগ করলেন। তখন তিনি উরুবেলায় একটি বৃক্ষতলে আসীন হলে সুজাতা নামে একটি গ্রাম্য বালিকা বাটিতে করে কিছু পায়েস আনল এবং তাঁকে দিল। তিনি সেই পরমান্ন গ্রহণ করে আবার ধ্যানে বসলেন। এই ঘটনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আমি উল্লেখ করলাম। তাৎপর্য এই যে, ভগবান বুদ্ধও সাধারণ মানুষের

মতোই তপস্যা বলতে প্রথমে বুঝেছিলেন, শরীরকে তপ্ত করে, উৎপীড়িত করে, বিশীর্ণ করে মনকে বশীভূত করা। এখনো পর্যন্ত তপস্যার এই সংজ্ঞাই বহু সম্প্রদায়ে গৃহীত। বুদ্ধদেবের সময়েও এটা ছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব ঐভাবে তপস্যা করে নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত পরমান্ন গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝলেন, মধ্যম পন্থাই অবলম্বনীয়। পরবর্তী কালে তা-ই তিনি প্রচার করেছিলেন।

সুজাতার পরমান্ন গ্রহণ করে বুদ্ধদেব আবার ধ্যানে বসলেন। ধ্যানে বসবার সময় তিনি সঙ্কল্প করলেন যে, বোধিলাভ না করা পর্যন্ত তিনি আসনত্যাগ করবেন না। সেই রাত্রেই তাঁর বোধিলাভ হল। এখানেও অনেক উপাখ্যান আছে—'মারে'র উপাখ্যান সেগুলি পরের যুগের। 'মার' কিছু বাইরের বস্তু নয়। মানুষের মনের মধ্যে যে প্রলোভন থাকে, তা-ই 'মার'। 'মার'রূপী সেই প্রলোভন মানুষকে আক্রমণ করে। সেই প্রলোভনকে জয় করে তিনি বোধিলাভ করলেন। বোধিলাভ করে তিনি বলে উঠলেন :

'অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং ॥
গহকারক! দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা ॥'

—'জন্মজন্মান্তর-পথে ফিরিয়াছি,
পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপন আছে, এ গৃহ যে
করেছে নির্মাণ।
পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব
পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি
রচিবারে আর ;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার
গৃহভিত্তিচয়,—
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি
পাইয়াছে ক্ষয় ॥'

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই গৃহকারক কে?—তৃষ্ণা। গৃহ কী?—দেহ। তৃষ্ণা বা কামনার ফলেই বারংবার দেহধারণ।

তারপর আরম্ভ হল একুশদিন ধরে চঙ্ক্রমণ। তিনি ঘুরে বেড়ালেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে। জীবনের সারবস্তুকে তিনি পেয়েছেন এবং সেই আনন্দেই তিনি ঘুরে বেড়ালেন। তারপর আবার উপবিষ্ট হলেন আসনে। আবার সেই রাজ্যে চলে গেলেন সেই নির্বাণের প্রশান্তিতে। উপাখ্যানের ভেতর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা এসে বললেন, 'সমস্ত পৃথিবী দুঃখ পাচ্ছে, তুমি যে-জ্ঞান পেয়েছ, সেই জ্ঞান বিতরণ কর।' বুদ্ধদেব তখন স্থির করলেন যে, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' তিনি তাঁর নিজের পরম প্রাপ্তির আনন্দ পরিত্যাগ করে ধর্মপ্রচার করবেন। এটা আমার মনে হয়, বুদ্ধদেবের মনের গহনে জীবের প্রতি যে অপার করুণা নিহিত ছিল, তারই প্রেরণা ও প্রকাশ। তারপর তিনি এসে উপস্থিত হলেন সারনাথে, তখনকার দিনে যার নাম ছিল মৃগদাব। সেখানে ছিলেন সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ তপস্বী, যাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের তিনি উপদেশ দিলেন এবং এইভাবে 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' করলেন। কি উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। তিনি কোন পরমবস্তুর কথা বলেননি। তবে চারটি আর্য সত্যের কথা তাঁর উপদেশে রয়েছে—

(১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণও আছে ; কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা বা বাসনা, (৩) দুঃখের নিরোধও আছে, এবং (৪) দুঃখনিরোধের উপায় হচ্ছে আষ্টাঙ্গিক মার্গ।

এই আষ্টাঙ্গিক মার্গের যে ব্যাখ্যা বুদ্ধদেব

নিজে দিয়েছেন, তা হল—

(১) সম্যক্ দৃষ্টি : চারটি আর্য সত্য সম্বন্ধে যথার্থ দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান।

(২) সম্যক্ সংকল্প : অহিংসা, অবিদ্বেষ, কামনারাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে সংকল্প।

(৩) সম্যক্ বাক্ : অসত্য বাক্য, অপ্রিয় বাক্য, পরনিন্দা, অসার বাক্যালাপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করা।

(৪) সম্যক্ কর্মান্ত : অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা, প্রাণিহত্যা না করা, ভোগাসক্ত না হওয়া।

(৫) সম্যক্ আজীব : ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকা অর্জন করা।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম : এই সব বিষয়ে চেষ্টা—মনে কুভাব না আসে ; কুভাব এলে, তা দূর করা ; যে-সব সৎ ভাব মনে উদিত হয়নি, সেগুলি যাতে উদিত হতে পারে ; যে-সব সৎ ভাব মনে উদিত হয়েছে, সেগুলির পূর্ণতা-সাধন

(৭) সম্যক্ স্মৃতি : সর্ববিষয়ে স্মৃতিকে জাগ্রত রাখা। ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন, অশন, বাক্য-উচ্চারণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে সজাগ থাকা, সচেতন থাকা।

(৮) সম্যক্ সমাধি : গভীর ধ্যান। এই সমাধির চারটি স্তর আছে। সমাধিই আষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ ধাপ। প্রথম সাতটি ধাপ অতিক্রম না করে কেউ শেষ ধাপে পৌঁছতে পারে না।

বুদ্ধদেবের এই আষ্টাঙ্গিক সাধনমার্গ দেখলে মনে হয়, যোগের যে-অষ্টাঙ্গ, তার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থকে গ্রহণ করেননি। অমুক গ্রন্থ, অমুক দর্শন, এমন-কি বেদকেও তিনি স্বীকার করেননি। এইজন্য হিন্দু দার্শনিকের কাছে বৌদ্ধদর্শন আস্তিক দর্শন নয়। সেটা হচ্ছে নাস্তিক দর্শন। সাংখ্যদর্শন আস্তিক দর্শন, যদিও সাংখ্য ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছে। পূর্বমীমাংসায় ঈশ্বরকে, এমন-কি দেবতাকেও অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দেবতা আর কিছুই নয়—চতুর্থী-বিভক্তি-যুক্ত শব্দ। 'অগ্নয়ে স্বাহা', এই 'অগ্নয়ে' কথাটুকু মীমাংসকদের দেবতা। তবুও পূর্বমীমাংসা আস্তিক দর্শন, কেননা মীমাংসকরা বেদকে মেনেছেন। বুদ্ধদেব বেদকে মানেননি। বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত যোগশাস্ত্রকেও তিনি মানেননি। কিন্তু তিনি যোগটা নিয়েছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'ঈশ্বর কি আছেন?' তিনি বলেছিলেন, 'আমি কি বলেছি ঈশ্বর আছেন?' 'তাহলে কি ঈশ্বর নেই?' 'আমি কি বলেছি ঈশ্বর নেই?' এই ছিল তাঁর উত্তর। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

'চারি দিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়,
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ-'পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ—
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন।'

এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন কিসের ?

'এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এসো কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে শরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সে দিকে হেরিবে সবে পথ।'

বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে এটি খুবই প্রযোজ্য। কারণ, যেদিকে তিনি 'দুখানি নয়ন' ফিরিয়েছেন, সেই দিকেই মানুষ পথ দেখেছে। দার্শনিক আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণের ভেতরে তিনি যাননি। তিনি

বলেছেন, একজন যদি তীরবিদ্ধ হয়ে তোমার কাছে আসে, তখন তুমি কি করবে? তাকে কি তুমি জিজ্ঞাসা করবে, 'কে তীর ছুঁড়ল? সে কোন্ বর্ণের?—ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য, না শূদ্র? সে কোন্ স্থান থেকে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়েছিল? কত দূর থেকে ছুঁড়েছিল? তীরটা কি রকম ধনুক থেকে ছুঁড়েছিল?' এইগুলি আমি আমার ভাষায় বলছি, বুদ্ধদেব তাঁর ভাষায় বলেছিলেন। ভাবটা একই। এই সব বৃথা আলোচনা না করে তীরটা উঠিয়ে ফেলে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে হবে —এই হচ্ছে বুদ্ধদেবের মত। নির্বাণের আনন্দ পরিত্যাগ করে তিনি মানুষের জন্য দিয়ে গেছেন নির্বাণের বাণী এবং চেয়েছিলেন প্রত্যেক মানুষের কাছে যেন নির্বাণের বাণী পৌঁছে দেওয়া হয়। খুব সংক্ষেপে বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম।

এরপর বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ। আপনারা যাঁরা বিবেকানন্দের জীবনচরিতের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ—তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত—একদিন রাত্রে তাঁর ঘরটিতে বসে ধ্যান করছিলেন। গভীর ধ্যানের শেষে, তখনও তিনি আসনে বসে আছেন, এমন সময়ে ঐ ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করে এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসিমূর্তি সামনে এসে দাঁড়ালেন। নরেন্দ্রনাথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, যেন কিছু বলবেন। নরেন্দ্রনাথ অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন। তারপর তাঁর মনে কেমন-একটা ভয় এল, তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে গেলেন। মনে রাখতে হবে তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। যাই হোক, পরবর্তী কালে তাঁর ধারণা হয়েছিল, সেদিন ভগবান বুদ্ধই তাঁকে ঐভাবে দর্শন দিয়েছিলেন।

জীবনের প্রথমে খোলা চোখে ভগবান বুদ্ধদেবের দর্শন। তারপর তিনি যখন কাশীপুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত, তখন বুদ্ধদেবের জীবন ও মতবাদ সম্বন্ধে খুব আলোচনা করতেন। ফলে তাঁর বুদ্ধগয়া-দর্শনের ইচ্ছা হয়। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং তিনি গিয়ে উপস্থিত হন বুদ্ধ-গয়ায়। সেখানে ধ্যান করতে করতে হঠাৎ প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে পাশে উপবিষ্ট স্বামী শিবানন্দকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবিসর্জন করতে থাকেন। সহজাবস্থায় ফিরে এলে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'মনে একটা গভীর বেদনা অনুভব করেছিলাম···সবই তো রয়েছে কিন্তু তিনি কোথায়?···বুদ্ধদেবের বিরহ এত তীব্র বোধ হতে লাগল যে, সামলাতে পারলাম না।' এখানেও ভগবান বুদ্ধদেবের একটা প্রভাব তাঁর জীবনের উপর পড়েছিল। তিনি বারবার ভগবান বুদ্ধদেবের হৃদয়বত্তার কথা বলেছেন। বুদ্ধদেবের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তিনি বলেছিলেন, 'I am the servant of the servants of the servants of Buddha.' [আমি বুদ্ধের দাসের দাসের দাস]। কী অপরিসীম শ্রদ্ধায় একথা বলেছেন! কেন বলেছেন? আমার অনুমান এই যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব—এই দুটি ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের অনন্য ঘটনা এবং দুটির ভেতরে সৌসাদৃশ্য অনেক। এই সৌসাদৃশ্যের জন্যই ভগবান বুদ্ধদেবকে স্বামী বিবেকানন্দ এত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলেছেন, 'ভগবান বুদ্ধই আমার দেবতা।' তিনি আরও বলেছেন তাঁর সম্বন্ধে—'ভগবান বুদ্ধদেবের জীবের প্রতি যে দরদ, তার তুলনা হয় না।' কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধির নিরিখে পরীক্ষা না করে কোন-কিছুই গ্রহণ করতেন না। অবতার-পুরুষরাও তাঁর সমালোচনার হাত থেকে নিস্তার পাননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমি অবতারদেরও সমালোচনা করি, তাঁদের প্রতি

আমার শ্রদ্ধা এতটুকু না কমিয়ে।' তিনি সব কিছুই বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নেওয়ার সপক্ষে ছিলেন। প্রত্যেকটি জিনিস বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নিতে হবে এদিক থেকে বুদ্ধদেব তাঁর অনেক কাছের মানুষ

বুদ্ধদেব কোন miracle, যাকে বলে অলৌকিক ঘটনা, তাতে বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিতেন না। এসব ঘটনার আলোচনা পর্যন্ত করতে দিতেন না। স্বামী বিবেকানন্দও তা-ই করতেন। ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি কররেখা ইত্যাদি সম্বন্ধে একদিন আলোচনা করছিলেন। এই ব্যাপারে স্বামীজী তাঁদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। একসময়ে তিনি বলেছিলেন যে, মানুষের জীবনে গ্রহ-নক্ষত্রের কিছু প্রভাব থাকতে পারে কিন্তু মানুষের আত্মশক্তি গ্রহ-নক্ষত্রের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। সেই আত্মশক্তির উদ্বোধন করা—এইটি সব চেয়ে বড় কথা। বুদ্ধদেবও সেই কথাই বলতেন।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, শঙ্করের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধের হৃদয়—এ-দুটির মিলন। যাঁর ভেতর এ-দুয়ের সমন্বয় রয়েছে, তিনিই আদর্শ পুরুষ। কাজেই দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োজন স্বামীজী স্বীকার করতেন। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকে স্বামীজী গ্রহণ করেননি, শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্বকেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বের যে কর্মে প্রয়োগ, সেটা নিয়েছিলেন বুদ্ধের জীবন থেকে। এই নিয়ে দুটোকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। এই মিলনটা তিনি দেখেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

আর একটি জিনিস স্বামীজী বুদ্ধদেব থেকে গ্রহণ করেছিলেন, সেটা হল সংঘ-স্থাপন। বৌদ্ধসংঘের একটা দোষ ছিল এই যে, বৌদ্ধরা সমস্ত ভারতবর্ষকে একটা মঠে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সমস্ত কিছুই সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহস্থদের জন্য কিছুই নয়। এটা ঠিক নয়। স্বামীজী সকলকে সন্ন্যাসী করতে চাননি। শ্রীরামকৃষ্ণও চাননি। তিনি অনেককে বলছেন, খেয়ে নে, পরে নে, ভোগ করে নে। তারপর আসিস্। বলা বাহুল্য, স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকেই অনুসরণ করেছিলেন। বৌদ্ধসংঘ আর স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত সংঘের মধ্যে আর একটা পার্থক্য আছে। বৌদ্ধসংঘ কেন্দ্রিত ছিল না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ কেন্দ্রিত। যাই হোক, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে বুদ্ধের যতটা প্রভাব, সেরকম প্রভাব তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ছাড়া আর কারোর ছিল না। বুদ্ধকে তিনি সর্বদা শ্রদ্ধা করেছেন, প্রণাম করেছেন। ত্রিধন্য এই পুণ্যদিনে সেই প্রণামের সঙ্গে আমাদেরও প্রণাম যুক্ত হোক।*

* ১৮ই মে ১৯৮১, বুদ্ধ-পূর্ণিমা দিবসে বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে দ্বিতীয় বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের সান্ধ্য অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ। স্বামী সুপ্রসন্নানন্দ কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতি*

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

আমার নিজের স্মৃতিকথা খুব অল্প; তার ভেতর আবার সাধারণের কাছে বলার মতো যা ছিল, তা ইতিপূর্বেই স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একটি জীবনীগ্রন্থে গ্রন্থটির রচয়িতা প্রচ্ছন্নভাবে ও সংক্ষিপ্তাকারে বিভিন্ন স্থানে সেগুলি সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। কাজেই নতুন কথা বেশী কিছু বলার নেই। তবু তারই দু-একটির বিস্তারিত বিবরণ এবং কিছু নতুন কথা এখানে দেওয়া হল।

তাছাড়া খুবই নির্ভরযোগ্য লোকের—প্রাচীন সাধুদের—মুখে শোনা দু-চারটি ঘটনা আছে। এছাড়া বিজ্ঞানানন্দজীর দুজন মন্ত্রশিষ্যের মুখে শোনা এবং আমার অনুরোধে লিখিতভাবেও আমাকে জানানো ঘটনা কিছু আছে। এই দু ধরনের কথাগুলি এতদিন প্রকাশ করিনি—প্রকাশ করা ঠিক কিনা, এই সন্দেহদোলায় দুলে। 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' বইটি পড়ে মনে হল এধরনের কথা যখন প্রকাশিত এবং সাধু ও গৃহস্থ উভয়বিধ পাঠকদের কাছে তৃপ্তিদায়কও হয়েছে, তখন প্রকাশ করাই ভাল।

আমার এই 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতি'কে তিনভাগে ভাগ করলাম: [১] আমার নিজের প্রত্যক্ষ করা বা শোনা; [২] অতি নির্ভরযোগ্য লোকের কাছ থেকে শোনা; এবং [৩] শোনা ছাড়াও যা লিখিতভাবে পেয়েছি। লিখিতভাবে যে-দুজনের কাছ থেকে পেয়েছি, তাঁদের একজন কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, যিনি এখন ইহলোকে নেই; দ্বিতীয় একজন মহিলা—নামপ্রকাশে একান্ত অনিচ্ছুক।

[১]

বিজ্ঞানানন্দজীর প্রথম দর্শন পাই ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি ছাত্রাবাসে কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর নবাগত ছাত্রদের একজন হয়ে এসে—যাদের ভেতর, আমার সহপাঠীদের ভেতর, বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপালাভে ধন্য হয়েছে। এর আগে রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশনের কোন কেন্দ্রের সঙ্গে বা কোন সাধুর সঙ্গে আমার কোন সংস্রব বা পরিচয় ছিল না। কেবল স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল; যে-স্কুলে পড়তাম, সেখানকার চিরকুমার স্নেহশীল প্রধানশিক্ষক মহাশয় একদিন আমার হাতে একখানা উপন্যাস দেখে সে-বয়সে ওসব পড়তে নিষেধ করেন, স্বামীজীর বই পড়তে বলেন। তিনিই বিদ্যার্থি-আশ্রমে আমার জন্য

---

* স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত রচনা। 'জনৈক সন্ন্যাসী'র রচনা হিসাবে তিনি ইহা উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্ত (৩০. ১. ১৯৭৮) হওয়ায় তাঁহার নামেই ইহা প্রকাশিত হইল। দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে তিনি ইহা সম্পূর্ণ করেন। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা। ইহার প্রথম অনুচ্ছেদে এবং ৩৯৭ পৃষ্ঠার ১ম ও ২য় কলমে যে-জীবনীগ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার সম্পূর্ণ নাম 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ: জীবনী ও বাণী' এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী স্বয়ং উহার রচয়িতা। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থটি শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস ও শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। উভয় গ্রন্থের প্রকাশক: শ্রীসুরজিৎ দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।—সংযুক্ত সম্পাদক।

আমায় উৎসাহিত করেছিলেন; সেদিক থেকে বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপালাভের পরোক্ষ আদি সহায়ক-রূপেই তাঁকে মনে করি আমি, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আরো বেশী কৃতজ্ঞ বিদ্যার্থি-আশ্রমের স্থাপয়িতা ও তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী নির্বেদানন্দজীর কাছে। এখানে এসে তাঁর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সম্বন্ধে বহু কথা শুনতে পাই। গভীর মনোযোগ দিয়ে সেসব শুনতাম, বলা যায় 'গোগ্রাসে গিলতাম।' এখান থেকেই বেলুড় মঠে যাওয়া-আসা এবং উৎসবাদিতে সেখানে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করা শুরু হল। আর পরমতম সৌভাগ্য এল একদিন অযাচিতভাবে—এই আশ্রমেই শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সন্ন্যাসীকে দর্শন করলাম, তাঁর কথা শুনলাম ও তাঁর পাদস্পর্শ করে ধন্য হলাম। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সেদিন বিদ্যার্থি-আশ্রমে এসেছিলেন।

ছোট্ট একটি ঠাকুরঘর ছিল তখন আশ্রমে। পাকাদেয়াল, সিমেন্টের মেজে, টিনের ছাউনি—বাংলো ধরনের, উত্তর ও দক্ষিণে গোটা ঘরের দৈর্ঘ্য-জোড়া প্রশস্ত বারান্দা। দুদিকের বারান্দার দিকেই ওঠার সিঁড়ি এবং ঘরে ঢোকার দরজা। উত্তরের সিঁড়ির ওপর মাধবীলতার গেট। অপূর্ব সুন্দর লাগতো আমার চোখে এই ঠাকুরঘরটি। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আশ্রমে এসে প্রথমে ঠাকুরঘরে গেলেন। দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলেন। ঘরে ঢোকার ওদিককার দরজার মাথায় একটি ছবি টাঙানো ছিল, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' যে-ছবিটি দেখা যায়,—শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারমশাইকে একদিন যে ছবিটি এনে দেখাতে বলেছিলেন—পাখি ডিমে তা দিচ্ছে, চক্ষু ফ্যালফেলে, বাইরে তাকিয়ে আছে কিন্তু সারা মন ডিমের দিকে। যোগীর চক্ষুর উপমা রূপে বলেছিলেন। বিজ্ঞানানন্দজী বারান্দায় উঠে বহুক্ষণ নিজের বড় বড় চোখদুটি মেলে স্থিরদৃষ্টিতে ছবিটির পানে চেয়ে রইলেন। তার আগে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র এই অংশটি আমার পড়া ছিল, আমি বিজ্ঞানানন্দজীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম একদৃষ্টে—যোগীর চক্ষু কি রকম, তা তখন ধারণা করার শক্তি যতটুকু ছিল তা দিয়ে ধারণা করার চেষ্টা করলাম তাঁর চোখ দেখে। তারপর ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করে তিনি এসে বসলেন পাশেই যে-চালাঘরটি ছিল, তার ভেতর। ঘরের ভেতর আগে থেকেই টেবিল-চেয়ার সাজানো ছিল। কিছু জলযোগ করলেন। আর হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে—ছেলেদের সঙ্গে। একটি ছেলেকে দেখে বললেন, "চেনা লোক মনে হচ্ছে!" নির্বেদানন্দজী সবিনয়ে বললেন, "চেনা লোক এখানে আরো অনেক আছে।" আশ্রমটি তখন দমদম এরোড্রোমের একেবারে সংলগ্ন এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে থাকায় দক্ষিণ দিক ফাঁকা ছিল, দখিনা হাওয়ার প্রাচুর্য ছিল আশ্রমে। একটু জোরেই হাওয়া বইছিল তখন। আমার একজন বন্ধু ছিল বয়সেও খুব ছেলেমানুষ এবং একটু রোগা। তাকে বিজ্ঞানানন্দজী বললেন, "খুঁটিটা আঁকড়ে ধর, হাওয়া তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।" একটা বাঁশের খুঁটির পাশে সে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রথম দর্শন।

তান্ত্রিক-বংশের ছেলে ছিলাম, মাকালীর ওপর ছেলেবেলা থেকেই টান ছিল, ছেলেবেলায় কয়েকবার কালীপুজোর দিন মাকালীর ছোট মূর্তি নিজেই গড়ে পুজো করেছি—অবশ্য খেলার পুজো। কাজেই আশ্রমে এসে নির্বেদানন্দজীকে দেখে মুগ্ধ হলেও, এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র প্রতিটি কথা আক্ষরিক অর্থে সত্য—এই বিশ্বাস শ্রীভগবান কৃপা করে হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিলেও আরতির গান গাওয়ার সময় প্রথম প্রথম 'অবতারবরিষ্ঠায়' জায়গাটা গাইতাম না, চুপ করে থাকতাম। মনে হত

এটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু, অতি শীঘ্র সে কু-ভাব মন থেকে মুছে দিলেন। মঠে দীক্ষা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হল, বিশেষ করে বিজ্ঞানানন্দজীকে ও পরে অখণ্ডানন্দজী এবং অভেদানন্দজীকে দর্শন করার পর। সন্দেহদোলায় দুলে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় কাটালাম অনেকদিন; কারণ তখন মাথায় ছিল, কুলগুরুর কাছেই দীক্ষা নিতে হয়, অন্যত্র নিতে নেই। অথচ মন ব্যাকুল হয়ে চাচ্ছে ঠাকুরের কোন সন্তানের কাছ থেকে দীক্ষা পেতে। এই ব্যাকুলতার আরও একটা কারণ ছিল। এখানেই একদিন শুনেছিলাম, নির্বেদানন্দজী পূর্বে প্রসঙ্গ-ক্রমে ছেলেদের একবার বলেছিলেন যে, ঠাকুরের সন্তানদের কাছে দীক্ষা পেলেই মুক্তিলাভ হবে। শুনে একজন ছাত্র বলেছিলেন, "মুক্তি কি এত সহজ কথা! দুপয়সা দিয়ে খেয়া পার হয়ে মঠে গিয়ে দীক্ষা নিলাম, আর মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল!" উত্তরে নির্বেদানন্দজী বলেছিলেন, "এখন সত্যিই এত সোজা। কিন্তু কিছুকাল পরে মাথামুড খুঁড়লেও আর এ জিনিস পাবে না।" নির্বেদানন্দজীর মুখেই অন্যসময় শুনেছিলাম, তুরীয়ানন্দজীকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "উপনিষদে আছে, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। তা, ঠাকুরের সন্তানরা যাদের কৃপা করছেন, তাদের তাঁরাই বরণ করা হচ্ছে তো?" তুরীয়া-নন্দজী উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ

মানসিক যন্ত্রণা যখন তীব্রতম হয়ে উঠেছে, তখন একদিন নির্বেদানন্দজী আমায় ডেকে বললেন, "এর আগে কাউকে নিজে থেকে দীক্ষা নেবার কথা বলিনি; কিন্তু তোকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। দীক্ষাটা নিয়ে নে। দেরি করিস না, ঠাকুরের সন্তানদের দুজন এখনো রয়েছেন (অভেদানন্দজী পৃথক্ মঠে থাকতেন বলেই বোধ হয় দুজন বললেন)—এঁদের মধ্যে যাঁকে ভাল লাগে তাঁর কাছে দীক্ষাটা নিয়ে নে।" তখন সব খুলে বললাম। শুনে হেসে বললেন, "ওটা কোন বাধাই নয়।"

এর আগে একদিন বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম, অখণ্ডানন্দজী এসেছেন শুনে। ঘরে একা বসেছিলেন তিনি। প্রণাম করে মনে মনে তাঁর কাছে মানসিক যন্ত্রণার প্রতিকার করে দেবার প্রার্থনাও জানিয়েছিলাম। প্রণাম করে ফিরে যাবার সময় দ্বারের কাছে এসে আবার ঘুরে তাঁর দিকে তাকালাম, আবার মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, 'আপনার ভেতর তো ঠাকুরই রয়েছেন, আপনি তো আমার মনের কথা সবই টের পাচ্ছেন, কৃপা করে একটা ব্যবস্থা করছেন না কেন?' সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার দিকে চোখ তুললেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে —আমিও স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। প্রায় মিনিট দশেক হবে। তারপর স্পষ্ট দেখলাম, পাতলা কুয়াশার মতো একটা জ্যোতির ধারা তাঁর চোখ থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে স্পর্শ করছে। কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পর থেমে গেল। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন, মুখে কিছুই বললেন না। হতাশ হলেও আনন্দ নিয়েই ফিরে এসেছিলাম সেদিন।

এই ঘটনার পর নির্বেদানন্দজীর সঙ্গে পূর্বোক্ত কথা হয়, দীক্ষা নিয়ে। তাই ঠিক করেছিলাম, অখণ্ডানন্দজীর কাছেই দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাবো। কিন্তু জানাবার আগেই তিনি দেহরক্ষা করলেন। মন তখন প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠল—বিজ্ঞানানন্দজীর মঠে আসার প্রতীক্ষায় রইলাম। শেষে একদিন তাঁর কৃপালাভ করে ধন্য হলাম। সব চেয়ে বেশী আনন্দ হল, 'দুর্দান্ত' আনন্দ হল আর একটি ঘটনায়। প্রথম যখন বিদ্যার্থি-আশ্রমে আসি, আরতির গান ও সকালের ভজন শেষ হবার পরই আসন ছেড়ে

উঠে পড়তাম। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (তখনও তাঁর সন্ন্যাস হয়নি) তখন ওখানকার কর্মী; তিনিই, ভাল গাইতে পারতেন বলে, ভজন পরিচালনা করতেন। তিনি একদিন বললেন, "আসনে কি ছারপোকা আছে নাকি? ভজন শেষ হতে না হতেই তিড়িং করে উঠে পড় যে!" ভেবে পেলাম না, বসে থেকে করবোটা কি? মনে তখন অনেক বাজে চিন্তা উঠত। ঠাকুরঘরে এমনি বসে থাকলে যদি সেসব চিন্তা ওঠে, খুবই খারাপ হবে সেটা। দেখতাম, যে সব ছেলেরা দীক্ষিত, তাঁরা বসে জপ করছেন। আমার তো তখন দীক্ষা হয় নি, বসে থেকে করবোটা কি? যাই হোক, তার পরদিন থেকে নিজেই মনে মনে একটা মন্ত্র ঠিক করে নিয়ে তাই জপ করতাম কিছুক্ষণ। বিজ্ঞানানন্দজী দীক্ষাদানকালে প্রথমেই যখন সেই মন্ত্রটি বললেন, আনন্দে মন-প্রাণ ভরে গেল; বলা যায়, মন-প্রাণ ভরিয়ে দিয়ে আনন্দ উপচে পড়ল। দীক্ষার পর প্রার্থনাদি শিখিয়ে দিয়ে হেসে বললেন, "ব্যস্, ছুটি!!"

আমার সঙ্গে আমার চেয়ে একটু বেশী বয়সের আর একটি ছেলের দীক্ষা হয়েছিল। নাম জানি না। পরে আর কখনো তাঁকে দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। আমি তো বোকা—দীক্ষা শেষ হবার পর আনন্দে মশগুল হয়ে তাঁর পদপ্রান্তে বসে আছি– কিছু যে বলতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়, সে জ্ঞানগম্যি ছিল না। সঙ্গীটি কিন্তু খুব তুখড়—সে মহারাজকে বলল, "আশীর্বাদ করুন, যেন ব্রহ্মচর্যজীবন যাপন করতে পারি।" তিনি আশীর্বাদ করলেন। আমার তখন হুঁশ হল, আমি বললাম, 'আমাকেও আশীর্বাদ করুন!" প্রাণখোলা হাসি হেসে আশীর্বাদ করে বললেন, "প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি।" বললেন, "সত্য ও ব্রহ্মচর্য—এদুটি জিনিস ঠাকুর খুব ভালবাসতেন।"

ফাঁকি দেবার ফন্দি অনেক রকম মাথায় ঘুরতো তখন—সব কাজেই। দীক্ষাদানের পর সকাল-সন্ধ্যায় জপ করার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, "কাপড় ছেড়ে জপ করবে।" ভাবলাম, এ তো এক হাঙ্গামার কথা হল। কি দুষ্টু মন ছিল, ভাবলাম এ আদেশটা কাটিয়ে নিতে হবে। এই দুষ্টুবুদ্ধি নিয়ে কয়েকদিন পরে মঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সব অবস্থায়, সব সময় জপ করা যাবে তো?" বললেন, "হ্যাঁ যাবে।...চলতে চলতেও করা যাবে, ট্রেনে যেতে যেতেও করা যাবে।" তারপরই বললাম, "তাহলে সকাল-সন্ধ্যেয় কাপড় না ছেড়ে করা চলে না?" পরিষ্কারভাবে "না" বলে দিলেন। আরো কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাপড় না ছাড়ার কথাটা আরো দু-একবার তুললাম। কিন্তু আমার চপলতায় বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশও করলেন না, ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তির প্রশ্রয়ও দিলেন না।

এরপর একবার মাথায় আর একটা চিন্তা ঢুকলো। গুরু-শিষ্যের একটা বিশেষ সম্পর্ক থাকে; ইনি আমাদের দীক্ষা তো দিলেন, কিন্তু আমাদের শিষ্য বলে মনে রেখেছেন তো? যাই, প্রণাম করে চলে আসি, শিষ্য বলে মনে করেছেন এমন কোন লক্ষণই তো দেখি না; তখন দীর্ঘ কিছুকাল ধরে, যে কয়দিন তিনি মঠে ছিলেন, কলেজ যাবার নাম করে সোজা মঠে চলে আসতাম। আশ্রমে ৮টা-৯টায় ভরপেট খেয়ে এলেও মঠে এসে নিত্য দুপুরে আবার প্রসাদও পেতাম—সেটা অবশ্য চালতার চাটনি প্রসাদের লোভে। মিশন আফিসের সামনে একটা চালতা-গাছ ছিল, খুব ফলতো। (হায়রে! সেটি এখন আর নেই।) সারাদিন মঠে কাটিয়ে আবার ভাল ছেলের মতো যথাসময়ে আশ্রমের বাসেই আশ্রমে ফিরতাম—যেন কলেজ থেকেই ফিরছি। কারণ, মঠের একজন প্রাচীন সাধু মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, "ঠাকুরের সন্তানদের, আগে আগে

যা দেখেছি, যখন ভোপাবিতরণের কোন বাছ-বিচারই থাকে না, তার স্বল্পকাল পরেই তাঁরা দেহত্যাগ করে চলে যান। এঁর এখন যা অবস্থা দেখছি সেই রকমই সন্দেহ হচ্ছে। যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, এই সময় করে নিও। যদি কোন সাধ থাকে এই সময় মিটিয়ে নিও।" তখন জিজ্ঞাস্য বিশেষ কিছু থাকত না, মনে কোন সংশয়ই খুঁজে পেতাম না। তবু দু-একটি যা ছোট-খাট প্রশ্ন জাগত, পূর্বোক্ত সাধুটির কথা অগ্রাহ্য করেই তা জিজ্ঞেস করতাম না—কারণ শুনেছিলাম তাঁর শরীর তখন খুব খারাপ—কথা বলতে যদি কষ্ট হয়! সাধ বলতে ঐ একটিই ছিল, নিত্য গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসা—তাঁকে দেখে আসা—সেটা মিটিয়ে নিতাম। যাই হোক, যাওয়া-আসা নিত্য করছি, কথা কিছু না বললেও প্রণাম তো করছি, কিন্তু তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত বলে চিনতে পারছেন এমন লক্ষণ তো এর মধ্যে একদিনও দেখলাম না! মনটা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। জিজ্ঞেসও করা যায় না সোজাসুজি। একদিন একটা তুক করলাম, সন্দেহ-নিরসনের জন্য। (মনে রাখবেন, আপনারা একটি ছেলের স্মৃতিকথা পড়ছেন—যার মনে অনেক আজে-বাজে প্রশ্ন জাগে, যার মন এসব বিষয়ে তখন সম্পূর্ণ অপরিণত)। ভাবলাম, 'আমার ডাকনাম তো উনি জানেন না। সেই নাম ধরে নিজে থেকে এর মধ্যে যদি আমায় একবারও ডাকেন, তাহলে বুঝবো ভোলেননি।' এর দু-একদিন পরই বিকেলে বিজ্ঞানানন্দজীর ঘরে প্রণাম করতে ঢুকেছি, আমি আর আমাদের আশ্রমেরই আর একটি ছেলে (সে-ও বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপাপ্রাপ্ত) —ঢোকামাত্র তিনি একগাল হেসে বললেন, "এই যে···!" আমার ডাকনামটিই বললেন। প্রাণ ভরে গেল। শুধু তাই না, সেদিন ঘণ্টাখানেক ধরে অতি পরিচিত বন্ধুর মতো আমাদের দুজনের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করে হাসিয়ে হাসিয়ে পেটে ব্যথা ধরিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের যে কোন ব্যবধান আছে, সেকথা একেবারে ভুলিয়ে দিলেন যেন তিনি তখন আমাদের সমবয়সী ও সহপাঠী অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু একজন। শেষে বললেন, "স্টুডেন্টস্ হোমের মাছ খেতে হবে। কাল আনতে পারবে?" বিদ্যার্থি-আশ্রমকেই ইংরেজীতে 'স্টুডেন্টস্ হোম' বলা হয়। দুজনেই একসঙ্গে উত্তর দিলাম, "পারবো মহারাজ।" তিনি আমার নাম করে বললেন, "ও পারবে।" আমাকেই আনতে আদেশ করলেন। আনন্দের মাত্রা আরো বেড়ে গেল এতে। আশ্রমে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হল! নির্বেদানন্দজীকে সব বললাম। তিনি শুনে তৎক্ষণাৎ জাল ফেলিয়ে একটা মাঝারি গোছের পোনামাছ ধরিয়ে জিইয়ে রাখালেন, যাতে সকালে নিয়ে যেতে দেরি না হয়। আশ্রমে ঝিল, পুকুর দুই-ই ছিল। আর একটু দুধও সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন। আশ্রমে গোশালাও ছিল।

পরদিন মহা উৎসাহে মাছ আর দুধ নিয়ে মঠে হাজির হলাম। মহারাজের ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখালাম। দেখে আবার সেই প্রাণখোলা হাসি—"খুব ভাল মাছ।" শ্রীনাথ মহারাজের কাছে দিতে বললেন। তিনিই তখন মহারাজের খাবার রান্না করে দিতেন, ঠাকুরকে ভোগ দেবার পর মহারাজকে প্রসাদরূপে এনে দিতেন। মাছ ও দুধ দুই-ই রাখলেন তিনি। দুপুরে প্রসাদ পাবার পর শ্রীনাথ মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম—"বিজ্ঞান মহারাজ মাছ খেয়েছেন?" (তখন 'গুরু মহারাজ', 'প্রেসিডেন্ট মহারাজ', 'বড় মহারাজ', 'ছোট মহারাজ' এসব কথার সৃষ্টিই হয়নি, সবাইকেই নাম ধরেই ডাকা হত; সাধুরাও বলতেন, আমরাও বলতাম। 'গুরুমহারাজ' বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরকেই বোঝাত।) শ্রীনাথ

মহারাজ বললেন, "না, আজ শরীর খুব খারাপ, কেবল একটু নেবুর রস খেয়েছেন।" মনটা দমে গেল। কাল কত উৎসাহ নিয়ে মাছ আনতে বললেন, আজ সকালেও দেখে কত আনন্দ করলেন, অথচ খাওয়া হল না! যাই হোক জানি যে খাননি, তবু বিকেলে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ, মাছ খেয়েছেন?" সেই প্রাণগোলা হাসি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, খেয়েছি!" শুনে সব গুলিয়ে গেল—এঁরা তো মিছে কথা বলবেন না। অথচ শুনলাম, নেবুর রস ছাড়া কিছু খাননি; অথচ বলছেন, "হ্যাঁ, খেয়েছি!" কি হল ব্যাপারটা? হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে উদ্ভাসিত হল, তাহলে যা ভাবি, তাকি আক্ষরিক অর্থেই সত্য—ঠাকুর ও ইনি এক? ঠাকুরের খাওয়াকেই 'আমি খেয়েছি' বলছেন। চিন্তাটা সম্পূর্ণও হয়নি, হেসে যা বললেন, তাতে মনে চিরতরে গভীরভাবে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের একত্বরোধ গেঁথে গেল। শুধু তাঁর সম্বন্ধে নয়, তখন থেকে মনে বিশ্বাস, যা আগে ভাসা-ভাসা ছিল, গভীরভাবে দাগ কেটে বসল যে ঠাকুর ও তাঁর সব সন্তানই অভেদ। এই সময়েই প্রথমে বলেছিলেন, "আমাদের নাম করে আনলেই আমাদের খাওয়া হয়।"

প্রসঙ্গতঃ বলছি, এই যে ছেলেমানুষি ভাব, 'আমাকে মনে রেখেছেন তো?' এ শুধু আমার একার হয়নি। অন্ততঃ আর একজনের কথা জানি—স্বামী সন্তোষানন্দ। একদিন তাঁকে আমার এই সন্দেহ ও তা নিরসনের কথা বলেছিলাম। তিনি হেসে বললেন, "ছেলেবেলায় ওসব মনে হয়।" তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন। বললেন, "দীক্ষার পর আমারও ঐরকম সন্দেহ হয়েছিল—'মা তাঁর শিষ্য বলে আমাকে মনে রেখেছেন তো?' কোন লক্ষণই দেখি না, জিজ্ঞেসও করতে পারি না সোজাসুজি। শেষে ঠিক করলাম, মাকে গিয়ে প্রণাম করার পর নিজেই বলবো, 'মা, আমাকে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন। ঠিক আছে তো?' গিয়ে প্রণাম করার পর যেই সেকথা বলতে গেছি, কেবল 'মা!' কথাটি মাত্র উচ্চারণ করার পরই মা নিজেই মন্ত্রটি বলে বললেন, 'এই মন্ত্র দিয়েছিলাম তো? ঠিক আছে বাবা!'"

আর একদিন প্রণাম করে ওঠার পর বিজ্ঞানানন্দজী নিজেই আমাকে বললেন, "ঠাকুর চৈতন্যস্বরূপ, আর মা হচ্ছেন চিন্তা-স্বরূপিণী।" আগেই বলেছি, মনে তখন কোন সংশয় জাগত না, বিশেষ করে এঁদের সান্নিধ্যে যখন থাকতাম। সেজন্য কথাটির অর্থ নিয়ে তাঁকে কোন প্রশ্ন করার চিন্তাও মনে জাগেনি। তখন মনে হয়েছিল, বলছেন, ঠাকুর চৈতন্যস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম, আর মা চিন্তাস্বরূপিণী অর্থাৎ সেই ব্রহ্মেরই শক্তি, এবং তাঁর কথামতোই (ঠাকুরেরও কথামতো) দুজন অভেদ। আমরা তখন উপনিষদে পড়েছি, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের শক্তিসমন্বিতরূপে, সগুণব্রহ্মরূপে প্রথম প্রকাশ 'চিন্তাস্বরূপ' হয়েই—"একোঽহং, বহু স্যাম্।" তা থেকেই পরে জগতের সব কিছুর সৃষ্টি। আশ্রমে তখন ছেলেদের নিয়ে উপনিষদের ক্লাস হত। নির্বেদানন্দজীও তখন আমাদের নিয়ে এসব বিষয়ে আলোচনা খুবই করতেন। অবশ্য এখনও এর অর্থ তাই-ই ভাবি।

বেলুড় মঠের মন্দিরের ভিত খোঁড়া থেকে ঠাকুরকে মন্দিরে বসানো পর্যন্ত সবই আমরা ছাত্রাবস্থায় দেখেছি। একদিন মঠে গেছি, বোধ হয় সকালবেলা। গিয়ে দেখি বিজ্ঞানানন্দজী মন্দিরের চারপাশ ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছেন। তখন দেওয়াল সবে মাটির ওপর পর্যন্ত উঠেছে, মন্দিরের চারপাশে শালবল্লার অরণ্য মাথা তুলতে শুরু করেছে। তাঁকে বেড়াতে দেখে আমি এবং আরো কয়েকটি ছেলে পিছু নিলাম। সবটা ঘুরে দেখে তিনি মিশন

আফিসের সামনের চাতালে চেয়ারে বসলেন। সামনে টেবিলের ওপর মন্দিরের ছোট্ট মডেল। আমরা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে সব দেখতে লাগলাম। মাটির নীচেও ঘর রয়েছে দেখে আঙুল দিয়ে সেটি দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "মাটির নীচের এ ঘরে কি হবে?" তিনি কৌতুকোজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বললেন—যেন কোন গুপ্তকথা বলছেন—"ওখানে ঢুকো না!"

শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেদিন বিজ্ঞানানন্দজী পুরনো মন্দির থেকে এনে নতুন মন্দিরে বসান, সে দিনটি বিপুল আনন্দে কেটেছে—তার বিশদ বর্ণনা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একটি জীবনীগ্রন্থে গ্রন্থটির লেখক অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন, এখানে তার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। সে সময় আট-দশ দিন আমরা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকরূপে দিনরাত্রি মঠেই থাকতাম। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পরদিন স্বামী শান্তানন্দজী আমাকে মন্দিরের সামনের মাঠে দেখতে পেয়ে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন—তিনি তখন মিশন আফিসের ওপরে ছোট একটি ঘরে থাকতেন। বললেন, "আজ এইমাত্র বিজ্ঞান মহারাজ নিজের ও ঠাকুরের সম্বন্ধে বহু কথা বলেছেন, যা সাধারণতঃ বলেন না। তুমি চল, আমি বলবো, সেগুলি লিখে দেবে।" তাঁর সঙ্গে গেলাম, ফুলস্ক্যাপ কাগজে প্রায় আট পৃষ্ঠার মতো লিখলাম, ঠাসা লাইনে। আগেই বলেছি, তখন এঁদের কাছে এলেই আনন্দে ভরে যেত মন, কোন প্রশ্ন বা সংশয় জাগত না। তাই এঁদের কথা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতাম না—কেবল যেগুলি আমার নিজের মনে দাগ কেটে যেত, সেগুলি ছাড়া আর কিছু মনে রাখার চেষ্টাও করতাম না। এই লেখা কাগজগুলি পরে হারিয়ে যায়। তারপর শান্তানন্দজীর সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, ততবারই তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, "তোমার কিছু মনে আছে?" বেকুবের মতো উত্তর দিতে হয়েছে, "না মহারাজ!"

এই সময়ই বিজ্ঞানানন্দজীর বেলুড় মঠে থাকাকালে একদিন, কিংবা এর আগে কোন একদিন, ঠিক মনে নেই, তাঁকে প্রণাম করে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সামান্য কিছু কথাবার্তাও বোধ হয় হয়েছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না। হঠাৎ দেখি বড় বড় চোখদুটি আরো যেন বড় করে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আর, যেমন আগে একবার অখণ্ডানন্দজীর চোখে দেখেছিলাম, তেমনি স্পষ্ট দেখলাম, তেমনি পাতলা কুয়াশার মতো জ্যোতি তাঁর চোখ থেকে বের হয়ে আমাকে স্পর্শ করে রইল কিছুক্ষণ।

প্রসঙ্গতঃ এখন, যখন জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, এবং যে-দুজন সন্ন্যাসীর কথা বলবো তাঁরা দুজনই দেহ ছেড়ে চলে গেছেন, বলতে বাধা নেই, ঠিক একই জিনিস জীবনে আরো তিনবার দেখেছি—কাশীতে মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মায়ের চোখে, স্বামী নির্বেদানন্দজীর দেহত্যাগের পূর্বদিন সন্ধ্যায় তাঁর চোখে এবং শেষবার কাশীতে স্বামী প্রেমেশানন্দজীর চোখে—যখন বিশেষ কোন কারণে তিনি 'প্রাণ খুলে' আমাকে আশীর্বাদ করছিলেন।

বিজ্ঞানানন্দজীর পাদস্পর্শ শেষবার করি হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরার ভেতর—যেবার এলাহাবাদ গিয়ে আর ফেরেননি।

ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর দেহত্যাগ-সংবাদ পাই। তখন শুনে এমন একটা কিছু অভাববোধ হয়নি। অভাব বোধ করলাম, ভেতরটা সত্যিই তাঁর অভাববোধে হাহাকার করে উঠল এরপর যেদিন প্রথম মঠে গেলাম।

[২]

শোনা কথারও অনেক কিছুই বিজ্ঞানানন্দজীর একটি জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন তার

গ্রন্থকার। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই আমার নাম দেননি, প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। নতুন কথা দু-চারটি যা জানি, তাই লিখছি।

বিজ্ঞানানন্দজী স্বভাবত খুব গম্ভীর হয়ে থাকলেও মাঝে মাঝে ছেলেদের সঙ্গে কেমন হাসি-ঠাট্টা করতেন, যেন তাদের স্তরেই নেমে এসে, তাদের সঙ্গে এক হয়ে, সে-কথা তো আগেই বলেছি। নির্বেদানন্দজীর মুখে শোনা বড়দের সঙ্গে তাঁর রসিকতার একটা উদাহরণ দিয়ে এ-প্রসঙ্গ আরম্ভ করি

বিদ্যার্থি-আশ্রমে বিজ্ঞানানন্দজী কয়েকবার গেছেন। দমদমে যখন আশ্রম, তখন সেখানে দুবার গিয়েছিলেন। শেষবারে আমরা ছিলাম, আগে বলেছি। তার আগের বার তাঁর এরোপ্লেনে ওঠার 'শখ' হয়েছিল। দমদম এরোড্রোমে এসে প্লেনে চড়ে কিছুক্ষণ আকাশে উড়ে ফেরার পথে বিদ্যার্থি-আশ্রমে এসেছিলেন। সে সময় দশ টাকা দিলে কিছুক্ষণ প্লেনে উঠে ঘোরার ব্যবস্থা ছিল—বোধ হয় 'বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব' সে ব্যবস্থা করত। সেবারেই আশ্রমে হাঁস দেখে এসেছিলেন। ছেলেদের ডিম খাওয়ানোর জন্য হাঁস রাখা হয়েছিল।

এরপর অখণ্ডানন্দজীও একবার দমদমে বিদ্যার্থি-আশ্রমে আসেন। তিনি ডিম খাওয়া পছন্দ করতেন না। হাঁস দেখে এবং সেগুলি আশ্রমের জেনে নির্বেদানন্দজীকে বলেন, "এগুলো রেখো না।" তাই করা হয়।

তারপর একবার বিজ্ঞানানন্দজী মঠে এসেছেন। নির্বেদানন্দজীও গেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। একথা-সেকথার পর বিজ্ঞানানন্দজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের সেই হাঁসগুলো ডিম দিচ্ছে তো?" নির্বেদানন্দজী অখণ্ডানন্দজীর আদেশের কথা জানিয়ে বললেন, "সেগুলো বিদেয় করে দেয়া হয়েছে।" বিজ্ঞানানন্দজী তৎক্ষণাৎ বললেন, "বেশ তো, মুরগি রাখুন। তিনি হাঁস রাখতে নিষেধ করেছেন, মুরগি রাখতে তো নিষেধ করেন নি!"

স্বামী গঙ্গেশানন্দজীর কাছে শুনেছি, তিনি একবার বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে গাড়ীতে আসতে আসতে (যতদূর মনে হচ্ছে, হাওড়া স্টেশন থেকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসার সময়) পথে তাঁকে বলেন, "মহারাজ, ঠাকুরের অনেক সন্তানকে দেখলাম, আপনাকেও দেখলাম, সঙ্গ-সেবাদিও করলাম, কিন্তু কৈ, কিছুই তো হল না!" শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমার মুখে একথা শুনবো, আশা করিনি। ভগবান যখন পার্ষদদের নিয়ে মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হন, তাঁদের লীলা দেবতারাও দেখতে আসেন। ঠাকুরের এতজন সন্তানদের যে দেখেছো, এতেই একটা জীবনের কাজ হয়ে গেছে।"

কয়েকজন প্রাচীন সাধুর কাছে, গৃহস্থ-ভক্তদের কাছেও, কয়েকটি ঘটনা একই রূপ শুনেছি—ভাষায় সামান্য তারতম্য মাত্র ছিল। এরূপ দুটি ঘটনা এখানে বলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করছি।

স্বামী শিবানন্দজীর একজন গৃহস্থ-মন্ত্রশিষ্য তাঁর দেহত্যাগের পর মনে খুব আঘাত পান। কয়েকদিন অস্বস্তিতে কাটাবার পর তিনি ঠিক করলেন এলাহাবাদে গিয়ে বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গ করবেন—ভেতরটা খানিকটা জুড়োবে। এলাহাবাদে তাঁর বাড়ী ছিল। সেখানেই গেলেন। বিজ্ঞানানন্দজীর নির্দেশমতো নিত্য বিকাল পাঁচটায় তাঁর কাছে যান, কিছুক্ষণ কাটিয়ে শান্তি নিয়ে বাড়ী ফেরেন। বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল। একদিন যেতে দশমিনিট দেরি হয়েছে। ঘরে ঢোকার আগে দরজার কাছে যেতেই বিজ্ঞানানন্দজী বলে উঠলেন, "গেট আউট! দশমিনিট ধরে আপনি আমাকে আপনার কথা ভাবিয়েছেন!" শুনে ভক্তটির মনে খুব লাগল, খুব অভিমানও হল। ফিরে গেলেন। ভাবলেন, "ভেতরটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেলেও আর আসছি না।" করলেনও তাই।

তিন দিন পরে বিকেলে দ্বারে করাঘাত শুনে দরজা খুলে দেখেন, বিজ্ঞানানন্দজী বাইরে দাঁড়িয়ে; অসুস্থ শরীর নিয়ে হেঁটে এসেছেন! দরজা খোলার পরই ভক্তটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সাধুর ওপর কি রাগ করতে আছে বাবা?" এ অভাবিত করুণায় চোখের জলে ভক্তটির সব অভিমান ধুয়ে গেল, আনন্দে বুক ভরে উঠল।

অন্য ঘটনাটি আসামের এক দম্পতীকে নিয়ে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই দীক্ষার দিন স্থির হয়েছে। যাবার ঠিক আগে স্ত্রী জ্বরে পড়লেন। স্বামী অপেক্ষা করলেন না, যথাসময়ে দীক্ষা নেবার জন্য যাত্রা করলেন। স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন, "ভাবনার কি আছে, পরের বারে হবে।" কিন্তু স্ত্রী সে-সুযোগ আর পেলেন না—তার আগেই বিজ্ঞানানন্দজী দেহত্যাগ করলেন। সংবাদ পেয়ে স্ত্রী আহার ত্যাগ করে কয়েকদিন ধরে কেবল কাঁদতে লাগলেন। অনেক বোঝানো হল, খাওয়ানোর চেষ্টা করা হল, সব বৃথা। স্বামী ভাবলেন, 'এ আর বাঁচবে না। না খেয়ে এভাবে একটানা কেঁদে চললে মানুষ কদিন বাঁচতে পারে!' কয়েকদিন পরে আফিস থেকে ফিরে দেখেন, স্ত্রী বসে আছেন, খুব হাসি-খুশী ভাব, মুখ আনন্দোজ্জ্বল। কি ব্যাপার? স্ত্রী বললেন, "উনি (বিজ্ঞানানন্দজী) আজ এখানে সশরীরে এসেছিলেন। আমায় দীক্ষা দিয়ে গেছেন।"

[৩]

প্রথমে কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় যে ঘটনাটি বহুবার আমাকে বলেছিলেন, লিখেও জানিয়েছিলেন, সেইটি বলছি।

বিজয়লালবাবুর মা বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা। প্রথম বয়সে বিজয়লালবাবু ধর্মকর্মে বা দীক্ষাদিতে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। তাঁর মা-ই এক-রকম জোর করে তাঁকে দীক্ষার জন্য বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে নিয়ে যান। কেবল মায়ের কথা রক্ষার জন্যই তিনি গিয়েছিলেন, নিজের কোন বিশ্বাস ছিল না দীক্ষায়। দীক্ষার সময় আসনে বসার পর বিজয়লালবাবুর মনে হল, 'আমার যে নিজের বিশ্বাস বা ইচ্ছে নেই, মা-ই জোর করে আমাকে এখানে এনেছেন, একথা এঁকে জানানো দরকার।' যাঁরা বিজয়লালবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘদিন মিশেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি খুব আবেগ-প্রবণ ছিলেন। কথাও বলতেন প্রায় সব সময়ই আবেগভরে, শেষ বয়সেও। তিনি দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে নিজের স্বভাবসিদ্ধ আবেগভরা কণ্ঠে বিজ্ঞানানন্দজীকে বললেন, "দেখুন, ভগবান আর আমার মধ্যে একচুলও ব্যবধান নেই। তাহলে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আবার অন্য লোকের (গুরুর) কি প্রয়োজন?"

শুনে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "একথা শুনে মহারাজ কি বললেন?" বিজয়বাবু উত্তর দিয়ে-ছিলেন, "একটিও কথা বললেন না। কেবল স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর দীক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিলেন।"

বিজয়বাবু পরবর্তী কালে বহু, বহুবার আমার কাছে এসেছেন। ঠাকুরের কথা, বিজ্ঞান মহারাজের কথা, বলতে বলতে বার বার তাঁর চোখ জলে ভরে যেতে দেখেছি। একদিন ঠাকুরের আলোচনা-প্রসঙ্গে ঠাকুরের সেই কথাটি বলেছিলাম, "ভগবানের জন্য কাঁদলে চোখের জলে মনের ময়লা ধুয়ে যায়।" শুনে সেদিন কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি একজন ভক্ত মহিলার। তিনি নাম প্রকাশে অতি কুণ্ঠিতা ও একান্ত অনিচ্ছুক বলে নাম প্রকাশ করলাম না। তাছাড়া এখন নাম প্রকাশ না করাই ভাল। তাঁর লিখিত কথাই এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি—কেবল ব্যাকরণ-সম্মত করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন ভাষায়, স্থানে

স্থানে সেটুকু মাত্র সংশোধন করে দিলাম—তা-ও বিজ্ঞানানন্দজীর কথা যেগুলি, সে-অংশগুলির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করলাম না—কেবল ক্রিয়াপদগুলি কোথাও চলতিভাষায় কোথাও শুদ্ধ-ভাষায় ছিল, সেগুলি মাত্র একরকম করে দিলাম :

"স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপা ও করুণার কথা আমার মতো মূর্খ সন্তানের বলার কিছু নেই। তিনি আমায় কৃপা করে শ্রীচরণে আশ্রয় দেবেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর চরণে আশ্রয় পাবার ঠিক আগে আমি অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলাম—কি করে দুর্জয় সংসার-বন্ধন কাটাব তাই অনুক্ষণ ভাবছিলাম। আমার জীবন ছিল খুবই দুঃখের। আমি বাপ-মার একান্ত আদরের সন্তান ছিলাম। নয় বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর একুশ দিনের মধ্যেই আমি বিধবা হই। বিবাহিত জীবন যে কি, তার কিছুই বুঝলাম না। এতে বাপ মা খুব দুঃখ পেলেন। আমার আবার বিয়ে দেবার জন্য বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ঐ বয়সেও 'বাবা'-কে অর্থাৎ শিবকেই আমি জীবনের একমাত্র সম্বল করেছিলাম। তাঁদের সেই চেষ্টা তাঁর (শিবের) কৃপাতেই ব্যর্থ হল। তাতে তাঁরা আমার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তখন থেকেই মাঝে মাঝে শিব ও যীশুখ্রীষ্টের দর্শন পেতে থাকায় আমি আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতাম; সেজন্যই বিবাহের প্রস্তাব আমার কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল। তখন আমি শ্বশুরবাড়ী চলে এলাম। শ্বশুররা ভক্তলোক ছিলেন; তাঁদের বাড়ীতেই নয় বছর বয়সেই কুলগুরুর কাছে দীক্ষা পাই। তাঁরা আমার ধর্মাচরণে কোনদিন বাধা দেননি; কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছেন। সবই নীরবে সহ্য করেছি।

"দৈবক্রমে বত্রিশ বছর বয়সে তারকেশ্বর গিয়ে সেখানে বামাক্ষ্যাপার শিষ্য তারাক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ পাই। তিনি বলেছিলেন, 'মা, তুমি বেড়াজালে আগুনে-পোড়া রুটি হচ্ছ। তোমার শান্তি মিলবে। তিন মাসের মধ্যেই সদ্‌গুরুর দর্শন পাবে ও জীবনের জ্বালা জুড়োবে। একবছরের মধ্যে ঘর থেকে চলে যেতে হবে ও সংসারবন্ধন কেটে যাবে।' এরপরই, আমার বত্রিশ বছর বয়সেই একদিন স্বপ্নে* একজন দিব্য মহাপুরুষের দর্শন পাই; তিনি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে বলেন, 'আমি বেলুড় মঠে এসেছি, তুমি কাল এস।' আমি পূর্বে কোনদিন বেলুড় মঠে যাইনি, দেখিনি। পর-দিন ভোরে পাড়ার এক ভদ্রলোক (মহাপুরুষ মহারাজের একজন মন্ত্রশিষ্য) ও আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় মঠে গেলাম। একখানা নতুন থানধুতি ও চারটে টাকা সঙ্গে নিলাম। মঠে গিয়ে ভরত মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দ) সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'দীক্ষা নেব।' তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'বলা নেই, লেখা নেই, দীক্ষা নিলেই হল!' আমি চুপ করে থাকলাম। এমন সময় হঠাৎ বিজ্ঞানানন্দজীর সেবক করমভাই মহারাজ (স্বামী অমোঘানন্দ) ভরত মহারাজের সামনে এসে আমাকে বললেন, 'মহারাজ আপনাকে ওপরে ডাকছেন।' আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওপরে উঠে গেলাম। গিয়ে দেখি

* স্বপ্নের কথা সাধারণতঃ উদ্বোধনে প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু প্রবন্ধটিতে ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করা হল এইজন্য যে, এখানে এবং পরে দেখা যাবে তাঁর জীবনে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা মাঝে মাঝে একেবারে মিলে গেছে।—সম্পাদক †

† এই সম্পাদকীয় মন্তব্যটি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর। তিনি তখন (জানুআরি ১৯৭৮) 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক।—সংযুক্ত সম্পাদক

বিজ্ঞানানন্দজী ফুল, ফল, মিষ্টি সাজিয়ে রেখে যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আমাকে বললেন, 'বস মা!' আমি ভয়ে এমন হয়ে গেছি যে প্রণাম করতেই ভুলে গেলাম। তিনি আমায় মন্ত্র দিলেন, স্বপ্নে যা বলেছিলেন, তাই-ই দিলেন; তিন-চার বার বললেন; এবং কি করে জপ করতে হয় তা দেখিয়ে বললেন, 'বুঝেছ মা!' তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লাম এবং তাঁর মধ্যে জ্যোতির্ময়রূপে শিব-মূর্তি দর্শন করলাম। এই দিব্য দর্শনে আমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখি তাঁর রাতুল চরণ দুখানি আমার মাথার ওপর। ছেলেবেলা থেকেই আমার একমাত্র ভালবাসার দেবতা ছিলেন শিব; তাই মনে একটু ভয় ছিল, তিনি যদি শিবপূজা করতে নিষেধ করেন! কিন্তু নিজে থেকেই বললেন, 'শিবই একমাত্র জগদ্গুরু।' আর প্রথমেই তো নিজের মধ্যে শিবকে দর্শন করিয়ে সেকথা প্রত্যক্ষ করিয়েও দিলেন। আমার হাতে মিষ্টি দিলেন। বললেন, 'মুখে চোখে জল দাও, পরে প্রসাদ পেয়ে (জপের) মালা নিয়ে আমার কাছে এস।' ঐ দিন আমার একা দীক্ষা হয়, ঘরে আর কেউ ছিল না।

"দীক্ষার পরে ১লা মাঘ আমি মঠে যাই, শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের আগে। সেবার আমি তাঁর চরণে মাত্র দুটি টাকা দিয়ে প্রণাম করি; কিন্তু তিনি আমায় বললেন, 'টাকা দিয়ে তোমায় প্রণাম করতে হবে না, ও-পথ তোমার নয়।' বললেন, 'ঘড়ির কাঁটার মতো জীবন তৈরী কর। আর, কাকেও তোষামোদ করবে না।'

"পনের দিন পরে আমার মেজো ভাইএর দীক্ষা হল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের পরে আবার একদিন বিজ্ঞানানন্দজীকে দর্শন করতে গেলাম। তিনি বললেন, 'পুরুষোত্তমে চলে যাও, ঘুরে এস।' তাঁর কথামতো পুরী গিয়ে আমি তিনমাস ছিলাম। ফিরে এসে শিবরাত্রির পরের দিন প্রসাদ পাবার পর আবার তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই আমাকে বললেন, 'কার হুকুমে এখানে এসেছ?' আমি বললাম, 'সেবক বলেছেন।' তিনি বললেন, 'কে সেবক? আমি কি তোমাকে আদেশ করেছি?' আমি ভয়ে কেঁদে ফেলে বললাম, 'ক্ষমা করুন।' তিনি বললেন, 'তুমি চিরশান্তি লাভ কর।' ঘরে এক ভদ্রলোক তাঁর চরণসেবা করছিলেন। আমি প্রণাম করে বাইরে এলাম; বাইরে থেকে শুনতে পেলাম, বিজ্ঞানানন্দজী সেই ভদ্রলোকটিকে বলছেন, 'ও চিরজীবন দুঃখী।'

"১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল বিজ্ঞানানন্দজী মহাপ্রয়াণ করেন। তিনমাস পরে শ্রাবণ মাসে তিনি আমায় স্বপ্নে আবার দীক্ষা দিয়ে বললেন, 'এটি সন্ন্যাস-মন্ত্র। এই আদি, এই সমাপ্তি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গেরুয়া কাপড় পরবো না?' তিনি বললেন, 'না'। বললেন, 'আমাকে দক্ষিণা দাও!' আমি চারটে টাকা দক্ষিণা দিলাম।

"মন তখন আমার খুবই খারাপ হত এই ভেবে যে, লোকে কত গুরুসেবা করে, আমি তাঁর সেবা কিছুই করতে পারলাম না। তিনি অন্তর্যামী, করুণাময়। একদিন স্বপ্নে দর্শন দিলেন—ঠাকুর-ঘরের ছোট চেয়ারে বসে বললেন, 'প্রতিদিন এই ৺শিবের ভেতর হতে তোমার নিত্যসেবা নিচ্ছি; তুমি দুঃখ কোরো না।' তারপর দেখলাম বিজ্ঞানানন্দজী শিবের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। এই দর্শনের পর আমি বেলুড় মঠে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে যাই। তাঁর কাছে আমার স্বপ্নের সব কথা নিবেদন করি।

তিনি সব শুনে বললেন, 'এ মন্ত্র কোথায় পেলি?' বললেন, 'তুমি কাশীতে কৈবল্যানন্দজীর কাছে গিয়ে কৌলমতে পূর্ণাভিষেক নাও। এই মন্ত্রের কথা কিছু বলবে না।...এই কথা কটি বলে আহুতি দেবে।'

"...তিনদিন ধরে পূজো হয়েছিল। উনি আমায় খুব কৃপা করেছেন, শান্তি দিয়েছেন।

"দীক্ষার পর দুবছর দীক্ষার কথা কাউকে জানাইনি, ঠাকুরের ফটো লুকিয়ে রাখতাম; রাত্রে বের করে পূজো করতাম। পরে জনৈকা আত্মীয়া আমার মঠে দীক্ষার কথা প্রকাশ করে দেন। তখন শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা বেলুড় মঠ ও আমার গুরুর নিন্দা করতে লাগলেন। আমি তাঁদের বললাম, 'গুরুনিন্দা সহ্য করব না।' তাতে তাঁরা আমাকে আরো বেশী যন্ত্রণা দিতে লাগলেন। এরপর শীঘ্রই শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ করে চলে এসে অন্যত্র রয়েছি। আর কখনো সেখানে যাইনি।"

'তৃতীয় স্বপ্ন'

ডক্টর রমা চৌধুরী

১৫ই অগস্ট ১৯৪৭ আমাদের চিরন্তনী সাধনার ধন স্বাধীনতা লাভের স্বর্ণ দিবস। এই দিনটি স্থিরীকৃত করেন ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয়, লর্ড মাউন্টব্যাটন, ভাবনাচিন্তা বুদ্ধিবিবেচনা ক'রে নয়, কিন্তু হঠাৎ সেই মুহূর্তেই আবেগপ্রবণ ভাবে। ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হবে, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি যখন ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক বিধানসভার নিকট উপস্থাপিত করা হয়, তারপর ৪ঠা জুন ১৯৪৭-এ লর্ড মাউন্টব্যাটন একটি অনুপম সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন নিউ দিল্লীতে। সেখানে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যতশীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা-হস্তান্তরের অত্যাবশ্যকতা বিধায়, আপনি কি একটি তারিখ স্থিরীকৃত করেছেন তার জন্য?' লর্ড মাউন্টব্যাটন উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' তখন সেই ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ সেই তারিখ?' বিপদে পড়লেন ভাইসরয় মহোদয়, কারণ তখন পর্যন্ত তিনি কোন তারিখের কথা চিন্তামাত্রও করেননি। কিন্তু উপায় নেই—'হ্যাঁ' ব'লে ফেলেছেন যখন, তখন ত সেই বিশাল সভাকে উত্তর দিতে হবেই। তখন তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল যে, মিত্রশক্তির নিকট জাপানের পরাজয় স্বীকারের দ্বিতীয় বার্ষিক দিনটিই হবে গণতান্ত্রিক ভারতের শুভ জন্মের যোগ্যতম দিন। সেজন্য তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, '১৫ই অগস্ট ১৯৪৭।' ('The Mountbatten Story', Reader's Digest, July 1981, p. 173)

কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই দিনটিই হ'ল শ্রীঅরবিন্দেরও পুণ্য আবির্ভাব-দিবস। স্বাধীনতা-দিবসের পূর্বদিন তিনি ত্রিচিনপল্লী-বেতারকেন্দ্র থেকে একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন (১৪ই অগস্ট ১৯৪৭)। তখন তিনি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা-সহকারে বলেছিলেন :

'August 15th is my own birthday, and it is naturally gratifying to me that it should have assumed this vast significance. I take this coincidence not as a

fortuitous accident, but as the sanction and seal of the Divine Force that guides my steps on the work with which I began life, the beginning of its full fruition.'

(Radio Broadcast on 14.8.47 from Trichinopoly centre)

'১৫ই অগস্ট আমার নিজেরও জন্মদিন। সুতরাং এই দিনটির এরূপ বিরাট তাৎপর্য লাভ করাটা স্বভাবতঃই আমার নিকট আনন্দের কারণ। কিন্তু আমি এই যোগাযোগকে একটি আকস্মিক ঘটনা ব'লে গ্রহণ না ক'রে যে কাজ নিয়ে আমি জীবন আরম্ভ করেছিলাম, সেই কাজ প্রতিপদে চালনা করছেন যে ভগবৎ-শক্তি, তাঁরই অনুমোদন ও স্বীকৃতিচিহ্নরূপে, এবং সেই কাজের পূর্ণ সিদ্ধির সূত্রপাতরূপেই গ্রহণ করলাম।'

কিন্তু কি ছিল শ্রীঅরবিন্দের এই জীবন-কর্ম, জীবন-ব্রত, জীবন-সাধনা, জীবন-তপস্যা, জীবন-মন্ত্র? তা হ'ল তাঁর 'স্বপ্ন-পঞ্চকে'র বাস্তব রূপায়ণ।

শ্রীঅরবিন্দের এই পাঁচটি স্বপ্ন ছিল নিম্নরূপ :

(1) Free and united India.

(2) Resurgence and liberation of the peoples of Asia.

(3) World-union.

(4) Cultural gift of India to the world.

(5) Evolution of man to a higher and larger consciousness.

(A. I. R. Message)

অর্থাৎ—

(১) স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ।

(২) এশীয় জাতিগণের নবজাগরণ ও মুক্তি।

(৩) বিশ্ব-ঐক্য।

(৪) জগতে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক দান।

(৫) উচ্চতর ও বৃহত্তর চেতনার স্তরে মানবের উন্নয়ন। (বেতার বাণী)

এদের মধ্যে, শ্রীঅরবিন্দের 'তৃতীয় স্বপ্ন' অথবা 'বিশ্ব-ঐক্য' বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা, যা সমাধানের জন্য আজ সমগ্র বিশ্বই বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত ও প্রচেষ্টাশীল। সেজন্য আজ এই আনন্দরসঘন শারদীয় মহোৎসবকালে আমরা এ বিষয়ে সামান্য চিন্তা করলে আমাদের কল্যাণই সাধিত হবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : 'The third dream was a World-union forming the outer basis of a fairer, brighter, nobler life for all mankind.'

'তৃতীয় স্বপ্ন ছিল—বিশ্ব-ঐক্য, যা হ'ল সমগ্র মানবজাতির সুন্দরতর উজ্জ্বলতর মহত্তর জীবনের বাহ্য ভিত্তিস্বরূপ।'

এরূপ 'বিশ্ব-ঐক্য' লাভ হবে কিরূপে? শ্রীঅরবিন্দের মতে তার একটিমাত্র উপায়ই আছে—'Religion of Humanity' অর্থাৎ, 'বিশ্ব-মানবতাবাদ'। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'The Ideal of Human Unity'তে তিনি এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা-প্রপঞ্চনা করেছেন। সেখানে 'Religion of Humanity'র ব্যাখ্যা তিনি এই ভাবে দিয়েছেন : 'The fundamental idea is that man is the Godhead to be worshipped and served by man and that the respect, service, the progress of human being and human life are the chief duty and chief aim of the human spirit.' (Chapter XXXIV pp. 542-43)

'মূলীভূত তত্ত্বটি হ'ল এই যে, মানবই হলেন মানবের দেবতা, যাঁকে মানবের পূজা

ও সেবা করতেই হবে ; এবং মানবাত্মার প্রধান কর্তব্য ও প্রধান জীবন-লক্ষ্য হ'ল মানবকে শ্রদ্ধা, সেবা ও উন্নত করা

পুনরায় তিনি আবেগভরে বলছেন : 'Man must be sacred to man regardless of all distinctions, race, creed, colour, nationality, states, political or social advancement.' (Op. cit.)

'সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির কথা বাদ দিয়ে, মানবকে গ্রহণ করতে হবে মানবকে পূত ব'লে।'

এ অবশ্য নূতন কোনো তত্ত্ব নয়—এ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের শাশ্বত আশার বাণী। স্মরণ করুন সগৌরবে সেই রোমাঞ্চকর পঞ্চ ঐক্য-মন্ত্র :

(১) 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১৪।১)

(২) 'ইদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।'
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১)

(৩) 'তত্ত্বমসি।' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।৮।৭ ইত্যাদি)

(৪) 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১৯)

(৫) 'অহং ব্রহ্মাস্মি।' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।১০)

অর্থাৎ—

(১) 'সব কিছুই ব্রহ্ম।'

(২) 'ব্রহ্মই সব কিছু।'

(৩) 'তিনিই তুমি।'

(৪) 'এই আত্মাই ব্রহ্ম।'

(৫) 'আমিই ব্রহ্ম।'

অতএব, ভারতীয় মতানুসারে মানবের পূজাই ঈশ্বরের পূজা, মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা, মানবে প্রীতিই ঈশ্বরে প্রীতি।

স্মরণ করুন তুল্য গৌরবভরে, ভারতাত্মা যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের অম্বুদবাণী—সুবিখ্যাত বিশ্বধর্মসম্মেলনে : "'Children of immortal bliss'—what a sweet, what a hopeful name! Allow me to call you, brethren, by that sweet name—heirs of immortal bliss—yea, the Hindu refuses to call you sinners. Ye are the Children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth,—sinners! It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep; you are souls immortal, spirits free, blest and eternal; ye are not matter, ye are not bodies; matter is your servant, not you the servant of matter." (Paper on Hinduism read at the Parliament of Religions on 19.9.1893)

"'অমৃত আনন্দের সন্তান'—কি মধুর, কি আশাব্যঞ্জক এই নাম! হে ভ্রাতৃগণ! আমাকে অনুমতি দিন সেই মধুর নামে আপনাদের ডাকতে—অমৃত আনন্দের উত্তরাধিকারিগণ—হ্যাঁ, হিন্দুরা আপনাদের পাপী বলতে অস্বীকার করেন। আপনারা ঈশ্বরের সন্তান; অমৃত আনন্দের অংশীদার, পবিত্র এবং পূর্ণ সত্তা। হে মর্ত্যভূমির দেবতাগণ!—পাপী? মানুষকে এরূপ বলাই পাপ; এ হ'ল মানবচরিত্রে শাশ্বত কলঙ্ক লেপন। হে সিংহগণ! উঠে আসুন, এবং আপনারা যে মেষ, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর ক'রে দিন; আপনারা অমৃত আত্মা, স্বাধীন আত্মা, আশীর্বাদধন্য ও শাশ্বত; আপনারা জড়বস্তু নন, আপনারা দেহ নন; জড়বস্তুই আপনাদের দাস, আপনারা জড়বস্তুর দাস নন।"

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের এই মধুময়ী চিরন্তনী বাণীকেই আধুনিক যুগের উপযোগী ক'রে প্রচারিত-প্রসারিত করেছিলেন সগৌরবে, 'বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্ত' ক'রে তুলেছিলেন সানন্দে সশ্রদ্ধায়—এই ত তাঁর অপূর্ব দান!

এইভাবে যদি আমরা আমাদের নিজেদের ও অন্যান্য সকলের মধ্যেই সেই একই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।১) এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে দর্শন করি, তাহলে কে কাকে হিংসা-দ্বেষ করবেন, কে কার সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ করবেন? কারণ, সকলেই ত এক ও অভিন্ন—ব্রহ্মরূপে। বিশ্ব-ঐক্য, বিশ্ব-শান্তি, বিশ্ব-আনন্দের ভিত্তি ত এইখানেই, কেবল এইখানেই।

চির আশাবাদী স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কি মহাশ্বাসই না দিয়ে গিয়েছেন পরম করুণাভরে:

'And that universal religion about which philosophers, and others, have dreamed in every country, already exists. It is here. As the universal brotherhood of man is already existing, so also is universal religion.' [C. W. II (1935), p. 365—Lecture at Universalist Church, Pasadena, California on 28. 1. 1900]

'এবং যে সার্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধে দার্শনিকবৃন্দ এবং অন্যান্যরা প্রত্যেক দেশেই স্বপ্ন দেখেছেন, তা কিন্তু পূর্ব থেকেই বিরাজমান। তা এখানেই আছে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব যেমন পূর্ব থেকেই বিরাজমান, ঠিক তেমনি বিশ্বধর্মও।'

শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন:

'There is nothing that need alter the view we have taken of the necessity and inevitability of some kind of World-union.' ('The Ideal of Human Unity', p. 571, A postscript chapter)

'এমন কিছুই নেই, যার জন্য যে কোনো ধরনের বিশ্ব-ঐক্যের অত্যাবশ্যকতা এবং অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে আমরা যে মতবাদ গ্রহণ করেছি, তার পরিবর্তন প্রয়োজন।'

অর্থাৎ, বিশ্ব-ঐক্য অত্যাবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী।

'The unification of the human world is under way....For, unification is a necessity of Nature, an inevitable movement.' (Radio Speech from Trichinopoly Station on 14. 8. 1947)

'সমগ্র বিশ্বের একীকরণ আরম্ভই হয়ে গিয়েছে।...কারণ একীকরণ একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।'

পরিশেষে বিশ্ব-ঐক্য ও বিশ্ব-শান্তি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদামণির অমূল্য বাণী যেন আমরা সর্বদা স্মরণে রাখি।

মা বলছেন ভক্ত ছেলেকে, 'হ্যাঁ গা, এত বড় যুদ্ধটা হচ্ছিল, তা হঠাৎ থেমে গেল কি ক'রে?' ভক্তটি বললেন, 'মা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন ১৪ দফা শর্ত দিয়ে সন্ধি ক'রে মিটিয়ে দিলেন।' মা বলছেন, 'কি রকম আর কি কি শর্ত হ'ল?' ভক্তটি বললেন, 'পরস্পর পররাজ্য অনাক্রমণ, প্রীতির সহিত বসবাস, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি কতগুলি শর্তে।'

মা বলছেন, 'এ তো খুব ভালো কথা, কিন্তু ওরা যা বলে ওসব মুখস্থ। যদি অন্তঃস্থ হ'ত তাহলে কথা ছিল না।'

('মাতৃসান্নিধ্যে'—স্বামী ঈশানানন্দ, পৃঃ ৮১)

মহাসন্ত ও বাঁশি*

দিলীপকুমার রায়

১

এত আনন্দ ছিল
লুকিয়ে কোন গহনে?
বাজল কার সে-বাঁশি
অন্তর-বৃন্দাবনে?

২

ভাঙে ঘুম, কে সে গুণী—
রাগ যার চৌদিকে ছায়?
আরো, যেই কান পাতি—সেই
রেশ তার মিলিয়ে যায়।

৩

যদি না সুর-সুরভি
ফোটে আর সে-সুরেলার,
বেসুরা এ-হাটে হায়
করুণা চাইব সে কার?

৪

আদরে দিনে দিনে
বুনি জাল কার মমতার?
ছিন্ন ক'রে বুনি
সে-মায়া জালই আবার।

৫

শুনে সে-কান্না আমার
কে আসে প্রবোধ দিতে?
ছুঁয়ে যায় থেকে থেকে
আমাকে ছন্দে গীতে।

৬

কেন সে-নিঠুর বাজায়
উদাস অকূল-মুরলী?
রচি ঘর যেমনি আশায়
করে ঘরছাড়া ছলী?

৭

কখনো সাধুর রূপে
দেখা দেয় ছদ্মবেশে,
বিষাদের বেসুর নিশা
পোহাতে গানের রেশে।

৮

সাধু গায়: "দুর্ভাবনা
রাখ্—কী হবে ভেবে?
সরলের মন্ত্রবাণীই
অমলের খবর দেবে।

৯

"কী বাণী—শুনবি? আমি
জেনেছি আমার প্রাণে:
সে-নিঠুর দূরে ঠেলেই
আরো তার কাছে টানে।

১০

"আমি তাই সাধু সেজে
দেখা দেই ভালোবেসে
বাসনার কালো নিশা
পোহাতে আলো হেসে।

১১

"প্রথমে, শোন্ পেতে কান,
মন মুখ এক ক'রে বল্:
তুমি এ-কাঁটাবনে
ফোটাও আনন্দকমল।"

১২

আমি গাই: "এইটুকু আজ
জেনেছি তোমায় মেনে:
দিয়ে বর দুঃখশোকের
তুমি লও পায়ে টেনে।

---

* অপ্রকাশিত কবিতা।

১৩

"বুঝি তাই চাই শুনতে
সন্তের চরণধ্বনি:
বিনা তার প্রসাদ কে পায়
গোকুলের পরশমণি?

১৪

"শুনি তার মুখে নাথের
কত প্রেমের কাহিনী!
বরে যার পাষাণেও
উচ্ছসায় নির্ঝরিণী।

১৫

"যে-ব্যথায় সাধক করে
অনুযোগ নয়নজলে,
সাধু তার প্রেমসাধনায়
রয় অটল ধরাতলে।

১৬

"নয় কি জীবন মরু?
কে ফোটায় ফুল এখানে?
সব রস যায় শুকিয়ে,
বেদনার বহ্নিবাণে।

১৭

"আমরা চর্মচোখে
যা দেখি ভুল সে-দেখা
বীজেরি মর্মে সাধু
পড়ে তাঁর হাতের লেখা।

১৮

"মানে না হার তো সাধু
দুরাশাই তার পাথেয়:
মরণের টঙ্কারেও
রয় অপরাজেয়।

১৯

"জগতের দশা দেখে
আমরা ভেবে মরি:
সে-অটল পূজারী জপ
করে: 'জয় জয় শ্রীহরি।'

২০

"বার বার ঘা খেয়েও
ডাকে সে নারায়ণে।
পায় যে বল মহাজন
অজিতের আরাধনে।"

২১

বাঁশি গায়: "বুঝবি কবে:
দিশারি—সন্ত গুরু
গায় সে ব'লেই গীতার
গানে হয় যাত্রা সুরু।

২২

"রাজাকে দেয় না সে মান,
কোল দেয় অভাজনে।
প্রেমবর পায় যে সাধু
প্রেমলের আবাহনে।

২৩

"পাথের যে-সারথি
সাধুও তাকেই ধেয়ায়।
যে লুকায় জাগরণে
করে পার স্বপ্ন-খেয়ায়।

২৪

"বুদ্ধি বিচারে নয়,
তাকে ডাক চোখের জলে
রাখো নাথ চরণ তোমার
অধীনের হৃৎকমলে।"

দুয়ারে কর্ণিকার

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ভেবেছিলাম দীর্ঘ ছুটি অনেক দূরে পাড়ি দিয়ে কাটিয়ে দেব।

কাছের দার্জিলিং থেকে দূরের মায়াবতী, কিষেণপুর থেকে বোম্বের সমুদ্রতীর, দক্ষিণের উটি থেকে ভারতের শেষপ্রান্তে কন্যাকুমারিকা—মনের মানচিত্রে কত পরিকল্পনাই উঁকি দিয়ে গেছে। শেষ অবধি জানা-অজানা, প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত কর্মভার এসে ঘর থেকে বারান্দা অবধি সামান্য সীমার বৃত্তে ছুটির শেষ দিনটি ঘনিয়ে আনলো।

না, গরমের ছুটিতে এবারে কোথাও যেতে পারি নি। কর্তব্য, দায়িত্ব, সত্যিকার কাজ এবং আসন্ন কাজের উৎকণ্ঠা—এরা সবাই মিলে আলো-আঁধারের পালাবদল চলেছে মনের মধ্যে। সিংহকে বাঁধবার জন্য দরকার গুরুভার শৃঙ্খল। মানুষের ক্ষেত্রে শুধু একটু মায়ার আভাস! স্পর্শমাত্রে ভঙ্গুর মাকড়সার জালে রোজ কতো কীটপতঙ্গ নিজেদের জড়িয়ে মারে!

আসলে ছুটি নিতে জানলেই ছুটি। নইলে সে ছুটি কাজের দিনের চেয়ে ঢের বেশী ছোটাছুটি। কর্তব্যের প্রভু না হয়ে কখন অগোচরে আমরা বেশীর ভাগ মানুষই কর্তব্যের দাস!

তবু দেখুন, কাজের চাপে নীরন্ধ্র এই জগৎটারও ফাঁকে-ফোকরে দূর দিগন্তের আলো এসে পড়ে, আর সেই মুহূর্তে যা এত কাছের এত দিনের চেনা তার রূপান্তর ঘটে যায়! মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই আত্মবিস্মৃতির ক্ষণটিই ছুটি। সত্যিকার ছুটি।

ছুটিতে যখনই কারু বাইরে বেড়াতে যাবার কথা শুনেছি, সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি, আমার দিনগুলো কাজের চাপে মাটি হলো, তখনই ঘরের বারান্দার প্রান্ত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা কর্ণিকার (রোজকার বাংলায় যাকে 'সোঁদাল' বলি) তরুটির কথা মনে পড়েছে। অকালে পুষ্পিত ওই কর্ণিকার এবারের মতো সব ক্ষতি তার স্বর্ণাঞ্জলিতে পূর্ণ করে দিয়েছে! এই ছুটিতে আমি ঘর আর বারান্দার সীমায় বসে না কাটালে সে সম্পদের সন্ধান পেতাম না। হয়তো এমন সম্পদ আর কোনোদিন পাবোও না।

আমাদের সব পাওয়ার উপরেই সময়ের ধুলো জমতে থাকে। যা এই মুহূর্তে তরুণ, সজীব, লাবণ্য-ভরপুর—সময়ের ধুলো তাকে পরমুহূর্তে ম্লান, বিবর্ণ, ক্লান্ত, একঘেয়ে করে তোলে। সকালের গলার মালা বিকেলের তাপে অনাদরে মাটিতে লুটায়। সেই ক্লান্তির অবক্ষয় থেকে বাঁচার জন্যই শিল্প, সাহিত্য, সংগীত। যা প্রতিমুহূর্তে ক্ষয়শীল, মরণশীল, তাকে অমৃত ও অনাহতের সুরে বেঁধে দেওয়া—এ আমাদের চিরকালের প্রয়াস। কোথাও না গেলেও যে চিররহস্য ঘরের দুয়ারে আমাকে সাত সমুদ্র তের নদী জয়ের অবাধ মুক্তি দিয়েছে, সেই বিনাভ্রমণের ভ্রমণকথা আজ আপনাদের বলি।

*

বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজার শেষে মা দুর্গাকে প্রণাম করতে গিয়ে মনে পড়লো এবার মায়ের 'গজে গমন'। 'গজে চ জলদা দেবী'—গজে যাওয়ার ফল সুবৃষ্টি। সেকথা যে কতদূর সত্য, এ বছরের চৈত্র-শেষ কি জ্যৈষ্ঠের সূচনা অবধি বর্ষণধারায় স্নিগ্ধ আমরা সবাই অনুভব করে ধন্য। বর্ষার এই অগ্রচারণ প্রকৃতির রাজ্যে নানা অঘটন টেনে আনলো। বাস-স্টপের কদমগাছটি কখন

কদম-কোরককে ছেয়ে গেছে,—আষাঢ়ের সম্ভাবনা তখনো অনেক দূরে। সকাল-বিকেল যখন তখন মেঘের নীলে দিগন্ত গাঢ় হয়ে আসে। ঘরের সামনে 'কর্ণিকার' বা সোঁদাল অজস্র স্বর্ণমঞ্জরী দুলিয়ে ভরা বর্ষার আগেই তার সম্পদ উজাড় করে দিতে চায়। বৈশাখের দুপুরে কখন মেঘ সরে গিয়ে শরতের আভাস ছড়িয়ে পড়ে।

অঘটন এমনি করে ফিরে ফিরেই ঘটতে থাকে। জ্যৈষ্ঠ যায় যায়—তবু গ্রীষ্ম কোথায় লুকিয়ে আছে। নদ নদী খাল বিল ডোবা পুকুর সর্বত্র জল থৈ থৈ করছে! এবারে সূর্য-দেবতার চেয়ে বরুণ-দেবতার প্রতাপ অনেক বেশী! খেয়ালী প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ সজল পরিহাসে মনে মনে আমরা সবাই পুলকিত। চোখের সামনে যা ঘটছে মনের মধ্যে তা বিশ্বাস করতে বাধে। বৃষ্টির ধারাপাতে দীর্ঘ গ্রীষ্ম প্রায় ঢাকা থেকেই কেটে গেল। গজগামিনী দেবী সত্যিই জলে ভরে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে গেছেন। বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হবে, না দিগন্তপ্লাবিনী বন্যা নামবে—সেকথা ফলেন পরিচীয়তে।

যাঁরা বলেন, বসন্তেই ফুলের শোভা, তাঁরা বাংলার বসন্তের কথা বলেন না। এখানকার বসন্তের মতো ক্ষণস্থায়ী ঋতু আর কিছু নেই। বসন্তের আগে শীতেই এখন ঋতুপুষ্পের সমারোহ। সে-সব বেশীর ভাগ বিদেশী ফুল। কিন্তু গ্রীষ্মের প্রখর তাপের মাঝখানে কিছু আশ্চর্য বর্ণ ও গন্ধের সমারোহ আসে ফুলের জগতে। সে-সব ফুলের জন্য আকাশের দিকে মুখ করে চাইতে হয়। যেমন, চাঁপা, কৃষ্ণচূড়া, সোঁদাল বা কর্ণিকার, ফুরুস, গুলঞ্চ, গুল্মোর—রৌদ্রের তপস্যা ছাড়া এদের এত সৌন্দর্য, এত গন্ধঘন আকাশবাতাস সম্ভব হয় না। বর্ষার শুরু থেকে এ-সব ফুলের অনেকগুলিরই ঝরে পড়ার সময়।

এ বছর বাসন্তী দেবী তাঁর চরণপাতে যে মেঘের সিঁড়ি তৈরী করে গিয়েছিলেন, তার ফলে বৈশাখী রৌদ্র সামান্য দেখা দিয়েই মেঘের আড়ালে মুখ লুকালো। দুপুরের রোদের নিষ্ঠুর দাহ মেঘের মায়ায় কখনো চেরাপুঞ্জী, কখনো মায়াবতী, কখনো শ্রাবণরাতের স্মৃতি হয়ে আমাদের ঘিরে রইলো। যাঁরা পাহাড়ে পালিয়ে গ্রীষ্মের কলকাতাকে ফাঁকি দিলেন, তাঁরা পরে জানলেন এমন স্নিগ্ধ-শীতল কলকাতা বহু কালের ইতিহাসে দেখা যায় নি। আমরা যারা ছুটিতেও কর্মবন্দী, তাদের জন্য প্রকৃতিজননী অনেক ভেবেচিন্তেই হয়তো এ বন্দোবস্ত করেছিলেন!

এদিকে ঘরের বারান্দায় বৃষ্টির চিকের আড়ালে পাদচারণা করতে করতে দিনে দিনে আমি 'কর্ণিকার'-তরুর পুষ্পিত আত্মপ্রকাশ দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে পরিবর্তিত হতে দেখছি। চৈত্র-শেষে কর্ণিকারের থোলো থোলো মুকুলগুলি তাদের সোনারঙের আভাস নিয়ে সবুজ শোভার আড়ালে উঁকি দিতে শুরু করলো। তারপর কখন সবুজের আড়াল ছাপিয়ে শীর্ষ থেকে তরুমূল অবাধ অসংখ্য পুষ্পাভরণের অমেয় সৌন্দর্যে বিভূষিত কর্ণিকার যেন কার প্রতীক্ষায় উদয়াস্ত অপেক্ষা করে থাকতো।

মনে পড়ে শীতের ভোরে এক শিশির-ভেজা পটভূমিতে রিক্তপত্র কর্ণিকারের একটি ঝরে-পড়া পাতা কেমন করে মাকড়সার জালে আটকে গিয়ে যেন শূন্যে স্থিরচিত্রে পরিণত হয়েছিল। আমাদের অনেক পুরানো স্মৃতি এমনি জীবনের হারানো মুহূর্তের স্থিরচিত্র। সেদিন কর্ণিকারের সেই বিবর্ণ পাতা-ঝরা রূপের সঙ্গে আজকের পুষ্পে-পল্লবে হিল্লোলিত সৌন্দর্যমগ্নতার পার্থক্য কতোখানি! অনেক আগে নেমে-আসা বর্ষার ধারাস্নানে এবার আর তার অঙ্গময় ফুলের ডালি ধরে রাখার জায়গা নেই। একটু হাওয়ায়, একটু বৃষ্টিতে টুপ্ টাপ্ সোনালী ফুলেরা মাটিতে ঝরে পড়ে, ফুলের

রেণুরা অগোচরে আলপনা আঁকতে থাকে, ভোমরার দল রূপে-গন্ধে বিভোর হয়ে সেই তরুতল ছুঁয়ে উড়ে বেড়ায়!

তারপর একদিন প্রচণ্ড ঝড় এল। কোথাও কাজে গিয়েছিলাম। অনেক রাতে যখন ঘরে ফিরলাম তখন সামনের পথ, ঘরের বারান্দা চারদিক জুড়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ছিন্ন পত্রপুষ্প রাতের অন্ধকারে সোনার লাবণ্য ছড়িয়ে রেখেছে। আর কর্ণিকারের বুকজোড়া অন্ধকারের মাঝে মাঝে একটি দুটি জোনাকির স্ফুলিঙ্গ ফুলের মতো ফুটে উঠছে, ঝরে পড়ছে।

রাতে আর আলো আসে নি। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দুয়ার খুলে দেখি কখন রাতের অন্ধকারে বাতাসে বাতাসে একগুচ্ছ কর্ণিকার দেহলিপ্রান্তে বিন্যস্ত—ঠিক মনে হতে পারে, কেউ সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

দেবতার দান ভেবে মাথায় তুলে নিলাম।

তারপর সারা আষাঢ় সকাল দুপুর রাত কখন যে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হতো কর্ণিকারের—কোনো ঠিক ছিল না।

শ্রাবণ সমাগত। পুষ্পাঞ্জলির পালাশেষে কর্ণিকার এখন পল্লবের ঘনান্ধকারে আত্মসমাহিত।

ছুটির পালা শেষ। ঘরের বারান্দায় ভ্রমণ-পালাও ফুরুলো।

দ-দ-দ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

মেঘ-ডাকা শুনেছ কি?—গুরু গুরু গুরু
সুগম্ভীর গভীর আহ্বান! চিরকাল ডাকে!
কভু মৃদু বিজলীতে হেসে, কড়কড় বজ্ররবে অট্ট অট্ট হেসে কভু
কী যে বলে—তির্যক্ আলোর অক্ষরে কী যে যায় লিখে!
স্বর্গ মর্তে সুরাসুর দেবদৈত্য নরনারী তোমাকে আমাকে—
মাথার উপরে থেকে ডাকে পথের পথিকে!
তারা চমকিয়া খোঁজে বৃক্ষতল—অভয় আশ্রয়!
গৃহকোণে মার বুকে শিশু লুকায় সভয়!

বজ্রমেঘ ডাকে চিরকাল।
অবোধ্য সে-বাণী ফেরে লোকে লোকে।
কারা তারা শুনেছিল সে মহা আহ্বান?
মর্ম তার বুঝেছিল কারা?
শুনেছিল—'দমন করহ' চিত্ত—কামনায় মোহাতুর মন'
'দান কর' দীনজনে, দাও অন্নজল
'দয়া কর' দুঃখীজনে, মুছাও নয়ন—
বজ্রগর্ভ বিজলীতে লেখা বাণী চিরন্তন।

শ্রীশ্রীমার শাশ্বত অভয়-আশ্বাস

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন আজ যে গগনস্পর্শী প্রাসাদ-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং যা এখনও ক্রম-বর্ধমান, তার আদি-ইতিহাস আলোচনা করলে প্রথমেই মনে পড়বে স্বামী বিবেকানন্দের কথা, যিনি ভারতের যুগযুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞানরাশির দ্বার উন্মোচন করে সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীদের আকৃষ্ট করেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই শ্রীশ্রীমাকে, যিনি এর প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু যে ঐকান্তিক কামনা করেছিলেন তা নয়, এর রক্ষণাবেক্ষণে সজাগ দৃষ্টি এবং প্রয়োজনে যথোপযোগী উপদেশ দিয়ে এর বর্ধনে অসীম সাহায্য করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি সকল শ্রেণীর মানুষকে এই প্রাসাদে আসার নির্ভয় আশ্বাস দিয়ে, এই প্রাসাদ যে তাদেরই, এই মনোভাব এনে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শকে রূপায়িত করা, এবং সেই রূপ যে এককালে কত বিরাট হবে, তাও তাঁদের অজানা ছিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে গেলেন এমন এক জীবনাদর্শ, যার প্রকৃত রূপ ধরা পড়ল কেবলমাত্র তাঁর কয়েকটি চিহ্নিত সন্তানের কাছে, আর তাঁর সহধর্মিণীর কাছে। বাকি যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এলেন, তাঁদের কেউ কেউ তাঁর দেবত্বের আভাস পেলেন, কেউ তাঁকে মহামানব, অথবা সাধারণ মানবরূপে দেখলেন, কেউ তাঁর মধ্যে নূতন ধরনের ব্যক্তিত্ব দেখে স্তম্ভিত হলেন, আবার কেউ বা তাঁর জীবনাদর্শকে 'নাগালের বাইরে' ধরে নিয়ে নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন হয়ে থাকলেন। শ্রীশ্রীমার বিশেষ দৃষ্টি যেন এই শেষোক্তদের উপর। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে, সাধারণ সংসারী লোকের ধর্মজীবন বা ঈশ্বরলাভের পথ সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং কিছুটা পরিমাণে বিভীষিকা আছে। সেরূপ মনোভাব থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। কারণ, নানা সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ; ভগবানলাভের পথ যে কণ্টকাকীর্ণ এবং কেবলমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষেই সুগম, এইরকম কথা শুনতেই তারা অভ্যস্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা এমন একজন 'সংসারী'কে পেল, যিনি সংসারের সব জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে থেকেও এ-সবের ঊর্ধ্বে; ঘরনিকানো, রান্নাবান্না, কাঁথাসেলাই থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ করেও চির-নির্লিপ্ত; সদাই যেন প্রশান্ত আননে উদাত্ত কণ্ঠে সংসারীদের আহ্বান জানাচ্ছেন, 'কোন ভয় নেই, আমি আছি তোমাদের পথ দেখাতে।' সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় ঝলসে-যাওয়া জনসাধারণ যে এ অমোঘ আহ্বানে সাড়া দেবে, এতে আর আশ্চর্য কি?

তাঁর অভয়বাণী তাঁর দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণের মাধ্যমে নানা সুরে ঝঙ্কার তুলেছে,—সাধারণ মানুষের নানা প্রশ্নের, নানা সমস্যার সমাধান এবং উৎকণ্ঠায় শুষ্ককণ্ঠ তৃষ্ণার্তদের শান্তিবারি দিচ্ছে, হতাশায় ম্রিয়মাণদের আশার আলো দেখাচ্ছে। তিনি সকলকেই বলছেন, 'তোমরা সর্বদা জেনো—তোমাদের পেছনে একজন রয়েছেন।'[১] 'আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি?'[২] এমন কি জনৈক সন্ন্যাসীকেও বলছেন, "মনে ভাববে, আর

কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন।"[৩] কাউকে বলছেন, 'আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক।'[৪] অথবা বলছেন, 'সর্বদা জানবে তোমাদের পেছনে একজন আছেন।'[৫] আরও বলছেন, 'যতদিন (এ) শরীর আছে, আনন্দ ক'রে চলে যাও।'[৫] একটি খোকাকে তাঁর প্রসাদ দেবার জন্য ব্রাহ্মণ-বিধবা হয়েও দুবার ভাত খেলেন; প্রশ্ন করাতে বললেন, 'ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি।'[৬] ব্যাধিগ্রস্তা ভক্তকে বলছেন, 'তোমাদের দেহ যে, মা, আমার দেহ। তোমাদের দেহ ভাল না থাকলে আমি যে, মা, কষ্ট পাই।'[৭] শুধু হাতে গুরু বা দেবতাকে দর্শন করতে যেতে নেই, তাই দরিদ্র ভক্ত রমণীকে বলছেন, 'একটা হরীতকী হাতে ক'রে নিয়ে এসো—এতেই হবে। আমি তোমাদের মুখ দিয়েই যে খাই, মা! তোমরা খেলেই আমার খাওয়া হয়।'[৮] ওকালতি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধ মনোভাবের কথা মনে করে শঙ্কিত উকিলকে মা আশ্বাস দিচ্ছেন, 'ভয় কি, বাবা? ব্যবসা বই তো নয়।'[৯] সন্ধিপূজায় ভক্তেরা মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলে মা বলছেন, 'আরও ফুল আন; রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, যোগেন, গোলাপ—এদের সব নাম ক'রে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকল ছেলের হয়ে ফুল দাও।'[১০]

কোন কোন ভক্তকে, হয়ত প্রয়োজনবোধে, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করে আশ্বাস দিয়েছেন। সাধন-ভজনে অক্ষম সন্তানকে বলছেন, 'মনে রাখবে, তোমাদের পেছনে ঠাকুর আছেন—আমি আছি।'[১১] জনৈক সন্ন্যাসীকে বলছেন, 'ঠাকুর যে ব'লে গেছেন, এখানকার সকলকে তিনি শেষ দিনে দেখা দেবেনই—দেখা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'[৩] স্বামী পরমেশ্বরানন্দ তাঁর মনের চঞ্চলতার জন্য 'ভয় হয়, ডুবে যাব না কি?' বলাতে মা বলছেন, 'ঠাকুরের সন্তান তোমরা ডুববে কি? কখনই না, ঠাকুর তোমাদের রক্ষা করবেন।'[১২] অসুস্থ অবস্থাতেও সন্তানদের চিন্তায় রাত্রে ঘুমাতে পারছেন না; জিজ্ঞাসা করলে বলছেন, "কি করি, বাবা, ছেলেরা ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, দীক্ষা নিয়ে যায়। কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত—নিয়মিত কেন, কেউ বা কিছুই করে না। তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি। আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, 'হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও। এ সংসারে বড় দুঃখকষ্ট। আর যেন তাদের না আসতে হয়।'"[১৩] অন্যত্র ভক্তকে বলছেন, "যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্য জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্য ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি, 'ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয় তাই কোরো।'"[১৪] ভক্ত প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলীকে বলছেন, 'যে যা-খুশি কর না কেন, যে যে-ভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা তো ছুঁড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।'[১৫]

তাঁর আশ্বাসদানের পাত্রের কোন বাছবিচার ছিল না। তিনি বলেছেন, 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।'[১৬] রাজেন্দ্রলাল দে জাতিতে কায়স্থ, তাঁকে বলছেন, 'বাবা, তুমি তাঁর সন্তান। অন্নভোগ দেবে, তাতে দোষ কি?'[১৭] পীতাম্বর নাথকে বলছেন, 'কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে।'[১৮] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধুকে কায়স্থভক্তকে প্রণাম করতে বলেছিলেন।[১৯]

দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুদের কাছে তাঁর দ্বার অবারিত। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর তফাত। তিনি নিজেই বলেছেন, 'তিনি নিয়েছেন সব বাছা বাছা ছেলে কটি—তা আবার এখানে মন্ত্র টিপে, ওখানে মন্ত্র টিপে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে সব পিঁপড়ের সার!'[২০] সত্যই তাই, কোন বাছবিচার নেই, সময়-অসময় নেই। তের বছরের ছেলে বরদাকে (পরবর্তী কালে স্বামী ঈশানানন্দ) দীক্ষা দিতে গোলাপ-মার আপত্তি, কারণ সে মন্ত্র ভুলে যেতে পারে। মা কিন্তু দীক্ষা দিলেন, কারণ হিসাবে বললেন, 'এখন থেকে যা পারে করুক না। পরে তো আমি আছিই।'[২১] মন্ত্র দিলে তার পাপ গ্রহণ করতে হয় এবং ফলে রোগ হয় জেনেও তিনি দীক্ষা দিয়ে চলেছেন, এবং কারণ-স্বরূপ বলছেন, 'দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়।'[২২] সেজন্য তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও দীক্ষা দিচ্ছেন শরৎ মহারাজের বারণ সত্ত্বেও, কারণ দীক্ষার্থী দূর হতে আশা করে এসেছে। তিনি বললেন, 'আমাদের ঐ জন্যেই আসা।'[২৩] অন্যত্র এইরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমরা তো ঐ জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব তবে কে করবে? পাপীতাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে?'[২৪] গর্হিত কাজ করে এসেছে, এরূপ যুবতীকে দীক্ষা দিয়েছেন, বলেছেন, 'আচ্ছা যা করেছ করেছ, আর ক'রো না।'[২৫] পুলিসের নজরবন্দী ছেলেকে তাড়াতাড়ির জন্য পথের মাঝে দুটো খড় পেতে আসন করে দীক্ষা দিয়েছেন।[২৬] সদ্য-দীক্ষিত শ্রীশচন্দ্র ঘটক ভব-বন্ধন-মোচনের উপায় জানতে চাইলে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, 'তোমার কিছুই করতে হবে না।'[২৭] অন্য দীক্ষিতকে বলেছেন, 'আমি করলেই তোমাদের হবে।'[২৮] দরিদ্র, ভীত বিধবাকে বলছেন, "'মাভৈঃ'... জন্মান্তরে যত কিছু করেছিলে, আমি সব নিয়ে নিলুম।"[২৯] একবার কোন ভক্ত মায়ের কাছে বিয়ের অনুমতি চাইলে মা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'ভয় কি? ঠাকুরের কত গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। তোমার কোন ভয় নেই—তুমি বিয়ে করবে।'[৩০]

শ্রীশ্রীমার সহজ সরল ব্যবহারই ভক্তদের কাছে টেনেছে এবং তাদের মনে 'আমাদেরই একজন' এইরকম আস্থা এনেছে। সেইজন্য নিবেদিতা লিখেছেন, 'স্ত্রীভক্তেরা মায়ের সঙ্গে বসিয়া যখন কথাবার্তা বলিতেন, তাঁহারা কিছুতেই মনে করিতে পারিতেন না যে, ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ বা তাঁহার উপর মায়ের দাবি তাঁহাদের চেয়ে বেশী ছিল। মনে হইত যেন তিনি তাঁহাদের মতোই ঠাকুরের আশ্রিত ও কৃপাপ্রার্থীদের একজন।'[৩১] মাঝি বউএর পুত্রশোকে ডাক ছেড়ে কাঁদছেন,[৩২] ভক্তের শিশুকন্যার ময়লা-করা কম্বল ধুচ্ছেন,[৩৩] ভক্তের চিবুক স্পর্শ করে চুমু খাচ্ছেন,[৩৪] ভক্তের উচ্ছিষ্ট থালা নিজে মাজছেন[৩৫]—দেবী-মানবীর এরূপ ব্যবহারে দীনদরিদ্ররাও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সাহস পেত।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছিলেন। ভেবে দেখলে এ কথা শ্রীশ্রীমার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। মা ঘরে থেকেই বনের বেদান্তকে প্রচার করে গেছেন, তাঁর জীবন দিয়ে—জীবে জীবে সেই এক অদ্বিতীয় শিবকে দেখে তাদের সেবা করে। যত দিন যাচ্ছে, ততই আমরা শুধু যে শ্রীশ্রীমার বাণী ও নির্দেশগুলির মধ্যে ব্যাপকতর অর্থ ও জীবন্মুক্তির নির্দেশ পাচ্ছি তা নয়, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, যতই আমরা তাঁর কাছাকাছি যাব, ততই আমরা শুনতে পাব তাঁর শাশ্বত অভয়-আশ্বাসবাণী 'আমি মা থাকতে ভয় কি?' মনে হয়, এই বাণীতেই আকৃষ্ট হয়ে যুগ যুগ ধরে অগণিত সাধারণ মানুষ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের আঙিনায় আসবে এবং ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবে।

আকর-নির্দেশিকা

[শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, একাদশ সংস্করণ, এবং ২য় ভাগ, অষ্টম সংস্করণ হতে গৃহীত]

১. ১।১৬৯. ২. ১।১৬৪. ৩. ১।১১৩. ৪. ১।১৮৫. ৫. ২।২৪২. ৬. ২।৩৫৫. ৭. ২।৩৯১. ৮. ২।৩৯৩. ৯. ২।৩৪০. ১০. ২।২১৬. ১১. ১।১৯৮. ১২. ২।৩২৫. ১৩. ২।২৩৯. ১৪. ১।১৭১. ১৫. ১।১৬৪. ১৬. ২।৩৭১. ১৭. ২।৩৬৬. ১৮. ২।৩৬৬. ১৯. ১।২০৬. ২০. ২।৩৬৭. ২১. ২।১৮৯. ২২. ২।৮১. ২৩. ২।৩২৪. ২৪. ২।৩৩৭. ২৫. ২।(২৪). ২৬. ২।২১০. ২৭. ১।১৫৪. ২৮. ২।৫৬ ২৯. ২।৩৭৭. ৩০. ২।(২৯). ৩১. ২। (২৭-২৮). ৩২. ২।২০২. ৩৩. ১।২০২. ৩৪. ২।৫০. ৩৫. ২।২৫৪.

দারা শুকো—রাজনীতিবিদ্ ও দার্শনিক

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসে যুবরাজ দারা শুকোর জীবন-কাহিনী প্রকৃতই একটি করুণ, বিষাদময়, ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের উপাখ্যান। ভারত-সম্রাট শাহ্‌জাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকো (১৬১৫-'৫৯ খ্রীঃ) ছিলেন একজন পণ্ডিত ও অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অনুরাগী ছাত্র এবং আনন্দময়, উদার ও বদান্য প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু সৈনিক, প্রশাসক ও কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি একেবারেই বিফল হন, এবং সেই কারণেই তিনি আজ ইতিহাসে এক বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তি। অথচ শাহ্‌জাহানের মৃত্যুর পর দারা শুকো ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করলে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস হয়ত অন্য রকম হতে পারত।

স্নেহময় পিতা শাহ্‌জাহান দারাকে সব সময় রাজসভায় আপন সান্নিধ্যে রেখে দক্ষ প্রশাসক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শাহ্‌জাহানের প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্বকালের (১৬২৮-'৫৮ খ্রীঃ) মধ্যে দারা শুকো সম্ভবত পনেরো মাসও পিতার ছত্রচ্ছায়ার বাইরে ছিলেন না। কিন্তু রাজসভায় দীর্ঘকাল থাকা সত্ত্বেও দারা কূটনীতিবিদ্যা অথবা দক্ষ প্রশাসকের গুণাবলী কোনোটিই ঠিক মতো আয়ত্ত করতে পারেন নি। এলাহাবাদ, লাহোর, গুজরাট, মুলতান, কাবুল প্রভৃতি কয়েকটি মুঘল সুবার সুবাদার বা প্রধান শাসক হিসাবে সম্রাট তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে অবস্থান না করে অধিকাংশ সময়ই দিল্লীর দরবারে অতিবাহিত করতেন, এবং সম্রাটের মনোনীত সহকারী বা অধীনস্থ রাজকর্মচারীরা তাঁর নামে ঐ সব সুবার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এর ফলে প্রশাসনিক কার্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। একমাত্র লাহোরেই তিনি কয়েকটি প্রাসাদ ও বাজার নির্মাণ করেছিলেন, অন্য কোথাও তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার কোনো পরিচয়ই আমরা পাই না।

কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে দারার ব্যর্থতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, যে রাজপুত সামন্ত নৃপতিদের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁরাও দারাকে জীবনের সব চেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তে পরিত্যাগ করেন। জয়পুরের মির্জা রাজা জয়সিংহের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে দারা তাঁর বন্ধুত্ব ও আনুগত্য অর্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে কান্দাহার জয় করতে গিয়ে ঐ দুর্গ অবরোধের সময় কঠোর বাক্য ও উদ্ধত আচরণের দ্বারা তিনি জয়সিংহকেই তাঁর শত্রুতে পরিণত করেন।

শাহ্‌জাহানের নির্দেশে মুঘল সেনাপতি সাদুল্লা খান্ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মেবার আক্রমণ করে ঐ রাজ্য জয় করতে উদ্যত হন। দারা তখন মেবারের রাণা রাজসিংহের সম্মান রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন। দারার অনুরোধ-উপরোধে শাহ্‌জাহান শেষ পর্যন্ত মেবারের স্বাধীনতা হরণ করেন নি, যদিও সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করার শাস্তি হিসাবে রাজসিংহকে তাঁর রাজ্যের কয়েকটি পরগণা মুঘলদের হস্তে সমর্পণ করতে হয়। কিন্তু এই ঘটনার অল্প দিন পরেই যখন সম্রাটের অসুস্থতার অজুহাতে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ বাধে (১৬৫৭-'৫৮), তখন রাজসিংহ দারার উপকার সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করেন ও মাড়োয়ার-রাজ যশোবন্ত সিংহকেও নিজের দলে টেনে নেন। বস্তুত উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সময় হাড়া-বংশীয় রাজা মুকুন্দসিংহই ছিলেন একমাত্র রাজপুত নৃপতি যিনি দারার পক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, এবং সামুগড়ের যুদ্ধে (১৬৫৮) এই বীরের দেহাবসান হয়। তর্কের খাতিরে এ কথা অবশ্য বলা চলে যে রাজপুত রাজারা সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করেছিলেন, এবং তার জন্য আমরা দারাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারি না। কিন্তু দারার জীবনীকার অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো যথার্থই বলেছেন যে আওরঙ্গজেব যত হিন্দুকে তাঁর শত্রুতে পরিণত করেছিলেন, দারা তার চেয়েও অধিকসংখ্যক ধর্মান্ধ মুসলমানের বিদ্বেষভাজন হন; কারণ তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা, আওরঙ্গজেবের মতো তাঁর মন ও মুখ আলাদা ছিল না। উদারচেতা দারা তাঁর অনেক শত্রুকে প্রকাশ্যে ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি, কারণ তাঁর ক্ষমা অনেক সময়েই অপাত্রে অর্পিত হত। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর পরাজয়ের এটি একটি প্রধান কারণ। মানুষ চেনবার ক্ষমতা যুবরাজ দারার কোনদিনই হয় নি।

সেনানায়ক হিসাবেও দারা চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেন। সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে তিনি পারসীকদের বিরুদ্ধে তিনবার মুঘল সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। পারস্য দেশে এই সময় দোর্দণ্ডপ্রতাপ সফাভিবংশীয় সম্রাটদের রাজত্ব চলছিল। সীমান্ত নিয়ে সুন্নী মুঘলদের সঙ্গে শিয়া সফাভিদের সংঘর্ষ লেগেই থাকত। বিশেষত আফগানিস্তানের কান্দাহার দুর্গের অধিকার নিয়ে তাদের বহুবার যুদ্ধ বাধে। দারা তিনবার সৈন্য পরিচালনা করলেও এর মধ্যে দুবার প্রকৃতপক্ষে কোন সামরিক সংঘর্ষ ঘটে নি, যুদ্ধের মহড়া হয়েছিল মাত্র। তৃতীয়বার, কান্দাহারের যুদ্ধে (১৬৫৩) মুঘল সৈন্যবাহিনীর এবং সেনাপতি দারার প্রকৃত শক্তি-পরীক্ষা হয়। কান্দাহার ছিল, সামরিক বিচারে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ। পারস্য-রাজ দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাস ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা এই দুর্গটি অধিকার করেন। শাহ্‌জাহান পর পর তিনবার দুর্গটি উদ্ধারের চেষ্টা করেও শেষ পযন্ত সফল হন নি। তাঁর তৃতীয় বা শেষ অভিযানের প্রধান সেনানায়ক হিসাবে যুবরাজ দারাকেই তিনি মনোনীত করেন। একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী, বহু গোলন্দাজ সৈন্য ও কামান এবং প্রায় এক কোটি টাকা এই অভিযানের সাফল্যের জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু আটমাস প্রাণপণ যুদ্ধ করেও দারা কান্দাহার দুর্গ পুনরধিকার করতে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার জন্য কান্দাহার দুর্গের সুন্দর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, মুঘলদের তুলনায় পারসীক গোলন্দাজ বাহিনীর অধিকতর দক্ষতা, এবং বিশাল মুঘল সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভাবই প্রধানত দায়ী। কিন্তু সেনাপতি হিসাবে দারার ব্যর্থতার কথাও অস্বীকার করা চলে না। তাঁর অতিরিক্ত

আত্মপ্রত্যয় এবং কিছু অযোগ্য চাটুকারের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপনের ফলে তাঁর সহযোগী উচ্চপদস্থ সেনাপতিরা ক্ষুব্ধ হন, এবং কান্দাহার দুর্গ অধিকার করার চেয়েও দারার চাটুকার হঠাৎ-নবাবদের পতন ঘটানোই তাঁদের কাছে অধিকতর কাম্য মনে হয়। এ থেকে মনে হয় যে সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠীগুলিকে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে সেনাপতি দারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর অনুগৃহীত সেনাপতিরাও কান্দাহার-যুদ্ধে অত্যন্ত স্বার্থপরতার পরিচয় দেন, এবং প্রায়ই তাঁরা নিজেদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদে জড়িত হয়ে পড়েন। ফলে কান্দাহার দুর্গ পারসীকদের অধিকারেই থেকে যায়।

কান্দাহার-যুদ্ধের এই ব্যর্থতার পরেও স্নেহান্ধ পিতা শাহ্‌জাহান দারাকে 'শাহ্‌-ই-বুলন্দ ইকবাল' বা 'মহা সৌভাগ্যবান রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং কার্যত তাঁকে সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনার ব্যাপারে সম্রাটের প্রধান উপদেষ্টার মর্যাদা দেন (১৬৫৫ খ্রীঃ)। দারা ষাট হাজার সৈন্যের মনসবদার পদে নিযুক্ত হন, এবং তাঁর ব্যক্তিগত আয় দাঁড়ায় বৎসরে সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা। কিন্তু পিতার এত স্নেহভাজন হয়েও তিনি রাজদরবারে অথবা দরবারের বাইরে এই বিরাট দেশের কোথাও নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার অজুহাতে তাঁর চার পুত্র দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ ক্ষমতা অধিকার করার জন্য এক আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত হন। আওরঙ্গজেব এই গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে আপন দলভুক্ত করেন এবং সম্রাটের প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে ধর্মাটের যুদ্ধে পরাস্ত করে রাজধানী আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। এর পর দারা স্বয়ং আওরঙ্গজেবকে বাধা দিতে গিয়ে সামুগড়ের যুদ্ধে (মে, ১৬৫৮) পরাস্ত হন ও বৃদ্ধ পিতাকে আগ্রা দুর্গে রেখে সপরিবারে প্রথমে দিল্লী ও পরে লাহোরে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যবশত এই সঙ্কটকালে দারা কোথাও বিশেষ সাহায্য বা সমর্থনের আশ্বাস পান নি। মুঘল সেনানায়ক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অধিকাংশই বিজয়ী আওরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করেন। মুরাদকেও আওরঙ্গজেব কৌশলে বন্দী করেন। কয়েক মাস পরে আজমীরের কাছে দেওরাই-এর গিরিবর্ত্মে দারার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী পুনরায় আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের হাতে পরাজিত হয়, ও প্রাণ বাঁচাবার জন্য দারা আফগানিস্তানের দিকে যাত্রা করেন (মার্চ, ১৬৫৯)। পথে দাদার নামে একটি স্থানে এক বালুচি নেতা মালিক জীবন তাঁকে আশ্রয় দেন। শাহ্‌জাহানের ক্রোধ থেকে দারা ইতিপূর্বে একবার মালিক জীবনকে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু দারার দুর্গতির তখনো অনেক বাকী ছিল। দাদারে তাঁর একান্ত অনুগতপ্রাণা পত্নী নাদিরা বেগমের মৃত্যু হয়, এবং অকৃতজ্ঞ মালিক জীবন অর্থের লোভে শোকার্ত দারাকে আওরঙ্গজেবের অনুচরদের হস্তে সমর্পণ করেন। বন্দী দারাকে দিল্লীতে নিয়ে এসে জনসমক্ষে অপমানিত করবার জন্য মলিন বস্ত্রে এক অসজ্জিতা হস্তিনীর পৃষ্ঠে বসিয়ে নগর-প্রদক্ষিণ করা হয়। দারার বিচারের জন্য আওরঙ্গজেব তাঁর বিশ্বস্ত ধর্মান্ধ উলেমাদের নিয়ে এক বিচারক-মণ্ডলী গঠন করেন। এই বিচারকগণ দারাকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করলে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। বন্দী সম্রাট শাহ্‌জাহান তাঁর প্রিয় পুত্রকে রক্ষা করার জন্য কোন চেষ্টাই করতে পারেন নি। পিতার দ্বারা প্রকাশ্যে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও দারা একদিনের জন্যও দিল্লীর মসনদে বসতে পারেন নি। রাজনীতির

বিচারে এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কি হতে পারে ?

কিন্তু সেনানায়ক, প্রশাসক ও কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেও দারা শুকো ছিলেন একজন প্রকৃত দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁকে তাঁর প্রপিতামহ মহামতি আকবরের সঙ্গেও তুলনা করা চলে। আকবরের মতো তিনিও সকল মতবাদের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতিতে (সুল্-ই-কুল) বিশ্বাসী ছিলেন, এবং হিন্দু প্রজাদের, বিশেষতঃ রাজপুতদের. আপন করে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। বিক্রমজিৎ হজরত দেখিয়েছেন যে দারার সর্বেশ্বরবাদী (pantheistic) দৃষ্টিভঙ্গি এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ বা আকর্ষণ ছিল তাঁর অন্তরের বিশ্বাসপ্রসূত, আকবরের মতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। আকবরের মতো বিভিন্ন ধর্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করে একটি নতুন সমন্বয়ী ধর্মমত (দীন-ই-ইলাহি) গড়ে তোলার কোন চেষ্টা দারা করেন নি, কারণ এই ধরনের কৃত্রিম ধর্ম জনসাধারণের কাছে হত দুর্বোধ্য, এবং হিন্দু বা মুসলমান কারো কাছেই তা গ্রহণযোগ্য হত না। দারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর সর্বেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সুফী ধর্মবিশ্বাসেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু অসাধারণ আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ইসলামের মূল নীতিকে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হন, এবং ইসলামের ভিতরেই বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতবাদের একটি সাধারণ মিলনক্ষেত্র রচনার চেষ্টা করেন। দারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে বেদান্ত ও ইসলামের মূলতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র বাচন-ভঙ্গির পার্থক্য, এবং এই কথাটিকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাজ্মা-আল-বাহরাইনে' (১৬৫৫) প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন, যদিও সেই প্রচেষ্টা খুব সার্থক হয় নি। হিন্দুদের বাহান্নটি উপনিষদের তিনি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করে 'সির-ই-আকবর' গ্রন্থে সেগুলিকে সঙ্কলন করেন (১৬৫৭)। তাঁরই উদ্যোগে 'গীতা', 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ', এবং হিন্দু দর্শন-ভিত্তিক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র ফার্সী ভাষায় অনুবাদের আয়োজন করা হয়। হিন্দু পণ্ডিত এবং কবিদের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দারা শুকো। কর্ণাটকের কবি জগন্নাথ পণ্ডিত তাঁর 'জগদাভরণম্' কাব্যের নায়ক হিসাবে দারাকেই গ্রহণ করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের হিন্দু পণ্ডিত কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীও দারার অনুগ্রহ লাভ করেন। দারা হিন্দী ভাষাতে কিছু কিছু স্তোত্র রচনা করেন, এবং নানা হিন্দু মন্দিরে মুক্তহস্তে দান করেন। সম্রাট শাহ্জাহান তাঁরই সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রয়াগ ও বারাণসীর হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে তীর্থ-কর আদায় বন্ধ করে দেন। আওরঙ্গজেব তাঁর পিতার রাজত্বকালেই গুজরাটের চিন্তামন মন্দির অপবিত্র করে দিয়েছিলেন। দারা ঐ মন্দিরের সংস্কার ও শুদ্ধির জন্য বহু অর্থব্যয় করেন। মথুরার বিখ্যাত কেশবদেবের মন্দিরেও তিনি একটি পাথরের 'রেলিং' দান করেন। হিন্দু দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং দীর্ঘকাল হিন্দু সন্ন্যাসী ও যোগীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে দারার মনে হিন্দুদের সম্বন্ধে এক গভীর সহানুভূতির ভাব জাগ্রত হয়, এবং তিনি নানাভাবে তাদের উপকারের চেষ্টা করেন। শাহ্জাহানের রাজত্বকালের শেষ দুই দশকে মুঘল সৈন্যবাহিনীতে উচ্চপদস্থ হিন্দু সেনাপতিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং এটি সম্ভব হয়েছিল দারারই চেষ্টার ফলে। মেবারের মহারাণা রাজসিংহকে কিভাবে তিনি রাজ্যহানি এবং চূড়ান্ত অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। এটি যে রাজপুত জাতির প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন, সে কথা অম্বররাজ জয়সিংহকে লেখা দারার একটি চিঠিতে

সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় একইভাবে দারা শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীচাঁদকে শাহ্‌জাহানের কোপ থেকে রক্ষা করেছিলেন (১৬৫৪)। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দুটি প্রধান সম্প্রদায় ছিল সুন্নী ও শিয়া। দারা নিজে সুন্নীর সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও শিয়াদের প্রতি যথেষ্ট সহিষ্ণুতা পরিচয় দেন। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মুঘল সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে বিপন্ন দাক্ষিণাত্যের দুটি শিয়া রাজ্য, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা, বারংবার দারার অনুগ্রহেই কোনমতে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়। খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রতি আচরণেও দারার এই পরধর্মসহিষ্ণুতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইতিহাসে দারার মতো চরিত্র সত্যই বিরল।

অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র ঠিকই বলেছেন যে রাজনীতিক্ষেত্রে দারার যাঁরা শত্রু ছিলেন, তাঁরাই দারাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য 'ইসলাম বিপন্ন' এই রব তুলেছিলেন ও দারাকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, সকল ধর্মের সত্যতায় বিশ্বাসী দারা ক্ষমতাসীন হলে ধর্ম হিসাবে ইসলামের মর্যাদা এবং ঐ ধর্মের নেতৃস্থানীয় গোঁড়া মৌলানা-মৌলবীদের বিশেষ অধিকার সবই বিপন্ন হবে। দারার আন্তরিক কামনা ছিল যে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক, এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রজাদের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ পক্ষপাতহীন হোক। এই দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় যেন মহামতি আকবরের অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব দারার উপর ন্যস্ত হয়েছিল, যদিও সে দায়িত্ব পালনের শক্তি তাঁর ছিল না। উত্তরাধিকারের যুদ্ধে দারার পরাজয় এবং আওরঙ্গজেবের জয়লাভ মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে শুধু যে সম্রাট শাহ্‌জাহানের এক পুত্রের পরিবর্তে অপর পুত্র দিল্লীর সিংহাসন লাভ করলেন তা নয়, দারার পরাজয়ের পরিণামে ভারতে মধ্যযুগের ইতিহাসের সব চেয়ে গৌরবময় অধ্যায়েরও সমাপ্তি ঘটল। 'আকবরের যুগ', যাকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ এবং পুনর্জাগরণের যুগ বলা হয়, তা সামুগড়ের যুদ্ধে দারার শোচনীয় পরাজয়ের সঙ্গে শেষ হয়ে গেল (১৬৫৮)। ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আবার কিছুদিনের জন্য ভারতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করল। ইতিহাসের সাধারণ মাপকাঠিতে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবকে সফল এবং দারাকে ব্যর্থ বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করলে দারার বিফল স্বপ্নকে আজ আমাদের মূল্যবান মনে হবে। ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সখ্যের বন্ধন যাঁরা দৃঢ় করতে চান, এবং সমস্ত ধর্মীয় বিভেদের অবসান ঘটাতে চান, আকবর এবং দারার প্রদর্শিত পথেই তাঁদের চলতে হবে। এই হিসাবে ভারতের প্রতিটি জাতীয়তাবাদীর কাছেই দারার ঐতিহ্য মহা মূল্যবান এবং সযত্নে রক্ষণীয়।*

* এই প্রবন্ধ রচনা করতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

(১) Kalika Ranjan Qanungo, **Dara Shukoh** (Calcutta, 1952)

(২) K. R. Qanungo, **Historical Essays** (Delhi, 1960)

(৩) Bikramjit Hasarat, **Dara Shikuh : Life And Works** (Viswa Bharati, 1953)

(৪) **Encyclopaedia of Islam** (1961), Satish Chandra's article on 'Dara Shukoh'.

(৫) দিলীপ কুমার বিশ্বাস, 'ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা' (কলিকাতা, ১৯৪৭)

সাংখ্যমতে সৎপদার্থের স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য

সাংখ্যদর্শনে সৎপদার্থকে চিরন্তন বা নিত্য বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। সহজ কথায় যাহা বস্তু, তাহাই সৎ। কোনও দেশে বা কালে যাহার অস্তিত্ব নাই, অন্য দেশে বা অন্য কালে তাহা সৎ হইতে পারে—এইরূপ কালভেদে একই বস্তুর সত্তা এবং অসত্তা ন্যায়বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ-দর্শনে স্বীকৃত হইলেও সাংখ্যদর্শন উহা স্বীকার করে না। যাহা সৎ, তাহা চিরদিনই সৎ। তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যাহা অসৎ, তাহা চিরদিনই অসৎ। তাহা কখনও সৎ হইতে পারে না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় এই সাংখ্যমতবাদের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। ভগবান বলিয়াছেন—

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'

(২।১৬)

ইহার অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর একটি ধর্মই নিয়ত ধর্ম হয়। সত্ত্ব যে বস্তুর ধর্ম, তাহা সৎস্বভাব। পক্ষান্তরে যাহা অসৎ, তাহা কখনও সৎস্বভাব হইতে পারে না।

ধর্ম ও ধর্মী সম্বন্ধে দ্বিবিধ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। কোনও স্থলে ধর্ম ও ধর্মী পরস্পরের ব্যভিচারী হইতে পারে। যেমন, নীল পদ্ম। এখানে পদ্ম ধর্মী, এবং নীলত্ব তাহার ধর্ম। কিন্তু নীলত্বকে বর্জন করিয়াও পদ্ম থাকিতে পারে। যেমন, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম। তেমনি পদ্মকে বাদ দিয়াও নীলত্ব থাকিতে পারে। যেমন, নীলবস্ত্র। সুতরাং নীলত্ব না থাকিলেও পদ্মের অস্তিত্ব সম্ভব। অন্যদিকে পদ্ম না থাকিলেও নীলত্ব অন্যত্র থাকিতে পারে। এইরূপ ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব থাকিলেও ধর্মটিকে ঐ ধর্মীর স্বভাব বলা যায় না। যাহা স্বভাব, তাহা কখনও বস্তুর ব্যভিচারী হয় না। যেমন, বহ্নির স্বভাব উষ্ণতা। এখানে উষ্ণত্ব বহ্নিকে (তেজোদ্রব্যকে) ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে পারে না। আবার বহ্নিও উষ্ণত্ব-বিহীন হইতে পারে না। সুতরাং যে ধর্ম এবং ধর্মী পরস্পরের ব্যভিচারী হয় না, সেই ধর্মকেই সেই ধর্মীর স্বভাব বলা হয়। কিন্তু স্বভাব না হইলেও ধর্ম ও ধর্মীর সামানাধিকরণ্যবশতঃ অভেদ-প্রতীতি জন্মে। নীল পদ্ম—এখানে নীলত্ব একটি গুণ, এবং পদ্ম একটি দ্রব্য। এই দুইটি অত্যন্ত ভিন্ন, এবং পরস্পরের ব্যভিচারী হইলেও উভয়কে অর্থাৎ নীল ও পদ্মকে এক বা অভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়। কারণ, নীলের জ্ঞান না হইলে এখানে পদ্মের জ্ঞান হয় না, যেহেতু বিশেষণের জ্ঞান ব্যতীত সেই বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং এখানে অভেদবুদ্ধি জন্মাইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা দুইটি ভিন্নবস্তুর একত্র-প্রতীতির ফল মাত্র। এইজন্যই এই অভেদকে বস্তুধর্ম না বলিয়া অর্থাৎ নীল ও পদ্মের অভেদ না বলিয়া 'নীলপদ্ম' এইরূপ বুঝিলে সেখানে দুইটি বস্তুর অভিন্ন-প্রতীতির বিষয়রূপেই বৌদ্ধিক-অভেদ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সন্‌ ঘটঃ, সন্‌ পটঃ, অর্থাৎ 'ঘট সৎ', 'পট সৎ' এইরূপ প্রতীতির স্থলে অভেদ বুদ্ধিগত নয়, কিন্তু বস্তুগত। বুদ্ধি এই অভেদের গ্রাহক মাত্র। এখানে ঘট এবং তাহার বিশেষণ বা ধর্মরূপে প্রতীয়মান সত্ত্ব অভিন্ন। কারণ সত্তাকে বাদ দিয়া ঘটের প্রতীতি সম্ভব নহে। ঘট আছে,

কিন্তু অস্তিত্ব নাই, ইহা হইতেই পারে না। যাহা অস্তিত্ববিহীন, আকাশকুসুমাদির ন্যায় তাহা অলীক। তাহা কখনও আছে, এইরূপ প্রতীতির বিষয় হয় না। সুতরাং ঘট একটি সদ্-বস্তু—ইহাই সিদ্ধ হয়। ঘট কখনও অসদ্-বুদ্ধির বিষয় হয় না।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ঘট পট প্রভৃতি কার্যবস্তুর যে জ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের মধ্যে ঘট প্রভৃতি বস্তুর সহিত তাহার উপাদান-কারণের জ্ঞানও হয়। মৃত্তিকার জ্ঞান হইল না, কিন্তু ঘটের জ্ঞান হইল, অথবা সূত্রের জ্ঞান হইল না, অথচ বস্ত্রের জ্ঞান হইল—ইহা অসম্ভব। ঘটপটাদির প্রত্যক্ষকালে তাহাদের উপাদান মৃত্তিকা, সূত্র প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ ঐ সমস্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ না হইলে ঘট-পটাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। ইহার কারণ, মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট থাকিতেই পারে না। সূত্রকে বর্জন করিয়া বস্ত্র থাকিতেই পারে না। সুতরাং মৃত্তিকার অনুভূতি ব্যতীত ঘটের অনুভূতি হয় না। মৃত্তিকার সত্তা বর্জন করিয়াও ঘটের সত্তা সম্ভব হয় না। এইজন্যই ঘট ও মৃত্তিকাকে অনন্য বা অভিন্ন বলিতে হয়। অতএব যেস্থলে এমন দুইটি বস্তু পাওয়া যাইবে, যেখানে একটির সত্তা এবং উপলব্ধি ব্যতীত অপরটির সত্তা এবং উপলব্ধি সিদ্ধ হয় না, সেখানে সেই দুইটি বস্তুর অভেদ বা অনন্যত্বই স্বীকার করিতে হয়। সেই দুইটি বস্তুর মধ্যে যাহার উপলব্ধি এবং সত্তা ব্যতীত অপরের উপলব্ধি বা অস্তিত্ব সম্ভব হয় না, সেই অপর বস্তুটিকে তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। মৃত্তিকার উপলব্ধি এবং সত্তা ব্যতীত ঘটের উপলব্ধি এবং সত্তা সিদ্ধ হয় না বলিয়া ঘট মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন বা অনন্য বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। এইরূপ স্থলে যাহা হইতে যে অভিন্ন হইবে, সেই বস্তু সেই স্বভাব-বিশিষ্ট হইবে। সুতরাং যাহা সৎ-স্বভাব তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যাহা অসৎ-স্বভাব তাহা কখনও সৎ হইতে পারে না। সুতরাং একই বস্তু কালভেদে সৎ এবং অসৎ—ন্যায়বৈশেষিকদর্শনের এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যাচার্যগণ স্বীকার করেন না।

কেবল ইহাই নহে, সাংখ্যমতে যাহা বস্তু, তাহাই সৎ। কিন্তু এই বস্তু বা সৎ—নিত্য হইলেও উহাদের দুইটি স্বভাব রহিয়াছে—একটি পরিণামী সৎ, অপরটি অপরিণামী সৎ। যাহা কোনও কালে কোনও অবস্থান্তর লাভ করে না, অর্থাৎ সর্বদা একইভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহা অপরিণামী সৎ। আত্মা বা পুরুষ এইরূপ সৎপদার্থ। যাহা অপরিণামী সৎ, তাহার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাই একমাত্র চৈতন্য বা স্বপ্রকাশ পদার্থ। তাহার কোনও ধর্ম নাই, কোনও গুণ নাই, তাহা নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। পুরুষ বা আত্মার এই স্বভাব বেদান্তদর্শনেও স্বীকৃত। স্বরূপের দিক হইতে সাংখ্য ও বেদান্ত—এই উভয় দর্শনেই আত্মস্বরূপ একইভাবে স্বীকৃত। পার্থক্য কেবল এই যে, অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শনে আত্মা এক, অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারাই এক আত্মা জীব হিসাবে পরিগণিত হন। কেবল তাহাই নহে, সমষ্টিস্বরূপ অবিদ্যা—যাহা 'মায়া' নামে প্রসিদ্ধ, সেই মায়ারূপ উপাধিদ্বারা আত্মা ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। পরমাত্মা এক হইলেও উপাধিবিশিষ্ট হইয়া জীব নামে প্রতীত হওয়ায় জীব ও পরমাত্মার মধ্যে কল্পিত ভেদ বৈদান্তিকমতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে আত্মা সংখ্যায় বহু,—বহুপুরুষবাদ সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত। সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নহে। জীব ও পরমাত্মাও পৃথক্ কিছু নহে। অর্থাৎ পুরুষকে যেরূপ আত্মা বলা যায়, সেরূপ পরমাত্মাও বলা যায়। পুরুষ,

আত্মা এবং পরমাত্মা—এই তিনটি অভিন্ন বস্তুর বোধক পর্যায়বাচক শব্দ মাত্র।

পরিণামী সৎ অপরিণামী সৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বভাবের বস্তু। নিত্য হইলেও তাহা সর্বদা একইরূপে বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু প্রতিক্ষণেই ধারাবাহিক পরিণামের মধ্যে উহার সত্তা অক্ষুন্ন-ভাবেই থাকে। যাহার পরিণাম ঘটে তাহার পূর্বাবস্থার অপগম এবং নূতন অবস্থার আবির্ভাব হয়—ইহারই নাম পরিণাম।[১] সুতরাং পরিণাম হইলেও মূলবস্তুটির সত্তা বা অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় না। পূর্বে যে অবস্থা তাহায় ছিল, সেই অবস্থার তিরোধান ঘটে, এবং নূতন একটি অবস্থার আবির্ভাব হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি বা প্রধান এইরূপ পরিণামী সৎ। সুতরাং সৎপদার্থের মধ্যেও কিছু বৈলক্ষণ্য আছে।

এই পরিণামী সৎ প্রকৃতি জড়পদার্থ এবং সমগ্র সৃষ্টপদার্থের উপাদান-কারণ। প্রত্যেকটি কার্যবস্তুর মধ্যে অবস্থাগত তারতম্য সত্ত্বেও যদি কোনও একটি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বস্তুটিকেই বিভিন্ন কার্যের উপাদান-কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। মৃত্তিকানির্মিত বিভিন্ন আকারের ঘট, থালা, পুতুল প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যবস্তুর ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির যোগ্যতার এবং আকৃতির পার্থক্য থাকিলেও একই মৃত্তিকা সকলের মধ্যে বিদ্যমান বলিয়া মৃত্তিকাকেই যাবতীয় মৃন্ময় কার্যবস্তুর উপাদান-কারণ বলা হয়। বিশ্বসংসারের আকৃতি এবং গুণগত তারতম্যযুক্ত নানাবৈচিত্র্যপূর্ণ যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মধ্যে যদি কোনও একটি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বস্তুটিকেই বিশ্বসংসারের উপাদান-কারণ বলিতে হয়। অনন্ত কার্যবস্তুর প্রত্যেকটিকে পরীক্ষা করিয়া অনুসন্ধান সম্ভব না হইলেও, যে কোনও একটি কার্যবস্তুর মৌলিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রথমতঃ উহার উপাদান-কারণ জানা সম্ভব। সাধারণভাবে উপাদান-কারণ চিনিবার প্রণালী পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকটি কার্যবস্তুর মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সন্ধান পাওয়া যায়। সত্ত্ব সুখ বা আনন্দজনক, রজঃ দুঃখ ও প্রবৃত্তি প্রভৃতির জনক, তমঃ মোহজনক এবং আবরণ-স্বভাব।[২] কোন একটি কার্যবস্তুকে লইয়া পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায় যে, ঐ বস্তুটি একই সময়ে বিভিন্ন লোকের সুখ, দুঃখ এবং মোহের জনক হয়। এই বিষয়ে সাংখ্যের প্রসিদ্ধ উদাহরণ : রূপ, যৌবন এবং সৎস্বভাবের অধিকারিণী সদ্‌বংশপ্রসূতা একজন নারী একই সময়ে তাহার পতির সুখের কারণ, সপত্নীর দুঃখের কারণ এবং তাহাকে প্রার্থনা করিয়াও লাভ করিতে অসমর্থ কোনও কামার্ত পুরুষের মোহের কারণ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একই বস্তু একই সময়ে সুখ, দুঃখ ও মোহের জনক হইয়া থাকে। বস্তুটি যদি সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক অথবা মোহাত্মক না হইত, তাহা হইলে উহা কখনও অপরের সুখ, দুঃখ বা মোহের কারণ হইত না। যে বস্তুর মধ্যে যাহা নাই, সেই 'বস্তুর নিকট হইতে তাহা পাওয়া যায় না। নির্গন্ধ পুষ্প গন্ধদায়ক হয় না, নীরস বস্তু হইতে রস-আস্বাদন করা যায় না। সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই গুণত্রয়ের যাহা স্বভাব, একটি বস্তুর নিকট হইতে সেই স্বভাব-অনুযায়ী সুখ,

১ 'অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ।'
—পাতঞ্জলদর্শন, ৩।১৩, ব্যাসভাষ্য

২ 'সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥' —সাংখ্যকারিকা, ১৩

দুঃখ এবং মোহের উপলব্ধি হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ বস্তুটি সুখ, দুঃখ এবং মোহাত্মক। বস্তুটি যদি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক না হইত, তাহা হইলে একটি বস্তু একই সময়ে সুখপ্রদ, দুঃখপ্রদ বা মোহপ্রদ হইত না। সুতরাং একটি কার্যবস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহার ত্রিগুণাত্মকতা প্রমাণিত হইলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যাহা কার্যবস্তু তাহাই ত্রিগুণাত্মক। এইভাবে সমস্ত কার্যবস্তুর ত্রিগুণাত্মকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় উহাদের কারণও যে ত্রিগুণাত্মক—অনুমানের দ্বারাই ইহা নির্ধারিত হয়। যে কার্যটি যদাত্মক, তাহার কারণও তদাত্মক হইবে—ইহাই নিয়ম। মৃত্তিকা ও ঘট, সুবর্ণ ও কুণ্ডল, ইহার দৃষ্টান্ত। এইভাবে সমস্ত কার্যবস্তুর ত্রিগুণাত্মক একটি উপাদান-কারণ সিদ্ধ হয় এবং ঐ উপাদান-কারণকেই সাংখ্যমতে মূলপ্রকৃতি বলা হয়। কেবল ত্রিগুণাত্মকতাই নহে, কার্যবস্তুর জড়াত্মকতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় মূল উপাদান-কারণকেও জড়াত্মক বলিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, সাংখ্যের মূলপ্রকৃতিও জড়াত্মিকা। কার্য ও কারণের অনন্যত্ব স্বীকার করিতেই হয়। 'অনন্যত্ব' কথার অর্থ (সাংখ্যমতে) অত্যন্তভেদশূন্যত্ব। অভিপ্রায় এই যে, মূল উপাদান-কারণ এবং তাহার কার্য স্বভাবের দিক হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া উহাদের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ নাই। যেমন, সূত্র ও বস্ত্র। এখানে সূত্র কারণ ও বস্ত্র কার্য। কিন্তু বিশেষভাবে বিন্যস্ত সূত্রসমষ্টির অতিরিক্ত কোনও পদার্থই বস্ত্র নহে। অতএব বিশেষ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত সূত্রসমষ্টিই বস্ত্র। সুতরাং স্বভাবের দিক হইতে সূত্র ও বস্ত্র অভিন্ন। কিন্তু কার্যকারিতার দিক হইতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সূত্র সেলাই প্রভৃতি কার্যের নির্বাহক। কিন্তু বস্ত্র ঐরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে বস্ত্র শরীরকে আবৃত করিতে পারে, কিন্তু সূত্র তাহা পারে না। সূত্র ও বস্ত্র কার্যকারিতার দিক হইতে ভিন্ন হইলেও অত্যন্ত ভিন্ন নহে। এইজন্যই সাংখ্যাচার্যগণ কার্য ও কারণের ভেদাভেদ স্বীকার করেন।[৩] সুতরাং সাংখ্যমতে জড়াত্মক প্রকৃতি সৎপদার্থ। তাহার বিনাশ নাই বলিয়াই তাহাকে সৎপদার্থ বলিতে হইবে। জড়বস্তুর উপাদান প্রকৃতির বিনাশ স্বীকার করিলে তাহার উৎপত্তিও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, যে ভাবপদার্থের বিনাশ আছে, তাহার উৎপত্তিও আছে। প্রকৃতির উৎপত্তি স্বীকার করিলে যাহা ছিল না, তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। অথবা প্রকৃতিকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। যাহা ছিল না—অর্থাৎ যাহা অসৎ—তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। ইহাই সাংখ্যসিদ্ধান্ত। কারণ, কালভেদে একই বস্তু অসৎ ও সৎ হইতে পারে না, যে কথা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে।

বিশেষতঃ প্রত্যেকটি কার্যের বিশ্লেষণের সাহায্যে ত্রিগুণাত্মক মূল উপাদান-কারণ সিদ্ধ হয়। এই মূল কারণকে নিত্য বলিতেই হয়। বস্তুটি যদি নিজে নিত্য না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কার্য বলিতে হইবে। এবং তাহাও অন্য একটি কারণকে অপেক্ষা করিবে। অপেক্ষণীয় সেই কারণটি অনিত্য হইলে, নিজের উৎপত্তির জন্য তাহাও অন্য একটি কারণকে অপেক্ষা করিবে। এইভাবে অনবস্থা-দোষ হয়। এইজন্যই প্রত্যেক দার্শনিক মূল উপাদানরূপে যে বস্তুটিকে স্বীকার করেন তাহাকে নিত্য বলিয়াছেন। যথা, ন্যায়বৈশেষিকমতে পরমাণু নিত্য, অদ্বৈতবেদান্ত-মতে বিবর্ত-উপাদান ব্রহ্ম নিত্য। ঠিক সেইভাবে সাংখ্যমতেও মূল উপাদান হিসাবে প্রকৃতিকে নিত্য বলা হইয়াছে—'মূলে মূলাভাবাদ্ অমূলং মূলম্' (সাংখ্যদর্শন, প্রথম অধ্যায়, সূত্র ৬৭)।

---

৩ 'কারণকার্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য।' —সাংখ্যকারিকা, ১৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন (১৯৮১)

(দ্বিতীয় বার্ষিক)

শ্রীতাপসকুমার ভট্টাচার্য

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ছাড়াও ওঁদের আবির্ভাব-স্মরণোৎসব সমস্ত দেশে সারা বছর ধরে, নানাভাবে, বিচিত্র আয়োজনে পালিত হয়। এদিক থেকে আমরা বলতে পারি, আমাদের একটা দিনও ঠাকুর-মা-স্বামীজী ছাড়া নয়। কলকাতার 'উদ্বোধন' বা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীটি এক পবিত্র পীঠস্থান। এখানে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জন্মতিথি ছাড়া অন্যত্র যেমন বড়ো আকারে উৎসব হয়, তেমন রেওয়াজ নেই। তাই ১৯৮০ সাল থেকে উদ্বোধনের 'সারদানন্দ হলে' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিস্তৃতভাবে—জন্মোৎসবেরই পরিপূরক অনুষ্ঠান বা উৎসব হিসাবে। ১৯৮১-তে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বর্ষের সম্মেলনের শেষ দিনটিতে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী এইভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

১৯৮১-র ১৬ই মে, ১৩৮৮-র নিদাঘ-তপ্ত রুক্ষ জ্যৈষ্ঠের এক পড়ন্ত বেলায় শুরু হয়েছিল এই সম্মেলন। সমাপ্তি ঘটেছিল বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে, বাইরের আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে 'ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি' নিয়ে।

শনিবার ১৬ই মে, ১৯৮১। সম্মেলনের প্রথম দিন। বিকাল ৪টা। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতির নিচে মঞ্চে উপবিষ্ট বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ, বা মায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বন্দনানন্দজী, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক তথা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহসম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী, মঠ ও মিশনের কোষাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী। অন্যান্য সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ, বক্তা-আলোচক, আমন্ত্রিত অন্যান্য সজ্জনবৃন্দ এবং সাধারণ দর্শক-শ্রোতায় হলঘর পরিপূর্ণ।

বিশিষ্ট গায়ক শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া, নিত্যকল্যাণ কাজে হে'—এই উদ্বোধনী সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী তাঁর স্বাগত-ভাষণে সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন, স্বামীজীর লেখমালা অনেকের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। তার কারণ এই যে, তাঁর রচনা নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি না।

এই সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন'। 'রামকৃষ্ণ' এবং 'বিবেকানন্দ'—দুটি নাম কেন একত্র উল্লেখিত, তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও শিষ্যদের অনেকে তাঁর বাণী প্রচার বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলি নিঃসন্দেহে শ্রীরামকৃষ্ণেরই বাণী হলেও সার্বজনিক নয়—একদেশী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বজনিক যে বাণী তা উদ্গীত হয়েছিল বিবেকানন্দেরই কণ্ঠে, প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরই লেখনীমুখে। তাই এই যুগ্ম-নাম— রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'।

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বজনিক বাণী সমাজদেহে কীভাবে কার্যকরী হয়ে উঠবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনার দ্বারাই আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি।

আগের আগের অন্যান্য ধর্মীয় মহাপুরুষদের থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পার্থক্য এইখানে যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তাঁদের জীবন ও বাণীকে সমাজদেহের মধ্যেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন ও পেরেছিলেন। হিমালয় যেমন 'অনন্তরত্নপ্রভব' ঠিক তেমনই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মধ্যেও রয়েছে অনন্ত রত্ন। আমাদেরই আগ্রহী হয়ে এগিয়ে গিয়ে এই রত্ন সংগ্রহ করতে হবে। এটুকু মনে রাখতে হবে, পল্লবগ্রাহিতা নিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোচনা চলে না। তাঁদের বুঝতে হলে চিন্তাশক্তির প্রয়োজন, শুধুমাত্র হৃদয় দিয়ে হবে না।

সমবেত সুধীবৃন্দকে লক্ষ্য করে হিরণ্ময়ানন্দজী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন এই বলে যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক এই সব আলোচনার মধ্য দিয়েই মানুষের ভিতরকার অন্ধকার দূর হবে এবং এই মহতী সম্ভাবনাময় বাণীপ্রবাহিণীর দ্বারা উৎপন্ন শস্যরাজি নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারব।

এরপর স্বামী বন্দনানন্দজী ইংরেজীতে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দেন। হৃদয়গ্রাহী এই ভাষণে তিনি সাহিত্যের নানা দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করে পরে বলেন, ধর্ম যে অনুশীলনের বিষয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। 'কথামৃত' ঠাকুরের মুখ থেকে শুনে সরাসরি মাষ্টারমশাই কর্তৃক সংকলিত। এমন একখানি শ্রেষ্ঠ-প্রামাণ্য গ্রন্থ আর নেই। মাষ্টার-মশাই রামকৃষ্ণের একটি কথা, একটি শব্দও পরিবর্তিত করে নিজের মতো করে লেখেন নি, লেখার চেষ্টাও করেন নি। সবই রামকৃষ্ণের কথা, আর এটাই রামকৃষ্ণ-সাহিত্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য আমরা পড়ি, পড়ে চিন্তা করতে শুরু করি এবং তা আমাদের জীবনে এক নতুন আলো এনে দেয়। আপনারাও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য শুনুন, পড়ুন, চিন্তা করুন এবং নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন। তবেই হবে এমন সম্মেলনের সার্থকতা।

স্বামী গহনানন্দজী তাঁর ভাষণে বলেন, যে-সাহিত্য ভারতবর্ষ তথা সমস্ত জগৎকে আলো দেবে সেই সাহিত্য-সম্মেলনে আজ আসতে পেরেছি, এ এক মহা সৌভাগ্য। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের বহু দেশনেতা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও সাহিত্য থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। সেই প্রেরণা তাঁদের মনে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল—স্বাধীনতা, ত্যাগব্রত ও দেশহিতৈষিতার আগুন। দিনে দিনে দেশ ডুবতে বসেছে আদর্শহীনতা, চরিত্রভ্রষ্টতা, অলসতা, অকর্মণ্যতায়। স্বামীজী বলেছিলেন, ভারত জাগছে। কিন্তু আমরা মনীষী-দের বাণী অনুসরণ করছি না, তাই আজ আমাদের এই দুরবস্থা। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আগে চাই চরিত্রগঠন। চরিত্রগঠনের সাহিত্যই হলো বিবেকানন্দ-সাহিত্য। আজকের যুবকদের মধ্যে এই সাহিত্যের প্রচার হওয়া দরকার। মনের পুষ্টির জন্য চাই উন্নততর সাহিত্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যই সেই সাহিত্য। ত্যাগ ও সেবার ভাবটি ছোটদের মধ্যে জাগাতে হবে। আমাদের মহা সৌভাগ্য যে আমরা এই দেশে জন্মেছি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের আলোচনা ও প্রচার যত বেশি হয়, ততই ভালো।

সুগায়ক শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের গানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বেলা ৫-টায় এবারকার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের প্রথম পর্ব শুরু হয় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর সভাপতিত্বে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে স্বামী

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্মেলন (১৯৮১)
উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন স্বামী বন্দনানন্দজী

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সমবেত বক্তা, আলোচক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ

সম্মেলনে স্বাগতভাষণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী

সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে সমবেত বক্তা, আলোচক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ

বিবেকানন্দ' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন।

অধ্যাপক সেন বলেন, স্বামীজীর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়ধর্মিতা। এর উৎসরূপে অধ্যাপক সেন তিনটি সূত্রের উল্লেখ করেন: (১) ভারত-ইতিহাসের ধারার মধ্যেই রয়েছে এই সমন্বয়ধর্মিতা, (২) গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেও তিনি সমন্বয়ের ধর্মটিকে গ্রহণ করেছিলেন, (৩) স্বামীজীর নিজ জীবনের ফল্গুধারায় প্রবাহিত—তাঁর আপন সত্তাতেই অনুস্যূত এই সমন্বয়ধর্মিতা। তাঁর সমন্বয়সাধনা থেকেই সৃষ্টি হল ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ন (বিশ্বজনীন ধর্ম), কমপ্যারাটিভ রিলিজিয়ন (তুলনামূলক ধর্ম)। এর থেকেই এসেছে জাতীয়তাবাদ। তিনি আরও বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজীর প্র্যাকটিক্যাল (কর্মে পরিণত) বেদান্তের বাস্তব রূপের প্রকাশ। স্বামীজীর অনুভূতিলব্ধ সংস্কৃতিই এ যুগের বিশ্বসংস্কৃতি আর তার পুরোধা স্বামীজী।

এই প্রবন্ধের উপর আলোচনা করতে উঠে অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় বলেন, বিবেকানন্দের সমন্বয়ধর্মিতার কথা বলতে গেলে, সমন্বয়ধর্মিতার উৎসের কথা বলতে হয়। সেই উৎসে আছেন রামমোহন আর কেশবচন্দ্র সেন। রামমোহনই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনের প্রথম চেষ্টা করেন, তারপর কেশবচন্দ্র।

ডঃ জহর সেন বলেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের এই বিভাজ-টা কতটা সার্থক বা যথার্থ সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। অধ্যাপক বিনয় সরকারের কথা উল্লেখ করে জহরবাবু বলেন, শিল্প-বিপ্লবের পর থেকেই এই বিভাজনটির সৃষ্টি। 'আনন্দমঠে'র বাস্তব চেতনার প্রকাশ দেখা যায় বিবেকানন্দের নর-নারায়ণের সেবার মধ্যে।

সভাপতির ভাষণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী বলেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও অনেক কথাই বলেছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সম্পর্কে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি স্বামীজীরও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্ত্যে যে আধ্যাত্মিকতা ছিল না, তা নয়, তবে তা ভারতের মর্মকথা যে আধ্যাত্মিকতা, সেরকম কিছু নয়, ওদেশে নিও-প্লেটোনিজমের পর থেকেই অধ্যাত্মবাদের সূচনা। দুটি সভ্যতার সুসামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবে। আমরা এখন ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে চলেছি। তবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সম্মেলনের প্রবক্তা যে স্বামী বিবেকানন্দ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হিরণ্ময়ানন্দজীর এই ভাষণের পর প্রথম পর্ব শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ৬-৩০ মিনিটে তাঁরই সভাপতিত্বে।

'স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারা' বিষয়ে স্বরচিত প্রবন্ধের ভিত্তিতে ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, স্বামীজীর দর্শন তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আদ্যোপান্ত অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শন। এরপর ডঃ চৌধুরী অদ্বৈততত্ত্বের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করে পরে বলেন, অদ্বৈতবেদান্ত-চিন্তায় স্বামীজীর অভিনবত্ব হল, তিনি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বলেই থেমে থাকেন নি, তিনি আরও বলেছেন, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জেনে ব্রহ্মরূপী জীবের সেবার কথা। পর্বতগুহা থেকে, বন থেকে বের করে অদ্বৈতবেদান্তকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মাঠে-ঘাটে, ঘরে-ঘরে সর্বত্র।

আলোচনা করতে উঠে অধ্যাপক শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় দুটি প্রশ্ন রাখেন: (১) বিবেকানন্দকে দার্শনিক বলা যাবে কিনা? (২) বিবেকানন্দকে নিছক ভাববাদী বলা যাবে কিনা? এর উত্তর দিতে গিয়ে নিজেই বললেন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দের স্বাতন্ত্র্য হল, পাশ্চাত্ত্যদর্শনের ধারায় তিনি ভারতীয় দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দ ঠিক তত্ত্ব করার জন্য দর্শন করেন নি, দর্শনের মধ্য দিয়েই তাঁর দর্শন তিনি গড়ে

তুলেছেন। ভাববাদ ও যুক্তিবাদ, সমাজবাদ ও অধ্যাত্মবাদ—এই দুই বৈষম্যের তিনি অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে মানবমুক্তির পথকে করেছেন উন্মুক্ত। তিনি কীভাবে এই দুটি ধারণাকে মেলালেন তাই আমাদের আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় বলেন, স্বামীজী অদ্বৈতবেদান্তকে সমাজদর্শনে প্রয়োগ করেছিলেন। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা—ফরাসী বিপ্লবের এই মন্ত্রের ফাঁকটুকু স্বামীজী অদ্বৈতবেদান্তের ঐক্যবোধ দিয়ে পূর্ণ করেছেন।

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী বলেন, বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদী ছিলেন অবশ্যই, মায়াবাদকে তিনি বাদ দেন নি। তাঁর ব্যাখ্যায় মায়া হল স্টেটমেণ্ট অফ ফ্যাক্ট। কনসেপ্ট অফ ম্যান প্রসঙ্গে স্বামীজী বারবার অপরোক্ষানুভূতির কথা বলেছেন। মানুষ বলতে কী বোঝায়, তা হাল আমলেরই আলোচনা। বিবেকানন্দই সূত্রপাত করেন এমন আলোচনার।

সভাপতির ভাষণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী বলেন, এতক্ষণ আলোচনার পরও স্বামীজী দার্শনিক কিনা সে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

পাশ্চাত্ত্যমতে স্বামীজী দার্শনিক না হলেও ভারতীয় মতে তিনি দার্শনিক। কারণ, তাঁর দর্শন অনুভব-উপলব্ধির মধ্য দিয়ে লাভ করা, অর্জন করা। এই প্রথমবার একজন ভারতীয় মনীষী ভারতের এতকালের বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশিকে একটা সংহত রূপ দিলেন। স্বামীজী মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে আমাদের কাছে এক নতুন চিন্তার পথ খুলে দিলেন। যে তত্ত্ব তিনি প্রচার করেছেন, তা তিনি 'দর্শন' করেছেন। তিনি ফিলজফার কিনা জানি না, কিন্তু নিঃসন্দেহে তিনি দার্শনিক।

রবিবার, ১৭ই মে, ১৯৮১ দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বেলা ৯টা থেকে। হল কানায় কানায় উপচে পড়ছে। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী।

প্রথমার্ধে আলোচনার বিষয় ছিল 'ইংরেজী সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান'। এই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতে উঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান, বিশিষ্ট কবি ও অধ্যাপক ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, বিষয়টি একটু অভিনব, একটু নতুন। তারপর সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ে নানাবিধ মনোজ্ঞ তথ্য পরিবেশনের পর তিনি বলেন, মানবজাতির উত্থানের জন্য যে-সাহিত্য প্রয়োজন স্বামীজীর সাহিত্য তাই। বিশ্বসাহিত্যে এর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর রচিত বাক্যগুলি আমাদের ধাক্কা দেয়, আমাদের এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়, সাহায্য করে। সবশেষে তিনি বলেন, ইংরেজী সাহিত্যে স্বামীজীর দান ঠিক কীভাবে ঘটেছে তার কোন আলোচনা এখনও হয় নি। এ-ধরনের একটা সংকলনগ্রন্থ থাকা প্রয়োজন।

বিষয়টির উপর আলোচনা করতে উঠে অধ্যাপক সুধাংশু মণ্ডল বলেন, স্বামীজীর রচনায় পাই ইন্সপিরেশন বা প্রেরণা। স্বামীজীকে দেখতে হবে গদ্যরচয়িতা এবং কবি হিসাবে। কে কত প্রবাদবাক্য তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে দিতে পারলেন তারই নিরিখে বিচার হয় কে কত বড় সাহিত্যিক। স্বামীজীর রচনায় অজস্র প্রবাদবাক্য—শেক্সপীয়র, মিল্টন, পোপের মতো। তাঁর রচনাকে ইংরেজী সাহিত্যে নিউম্যানের রচনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

শ্রীবিপ্রদাস ভট্টাচার্য বলেন, ইংরেজী সাহিত্যে বিবেকানন্দের অসামান্য দানের কথা সাধারণ ইংরেজরা হয়তো স্বীকার করবেন না। প্রাচ্যের পায়ে যে পাশ্চাত্ত্য বসেছে তা কিন্তু স্বামীজীর ইংরেজী রচনাগুলির জন্যই। তাঁর 'ইন্সপায়ার্ড

টক্‌স্'-ই হচ্ছে ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর সবচেয়ে বড় দান। এক দিক দিয়ে হপকিনসের সঙ্গে তাঁর রচনা-প্রতিভার তুলনা করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে আরও দুজন—ডঃ দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রকুমার ঘোষালের আলোচনার পর সভাপতির ভাষণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী বলেন, স্বামীজীর বুকে একটা ব্যথা ছিল, সেই ব্যথার প্রকাশ ঘটেছে নানাভাবে —বক্তৃতায়, রচনায়। একটা অদম্য দুর্বার আবেগ তাঁর 'কালী দি মাদার' কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। বেদান্তের কঠিনতম বক্তব্য স্বামীজীর অসাধারণ ইংরেজীতে প্রাঞ্জল হয়ে প্রকাশিত। কাজেই ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর দানের পরিমাণ গভীরভাবে চিন্তনীয়।

সকাল ১০-৩০ মিনিটে দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'বাংলা গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ'। ডঃ মজুমদার তাঁর সুচিন্তিত, সুলিখিত প্রবন্ধে বিবেকানন্দের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিকের আলোচনার পর বলেন, তাঁর বাংলা রচনা চলতিভাষার এমন কাছাকাছি, যা তৎকালীন সমসাময়িক আর কারও রচনায় ছিল না। এদিক দিয়ে বিবেকানন্দই পথিকৃৎ। বঙ্কিমের রচনায় যেমন ছিল ত্রিমাত্রিক ছবি, তেমনি বিবেকানন্দের রচনায় দেখতে পাই পঞ্চমাত্রিক ছবি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইএর সূচনার পাঁচটি অনুচ্ছেদের উদাহরণ দেওয়া চলে। সেখানে বর্তমান ভারত, আমাদের জন্মভূমি, ইউরোপী পর্যটক, ইংরেজ রাজপুরুষ এবং ভারতবাসীর চোখে ভারতবর্ষকে তুলে ধরা হয়েছে। 'আনন্দমঠে'র মাতৃরূপের ত্রিমাত্রিক বর্ণনার পর তুলির এক-এক আঁচড়ে এমন পাঁচটি ছবির পঞ্চমাত্রিক বর্ণনা আমরা বাংলা সাহিত্যে পাই নি। বিদ্যাসাগরের কমন স্টাইল-এরও কাছাকাছি বিবেকানন্দের রচনাবলী। পেশাদারী লেখক ছিলেন না বলেই, তাঁর প্রচারের ঢাকঢোল বাজে নি বলেই, চলতি-ভাষার রচনাকার এবং চলতিভাষার প্রবচনের পুরোধা হিসাবে তিনি সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে এতকাল থেকেছেন উপেক্ষিত। চলতিভাষার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশেষভাবে তুলনা চলে, মুজতবা আলীর রচনায় বিবেকানন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আলোচনা করতে উঠে ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য বলেন, শিল্প শিল্পীর সচেতন ও অবচেতন মনের প্রকাশ। শিল্পী-মনের সংবেদনার প্রকাশের মধ্যেই পাই স্বভাব-শিল্পীর দেখা। বিবেকানন্দের ভাষা জীবনের ভাষা। আবেগ ও মননে সমৃদ্ধ তাঁর গদ্য।

ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী বলেন, শক্তির সঙ্গে লাবণ্যের যেখানে যোগ হয়েছে, তাই সুষ্ঠু সাহিত্য। বিবেকানন্দ-সাহিত্যে এই শক্তি ও লাবণ্যের এক অপূর্ব সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীতাপস বসু বলেন, স্বামীজীর রচনার মধ্যে আমাদের সংস্কৃতির আটপৌরে ভাবটি রয়েছে, যা শিল্পে যামিনী রায়ের ছবিতেও লক্ষ্য করা যায়।

সভাপতির ভাষণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী বলেন, স্বামীজী যে বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন বলেছিলেন, তা তিনি সম্ভব করে তুলেছেন তাঁর বাংলা গদ্যের মধ্য দিয়ে। তাঁর গদ্যভাষায় সব সময়ই একটা গতিবেগ লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজী প্রাণবন্ত চলতিভাষারই শিল্পী ছিলেন। স্বামীজীর পরে চলতিভাষায় অনেক লেখা হচ্ছে, কিন্তু তা যেন জলো, রক্তাল্পতায় ভুগছে।

এই অধিবেশন সমাপ্তির পর আবার বেলা ৩টা থেকে তৃতীয় অধিবেশনের শুরু হয়।

তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার। প্রবন্ধের বিষয় ছিল, 'শ্রীশ্রীমায়ের বাণী : সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি-

কোণে'। প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, মহাজীবন ও অমৃত-বাণীর এক মহাসম্মিলন মায়ের জীবনে। করুণার মহাকাব্য শ্রীশ্রীমা। তাঁর বাণীর আশ্চর্য স্বচ্ছতার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সেগুলি স্বয়ংপ্রভ। তাঁর 'কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।'—এই মহামন্ত্র আগামী দিনের সমাজের বাঁচার মহামন্ত্র।

আলোচনা করেন ডঃ জলধিকুমার সরকার, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, অধ্যাপিকা চামেলী বসু।

ডঃ সরকার বলেন, শ্রীশ্রীমায়ের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি জানতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না, কারণ তিনি সংসারের মধ্যে বাস করেই বহু গৃহী ভক্তকে তাদের সাংসারিক জীবনের নানা সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন। তাঁকে সাহিত্যিক বলে ভাবা মুশকিল সন্দেহ নেই, তবে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী শ্রীশ্রীমায়ের বাণীগুলিকে সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলতে কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীভরদ্বাজ বলেন, জীবনের বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াই করে শুধু বেঁচে থাকাই নয়, এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই মায়ের বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে। তাঁর জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতা-বাদে পরিণত হয়েছে।

ডঃ চামেলী বসু শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মজুমদার বলেন, মায়ের বাচনশৈলী বলতে গেলে বলতে হয় তাঁর বাচনশৈলীতে শব্দচয়নের মুন্সিয়ানার কথা। মায়ের বাণী রাসকিনের ভাষায়—বুকস অফ অল টাইম-এর পর্যায়ভুক্ত। সহগুণের কথা মা সূত্রাকারে বলেছেন তিনটি—'শ, ষ, স'-এর উল্লেখে।

এদিনের পরবর্তী প্রবন্ধ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্ম আন্দোলন' পড়লেন অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি সুলিখিত, সুললিত অথচ যুক্তিপূর্ণ। রামমোহন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত ব্রাহ্ম আন্দোলনের ধারা, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করে এবং বিবেকানন্দ-মানসে ব্রাহ্মধর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথাও উল্লেখ করে ডঃ মুখোপাধ্যায় একটি প্রশ্ন রাখেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন কি ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

আলোচনা করেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ পাল, অধ্যাপক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।

অধ্যাপক সেন বলেন, রামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের যেমন একটা গৌরবময় ভূমিকা ছিল, তেমনি পরবর্তী কালে একটা তিক্ততার সম্পর্কও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন।

অধ্যাপক পাল বলেন, ব্রাহ্ম আন্দোলনকে বিজয়কৃষ্ণে এসে থামিয়ে না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত টেনে আনা উচিত। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে জীবনে প্রয়োগ কীভাবে করা যায় এবং কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ একে সমাজে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তার চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম কীভাবে ক্রমশঃ অবক্ষয়ের পথে গেল বিবেকানন্দ তা বলেছেন।

ডঃ ঘোষ বলেন, উনবিংশ শতকের চিন্তার ক্রমবিবর্তনের আন্দোলনে ব্রাহ্মধর্মের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সে আন্দোলনের ঢেউকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত টেনে আনার যথেষ্ট যুক্তি আছে। ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল মূলতঃ গৃহ-কেন্দ্রিক। পরম সত্যকে পেতে হলে চরম স্বার্থত্যাগ করতেই হবে, সেখানে কোন আপস চলে না। তাই সন্ন্যাস-কেন্দ্রিক রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

আন্দোলনের সঙ্গে ব্রাহ্ম ভাবধারার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তবু ব্রাহ্মসমাজের বহুব্যাপ্ত প্রভাবকে আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে।

এরপর সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মজুমদার বলেন, রামমোহনের বেদান্ত-আলোচনা পুরোপুরি শঙ্করাচার্যপন্থী নয়। দেবেন্দ্রনাথ এ আন্দোলনকে ভক্তিমুখী করেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ অবিদ্যাশক্তি কামিনীকেই ত্যাগ করতে বলেছেন, বিদ্যাশক্তি কামিনীকে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনায় সমগ্র হিন্দুধর্মকে রূপায়িত করলেন। মানবকল্যাণে তাঁর একমাত্র অস্ত্র ছিল প্রেম। ব্রাহ্মধর্ম বনাম হিন্দুধর্ম—এই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক নয়। হিন্দুধর্মের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম একটি শাখা বা সম্প্রদায় মাত্র।

সভাপতির ভাষণের পর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত 'সুরপীঠে'র শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক 'সুরসাধক বিবেকানন্দ' পরিবেশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ কীভাবে সংগীতশিল্পী বিবেকানন্দ হলেন, কী কী গান তিনি গাইতেন—এ সবই সুমধুরভাবে গানে গানে পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

চতুর্থ অধিবেশন। সোমবার, ১৮ই মে, ১৯৮১, বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে। সভাপতি স্বামী প্রভানন্দ। বিষয়: 'বিবর্তনবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ।' প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডারউইন, অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস—এঁদের উল্লেখ করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিবর্তনবাদ সেকালের সবচেয়ে আলোচিত বৈজ্ঞানিক চিন্তা। পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিকদের উল্লেখ করে তিনি দেখান ডারউইনের মতবাদ নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে এখনও চলছে। কিন্তু স্বামীজী একটি নতুন দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—তা হল, ক্রমবিকাশ-ক্রমবিবর্তনের বিপরীতে ক্রমসংকোচনের দিক। অদ্বৈতবেদান্ত কীভাবে বিবর্তনবাদকে ত্রুটিহীন করে তুলতে পারে স্বামীজী তা দেখিয়েছেন।

ডঃ চামেলী বসু, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং ডঃ ধ্রুব মাজ্জিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ডঃ সেনশর্মা বলেন, স্বামীজীর আবির্ভাব উনিশ শতকে, যখন বিজ্ঞান পৃথিবীকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছে। বেদান্তকেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরই দাঁড় করাতে চেয়েছেন বিবেকানন্দ। ডারউইনেরও আগে লামার্ক বিবর্তনবাদ নিয়ে চিন্তা করেছেন। স্বামীজীর বিবর্তনবাদের চিন্তা 'দেববাণী'তেই সর্বাধিক লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধেও এ চিন্তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সভাপতির ভাষণে স্বামী প্রভানন্দ বলেন, স্বামীজীর পরিণামবাদ বিবর্তনবাদ থেকে অনেকখানি ভিন্ন। হাক্সলির ইভলিউশন অফ হিউম্যানের-ও তিনি উল্লেখ করেন। প্রতিযোগিতা-সহযোগিতা-ত্যাগের সঙ্গে স্বামীজীর তত্ত্বের সংমিশ্রণের কথা বলে তিনি বলেন, ত্যাগই হল শ্রেষ্ঠ।

৬টায় স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্যের উপর প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা শুরু হয়। এটিই ছিল এই সম্মেলনের শেষতম প্রবন্ধ। পাঠ করেন ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার। তিনি বিশেষভাবে বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্যের (১) সাহিত্যমূল্যের বিচার ও (২) ক্রমপর্যায়ের বিচার করেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব যে পত্রাবলীতেই বিশেষভাবে প্রকাশিত এ সত্যটি তাঁর প্রবন্ধে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়।

আলোচনা করেন অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, শ্রীতাপসকুমার ভট্টাচার্য।

আলোচনাকারীরা প্রত্যেকেই স্বামীজীর পত্র-সাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতার দিকগুলি

তুলে ধরে এ সম্বন্ধে বাংলাসাহিত্যে যে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন সেকথা মনে করিয়ে দেন।

এরপর স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষে 'বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ' বিষয়ে একটি অনুপম ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, অধিকাংশ পুরাণ-পুরুষদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগলেও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে বুদ্ধই এমন একজন প্রথম ব্যক্তিত্ব যাঁর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই। বুদ্ধের আবির্ভাব ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারত-ইতিহাসের অনন্য ঘটনা বলে মনে হয়। বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত জিনিসকে গ্রহণ করতে হবে—বুদ্ধের এই চিন্তা বিবেকানন্দেও সঞ্চারিত। বুদ্ধ যেমন কোন অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসে প্রশ্রয় দিতেন না, বিবেকানন্দও তা-ই করতেন। বুদ্ধ একজন পরিপূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ছিলেন। বিবেকানন্দও যথাযথ যুক্তি-প্রমাণ ভিন্ন কোন-কিছু গ্রহণ করতেন না। তবে বুদ্ধের অনুগামীরা ভারতকে একটি মঠে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, বিবেকানন্দ তা করেন নি। তিনি একদিকে সন্ন্যাসী ও অন্যদিকে গৃহীদের নিয়ে তাদের দিয়েই নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন।

হিরণ্ময়ানন্দজীর ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবারকার মতো সম্মেলন শেষ হল। বাইরে আকাশে তখন বুদ্ধপূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাঁদ।

শিক্ষাঃ সমস্যা ও সমাধান

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

১

প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির—শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়।'[১] স্বাভাবিকভাবেই তাই স্বামীজী মনে করেন যে, বই পড়া কিংবা নানাবিধ জ্ঞানার্জন যথার্থ বিদ্যা-শিক্ষা নয়। যে-শিক্ষা ইচ্ছাশক্তিকে নিজের বশে আনতে সাহায্য করে সেটাই সত্যিকারের শিক্ষা। যুগ যুগ ধরে যে-কুশিক্ষা আমরা পেয়ে এসেছি, তার ফলে আমাদের ইচ্ছাশক্তির বিশেষ-কিছু আর অবশিষ্ট নেই। আমরা ক্রমশঃ যন্ত্রে পরিণত হয়েছি। এর চেয়ে বড় দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। যান্ত্রিক জীবনের গ্লানি 'সৎ' জীবনকেও কোনো মহিমা দেয় না; বরং নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা উদ্বুদ্ধ যে-'অসৎ' জীবন তার একটা গৌরব আছে।

জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায়গুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একাগ্রতা। বিজ্ঞানীর কাছে প্রকৃতির যে-সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে তাঁর একাগ্রতার জন্য। নিজের মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে তিনি তাঁর পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণাদি কাজে নিবিষ্ট হন, তবেই তাঁর সাফল্য আসে। আমাদের দেশে সাধারণ ছাত্রদের মনের অবস্থা, ফরাসী ভাষায় যাকে বলা হয় 'l'oiseau sur la branche' ('গাছের ডালের উপর পাখি'), তার মতো। কতক্ষণ এক জায়গায় থাকবে কোনো স্থিরতা নেই; হঠাৎ উড়ে গিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরবে। ঠিক

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৯।৪৮১

ঘাসের ডগায় ফড়িঙের মতো। এতে শিক্ষালাভ করা যায় না। সর্বাগ্রে প্রয়োজন, মনঃসংযোগের অভ্যাস করা। এইজন্য প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্যের উপর এত জোর দেওয়া হত। ব্রহ্মচর্য আমাদের মনের শক্তি অনেক বাড়িয়ে দেয়। ছাত্রজীবনে তাই ব্রহ্মচর্যের প্রধান গুরুত্ব উদ্দেশ্যসাধনের উপায়রূপে। স্বামীজীর 'রাজযোগে'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : 'প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে—কিভাবে আঘাত করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয় রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত। সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে একাগ্রতা হইতে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয়, এবং ইহাই রহস্য।'[২]

একাগ্রতা ছাত্রদের চারিত্রিক উৎকর্ষের চাবিকাঠি। আমাদের প্রথমে দেখতে হবে, ছাত্রেরা চরিত্রবান্ হচ্ছে কিনা, নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান্ হচ্ছে কিনা। যে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করেছে কিংবা পরীক্ষায় পাস করেছে, সে প্রকৃত শিক্ষিত নয়। সে-ই প্রকৃত শিক্ষিত যে নিজের শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী, যে নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিতে অটল। এই আধ্যাত্মিক শক্তি থাকলে তবেই দৈহিক শক্তি আসবে, আর দৈহিক শক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সার্থক জীবনে মানসিক ও দৈহিক শক্তির সমন্বয়ের প্রয়োজন। ল্যাটিন প্রবচনে এই আদর্শের কথাই বলা হয়েছে, 'Mens sana in corpore sano' ('সুস্থ দেহে সুস্থ মন')।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করানো। কিন্তু আমাদের দেশে কার্যক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই দেখা যায়। তাকে সাধারণত সব সময় বলা হয়ে থাকে, সে দুর্বল। তার দুর্বলতা, তার অক্ষমতা সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকে তার মাথার মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়, যেটা তার সারা জীবন নষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হীনম্মন্যতা বড় বিষম ব্যাধি। তার বিষ শরীরে একবার প্রবেশ করলে পরিত্রাণের পথ নেই। তাই এই বিষয়ে সাবধান হওয়া সর্বপ্রথম প্রয়োজন। ছাত্রকে বিশ্বাস করানো দরকার যে, সে অনন্ত শক্তির আধার। তার মধ্যে অনন্ত শক্তির বীজকে ধীরে ধীরে মহীরুহে পরিণত করানো তার সব চেয়ে পবিত্র কর্তব্য। এই বিষয়ে শিক্ষক তার সহায়তা করবেন মাত্র। বিবেকানন্দ এ-কথাই বলতে চেয়েছেন : 'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। ...সুতরাং...শিক্ষকের কার্য কেবল পথ থেকে সব অন্তরায় সরিয়ে দেওয়া।'[৩]

২

শিক্ষাই মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারে। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার পর অনেক বছর কেটে গেছে কিন্তু আমরা অনেকে যে নিজেদের মনে-প্রাণে স্বাধীন ভাবতে পারছি না, তার একটা কারণ আমাদের দেশে শিক্ষা ভালোভাবে প্রসার লাভ করেনি। শিক্ষার মূল্য অপরিসীম এবং শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একবার তাই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ অ্যারিস্টট্‌লকে যখন প্রশ্ন করা হয় শিক্ষিতরা অশিক্ষিতদের চেয়ে কত বড়, তিনি উত্তর দেন, 'জীবিতেরা মৃতদের চেয়ে যতটা, ততটা।' শিক্ষাহীন জীবন শুধু নিকৃষ্ট নয়, প্রাণহীনও। শিক্ষার অভাব সমস্ত জাতিকে নিষ্প্রাণ ও শক্তিহীন করে রাখে। সে-ক্ষেত্রে এই রকম অপদার্থ জাতি উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি ও

২ তদেব, ১।২১৭

৩ তদেব, ৬।৪০০

অনাচারের আপাত-রমণীয় পথ ধরেই চলবার চেষ্টা করে। অন্যান্য জাতির কাছে বারংবার ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশই প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে সে-সব দেশ নূতন করে নিজেদের সৃষ্টি করেছে এবং আরও কয়েক বছরের মধ্যে সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে পৌছেছে। আর আমরা? শুধু যে যে-তিমিরে ছিলাম সে-তিমিরেই রয়ে গেছি তা নয় বরং গভীরতর অন্ধকারের মুখোমুখি। অন্য সব শিক্ষিত দেশ যেখানে পরিশ্রমের কঠিন সরণিতে উন্নতির লক্ষ্যে যেতে পেরেছে, আমাদের অশিক্ষিত দেশ সেখানে আরামের অনায়াস-পথে অবনতির অতলে ডুবতে বসেছে। মূর্খেরাই শুধু জানে না যে, জীবনের সব-কিছু ভালো জিনিস—তা পার্থিব স্তরেই হক বা অন্য স্তরে—মূল্য দিয়ে পেতে হয়। সহজ পথে চলতে চাইলে শুধু পাকের মধ্যে পড়তে হয়—এগিয়ে যেতে পারা যায় না।

শিক্ষাকে যে-গুরুত্ব আমাদের মতো অনগ্রসর দেশে দেওয়া উচিত, তা দেওয়া হয়নি। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? কোনো কোনো সময় আবার লোক-দেখানো যে-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা সুশিক্ষা নয়, কুশিক্ষা। আর এই কুশিক্ষা অশিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী সাংঘাতিক। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো বিশেষ ধরনের একমুখী শিক্ষাদানের মাধ্যমে জাতিকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হয়। শিশুকে শিক্ষাদানের সময় সর্বপ্রথম দেখা দরকার তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাতন্ত্র্য আমরা মেনে নিচ্ছি কিনা এবং তাকে স্বাধীনভাবে ভাবতে দিচ্ছি কিনা। কতকগুলি বাইরের জিনিস তার উপর জোর করে চাপিয়ে দিলে তার যে-ক্ষতি করা হয়, তা চিরদিনের জন্য অপূরণীয় থেকে যায়। তার মনের সুকুমার অঙ্কুর শিক্ষার আলোকে ধীরে ধীরে বিকশিত হবে, এইটাই হওয়া উচিত। আমাদের দেশে কিন্তু এটা একেবারেই হয় না। যতক্ষণ না এর প্রতিকার হচ্ছে, ততক্ষণ দেশের উন্নতি কোনো-ভাবেই সম্ভব নয়। আমার চেয়ে, আমার দলের চেয়ে, আমার দেশ বড়—জন্মভূমি, জননীর মতোই, স্বর্গাধিক গরীয়সী—এ-বোধ আজ অন্তর্হিত হয়েছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এ-উক্তি আমাদের কবিই করেছেন। এই সত্য নানাভাবে লঙ্ঘন করে এখন এর মর্যাদা দেওয়া হয়। প্রত্যেক মানুষের পৃথক্ ব্যক্তিসত্তার মূল্য পাশ্চাত্য জগতে যখন প্রথম স্পষ্টভাবে পূর্ণরূপে স্বীকৃত হল, তখন সেখানে প্রলয় ঘটে গেল ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তার প্রায় দুশো বছর পরেও ভারতবর্ষে ব্যষ্টি ও সমষ্টি একাকার রয়ে গেছে।

৩

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য দুটি—মানুষকে তার নৈতিক জীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে সার্থকতার জন্য প্রস্তুত করা। বর্তমানে আমাদের দেশে যে-শিক্ষা ও শিক্ষাধারা প্রচলিত আছে, তাতে এর কোনোটিই হচ্ছে না। সুতরাং ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন, ছাত্রেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে বলেই তাদের আমরা প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারছি না। অন্যেরা বলেন, প্রকৃত শিক্ষা না পাওয়ার জন্যই ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা। তর্কের এই 'পাপাবর্তে' প্রবেশ না করেও আমরা বুঝতে পারছি, শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই সংস্কার সাধিত না হলে পদে পদে মৃত্যু বন্ধ করা যাবে না। আর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, মানুষের মৃত্যুর চেয়ে মনুষ্যত্বের মৃত্যু অনেক বেশী পীড়াদায়ক।

এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে ভাবা উচিত প্রাথমিক শিক্ষার কথা। এটা সত্যই লজ্জার বিষয় যে, আমাদের দেশে কোটি কোটি মানুষ আজও নিরক্ষর এবং সমাজের সর্বস্তরে ও দেশের প্রতিটি প্রান্তে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার পর্যন্ত ব্যবস্থা করতে পারিনি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, ছাত্রদের মাতৃভাষা-পরিচয়। মাতৃভাষায় তাদের যাতে কিছুটা অধিকার আসে, সেটা দেখতে হবে। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে এটা সম্ভব নয়। আমরা ছাত্রদের জন্য প্রশ্ন দিই, 'অমুক কবিতার সারাংশ লিখ।' তারা এই ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হয়েই আসে। বাজারে যে-সব 'অর্থপুস্তক' পাওয়া যায়, তাতে 'সারাংশে'র ছড়াছড়ি। ছাত্রেরা সাধারণত বাড়ী থেকে এই সব 'সারাংশ' মুখস্থ করে এসে পরীক্ষার খাতায় লিখে দেয়। ফলে ছোটবেলা থেকেই তাদের নিজেদের রচনা-শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁরা ছাত্রদের নিজেদের লেখায় ভুল থাকার জন্য তাদের অন্যের লেখা মুখস্থ করতে প্ররোচিত করেন। ভুল করার এই ভয় ছাত্রদের মনে ছোটবেলা থেকে ঢুকিয়ে দেওয়ার কুফল তাদের সারা জীবন ভোগ করতে হয়। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও তারা নিজেরা ভাবতে ও লিখতে ভয় পায় এবং 'অর্থপুস্তকে'র সন্ধানে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে। মিথ্যা রোখবার জন্য দ্বার বন্ধ করতে গেলে সত্যের প্রবেশও রুদ্ধ হয়ে যায়। ভুল করা কোনো অপরাধ নয়, কিন্তু সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টা না করা অপরাধ। শুদ্ধ উত্তর লেখবার শক্তি যাতে ছাত্রেরা অর্জন করতে পারে, সেজন্য শিক্ষকের যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন, এবং তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে যে, অশুদ্ধ উত্তরের পরিক্রমা শেষ হলে তবেই ছাত্র শুদ্ধ উত্তরে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

শিক্ষককে আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে। তিনি যদি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন না করতে পারেন, তা হলে তাঁর পক্ষে ছাত্রদের সঙ্গে কোনো আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে না। আর এই যোগাযোগ না থাকলে তিনি যেটা ছাত্রদের শেখাবেন, সেটা তারা গ্রহণ করতে অক্ষম হবে। তিনি শুধু তাঁর বিদ্যার ভারবাহী হয়ে থাকবেন, প্রয়োগ করতে পারবেন না। 'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে', এ-কথা গায়ক ও শ্রোতার সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যখন পরস্পর মিলতে পারবেন, তখনই শিক্ষক তাঁর শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে সার্থকভাবে সঞ্চারিত করবেন।

ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেতে হলে শিক্ষককে চরিত্রবান্ হতে হবে। কখনো কখনো শোনা যায়, সমাজের চারদিকেই যখন দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতার আতিশয্য, তখন আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে কিভাবে চারিত্রিক বিশুদ্ধি আশা করতে পারি? তা ছাড়া, চরিত্রবল তো সকলের জন্য নয়। ঠিক কথা, কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে, শিক্ষকের বৃত্তিও সকলের জন্য নয়। যাঁরা কোনো আদর্শে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের জন্য অনেক বৃত্তি রয়েছে। যদি তাঁরা অর্থকেই পরমার্থ মনে করে থাকেন, তা হলে তাঁরা শিক্ষকের জীবন কেন বেছে নেবেন? ব্যাঙ্কের একজন করণিক একজন শিক্ষকের চেয়ে বেশী উপার্জন করেন এবং যাঁরা পুঁথিগত বিদ্যা ভালোভাবে অর্জন করেছেন, তাঁদের পক্ষে ব্যাঙ্কের চাকরী পাওয়া খুব

একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

যে-কোনো সভ্য দেশ বা সভ্য সমাজ শিক্ষকদের কাছ থেকে অন্তত চারিত্রিক দৃঢ়তা আশা করবেন। শিক্ষক যদি নীতি না মানেন, তা হলে আমরা পথ-নির্দেশের জন্য কার কাছে যাব? শিক্ষকেরা নিজেরা যদি মেরুদণ্ডহীন হন, তা হলে তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে তাঁরা শক্তিসঞ্চার করতে পারবেন না, তাদের মধ্যে তাঁরা নিজেদের দুর্বলতা সংক্রামিত করবেন মাত্র। পারিপার্শ্বিকে, পরিবেশে এবং আবহাওয়ায় যত অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকুক না কেন, শিক্ষককে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, সাধারণ মানুষের মতো টলে গেলে চলবে না। বৃক্ষ ও পর্বতে পার্থক্য কি রইল যদি ঝড় এসে উভয়কেই নাড়া দিয়ে গেল?

পত্রাবলী ও নানা রূপের বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন

বাংলায় প্রকাশিত স্বামীজীর পত্রাবলীর পত্র-সংখ্যা ৫৭৬। পত্রগুলিকে স্বামীজীর মানস-দর্পণ-রূপে ব্যাখ্যা করলেও অত্যুক্তি হবে না, কেননা এই পত্রগুলি থেকে নানা রূপের বিবেকানন্দের একটি জ্যোতির্ময় মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের হৃদয় আপ্লুত করে। কি ভাষার দীপ্তিতে, কি বিচারের তীক্ষ্ণতায়, কি সহৃদয়তার বিস্তৃতিতে এই পত্রগুলি যে কোন দেশের, যে কোন সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গণ্য হবে। রবীন্দ্রনাথের মানস-লোকের সন্ধান যেমন তাঁর অপূর্ব 'ছিন্নপত্রাবলী' ও অসংখ্য পত্রে সহজলভ্য, স্বামীজীর এই পত্রগুলিও তাঁর মানস-লোক ও চেতনা, তাঁর ধ্যান ও ধারণার উদ্ভাসিত প্রকাশ। বিবেকানন্দ কে? তিনি কি চেয়েছিলেন? তিনি তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেছিলেন?—সব কিছুরই সুষ্ঠু, সুন্দর, প্রাঞ্জল উত্তর এই পত্রগুলির ভেতরই নিহিত আছে। স্বামীজীর জীবনী রচনা করতে গিয়ে বহু মনীষী তাঁদের বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের ব্যাখ্যায় সুদীর্ঘ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, সেকথা অনস্বীকার্য। তবুও নিতান্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে হবে যে, স্বামীজীকে জানার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পথ হল তাঁর নিজস্ব রচনা পাঠ। কারণ, সে রচনার দিব্যশক্তি যে কোন ব্যক্তির মর্মস্পর্শ করে এবং তাকে এক নতুন জীবন ও জগতের সন্ধান দেয়। সব মহৎ সাহিত্যের সে শক্তি আছে—স্বামীজীর এই পত্রগুলিই তার প্রমাণ। এই সব পত্রে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের যে বিভিন্ন রূপ বা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে—সব কিছুর বিশ্লেষণ হয়তো একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তবুও বিক্ষিপ্তভাবে এই বিশ্লেষণের একটি পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা আশা করি মার্জনীয় হবে।

স্বামীজীকে যখনই আমরা ধ্যানে আনবার চেষ্টা করি, তখনই তাঁর তেজোদীপ্ত বীরত্বব্যঞ্জক চিকাগো ধর্মমহাসভার সর্বজয়ী চিত্রেরই কল্পনা করি—তাঁর করুণাঘন রূপ, সমাজের সর্ব-ঘৃণ্য মানুষদের প্রতি তাঁর দয়ার্দ্র সহৃদয় রূপের কথা আমরা স্মরণ করি না। অথচ পত্রাবলীর দ্বিতীয় ভাগে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্রটি (পৃঃ ১২৬-১২৯, তারিখ: ২৩।৮।১৮৯৬) তাঁর এই করুণাঘন রূপটিকে কি সুন্দরভাবেই না প্রকাশ করেছে। তিনি লিখছেন, 'বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় ত কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।…যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ

ছোটলোক ভাবে, তাহাদের…সংখ্যা যতই কম হয় ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে, নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর, ডাকাত, সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার।' এই পত্রটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আমাদের সকলকেই আহ্বান করে তাঁর করুণার ভাণ্ডার আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন এক অপূর্ব দয়ার্দ্র আহ্বানে। এই পত্রটি যেন আমাদের পরম ভরসা, চরম নিশ্চিন্ততার একটি দলিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি—সেটিকে জানার ও উপলব্ধি করার পথ-নির্দেশ এই পত্রাবলীতেই নিহিত আছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত একটি পত্রে স্বামীজী লিখছেন, 'দর্শন বিজ্ঞান বা অপর কোন বিদ্যার সহায়তা না লইয়া এই মহাপুরুষই জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সত্যের এই তথ্য প্রচার করিলেন যে, "সত্য সকল ধর্মে নিহিত আছে", শুধু ইহা বলিলেই চলিবে না, প্রত্যুত সকল ধর্মই সত্য; আর এই তথ্যই জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।' (১ম ভাগ, পৃঃ ১৩৬, তারিখ: ২৯।১।১৮৯৪)। 'সকল ধর্মই সত্য' এই তত্ত্বটিকে জানাই যথেষ্ট নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর সকল ধর্মকে জীবনে গ্রহণ করে সেগুলির সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং এখানেই তিনি অনন্য। তাই স্বামীজী ঐ পত্রেরই একাংশে লিখছেন, 'আমরা যে প্রত্যেকটি ধর্মমতকে শুধু বরদাস্ত করি তাহা নহে, পরন্তু উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকি এবং সেই তত্ত্বই প্রভুর সহায়তায় জগতে প্রচার করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি।' (১ম ভাগ, পৃঃ ১৩৭)। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত একটি ইংরাজী পত্রে তিনি লিখেছেন, 'Perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform.' (১ম ভাগ, পৃঃ ৩০৬, সাল: ১৮৯৪)। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন শুধু সহনশীলতার মহান আদর্শের জন্য বিশিষ্ট নয়, এর বৈশিষ্ট্য সর্ব-ধর্মের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে নিহিত এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন যুগোপযোগী ও সার্থক। এই আন্দোলনকে শুধু মাত্র 'সংস্কার' বা 'reformist' আন্দোলনের দৃষ্টিতে বিচার করা ভ্রান্ত।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' যা কিনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের একটি মহৎ অবদান, সেই সেবাধর্মের আহ্বান এই পত্রাবলীর বহু পত্রেই বিধৃত রয়েছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীআলাসিঙ্গা, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত বহু পত্রে এই সেবাধর্মের স্বরূপকে তিনি বার বার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখছেন, 'বসে বসে রাজভোগ খাওয়া আর "হে প্রভু রামকৃষ্ণ" বলায় কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পার।' (১ম ভাগ, পৃঃ ৩১১, সাল: ১৮৯৪)। সর্বস্ব ত্যাগের নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি আর একটি পত্রে লিখছেন, 'তুমি যদি তোমার নিজের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর, সে আর কি ত্যাগ হল? তুমি কি জগতের কল্যাণের জন্য তোমার নিজের মুক্তিকামনা পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ? তুমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ—একথাটা ভেবে দেখ।' (১ম ভাগ, পৃঃ ২৯৩, তারিখ: ৩০।১১।১৮৯৪)। 'জীবসেবা'র কর্মযজ্ঞে যোগ দেবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি আর একটি পত্রে বলছেন, 'Onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে।…যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী তাপী, কীট পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে

তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন।' (১ম ভাগ, পৃঃ ২০৩-২০৪, সাল: ১৮৯৪)। কর্মযজ্ঞের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণকে তিনি বলেছেন 'জীবন', কর্মবিরতি হল, 'মৃত্যু'। তাঁর ভাষায়: 'Life is ever expanding, contraction is death—যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েশ খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নেই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র।' (তদেব, পৃঃ ২০২-২০৩)।

স্বামীজী দারিদ্র্য বোঝাতে শুধু অন্নবস্ত্রের দারিদ্র্যের কথা বলেন নি; তিনি চেয়েছিলেন আপামর জনসাধারণের মনের দারিদ্র্যও দূর করতে, আর তাই তিনি বহু পত্রে তাঁর গুরুভাই অথবা ভক্তদের বার বার নির্দেশ দিয়েছেন বাস্তবানুগ শিক্ষা বিস্তার করতে। পরম বিস্ময়ের কথা, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও তিনি যে পদ্ধতি ও উপায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সে পদ্ধতিকে সর্বোৎকৃষ্টরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন, 'গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু Chemical (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর—কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, তাই চেষ্টা কর—সন্ধ্যেয়, ঘরে দিন দুপুরে। কত গরীব মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর—পার কি? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া?' (তদেব, পৃঃ ১৯৬-১৯৭)। শিক্ষাকে সর্বত্রগামী করার উদ্দেশ্যে বার বার 'ঘরে ঘরে' বাড়ীতে বাড়ীতে শিক্ষা প্রসারের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন—তাঁর সকল অনুগামীদের। মাদ্রাজী ভক্তদের একটি পত্রে তিনি লিখছেন, '…শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরিবের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্মের বিস্তার—এই ভাবগুলি প্রচার করিতে থাক।' (১ম ভাগ, পৃঃ ১৩২, তারিখ: ২৪।১।১৮৯৪)। জীবকল্যাণের ব্রত যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সাধিত হবে, সেকথা তিনি বার বারই উল্লেখ করেছেন এবং সে বিচারে এই পত্রাবলী অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হবার দাবি রাখে।

স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে স্বধর্মে ও সত্যধর্মে যেমন প্রতিষ্ঠিত হতে বলেছেন, তেমনি তাদের কূপমণ্ডূকতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই পত্রগুলিতেও তার পরিচয় আমরা পাই। এ বিষয়ে শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখিত ২রা নভেম্বর ১৮৯৩-এর একটি পত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন কোন ভারতীয় সাধক ও মনীষী যে সংস্কারসাধনে সচেষ্ট হয়ে ততদূর সাফল্য লাভ করতে পারেন নি তার একটি সুচিন্তিত কারণ স্বামীজী নির্দেশ করেছেন। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে স্বামীজীর মন্তব্যের সারবত্তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ঐ পত্রের একস্থানে তিনি লিখছেন, 'হিন্দু যেন কখনও তাহার ধর্ম ত্যাগ না করে।' (১ম ভাগ, পৃঃ ১২১)। ধর্ম বলতে তিনি এখানে সামাজিক ও লৌকিক আচার ও বিধানকে গ্রহণ করেন নি। এবং সঠিকভাবেই 'জাতিভেদ' প্রথাকে ধর্মের প্রতিফলনরূপে গ্রহণ না করে সামাজিক রীতিনীতির অর্থহীন অসার ও স্বার্থপর প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখছেন,

'বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই একসঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে।' (তদেব)। এই জাতিভেদের পূতিগন্ধময় নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের পথনির্দেশরূপে তিনি ব্যক্তি-মানসের 'স্বাতন্ত্র্য' অর্জনের প্রয়োজনের কথা ঐ পত্রে উল্লেখ করেছেন। এই ব্যক্তি-মানসের স্বাতন্ত্র্য অর্জন ব্যতিরেকে জাতিভেদের নাগপাশ যে ছিন্ন হবে না, তা আজকের দিনে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হতে চলেছে। সাংবিধানিক পরিবর্তন তখনই সফল হবে যখন ব্যক্তি-মানসের স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগরিত হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীআলাসিঙ্গাকে লিখিত ২০শে অগস্ট ১৮৯৩ সালের আর একটি পত্রের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখছেন, 'হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক" নামক মত দ্বারা সর্ব-প্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।' (তদেব, পৃঃ ১০৯)। সমাজের এই অবস্থার দূরীকরণের উপায়রূপে তিনি ঐ পত্রেরই একস্থানে লিখছেন, 'সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান উপদেশ-সমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দু-ধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া।' (তদেব, পৃঃ ১০৮-১০৯)।

স্বামীজীর চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাঁর আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনা। এই বিশেষ সম্পদটি না থাকলে দেবপুরুষে রূপান্তর সম্ভব হয় না। স্বামীজী পরম সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই পত্রগুলিতেও তার পরিচয় আছে। পত্রাবলীর দ্বিতীয় ভাগে মিঃ ফ্রানসিস্ লেগেটকে লেখা একটি পত্রে তিনি লিখছেন, 'তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি, সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবল প্রতাপশালী এঙ্‌লো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান বলে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্যন্ত ভালবাসতে পারব।' (২য় ভাগ, পৃঃ ১০৪, তারিখ : ৬।৭।১৮৯৬)। পত্রের প্রথম পর্বে যে অসহিষ্ণুতার গ্লানির তিনি উল্লেখ করেছেন, তা থেকে উত্তরণের উপলব্ধি, আত্মবিশ্লেষণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্তরূপে, এই পত্রটিকে মূল্যবান করে তুলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কিনা তিনি আমাদের অকৃপণভাবে দান করেছেন নিজের জীবনের দৃষ্টান্তে, তা হল ঈশ্বরচরণে পরম ঐকান্তিক ভক্তিনম্র আত্মসমর্পণ। কলিযুগের সহজ সাধন এই নারদীয় ভক্তি—কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরচরণে আত্মনিবেদন—স্বামীজীও একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই উল্লেখ তিনি করেছেন মিসেস বুলকে লেখা একটি পত্রে। তিনি লিখছেন, 'হে আমার শিব, তুমিই আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ।…তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার নিয়ন্তা, তুমিই আমার শরণ, তুমিই আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, আমার যথার্থ স্বরূপ।' (১ম ভাগ, পৃঃ ৪০৭, তারিখ। ১৭।৪।১৮৯৫)।

এই আত্মনিবেদনের সুরটি পত্রটির শেষাংশটিকে একটি সুন্দর ভক্তি-সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' দেশমাতৃকার যে রূপ-কল্পনা করেছিলেন, যে মাতৃদেবীর প্রতি ভারত-বাসীকে 'ভালবাসা'র মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছিলেন—উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মনীষা তার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। স্বামীজীর 'দেশ-সেবা' নিছক কর্তব্য কর্মের শুষ্ক অভিব্যক্তি নয়—তিনি 'দেশমাতৃকা'কে, . দেশবাসীকে অকৃত্রিম ভালবাসায় সিঞ্চিত করেছিলেন এবং তিনি জানতেন, ভালবাসার মন্ত্রের মাধ্যমেই ভারত ও ভারতবাসীর বন্ধনমুক্তি
এ বিষয়ে পত্রাবলীর দ্বিতীয় ভাগে ভারতী-সম্পাদিকাকে লেখা পত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি লিখছেন, '…আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রী-কাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।' (২য় ভাগ, পৃঃ ১৯০, তারিখ : ৬।৪।১৮৯৭)।

১৮৯৪ সালে চিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামীজী যে পত্র (১ম ভাগ, পৃঃ ৩০২-১০) লিখেছিলেন, তাতে নিজেকে বলেছেন, 'I want to be a voice without a form.' শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন মায়ের কাছে প্রার্থনায় জানাতেন, 'মা, আমি লোকমান্য চাই না'—স্বামীজীও ঐ পত্রে বলছেন, 'এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই।' ঠাকুরের মত তিনিও বলছেন, 'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্র দ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন।' বৃহত্তর সেবা-কর্মের ক্ষেত্রে তিনি সন্ন্যাসী-গৃহী ভেদাভেদ ঘুচিয়ে সকলকেই একই কর্মযজ্ঞে যোগ দিতে আহ্বান করেছেন। ঐ পত্রের আর একটি স্থানে লিখছেন, 'আমাদের একটা বড় দোষ—সন্ন্যাসের গরিমা। ওটা প্রথম প্রথম দরকার ছিল, এখন আমরা পেকে গেছি, ওটার আবশ্যক একেবারেই নাই।… সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ কোন ভেদ থাকিবে না, তবে যথার্থ সন্ন্যাসী।' কথাটি খুবই তাৎপর্যময়, সন্দেহ কি!

যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জাতীয় নেতার মত স্বামীজী ভারতবাসী ও বিশেষভাবে বাঙ্গালী জাতিকে চারিত্রিক ও মানসিক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে বাক্যের কশাঘাতের কার্পণ্য করেন নি। এখানে তিনি স্নেহবিগলিত করুণাকে বিসর্জন দিয়ে রুদ্ররূপে জাতিকে আত্মসচেতন করতে চেয়েছেন এবং জাতীয় চরিত্রের দৈন্যকে নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা শেষোক্ত যে পত্রটি থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেই পত্রেই তিনি পরম ক্ষোভের সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে লিখছেন, 'We are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus.' জাতির চেতনা সঞ্চারে এই ধরনের ভর্ৎসনার প্রয়োজন হয়তো তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

'কর্মই জীবন' এই তত্ত্বটি স্বামীজীর জীবনে যত যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, বহু মনীষী বা দেবপুরুষের জীবনে ততখানি সত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। তথাপি তিনি যে সপ্ত ঋষির এক ঋষিরূপে এই ধরাধামকে পবিত্র করতে ক্ষণকালের জন্য এসেছিলেন, তাঁর জীবনের ধ্রুব

লক্ষ্য যে পরমাত্মায় বিলীন হওয়া—কর্মকাণ্ডের ধূম্রজাল থেকে পরম শান্তির মধ্যে নির্বাণ লাভ করা, তাঁর এই জীবন-বেদের পরিচয় তাঁর অনুরাগিণী জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লেখা অপূর্ব কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত একটি পত্রে তিনি নিজেই দিয়েছেন, 'বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে!···হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র···আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী; এত যে দুঃখ ভুগেছি, তাতেও খুশী; জীবনে কখন কখন বড় বড় ভুল যে করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী।' (২য় ভাগ, পৃঃ ৪১৭, তারিখ: ১৮।৪।১৯০০)। কর্ম-ক্লান্ত, নির্বাণলাভেচ্ছুক স্বামীজী ঐ পত্রের আর এক অংশে লিখছেন, 'শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!' (তদেব, পৃঃ ৪১৮)।

পত্রাবলীর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে বিকশিত নানা রূপের বিবেকানন্দ—কোথাও করুণার অবতার, কোথাও রুদ্র সন্ন্যাসী, কোথাও শিক্ষাদাতা, কোথাও জাতীয়-চেতনার উদ্গাতা, কোথাও তাঁরই ভাষায়, 'গুরু, নেতা, আচার্য'। সব ছাপিয়ে মানুষ বিবেকানন্দের রূপটিও ভোলবার নয়। মানুষ বিবেকানন্দ আশ্রয়দাতাদের আশ্রয়ের ঋণ স্বীকার করে লিখছেন, 'রাখাল, ঠাকুরের দেহ-ত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে—হাবাতে (গরীব ছোঁড়াগুলো) মনে করে; কেবল বলরাম, সুরেশ, মাষ্টার ও চুনীবাবু এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।' (২য় ভাগ, পৃঃ ৪৭-৪৮, সন: ১৮৯৫)। পরিহাস-সমুজ্জ্বল মানুষ বিবেকানন্দকেও পাই এই পত্রাবলীতে আর সেই পরিহাস—পরম নির্মল কৌতুক—নিজেকে নিয়েই, অপরের দুর্বলতা নিয়ে বিদ্রূপের নির্মম কশাঘাত নয়। একটি পত্রে আমেরিকায় তাঁর বাগ্মিতার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে পরম কৌতুকের সঙ্গে লিখছেন, 'আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; "মধো তোর পেটে এতও ছিল!!"' (১ম ভাগ, পৃঃ ২০১, সন: ১৮৯৪)। নিজের অসাধারণ সাফল্যকে এইভাবে কৌতুকে মিশ্রিত করার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। নিজের রন্ধনশিল্পে পারদর্শিতা নিয়ে আর একটি পত্রে যে পরিহাস-পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন সেটি উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করা কঠিন। লিখছেন, 'কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম। জাফরান, লেভেণ্ডার, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, পেঁয়াজ, কিসমিস, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাউল—এই সবগুলি মিলিয়ে এমনই সুস্বাদু খিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে, নিজেই গলাধঃকরণ করতে পারি নি!' (২য় ভাগ, পৃঃ ৯৫-৯৬, তারিখ: ৩০।৫।১৮৯৬)। এই পরিহাস-রসিক সহজ মানুষ বিবেকানন্দ আর হিমাদ্রিশিখরের ন্যায় ধ্যানগম্ভীর স্বামীজী—সব রূপেরই প্রকাশ রয়েছে এই পত্রসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে। তাই এই পত্রাবলী আমাদের মহামূল্য জাতীয় সম্পদ। অনাগত কালেও দেশবিদেশের অসংখ্য মানুষ এই পত্রাবলী পাঠ করে নানা রূপের বিবেকানন্দের জ্যোতির্ময় মূর্তির উদ্দেশে শতসহস্র প্রণাম নিবেদন করবে।

স্বামীজীর সমন্বয়বাণী

অধ্যাপক সেন

মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁ স্বামী বিবেকানন্দের যে মহাজীবনী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বামীজীর অসামান্য প্রতিভার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন-প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সকল পথের কথা তিনি বলিয়াছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকটিরই স্ব স্ব সীমা ছিল, কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটি পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চার ঘোড়ার গাড়ীর মতো সত্যের চারিটি পথের বল্গাকে তিনি ধরিয়া থাকিয়া একই সঙ্গে সেই চারিটি পথের ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।' ('বিবেকানন্দের জীবন' —ঋষি দাস অনূদিত, পৃঃ ২৫৫)।

সমন্বয়ের বাণীমূর্তিরূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, জীবনের কোন সম্পদকে পরিত্যাগ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে মানবাত্মার যে বিরাট ঐশ্বর্য যুগে যুগে বিকশিত হইয়াছে, তাহার কোন অংশকেই পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহার গুরুর ন্যায় তিনিও সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে তাই আপনার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর এক কবি-মনীষী স্বামীজীর এই ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা রোমাঁ রোলাঁর মন্তব্যেরই সমর্থন করিতেছে। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারবতর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।' (রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৫)।

স্বামী বিবেকানন্দ যে যুগে জন্মিয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সর্বময় প্রভুত্বের যুগ। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সে যুগে দাসজাতির সংস্কৃতি বলিয়া সভ্যসমাজে অস্বীকৃত ও ঘৃণিত। বিবেকানন্দ স্বয়ং এই ঘৃণা ও অস্বীকৃতিকে সবলে অপসারিত করিয়া পাশ্চাত্য জগতে সর্বপ্রথম ভারত-সংস্কৃতিকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, কোন একটি মাত্র ধর্ম পৃথিবীতে বর্তমান থাকিবে এবং অপর সকল ধর্ম বিদূরিত হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায়ের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বাঁচিবার অধিকার আছে।

ধর্মের ন্যায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তিনি এই একই মত পোষণ করিতেন।

জীবন সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টি যেমন গভীর

তেমনি বিস্তৃত ছিল। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়—'তাঁহার অতি শক্তিশালী দেহ, তাঁহার অতি বিরাট মস্তিষ্ক আগে হইতেই তাঁহার বাত্যা-ব্যাকুলিত আত্মার রণক্ষেত্ররূপে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানে অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, স্বপ্ন ও কর্ম স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম-শক্তি এতোই অধিক ছিল যে, তাঁহার নিজের স্বভাবের এক অংশকে বা সত্যের এক অংশকে বিসর্জন দিয়া কোনরূপ সংগতি-বিধান তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।' ('বিবেকানন্দের জীবন', ঋষি দাস, পৃঃ ৪)।

সত্যকে তিনি তাহার সমগ্রতায় গ্রহণ করিতেন, আংশিকভাবে নহে। ব্যক্তিকে এবং জাতিকে তিনি তাহার সমগ্র চরিত্রের বিকাশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতেন। ব্যক্তি বা জাতি—কাহারও চরিত্রকে খণ্ডিত করিয়া গ্রহণ করিবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকে স্বামীজী বলিয়াছেন—'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যেদিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইউরোপীদের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হ'লে সংসার চলবে না।' ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃঃ ৩-৪)।

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বাণী তাই স্বামীজী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। ফরাসী, ইংরেজ ও হিন্দু এই তিন জাতির জাতীয় চরিত্র তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। ইংরেজ-চরিত্রে তিনি লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন ব্যবসাবুদ্ধি; আদান-প্রদান ও যথাভাগ ন্যায়বিভাগ। আর হিন্দুর জাতীয় চরিত্রে তিনি দেখিয়াছিলেন পারমার্থিক স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রাধান্য। তাঁহার ভাষায়—'সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছা-রূপে বিকাশ হয়েছে।' ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃঃ ২২)।

সংস্কৃতি-বিচারের ক্ষেত্রে স্বামীজী অসহিষ্ণু বিরুদ্ধ ভাবকে প্রশ্রয়দানে বিমুখ ছিলেন। তাঁহার মতে—'প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে; সেইখানটা হ'তে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।' ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', পৃঃ ৮৮)।

বর্তমান পৃথিবীতে কোন একটি মাত্র জীবনতন্ত্র বা জীবনাদর্শকে সর্বত্র প্রচলিত করিবার উগ্র প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং জাতিগত স্বাধীনতাকে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিদ্বেষবহ্নি ও মারণাস্ত্র সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এই প্রচেষ্টা। ইহা মানবজাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকেই বিনষ্ট করিবার পথ উন্মুক্ত করিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের মধ্যেই এই সঙ্কটের সমাধান নিহিত। স্বামীজীর মহামন্ত্রেই এই সমাধানের সূচনা।

ধর্মের ক্ষেত্রে ও জাতির ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যেককে স্বাধীনতা ও সমমর্যাদাদানের কথা স্বামীজী

প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি সমাজের ক্ষেত্রেও তিনি এই স্বকীয়তা ও সমমর্যাদার প্রচারক ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, শাসন-পরিচালনায় রাজা যেরূপ দক্ষতা দেখাইতে পারেন, সেইরূপ পাদুকা-নির্মাণে মুচিও তাহার দক্ষতা প্রমাণিত করে। সমাজের পক্ষে যেমন শাসন-পরিচালনা প্রয়োজনীয়, তেমনি তাহার পক্ষে পাদুকা-নির্মাণেরও প্রয়োজন আছে। আপন আপন ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই গুরুত্ব আছে। অতএব কাহাকেও হেয়জ্ঞান করা চলে না। সমাজের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে সকল প্রকার বৃত্তিরই মূল্য আছে। সামাজিক সমদৃষ্টির ইহাই মূল কথা।

সুগভীর চিন্তাশীলতার সহিত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া স্বামীজী ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, মানব-ইতিহাসে বিবর্তনের ধারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি যুগ-সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই চারিটি যুগের প্রত্যেকটির নিজস্ব দোষ ও গুণ কি তাহাও স্বামীজী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কোন যুগটিকেই তিনি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন বিবেচনা করেন নাই। তিনি কল্পনা করিতেন এমন একটি রাষ্ট্রগঠনের, যাহাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইবে, কিন্তু উক্ত চারিটি যুগের দোষগুলি তাহার মধ্যে স্থান পাইবে না। মানব-ইতিহাসে এইরূপ একটি পূর্ণ পরিণতির যুগের আবির্ভাব সম্ভব কি?—এই প্রশ্নও তিনি তুলিয়াছেন। এক কথায় তিনি ইহার উত্তর দেন নাই। ইহার উত্তর তাঁহার অমর বাণীর মধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকাশলাভ করিয়াছে।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে মানবজীবন তিনটি স্তরে বিভক্ত—জৈবিক, সামাজিক ও আত্মিক। দেহ-জীবনের দিক হইতে মানুষ একটি জীব মাত্র। কিন্তু ইহা তাহার জীবনের প্রাথমিক স্তর। ইহার পরবর্তী স্তরে মানুষের জীবন সামাজিক ক্ষেত্রে প্রসারিত। সে কেবল দেহধারী জীব নহে, সে সামাজিক জীবের সকল বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এই স্তরেই মানবজীবনের সীমারেখা টানা যায় না। মানবজীবনের আরও একটি গভীরতর ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে—সে স্তর আত্মিক স্তর। মানুষ প্রকৃতপক্ষে অজর, অমর আত্মা। জন্মে যাহার আরম্ভ এবং মৃত্যুতে যাহার শেষ, এইরূপ একান্ত পার্থিব জীবরূপে স্বামীজী মানুষকে দেখেন নাই। মানুষের একটি অনন্ত সত্তা আছে। ইহাই মানবজীবনের পারমার্থিক সত্য। এই সত্যকে বাদ দিয়া যাহা কিছু ভাবা যায় বা করা যায়, তাহাতে বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা অস্বীকৃত।

এইজন্য স্বামীজী কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে এবং জীবনানুভূতির ক্ষেত্রেও—কোথাও গোষ্ঠীর প্রভুত্বকে শিরোধার্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। 'My Life and Mission' বক্তৃতায় তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—'That is a glorious thing, that there should be so many paths, because if there were only one path, perhaps it would suit only an individual man. The more the number of paths, the more the chance for every one of us to know the truth. If I cannot be taught in one language, I will try another, and so on.' (My Life and Mission, p. 12)।

অর্থাৎ, অনুভূতির বিভিন্ন ভূমিতে দাঁড়াইয়া মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করিবে। মানুষের উপলব্ধি যদি সত্যোপলব্ধি হয়, তবে বিভিন্ন অনুভূতির মধ্য দিয়া সে একই মহাসত্যের বিভিন্ন দিককে প্রত্যক্ষ

করিবে। স্বামীজীর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমরা যদি সূর্যের আলোকচিত্র তুলিতে তুলিতে সূর্যের দিকে অগ্রসর হই, তবে সেই একই সূর্যকে দূরত্বের ব্যবধানে কত ভিন্নরূপেই দেখিব। কিন্তু প্রতিটি চিত্র একই সূর্যের চিত্র।

মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতা এই যে, পার্থিব জীবনে রোগ, শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু মানবজীবন সম্বন্ধে সে কথাই শেষ কথা নয়। স্বামীজী যে অমৃতবার্তা মানুষকে শোনাইয়াছিলেন, তাহা এই অভয় মন্ত্ররূপে ধ্বনিত হইয়াছিল—'Then alone can death cease when I am one with life, then alone can misery cease when I am one with happiness itself, then alone can all errors cease when I am one with knowledge itself; and this is the necessary scientific conclusion.' (Paper on Hinduism read at the Parliament of Religions—'Selections from Swami Vivekananda', p. 14)।

মানবজীবনের সার্থকতা সামাজিক জীব হিসাবে নহে, রাজনৈতিক প্রাণী হিসাবেও নহে। তাহার সার্থকতা অজর, অমর আত্মারূপে আপনার স্বরূপ উপলব্ধির মধ্যে। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি—ইহাদের সকলের চরম লক্ষ্য এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাহা মানুষের এই পরম উপলব্ধির সহায়তা করিতে পারে। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর সেই চিরস্মরণীয় উক্তি মানুষকে এই পরম সত্যের সন্ধান দিয়াছে—'The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth, or the air, or the water? No. It becomes a plant, it develops after the law of its own growth; assimilates the air, the earth, and the water, converts them into plant substance, and grows into a plant.' ('Selections from Swami Vivekananda', p. 25)।

সমন্বয়ের আচার্যরূপে স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মকথা পর্যালোচনা করিয়া মানুষকে এই পরম প্রজ্ঞায় সচেতন করিতে চাহিয়াছেন—"Thus it is that the Vedas proclaim not a dreadful combination of unforgiving laws, not an endless prison of cause and effect, but that at the head of all these laws, in and through every particle of matter and force, stands one, 'By whose command the wind blows, the fire burns, the clouds rain, and death stalks upon the earth.'" ('Selections from Swami Vivekananda', p. 10-11)।

মানুষ সাম্যবাদী কি গণতন্ত্রী, ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী কি রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভুত্বে বিশ্বাসী—এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে মানবজীবনের পরম মহিমা নিহিত নাই। মানুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব—ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

লীলাময়ের লীলা

ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা

এ-জীবনের অসমাপ্ত কাজ আর অপূর্ণ বাসনার তালিকাটি এত দীর্ঘ যে, পৃথিবীতে ফিরে না-আসার কল্পনা আমাকে স্বভাবতই ব্যথিত করে। কত দুঃখ, কত শোকের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে এ-জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কিন্তু তারই আধারে কত স্নেহভালোবাসার স্পর্শ, প্রাপ্তি আর সাফল্যের স্বল্পাবয়ব অথচ মাধুর্যময় কত অভিজ্ঞতা! সব নিয়েই মন ভরেছে এক সর্বগ্রাসী মর্ত্যপ্রেমে। একে অস্বীকার করি কোন্ শক্তিতে?

ভুবনেশ্বরবাসী আমি দীর্ঘ দিন। তবু রথযাত্রা-উৎসবটি থেকে চিরকাল দূরে থেকেছি। বছরে অন্তত একবার গিয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন করে আসি, কিন্তু রথযাত্রা দেখতে যাই না। জিজ্ঞাসু বন্ধুদের বলি, রথে বামনদর্শন করলে আর রথরজ্জু স্পর্শ করলে পুনর্জন্ম হয় না। আমি ঐজন্যেই রথযাত্রায় যাই না। তাছাড়া 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হোত যে মিছে'—এর প্রমাণ কই? কোথায় আমার জন্যে বিশেষ আয়োজন? পরিচর্যার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি?

রথের কিছুদিন আগে এক নবলব্ধ বন্ধু তাঁর রথযাত্রা দর্শনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, আমি বেশ কয়েকবছর এখানে আছি। রথযাত্রা দর্শনের সমান্তরাল অভিজ্ঞতা আমারও নিশ্চয় আছে। কিন্তু তা যে নেই সেকথা জানা এবং তার কারণ শোনার পর সব উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন বন্ধুটি। রথযাত্রার অল্প ক-দিন আগে বন্ধুটি আবার এসে শোনালেন—আপনার জন্যে বিশেষ আয়োজন জগন্নাথদেবই এ-বছর করে রেখেছেন, আপনি প্রস্তুত হোন।

আয়োজন বড় মাপেরই হয়েছিল এখান থেকে উড়িষ্যা ট্যুরিজমের ডিলাক্স বাসে যাওয়া আর পুরীতে বড় রাস্তার ওপর রথগুলির খুব কাছেই একটি বাড়ীর দোতালার বারান্দায় বসার জন্যে ব্যবস্থা করে রাখা ছিল।

বসেছিলাম মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে। আমাদের পাশেই ছিল বলরামের 'তালধ্বজ', তার বামপাশে সুভদ্রার 'দেবদলন' আর সবশেষে জগন্নাথদেবের 'নন্দীঘোষ' নামক তিনটি রথ। মন্দিরের মধ্যে রত্নবেদীতে এঁরা যেভাবে শোভা পান, রথযাত্রায়ও সেই ক্রমপর্যায় প্রতিপালিত হতে দেখলাম। এই উৎসবের দু-সপ্তাহ আগে স্নানপূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হয়। তখন এঁদের রত্নবেদী থেকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু স্নানবেদীতে। রথযাত্রা পর্যন্ত এই দু-সপ্তাহ কেউই তাই দেবতাদের দর্শন পান না। রথের দিন তাঁরা রত্নবেদীতে ফিরে যান, সাজসজ্জা করে রথযাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

রথারোহণের জন্যে দেবমূর্তিগুলিকে নিয়ে আসা হয় যেভাবে, সে একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য। এই প্রক্রিয়ার নাম 'পহণ্ডী'। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায় ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের এই পহণ্ডী দর্শন বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে—

> আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
> রাত্রে উঠি গণসঙ্গে কৈলা কৃত্য স্নান ॥
> পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
> জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন ॥

দারুদেবতাগুলিকে প্রায় হাঁটিয়ে আনার ভঙ্গিতে দুলিয়ে দুলিয়ে আনেন সেবকেরা। সেই দোলার ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে শতাধিক কাঁসর বাজিয়ে এগিয়ে চলে বিশাল শোভাযাত্রা। আগে আসেন

বলরাম। তিনি রথাধিষ্ঠিত হবার পর আসেন সুভদ্রা আর সব শেষে জগন্নাথদেব। প্রায় চার ঘণ্টার মত সময়ের প্রয়োজন হয় সমগ্র পহণ্ডীটি সম্পূর্ণ করতে।

বলরামের পহণ্ডী দেখলাম পথের ওপর দাঁড়িয়ে। সুভদ্রার মূর্তিটি ক্ষুদ্রতম তাই তাঁর পহণ্ডী ততখানি উপভোগ্য হয়নি। জগন্নাথদেবের পহণ্ডীই দর্শনার্থীদের পুলকিত করে সব চাইতে বেশী। মূর্তিটি বৃহৎ। তাই ভূমিতে দণ্ডায়মান অবস্থাতেও দূর থেকে তাঁকে দর্শন করা সহজসাধ্য। শোভাযাত্রার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় তাঁর বৃহৎ চক্ষুযুগল যেভাবে আন্দোলিত হয় তাতে কেবলই মনে হয়, বিশাল জনসংঘের দিকে তাকিয়ে তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে চলেছেন। আবার জনসংঘের প্রতিটি মানুষ অনুভব করতে পারে, দেবতা তার দিকে কৃপাস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। নির্বাক্ বিস্ময়ে এই শোভাযাত্রা দর্শন করেছি আর বিচিত্র অনুভূতিতে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার স্বরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। সেই বিশিষ্ট পরিবেশে সমগ্র ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ না করলে তার দ্যোতনাটি কখনই অনুভব করা সম্ভব নয়।

পহণ্ডী ফুরোলে অর্থাৎ তিন বিগ্রহকে তাঁদের রথে যথারীতি অধিষ্ঠিত করার কাজ হয়ে গেলে রথ সম্মার্জনার জন্যে এলেন পুরীর বর্তমান গজপতি বংশধর। তিনি এলেন শোভাযাত্রা করে তাঁদের রাজচিহ্নযুক্ত বিশেষ শিবিকায়। স্বর্ণবেষ্টনীতে আবদ্ধ সম্মার্জনী নিয়ে তিনি পরম নিষ্ঠায় একের পর এক তিনটি রথের সম্মার্জনা করলেন আর সুগন্ধি জল ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত পরিবেশটিকে অপূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। এককালে সমগ্র পথটি সম্মার্জনারই রীতি প্রচলিত ছিল। আজকের 'ছেরা পহরা' নামক এই প্রক্রিয়াটি তারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছে—

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেচন।
স্বর্ণমার্জনী লৈয়া পথ সংমার্জন ॥
চন্দনজলে করেন পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে ॥

তাঁর বংশপরম্পরাগত কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে রাজা এই আদর্শই তুলে ধরলেন যে, দেবসেবার ক্ষেত্রে কোন কাজই হীন নয়। তাছাড়া সেবার অধিকারলাভে প্রাসাদবাসী রাজা থেকে পথবাসী ভিক্ষুকও একই পর্যায়ভুক্ত। দেবভূমিতে সবাই সমান

রাজা ফিরে যাবার পর রথযাত্রার সর্বশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে প্রস্তুত হলেন পরিচারকেরা। ইতিমধ্যে মন্দির থেকে 'গুণ্ডিচা ঘর' বা 'মাসীর বাড়ী' পর্যন্ত আনুমানিক তিন কিলোমিটার পথ প্রকৃতপক্ষে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। সে সমুদ্রের ঢেউ কূল ছাপিয়ে উঠেছিল মন্দির আর বৃক্ষচূড়ায়, পথের দু-পাশে অবস্থিত প্রতিটি গৃহের সর্বাঙ্গে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ নরনারী অবিশ্বাস্য ধৈর্যের সঙ্গে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রথগুলির দিকে। ভারতের দূরতম প্রান্ত থেকে ছুটে-আসা নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক-কৃষাণীর পাশেই করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিজ্ঞানের কৃতবিদ্য অধ্যাপক। বহুজনমান্য মন্ত্রী আর লোকসভার সদস্যদের দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মগ্নচৈতন্য একদল যুবক। ব্যক্তিমুখী সমস্ত পরিচয়, সামাজিক অর্থনৈতিক এমনকি ধর্মীয় সমস্তপ্রকার সংজ্ঞা যেন অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। শুধু কি তাই? লক্ষ লক্ষ মানুষের সুশৃঙ্খল আচরণ আর পারস্পরিক সহযোগিতার দৃশ্যগুলোও অবিস্মরণীয়। যেদেশের জাতীয় জীবনে বিশৃঙ্খলাই স্বীকৃত নীতি, সে-দেশেরই একটি উৎসবে শৃঙ্খলাবোধের এই

অতিশ্রদ্ধেয় রূপটি স্বভাবতই মনকে জিজ্ঞাসু করে তোলে। কেন এই বিশাল জনসমাগম? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাতি, ধর্ম ও সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতার এই সমাবেশ কেন? কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে, অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে, সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে কেন এরা রথযাত্রা দেখতে আসে? শুধু স্নেহপ্রসন্ন পূতদৃষ্টি ছাড়া করচরণহীন এই দেবতাদের তো আর দেবার কিছু নেই! এ কি শুধুমাত্র অহৈতুকী ভক্তি? 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে/মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।' এই উত্তরের মধ্যেই মন তার শান্তি ফিরে পেল। করজোড়ে প্রার্থনা করলাম, 'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।'

একসময় রথের ওপর থেকে সবুজ সঙ্কেত আন্দোলিত হল। বিপুল হর্ষধ্বনি, শঙ্খ-কাঁসর আর হরিধ্বনির মধ্যে হাজার হাজার হাতের টানে একটি একটি রথ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল গুণ্ডিচা ঘরের দিকে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে নিয়ে তাঁর সর্ববৃহৎ রথটি যখন আমাদের সামনে দিয়ে ডানদিকে গুণ্ডিচা ঘরের দিকে চলে গেল, তখন একটা সাময়িক শূন্যতাবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল সেদিন। ওঁরা গেলেন ন-দিনের অবকাশ যাপনের জন্যে। গুণ্ডিচা ঘরই তো তাঁদের প্রসূতিভবন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন চক্রতীর্থের সমুদ্রলগ্ন বেলাভূমি থেকে তরঙ্গবাহিত কাষ্ঠখণ্ড তুলে এনেছিলেন এই ঘরের মধ্যে। এখানে বসেই বৃদ্ধ সূত্রধরের ছদ্মবেশে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তিনটি দারুবিগ্রহ নির্মাণে নিযুক্ত ছিলেন। শর্ত ছিল, তিন সপ্তাহ তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিগ্রহ নির্মাণ করবেন, কোন কারণে তাঁর কাজে কেউ বাধা সৃষ্টি করবে না। দু-সপ্তাহের পর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে রাণী গুণ্ডিচার সনির্বন্ধ অনুরোধে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দরজা খুলে ফেলার আদেশ দেন। দরজা খোলার পর তিনটি অর্ধ-সমাপ্ত বিগ্রহ পাওয়া গেল, পাওয়া গেল না বৃদ্ধ সূত্রধরকে।

সেই সূতিকাগৃহ গুণ্ডিচা ঘরের উদ্দেশ্যে তিন ভাই-বোন রথারূঢ় হয়ে যাত্রা করলেন। এককালে এই যাত্রাপথ প্রবহমান একটি নদীধারায় দ্বিধা-বিভক্ত ছিল। সেদিন নদীর এপারে তিনটি রথ আর ওপারে তিনটি রথ রেখে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। আজ সে-নদী নেই, তাই তিনটি রথ অসংখ্য ভক্ত নির্বাধ গতিতে টেনে নিয়ে যায় মাসীর বাড়ী পর্যন্ত।

সাময়িক শূন্যতাবোধের পর একটি আনন্দঘন অনুভূতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম ফিরে আসার জন্যে। পার্শ্ববর্তী সবাই দেবদর্শনের আনন্দে তখন উচ্ছ্বসিত। আমিও উচ্ছ্বসিত আমার বিশিষ্ট কামনার পরিপূর্তিতে। আমার জন্যে হয়েছে বিশেষ আয়োজন আর পরিচর্যার নিখুঁত ব্যবস্থা। বন্ধুটি কোথাও কোন ত্রুটির অবকাশই রাখেননি। দ্বিতীয় শর্তটিও তিনি অভাবনীয়ভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন—রথে বামনদর্শন আমার হয়নি। রথরজ্জু-স্পর্শের প্রশ্নটি ছিল অবান্তর। দর্শন সকলেরই হয়েছে, হয়নি শুধু আমারই। আমি নানাভাবে চেষ্টা করেও রথারূঢ় কোন দেবমূর্তিকেই দর্শন করতে পারিনি। কেউ কেউ আমার বসার জায়গাটা আর রথগুলির অবস্থান ও গতির হিসাব দেখিয়ে বললেন, বিগ্রহদর্শন আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জ্যামিতিক বা গতিবিদ্যাগত সিদ্ধান্ত আমার বোঝবার কথা নয় কিন্তু আমি এও জানি যে রথারূঢ় বিগ্রহদর্শনের কথাও আমার নয়। দর্শন হয়ে গেলে তাঁর লীলাই ক্ষুণ্ণ হোত। লীলাময়ের লীলা কি ক্ষুণ্ণ হয় কখন?

দেখার কথা নয় রথারূঢ় বামনকে। আমি সেদিন দেখিনি কিন্তু ভারতাত্মার একটি অপূর্ব রূপ

আমি দেখেছি। সে রূপ চিরন্তন। কালধর্ম সেই রূপটিকে স্পর্শও করতে পারেনি। প্রায় হাজার বছরের পুরাতন এই অনুষ্ঠান আজও তেমনি নতুন আর আকর্ষণীয়। ভারতবর্ষের এই শাশ্বত ভাবটিই সেদিন সজীব হয়ে উঠেছিল। দারুবিগ্রহকে করজোড়ে প্রণাম জানিয়েছি আর প্রণাম জানিয়েছি ভারতাত্মার অজর অমর ভাবমূর্তিকে।

ফেরার পথে বার বার মনে হল, তাঁকে আমি দেখিনি আরও অনেক-অনেক-অনেকবার দেখব বলেই। রথে বিরাজমান অবস্থায় নয়, শোভাযাত্রায় নৃত্যদোদুল ছন্দে তাঁকে বহুবার দেখব বলেই আমার সেদিন তাঁকে রথে দেখা হয়নি। সব অন্তরের আস্বাদ যিনি অভ্রান্তভাবেই গ্রহণ করেন, আমার ক্ষেত্রে যে তার ব্যতিক্রম হয়নি —এইখানেই আমার তৃপ্তি, আনন্দের পূর্ণতা।

যখন পুরীতে জগন্নাথদর্শন করি, এত লোকে জগন্নাথদর্শন করছে দেখে আনন্দে কাঁদলুম। ভাবলুম—আহা, বেশ, এত লোক মুক্ত হবে। শেষে দেখি যে না, যারা বাসনাশূন্য সেই এক-আধটিই মুক্ত হবে। যোগেনকে বলায় সেও তাই বললে, 'না মা, যারা বাসনাশূন্য তারাই মুক্ত হবে।' —শ্রীমা সারদা দেবী

ঐ যে জগন্নাথের রথ, তাও এই দেহরথের concrete form (স্থূল রূপ) মাত্র। এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়েছিস না—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি' ইত্যাদি, 'মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে'—এই বামন-রূপী আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক জগন্নাথদর্শন। ঐ যে বলে 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'—এর মানে হচ্ছে, তোর ভেতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা ক'রে তুই কিম্ভুত-কিমাকার এই দেহরূপ জড়পিণ্ডটাকে সর্বদা 'আমি' ব'লে ধরে নিচ্ছিস, তাঁকে দর্শন করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হ'ত, তা হ'লে বছরে বছরে কোটি জীবের মুক্তি হয়ে যেত—আজকাল আবার রেলে যাওয়ার যে সুযোগ! তবে ৺জগন্নাথের সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বাসকেও আমি 'কিছু নয় বা মিথ্যা' বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ঐ মূর্তি-অবলম্বনে উচ্চ থেকে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে যায়, অতএব ঐ মূর্তিকে আশ্রয় ক'রে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। —স্বামী বিবেকানন্দ

'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা' প্রভৃতির মানে হচ্ছে, হৃদয়ের ভিতর সেই পরম পুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন অধিকারীর জন্য বাহ্য রথ, মন্দির প্রভৃতির সৃষ্টি। —স্বামী ব্রহ্মানন্দ

একদিন জগন্নাথের মন্দিরের ভিতর লক্ষ্মীর মন্দিরে মা ও আমি পাশাপাশি বসে ধ্যান করছি। আমি মনে মনে ভাবছি, আহা এত সব লোক রথে জগন্নাথ দেখছে, সব তো মুক্ত হবে। তখন শুনি কে যেন বলছে, 'না, যারা বাসনাশূন্য, তারাই মুক্ত হবে।' আমি মাকে যখন এই কথা বললুম, মা বললেন, 'ও যোগেন, আমার মনেও তখন এই চিন্তা উঠেছিল, আর আমিও এই উত্তর শুনতে পেলুম।'

—শ্রীমতী যোগীন্দ্রমোহিনী দেবী

স্বদেশদর্শন

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। কিছুদূর-নির্মিত উঁচু বাঁধের উপর থেকে দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে কংসাবতী জলাধার পরিকল্পনার অভীষ্ট চেহারাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিলাম। মুকুটমণিপুরের দিক থেকে প্রায় দেড় শ' ফুট উঁচু বাঁধ গিয়ে শেষ হবে ওপারে অবস্থিত নীচু এক পাহাড়শ্রেণীতে যার কোল ঘেঁষে নীল কংসাবতীর অবিরাম স্রোত তখনও ছিল অব্যাহত। সেই পাহাড়ের ওপার থেকে আর এক প্রস্থ বাঁধ এগোবে সাঁওতাল গ্রাম লিপিডিরি (কী সুরেলা নাম।) পর্যন্ত যাতে পাশাপাশি প্রবাহিত কুমারী নদীকেও আটকানো যায়। কংসাবতী প্রকল্প সেজন্য মাত্র একটি নয়, দু'টি নদীর শ্বাসরোধ করবার জন্য রচিত।

বাঁধের উপর থেকে, কংসাবতীর উজানে দেখা যায় দূর দিগন্তের নীল বনরেখা, তরঙ্গায়িত তামাটে জমির এখানে-সেখানে তালগাছের সারি, মাঝেমধ্যে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মতো দু'চারটে টিলা। আর, এই নয়নলোভন পটভূমির ঠিক মাঝখান দিয়ে সরু এক ফালি নীল ফিতের মতো এঁকেবেঁকে ব'য়ে এসেছে ঊর্মিমুখর কংসাবতী নদী। আগ্রাসী বাঁধের কাছাকাছি এসে তার গতি বুঝি বা একটু চঞ্চল, একটু সন্ত্রস্ত। প্রসারিতবাহু সেই বিরাট দৈত্যের দিকে ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকিয়ে বাঁধের ভাটিতে পালাবার জন্য সে যেন নিরতিশয় ব্যগ্র।

সঙ্গের ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক বহুক্ষণ ধ'রেই গর্বভরে বোঝাচ্ছিলেন—আর কিছুদিনের মধ্যেই বাঁধ গিয়ে ছোঁবে কংসাবতী ও কুমারীর মধ্যবর্তী সেই পাহাড়শ্রেণীকে। অমনি কংসাবতীর উজানে অনুপম নিসর্গদৃশ্যকে ডুবিয়ে জেগে উঠবে এক বিশাল জলাধার। এখনকার ওই ফিতের মতো সরু নীল অকেজো রেখাটি তখন ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করবে দিগন্তপ্রসারিত এক কর্মক্ষম হ্রদে যার জল হুকুমের বাঁদীর মতো বৈষয়িক দায়িত্ব পালন করবে নানাপ্রকার। জলাধারের দু'পাশ থেকে নির্গত দুই প্রধান খাল ও তাদের শত-সহস্র শাখা-উপশাখা সেচের জল পৌঁছে দেবে লক্ষ লক্ষ একর তৃষিত জমিতে। আধুনিক সভ্যতার জীয়নকাঠি যে বিদ্যুৎ তাও উৎপন্ন হবে প্রচুর পরিমাণে। সমস্ত প্রকল্পটির প্রভূত সম্ভাবনা আমার মগজে ভালো ক'রে গেঁথে দেবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অনেক একর, অনেক একর-ফিট, অনেক কিউসেক, অনেক কুইণ্টাল, অনেক কিলোওয়াটের ফিরিস্তি দাখিল করেছিলেন। তার বিন্দুবিসর্গও আজ আমার মনে নেই কেনন তার কিছুই আমার কানে তেমন ঢোকেনি। আমি ভাবছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কথা। উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে হু-হু ক'রে ব'য়ে যাওয়া হাওয়ায় দূরাগত এক অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি যেন ভেসে আসছিল। একটু কান পেতে বুঝলাম, সে-বিলাপ তখনও-শৃঙ্খলমুক্ত কংসাবতী আর কুমারীর। যমদূতের মতো প্রসারিতবাহু, দানবের মতো বিশালকায় সেই বাঁধের কাছে তাদের কান্নায়-ভেজা করুণ মিনতি যেন শোনালো—"আমাদের হত্যা ক'রো না। আমাদের নিরুপদ্রবে ব'য়ে যেতে দাও। দু'কূল স্পর্শ ক'রে আমাদের চিরকালের প্রবহমান এই জীবনটুকুকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ো না। আমরা তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি!"

ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুটির সঙ্গে কথা বলিনি অনেকক্ষণ। স্বপ্নোত্থিতের মতো এক সময়ে হঠাৎ ব'লে উঠলাম—অনেক ফসল ফলবে, অনেক কারখানা চলবে, সবই বুঝলাম। কিন্তু নদী দু'টো যে মরে যাবে! তাঁর এত বক্তৃতার পর আমার এহেন অবান্তর উক্তিতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। সমস্ত স্কীমটার যাঁরা পরিকল্পনা করেছেন, কিংবা উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে যাঁরা সে-প্রকল্পকে রূপায়িত করছেন, এ-প্রশ্নটা তাঁদের কারও মনে বোধ হয় কখনও জাগেনি। আমাকে তাই আর একটু প্রাঞ্জল হতে হল। বললাম—হিন্দীতে একটা প্রবচন আছে যার মানে—সন্ন্যাসী যদি সতত ভ্রমণশীল না হয় আর নদী যদি তার প্রবাহ হারায়, তাহলে তাদের. কোনও মূল্যই নেই। "রমতা সাধু ঔর বহ্‌তা পানী"ই স্বাভাবিক এবং সুন্দর। নদীর গতি জবরদস্তি রুদ্ধ ক'রে তাকে নানান কাজে লাগানো যায় সত্য কিন্তু সে বৈষয়িক-যজ্ঞের প্রথম বলি হয় সে নদীটিই। বিশাল এক বদ্ধ জলায় পরিণত হয়ে সে সেচের উন্নতি, বিদ্যুতের উৎপাদন, মায় মাছের চাষ পর্যন্ত সবকিছুই করতে পারে, শুধু চিরকালের মতো ছেদ পড়ে তার অকারণ পুলকে প্রবাহিত হবার স্বাধীনতায়। আর, সে স্বাধীনতাহীনতায় "রমতা সাধু ঔর বহ্‌তা পানী"র কোনই অর্থ হয় না।

দেশভ্রমণ সম্বন্ধে আমার মূল ধারণাটা মোটামুটি একই ধাঁচের। স্রোতস্বিনী নদীর মতো দুই কূল স্পর্শ ক'রে শুধু অকারণ পুলকে ব'য়ে যাবার আনন্দ। কোনও ইষ্টলাভের অভীপ্সা নেই। নেই কোনও প্রাপ্তিযোগের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অকারণে দুই কূল স্পর্শ ক'রে যাওয়াটা নিতান্তই আবশ্যিক। নিত্যনতুন পরিবেশে, সদা-উন্মোচিত নব নব দিগন্তে নিজের অন্তরসত্তাকে যদি বিলিয়ে দিতে না পারি, অভিনব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্ম হবার সহজ প্রয়াসে যদি ব্যর্থ হই, তাহলে দেশভ্রমণের সার্থকতা কোথায়! পথের পাশে যদি সাধারণ অর্থে দর্শনীয় কিছু দেখি যা আগে দেখিনি, নতুন কিছু অভিজ্ঞতা যদি সঞ্চয় করি যা আগে করিনি, সে তো বাড়তি লাভ। সেসব হঠাৎ-পাওয়ার জন্য মনের সব কয়টি জানালা তো সদা-উন্মুক্ত। কিন্তু তেমন কিছু উপচারের দেখা না পেলেও ক্ষতি কোথায়? ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে প্রকৃতির ডালি এতোই নিপুণ ও বিচিত্রভাবে সাজানো; নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের বৈভব সেখানে এতোই বিপুল যে, ঘরের কোণ ছেড়ে শুধু বেরিয়ে পড়বার অপেক্ষা। তারপর দু'কূল ছুঁয়ে ব'য়ে যাওয়াতেই অক্ষয় স্বর্গসুখ। মাসের পর মাস. বছরের পর বছর যখন অভ্যস্ত জীবনযাত্রার বদ্ধ জলায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকি কূপমণ্ডূকের মতো, কাজের মানুষ হিসাবে নাম কিনবার জন্য যখন কতই না ফিকিরে ঘুরে বেড়াই রাত্রিদিন, তখনও কিন্তু প্রতিদিন অদেখা শুকতারা জলজ্বল করে ভোরের আকাশে, শিউলি ঝ'রে শুকিয়ে যায় ঘাসের বিছানায়, কাউকে ডাকাডাকি না ক'রে হোলির রং লাগে দিনান্ত-বেলার পশ্চিম গগনে। ভারতীয় প্রকৃতির মতো এমন ঘর-ভোলানো সুরে, এতো নিরন্তর ডাক কে-ই বা আর ডাকবে! আর, গোটা দেশটার গ্রামীণ মেয়ে-পুরুষ? ভারতবর্ষের দূরান্তে দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে মিশে এ-প্রতীতি আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল —তাদের মতো দিল্‌খোলা, তাদের মতো দরদী, তাদের মতো পরোপকারী জনতা অন্য কোনও দেশে আছে কিনা সন্দেহ। বহুদিনের ব্যবধানে, মানুষ ও প্রকৃতির এই যুগপৎ ডাকে সাড়া দিয়ে যখন বেরিয়ে পড়তে পারি, তখনকার তৃপ্তির শুধু একটি তুলনাই দেওয়া যায়—নীল আকাশে ডানা মেলে পাখির ভেসে যাওয়ার আনন্দ। সুখের

কথা, এ-আনন্দ ক্রমশই বেশী লোককে আকৃষ্ট করছে। তাদের সকলের কাছেই স্বদেশদর্শন দেশপ্রেমে উত্তীর্ণ হবার প্রাথমিক সোপান। অন্তত তাই তো হওয়া উচিত।

আরও কিছু বিশিষ্ট আকর্ষণ আছে আমাদের এই জন্মভূমির। আমরা যতই কেন না অন্যমনা হই, তারা কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে কল্পান্তকাল। যুগযুগব্যাপী এক অগ্রসর সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ এত অগণিত, এত সুচারু পুরাকীর্তি পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই। গ্রীস ও ইতালীতে এ-শ্রেণীর কিছু কৃষ্টিসম্পদ ভুবনবিখ্যাত হলেও সে দু'টি নিতান্ত ছোট দেশের উন্নত সভ্যতাবিকাশের কাল এতই সংক্ষিপ্ত ছিল যে, তাদের সংখ্যা, বৈচিত্র্য বা উৎকর্ষ ভারতীয় পুরাকীর্তির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। মিশর ও চীনের সভ্যতাও খুব প্রাচীন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানেও পাথরের মতো টেকসই উপাদানের যেসব পুরাকীর্তি (যেমন, পিরামিড বা চীনের প্রাচীর) অতীতের অন্ধকার থেকে বর্তমানের তীরে এসে পৌঁছেচে, তারা সবই স্থূল প্রকৃতির। তাদের নির্মাণকৌশলের প্রশংসায় শুধু এটুকুই বলা যায়, সেসব দেশে দাস-শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থাটা যতখানি পরিণতি বা ব্যাপকতা লাভ করেছিল ভারতবর্ষে সেরকমটি কখনও হয়নি। তাই, গজদন্তশিল্পীরা দু'হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন সাঁচিস্তূপের তোরণগুলিতে যে সূক্ষ্মতা ও শিল্পবোধের স্বাক্ষর রেখে গেছেন ভূমণ্ডলে তার আর তুলনা নেই। হতে পারে, প্রাচীন চীনে নিপুণ কারুকর্মের বহু দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু উপকরণ হিসাবে প্রধানত কাঠের ব্যবহারের জন্য তাদের সামান্যই রক্ষা পেয়েছে। সাঁচি, সারনাথ, কুশীনগর, নালন্দার মতো বিস্তীর্ণ বৌদ্ধ-বিহার (হায়! তক্ষশিলা ও পাহাড়পুর এখন বিদেশে); অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যাণ্টা, কার্লী, ভাজা, বাঘ, মহাবলীপুরমের মতো গুহা-নিহিত ব পাহাড়-কাটা স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলার লীলা নিকেতন; বুদ্ধগয়া, খাজুরাহো, মোধেরা, পুরী, ভুবনেশ্বর, কোণারক, কাঞ্চিপুরম্, তাঞ্জোর, হাম্পী, মাদুরাই, শ্রীরঙ্গম্, সুচিন্দ্রমের মতো সমুন্নত মহিমার মন্দিরাদি; গির্নার, পালিতানা, শত্রুঞ্জয়ের মতো গিরিশীর্ষ দেবনগরী; আদিনা, জৌনপুর, দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি, আহ্‌মেদাবাদ, মাণ্ডু, বিজাপুর প্রভৃতির মতো মোসলেম পুরাকীর্তিস্থল; অথবা, আরও ঘরের কাছে, গৌড়, বড়নগর, বহুলাড়া, বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোণা, বাঁশবেড়ে, আঁটপুর প্রভৃতির টেরাকোটা-অলংকরণসজ্জিত সৌধ—অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করলাম— আর কোন্ দেশেই বা পাওয়া যাবে! আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকারের এই বিপুল সম্ভার যে-কোনও ভারতীয়ের কাছেই গর্বের বস্তু। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের বিভেদের মধ্যে এগুলি মহান মিলনের অন্যতম বন্ধনীস্বরূপ।

জাতীয় ঐক্যের আর যে বিশিষ্ট বন্ধনীটি আসমুদ্রহিমাচলকে প্রভাবিত ক'রে এসেছে আবহমানকাল তার নাম তীর্থ-পরিক্রমা। পূর্ব-ভারতের লোক তীর্থভ্রমণে গেছেন কেদার-বদরী, দ্বারকা, রামেশ্বরম্, কন্যাকুমারীতে; দক্ষিণীরা এসেছেন গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অমরনাথে। একান্নটি পীঠ ও ততোধিক উপপীঠের কল্যাণে এদেশে হিন্দুধর্মের জালটা এতই ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে যে, তাতে ধর্মবন্ধনের ভিতটাই শুধু মজবুত হয়নি, ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রেও জাতীয় একতার ভিত্তিও পাকা হয়েছে। প্রাচীন তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য ও আকর্ষণ তুলনায় আজ হয়ত কিছুটা ম্লান কিন্তু নতুন যুগের অভিনব সব তীর্থ গ'ড়ে উঠেছে হলদিয়া, দুর্গাপুর, বোকারো, চিত্তরঞ্জন, জামশেদ-পুর, রাউরকেলা, ভিলাই, বারাউনী, ট্রম্বে, বাথরা-

নঙ্গল প্রভৃতি অজস্র স্থানে—পণ্ডিত নেহ্‌রু যাদের নামকরণ করেছিলেন নয়া ভারতের নয়া দেবস্থান। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে, ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে এসব দেবস্থানে আজ দর্শনার্থীর বিরাম নেই। জাতীয় ঐক্যবিধানের এও এক সফল উপায়।

ভারতবর্ষের দূরদূরান্তরে দীর্ঘকাল পর্যটন ক'রে এ-ধারণা আমার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল যে, আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের একেবারে মর্মমূলে প্রবেশেচ্ছু দর্শকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। এসব মরমী অনুসন্ধানকারীর মধ্যে বহু বিদেশী-বিদেশিনীও আছেন। আমাদের স্থাপত্য-ভাস্কর্য, আমাদের নৃত্য-সঙ্গীত-অভিনয়, আমাদের বহুমুখী চারুকলার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে তাঁদের যাতায়াত ক্রমবর্ধমান। মালাবারের অখ্যাত গ্রাম চেরুথুরুথির 'কেরালা কলামণ্ডলমে' তাঁদের দেখেছি, আবার তাঁদের দেখেছি শান্তিনিকেতনের পৌষ-মেলায়। ইম্ফলে নাচের আসরে তাঁদের পাশে বসেছি কখনও, আবার তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছি তাঞ্জোরের ভরত-নাট্যের জলসায়। নেপাল-তরাইয়ের পাদদেশে কুশীনগরে দেখেছি তাঁদের, তাঁদের আবার দেখেছি কোণারকে। ছ'হাজার সিঁড়ি ভেঙে গির্নারের গিরিচূড়ায় উঠতে উঠতে তাঁদের মুখোমুখি হয়েছি কখনও, আবার তাঁদের সঙ্গে পথ হেঁটেছি অর্কিডে-ছাওয়া সিকিমের অরণ্যপথে। স্তব্ধ দুপুরের প্রখর রৌদ্রে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর এসব ভারতবন্ধুদের দেখেছি বিগতকীর্তি চিতোর দুর্গের এখানে-সেখানে, আবার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি ধুলোর ঘূর্ণি-ওঠা বিজয়নগরের বিজন প্রান্তরে। ভারতাত্মার মর্ম-সন্ধানী, দেশী-বিদেশী এসব পর্যটকদের দেখে আনন্দে ভ'রে উঠেছে আমার মন। আমার মাতৃভূমি, আমার মহামহিমান্বিতা, ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেশজননীর অন্তরসন্ধানের জন্য আরামত্যাগী ভারতপথিকদের আজও অভাব হয়নি ভাবতেই পুলকিত হই।

নানান আঞ্চলিক বিভেদের শিকার ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের গুরুদায়িত্ব এঁদেরই হাতে। কিন্তু সংখ্যায় আজও এঁরা খুব বেশী নয়। এঁদের দল আরও অনেক ভারী হওয়া দরকার। তাই, জাতীয় সংহতিপ্রতিষ্ঠার সম্ভবত প্রথম ও সর্বোত্তম উপায়—স্বদেশদর্শন: আরও আরও বেশী স্বদেশদর্শন।

মন্ত্র-ন্যাস

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

হিন্দু পূজানুষ্ঠানে ন্যাস একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। ন্যাস শব্দের অর্থ স্থাপন। বিশেষ বিশেষ বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করার নাম ন্যাস। যে স্থানকে স্পর্শ করা হইল উহা যেন মন্ত্রশক্তি দ্বারা পবিত্র ও উজ্জীবিত হইল ইহাই ন্যাস-ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত ভাব। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—দৈবভাব প্রাপ্ত হইয়া দেবতার আরাধনা করা উচিত। এই উক্তি অনুসারে পূজক ন্যাস-প্রক্রিয়া দ্বারা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। পীঠ-ন্যাস, ঋষ্যাদি-ন্যাস, করাঙ্গ-ন্যাস ও ব্যাপক-ন্যাস এইগুলি সাধারণ ন্যাস এবং অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহা ছাড়া তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতিতে মাতৃকা-ন্যাস, অন্তর্মাতৃকা-ন্যাস, বাহ্যমাতৃকা-ন্যাস, সংহারমাতৃকা-ন্যাস প্রভৃতি বিশদ এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন ন্যাসের বিধি আছে। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় ন্যাসের মন্ত্র এবং ক্রম আলাদা। পূজা-পদ্ধতি দেখিয়া এই সকল অভ্যাস করিতে হয়

ন্যাস-প্রক্রিয়ায় অনেক স্থলে প্রচুর কল্পনাশক্তি এবং ধ্যানেরও প্রয়োজন।

আনুষ্ঠানিক পূজার অঙ্গ ছাড়াও ব্যক্তিগত ধর্মকৃত্য হিসাবে কেহ কেহ ন্যাস অভ্যাস করেন, প্রাণায়াম অভ্যাসের মতো। একটি শ্লোক আছে :

আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ।
দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥

"আগমোক্ত বিধি অনুসারে যিনি নিত্য ন্যাস অভ্যাস করেন তিনি দেবতাভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়।"

এইরূপ ন্যাস অভ্যাসকে ন্যাসযোগ বলা যায়। প্রাণায়াম, ন্যাস প্রভৃতি ক্রিয়া বৈধী ভক্তির অঙ্গ। শ্রীভগবানে যথার্থ প্রীতি জন্মিলে সাধক আর এই সকল ক্রিয়া করিতে চান না। তাঁহার ভক্তি তখন রাগভক্তির স্তরে পৌঁছিয়াছে। শঙ্করাচার্য তাঁহার 'ভবান্যষ্টকম্' স্তোত্রে বলিয়াছেন :

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

"মা, আমি দান ধ্যান জানি না, মন্ত্র তন্ত্র স্তোত্রাদিও জানি না; পূজা এবং ন্যাসযোগও জানি না। হে ভবানি, এই শুধু জানি যে তুমিই আমার পরমা গতি।"—ইহাই কামনাহীন ঈশ্বরানুরাগীর প্রাণের কথা।

যাহা হউক ন্যাস বা মন্ত্রের স্থাপন ব্যাপারটিকে আধ্যাত্মিক সাধনায় নানাভাবে ব্যবহার করা চলে। ভক্তিযোগী বা জ্ঞানযোগী উভয়েই ন্যাসের এই আধ্যাত্মিক প্রয়োগ অভ্যাস করিতে পারেন এবং এই প্রয়োগের দ্বারা উত্তরোত্তর উচ্চ উপলব্ধিসমূহ লাভ করা সম্ভবপর। যিনি সদ্গুরুর নিকট ইষ্টমন্ত্র পাইয়াছেন তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ় করা উচিত যে ইষ্টমন্ত্র ইষ্টস্বরূপ। আমাদের শাস্ত্রে বলে মন্ত্র শব্দব্রহ্ম। অনুরাগ এবং বিশ্বাসের সহিত শ্রীভগবানের নাম জপ করিতে করিতে মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উঠে। তখন মন্ত্রচৈতন্য এবং চৈতন্যময় ইষ্টে কোনও পার্থক্য থাকে না।

হৃদয়ে এবং ইষ্টমূর্তিতে মন্ত্র-ন্যাস

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, হৃদয় ডঙ্কামারা স্থান। হৃদয়েই ইষ্টের ধ্যান করা প্রশস্ত। যোগশাস্ত্রে যে ষট্চক্রের কথা আছে তাহার মধ্যে হৃদয়স্থিত চক্র বা ধ্যানকেন্দ্রের নাম অনাহত চক্র। ঐ চক্রকে একটি দ্বাদশদল পদ্মরূপে কল্পনা করিতে হয়। 'যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্' গ্রন্থে ইষ্টের ধ্যানের পূর্বে চক্রগুলির বিশেষ ধ্যানের উপদেশ আছে, যথা—প্রতি চক্রে কতদলবিশিষ্ট পদ্ম কল্পনা করিতে হইবে, ঐ পদ্মের বর্ণ কি এবং পদ্মের দলগুলিতে কি কি বীজ নিহিত তাহা ভাবিতে হইবে ইত্যাদি। আমরা যে মন্ত্র-ন্যাসের আলোচনা করিতেছি তাহাতে এই সকল বিশদ কল্পনার প্রয়োজন নাই। হৃদয়ে শ্বেত বা রক্তবর্ণের দ্বাদশ অথবা অষ্ট দলের একটি পদ্ম—ইষ্টের আসন কল্পনা করিয়া ঐ আসনে ইষ্টমন্ত্রের ন্যাস করিতে হইবে : মনে মনে ইষ্টমন্ত্রের জপ এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবনা যে মন্ত্রশক্তি ইষ্টের আসনকে শুদ্ধ এবং জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিতেছে। যাহার উপর ইষ্টকে স্থান দিব তাহা ইষ্টের উপযোগী তো হওয়া চাই—ইহাই এই প্রক্রিয়ার অর্থ। হৃদয় যে পরব্রহ্মের স্থান তাহা উপনিষদের নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে :

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

"অনন্তর ব্রহ্মপুরী এই দেহের ভিতর যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ আবাস আছে তাহাতে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ (চিদাকাশ) অবস্থিত। সেই চিদাকাশের

অভ্যন্তরে যিনি রহিয়াছেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, জানিবার ইচ্ছা দৃঢ় করিতে হইবে।"

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।১।১)

পরবর্তী মন্ত্র-ন্যাস হৃদয়াসনে আসীন ইষ্ট-মূর্তিতে। মানসচোখে ইষ্টমূর্তিকে দেখা এবং মানসজপে ইষ্টমন্ত্রকে মূর্তিতে মিলাইয়া দেওয়া। একই চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবান মূর্তির ভিতর অভিব্যক্ত, আবার তিনিই শব্দব্রহ্মরূপে অনুরণিত। রূপ এবং শব্দ পাশাপাশি চলিয়াছে। যে মূর্তির চিন্তা করিতেছি তাহা তো জড়ভূত-গঠিত নয়, চৈতন্যময়। যে মন্ত্র-শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিতেছি তাহাও ভৌতিক শব্দ নয়, চৈতন্যস্পন্দন। এইভাবে জপধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে ইষ্টমূর্তি ও ইষ্টমন্ত্র জাগিয়া উঠেন এবং একাকার হইয়া যান। জপ ও ধ্যান এক হইয়া যায়। যাঁহাকে দেখিতেছি তাঁহাকেই শুনিতেছি। রূপকে শুনি, শব্দকে দেখি! চৈতন্যের জাগরণ হইলে দেখা ও শোনায় কোন পার্থক্য থাকে না। দুইই এক চৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়। মনের যে অবস্থায় এই অসম্ভব সম্ভবপর হয় তাহার নাম প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধি। শ্রুতির উক্তি ঃ

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ

"একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্মদর্শীরা তাঁহাকে দর্শন করেন।" (কঠ উপনিষদ্ ১।৩।১২)

প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

"প্রজ্ঞা দ্বারা ইঁহাকে পাওয়া যায়।"

(কঠ উপনিষদ্ ১।২।২৪)

সচ্চিদানন্দঘন ইষ্ট পরে রূপ হইতে অরূপে মিলাইয়া যান, ইষ্টমন্ত্র শব্দ হইতে অশব্দ অবস্থা লাভ করে। উপনিষদ্ ওঁকারের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রণবের (ওঁকারের) চারিটি মাত্রা আছে—তিনটি ব্যক্ত অ-উ-ম এবং চতুর্থটি অব্যক্ত (অমাত্রা)। ওঁকার জপ করিতে করিতে ব্যক্ত-ধ্বনি অব্যক্ত অমাত্রায় উপনীত হয়। যাহা ওঁকারে সত্য, অন্য ইষ্টমন্ত্রের পক্ষেও তাহা সত্য। ইষ্টমন্ত্রও উত্তরোত্তর ইষ্টমূর্তিতে স্থাপিত হইয়া ইষ্টের সাকার চৈতন্যমূর্তির অনুভবের পর অব্যক্ত শব্দব্রহ্মে মিলাইয়া যায়।

চোখ বুঁজিয়া জপধ্যানের মতো সাধক কখনও কখনও চোখ চাহিয়াও জপধ্যান করিতে পারেন। যে বেদিতে ইষ্টমূর্তি (বিগ্রহ বা চিত্র) স্থাপিত সেই বেদিই এখন হৃদয়। জপমন্ত্র ইষ্টমূর্তিকে স্পর্শ করিয়া উহাকে চৈতন্যময় করিয়া তুলিতেছে। জপ চলিতে চলিতে মনে হইবে মূর্তিতে আর মন্ত্রে কোনও প্রভেদ নাই। মূর্তি মন্ত্রধ্বনি, মন্ত্রধ্বনিই মূর্তিরূপে বসিয়া আছেন।

প্রাণবৃত্তিতে মন্ত্র-ন্যাস

আমাদের শাস্ত্র বলেন যে, পঞ্চধা বিভক্ত প্রাণ (প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান) দেহের যাবতীয় জীবন-ক্রিয়া সম্পাদন করে। হৃদযন্ত্রের শরীরের সর্বস্থানে ধমনী শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া রক্ত-সঞ্চালন, ফুসফুসের বায়ুপ্রবাহ-নিয়ন্ত্রণ, উদরে ও অন্ত্রসমূহে খাদ্যপরিপাক, মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলীর বিষয়জ্ঞান সম্পাদন এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি-বিধান ইত্যাকার কত ব্যাপার শরীরের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এ সকল প্রাণ-শক্তিরই বিকাশ। গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন :

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

"আমি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণীদের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সহায়ে চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি।" (গীতা ১৫।১৪)

প্রাণেরও প্রাণ হইলেন চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা। প্রাণের যাবতীয় শক্তি তাঁহা হইতেই আসিতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন :

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ।
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্॥

"যাঁহারা প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ এবং মনেরও মনকে জানেন তাঁহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ সনাতন ব্রহ্মকে বুঝিতে পারিয়াছেন।"

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।১৮)

প্রাণবৃত্তি যে চৈতন্যের অধীন তাহা আমরা অজ্ঞানদশায় জানি না। প্রাণে মন্ত্র-ন্যাস অভ্যাস করিলে প্রাণের জৈবভাব কমিয়া আসে, জৈব-প্রাণ দিব্যপ্রাণে রূপান্তরিত হয়। নিশ্বাসপ্রশ্বাস, হৃদয়স্পন্দন, রক্তপ্রবাহ প্রভৃতিতে মন রাখিয়া ইষ্টমন্ত্র ঐ সকল ক্রিয়ায় নিবিষ্ট করিতে হইবে। এই অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ বোধ হইতে থাকিবে যে, ঐ সকল ক্রিয়া মন্ত্রেরই স্পন্দন। যাহা ছিল জৈবিক স্পন্দন তাহা এখন চৈতন্যের অভিস্ফূর্তি। হৃদয়স্পন্দনে, শ্বাসগতিতে, রক্তপ্রবাহে জপ চলিতেছে। সারা প্রাণক্রিয়ায় জপ ছাইয়া গিয়াছে। আমি শুধু জিহ্বায় কণ্ঠে বা মনে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছি না—যেখানেই প্রাণস্ফূর্তি সেখানেই আমার মন্ত্রজপ। মন্ত্র-ন্যস্ত প্রাণ দিব্য-প্রাণ—এই প্রাণ ক্রমশঃ আমাকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে সাহায্য করিবে।

দেহ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে মন্ত্র-ন্যাস

কঠোপনিষদে পড়ি: পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ—"স্বয়ম্ভূ ভগবান (জীবসৃষ্টিকালে) তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করিয়া দিয়াছেন।"

(কঠ উপনিষদ্ ২।১।১)

ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিতে মন্ত্র-ন্যাস করিলে এই বহির্মুখীনতা অনেকাংশে নিরস্ত হয়। চোখ যখন রূপজ্ঞান আনে তখন ঐ জ্ঞানের সহিত মন্ত্রজপ করিলে রূপজ্ঞান ভাগবত জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। কান দিয়া যখন শব্দ শুনি তখন যদি ঐ শব্দে ইষ্টমন্ত্র নিয়োজিত করি তাহা হইলে ঐ শব্দ আর মনকে বহির্মুখ করিতে পারিবে না। চোখের দেখা, কানের শোনা মন্ত্রজপের সহিত মিশিয়া গিয়া চৈতন্যদীপ্ত হইয়া উঠিবে। এইভাবে সব ইন্দ্রিয়গুলিই আমার মন্ত্রজপে যোগ দিতে পারে। মন্ত্রজপের এই ব্যাপ্তি ও গভীরতায় একটি অপার্থিব শান্তি হৃদয়ে অনুভূত হইবে।

দেহবুদ্ধি আমাদের ধর্মজীবনের একটি প্রচণ্ড বাধা। এই দেহবুদ্ধিকে মন্ত্র-ন্যাস দ্বারা প্রতিহত করা যায়। দেহের সহিত অনবরত 'আমি' 'আমি' বোধ যুক্ত না করিয়া সারা দেহে ইষ্টমন্ত্র প্রয়োগ করিলে জৈবদেহ ভাগবতী-তনুতে পরিণত হয়। তখন উপাসনার সময় মনে হইতে থাকিবে যে, সমগ্র দেহ আমার সহিত জপ করিতেছে। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন: "যত শুন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে। কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।" অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বর্ণ এবং ঐ সকল বর্ণের হেরফের দিয়া যত শব্দ গঠিত সবই শব্দব্রহ্ম কালী হইতে উত্থিত হইতেছে। যত কিছু ধ্বনি শুনিতেছ সবই পরমেশ্বরীর মন্ত্র।

রামপ্রসাদের আর একটি গানে আছে:

"কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এই দেহ বেচে ভবের হাটে
দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥"

দেহকে 'বেচিয়া দেওয়া'র অর্থ দেহজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়া। দেহজ্ঞানের পরিবর্তে 'দুর্গানাম' এখন অনুক্ষণ সাথী

চিত্তবৃত্তিতে মন্ত্র-ন্যাস

মনের ছুটাছুটির জন্য আমরা গভীরভাবে ইষ্টচিন্তা করিতে পারি না। মনকে স্থির করিবার জন্য নানা উপায় যোগশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ন্যাসযোগও একটি চমৎকার উপায়। চিত্তবৃত্তি-গুলিকে যদি বলিতে পারি, আয় আয় তোরা আমার সঙ্গে জপ কর্, উহাদের সহিত যদি আধ্যাত্মিক বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারি তাহা হইলে উহারা আর আমার জপধ্যানের অন্তরায় হইবে না। গীতা বলিয়াছেন:

অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ

"অবশীভূত মন যাহার, তাহার মন শত্রুত্বে থাকিয়া শত্রুবৎ আচরণ করে।" (গীতা ৬।৬) মনের বৃত্তিতে মহামন্ত্র নিয়োগ করিলে বৃত্তি চৈতন্যপ্রভায় আলোকিত হয়। ঐ বৃত্তি জপসঙ্গী হইয়া যায়, বাহিরে ছুটিয়া ধ্যানবিঘ্ন ঘটায় না। মন, তুই কোথায় যাইবি? যেখানেই যাস না কেন ইষ্টমন্ত্র তোর সঙ্গে থাকিবে। ইষ্টমন্ত্র যদি তোকে স্পর্শ করিয়া থাকে তাহা হইলে তোর মায়িকরূপ বদলাইয়া যাইবে। তোর মধ্যে ইষ্টের মুখ উঁকি দিবে। তোর ভিতর দিয়া নামিয়া আসিবে আনন্দ, শান্তি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিবস্তোত্রে শিবের দুইটি রূপের বর্ণনা দিয়াছেন। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার বিপুল ঝড়ের মতো বহিয়া যাইতেছে, ঘূর্ণিত তরঙ্গমালার মতো বলবান ব্যক্তিদিগকেও দলিত করিতেছে। তুমি-আমি রূপে প্রতিভাত দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। চিত্তের এই অবস্থা শিবের "অতিবিকলিতরূপ"। পক্ষান্তরে বৃত্তিগুলি যখন সংস্কৃত হয়, অগণিত চিত্তভঙ্গিমার মধ্যে এক চৈতন্য প্রতিভাত হয়, মন আর যখন কার্যকারণ-ভাব লইয়া মত্ত থাকে না, চিত্তবিকারের ঝড় থামিয়া যায়, যখন ভিতরও নাই, বাহিরও নাই তখন সেই অবস্থা শিবের প্রশান্ত "চিত্তবৃত্তি-নিরোধ"-রূপ। স্বামীজী শিবের দুই রূপকেই নমস্কার করিতেছেন।*

বিশ্বসংসারে মন্ত্র-ন্যাস

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ জগৎসংসারকে "ব্রহ্মচক্র" বলিয়াছেন: অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে। "এই ব্রহ্মচক্রে হংস (জীব) অনবরত আবর্তিত হইতেছে।" (১।৬) এই ব্রহ্মচক্র বস্তুত ব্রহ্মই, কিন্তু অজ্ঞানের জন্য জীব তাহা জানে না। এককে সে বহু বলিয়া দেখে, নিশ্চল তাহার নিকট চলমান বলিয়া মনে হয়। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে সে নিষ্পিষ্ট হইতে থাকে। ব্রহ্মচক্রকে সে যদি ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে, বিশ্বসংসারের মধ্যে যদি সে শ্রীভগবানকে আবিষ্কার করিতে পারে তাহা হইলে এই আবর্তন থামিয়া যায়, সে পরমা শান্তি লাভ করে।

বিশ্বজগৎ সর্বদাই আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। 'আমি' এবং 'জগৎ' এই দুইটি প্রতীতিই সর্বদা আমাদের মনে ক্রিয়া করিতেছে। আমি অর্থে আমার দেহ মন আশা আকাঙ্ক্ষা আবেগ অনুভূতির সমষ্টি। জগৎ অর্থে যাহা আমার বাহিরে—যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু যাহারা অনবরত আমার ইন্দ্রিয় এবং মনকে আকর্ষণ-বিকর্ষণে চঞ্চল করিতেছে।

মন্ত্র-ন্যাস দ্বারা যেমন আমার দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়সমূহকে সুসংস্কৃত, শান্ত করিতে পারি, উহাদের মায়িক ব্যবহারকে দৈবীসত্তায় উন্নীত করিতে পারি সেইরূপ জগৎসংসারের উপর মন্ত্র স্থাপন করিয়া উহাকে শুদ্ধ ও চৈতন্যময় করিয়া তোলা সম্ভবপর। জগৎ-জ্ঞান আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করে কেন? উহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ মনে করি বলিয়া। যখনই জগৎ-প্রতীতি মনে উঠিবে তখনই যদি উহার সহিত ইষ্টমন্ত্র মিশাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে জগতের মায়িক আবরণ দূর হইয়া যায়; জগৎ যাঁহাতে দাঁড়াইয়া, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়া উঠেন। মরমী সূফী সাধক জাফর গাহিয়াছেন:

জঁহা মৈনে দেখা তুঁহী নজর আয়া
যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।

---

* বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্মিমালা।
প্রচলতি খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্।

জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ
অগণনবহুরূপো যত্র চৈকো যথার্থঃ।
শমিতবিকৃতিবাতে যত্র নান্তর্বহিশ্চ
তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তের্নিরোধম্॥

"যেখানে চোখ ফেলিয়াছি তোমাকেই দেখিয়াছি। যাহা কিছু আছে সে তুমিই।" নরেন্দ্র এই গানটি গাহিতেন, কিন্তু গূঢ় মর্ম তখন বুঝিতে পারেন নাই। ঠাকুরের কাছে গিয়া বলিলেন, আমি নির্বিকল্প সমাধিতে স্থির হইয়া থাকিতে চাই। ঠাকুর মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তোর লক্ষ্য তো বড় ছোট। নির্বিকল্প সমাধির উপরের অবস্থাও আছে। নরেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে আবার কি? ঠাকুর উত্তর দিলেন, কেন, তুই যে ঐ গানটি গাস 'যো কুছ্ হ্যায় সো তু'হী হ্যায়।' —ঐ গানের মধ্যেই তো ঐ ভাব আছে— সমাধি হইতে নামিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বরেরই রূপ বলিয়া দেখা।

এমনি করিয়া ভগবানের পাবন নামকে ভগবৎ-স্বরূপ জানিয়া ঐ নামের শক্তি অন্তরে বাহিরে প্রয়োগ করিয়া আমরা আমাদের দেহ-মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে ভাগবতী-চেতনায় উন্নীত করিতে পারি, বিশ্বজগতের চাঞ্চল্যকর বিক্ষেপকে সচ্চিদানন্দে একীভূত করিতে পারি। যে ইষ্টকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিতেছিলাম তাঁহাকে সর্বতোব্যাপ্ত বলিয়া জানিতে পারি। ইষ্টমন্ত্র যতক্ষণ সঙ্গে আছে, শ্রীভগবানও ততক্ষণ সঙ্গে রহিয়াছেন। ইষ্টমন্ত্র যেখানে আছে, ইষ্টও সেখানে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় সাহিত্য-সৌন্দর্য

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভূমিকা

ভারতের সমকালীন দুই বিশ্ববরেণ্য মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ—একই ভাবমণ্ডলে মূর্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপ : গুরু ও শিষ্য—বীজ ও বৃক্ষ। এক—শিবসুন্দর সাত্ত্বিক শক্তির প্রতিমূর্তি, আর এক—রাজযোগী কর্মযোগী; এক—সর্ব-সাধনার শেষে পূর্ণজ্ঞানে ভক্তিনম্র শান্তিসাগরে ভাসমান পরমহংস, আর এক—পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও প্রাচ্যের দীক্ষাশেষে জ্ঞান-কর্মযোগী বিবেকানন্দ। এক—উৎস থেকে মহাসঙ্গম, আর এক—জনপদ-মধ্যবর্তী মহাপ্রবাহ।

এই দুই গুরু-শিষ্য মহাপুরুষ যুগপৎ ভাবলোকে ও কর্মলোকে যে বিশেষিত ভূমিকাটি গ্রহণ করেছেন তা মূলত এবং উদ্দেশ্যাত্মকরূপে সাহিত্যিকের নয়, অন্তর্জীবনেরই অবিচ্ছিন্ন বহিঃপ্রকাশ।

নিখিল মানস-সরোবর থেকে উদ্গীত পরমহংস-বাণীর আবেদনে দেশকালসীমা অবলুপ্ত, জাতি-বন্ধন-প্রাচীর অনুপস্থিত, ধর্মসাধনার ঐকদেশিকতা তথা 'স্কুল'-প্রতিষ্ঠা অস্বীকৃত। প্রেম-সরোবরে পরমহংসের কলবাণীতে স্নেহপ্রেমের অবিরাম মধুবর্ষণ,—এবং সেখানে সকলেরই অন্তর্জীবনের চির-আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয়। এই বাণীতে কখনো সমাহিতির নৈর্ব্যক্তিকতা, কখনো জ্ঞানেরই সহৃদয়তা, কখনো ভক্তিমধুর ব্যাকুলতা, কখনো-বা সাংসারিকতার স-ক্ষম যোগ : কখনো ধ্যানী, কখনো জ্ঞানী, কখনো ভক্ত, কখনো-বা সাংসারিক মানুষের একান্ত-সঙ্গী সমব্যথী হিতৈষী।

এই পরমহংসের মহাজীবনের সৌন্দর্য চির-কালের জন্যই বিকশিত হয়ে আছে তাঁর মধু-বাণীতে, আর তারি আকর্ষণে বিবেকানন্দ-প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ ধীমানদের অনেকেই ঘিরে ধরেছেন

তাঁকে—ছুটে বেড়িয়েছেন দেশে-দেশান্তরে, অব্যাহতভাবে অভিব্যক্ত করছেন পরমপুরুষ সম্পর্কে তাঁদের বিচিত্রসুন্দর কত অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান জগতের এক চির-অম্লান শতদল, আর বিবেকানন্দ তাঁর শ্রেষ্ঠ মধুপ—শ্রেষ্ঠ রস-গ্রাহক ও মর্ম-উন্মীলক—একালের শ্রেষ্ঠ এক সাধক-ভাষ্যকার।

এই শ্রীরামকৃষ্ণ কি বিবেকানন্দের বাণী কি রচনায় স্বভাবতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগী-জীবনের অবলম্বন অনুপস্থিত, এবং স্বতই তা প্রচলিত পরিচয়ে রসসাহিত্য নয়। কিন্তু—জীবন তো সাহিত্যের চেয়ে বড়, তাই জীবন থেকে মহাজীবনের অভিপ্রকাশ পঙ্ক থেকে পঙ্কজের স্ফুরণের মতোই। আর অনুভবে ও চেতনায় তা যদি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠরূপায়ণ হয়, তবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জীবনের নিখুঁত বর্ণনায় কিংবা দিশাহারা কুয়াশার চিত্রণে যতই কৃতিত্ব থাক না, তা ওই মহাজীবন ও তার সাহিত্য-রূপের সৌন্দর্যের সমকক্ষ হবার কথাই ওঠে না।

সৎসাহিত্যে জীবন ও বাণীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সৌহার্দ্য। ভাব ও রূপের মধ্যে সেখানে কোনো পর্দা নেই। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব যেমন সমধর্মী তেমনি ভাব ও রূপ—মাঝখানে নেই ছলনার কলাচাতুর্য অর্থাৎ ছলাকলা ('Art of lying')। রামকৃষ্ণ যেখানে সাধক সেইখানেই কবিও—সাধনার বাণী ও বাণীর সাধনা সেখানে সমার্থক। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও তাই। তাই-শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় যে সাহিত্য-সৌন্দর্য তা সততার স্বরূপে ও বিকিরণে একটু অসাধারণ ও অনন্যসম্ভব। এঁদের সাহিত্য-সৃষ্টি থেকে একে একে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করলেই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার কাজ হতে পারে। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী, পরে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রামকৃষ্ণবাণীতে সাহিত্য-সৌন্দর্য

এক : তত্ত্বকথা ও গভীর জিজ্ঞাসার সাহিত্য-রূপ

রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণীতে দুরূহ দর্শন তথা তত্ত্ববস্তুই এমন সহজ ও সহৃদয় প্রকাশে মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে যে সকলের পক্ষেই হয়ে ওঠে তা অনুধাবন-যোগ্য ও অনুভব-সম্ভব। গুরু বিষয়-বস্তুকেই প্রথমে সহজতম ভাষায় বলে নিয়েও সেখানে বিষয়ের যেটুকু গুরুভার তাকেও 'দৃষ্টান্ত' বা 'চিত্রকল্প'-এর প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এমন মর্মগ্রাহী করে তোলা হয় যে সত্যিই তার তুলনা নেই। এমনকি, ওই রামকৃষ্ণবাণীকেই কেউ যদি বুঝিয়ে বলেন বা তার ভাষ্য রচনা করেন তো ওই স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনটির সাহিত্য-সৌন্দর্যেরই হানি ঘটে : গাছ বাঁচে তো ফুল বাঁচে না, ফুল বাঁচে তো সৌরভ বাঁচে না। এমন গুরুত্বপূর্ণ বহুবিষয়ের অফুরন্ত উদাহরণ ছড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ-বাণীবনে। এখানে দু-একটি উদ্ধৃতিমাত্র তুলে ধরছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের সম্পর্কেই প্রয়োগ করা যায় শুরুতে এমন একটি ভারি কথা :

'পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস, যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—"আমার হলেই হলো"। যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ ক'রে আবার লোক-শিক্ষা দেন।'—এবার এই বস্তুতেই যেটুকু ভার তাকেও সহজ করবার জন্য কী সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত অলঙ্কার—'কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়।'

যে কোনো দুর্বোধ্য কি জটিল বিষয়কেই সহজগ্রাহ্য দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্তের নিপুণ প্রয়োগে এমন মর্মমধুর করে তোলা হয়, যার তুলনা কোনো সাহিত্যেই আর নেই। এমন গুরুত্বপূর্ণ বহুবিষয়ের মধ্যে এমনকি অচিন্ত্য ঈশ্বরের

মতো বিষয়েও পরমহংস-বাণী কী সুন্দর! কয়েকটি সহজবোধ্য সর্বজনগ্রাহ্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি বললেন—'অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার?…যদি আমার একঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার?' তবু সেই ঈশ্বরের কথাই জানতে চাইলে পরমহংসদেব তুলে ধরেন ব্রাহ্মণ-ভোজনের চমৎকার চিত্রকল্পটি—'যেমন ব্রাহ্মণভোজনে—প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে ক'রে বস্‌লো, তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল "লুচি আন", "লুচি আন" শব্দ হ'তে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল তখন সুপ্ সুপ্ …—শব্দ নাই বললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।'—ঈশ্বর যে শব্দাতীত বাক্যাতীত এক পূর্ণস্বরূপ সেইদিকেই ইঙ্গিত করা হল ব্যঞ্জনাময় ভাষাচিত্রে। ঐ একই নিগূঢ় প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্ত স্মিত কৌতুকে আরো ব্যঞ্জনা-মধুর। —বাপের বাড়ীতে নববধূ কর্তৃক সখীদেরকে আড়াল থেকে বর চেনানোর নির্বাক্ হাসির সুন্দর দৃশ্যটি। এত গুরু বিষয়ের এমন প্রকাশ-কলায় যদি সাহিত্য না হয় তো সাহিত্য কোথায়?

নির্বিকল্প সমাধি তথা জড় সমাধিতে অবস্থাটা কী রকম হয় তা জানতে চাইলেও পরমহংসদেবের সাহিত্য-সুন্দর ভাষা—'তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল, একটু নেমেই গলে গেল।…তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর।'

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মতো গভীর দর্শনও প্রকাশের মহিমায় হয়ে ওঠে আশ্চর্য সহজ, এবং সেখানে পাণ্ডিত্য স্বতই হার মানে। সাধারণ একটি বেলের দৃষ্টান্ত দিয়ে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পার্থক্যটা ধরিয়ে দেবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—

'বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা।'—শুধু শাঁস নয়, শাঁস বীচি খোলা সমেত গোটা বেলটা ধরলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং সেখানে ব্রহ্ম জগৎময়, তাই জগৎ মিথ্যা নয়। আর, সবটা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে কেবলমাত্র শাঁসটা অর্থাৎ মূলটা দিয়ে বুঝতে গেলে অদ্বৈতবাদ।

সহজাত ভক্তিই যে ঈশ্বরলাভের সর্বোত্তম ও সহজতম পন্থা সে সম্পর্কে তাঁর সহজ বাণী অর্থগৌরবে কত সুন্দর—

'রাগভক্তি প্রেমাভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর কোন বিধিনিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা এক দিক্ দিয়ে গেলেই হ'লো।'—আবার ঐ একই বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের প্রয়োগ—'বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না।… সোজা নৌকো চালিয়ে দিলেই হ'লো।'—এমনি সর্বজনবোধ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ কথকটি এলেন তাঁর মূল বক্তব্যে—'এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বরলাভ হয় না।'

—সকল মানুষের বুঝবার মতো, মনে ধরবার মতো করে কথা বলতে হলে সকল মানুষের মনটিই বুকের মধ্যে ধরে রাখতে হয়। বাণীশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ সেটি জানতেন বেশ ভালোভাবেই। এমনিধারা গাঁয়ের মানুষের সহজ অনুভব ও অভিজ্ঞতার কথা দিয়েই লোকায়তবাণীর এই আদর্শ শিল্পীটি তাই কত অনায়াসেই পরিবেশন করে যান কত না তত্ত্বকথা কি দার্শনিক প্রসঙ্গ! এসব তো বাক্যবাগীশ পণ্ডিতের ছিবড়ে-কামড়ানো

নয়, কিংবা পণ্ডিতম্মন্য দার্শনিকের বক্তৃতাজালও নয়, কিংবা দিশাহারা ভাবুকের ধোঁয়াশাও নয়। এ যে সরলতম বোধেরই সহজতম প্রকাশ।

ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন সেব্য ও সেবকের কথা—'সেব্যসেবকভাব খুব ভাল। আর দেখো গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না।'

অহং-সমর্পিত ভক্তেরও ব্যক্তিবোধ থাকে, কিন্তু সেটা বিচ্ছিন্ন এক স্বাধীনসত্তা নয়,—পরমসত্তার বা ঈশ্বরসত্তারই অধীন এক অচ্ছেদ্য অংশ, তাই 'গঙ্গারই ঢেউ', 'ঢেউয়ের গঙ্গা' নয়। কত সহজ কথায় উদ্ভাসিত হল সত্যবস্তু!

'আমি' ও 'তুমি'—অহং-সত্তা ও অহং-সমর্পিত সত্তা সম্পর্কে বাক্‌শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ কতবার কতরকম দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সহজ প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে: 'হাম্বা-হাম্বা—তুহুঁ-তুহুঁ'; 'বুড়োর আমি ও বালকের আমি'; 'কাঁচা-আমি ও পাকা-আমি'; 'ব্যাঙাচির লেজ-খসা'; 'হোমাপাখীর ডিমফোটা বাচ্চা'; 'রামের ইচ্ছা'—এমন আরো কত। আলঙ্কারিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ একবিষয় এককথায় প্রকাশ করেই তৃপ্ত নন—একবিষয়ই অভিব্যক্ত করেছেন বহুরূপে বহুরঙে।

অধ্যাত্ম-সন্ধানী ও ভক্তিমার্গী সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-বাণী উচ্চারিত হয়েছে সহজ পথনির্দেশের সহৃদয়তায়, এবং তা আত্মীয়বৎ সমস্তর আলাপেরই মতো: 'ঈশ্বরেতে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। এর পর পেন্সান্ ভোগ করবে।'—সাংসারিক লোককে বোঝানো হল সাংসারিক-ভাবে বুঝবার ভাষায়। কথাশিল্পী পরমহংস সবসময়েই উঁচু বিষয়কে নিচু জায়গায় কাছে এনে স্মিত হাস্যে তা পরিবেশন করেন—এখানে 'পেন্সান্ ভোগ' কথাটির আকস্মিক প্রয়োগ বড়ই আনন্দদায়ক।

সর্বধর্মপ্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অবিদ্বেষী উদার দৃষ্টিতে দেখেছেন ঈশ্বরলাভের জন্যে সব পথই সমান। এখানে উঁচু থেকে বা দূর থেকে পথ-দেখানো নয়, নিজেই যেন বিশ্বাস জাগিয়ে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে পথ দেখানো। নানা মত ও নানা পথের বিরোধ-বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের মধ্যে দ্রষ্টাপুরুষ পরমহংস তাই বললেন—'যত মত, তত পথ।'—মতে মতে সংঘর্ষ ও পথে পথে বিরোধের এর চেয়ে সহজ সমাধান আর কিছুই হতে পারে না, এবং যে কোনো দেশের যে কোনো শুভবুদ্ধি লোকের কাছেই এটা সানন্দে বরণযোগ্য ধর্মাদর্শ। তবে কিনা, মনে প্রাণে ঐকান্তিকতা—একান্ত-নির্ভরতাই আসল কথা, তখন পথের জন্য ভাবতে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ এটাই বললেন সুন্দর এক ঘরোয়া উদাহরণ দিয়ে—'বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে—কখনও হেঁসালে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।'

একের পর এক দৃষ্টান্ত ও ঘরোয়া চিত্রকল্পের সাহায্যে কঠিন বিষয়েরই সহজ অভিব্যক্তি মুগ্ধ হয়ে দেখবার মতো। দৃষ্টান্ত যেমন নতুন নতুন, নতুন তেমনি ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী। সংসারে কিভাবে থাকতে হবে, তা বোঝাতে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন 'বড় মানুষের বাড়ির দাসী'র। ঐ একই বিষয়ের উপর সুন্দর আর একটি নতুন ধরনের দৃষ্টান্ত: 'কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায় কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান?—আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে।'—এই বলেই এলেন তিনি মূলবিষয়ে—'সংসারের সব কর্ম করবে কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।'

তবে, পাত্রবিশেষের অধিকার-অনুসারে একটু আলাদা-আলাদা ব্যবস্থা চাই তো বটেই। এ

প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত করলেন বহুসন্তানের সংসারে গিন্নিমার দৃষ্টান্তটি : 'এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন—যার যা পেটে সয়! কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চচ্চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয় —বুঝলে?' —এত ঘনিষ্ঠ গৃহস্থালী-চিত্রে মূল-বিষয়টিকে উদ্ভাসিত করতে পারাটা প্রথমশ্রেণীর ভাবশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। আর, এসব কথার সঙ্গেই যেন বক্তার স্মিত-সুন্দর মুখখানিও আমরা দেখতে পাই একেই বলে জ্যান্ত ভাবের জ্যান্ত ভাষা।

ভাবসমাধিতেই আত্মহারা থাকতেন না শ্রীরামকৃষ্ণ, নেমে আসতেন সাধারণের জীবনস্তরে—পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনের আঙিনায় লোকহিতায়। সাংসারিক জীবনাশ্রয়ী গৃহী, ভোগী, বিলাসী, মাতাল, অভিনেতা-অভিনেত্রী—এমনকি ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা চরিত্রদের মধ্যেও ছিল তাঁর সহৃদয় আত্মপ্রকাশ —ছিল বেদনা-ঘন সহানুভব ও করুণা-স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত। শুদ্ধসত্ত্ব পরমহংস সত্যেই উদ্ভাসিত দেখতে চেয়েছেন মানুষকে—আপাত যা দুর্বলতা বা অশ্রেয়তা বা পাপ তাকে ঝেড়ে ফেলে মনুষ্যত্বের বোধনকেই তিনি বড় করে তুলে ধরেছেন দেবত্বের দিকে—এমনকি সত্যচেতনার বা ধর্মবোধের সাময়িক স্ফুলিঙ্গকেও বড় করে দেখাতে চেয়েছেন পরম আশ্বাসের মতো,—জঙ্গলের মধ্যেই বিশ্বাসের বীজ বপন করার মতো একটুখানি ফাঁকা জায়গাকেই দিয়েছেন প্রশস্ত গুরুত্ব। সংসারে থেকেই ধর্মজীবন কি অধ্যাত্মজীবন যাপন করাটা যে সংসারী মানুষের পক্ষে শ্রেয়—সেকথা পরমহংসদেব বলেছেন তাঁর মানবিক বোধের নির্দেশেই। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিবেচক যথোক্তি নতুন নতুন দৃষ্টান্তে পরিবেশিত : 'তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয় তা না হ'লে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়।'—এর পরেই রূপক-অলঙ্কারে মূল-বিষয়টি প্রকাশিত—'ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।' 'কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হ'লে নির্জন হওয়া চাই।'—এখানে এই মূলবক্তব্যের প্রকাশে যেটুকু স্থূলতা তাকে শোভন করে না বললে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিশীলিত মন তৃপ্ত হয় না। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুন্দর এক দৃষ্টান্ত অলঙ্কার-যোগে বললেন—'মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাত্‌তে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে ব'সে সব কাজ ফেলে, দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।'

—এমনি করে কথার পর কথার ডালি সাজিয়ে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়ে কী অপরূপ প্রকাশ-কলা! এমন অধিকার একমাত্র শ্রেষ্ঠ বাণীশিল্পীর স্বাভাবিক অধিকারেই থাকা সম্ভব।

দুই : সংহতি-সৌন্দর্য

অবিরাম বাণীর সাজ যেমন পরমহংসদেবের প্রকাশকলার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তেমনি উল্লেখ-যোগ্য বাণী-সংহতি। কখনো কখনো কী অল্প কথায় চমৎকারভাবেই না প্রকাশিত হয়েছে গূঢ় সত্য! এমন অজস্র উদাহরণের মধ্যে দু-তিনটি প্রসঙ্গ মাত্র তুলে ধরছি : 'তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। যেমন লাউ-কুমড়ো গাছে আগে ফল হয় তারপর ফুল।' 'ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে, সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জেলে রাঁধা, খাওয়া, হেউ-ঢেউ হ'য়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী।'

'ঈশ্বর লাভ হ'লে আর কর্ম থাকে না। ফল হ'লে ফুল আপনিই ঝরে যায়।'

'গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।'

'"আমি" ও "আমার" এই দুইটি অজ্ঞান। "তুমি" ও "তোমার" এই দুইটি জ্ঞান।'

'সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।...ব্রহ্ম কি বস্তু কেউ এ পর্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই।'

'অহং লাঠিটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অর্থাৎ লাঠিটা থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল ও একভাগ জল।'

এমনি নিবিড় উপলব্ধি কি গভীর জ্ঞানের কথা উচ্চারিত হয়েছে কত না সংক্ষিপ্ত বাক্যে! এসবের অনেকটাই প্রবাদরূপে অর্থাৎ কিনা রামকৃষ্ণ-প্রবাদরূপে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পেতে পারে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পরে প্রবাদ-বাক্যের [বিশেষোক্তি বা সুভাষিতের] এমন সুন্দর প্রয়োগ আর মেলে না। কয়েকটি মাত্র এখানে সানন্দে তুলে ধরছি: 'যত মত, তত পথ'; 'ধ্যান করবে মনে, বনে, কোণে'; '...সারে মাতে আছ' [উৎকৃষ্ট অংশেও (যোগে) আছ, নিকৃষ্ট অংশেও (ভোগে) আছ—অর্থে]; 'লোক পোক'; 'সতের রাগ ...জলের দাগ'; 'জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে, ভক্তি অন্দর মহলে যায়'; 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'; 'গোলমালে মাল আছে'; 'ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লেও ছোলাগাছই হয়।'

আর একটি উল্লেখ্য বিশিষ্টতা পারিভাষিক প্রয়োগ—রামকৃষ্ণবাণী বাংলা পরিভাষার ভরা ভাণ্ডার। এ প্রসঙ্গে আলোচনা খুবই ঔৎসুক্য-জনক এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার দাবী রাখে।

তিন: কথক পরমহংস—কথাকলাকার

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজে কিছুই লিখে যাননি (যাকে লেখাপড়া বলে তা তো জানতেনই না), কিন্তু অবিরাম কথার মধুস্রোত বয়ে চলেছে তাঁর কণ্ঠ থেকে—দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর,—এমনকি গলক্ষতের গুরুতর ব্যাধিতে (ক্যান্সারে) মুমূর্ষু থাকা কালেও তাঁর কথার বিরাম ঘটেনি। ডাক্তারের নিষেধ শোনেননি, ভক্ত শিষ্য হিতৈষীদেরও নয়। কারণ, কথাছাড়া তিনি যে বাঁচতে পারেন না—মহাসরস্বতী মা তাঁকে অমৃতবাণী বিতরণ করবার জন্যেই তো পাঠিয়েছেন। আর, অমৃত বিতরণের ভার যাঁর উপর, তিনি তা কেমন করে বয়ে বেড়াবেন বুকের মধ্যেই। এই কথামৃত পরিবেশনের আনন্দে তিনি একালের শ্রেষ্ঠ কথকই নন—সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাণীসাধক বাণীশিল্পী। এবং তা উদ্দেশ্যাত্মক কোনো বক্তৃতা বা ভাষণ নয়, সুহৃজ্জনের কাছে মনখোলা আলাপন—হৃদয়রাজ্যের দোরখোলা সম্ভাষণ। তাই তাঁর ভাষা কেবল পশ্চিমবঙ্গের সর্বজনের আদর্শ কথ্যভাষাই নয়—প্রাণশোভন ভাষা, এবং লোকসাহিত্যেরও যথার্থ আদর্শ ভাষা। এ ভাষা গদ্য হয়েও কবিতার মতো কমনীয় এবং অনুভব-সজীব। সাহিত্যশিল্পীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ তাই লোককবি।

লোকসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্টতম পরিচয় তাঁর গল্পপরিবেশনের নিপুণ দক্ষতায়—পরিমিত আকারের গল্পগুলির প্রত্যেকটিই বিশিষ্টার্থে অভিব্যক্ত। শ্রীমুখে কথিত এই গল্পগুলির অধিকাংশই দেখা যায় 'কথামৃত' গ্রন্থে, কিছু আছে স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ। গল্পগুলি বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ কি ঈশপের নীতিগল্পের মতো নয়, কারণ এখানে নীতি-প্রচারের উদ্দেশ্য নেই বললেই হয়—নীতিগল্পকারের হিতৈষী প্রয়াসের ব্যবধানটুকুও এখানে অনুপস্থিত। আবার, সক্রেটিস কি কনফ্যুশাসের জ্ঞানগর্ভ বাণী নয়,—তা গল্পের মেজাজেই খাপ খায় না, চেহারায়ও মেলে না। কিছুটা বরং বাইবেলের 'প্যারাব্‌ল'-এর সঙ্গেই এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় আকারে ও প্রকারে। কিন্তু এই কথামৃত-গ্রথিত গল্পগুলি সাহিত্যমূল্যে আরো

সুন্দর: এখানে বর্ণনাগুণেই প্রত্যক্ষ করা যায় চলতি ভাষার জীবন্ত স্বরূপ—ঠিক চলচ্চিত্রের মতো, তদুপরি বক্তার মৃদুহাসির মধুজ্যোৎস্নায় গল্পগুলির প্রত্যেকটিই হয়েছে উদ্ভাসিত। অনেক গল্পেই ভাবগৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চিত্রকল্পের মাধ্যমে। সববয়সীদের কাছেই এই গল্পগুলির সার্বজনীন আবেদন, এবং খাঁটি লোকসাহিত্যের মতোই আমরা ভুলে যাই এসব কার রচনা। [তবে, এটা এক গবেষণার বিষয়, গল্পগুলির কতটা শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত স্বকীয় সৃষ্টি, কতটা নতুন করে পরিবেশিত] শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত অপরূপ গল্পমালার কয়েকটি মাত্র এখানে বিষয়োল্লেখেই তুলে ধরা সম্ভব: যেমন—মাস্তুলের পাখী; রামের ইচ্ছা; হাতী নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ; ব্রহ্মচারীর উপদেশ ও সাপ (দংশন নয়, ফোঁস ফোঁস); সংসারে কে কতখানি আপন গৃহীকে তা সাধু কর্তৃক শিক্ষাদান; পঞ্চভূতের ফাঁদে নারায়ণের বরাহ-জীবন; বহুরূপীর (গিরগিটির) দৃশ্য; সাধুর মার খাওয়া ও দুধ খাওয়া; চাষার রোক (তীব্র বৈরাগ্য-এর দৃষ্টান্ত)।—গল্পগুলি বুদ্ধদেব-কথিত (?) জাতকের গল্পের মতোই—মূলবক্তব্যের অন্তরাল-ধর্মিতার দিক থেকে, তবে সেক্ষেত্রেও সংক্ষিপ্ত আকারে এই কথামৃতের গল্প আরো জীবন্ত, সমৃদ্ধ এবং প্রাণময়। গল্পগুলিতে যে কৌতুকের ভঙ্গীটি জড়িয়ে আছে তাতে সুকুমার সাহিত্যেরই পরিচয়। আসলে এসব রূপকগল্পেরই সমধর্মী, মূল আবেদনটি তলিয়ে গিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয় না—সরাসরিই তা অনুভব ও বোধগ্রাহ্য। তাই রূপকগল্পের সমধর্মী হলেও রূপক নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্পমালার অনেকটাই লোকসাহিত্যে উচ্চমর্যাদায় সমাসীন হবার যোগ্য।

চার: অবলম্বন-বৈচিত্র্য

সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাসে দেখা যায় কেবলমাত্র উচ্চভাবাশ্রয়ী উপাদান বা বিষয়কেই সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয়নি, বরং ক্রমান্বয়ে সেখানে ঘটেছে তুচ্ছ ও অবহেলিতের যথাস্থান ও যথা-মূল্যবোধ। এটা লোকসাহিত্যেরও উত্তরাধিকার বটে। রামকৃষ্ণবাণী এদিক থেকে বিস্ময়কররূপে অগ্রসর। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চমৎকার ধরা দেয় এই অবলম্বন-বৈচিত্র্য। অন্তরীক্ষ থেকে মর্ত্যলোক ও মহাকাল থেকে মহাকাশই নয়, অতিতুচ্ছ কীটপতঙ্গ পর্যন্ত অবাধে ঠাঁই পেয়েছে এখানে। বিষয়ের এই উদার অধিকার, অনুভবের এই মুক্তদ্বার, মহানের সঙ্গেই সাধারণের এই সহাবস্থান সাহিত্যের উপাদান ও আশ্রয় সন্ধানে সংস্কারমুক্তির বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত—আধুনিক কালের কোনো কথা-সাহিত্যিক এমনকি পুরানোদিনের কোনো লোক-সাহিত্যিকের বা কথকের ক্ষেত্রেও প্রকাশের তাগিদে এমন সর্বগ্রাহ্যতা দেখা যায় না, বাংলার প্রাচীন লোক-কাব্যের কবিকঙ্কণও এখানে পাশে দাঁড়াতে পারেন না। আর, এখানে কেবল গ্রামজীবন তথা লোকজীবনের পরিচিতিই পাওয়া যায় না—স্বর্গমর্ত্যের প্রায় সবকিছুরই এমন সুন্দর আবাহন ও প্রতিষ্ঠা রামকৃষ্ণবাণীর এক অনন্যসম্ভব মহিমা। কুমুরে পোকা, বাহুলে পোকা, জোনাকী, চামচিকে, চড়ুই, সাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, পানকৌড়ি থেকে কুমড়ো ফুল; আবার চচ্চড়ি, ভাজা, ঝোল, অম্বল, দই, মেঠাই—এমন কতকিছুই উদার আশ্রয় পেয়েছে সমদৃষ্টি পরমহংসের কথায়, কেবলমাত্র সূর্য, চন্দ্র, আকাশ কি নদী, গিরি, সাগরই নয়। অথচ এসবই প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়ক অনুসঙ্গ, মূলবিষয় নয়,—মূল-বিষয়কেই উদ্ভাসিত করার সাহিত্যিক প্রয়োজনে গৃহীত। রামকৃষ্ণবাণীতে এই প্রসঙ্গটা বৈচিত্র্যসন্ধানীর দৃষ্টিতে বেশ ঔৎসুক্য-জনক বটে।

পাঁচ: প্রকাশকলা-বৈচিত্র্য

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী বহুবিষয়াশ্রয় এবং সেখানে নব নব প্রকাশকলা। মূলভাববস্তু এক হয়েও অনেক সময়েই প্রকাশরীতিগুণে তা যে অভিনব রূপে দেখা দিতে পারে সেকথা সাহিত্যশিল্পীমাত্রেই জানেন—ঠিক মনের মতো করে বলার তাগিদেই তা হয়ে উঠতে পারে বহুরূপ। একঘেয়েমি—তা একতারার সুরে হলেও বা, সৎ অর্থাৎ সুন্দর সাহিত্যের জগতে পরিত্যাজ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যথার্থ বাণীশিল্পীর মতোই যেমন বিচিত্র রসের রসিক, তেমনি বিচিত্র রূপেরও শিল্পী—কখনোই একঘেয়ে নন। আর তাই তো, তাঁর বাণী বার বার শুনলেও কখনই ঔৎসুক্য হারায় না, ক্লান্তি আসে না। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথাই এখানে তুলে ধরছি—'আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচরকম করে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে, অম্বলে, কখন বা ভাজায়।'

ঠিক কথা, রামকৃষ্ণকথা বহুরকমের স্বাদে ভরপুর,—কিন্তু সেই রসাস্বাদ কখনো কোনো কারণেই কোথায়ও ফেনিয়ে বা গেঁজিয়ে ওঠে না, মধুর ভাবাবৈচিত্র্যের মধ্যেই এত পবিত্র সংযম।

ছয়: শেষ বক্তব্য

অধ্যাত্মজীবনের পথনির্দেশ কিংবা চেতনা-সঞ্চারের কথা যেখানে, সেখানেও রামকৃষ্ণ গুরু সেজে গুরুগিরি করেন না—গুরু-সচেতন ভাবভাবনা বা ভাবভঙ্গী সেখানে অনুপস্থিত, এবং সেখানে কী স্নিগ্ধশান্ত তাঁর বাণী —ঠিক যেন সুরভিত জ্যোৎস্নার মতো বা দেবধূপের গন্ধের মতো ছড়ানো। আর, সেখানে কী স্বর্গীয় করুণা-বর্ষণ! তাঁর সেই প্রাণজুড়ানো করুণা তাঁর কণ্ঠস্বরে, তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর আচরণে। এসবই আমরা তাঁর জীবন্ত বাণীলোকে প্রত্যক্ষ করি আজো। না, উচ্চাসন থেকে পরিবেশিত নয়, সকলের মধ্যমণিরূপে নিবেদিত। তাই রামকৃষ্ণবাণী অধ্যাত্মসাহিত্য; জীবনেরই মর্মবাণী, কেবল ধর্মবাণী নয়। তার অর্থ, কোনো নির্দিষ্ট ছকের বা বেড়ার মধ্যে রেখে এই মহা মানব-সুহৃদটি তাঁর প্রেমের বাণীকে সঙ্কুচিত ব্যাহত কি বিকৃত করেন না, বা সাজসজ্জায় তুলে ধরেন না বহিরঙ্গ আয়োজনের কারু-কৃতিত্বে। এখানে যেটুকু চারু-কৃতিত্ব তা-ই কারু-কৃতিত্ব। ধ্যানী যদি ভাবুক হন—জ্ঞানী যদি প্রেমে শান্তিলাভ করেন, তবেই এমনটা সম্ভব। একেই বলে সারল্যের সৌন্দর্য, সামঞ্জস্যের সুষমা—ভাব ও রূপের একাত্ম মিলনের মহিমা। বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র বাউলের গানে ও রামপ্রসাদীতে আর কিছুটা-বা পালিসাহিত্যের 'ধম্মপদ'-এ এবং ইংরেজী সাহিত্যে বাইবেলের 'The Book of Proverbs'-এ ও 'The Song of Solomon'-এ এর সাদৃশ্য মেলে। তবে সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্র-বিচারে রামকৃষ্ণ-কথামৃত অতুলনীয়। সত্যিই, মুখের কথার প্রাণময় গতিভঙ্গিমার সহজ সৌন্দর্যে, উপমায়-দৃষ্টান্তে ও চিত্রকল্প-সজ্জায়, গভীরতম জ্ঞানের সরলতম প্রকাশরীতিতে, এবং সর্বোপরি স্মিত-হাসির সহৃদয় কৌতুক-কিরণে আর প্রেমময় অনুভবের স্পর্শে পরমহংসবাণী কালজয়ী সাহিত্য-সৌন্দর্যে উচ্চারিত। যুগপৎ ভাবের গভীরতা ও প্রকাশের সরলতাকে যাঁরা উচ্চমান সাহিত্যের স্বরূপ মনে করেন সেই বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিক ও দরদী সমালোচকবৃন্দ রামকৃষ্ণ-কথামৃতকে উচ্চসাহিত্যের সর্বপ্রিয় মানমন্দিরে ঠাঁই দেবেনই।

কালজয়ী কথামালাকার রামকৃষ্ণ, সহজকথার রত্নভাণ্ডারী রামকৃষ্ণ, বাণীচিত্রশিল্পী রামকৃষ্ণ, পরিভাষা-দক্ষ রামকৃষ্ণ, আলঙ্কারিক রামকৃষ্ণ—বাগ্‌রীতির আদর্শ প্রবক্তা রামকৃষ্ণ, পরমভাব-সাধনার বাণীকার এবং অমৃতজীবনের কবি

শ্রীরামকৃষ্ণকে আসুন আমরা সর্বজনীন সর্বকালীন সাহিত্যের উচ্চবেদীতে বরণ করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরমহংসের ঘনিষ্ঠতম শিষ্য

বিবেকানন্দ জ্ঞানদীপ্ত বলিষ্ঠ পুরুষ: স্থিতি নয় গতি, সমাহিতি নয় উদ্দীপন ও বিকিরণ, ভক্তি-যোগের আগে শক্তিযোগ। জাগতিকতার অধিকার এড়িয়ে আধ্যাত্মিকতা নয়, তাই তো দরিদ্র মূর্খ স্বদেশবাসীকে ভালোবাসা ও আত্মীয়বৎ সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরচেতনা: 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'—এই হল স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব-পরিচিতি।

বিবেকানন্দের এই ব্যক্তিত্বই তাঁর বহুমুখী বাণী ও রচনায় প্রতিষ্ঠিত। একে একে আমরা তার কিছু পরিচয় গ্রহণ করব।

এক: উদ্বোধনী সাহিত্যের সৌন্দর্য

বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় যে সাহিত্য-স্বরূপ সবচেয়ে সমুজ্জ্বল কান্তিতে উদ্ভাসিত সেখানে মননশক্তির দুর্বার বেগ ও হৃদয়ধর্মের ব্যাকুল আবেগের বিস্ময়কর এক সুষম সমন্বয়। পৌরাণিক যুগের সংগ্রামী নায়কশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কম্বুকণ্ঠে আত্মবিস্মৃত অর্জুনসখার কাছে সর্বাত্মক উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে যে সংগ্রামী আহ্বান বিঘোষিত হয়েছিল—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।'—আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ভারতনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ব্যাপক এক অগ্রণী অংশেই আমরা আবার শুনতে পাই ওই আহ্বান—শুনতে পাই আত্মচেতনার বোধনমন্ত্র: 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'—ওঠো, জাগো, যা শ্রেয় তাকেই বরণ করো। বিবেকানন্দের বিচিত্র সাহিত্য-সন্দর্ভের এইটিই একমাত্র সুর না হলেও, প্রধান সুর। 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পত্রাবলী' এবং 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে'র কিছু কিছু অংশে বিবেকানন্দ-সাহিত্যে এই তেজবিকিরণের সৌন্দর্য। আর, তারই বিদ্যুৎ-স্পর্শে একসময় উদ্বোধিত হয়েছে সমগ্র ভারত এবং এমনকি বহির্ভারতও—সুশিক্ষিত যুবসম্প্রদায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে লোকহিতায় দেশ-হিতায় বিশ্বহিতায়। বিবেকানন্দের এই উদ্বোধনী ভাষা ভাষাই নয়—উদাত্ত মন্ত্র, মন্ত্রই নয় মহা-ব্যক্তিত্বের অমোঘ আহ্বান। জাতিভেদখিন্ন আত্মবিস্মৃত এবং পরানুকরণ-দুষ্ট ভারতকে আত্মস্থ করবার জন্য তাঁর বীরবাণী আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে:

'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?'—এবং এই চেতনবাণীর পাশাপাশিই বিবেকানন্দ-বাণীতে উদ্দীপিত হয়েছে আত্মোৎসর্গের আহ্বান—আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার আহ্বান:

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র...।"

বিবেকানন্দ-বাণীতে বিঘোষিত হয়েছে জাতি-ভেদে বিদীর্ণ-বক্ষ ভারতকে সুস্থ ও ঐক্যবদ্ধ করার দাবীরই হৃদয়-মথিত আহ্বান,—এই আহ্বানে ভাবের যে সরাসরি আবেদন তার তুলনা বড় আর নেই:

'ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে

বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই;···ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ···।'—ভাবের আবেদনকে ক্রমান্বয়ে সপ্তস্বরগ্রামে তুলবার এই যে আবেগময় চারুকৃতিত্ব তা বাংলাসাহিত্যে চিরসমাদৃত হবার যোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ-বিরচিত নবযুগের উদ্বোধন-বাণীতে যে নিরাবরণ সাহিত্য-রূপ, সেখানে দেখি সারল্যের সঙ্গেই তীক্ষ্ণতা, ভাবভাবনার গতিবেগের সঙ্গেই প্রাণাবেগ, এবং সেখানেই চলতি বাংলার জীবন্ত স্বরূপ। অতীত ভারতের ফাঁপা অহঙ্কারে প্রমত্ত উচ্চসমাজকে চূড়ান্ত ধিক্কার ও মৃত্যুকামনা জানিয়ে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বিবেকানন্দ আবেগোদ্বেল অথচ সংহত ভাষায় আহ্বান করেছেন গণশক্তির অভ্যুত্থানকে: এবং একে বলা যায় আধুনিক ঋষিপুরুষ-কর্তৃক গণ-বন্দনা:

'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনা-ওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে;···এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!!'

—এ কেবল জোরালো চলতিই নয়—এ ভাবে ভাষায় গদ্যকবিতা—স্পন্দমান গদ্যছন্দ: 'প্যাসন্‌ড প্রোজ'। আরও লক্ষ্য করবার এই জ্যান্ত ভাষার নাটকীয় গুণ। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ যে স্বরূপে দণ্ডায়মান তাতে আমরা যেন প্রত্যক্ষ করতে থাকি তাঁর ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নায়ক-সত্তাকেই—প্রত্যক্ষ করি তাঁর অবয়বে উদ্ভাসিত ভাবগরিমা, উচ্চশ্রেণীর প্রতি ভর্ৎসনার ভ্রূকুঞ্চন আর পতিত সাধারণ মানুষের জন্য প্রদীপ্ত প্রত্যয় ও বিহ্বল সমবেদনা। এত জ্যান্ত ভাবের এমন জ্যান্ত ভাষা সমগ্র বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ। পরবর্তী কালে প্রবন্ধকার-সমালোচকরূপে প্রমথ চৌধুরীর চলতি বাগ্‌রীতিতে যে তীক্ষ্ণতা ও বক্তব্য-প্রকাশের সংহত সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায় তা এই বিবেকানন্দেরই উত্তরাধিকার বলা অসঙ্গত মনে নাও হতে পারে, তবে প্রমথ চৌধুরী যখন বুদ্ধিদ্বারাই প্রধানত নিয়ন্ত্রিত এবং রচনার পশ্চাতে তাঁর মনের আবেগ-বর্জিত স্বতন্ত্র অবস্থান লক্ষ্য করা যেতে পারে, বিবেকানন্দ সেখানে মননের সঙ্গে হৃদয়ের, বুদ্ধির সঙ্গে সমবেদনার এক সুষম সমন্বয়।

দুই: ব্যঙ্গ-সৌন্দর্য

বেশ কিছু প্রসঙ্গেই বিবেকানন্দ-রচনায় দেখা যায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাঘাতে লঘু-গুরু ভাষায় কশাঘাত, কখনও বা শরবর্ষণ। অব্যর্থ প্রয়োগশক্তিগুণে এ ভাষা কখনই পুরানো হয় না, মরচে পড়ে না বা ধারও ক্ষয়ে যায় না। সমালোচনা ও সংশোধনেচ্ছায় ভাষা যে কত মধুমাখা হুল হয়ে উঠতে পারে তার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বিবেকানন্দের বিভিন্ন রচনায়, এর মধ্যে 'ভাববার কথা' সবচেয়ে উল্লেখ্য। এই বইটি থেকে ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে ধরছি:

"বলি রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে

না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার ওপর নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টামিগুলোও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর, বল দেখি ?

"রামচরণ—'সে সোজা কথা, মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।'"

আর একটি উদাহরণের অংশবিশেষ : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ থেকে :

"যার দু'পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা মিঠাই খাওয়াবে !! ভাত রুটি খাওয়া অপমান !! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না তো কি ?...ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ী চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে ; 'কলকেত্তা'ই হওয়ার এই ফল !!" —এই জ্যান্ত ভাষার এক বিশেষ লক্ষণ এর গতিভঙ্গিমা এবং খাপমতো ব্যঙ্গবর্ষণে চেতনার উদ্দীপন।

বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা করেই বিবেকানন্দের স্বকীয় শ্লেষাত্মক বাগ্‌ভঙ্গী বড়ই উপভোগ্য : 'যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।...আহাহা! কি প্যাচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি ; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা ক'রে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রের কি ধুম !!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না ; আবার সে গানের মধ্যে প্যাচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ!' এবং এ প্রসঙ্গে বাগ্‌রীতির আদর্শ প্রবক্তা বিবেকানন্দের সুচিন্তিত বক্তব্য—'...যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।'

—তবে, নবজীবনের নায়ক বিবেকানন্দ এই অনন্যকরণীয় ব্যঙ্গ পরিবেশন করেই তৃপ্ত হন না, অবশেষে তুলে ধরেন সুস্থ সিদ্ধান্ত—'...জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।'

তিন : রম্যরচনা—চিত্ররচনা

বর্ণনাশক্তি ও চিত্রাঙ্কনদক্ষতা বিবেকানন্দ-রচনার এক উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। বিবেকানন্দ এসব প্রসঙ্গে বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গ্রহণ করেছেন বিচিত্র বাগ্‌রীতি—চলতিই প্রয়োগ করেছেন লঘু কিংবা গুরু ভঙ্গিমায়, কখনো-বা লঘু-গুরুর মিশ্র-রীতিতে। লঘুভঙ্গীতে বর্ণনার অবিস্মরণীয় ভাষাচিত্র 'হাঙ্গর-শিকার'। রঙীন এক সবাক্ ছায়াচিত্রের মতোই সার্বিক ও বিশেষিক—একই সঙ্গে দূর থেকে এবং কাছ থেকে দেখা নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ এই বর্ণনা—এখানে লেখক ও পাঠক সকৌতুকে একই সঙ্গে যেন উপভোগ করতে থাকেন এক নাট্য দৃশ্য : শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য, হাবভাবভঙ্গিমা, কথোপকথন (এমনকি দুই হাঙ্গরের)—সবই এখানে বর্ণনাগুণে একেবারে জ্যান্ত। আর, সেই সঙ্গেই শব্দপ্রয়োগ-কৌশলে ও কৌতুকদৃষ্টিপাতে খুশিতে ঝলমল করছে সমস্তটাই। এমন রমণীয় রচনার উদাহরণ কমই আছে।

এবার বর্ষাকালে পল্লীবাংলার বহুরঙ পটে

RAMAKRISHNA VEDANTA ASHRAMA
DARJEELING

AN APPEAL

Phone : Darjeeling 2091

দার্জ্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বাসগৃহ সংরক্ষণার্থ আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ২৫ বৎসর যাবৎ (১৮৯৬-১৯২১) ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও বিশ্বজনীন বেদান্ত ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পার্বত্য-অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের উদার ভাবধারা প্রচারের জন্য সর্বপ্রথম দার্জ্জিলিঙএ 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম' স্থাপন করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই আশ্রমের যে-গৃহে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ দীর্ঘ দিন বাস করিয়া গিয়াছেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী ও জনসাধারণের অনেকের কাছেই তীর্থস্থানস্বরূপ। দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক দার্জ্জিলিঙ-ভ্রমণে আসিয়া সেখানকার অন্যান্য দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে স্বামীজী মহারাজের ব্যবহৃত দ্রব্যাদিসজ্জিত এই বাসগৃহখানিও দর্শন না করিয়া ফিরিয়া যান না। নানাকারণে, বিশেষ করিয়া পার্বত্য-অঞ্চলের ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বর্ষার প্রকোপের ফলে, পঞ্চান্ন বৎসরের পুরাতন এই গৃহের দেওয়াল, কাষ্ঠনির্মিত ছাদ এবং কোন কোন স্থানে ভিত্তি পর্যন্ত দুর্বল হইয়া ইহার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বহু স্মৃতি-বিজড়িত এই বাসগৃহখানি সংরক্ষণের জন্য আমরা বিশিষ্ট স্থপতি ও কুশলী বাস্তুকারদের পরামর্শ লইয়াছি—যাহাতে এই গৃহের মূল কাঠামো ও প্রাচীন আকার বজায় রাখিয়া পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়। ইহার জন্য আনুমানিক আড়াই লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

বর্তমান সংস্কারকার্যের জন্য অপরিহার্য এই বিপুল অর্থ আমাদের না থাকায় আমরা শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলী, স্বামীজী মহারাজের ভক্ত, শিষ্য ও জনসাধারণের নিকট একান্ত অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য আছে, এই সৎকার্যে সাহায্য করুন। সর্বপ্রকার দান 'সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জ্জিলিঙ-৭৩৪১০১' এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত-স্বীকৃত হইবে।

চেক পাঠাইলে 'Ramakrishna Vedanta Ashrama, Darjeeling', এই নামে লিখিয়া দিবেন। এই দান সরকারী আয়কর-মুক্ত।

স্বামী সচ্চিদানন্দ
সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম,
দার্জ্জিলিঙ

RAMAKRISHNA VEDANTA ASHRAMA, DARJEELING.

AN APPEAL

for protection of dwelling house of Srimat Swami Abbedanandajee Maharaj

Srimat Swami Abhedanandajee Maharaj, direct disciple of Bhagawan Sri Sri Ramakrishna Paramahansa Dev and a beloved brother-disciple (Gurubhai) of Swami Vivekananda, after preaching the message of his Master and the Universal Religion and Vedanta for 25 years (1896-1921) in Europe and America, returned to India in 1921. He established the Ramakrishna Vedanta Ashrama in 1924, at Darjeeling, to spread education amongst the Hill-people. The house of the Ashrama, in which the Swami lived for years together, has now become a pilgrimage to good many devotees and admirers of the Ramakrishna Order and also to general public. Every year from far and abroad many travellers come to Darjeeling for sight-seeing and most of them do not miss the opportunity of visiting the house in which the Swami lived, which is preserved with his belongings.

The walls, the wooden-roof and some places upto the foundation of this building have become so delicate that these require immediate repairs.

So, to protect the dwelling house, associated with various memorable incidents of the Swamijee Maharaj, we have consulted the expert Architect and Engineers for repairing the building, keeping its exact original form and structure, and they have advised that about a sum of Rs. 2,50,000/- (Rupees two and half lakhs) will be required to serve the purpose.

We are earnestly requesting the devotees and disciples of the Swamijee Maharaj, the admirers of the Ramakrishna Circle and also the generous public to extend their gracious help towards this noble cause.

Any contribution, may be sent to the Secretary, Ramakrishna Vedanta Ashrama, Darjeeling, PIN-734-101, West Bengal, and will be gratefully accepted and acknowledged. (Cheques may also be drawn in favour of 'Ramakrishna Vedanta Ashrama, Darjeeling').

All contributions are free from Income-Tax.

Swami Sambidananda
Secretary,
Ramakrishna Vedanta Ashrama,
Darjeeling.

নিপুণ তুলিতে আঁকা একটি বড় ছবি :

'...বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে।...জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হ'য়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না।'—এর পরেই চিত্রশিল্পী বিবেকানন্দের কলমের তুলিতে যে চিত্রপট আঁকা হয়েছে সেখানে ধরা দিয়েছে অপরূপ রঙের খেলা—দেখতে দেখতে যেন নেশা ধরে: 'সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁটাল —পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানী তুর্কীস্থানী গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়। সেই ঘাস, যতদূর চাও—সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক ক'রে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল।'—আকাশের কোলে মেঘে মেঘে রঙ-বৈচিত্র্য, আর তার তলায় তলায় শ্যামতরুপুঞ্জের অপরূপ জটলা, আর তারও তলায় ঘাস। বিশেষ করে ঘাস নিয়ে শিল্পনিপুণ এমন দরদী বর্ণনা কোথায় আছে আর, শুধু ঘাস নিয়ে এমন রচনা! এর পরেই বিবেকানন্দের রঙের নেশার যে পরিচয় তা কখনো ভুলবার নয় :

'আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?'—চোখে আর মনে এই নেশা-ধরানো ভাব ও ভাষায় বিবেকানন্দ এখানে প্রথম শ্রেণীর কবি-চিত্রকর।

সুস্মিত অনুভবে, ভালোবাসার মৃদু গরবে আর সৌন্দর্য-চেতনার পরিপূর্ণতায় এই রচনার তুলনা নেই। কবি যদি চিত্রশিল্পী হন, চিত্রশিল্পী যদি প্রেমিক হন—তবে সেই ত্রিবেণীতেই এমন দুর্লভ দর্শন সম্ভব।

চার : বাগ্‌রীতি

আদর্শ ভাষা হবে কেমন সে সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট কথা—'ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।'—এ কেবল দুর্দম চলতির ঝকঝকে ধারালো ইস্পাতই নয়, দুরন্ত ভাবেরই বলিষ্ঠ সহোদর। এই চলতির সৌন্দর্যের টান বিবেকানন্দকে এতদূর বেপরোয়া করে তুলেছিল যে এখানে তিনি শব্দপ্রয়োগে উত্তর কলকাতার আঞ্চলিক অধিবাসীদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন-বা—এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে কিছুটা আগেকার বলিষ্ঠ-তরুণ কালীপ্রসন্নের 'হুতোমী' ভাষা। বস্তুত, দুইই আক্রমণাত্মক ভাষা, ব্যঙ্গরসে জারিত, তবে বিবেকানন্দের কলমে তা যেমন জোরালো এবং লঘুগুরু সমস্ত বিষয়েই প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ-যোগ্য তীক্ষ্ণ শরবৎ, হুতোমে

ব্যঙ্গের সঙ্গে রঙ্গেরই প্রাধান্য—এবং তাই তা 'নক্সা', চেতন-বাণী নয়।

বিবেকানন্দের ভাষাবৈশিষ্ট্যের বিশেষ চারু-চমৎকারিত্ব এক নতুন ধরনের বাগ্‌রীতির কলা-নিপুণ প্রয়োগে, এবং এখানে তিনি বাংলা-সাহিত্যের এক উল্লেখ্য অগ্রপথিক। পাশাপাশি দুটো বিরোধার্থক হ্রস্ববাক্যের কাটা-কাটা প্রয়োগে পরবর্তী কালে প্রমথ চৌধুরীকে যে বিশেষিত আসনে বসানো হয়ে থাকে [দ্রঃ 'আমরা ও তোমরা' প্রবন্ধ], সেখানেও জ্যেষ্ঠ ভূমিকায় পথপ্রদর্শকরূপে বিবেকানন্দ। তাঁর এই অনন্য বাগ্‌রীতির একটি অ-পূর্ব পরিচয় এখানে তুলে ধরছি, আর দেখবার বিষয় যে এখানেও তুলনামূলক সেই একই প্রসঙ্গ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—সেই 'আমরা ও তোমরা' :

'আমরা দিব্যি স্নান ক'রে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইউরোপে ময়লা গায়ে, না নেয়ে একটি ধপধপে পোশাক পরলে।…হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে ; বিলাতি—সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হ'ল, কাপড় যা তা হোক! বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হ'ল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতির মেজে কার্পেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হ'ল!!…হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।'

মার্জিত বাংলায় তৎসম শব্দের সঙ্গেই দেশজ-তদ্ভব শব্দের বিষম সমন্বয়ে বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে যেরকম বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা লক্ষ্য করা বেশ ঔৎসুক্যজনক। এর বিশিষ্ট নমুনা 'হৃষীকেশের গঙ্গা'। এখানে সাধু-চলতির বৈষম্য অস্বীকার করে বিষয়কেই তুলে ধরেছেন অভীষ্ট মতো—বিশেষত সাধু শব্দগুলিই পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে মন্ত্রধ্বনির মতো :

"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে?…সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে—কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা,…কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে তা ভোলবার নয়।"—এই ধরনের বাগ্‌রীতির উদাহরণ ক্ষেত্রমতো ছড়িয়ে আছে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের চলতিভাষার মধ্যেই (দ্রঃ 'ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ')। আবার লক্ষ্য করবার, এখানে সংস্কৃতমন্ত্রে বেদীক্ষেত্রের ভাষা নয়, পদাতিকের ভাষাই নিয়েছে মুখ্য ভূমিকা। এ দুইয়েরই এক অনবদ্য সমন্বয়-সাধন—অনেকটা বহুপূর্বগামী কবিকঙ্কণের কাব্যভাষার মতোই। আধুনিক কালে বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে অস্থির পদচারণার শেষেই স্বস্থিত হয়েছেন—সংস্কৃত-শব্দসমন্বিত দীর্ঘবাক্যের প্রাধান্যের সঙ্গেই চলতি তদ্ভব-দেশজ শব্দযোগে মিশ্রবাগ্‌ভঙ্গীর শেষপর্বে এসে তবেই নির্ভেজাল বাংলার অন্তঃপুর তথা মাতৃকক্ষ খুঁজে পেয়েছেন। এমন ক্রম-ইতিহাস রবীন্দ্রনাথেও রয়েছে। তবে, বিবেকানন্দ সেখানে বরং বিশুদ্ধ চলতিতেই রচনা করেছেন তাঁর চারখানি গ্রন্থের তিনখানাই—একমাত্র 'বর্তমান ভারত'-ই সাধুভাষায় লেখা। অবশ্য এগুলি প্রথমে প্রবন্ধাকারে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাম্বিত হয় এবং 'বিলাতযাত্রীর পত্র' প্রবন্ধটির নামকরণ করা

হয় 'পরিব্রাজক'। মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে অব্যবহিতরূপে তিনখানি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ চলতি-রীতিতে রচনার উদাহরণ তখনকার দিনে এক নতুন দৃষ্টান্ত —'দৃষ্টান্তস্থাপন'তুল্য।

একটা কথা বেশ লক্ষ্য করবার মতো: রামকৃষ্ণবাণী হল চিরস্বচ্ছ আয়না—ভাবের প্রতিবিম্ব সেখানে স্বত-উদ্ভাসিত। সে ভাষায় সব সময়েই একটি নির্বিকার অর্থাৎ কেন্দ্রস্থিত মানুষেরই চিরশান্ত পরিচয়, কিন্তু বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশে বিভিন্ন রকম ভাষা ও ভাষাশৈলীর আশ্রয়। বিবেকানন্দ যেমন পরমহংসের মতো বিশুদ্ধসত্ত্ব নন, তেমনি তাঁর ভাষায়ও সত্ত্বাশ্রিত রজোগুণেরই প্রাধান্য—এমনকি রঙ্গব্যঙ্গেও [আমার মনে হয় ব্যঙ্গরঙ্গও রজোগুণেরই ওপিঠ], এবং তা বিষয়বিশেষের সঙ্গে ভাবের সহবাসের বৈচিত্র্যে নবনবরূপী। বিবেকানন্দ মহৎ শিল্পীর মতোই সাহিত্যের বাহনরূপে বরণ করেছেন নির্ভেজাল এক মৌখিক ভাষা—চলতিতে ও সাধুতে ভাষা সেখানে দুমুখো নয়। তাই দেখা যায় বিবেকানন্দ-রচনার প্রায় সমস্তটাই তাঁর মুখের ভাষায়ই লেখা—টেবিলে বসে লেখাও তাই সরাসরি সম্বোধনে বলার মতো অবাধ এবং কৃত্রিম বাহুল্যবর্জিত। এই অসাধারণ ভাষাশৈলীর পরিচয়—তাঁর 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' এবং 'পত্রাবলী'তে। এই চলতি বাগ্‌রীতির বৈচিত্র্যবাহী কিছু নমুনা এই প্রবন্ধে আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। এই চলতি বাগ্‌রীতি ভাবের গুরুত্ব রক্ষা করেই কতখানি একান্ত ঘরোয়া এক বেপরোয়া ভাষার প্রয়োগে সহজসিদ্ধ হতে পারে তারই একটি নমুনা এই বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গের শেষে তুলে ধরছি:

"এ সংসার—'দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর', কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দু-শ হাত দিয়ে দেখছে, খাটছে; আমরা—'গোসাঁইজী যা পুঁথিতে' লেখেননি—তা কখনই ক'রব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা; খালি চীৎকার হচ্ছে; বস্! কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখ না। আপনা আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্র সৌন্দর্য

আমাদের স্মরণে থাকা দরকার, শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থ রচনা করেননি, তাঁর শ্রীমুখের বাণীই প্রসঙ্গক্রমে বা ঘটনাসূত্রে কথিত, এবং সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে তা ছিন্নগ্রন্থি মণির মতো। তবু তার এক-একটি খণ্ডই সাহিত্যলোকের বিশেষ কক্ষে হীরকের মতোই দীপ্তিময়। আর, বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (মুখের কথা ও লেখা) সুসম্বদ্ধরূপেই বিন্যস্ত, গ্রথিত ও গ্রন্থায়িত।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব যেমন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব যেমন একই সত্তার প্রতিফলন, তেমনি ভাব ও রূপ তথা স্বরূপ ও অভিব্যক্তি। সেখানে 'Style is the Man'—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় তাঁদের ব্যক্তিত্বেরই স্ব স্ব প্রকাশ—নিজ নিজ বাণীতে তথা রচনায় তাঁদের সত্তাই উদ্ভাসিত সত্যের আলোকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নন, বিবেকানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণ নন—সাহিত্যের অভিব্যক্তিতে। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেবের অনুকরণ বা প্রতিফলন নন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্ব ভাষা প্রেমের মন্দিরের স্নিগ্ধ আলোকে মধুসৌরভে নিবেদিত; আর, বিবেকানন্দ-বাণী সেই মন্দিরেরই বহিরঙ্গনে, চত্বরে, সভামণ্ডপে, রাজপথে, মেঠো-পথে, দ্বারে দ্বারে—কখনো কম্বুকণ্ঠে বিঘোষিত, কখনো হাস্যফেনিল ঝর্নাস্রোতে মুখরিত, কখনো-বা ব্যঙ্গশরে বর্ষিত। মুক্তদৃষ্টিতে তাই পরমহংস ও বিবেকানন্দ সাহিত্যবিচারে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত—দুজনে পারস্পরিক সম্পর্কে গুরু ও শিষ্য, বীজ ও বৃক্ষ হলেও, দুজনেই ভাবুকশ্রেষ্ঠ জীবনসাধক মহাশিল্পী হলেও। গঙ্গা ও গঙ্গার ঢেউ মূলত এক হলেও আকারে ও প্রকারে নিশ্চিতই স্বতন্ত্র।*

* ৬ই এপ্রিল ১৯৮০, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের সারদানন্দ হলে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।

সমালোচনা

Myth Symbol Language (A Vivekananda Perspective): 'Ananda. শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া। (১৯৮০), পৃঃ ২০৪, মূল্য : উল্লেখ নাই।

বর্তমান গ্রন্থটি গ্রন্থকারের প্রথম গ্রন্থের (**A Vivekananda View of Mythology—I**) পরবর্তী অংশ। তিনি বিশ্বাস করেন, myths বা অতিকথা অতীতেই শেষ হয়ে যায় নি, তার ধারা এখনও প্রবাহিত। সেগুলি যদি শুধু কুসংস্কার হত, তা হলে আমরা যাদুঘরের পুরানো জিনিসগুলির মতো সংরক্ষণ করতে পারতাম। লেখক ম্যাক্স মূলারের মত উদ্ধৃত করেছেন, 'Mythology in the highest sense, is the power exercised by language on thought in every possible sphere of mental activity.' এর সঙ্গে Langer, Heisenberg, Cassirer প্রভৃতি লেখকবর্গের মতও রয়েছে। তবে লেখক সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা, তিনি শুধু বিষয়টির ভূমিকা লিখেই ক্ষান্ত থাকবেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের ভাবধারার আলোচনা করবেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে।

বিবেকানন্দের অনেক বাণীর তাৎপর্য লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'জীবনের অর্থ বিস্তার'। রামকৃষ্ণ-দেবের উক্তিরও সুন্দর ব্যবহার রয়েছে। বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'রাজযোগ' এবং বেদান্তবিষয়ক নিবন্ধগুলি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি রয়েছে যেগুলি প্রাসঙ্গিক। বিবেকানন্দ 'ওম্' শব্দের যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন তার এবং তাঁর স্বপ্নবিষয়ক মতবাদের আলোচনাও এখানে রয়েছে। প্রসঙ্গত ভর্তৃহরি প্রভৃতির প্রাচীন মতগুলি এসেছে।

অতিকথা, প্রতীক, ভাষা, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান —এগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই সংযোগ বিশ্লেষণের প্রশংসনীয় প্রয়াস বইটিতে দেখা যায়। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমান সেতুবন্ধনের কাজ করে। আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হয় যখন আমরা দেশের যুগসন্ধিক্ষণে রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা ভাবি। এই ধারণা দৃঢ়তর হয় বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করার পর। স্বামীজী যথার্থই মনে করেন, অতিকথা ও প্রতীকগুলির মধ্যে ধর্মের প্রাণস্পন্দন শোনা যায়। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এগুলির মূল্য অনস্বীকার্য।

গ্রন্থকারের পড়াশুনার পরিধি বিস্ময়কর এবং তাঁর পাণ্ডিত্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই রকম একটি বইয়ের প্রয়োজনও ছিল। তবে কোনো পরিচ্ছেদে ভাগ না থাকা, উদ্ধৃতির আতিশয্য ও অসংলগ্নতা, ইত্যাদি কারণে বক্তব্য অনেক সময় স্বচ্ছ নয়। মৌলিকতা অবশ্য লেখক নিজেও দাবী করেন নি। মুদ্রণ-প্রমাদের প্রাচুর্য গ্রন্থের অঙ্গহানি ঘটিয়েছে; প্রথম পাতাতেই এর নিদর্শন রয়েছে :

'The depth of such study are yet to open many interesting field.'

এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, ভবিষ্যতে লেখক এই ধরনের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আরও লিখবেন, তাঁর কাছে আমাদের এই প্রত্যাশা।

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে:

শ্রীকাকুলাম জেলায় (অন্ধ্রপ্রদেশ) এবং গুণুপুরে (উড়িষ্যা) বংশধারা নদীর বন্যাবিধ্বস্ত উভয়তীরে গৃহনির্মাণকার্য অব্যাহত। বালি-দেওয়ানগঞ্জস্থিত দিঘড়ায় (পশ্চিমবঙ্গ) নির্মীয়মাণ বালিকা বিদ্যালয়-ভবনের উপরের অংশ সমাপ্ত, ছাদনির্মাণকার্য চলিতেছে। মোরভিতে (গুজরাত) পুনর্বাসনকার্য সমাপ্ত—৪৩৩টি গৃহ, ৩টি বিদ্যালয়-ভবন এবং ১টি চিকিৎসা-ভবন নির্মিত ও সমর্পিত।

জয়পুর (রাজস্থান—১৯৮১-র বন্যায়): রান্নাকরা খাদ্যবিতরণ সমাপ্ত। জয়পুর জেলার ৩০টি গ্রামের ৮০০টি নিঃস্ব পরিবারের মধ্যে বস্ত্র ও বাসনপত্রাদি বিতরিত।

বাংলাদেশে:

দুইটি কেন্দ্রে বস্ত্রবিতরণ, তিনটি কেন্দ্রে দুগ্ধ-বিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রে অ্যালোপ্যাথি ও দুইটি কেন্দ্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-ব্যবস্থা যথারীতি চলিতেছে।

উদ্বোধন সংবাদ

স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার কথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

১৫ই অগস্ট স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি, ২৩শে অগস্ট শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী এবং ২৮শে অগস্ট স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়।

গত জুলাই ও অগস্ট মাসে প্রকাশিত নূতন সংস্করণ ও নূতন গ্রন্থের বিবরণ:

নূতন সংস্করণ: দশাবতার-চরিত—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য, ৮ম সং, পৃঃ ১০৮, মূল্য: ৩.৭৫ টাকা; বর্তমান ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ, ১৭শ সং, পৃঃ ৫০, মূল্য: ২.৫০ টাকা; শিশুদের মা সারদাদেবী—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ৩৯, মূল্য: ৬.০০ টাকা।

নূতন গ্রন্থ: ধ্যান—স্বামী ধ্যানানন্দ, পৃঃ ১০২, মূল্য: ৩.৫০ টাকা।

দেহত্যাগ

স্বামী বোধস্বরূপানন্দ (মাধবন মহারাজ) গত ৪ঠা জুলাই ১৯৮১, বেলা ১২-১০ মিনিটে ৪৩ বৎসর বয়সে সহসা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ত্রিবান্দ্রামে শ্রী চিত্র মেডিক্যাল সেণ্টারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। সেইদিনই প্রাতে তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছিল এবং সর্ববিধ সুচিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার দেহান্ত হয়। পূর্ব হইতেই তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না এবং সেইজন্য প্রথমে মাদ্রাজে ও পরে ত্রিবান্দ্রামে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৬০ সালে মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মাদ্রাজ কেন্দ্র ব্যতীত তিনি কলিকাতায় ইনস্টিটিউট অব কালচারে এবং দিল্লী, ত্রিবান্দ্রাম ও রাজমুন্দ্রী কেন্দ্রে কাজ করেন।

বিবিধ সংবাদ

বিদ্যাসাগর-স্মরণোৎসব

প্রতি বৎসরের মতো এবারও বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণদিবস ১৩ই শ্রাবণ তারিখে (এ বছর ২৯শে জুলাই, ১৯৮১) বিদ্যাসাগর-স্মরণ-উপলক্ষে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিশেষ উৎসবের আয়োজন হয়। বিদ্যাসাগরের ভিটায় এখন একটি বিদ্যাসাগর স্মারকসদন (বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল)

স্থাপিত। বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বলে একটি স্থান বিশেষভাবে চিহ্নিত। বিদ্যাসাগরের নিজস্ব গ্রন্থসংগ্রহের কিছু নমুনাসহ একটি গ্রন্থাগার ও দেশের জ্ঞানীগুণী মহাপুরুষদের অবলম্বনে দেয়াল-চিত্রে সুসজ্জিত একটি হলঘর স্মারকসদনের বৈশিষ্ট্য। সারাদিন দরিদ্রনারায়ণ সেবার প্রচুর আয়োজন ছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের একান্ত আত্মীয় বিদ্যাসাগরের স্মরণে যে আন্তরিকতায় সমবেত হয়েছিলেন, তা সত্যই হৃদয়স্পর্শী।

বিকেলে ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর-স্মরণসভায় ছাত্র ছাত্রীদের আবৃত্তি ও আলোচনার পরে প্রধান অতিথি শ্রীঅমলকুমার মিত্র ভাষণ দেন। ডঃ ঘোষ সভাস্থ সুধীজনদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, আর এক বছর পরে ১৯৮২-র ৫ই অগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকারের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। একদিকে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্বত্যাগ ও অন্যদিকে মানুষের প্রতি ভালোবাসায় আত্মোৎসর্গ—এ দুটি আদর্শের মধ্যে যে সংযোগ সম্ভব সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' মহামন্ত্রকে জীবনে ও কর্মে রূপায়িত করে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমাণ করেছেন। স্বামীজী নিজে বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরে বিদ্যাসাগরের দ্বারাই তিনি সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত। প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর-পরায়ণ না হলেও ঈশ্বরচন্দ্র মানুষকে সবচেয়ে বড়ো উপাস্য ভেবে মানুষের প্রতি ভালোবাসার যে আদর্শ সারাজীবন পালন করেছেন—তাঁর জীবন থেকে সে সম্বন্ধে কিছু অপেক্ষাকৃত স্বল্প-আলোচিত ঘটনাবলীর উদাহরণ তুলে ধরে ডঃ ঘোষ বিদ্যাসাগরকে বাঙালী প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, বাঙালীর মনন ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অন্যতম সমুন্নত শিখর বিদ্যাসাগর-জীবন ও চরিত্র।

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক এবং স্থানীয় জন সাধারণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিদ্যাসাগর-স্মরণোৎসব একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

বিধানচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী

কলিকাতা ফেডারেশন হল সোসাইটি কর্তৃক গত ৩১শে জুলাই ও ১লা অগস্ট ১৯৮১, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত চারজন প্রাক্তন আই. সি. এস অফিসার ডাঃ রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে তাঁদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও আমরা' শীর্ষক বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম দিন শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত ও শ্রীবিজয়... আচার্য 'প্রশাসক বিধানচন্দ্র' ও 'মানুষ বিধান চন্দ্রের' নানা দিক নিয়ে বিধানের অজ্ঞাত মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ঐদিন সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক এবং ফেডারেশন হল সোসাইটির সহ সভাপতি, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় দিন শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার রায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অত্যন্ত তথ্যে সমৃদ্ধ সরস ভাষণ দেন। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ও ভাষণ দেন। ঐদিন সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং ফেডারেশন হল সোসাইটি সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য।

পরলোকে

হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের কোষা... রবীন্দ্রনাথ পাত্র গত ১১ই অগস্ট ১৯... হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। আত্মভোলা ... পাত্র শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ... ছিলেন। তিনি বহুবৎসর একনিষ্ঠভাবে ... বিবেকানন্দ আশ্রম ও বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটের সেবা করে গেছেন। নিরহঙ্কার ও পরোপকারী এই মানুষটির চরিত্রমাধুর্যে সকলেই আকৃষ্ট হ... শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হ... যে সব তরুণ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি তাঁদের অনুবর্তী ছিলেন।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—২০৲ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৯৫৲ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১৬৲ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র
দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত
তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান
চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে
পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে
ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী
সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)
অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ
নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন
দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ— পৃ: ১৪১, মূল্য ৫·০০
ভক্তিযোগ— পৃ: ৯৬, মূল্য ৩·০০
ভক্তি-রহস্য— পৃ: ৯৮, মূল্য ৩·৪৫
জ্ঞানযোগ— পৃ: ২৯০, মূল্য ১০·৫০
রাজযোগ— পৃ: ২১৪, মূল্য ৬·৫০
সন্ন্যাসীর গীতি— পৃ: ২৩, মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট— পৃ: ২৯, মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ— পৃ: ৩৬, মূল্য ১·২৫
পত্রাবলী—প্রথমার্ধ— পৃ: ৪০২, মূল্য ১০·
শেষার্ধ— পৃ: ৪২৪, মূল্য ১০·৫০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)— মূল্য ২৭·০০
ভারতীয় নারী— পৃ: ৯৩, মূল্য ৩·৫০
পওহারী বাবা— পৃ: ১৮, মূল্য ১·২৫
স্বামীজীর আহ্বান— পৃ: ৮০, মূল্য ১·২৫
ধর্ম-সমীক্ষা— পৃ: ১০০, মূল্য ৫·০০
ধর্মবিজ্ঞান— পৃ: ১০২, মূল্য ৫·৫০

বেদান্তের আলোকে—পৃ: ৮৫, মূল্য ৫·০০
ভারতে বিবেকানন্দ—পৃ: ৪২৪, মূল্য ১০·০০
দেববাণী— পৃ: ১৬০, মূল্য ৬·৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ— পৃ: ২৬৮, মূল্য ৪·০০
কথোপকথন— পৃ: ১৩৫, মূল্য ১·২৫
মদীয় আচার্যদেব— পৃ: ৬২, মূল্য ২·২৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে— পৃ: ১৪৩, মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা— পৃ: ৫২, মূল্য ১·৭৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ— পৃ: ১৩৪, মূল্য ৬·০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক— পৃ: ১৩২, মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— পৃ: ১৩৬, মূল্য ৩·৫০
ভাববার কথা— পৃ: ৬৪, মূল্য ২·৩০
বাণী-সঞ্চয়ন— পৃ: ৩১৬, মূল্য ৭·০০
বর্তমান ভারত— পৃ: ৪০, মূল্য ২·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। দ্বিতীয় সং পৃঃ ৫৮, মূল্য ২·৫০

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৭, মূল্য ২·৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩·০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫·০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩·২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫·০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১·৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬·০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭·৮০

শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত।
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫·৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫·০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪·০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬·৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, মূল্য ১·০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩·০০

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭·৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪·৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭৯, মূল্য ২·০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ২·৫০

দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ৩·৭৫

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫·২০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫·০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪·০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬·২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০·০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১·২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০·৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪·০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১·৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী —পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪·৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩·৫০

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়—পৃঃ ৪৪, মূল্য ০·২৫

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা — স্বামী দেবানন্দ। পৃঃ ৬০, মূল্য ১·২৫

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩·৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬·০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২·৫০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪·০০

ধ্যান — স্বামী ধ্যানানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩·৫০

সংস্কৃত

স্তবকুসুমাঞ্জলি—পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২·৫০

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮·০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫·০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১·০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১·০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮·৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ৯·২৫

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ৪র্থ খণ্ড ৩·০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩·০০ ৪র্থ অধ্যায় ৯·০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২·০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ—(স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২·০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০·০০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ৩·০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সুরেশ... পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮·০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ...

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ... ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩·৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ... মূল্য ৪·০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

* * *

তোমরা আহারের দ্বারা শরীরে পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার? তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার?

—স্বামী বিবেকানন্দ

* * *

* * *

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা।

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।

—শ্রীসারদাদেবী

বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল, তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

॥ মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি 'হে ভগবান, তুমি আমার সর্বস্ব ধন, এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে ব'সে রয়েছি; এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয় ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

What we need to-day is to know that there is a God and that we can see and feel Him here and now.

—Swami Vivekananda

Faith, sympathy, fiery faith and fiery sympathy! Faith, faith,

faith in ourselves, faith, faith in God—this is the

secret of greatness.

—*Swami Vivekananda*

'অন্নগত, অল্পবুদ্ধি তোরা—কি করে সেই সচ্চিদানন্দের ধারণা করবি? আমাতে প্রাণ ঢেলে দে, সর্বসিদ্ধি হবে।—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

বলরামের
গেঞ্জি ও
জাঙ্গিয়া
BALARAM HOSIERY
বলরাম
হোসিয়ারী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
Standard

* * *

"রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্য্যন্ত পরিষ্কার করছেন!
ঠাকুরের গলায় ঘা হয়েছিল রামকৃষ্ণ সংঘ তৈরীর জন্য, আর মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট কচ্ছেন গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য।" —**স্বামী প্রেমানন্দ**

উদ্বোধনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাবমূর্তি আমাদের সর্বসাধারণের অনুধ্যানের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হউক। —**জনৈক কৃপাপ্রার্থী।**

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Re 0·85

RELIGION OF LOVE
Price Rs 3 50

MY MASTER
Price Re 0 60

A STUDY OF RELIGION
Price Rs 4 25

REALISATION AND ITS METHODS
Price Rs 3 00

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price Rs. 3 80

VEDANTA PHILOSOPHY
Price Rs [illegible]

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price Rs 1 80

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price Rs. 12 00

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price. Rs. 6 00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price Rs 7 00

AGGRESSIVE HINDUISM (Fifth Edition)
Price. Rs 1 10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price Rs 7 50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
(Cloth) Price Rs 2 30

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price. Rs 6 25

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price · Re 1 00

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

Udt ৭—Phone : 55-2447 SEPTEMBER 1981 Regd. No. WB/NC-19
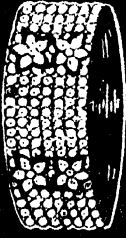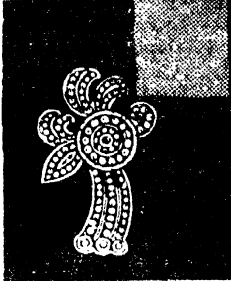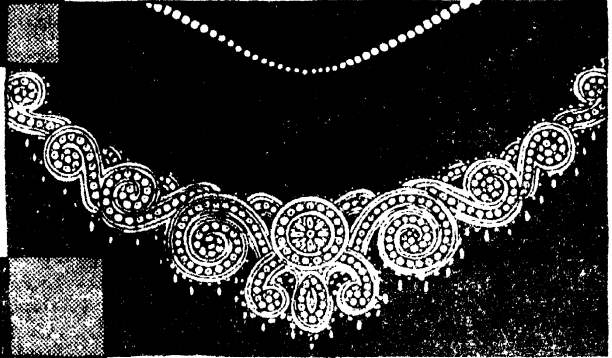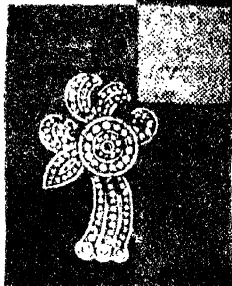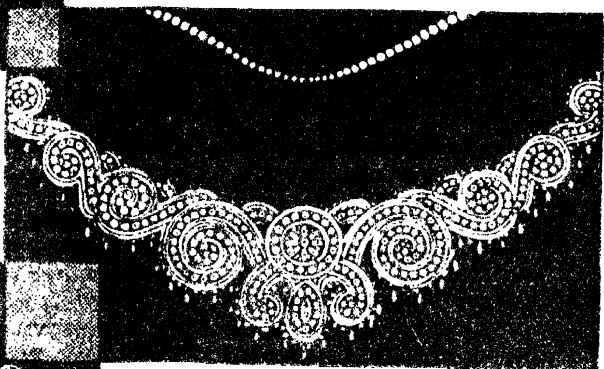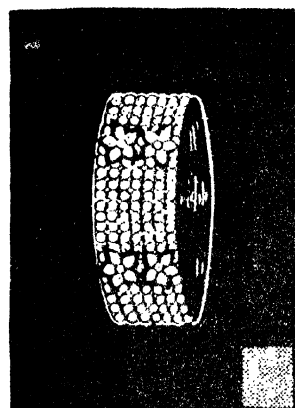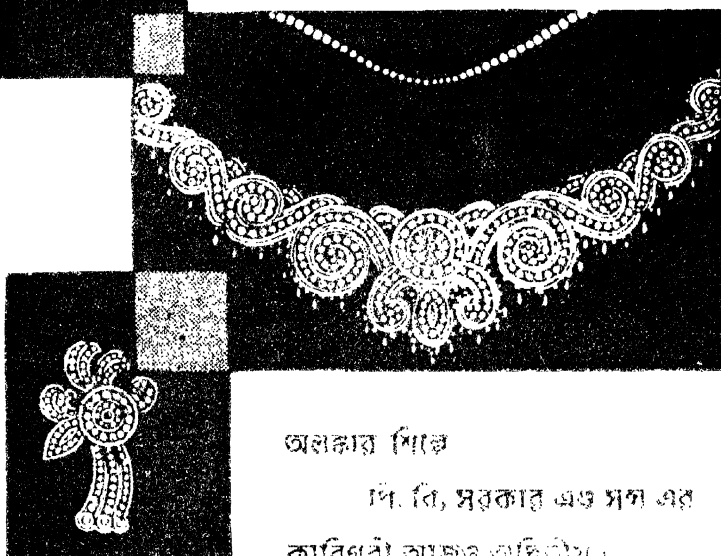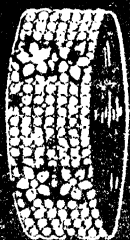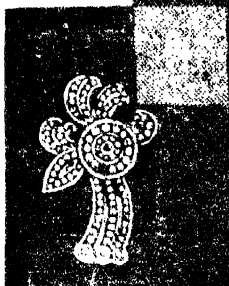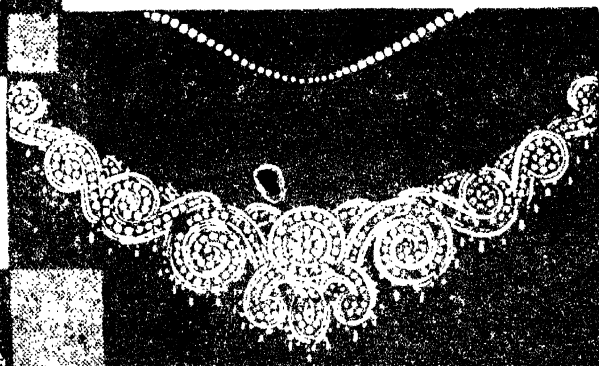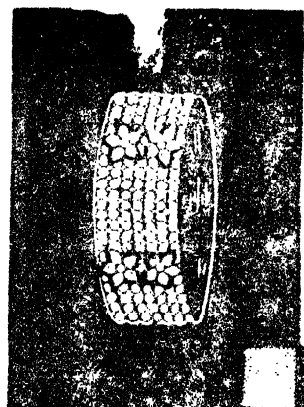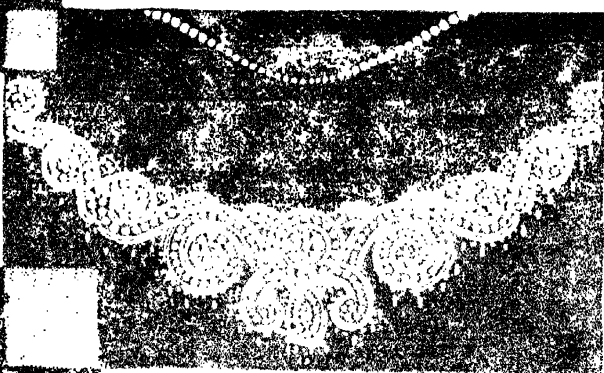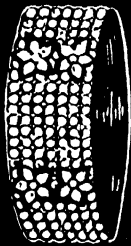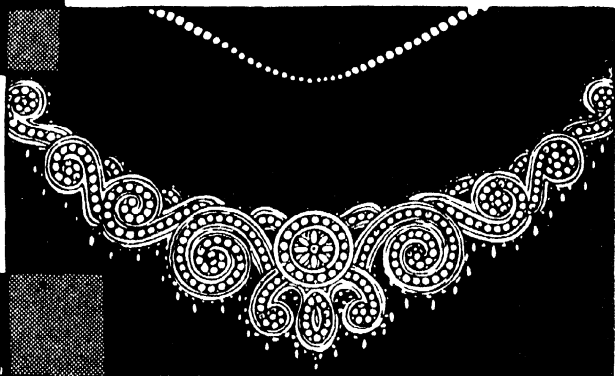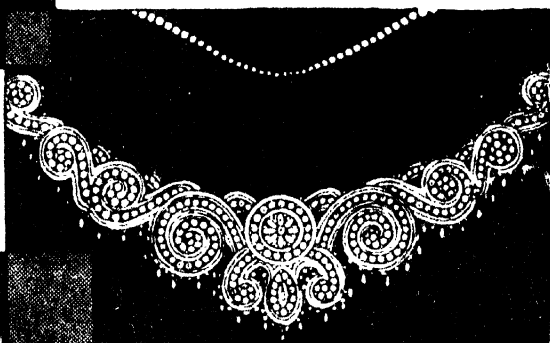
পি, বি, সরকার এণ্ড সন্স

জুয়েলার্স

সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব্ লেট বি সরকার

৮৯, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০ • ফোন : ৪৪-৮৭৭৩

আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

কার্তিক ১৩৮৮
৮৩তম বর্ষ
১০ম সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়, ৮৩তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৫৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৩৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে, তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনাঃ—ধর্ম দর্শন ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন শিল্প শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্য উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা, বিকাল ২॥টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

কয়েকখানি নিত্যসঙ্গী বই ঃ

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৯৫.০০ টাকা
প্রতি খণ্ড ২০.০০ টাকা, সুলভ সংস্করণ সেট ১৫৫.০০ টাকা, প্রতি খণ্ড ১৬.০০ টাকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম খণ্ড) ১ম ভাগ ২৮.০০ টাকা, ২য় ভাগ ২২.৫০ টাকা। সাধারণঃ ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা
২য় খণ্ড ৭.৮০ টাকা, ৩য় খণ্ড ৮.২৫ টাকা, ৪র্থ খণ্ড ৯.৫০ টাকা, ৫ম খণ্ড ১১.৫০ টাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—প্রথম ভাগ ৭.৫০ টাকা, ২য় ভাগ ১০.০০ টাকা

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।
১ম ভাগ ১৫.০০ টাকা, ২য় ভাগ ১১.০০ টাকা, তৃতীয় ভাগ ১১.০০ টাকা

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত। ৮.৪৫ টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন, ৮৪তম বর্ষ, ১৩৮৮-৮৯

নিবেদন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮৩তম বর্ষ শেষ হইবে। আগামী মাঘ (১৩৮৮) মাসে পত্রিকা ৮৪তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের (১৯৮১) মধ্যে তাঁহাদের পুরা নাম ও ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ষিক চাঁদা ১৪·০০ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৪০·০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১১০.০০ টাকা) মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্বে যত শীঘ্র সম্ভব সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া জানাইবেন—মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ১০ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে লইলে টা. ১৭·৮০ পয়সা লাগিবে। চেকে টাকা পাঠাইবেন না।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১৪·০০ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠানো হইবে। ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়; সেজন্য সংলগ্ন কার্ডখানি অতি অবশ্যই অবিলম্বে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

সুদীর্ঘ ৮৩ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি. আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥—১১টা; বিকাল ১॥—৫টা।
[রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।]

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়

১ কার্তিক, ১৩৮৮ — ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

দশের কল্যাণে
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

গ্রাহক নং

নাম

ঠিকানা

(১) আগামী ৮৪তম বর্ষে (১৩৮৮-৮৯) 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক থাকিবার জন্য দেয় ১৪.০০ টাকা আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের (১৯৮১) মধ্যে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতেছি।

(২) লোক মারফত টাকা পাঠাইতেছি।

(৩) আমার নামে ভি. পি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠাইবেন

(৪) অনিবার্য কারণে আমার পক্ষে আগামী বর্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব হইবে না।

(স্বাক্ষর)

তারিখ

এখানে
২০ পয়সার
ডাকটিকিট
আঁটিয়া দিবেন

Manager,
UDBODHAN OFFICE
1, Udbodhan Lane,
Calcutta-700 003

অপর পৃষ্ঠায় যথাস্থানে গ্রাহক-নম্বর, নাম ও ঠিকানা লিখিয়া এবং ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বরে লিখিত বিবরণের একটি মাত্র রাখিয়া এবং অন্যগুলি কাটিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিবার পর কার্ডটি আজই ডাকে দিন। চেকে টাকা পাঠাইবেন না।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন

ভি. পি. পি. যোগে পত্রিকা লইলে পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা টা. ১৪·০০, ডাকখরচ টা. ৩·৮০ পয়সা; মোট টা. ১৭·৮০ পয়সা লাগে।

উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮৮

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

৮৩তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　কার্তিক, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

সাংসারিক উন্নতির জন্য মধুরভাষী হওয়া যে কত ভাল, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মিষ্টভাষী হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যখন অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা ভয়ঙ্কর আপস করিতে হয়, তখনই আমি থামিয়া যাই। আমি বিনম্র দীনতায় বিশ্বাসী নহি—সমদর্শিত্বের ভক্ত!

সাধারণ মানবের কর্তব্য—তাহার 'ঈশ্বর' অর্থাৎ সমাজের সকল আদেশ পালন করা; কিন্তু জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না। ইহা একটি চিরন্তন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সহিত খাপ খাওয়াইয়া সর্বকল্যাণপ্রদ সমাজের নিকট হইতে সর্ববিধ সুখসম্পদ পায়; অপর ব্যক্তি একাকী থাকিয়া সমাজকে তাঁহার দিকে টানিয়া লন।

সমাজের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাস্তীর্ণ, আর যে তাহা করে না, তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।

আমি সত্যকে একটা অনন্তশক্তিসম্পন্ন জারক (Corrosive) পদার্থের সহিত তুলনা করি; উহা যেখানে পড়ে, সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়—নরম জিনিসে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানাইট পাথরে বিলম্বে; কিন্তু পথ করিয়া লইবেই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় সং, ৭।১১৫-১৬]

শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী, অনুরাগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতি সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক, ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।—সম্পাদক

কথাপ্রসঙ্গে

মনুসংহিতায় চিরকালের ধর্ম : সত্য

মনূক্ত দশলক্ষণ ধর্মের অন্যতম লক্ষণ 'সত্য'। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি 'সত্যে'র ব্যাখ্যা করেন নাই, লিখিয়াছেন উহা 'প্রসিদ্ধ'; অর্থাৎ, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। টীকাকার কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন, 'যথার্থাভিধানং সত্যম্'; অর্থাৎ, যথার্থ-কথনই 'সত্য'। 'চিরপ্রভা'কার লিখিয়াছেন, 'সত্যে'র অর্থ 'যথার্থ'; কিন্তু শুধু 'যথার্থ' বলিয়া ছাড়িয়া দিলে 'সত্য' যে অনুষ্ঠেয় ধর্ম, তাহা স্পষ্টীকৃত হয় না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মনূক্ত ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটির প্রত্যেকটিই অনুষ্ঠানের বিষয়। 'সত্য' যে অনুষ্ঠেয়, ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আমরা কুল্লুক ভট্টের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিতেছি; অর্থাৎ, 'সত্যে'র অর্থ সত্য কথা বলা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখি, বেদ অধ্যাপনা-শেষে আচার্য শিষ্যকে বলিতেছেন, 'সত্যং বদ'—'সত্য বলিও'; 'সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্'—'সত্য হইতে প্রমাদবশতও বিচ্যুত হইও না'; তাৎপর্য এই যে, সর্বদা সজাগ থাকা উচিত, যাহাতে ভুলক্রমেও অসত্য কথা বলা না হয়। ('অনৃত-বর্জনে সদা জাগরূকেণ এব ভবিতব্যম্ ইতি ভাবঃ'—'বনমালা' টীকা)। অনেকে অতিরিক্ত কথা বলেন। ফলে ভুলক্রমে কিছু কিছু অসত্য কথা বলা হইয়া যায়।

কিন্তু কেন সত্য কথা বলিব? মিথ্যা বলিলেই যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, বেশ লাভ হয়—কাজটা হাসিল হইয়া যায়, তখন সত্যটা ছাড়িয়া মিথ্যা বলায় ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছেন:

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥

ইহার ব্যাখ্যায় শংকরাচার্য বলিতেছেন, সত্য ও মিথ্যার জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন তখনই উঠিতে পারে, যখন উহারা কোনও ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। ব্যক্তিকে আশ্রয় না করিয়া জয়-পরাজয়ের কোন অর্থ হয় না। সুতরাং এই মন্ত্রটির অর্থ হইল: সত্যবাদীই অপরের জয়লাভ করে, মিথ্যাবাদী পরাজিত হয়। আপ্তকাম ঋষিগণ 'দেবযান' নামক ক্রমমুক্তিমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, যেখানে সত্যরূপ সাধনের দ্বারা লভ্য পরম পুরুষার্থ নিহিত আছে। যথার্থ-ভাষণ দ্বারাই সেই 'দেবযান' মার্গ প্রসারিত।

কেন সত্য কথা বলিব?—ইহার উত্তরে ঐ উপনিষদটিই আরও বলিতেছেন:

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥

অর্থাৎ, নিত্য সত্যকথনের দ্বারা ('মৃষাবদনত্যাগেন'—শংকর), নিত্য তপস্যার দ্বারা, নিত্য সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা এবং নিত্য ব্রহ্মচর্যের দ্বারা—হৃদয়াকাশে বিরাজিত শুভ্র জ্যোতির্ময় আত্মা লভ্য, যে আত্মাকে চিত্তমলশূন্য যতিগণ দর্শন করিয়া থাকেন।

জানি, জগতের অধিকাংশ লোকই এ সকল কথা বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, আত্মা আছেন, দেবযান-মার্গ আছে, সত্যভাষণের দ্বারা সেই মার্গে গমন করিয়া ঋষিগণ পরম পুরুষার্থ লাভ করেন—এ সকল কথার প্রমাণ কি?

ঠিক কথা। কোন আলোচনা শুরু করার আগে কোন্ পক্ষ কি প্রমাণ মানেন, তাহা নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। যদি চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা প্রত্যক্ষই আপনার স্বীকৃত একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আপনার সহিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'আত্মা', 'দেবযান-মার্গ' ইত্যাদি বিষয় প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত করা যায় না। 'শব্দ' অর্থাৎ, শ্রুতি ও আত্মদর্শী মহাপুরুষদের বচনই, এই সকল বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। যাঁহারা এই প্রমাণে বিশ্বাসী, তাঁহাদেরই সহিত আলোচনা সার্থক, অন্যের সহিত নিষ্ফল—শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, 'কুমীরের গায়ে অস্ত্র মারলে অস্ত্র ঠিকরে পড়ে যায়; তার গায়ে কিছুতেই লাগে না।'

ইহজন্মে বা জন্মজন্মান্তরে অনেক ধাক্কা খাইয়াই মানুষ আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করে। এইরূপ মানুষও কিন্তু বলে, 'আমরা সংসারী মানুষ, সর্বদা সত্য কথা বলি কি করিয়া?'

ঠিক কথা। শংকরাচার্যও তাঁহার ভাষ্যের একাধিক স্থলে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, গৃহীদের পক্ষে সম্পূর্ণ সত্যবাদী হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আদর্শটি যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে অনেকটা কাজ হইয়া যায়। জনৈক ভক্ত শ্রীমা সারদাদেবীকে পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি যে চাকরী করেন তাহাতে সময় সময় মিথ্যা কথা বলিতে হয়; সেজন্য তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিতে চান, কিন্তু সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য পারিতেছেন না, ভরণপোষণের আর কোন উপায় নাই। এই অবস্থায় তিনি মায়ের নির্দেশ প্রার্থনা করিতেছেন। মা সেবককে বলিলেন, 'তাকে লিখে দাও চাকরী না ছাড়তে।' অল্পবয়স্ক সেবক ভাবিলেন, মা এরূপ আদেশ কেন করিতেছেন, ভক্তটি তো ভাল পথেই চলিতে চায়। সেবক লিখিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া মা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'আজ একটু সামান্য মিথ্যা কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, কিন্তু চাকরী ছেড়ে অভাবে পড়লে তখন চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে ভয় পাবে না।' শেষোক্ত অংশ—'চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে ভয় পাবে না অভাবে পড়লে'—খেদ করিয়া মা দুই তিন বার বলিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনীতে আমরা অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাই। জনৈক যুবক বেলুড় মঠে আসিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম করিয়া বলিল যে, সে একটি কারবারে কাজ করে, মিথ্যা বাদ দিয়া সেখানে কাজ করিবার জো নাই। এখন সে কি করিবে? একটু মিথ্যা কথা বলা কি ভগবানলাভের বাধা হইবে? উত্তরে মহারাজ বলিলেন, 'কম ক'রে সত্যি কথা বললে কম ভগবান পাবে! ফল যাবে কোথায়? ভগবানলাভ করতে হলে সম্পূর্ণরূপে সত্যি কথা বলতে হবে।' মহারাজের জনৈক সেবক ইহাতে মন্তব্য করিলেন, 'ও ব্যবসার সময়ে মিথ্যে কথা মিথ্যের মধ্যেই গণ্য নয়।' মহারাজ যুবকটিকে

বলিলেন, 'ওই ছাখো! লোকের কথায় কি বিশ্বাস করতে আছে? ওই রকম কত লোকে কত কি বলে। ওসবে কান দিতে নেই। তবে তোমার এখন কর্তব্য সত্যি বলার জন্য সব সময়ে ঝোঁক রাখা; উদ্দেশ্য থাকবে সত্যি কথা বলা। তবে মাঝে মাঝে বিশেষ দরকারে মিথ্যে বলতে হলে, ভাবনা করো না। মিথ্যে ছাড়া যে তোমার চলবে না। তুমি সেখানে অপরের অধীন। যদি সত্যি কথা বলতে যাও, তবে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে। যখন বুড়ো হবে কাজকর্ম থাকবে না, তখন নিজের ভাবমতো চ'লো। সব সময়ে তখন সত্যি ব'লো। আমরা তো বুড়ো হয়েছি; আমরাই কি সব সময়ে সত্যি কথা বলতে পারি? মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত জানবে, ভগবানকে পেতে হলে পুরোপুরি সত্যি বলতে হবে।'

এই যে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা হইল, ইহাতে অধিকারিভেদে উপদেশদানের অতি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। সকলের জন্য একই উপদেশ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁহার মানসপুত্র রাখালচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'কিরে, তোর দিকে কেন তাকাতে পারছিনে—কিছু কুকাজ করেছিস?' অনেক পরে বেলুড় মঠে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তখন জানিতেন চুরি, ডাকাতি ইত্যাদিই কুকাজ, তাই তিনি উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'না'; তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোন মিথ্যা কথা বলিয়াছেন কিনা। রাখালচন্দ্রের তখন মনে পড়িল যে, পূর্ব দিন হাসি-ঠাট্টা করিতে করিতে গল্পচ্ছলে একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন!

উত্তরকালে যাঁহাদের জীবন জ্ঞান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত হইবে, তাঁহাদের জন্য যে ব্যবস্থা, সাধারণ অধিকারীর জন্য সে ব্যবস্থা হইতে পারে না। রোগী ও রোগ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র। 'সত্য' তো মহর্ষি পতঞ্জলির মতে অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ 'যম'-এর অন্তর্গত হওয়ায় 'সার্বভৌম মহাব্রত' (যোগদর্শন, ২।৩১)। 'সার্বভৌম'—অর্থাৎ, সর্বদেশে সর্বকালে সর্বাবস্থায় সর্বথা পালনীয়, ব্যতিক্রমরহিতভাবে। আর 'সার্বভৌম' বলিয়াই 'সত্য' প্রভৃতি 'মহাব্রত'। কিন্তু কাহার পক্ষে?—আত্মদর্শনই যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই প্রযত্নশীল যোগীর পক্ষে। এইরূপ মানুষ সহস্র সহস্রের মধ্যে একজনই হয় (গীতা, ৭।৩)। তথাপি—যে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—আদর্শটি যদি নির্ধারিত হইয়া যায়, তাহা হইলে অনেকটা কাজ হইয়া যায়। সাধারণ অধিকারী ধীরে ধীরেই সত্যের পথে অগ্রসর হয় এবং কালে সত্যস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়।

[পরবর্তী সংখ্যায় 'অস্তেয়' ও 'শৌচ']

ঠাকুরের কি সত্যনিষ্ঠাই না ছিল! খেতে বসেও যদি বলে ফেলতেন 'খাব না', তবে আর খাওয়া হত না। একদিন যদু মল্লিকের বাগানে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু ভক্তের ভিড়ে সেকথা ভুলে গেছেন, আমিও আর কিছু বলি নি। রাত্রে খাওয়ার পর মনে পড়েছে। তখন অনেক রাত্রি, কিন্তু যেতেই হবে। আমি লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলুম—গিয়ে দেখি সব বন্ধ, সকলে ঘুমুচ্ছে। তখন বৈঠকখানার দরজা ফাঁক করে ভিতরে পা গলিয়ে দিয়ে এলেন।

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রামকৃষ্ণ সংঘ

স্বামী ভূতেশানন্দ

কোন একই উদ্দেশ্যের সূত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই সমাজ। এইভাবে গোষ্ঠীর সংগঠন সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তিদের এবং তাদের নিয়ে গঠিত গোটা সমাজকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তিরা এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন অথবা উদ্দেশ্যটি তাঁদের মনের অগোচরে থেকেও তাঁদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। বন্ধনসূত্রটি সচেতনভাবে রক্ষিত না হলে সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিরা শুধু একত্র থাকতে পারেন এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে একে অন্যের সহায়ক হতে চেষ্টা করতে পারেন মাত্র, পরন্তু লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা গোষ্ঠীর প্রতি তাঁদের আনুগত্যকে একটি বিশিষ্ট চরিত্র দেয়।

এই লক্ষ্য সাময়িক অথবা স্থায়ী হতে পারে। লক্ষ্যের সাধন সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি সাময়িক সামঞ্জস্যবোধের সৃষ্টি করতে পারে, অথবা সেই সামঞ্জস্যবোধ তাঁদের স্থায়ী চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে। এই লক্ষ্য যত অধিক স্থায়ী হবে, লক্ষ্যের অনুগামী ব্যক্তিদের চারিত্রিক গুণের প্রকাশ এবং তাঁদের কর্ম মূল্যায়নের নিরিখও হবে তত অধিক দৃঢ়ভিত্তিক।

মানুষ এক জটিল যন্ত্রবিশেষ বা প্রাণী। তার এই জটিলতা সে যে-সমাজের অঙ্গ সেই সমাজে প্রতিফলিত। একটি সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি নানা লক্ষ্যের অনুগামী হতে পারেন অথবা তাঁদের একটি মূল লক্ষ্য এবং কিছু আনুষঙ্গিক লক্ষ্য থাকতে পারে। কোন ব্যক্তির আদর্শগুলি যদি পরস্পর-বিরোধী না হয়ে সুসমন্বিত হয়, তাহলে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত না হয়ে বিকর্ষণমুক্ত চিত্তে—অর্থাৎ শক্তিক্ষয়ের বিপর্যয় এড়িয়ে একটি চরম লক্ষ্যের প্রতি সমস্ত শক্তি সুস্থিতভাবে নিয়োজিত করে—তিনি তাঁর মূল লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হতে পারেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, যে-সমাজের ব্যক্তিরা তাঁদের জীবনের স্থায়ী লক্ষ্যসাধনে সর্বাধিক সুযোগ পেয়ে থাকেন সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ। যখন একটি সমগ্র জাতি তার স্থায়ী লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে তখন সে মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণেও একটি বিরাট শক্তি-রূপে সক্রিয় হয়। মানবজাতির ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, তার আপাত-ঘাত-প্রতিঘাতের গভীরে রয়েছে উক্ত অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যা বিভিন্ন জাতিকে তার নিজস্ব চরিত্রে মণ্ডিত করে সেই চরিত্র মোটামুটি অপরিবর্তিতই থাকে অথবা যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তবে তা নামমাত্র এবং সাময়িক। এই স্থায়ী চরিত্র শত-সহস্র বৎসর ধরে বিদ্যমান থাকে—শুধু সময়ের দাবি অনুযায়ী মাঝে মাঝে তার সামান্য কিছু ইতরবিশেষ ঘটে।

মহান যুগপুরুষ এবং দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন যে, নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বের উপলব্ধিই মানুষের পরম লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যই মানবসমাজকে তার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে চালিত করছে। স্বামীজী অসাধারণ স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি এবং তেজোদীপ্ত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, এই শক্তির সাহায্যে তিনি জাতিকে নির্ভুলভাবে উক্ত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন। তাঁরই শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, দেবত্বের অনুভূতিলাভের এই লক্ষ্যে মানুষের কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক একটি সামঞ্জস্যসূত্রে সুগ্রথিত ও সুপরিচালিত—সেখানে চরম ভবিতব্য থেকে

লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে মাঝে মাঝে তাকে সময়োপযোগী দিক পরিবর্তন করে নিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত সরল ও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু জানেন না। অতএব তাঁর কাছে ভগবানলাভই ছিল জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং তাঁর মতে সমগ্র মানবজাতিরও লক্ষ্য ওই একই। সেইসঙ্গে সংসারের নানা প্রয়োজন মেটাতে আমাদের সময় ও শক্তি যে নিয়োজিত করতে হয় সে-সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি এও জানতেন যে, বিক্ষেপকারী ও বিভ্রান্তিকর মনে হলেও আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের চরম উপলব্ধির জন্য এই ব্যাপারটিরও অর্থাৎ জীবনের দাবি মেটানোরও বস্তুত প্রয়োজন আছে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর মতে, খালি পেটে ধর্ম হয় না। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি উপেক্ষা করলে নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনতে হয়। সেইরূপ, সময়ের দাবি অনুযায়ী সমাজে আমাদের আচরণেরও সামঞ্জস্যবিধান আবশ্যক। কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য যে ভগবানলাভ সেই কথাটি যদি আমরা ভুলে যাই, তবেই হবে সর্বনাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদিষ্ট এই আদর্শের প্রতি একান্ত অনুগত, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বস্ত এবং অক্লান্তভাবে এই বাণী প্রচার করেছেন এবং জগতের সম্মুখে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই সত্য উপস্থাপন করেছেন যে, সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে যে-সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি দেবত্ব উপলব্ধির এই লক্ষ্যে উপনীত হবার সবচেয়ে বেশী সুযোগ-সুবিধা পাবে। সেইসঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, ব্যক্তি হিসাবে কেবল নিজের মোক্ষলাভই কারও একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত নয়; পরন্তু যেহেতু ব্যক্তি সমাজেরই অঙ্গ সেই কারণে মোক্ষলাভের জন্য উদ্দিষ্ট তার প্রত্যেকটি প্রয়াস যেন সমগ্র মানবসমাজের সেবায় নিবেদিত হয়। এই মানবজাতি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সত্তারই আর এক প্রকাশ মাত্র। অতএব তার আদর্শ হবে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তি এবং সেইসঙ্গে জগতের কল্যাণার্থে [আত্মনিয়োগ]। রামকৃষ্ণ সংঘের কার্যধারা বুঝতে হলে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিচার করতে হবে। এমন-কি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যেও অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ এই আলোকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি এবং সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেননি—বিশেষত যেভাবে স্বামীজী তা বুঝেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন সেইভাবে তাঁরা পারেননি। বর্তমানে রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত সমুদয় সাধু এবং গৃহী ভক্তদের সম্মুখে রয়েছে এই স্বীকৃত আদর্শ। এই আদর্শই সংঘকে একটি নির্ভুল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে এবং সংঘের অন্তর্ভুক্ত সকলের জীবনে স্থির বিশ্বাস ও একটি সুস্থিত লক্ষ্য এনে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশে ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে, বিভিন্ন সমাজে ও ধর্মে যেসব পথ গৃহীত এবং অনুসৃত সেইসবের ভিতর দিয়েই আমাদের আত্মোপলব্ধির লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে। সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যে-নূতন আলোক বিকিরণ করছে, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত রাখতে হবে।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে, বিভিন্ন দেশে এবং তাদের পবিত্র গ্রন্থে এই সার্বজনিক আদর্শের মৃদু আভাসমাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষেই এই আদর্শের একটি স্পষ্ট রূপরেখা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। যুক্তিবাদী এবং তন্নিষ্ঠ সত্য-জিজ্ঞাসুরা ইতিমধ্যেই উক্ত আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বর্তমান কালে এই আদর্শের প্রধান উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। সমগ্র জগতে সেই আদর্শ তাঁরা যে শুধু প্রচার করেছেন তা-ই নয়, কীভাবে তাঁদের উপদেশ আমাদের

প্রাত্যহিক জীবনে কার্যে পরিণত করে সেই আদর্শকে সার্থক করা যায় সেই পথের ব্যবহারিক রূপরেখাও তাঁরা নির্দেশ করেছেন।

আসন্ন যে-সর্বনাশ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সকল প্রয়াস সত্ত্বেও যার দিকে মানবজাতি দ্রুত-গতিতে ছুটে চলেছে সেই বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা, সহাবস্থান এবং একটি সুসংহত কার্যক্রম সেই কথাটি উপলব্ধি করানোর জন্য বিভিন্ন জাতিগত এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রচেষ্টায় আমরা নানাভাবে মাথা ঘামাচ্ছি। অপরের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটুক, এই আমাদের একান্ত কামনা—কিন্তু আমরা যদি নিজেদের চিন্তাধারায় ও কর্মে যথোচিত পরিবর্তন ঘটাতে না পারি তাহলে কোন সংস্থা বা সংঘ অথবা কোন প্রকার বাণীপ্রচার, তা সেই বাণী যত উচ্চ বেদী থেকেই প্রচারিত হোক না কেন, কিছুই কাজে আসবে না। এই কথাটা আমরা ভুলে যাই। অতিশয় স্পষ্ট তথাপি আমাদের মনোযোগ-বহির্ভূত এই নিরাবরণ সত্যের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর নামাঙ্কিত সংঘ গুরুত্ব আরোপ করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অনুগামীদের এই কাজ অর্থাৎ আমাদের আচরণে পরিবর্তন ঘটানো। বস্তুত আমাদের আচরণ আলস্যচিহ্নিত, দ্বিধাগ্রস্ত—নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে আদর্শের প্রতিফলনের চেয়ে তার মৌখিক প্রচারেই আমাদের প্রবণতা অধিকতর। সুখের বিষয়, আপাত-দৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, আজ বাঞ্ছিত পরিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন যুগের সূচনা হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তিনি ছিলেন প্রায় নিরক্ষর—আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি সেই ধরনের কোন শিক্ষালাভ তাঁর হয়নি। আধুনিক যুগের সভ্য সমাজ থেকে দূরে বাংলার এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে তাঁর জন্ম এবং উক্ত পরিবেশে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হওয়ার ফলে তিনি নিরীশ্বর, বস্তুতান্ত্রিক, নাগর সমাজের কলুষ স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি গ্রামের বালকদের সাহচর্যে দিন কাটাতেন—তারা প্রধানত নিজেদের সহজ, সাধারণ কাজকর্মে, বেশীর ভাগই তাদের পরিবারের প্রাত্যহিক ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে সক্রিয় থাকত। অবসর-সময়ে তারা লোকসংগীত গাইত আর গ্রাম্য পরিবেশে সরল নাটকের অভিনয় করে আনন্দলাভ করত। শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে দাঁড়ালেন এই বালকদলের নেতা। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির ফলে তিনি অপরের কাছে যা সহজেই শিখে নিতেন সেইসব গান ও নাটকের অভিনয়-কৌশল তাঁর বালকসঙ্গীদের শিখিয়ে দিতেন। এই অভিনয়কৌশল প্রধানত তাঁর নিজেরই উদ্ভাবিত। উপরন্তু তিনি ছিলেন স্বভাবশিল্পী, অসাধারণ ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি। তাই তাঁর উদ্ভাবিত এই সব নাটকে তিনি পারিপার্শ্বিক মানুষের চারিত্রিক শক্তি ও দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তাঁর যে শুধু অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা ছিল তা নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং মানুষের বিভিন্ন মনোভাব যথাযথভাবে অঙ্কনেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। এইসব গুণ এবং বিশেষ করে সবার প্রতি তাঁর সতত-বিদ্যমান সহানুভূতি তাঁকে সকলের নিকট—এমন-কি যাঁদের স্বভাবজ দুর্বলতা তিনি নকল করে দেখিয়ে দিতেন তাঁদের কাছেও—প্রিয় করে তুলেছিল। তার কারণ যাঁদের নিয়ে তিনি রঙ্গরস করতেন তাঁরাও অন্তরে অন্তরে জানতেন যে, তাঁদের অপমান করা তাঁদের আদরের গদাইয়ের মনোগত অভিপ্রায় নয়। আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য যে-শিক্ষালাভ পরিবারের সকলের একান্ত বাঞ্ছিত বস্তু ছিল, সেই

শিক্ষালাভে গদাইয়ের আগ্রহ ছিল না। বাইরের সকল বিষয়ের প্রতি প্রখর আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি ঐকান্তিকভাবে ব্যাপৃত ছিলেন ঈশ্বর-অন্বেষণে—তা-ই ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য তিনি কোন ধরাবাঁধা পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। কেবলমাত্র প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান পালনে তাঁর মন নিয়োজিত ছিল না, তাঁর ব্যাকুল চিত্ত চাইত ঈশ্বরদর্শনের অপরোক্ষ অনুভূতি। ধর্মের এই অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে তাঁর একমাত্র পাথেয় ছিল ভগবানলাভের জন্য ব্যাকুলতা—জননীকে কাছে পাওয়ার জন্য শিশুর যে-ব্যাকুলতা সেই ব্যাকুলতা। তরুণ বয়সে যখন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পূজারী, সেই সময়ে তিনি লাভ করলেন মায়ের দিব্যদর্শন—সমগ্র সত্তা জুড়ে সেই দিব্যভাবে হলেন নিমগ্ন। সে-ই তাঁর ভগবদন্বেষণের পরম মুহূর্ত—তাঁর পরম প্রাপ্তি।

অতঃপর শুরু হল তাঁর ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ইতিপূর্বে ঈশ্বরদর্শনের ফলে পরম সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস তখন সুদৃঢ়। সেই-সঙ্গে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে, সাধকের আন্তরিকতা থাকলে তাঁর পক্ষে ঈশ্বর-উপলব্ধি সম্ভব। এই সময়ে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য যে-সব পথে পূর্ব পূর্ব সাধকগণ সাধনা করেছেন সেইসব ধর্মপথের রহস্য জানা। এইভাবে একের পর এক পথে সাধনা করে তিনি প্রতি ক্ষেত্রেই সিদ্ধিলাভ করলেন। উক্ত সাধনার ফলে তিনি এই সত্যে দৃঢ়নিশ্চয় হলেন যে, সকল ধর্ম একই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়। অন্য কথায় বলা যায়, ধর্ম বস্তুত এক এবং অভিন্ন, সাধকদের জন্য চিহ্নিত পথ যদিও বহু এবং বিবিধ। এই মহান উপলব্ধি বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল সাধকের প্রতি তাঁর মন অপরিসীম প্রেম ও সহানুভূতিতে পূর্ণ করে তুলল। বেদান্তসত্যের সাধনায় তিনি এই জ্ঞান লাভ করলেন যে, সকল প্রাণী এবং বস্তু এক ও অদ্বিতীয় সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য বিরাজিত সেই পরম জ্ঞানলাভেও তিনি পরিতৃপ্ত থাকতে পারেননি। যদিও তিনি সর্বত্র দেখেছেন ভগবৎ-প্রকাশ, তবু তাঁর চারদিকে মানুষের যে-দুঃখযন্ত্রণা তার প্রতি তিনি উদাসীন থাকতে পারেননি। জগতের দুঃখজ্বালা দেখে তাঁর কোমল হৃদয় সর্বদা বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ত। ইতিপূর্বে ভগবানলাভের জন্য যে-আকূতি তিনি অনুভব করতেন এখন সেটি মানুষের দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্য নিয়ন্ত্রিত হল—তা সেই দুঃখ সত্যই হোক অথবা অজ্ঞানপ্রসূতই হোক। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তাঁর চরণপ্রান্তে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে এই সময়ে তিনি ধর্ম-উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন।

এই দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরেই তিনি এক ভক্তগোষ্ঠী গড়ে তোলেন এবং তাঁদের ভগবানলাভের সাধনায় শিক্ষা দেন। এঁরা প্রত্যেকে নিজের ভাব অনুযায়ী সাধন করেন এবং সেইসঙ্গে অনুভব করেন অন্য গুরুভ্রাতাদের প্রতি নিবিড় আত্মীয়তা। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের মিলনের যোগসূত্র হলেন আর সেই সূত্রেই পরবর্তী কালে তাঁরা হয়ে থাকলেন আবদ্ধ। এইখানেই রামকৃষ্ণ সংঘের সূত্রপাত। কালক্রমে ত্যাগ ও বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ কয়েকজন তরুণ শিষ্যের আগমনে সন্ন্যাসি-গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। পরবর্তী কালে তাঁরা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সমগ্রভাবে সংঘ বলতে তখন কেবলমাত্র সন্ন্যাসি-গোষ্ঠীর সাধু ও ব্রহ্মচারীদের বোঝাত না, আজও তা বোঝায় না। গৃহী ভক্তরাও এই মহান সংঘের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সংঘের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন সেটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় এই বিষয় থেকে যে, তিনি গৃহী ভক্তদের সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে অনুমতি দেননি। তিনি বলতেন, এই

গৃহী ভক্তদের জীবন অন্যদের পক্ষে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কদাচ সংস্কার-আন্দোলনের প্রবর্তনে আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির সম্মুখে অমূল্য সত্যের রত্নরাজি উপস্থাপন করা—সেই সত্য যা জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের অনুগামীদের পবিত্র কর্তব্য হবে এই সত্যের আলোকে আপন আপন জীবন গঠন করে নেওয়া এবং কথা ও কাজের ভিতর দিয়ে তাঁদের চারপাশের মানুষের মধ্যে সেই সত্য প্রচার করা। এইভাবে সংগঠিত হলে উক্ত আন্দোলন থেকে এক প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হবে যা কালে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে। স্বামীজী যখন আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্ববিজয়ের কথা বলেছিলেন তখন তিনি মাত্রাহীন অভীপ্সা প্রকাশ করেননি। এই বিজয়ের অর্থ কোন মতবাদ বা জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া নয়, কথাটির লক্ষ্য প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণতালাভের জন্য যা মঙ্গল ও হিতকারী তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। আমরা যদি এইভাবে আমাদের শক্তি নিয়োগ করতে পারি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ ও কর্মধারার আলোকে নূতন জগতের অভ্যুদয়কল্পে আমাদের সাধ্যমত কাজ করতে পারি, তবেই আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রকৃত অনুগামীরূপে নিজেদের পরিচয় দিতে পারব। তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা।*

* ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৮০, বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহাসম্মেলনের (১৯৮০) দ্বিতীয় দিনের প্রধান অধিবেশনে সভাপতির ইংরেজী ভাষণের শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ। —সঃ

'অবতারবরিষ্ঠ'

স্বামী গম্ভীরানন্দ

ও স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রণামমন্ত্রটি রচনা করেছিলেন, তাতে আছে ঠাকুরকে তিনি বলেছেন 'অবতারবরিষ্ঠ'। এখন এই 'অবতারবরিষ্ঠ' কথাটির মানে কি—আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি। 'বরিষ্ঠ' কথাটি এসেছে 'উরু' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'বড়'। 'বরিষ্ঠে'র অর্থ 'সবচেয়ে বড়'। তা অবতারদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাহলে সবচেয়ে বড়। এখন একথাটি বলতে গেলে একটুখানি তর্কের প্যাচে পড়ে যাব। কেননা স্বয়ং ঠাকুর বলেছেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এ দেহে রামকৃষ্ণ।' তাহলে রাম, কৃষ্ণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ একই ব্যক্তি। ভগবানকে তো আর বড়-ছোট করা চলে না, সুতরাং এদিক দিয়ে বড়-ছোট করতে গেলে মুশকিলে পড়ে যাব। তবে হ্যাঁ, আমরা প্রকাশের দিক দিয়ে যদি ধরি—ভগবান নিজেই নিজেকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করে থাকেন—কখনও শ্রীরামচন্দ্ররূপে, কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে, কখনও শ্রীরামকৃষ্ণরূপে,—এই প্রকাশের দিক দিয়ে যদি দেখি, তাহলে হয়তো বড়-ছোটর একটা আন্দাজ করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে বসেছিলেন। তাদের বললেন, "দেখ তো বাইরের কেউ নেই তো—তোমাদের একটা গুহ্য কথা বলি, দেখলাম এখান থেকে, এই শরীর

থেকে সচ্চিদানন্দ বেরিয়ে রূপ ধারণ করল এবং ধরে বলল, 'যুগে যুগে অবতার, পূর্ণ অবতার, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।'" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তাঁতে সত্ত্বগুণেরই ঐশ্বর্য ছিল।

তাঁকে লড়াই করতে হয় নি, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের মতো। অথবা কষ্টসাধ্য শারীরিক কাজ করতে হয় নি, যেমন করেছিলেন বরাহ অবতার। তাই তিনি সত্ত্বগুণেরই আধার ছিলেন এবং সত্ত্বগুণই প্রকাশ করে গেছেন। সত্ত্বগুণের বিশেষ প্রকাশ তাঁতে হয়েছিল। এই হিসাবে আমরা বলতে পারি তিনি 'অবতারবরিষ্ঠ'।

আর একদিক থেকেও আমরা তাঁকে বলতে পারি 'অবতারবরিষ্ঠ', কিন্তু তার দ্বারা অন্য অবতারকে ছোট করা হয় না। ভগবান জগতের প্রয়োজনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। ছোট বড় কিনা তা তিনি হিসাব করেন না। যুগের প্রয়োজন ছিল শ্রীরামচন্দ্ররূপে আসা, যুগের প্রয়োজন ছিল শ্রীকৃষ্ণরূপে আসা, তৎ তৎ যুগের জন্য সেই সব অবতার তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বর্তমান যুগে তিনি এলেন বর্তমান যুগপ্রয়োজনে। বর্তমান যুগের জন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই হিসাবেও আমরা বলতে পারি যে, তিনি 'অবতারবরিষ্ঠ'।

আর একটা দিক আছে, 'বর' কথাটার অন্যতম অর্থ প্রিয়—আদরণীয়, সম্মানভাজন। যেমন আমরা যখন বলি 'সুহৃদ্‌বর' বা 'মান্যবর' তখন সুহৃদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মান্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এমন নয়। তাঁকে সম্মান দেবার জন্য, তাঁর প্রতি একটা বিশেষ আদর দেখাবার জন্য, আমরা বলি 'সুহৃদ্‌বর' বা 'মান্যবর'। সেই হিসাবে যিনি প্রিয় বা আদরণীয় তিনি হলেন 'বর'। এইভাবে 'বরতম' বা 'বরিষ্ঠে'র অর্থ হয় 'প্রিয়তম'। শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের প্রিয়তম। কেন প্রিয়তম?—না, যেহেতু যুগোপযোগী এবং আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনে যে প্রয়োজন মেটানো দরকার, তার উপযুক্ত ইঙ্গিত ও প্রেরণা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে পাই, অতি পরিষ্কারভাবে কথামৃতের ভিতরে এবং অন্যান্য যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁদের গ্রন্থে। সুতরাং সেইদিক দিয়ে তিনি আমাদের প্রিয়তম। যেমন মহাবীর বলেছিলেন—

'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥'

শ্রীনাথ—লক্ষ্মীনাথ নারায়ণ এবং জানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্র, এঁদের দুজনের ভিতর কোন তফাত নেই, দুজনে একই পরমাত্মা নারায়ণ। তথাপি কমললোচন রামই আমার জীবনসর্বস্ব। তিনিই আমার প্রিয়তম—এ আমার ভালবাসার সম্বন্ধ।

আমরা আমাদের পরিবারের সবাইকে তো সমানভাবে ভালবাসি না। পরিবারের বিভিন্ন লোকের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের সম্বন্ধ হয়। তেমনি সমাজেও হয়। এর কোন কারণ খুঁজে পাবেন না। একটা হয়তো কারণ বলে দিতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তিতর্কে হয়তো সেটা দাঁড়াবে না। আমি হয়তো কাউকে ভালবাসি ভালবাসারই জন্য। তেমনিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা ভালবাসি সবচেয়ে। তিনি আমাদের কাছে সবচেয়ে আদরণীয়—আমাদের নিজেদের জীবনের জন্য এবং জগতের সকলের জন্য। এদিক দিয়ে যদি চিন্তা করি, তাহলেও তাঁকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলতে পারি। এই হল কথা।

আবার সাধারণ লোকেরা বলে থাকে, 'মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ'। নিজের গুরুকে সকলে শ্রেষ্ঠ বলে। স্বামীজীও কি সেভাবেই ঠাকুরকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলেছিলেন? তাঁর গ্রন্থাদি পাঠ করলে কিন্তু তা মনে হয় না। তিনি শ্রেষ্ঠ বলে বিচারবুদ্ধিতে পেয়েছিলেন বলেই, তাঁকে

'অবতারবরিষ্ঠ' বলে গেছেন।

সুতরাং আমরা যুগোপযোগী প্রকাশের দিক দিয়েই একটু বিচার করি। ধরুন, শ্রীরামচন্দ্রের ভিতর কয়েকটি গুণের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল তাঁর সত্যনিষ্ঠা। পিতৃসত্য পালন করবার জন্য তিনি বনবাসে গিয়েছিলেন। আর একটি দেখতে পাই তাঁর আত্মীয়স্বজন, মা, বাবা, ভাই—এঁদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার সম্বন্ধ। শ্রীরামচন্দ্র সত্যকে ধরেছিলেন। ঠাকুরের বেলায় বলতে পারি, তিনি সত্যকে শুধু ধরেন নি, খুব শক্ত করেই ধরেছিলেন। আবার আর একদিক থেকে দেখতে গেলে—তিনিই যে সত্যকে ধরেছিলেন তা নয়, সত্যই তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তাঁকে ধরে ছিল সত্য। যেমন ঠাকুর নিজে বলেছেন, যে ছেলে বাপের হাত ধরে চলে, সে পড়েও যেতে পারে, কিন্তু বাপ যার হাত ধরে, সে পড়ে না। তেমনি সত্য যেন তাঁকে ধরে ছিল। কি রকম? না, নবদ্বীপে যাবেন তিনি, শুনেছেন নবদ্বীপ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান। সুতরাং সেখানে তাঁর আবির্ভাবের কিছুটা আভাস তাঁর মনে জাগবে। বৃন্দাবনে যেমন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপনা হয়, তেমনিভাবে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর উদ্দীপনা হওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সমস্ত জায়গা ঘুরে দেখা হল কিন্তু কোন উদ্দীপনা জাগল না। হতাশ হয়ে—তিনি যে নৌকা করে এসেছিলেন সেই নৌকাতেই গিয়ে উঠলেন। তখন দেখলেন দুটি সুন্দর কিশোর—গৌর নিতাই,—তারা হাসতে হাসতে তাঁর দিকে ছুটে আসছে আকাশপথে, আর তিনি 'ঐ এলোরে' 'ঐ এলোরে' বলে সমাধিস্থ। বলছেন, 'হয়তো জলেই পড়ে যেতাম। হৃদয় পাশে ছিল, সে আমাকে ধরে ফেলল।' অতএব কথাটির মানে কি দাঁড়াল? না, নবদ্বীপে যেখানে মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল সে বাড়ী গঙ্গাস্রোতে ভেসে গঙ্গাবক্ষে চলে গেছে। সুতরাং নবদ্বীপে তাঁর উদ্দীপনা না জাগলেও যেখানে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের মাটি রয়েছে সেখানে তাঁর উদ্দীপনা জাগল। সত্য তাঁকে দেখিয়ে দিল এখানে-ওখানে নয়, জন্মস্থান এইখানে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। যেমন শম্ভু মল্লিক যখন বললেন, আপনার পেটের অসুখ, যাবার সময় আমার কাছ থেকে একটু আফিং নিয়ে যাবেন তাতে আপনার অসুখ সেরে যাবে। তা কথাবার্তায় দুজনেই আফিংএর কথা ভুলে গেলেন। শম্ভুবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে এসে ঠাকুরের ঐকথা মনে পড়ায় আবার শম্ভুবাবুর বাগানবাড়ীতে গেলেন। তখন শম্ভুবাবু বাড়ীর অন্দরমহলে চলে গেছেন। কাজেই ঠাকুর তাঁর কর্মচারীর কাছ থেকে আফিং নিলেন। তারপর কালীবাড়ীতে ফিরছেন, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। যতই এগোন, পা ক্রমে নালার দিকে যাচ্ছে। কালীবাড়ীর পথটিকে আর খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ সে রাস্তায় তো কতবার যাতায়াত করেছেন! কতটুকু আর দূরত্ব! দু ফার্লং। দেখতে পাচ্ছেন না কিছু। কিন্তু ফিরে যেই শম্ভু মল্লিকের বাড়ীর দিকে তাকাচ্ছেন তখন সব পরিষ্কার। ভাবলেন, একি হল! তারপর বার কয়েক চেষ্টা করে তাঁর মনে জাগল, আমি মিথ্যা আচরণ করেছি, কথা ছিল শম্ভুর কাছ থেকে আফিং নিয়ে যাব। তা না নিয়ে আমি নিয়েছি তার কর্মচারীর কাছ থেকে। তাই আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না। ফিরে শম্ভুবাবুর বাড়ীতে এলেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। একটি জানলা খোলা ছিল, তার ভিতর দিয়ে আফিংএর মোড়কটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এই রইল গো তোমাদের আফিং। বলেই তিনি আবার কালীবাড়ীর দিকে ফিরে চললেন। তখন পথ পরিষ্কার। তাই সত্য তাঁকে

ধরে বসেছিল

আর আত্মীয়স্বজনের প্রতি মায়া-মমতার প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমি একটি-দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি তাঁর মাকে এনে রেখেছিলেন নহবতে। সেখানে গিয়ে রোজ তাঁকে প্রণাম করতেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য কেমন আছে জিজ্ঞাসা করতেন। তারপর একসময় মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন। বৃন্দাবনে গেছেন। গিয়ে স্থির হল সেখানে সিদ্ধপ্রেমিকা বৃদ্ধা গঙ্গামায়ীর কাছে তিনি থাকবেন, দক্ষিণেশ্বরে আর ফিরবেন না। তখন হৃদয়—তাঁর ভাগ্নে এবং সেবক—তাঁর একহাত ধরে টানছেন নিয়ে আসার জন্য, অন্যদিকে গঙ্গামায়ী আরেক হাত টানছেন তাঁকে রাখবার জন্য। ঠাকুর 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। কি করবেন কিছু ঠিক করতে পারছেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল তাইতো, আমার মা যে রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর তো তাহলে কষ্ট হবে আমি না গেলে। অমনি তিনি ফিরে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সন্ন্যাসী হয়েছেন, কিন্তু গেরুয়া পরেন নি পাছে তাঁর মায়ের মনে কষ্ট হয়। তাঁর মায়ের দেহত্যাগের পর সন্ন্যাসী হয়েও তিনি তর্পণ করতে নেমেছিলেন গঙ্গাতে, কিন্তু জল গলে পড়ে গেল তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে। তর্পণ করা আর হল না। একজন বুঝিয়ে দিল, তিনি 'গলিতহস্ত' হয়ে গেছেন, তাঁর দ্বারা তর্পণ হবে না। কিন্তু চেষ্টা তিনি করেছিলেন

তাঁর ভাইপো অক্ষয় দেহত্যাগ করছে, দাঁড়িয়ে দেখছেন তিনি। দেখলেন—যেন খাপের ভেতর থেকে তলোয়ারটা বেরিয়ে গেল—খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব হাসলেন, গান করলেন, নাচলেন। কিন্তু তারপর বলছেন, হৃদয়টার ভিতর যেন গামছা নিংড়াবার মতো হতে লাগল—ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল অক্ষয়ের জন্য। এই ছিল তাঁর আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালবাসা

তারপর ধরুন, শ্রীকৃষ্ণের কথা। শ্রীকৃষ্ণের বেলায় একটি জিনিস তাঁর ভিতর প্রধানরূপে দেখে থাকি, তিনি সমস্ত ধর্মের সমন্বয় স্থাপন করেছিলেন, অবশ্য তখনকার দিনে যেগুলো ছিল। গীতার শ্লোকে আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

—যে যেমনভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাকে সেইভাবেই কৃপা করে থাকি। মানুষ যে পথেই চলুক না কেন তারা সকলেই আমার দিকে আসছে।

অতি উদার কথা, স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। কিন্তু টীকাভাষ্য যদি পড়েন তবে দেখতে পাবেন, সাম্প্রদায়িক মন তাকে মোচড় দিয়ে এমন করেছে যে, সেই সমন্বয়ের বার্তা সেখানে একেবারে চাপা পড়ে গেছে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন করেছিলেন বিভিন্ন পথে। সাধন করে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সব ধর্ম সত্য। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সেই সমস্ত সাধনের পরিচয় আমরা তো কিছু পাই না। শুধু একটি শ্লোক পাচ্ছি, তাঁর কথা পাচ্ছি। কথার পিছনে যে জীবন থাকা আবশ্যক, তা শ্রীকৃষ্ণের হয়তো ছিল, কিন্তু লেখা তো গীতায় লিখিত নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায় আমরা লিখিত জীবন পাচ্ছি, তাঁর মুখের কথা পাচ্ছি। তার মধ্য দিয়ে তাঁর সাধনা, তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়, জীবন্তরূপে আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। ভুল হতে পারে না, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁরা তখন তখনই লিখে রেখেছেন। তারপর সেই কথাগুলো মনে করে করে গ্রন্থাকারে লিখেছেন তাঁরা। সুতরাং ভুল হতে পারে না।

আর একটি জিনিস শ্রীকৃষ্ণের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তিনি যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে, সমগ্র ভারতকে একত্র করে মহাভারত রচনা করেছিলেন। যুদ্ধ হল কুরুক্ষেত্রে, তারপর

যত রাজরাজড়ারা বশ্যতা স্বীকার করলেন যুধিষ্ঠিরের। সকলকে নিয়ে একটি সাম্রাজ্য সৃষ্টি হল—মহাভারত। শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ?—তাঁর ভাবরাশি সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, তিনি এই সমস্ত জগতের যে শক্তি, তাকে উদ্দীপিত করেছেন। সারদানন্দজী আরও বলেছেন, এই যে স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে গিয়ে শক্তি দেখালেন, এটা শ্রীরামকৃষ্ণেরই শক্তি, তার একটি সামান্য স্ফুট মাত্র, এরপর আরও কত কিছু হবে। এই কথাটাই অন্যভাষায় মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী বলেছিলেন—এবারে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এসেছেন, তখন জগতের যে ব্রহ্মকুণ্ডলিনী শক্তি, তাকে জাগিয়ে তিনি এসেছেন। জগতের যে কুণ্ডলী পাকানো শক্তি, তার যে latent power, যে শক্তিটি প্রকাশিত হয় নি কিন্তু প্রকাশিত করা চলে, তাকে উদ্দীপিত করে, জাগরিত করে, তবে তিনি এসেছেন। যার ফলে জগতের সব মানুষই ক্রমে ক্রমে আত্মস্থ হয়ে উঠছে।—আমরাও ভাল, আমরাও আমাদের দেশ শাসন করতে পারি, আমরাও ধর্ম আচরণ করতে পারি, এই যে সব ভাব সমস্ত জগতে ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে, এর পিছনে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাব। তিনিই তাদের জাগাচ্ছেন, তিনিই জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পূর্ব পূর্ব যে সব অবতার, তাঁদের বিশেষ বিশেষ যে সমস্ত অবদান, তা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে পূর্তি লাভ করেছে—বরং আরও বেশী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের জীবনে যতটা ছিল বা তাঁদের জীবনীকাররা যা হয়তো সবটা খুলে লিখতে পারেন নি, এখানে আমরা তা আরও পরিষ্কাররূপে পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে।

তারপর ধরুন, বুদ্ধের কথা। বুদ্ধের ত্যাগের কথা বলা হয়। তিনি রাজপুত্র ছিলেন। তিনি রাজত্ব ছেড়ে এসেছিলেন, আর তাঁর সদ্যোজাত শিশু এবং তাঁর স্ত্রীকে তিনি ত্যাগ করে এসেছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, জগতের কল্যাণের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায় আমরা কি দেখতে পাই ?—তাঁর ঐ রাজত্ব বলে তো কিছু ছিল না। পর্ণকুটির ছিল কামারপুকুরে, তাও অংশীদারেরা ছিলেন। কিন্তু ছাড়বার মতো সেরকম কোন বস্তু ছিল বলে তো মনে হয় না। অতি গরীব। তবে তিনি কি করলেন ?—না, একহাতে নিলেন টাকা আর একহাতে নিলেন মাটি, নিয়ে বললেন 'টাকা মাটি ; মাটি টাকা', বারবার এহাত ওহাত করলেন, করে যখন ঠিক ধারণা মনে এসে গেল যে টাকাতে আর মাটিতে কোন তফাত নেই তখন দুটোকেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে। তারপর আরও দেখি, কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করলে তাঁর হাত বেঁকে যেত, মনে হত যেন বিছুতে কামড়াচ্ছে। তাঁকে না জানিয়ে তাঁর বিছানার তলায় একটা টাকা রেখেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। রেখে পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে গেছেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন, তখন নরেন্দ্রনাথও ঘরে ঢুকলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় বসতে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। উপস্থিত একজন বিছানার চাদর টেনে তুলতেই টাকাটা বেরিয়ে পড়ল। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, এটা নরেনেরই কাজ। বললেন হাঁ, ঠিক, সাধুকে পরীক্ষা করে দেখে নিবি। এই ছিল তাঁর ত্যাগ। মনে প্রাণে ত্যাগ—লোক-দেখানো ত্যাগ নয়। যেটা ত্যাগ হল, সেটা মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল। শ্রীশ্রীমাও বলেছিলেন, ঠাকুর এযুগে বিশেষভাবে দেখিয়ে গেলেন তাঁর ত্যাগ, ত্যাগের ভাব।

আর স্ত্রীকে ত্যাগ করা, যেটা বুদ্ধ করেছিলেন, ঠাকুরের বেলায় কিন্তু সে জিনিসটা দাঁড়াল অন্য-রকম। তিনি শ্রীশ্রীমাকে নিজের শয্যায় পর্যন্ত

শুতে দিলেন, সেবা করলেন রোগ সারাবার জন্য। তারপরে তাঁকে পূজার আসনে বসিয়ে ষোড়শীরূপে —দশমহাবিদ্যার কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি মহাবিদ্যার ষোড়শীরূপে পূজা করলেন। পূজার পরে তাঁর নিজের জপের মালা মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করলেন, যেন তাঁর সাধনা শেষ হয়েছে এইটি জানাবার জন্য। পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন লক্ষ্মীদিদি, মা, তোমাকে যে ঠাকুর কাপড় পরিয়ে দিলেন, আলতা পরালেন, পূজা করলেন—তোমার কোন সংকোচ হয় নি ? শ্রীশ্রীমা বললেন, আমি তখন আমাতে ছিলাম না, তিনিও তখন তাঁতে ছিলেন না। সাধারণ মানুষের স্তরে তখন তাঁরা দুজনেই ছিলেন না। উর্ধ্বলোকে উঠে আধ্যাত্মিকতায় তাঁরা বিভোর হয়ে গেছেন, এ জগতের কোন চিন্তা তাঁদের ভিতর তখন নেই। সেই মিলনস্থলে এই পূজা। সুতরাং এখানে শ্রীশ্রীমাকে ত্যাগ করা বা গ্রহণ করা কিভাবে আপনারা বুঝবেন, তা আপনারা ঠিক করুন। কিন্তু জগতের ইতিহাসে এটা একটা নতুন জিনিস, ত্যাগের একটা নতুন রকমের অর্থ—আমি তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি না, আমি তাঁকে দেবত্বের আসনে বসাচ্ছি

একবার হরি মহারাজ, স্বামী তুরীয়ানন্দজী ঠাকুরকে বলেছিলেন, আমি মেয়েদের ঘৃণা করি, ঠাকুর ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন—বড় বাহাদুরি! কেন তুমি তাদের ঘৃণা করবে ? তারা জগন্মাতার অংশ, তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেইভাবে তুমি তাদের সম্মান করবে। এই ছিল ঠাকুরের উপদেশ।

তারপর ধরুন, যীশুখ্রীষ্টের কথা। খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস, জগতের সব লোক পাপী, সেই পাপীদের সমস্ত পাপ যীশুখ্রীষ্ট নিজে গ্রহণ করে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, দেহত্যাগ করলেন। আর ঠাকুর বলেছেন, আমার কাছে কত লোক আসে তাদের সব পাপ গ্রহণ করতে হয়েছে, তাই গলরোগ হয়েছে। বিভিন্ন লোক ছুঁয়েছে, তাই গলরোগ তাঁর দেহে এসেছে। আর কি করলেন তিনি ? শুধু যে অপরের পাপগুলি গ্রহণ করলেন তা নয়, কাউকে তিনি পাপী বললেন না। বললেন, তোমাদের সকলের ভিতর নারায়ণ রয়েছেন, সেই নারায়ণকে তোমরা জাগ্রত কর। সেই নারায়ণের সেবা কর। নারায়ণবুদ্ধিতে এই সেবার ভাব তিনি নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। যীশুখ্রীষ্ট দুচারজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোককে নীরোগ করেছিলেন বা মরাকে জীবন্ত করে দিয়েছিলেন। আর তিনি বলেছিলেন, প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসতে আর সেবা করতে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবার ভাব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন লোকসমাজে। আর বলেছিলেন, 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করতে। দেওঘরে জনসেবার প্রসিদ্ধ ঘটনা আপনারা সকলেই জানেন। অনেক গরীব খেতে পায় না, অস্থিচর্মসার হয়ে গেছে। ছেঁড়া কাপড় তাদের, চুলগুলো উস্কখুস্ক, তেল নেই মাথায়। তাই দেখে মথুরানাথ বিশ্বাসকে বললেন, এদের তুমি তেল দাও, পেট ভরে খেতে দাও, আর নতুন কাপড় দাও। মথুরবাবু তখন বললেন, বাবা লোকগুলি সংখ্যায় তো দেখছি অনেক। তা অত দিতে গেলে তো আমাদের তীর্থদর্শন আর হবে না। ঠাকুর তখন বসে পড়লেন তাদের মধ্যে। বললেন, এদের ব্যবস্থা না হলে আমি এখান থেকে উঠবো না, বিশ্বনাথদর্শনে কাশী যাব না। শিবদর্শনে তিনি যাবেন না বলছেন কেন ? না, তিনি স্বয়ং শিবকে দেখতে পাচ্ছেন লোকগুলোর ভিতর। মা কালীর কথা শুনে তিনি জেনেছিলেন যে, তিনি 'নরেন নরেন, রাখাল রাখাল' ইত্যাদি করেন—তা ওদের ভিতর নারায়ণ দেখতে পান বলেই ওরূপ করেন। যেদিন তা না দেখতে পাবেন সেদিন তাদের মুখও দেখতে পারবেন না। দেওঘরে তিনি সাধারণ লোকের ভিতর নারায়ণকে বা শিবকে দেখেছিলেন, তাই

তাদের ছেড়ে তিনি শিবদর্শনে যেতে চান নি। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে একটি শ্লোক আছে—

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

—সর্বভূতে আত্মা ও ঈশ্বররূপে অবস্থিত আমাকে ছেড়ে মূর্খতাবশতঃ যারা প্রতিমায় পূজা করে, তারা শুধু ভস্মে আহুতি দেয়।

মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী দেবী দর্শন করে হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়েছিলেন। আমরা তো পৌত্তলিক বলে নিন্দিত ছিলাম। সেই পৌত্তলিকরা সমাজে অর্থাৎ জগতের সমাজে স্থান পেলাম আধ্যাত্মিক লোক হিসাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি না আসতেন, তবে আমাদের হিন্দুধর্ম বা হিন্দু-সংস্কৃতির কিছুই থাকত না। যিনি এতবড় একটি অবদান দিয়ে গেলেন তিনি আজকে বললেন কিনা আমি শিবদর্শনে না গিয়ে এখানে বসে থাকবো! মথুরানাথকে অগত্যা ঐ দীনদুঃখীদের সেবার জন্য টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। তা 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়লে মনে হতে পারে ওটা যেন একদিনের ঘটনা। কিন্তু অন্য গ্রন্থে লেখা আছে তিন-চারদিন ধরে ঐ সেবা চলেছিল। তাহলে বুঝুন শ্রীরামকৃষ্ণ লোকসেবা করেছিলেন লোকসেবা নয়, শিবসেবা—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। মানুষের মধ্যে শিব রয়েছেন, তাদের ভিতর সে চেতনা জাগিয়ে দাও যে তুমি সাধারণ মানুষ নও, তুমি হচ্ছ শিব। এই শিবকে জাগ্রত কর, তার দ্বারা তোমার নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ কর। তুমি নিজেও সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও। উপনিষদে আছে—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

—অমৃতের পুত্রগণ যাঁরা দিব্যধামে আছেন তাঁরা শুনুন—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি স্বপ্রকাশ ও অন্ধকারের অতীত।

সেই কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগে সকলকে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, সমাজকল্যাণ করলেন। একজনকে অবলম্বন করে নয়, একজন কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে নয়, একজন মরা মানুষকে বাঁচিয়ে নয়, বিশ্বের সমস্ত সমাজের কল্যাণের জন্য একটা পথ তিনি খুলে দিয়ে গেলেন।

তারপরে ধরুন, শ্রীরামকৃষ্ণের মুসলমান ধর্মসাধনার কথা—সুফী মন্ত্র গ্রহণ করে। তার ফলে তিনি কি দেখলেন? বটতলায় ধ্যান করছেন, দেখলেন, একজন দাড়িওয়ালা মুসলমান সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এল। সানকি থেকে ভাত সকলকে খাইয়ে তাঁকেও দুটি দিয়ে গেল। মুসলমান ধর্মের একটি বিশেষত্ব—সামাজিক সাম্য। মুসলমানের সাম্যভাবের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দর্শনের ভিতর দিয়ে পেলেন। কিন্তু শুধু দর্শনের ভিতর দিয়েই পাওয়া নয়, তাঁর সেই সাম্যভাব নিজের জীবনেও দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। গীতায় আছে—

'শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'

—পণ্ডিত যাঁরা, জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা কুকুর এবং কুকুর-মাংসভোজী সবাইকে সমান দেখেন।

ঠাকুর দেখেছেন দক্ষিণেশ্বরে এক উন্মাদপ্রায় সাধু একটি কুকুরের গলা ধরেছেন এক হাতে, অন্য হাতে পাতা থেকে নিজে খাচ্ছেন এবং কুকুরটিকেও খাওয়াচ্ছেন। তাই দেখে তিনি বললেন, আমারও কি এই অবস্থা হবে! তাঁরও হয়েছিল ঠিক ঐ অবস্থা। আর কি করলেন? দক্ষিণেশ্বরে এক বাড়ীতে রাত্রে গিয়ে নিম্নজাতির একজনের পায়খানা সাফ করলেন নিজ হাতে এবং নিজের লম্বা চুল দিয়ে সেটিকে মুছে দিলেন। শুধু কথায় নয়, কাজে দেখালেন সাম্যের ভাব। তারপরে ভিখারীরা খেয়ে গেছে, বিভিন্ন জাতের

তারা—ফেলে গেছে তাদের এঁটো পাতা। সেই সমস্ত পাতা ঠাকুর মাথায় করে নিয়ে গঙ্গায় ফেললেন। তারপর পাতের এখানে-সেখানে খানিকটা ভাত রয়েছে কোথাও কোথাও, তাও ঠাকুর কুড়িয়ে খেলেন।

তাঁর আচরণ দেখে তাঁর এক আত্মীয় হলধারী বললেন, তুমি জাতিচ্যুত হবে, আর তোমার ছেলেমেয়েদের বিয়ে হবে না। ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ, তুমি ভেবেছ আমার আবার ছেলেমেয়ে হবে! হয় নি তাঁর। তাঁর যে সমদর্শন সেটা তিনি দেখিয়ে গেছেন হাতেনাতে। মাঝিতে মাঝিতে ঝগড়া করছে গঙ্গার ঘাটে, একজন আর একজনের পিঠে চাপড় মারল জোরে, যাতে করে পাঁচ আঙুলের দাগ তার পিঠে দেখা দিল। ঠিক সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ চিৎকার করে উঠলেন, যেন তাঁকেই মেরেছে। হৃদয় এসে জিজ্ঞেস করল, মামা তোমার পিঠে পাঁচ আঙুলের দাগ দেখছি লাল হয়ে উঠেছে, কে তোমাকে মেরেছে বল তো? বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ—না, কেউ তো মারে নি। দুটো মাঝিতে ঝগড়া করেছিল, একজন আর একজনকে মারল, তখন মনে হল যেন আমাকেই মেরেছে। এই যে সমবুদ্ধি, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারা, এই অনুভূতি ফুটে উঠেছে শরীরে পর্যন্ত। এরূপ দৃষ্টান্ত তো ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠাকুর বলেছেন, এখানকার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে। এই তো এবং আরও কত দৃষ্টান্ত আছে।

তারপরে আমরা শংকরাচার্যের কথা ধরতে পারি। তিনি অদ্বৈতবেদান্তী ছিলেন এবং নির্বিকল্প সমাধি—যাকে বলা হয় সাধনজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি—সেই নির্বিকল্প সমাধিতে তিনি আরূঢ় হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তিনদিনেই সমাধি আয়ত্ত করেছিলেন। শংকরাচার্য একটানা ছমাস সমাধিতে ছিলেন একথা অবশ্য গ্রন্থে লিখিত নেই, হয়তো ছিলেন কে জানে! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায় আমরা পড়েছি, তিনি নিজেও বলেছেন, তিনি ছমাস নির্বিকল্প অবস্থায় ছিলেন, যা নাকি জীবের পক্ষে একুশ দিনের বেশী সম্ভব নয়। তা কি করে বেঁচে ছিলেন? তখন এক সাধু সেখানে এসেছিলেন। তিনি তাঁর অবস্থা দেখে বুঝলেন—ইনি মহাপুরুষ। এঁর দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ হবে। সুতরাং তিনি লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাঁকে একটুখানি জাগাতেন আর তাঁর মুখে ভাত গুঁজে দিতেন। এমনি করে তাঁর শরীর রক্ষা করেছিলেন, তারপর জগন্মাতা তাঁকে আদেশ দিলেন, তুই ভাবমুখে থাক। অর্থাৎ একেবারে নির্বিকল্প অবস্থায় ডুবে না গিয়ে তারই ঠিক দরজাতে দাঁড়িয়ে থাক। তার দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাক। যেমন মন্দিরের দরজাতে দাঁড়িয়েছি—দেবদর্শনও হচ্ছে, জগৎ-দর্শনও হচ্ছে। কিন্তু জগৎটি যখন আসছে তখনও মনটি দেবতার দিকেই ঝুঁকছে, জগতের দিকে নয়। এই ছিলেন আমাদের ঠাকুর। আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে নানারকম ভাব, মহাভাব ইত্যাদি দেখা যেত, সেইগুলো ঠাকুরের শরীরেও বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

আর একটা জিনিস আমি আপনাদের বলে শেষ করছি। সেটা শংকরাচার্যের বেলায় বিশেষ করে খাটে, তবে আমরা ভুল করে সেটার অন্য-রকম কদর্থ করে ফেলেছি। আমরা ধরে নিই যে বেদান্তী যে হবে, তার সঙ্গে জগতের কোন সম্পর্ক থাকবে না। জগৎ তো মায়াময়। জগৎ যদি মায়াময়ই হয়, তার যদি বাস্তব সত্তা না থাকে, তবে তার জন্য কিছু করার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎটাকে দেখলেন মা জগদম্বারই একটি রূপ হিসাবে, শক্তিরই একটি রূপ হিসাবে। তার সঙ্গে তিনি একটা ভালবাসার সম্বন্ধ পাতালেন—জগতে যত মানুষ আছে তাদের

ভালবাসা, তাদের যাতে হিত হয় তাই করা। কলকাতায় যতদূর সম্ভব বার বার গিয়ে কীর্তনাদিতে তিনি যোগ দিয়েছেন। ব্রাহ্মদের বলেছেন, তোমরা সমাজসংস্কার ইত্যাদি নিয়ে এত মেতেছ কেন?—তোমরা ভগবানে ডুবে যাও। 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।' ভগবানে ডুবে যাও, কর্মের দিকে এত ঝুঁকছ কেন? তাদের যে আধ্যাত্মিক জীবন সেটাকে আরও গভীরতর করবার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করে গেছেন। কেন চেষ্টা করে গেলেন? না, বলছেন, যতক্ষণ 'আমি'-বোধ আছে, ততক্ষণ জীব আছে, ঈশ্বর আছেন, জগৎ আছে। সবই আছে। এদিকে 'আমি'-বোধ রয়েছে, কাঁটা বিঁধছে, রক্ত বেরোচ্ছে আর বলছি জগৎ নেই, জগৎ স্বপ্নময়—এটা মিথ্যাচার। সুতরাং তুমি যে অবস্থায় আছ, যেখানে আছ আগে সেটাকে স্বীকার কর। তোমাকে যদি বাড়ীর ছাদে উঠতে হয় তবে যে ধাপে পা দিয়েছ, সেই ধাপটা বুঝে নাও—সেটা কতখানি উপরে। আর কতগুলো সিঁড়ি বেয়ে তোমাকে উঠতে হবে সেটা রাখ মনে। তা না হলে যদি মনে কর আমি ধাপে যখন পা দিয়েছি, তখন আমার সব হয়ে গেছে, আর লাফালাফি যদি শুরু করে দাও, তবে কি হবে? ঘাড় মটকাবে মাটিতে পড়ে। আমাদের সেই হয় অবস্থা! আমরা যেখানে আছি, নিজের অবস্থাটাকে ভাল করে বুঝে না নিয়ে সেখান থেকে এগোবার জন্য যে চেষ্টা, সে চেষ্টা না করে একটা ভুয়ো philosophy-র পিছনে ছুটি। চরম যে সত্য সেটি শ্রীশ্রীঠাকুর মুখে বলতে পারেন নি। বলেছিলেন, আমি তো বলতে চাই রে, কিন্তু মা মুখে চাপা দিয়ে রেখেছে, বলতে দেয় না। আমরা মনে করি সেই যে উচ্চতম দর্শন, সেই দর্শনটা যেন আমাদের হয়ে গেছে, যেহেতু বইতে পড়েছি। বইতে পড়াতে কি হবে? ঠাকুর তো বলেছেন, পাঁজিতে লেখা আছে এ বছরে এক আড়া বৃষ্টি হবে, কিন্তু পাঁজি নিংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না জল; এক ফোঁটাও বেরোক, তাও নয়। এই তো ঠাকুর বলেছেন। সুতরাং ধর্মজগৎটা কথার কথা নয়, কাজে ফলানো চাই। জগৎটাকে স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে একটা ভালরকমের দোস্তী করে নেওয়া, ভালরকমের একটা সম্বন্ধ করে নেওয়া। যে কাজটা শংকরাচার্যও করেছিলেন। শংকরাচার্য যে এতগুলো গ্রন্থ লিখলেন, জগতের কল্যাণের জন্য তো? আর তিনি যদি জগৎটাকে অন্ততঃ খানিকটা সত্য বলে না মানতেন তাহলে কাগজ-কলম হাতে নিলেন কেন? এত খাটলেন কেন—লিখলেন কেন? তিনি বদ্রীনাথে গিয়ে স্বপ্নদর্শন করলেন, ঐ পাথরের তলায় বদ্রীনাথ পড়ে আছেন; তাঁর অংশবিশেষ ভেঙ্গে গেছে। সেই ভগ্ন মূর্তিটি তুলে এনে বদ্রীনাথের মন্দিরে তিনি স্থাপন করলেন। আর কত জায়গায় কত মঠ-মন্দির স্থাপন করলেন। সারা ভারতের চারদিকে বড় বড় চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। গোটা ভারতবর্ষকে তিনি political দিক থেকে এক করে ফেলেছিলেন। তারপর তিনি দশনামী সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। যার ভিতরে আমরাও পড়ি। পুরী, গিরি, ভারতী, সরস্বতী ইত্যাদি করে তাদের ভাগ করে দিলেন বেদরক্ষার জন্য, শাস্ত্ররক্ষার জন্য—তোমরা এই বেদ পাঠ করবে, তোমরা ঐ বেদ পাঠ করবে—এইভাবে। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়ে গেলেন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য। এতখানি দূরদৃষ্টি যাঁর, এতখানি practical যিনি, এতখানি pragmatic যিনি, তাঁর কাজ দেখলে মনে হয়, এ জগৎটাকে যেন একেবারে সত্যি বলে গ্রহণ করেছেন। যাতে জগতের ঠিক ঠিক উপকার হয়, মঙ্গল হয়, তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই হলেন শংকরাচার্য।

শ্রীরামকৃষ্ণও তাই করেছিলেন। যতক্ষণ 'আমি'-বোধ আছে, ততক্ষণ আমার মা কালী আছেন, জীব, জগৎ সব আছে। জগৎটায় আমি যখন আছি, তখন তার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে। কিভাবে? সেবার ভাবে। সকলের সেবা করছি, মায়ের পূজা করছি এই হিসাবে করতে হবে। এইটি শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন এবং বললেন যে, শক্তির পূজা শ্রীকৃষ্ণও করেছিলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত করেছিলেন। এই শক্তির পূজা করতে হবে। যাঁরা বেদান্তদর্শন পড়েছেন, তাঁরা জানেন শংকরাচার্য মায়াকে বলেছেন ব্রহ্মের শক্তি—পরিষ্কার ভাষায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আছে—'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।' এই যে মায়া আমরা বলছি, এটি হচ্ছে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার আত্মভূত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি। 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।' মায়াকে প্রকৃতি বলে জানবে, আর এই প্রকৃতিকে যিনি চালাচ্ছেন, সেই পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলে জানবে। এই তো শাস্ত্রের কথা। আর ঠাকুরের এই ছিল অপরোক্ষ অনুভূতি। সমস্ত আধ্যাত্মিক ভাবরাশি তাঁর ভিতরে সম্মিলিত হয়ে যে নতুন রূপ নিয়েছে, তাতে মনে হয় যেন এটা একটা নতুন জিনিস। পুরাতন সব হতে পারে, কিন্তু পুরাতনের ভিতর থেকে ভালগুলিকে বেছে নিয়ে অনুভূতির দ্বারা সেগুলিকে সুস্পষ্ট করে একই জীবনে সংগ্রথিত করে যে একটি সুন্দর ফুলের তোড়া সাজানো, সেটি শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।*

* ২৪. ১. ১৯৮১ তারিখে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বা অন্যদের উক্তির যে-সকল উদ্ধৃতি ইহাতে আছে, সেগুলি গ্রন্থলিখিত উক্তিগুলির সহিত হুবহু না মিলিলেও ভাব সম্পূর্ণ ঠিক আছে।

বিপিনচন্দ্র পালের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

বিপিনচন্দ্র পাল বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এক প্রধান রাজনৈতিক চরিত্র। ঐকালে তিনি সর্বভারতীয় চরমপন্থী নেতাদের অন্যতম। তাঁর নাম তপ্ত আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে তিলক ও লাজপত রায়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রে—'লাল [লাজপত রায়]-বাল [বাল গঙ্গাধর তিলক]-পাল' [বিপিনচন্দ্র পাল]। স্বদেশী-যুগে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। অরবিন্দ বলেছেন: তাঁর বাগ্মিতা প্রায় দিব্য 'অবতরণ'; তাঁর বক্তৃতায়, 'আগুন জ্বলত'; তাঁর বক্তৃতার প্রভাব সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি ইত্যাদি। আমরা জেনেছি, 'বয়কটে'র পক্ষে বিপিন পালের কণ্ঠের নির্ঘোষে দেশ কম্পিত; 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-তত্ত্বের তিনিই প্রথম প্রচারক। ঐ সময়ে অন্যতম প্রধান সাংবাদিক-লেখক তিনি। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক কে, সে-প্রশ্নে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনকালে বিপিন পালের ভূমিকা প্রবল ও প্রচণ্ড সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিপিন পাল একইসঙ্গে আশঙ্কিত ও আত্মখণ্ডনে পূর্ণ। ব্রাহ্মমত থেকে বৈষ্ণবতা থেকে চরমপন্থী জাতীয়তা থেকে রাজনৈতিক আপসমুখিতা। দ্বিধান্বিত তাঁর ধর্মীয় চরিত্র,[১] দ্বিধান্বিত তাঁর রাজনৈতিক

১ লেখককৃত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২। বইটি অতঃপর 'সমকালীন' শব্দের দ্বারা সূচিত হবে।

চরিত্র।[২] বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বিপিন পালের বক্তব্যের আলোচনাতেও দেখব একই অস্থিরতা, যা কাল গতে স্থিরতা এবং ক্রমপরিণতি পেয়েছে। সে-ইতিহাস চিত্তাকর্ষক।

লেখক বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে একথা অবশ্যস্বীকার্য —বিচারবুদ্ধি এবং মনীষার চিহ্ন তাঁর লেখায় যথেষ্ট। তাঁর মতো চলমান জীবনে স্থিরসিদ্ধ মতপ্রকাশের সুবিধা প্রায়ই থাকে না। তদুপরি তিনি রাজনৈতিক, বাগ্মী এবং সাংবাদিক। এই সকল পরিচয় লেখক-পরিচয়কে একদিকে সহজ করে, অন্যদিকে অগভীর। পূর্বোক্ত পরিচয়ের অধীন মানুষকে দ্রুত তীক্ষ্ণ এবং গ্রাহ্যভাবে বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়, প্রকাশভঙ্গিতে সতেজ অনর্গলতা থাকে, কিন্তু তার ফলে গভীর খাতে তাঁদের চিন্তা প্রবাহিত হতেও পারে না। বিপিন পালের লেখায় ঐসকল লক্ষণজাত অসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দ মনীষাও তাঁর ছিল যা তাঁকে প্রয়োজনভিত্তিক চিন্তার দৈনন্দিনতা থেকে বহুলাংশে রক্ষা করেছিল, ফলে হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের 'নবজন্ম'কালের ও স্বদেশীযুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান লেখক।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র বেশ কয়েকবার লিখেছেন। তাঁর সব লেখার সন্ধান পেয়েছি এমন মনে করি না, কিন্তু বেশ কয়েকটির পেয়েছি, এবং সেগুলি বিচার-বিশ্লেষণের গুণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান রচনা।

লেখাগুলির মধ্যে যেসব প্রসঙ্গ বিশেষভাবে এসেছে সেগুলি হল: (১) ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্ক, (২) রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্ক, (৩) পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের প্রচারসাফল্য, (৪) জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রেরণা, (৫) বিবেকানন্দ-উদ্‌গীত মানবতার বাণী।

বিপিন পালের বিবেকানন্দ-বিচারের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দুই ভাগ দেখা যায়—স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বিচার। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববর্তী সময়ে, ঠিকভাবে বলতে গেলে স্বামীজীর দেহান্তকাল পর্যন্ত সময়ে, মত পথের ব্যাপারে বিপিন পাল বিবেকানন্দের ভিন্নপথগামী, তদনুযায়ী কখনো সমালোচক কখনো সমাদরকারী। আর স্বদেশী আন্দোলনের পরে, বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর পূর্ণতর মহিমার অনুধাবনে সমর্থ হয়ে, তিনি প্রধানাংশে সহানুভূতিযুক্ত বিশ্লেষক, যদিও চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের দাবি কখনই ত্যাগ করেননি। কিন্তু আমরা সতর্ক বিচারে লক্ষ্য করি, ক্ষেত্রবিশেষে তিনি পূর্বমতের বিরোধিতাই করেছেন।

এবার কালানুক্রমিকভাবে বিপিনচন্দ্রের লেখাগুলি (যেগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছি) লক্ষ্য করা যাক।

বিপিন পালের বিবেকানন্দ-বিষয়ে প্রথম লেখা পাই মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, লণ্ডনের চিঠিতে। ঐকালে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের বৃত্তি গ্রহণ ক'রে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম হিসাবে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তখন তাঁর উৎসাহী হবার কারণ ছিল না, কিন্তু যুক্তিবাদী মানুষের ঔদার্য তাঁর ছিল। তিনি ইংলণ্ডে বিবেকানন্দের সাফল্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ চিন্তাশীল কিছু মানুষকে বিবেকানন্দ কিভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, যা তখনি 'বিবেকানন্দ-বাদ' কথাটির সৃষ্টি করেছিল—তা ঐ রচনা থেকে দেখতে পাই।[৩]

২ লেখককৃত প্রকাশিতব্য 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের ২য় খণ্ড।

৩ সমকালীন, ২য়, ১২-১৩।

এই পর্ব পর্যন্ত বিবেকানন্দ বিপিনচন্দ্র পালের কাছে উপলব্ধিমান ধর্মপুরুষ নন, রামমোহন প্রভৃতির মতো ধর্মসংস্কারক। এই ধারণা তিনি প্রকাশ করলেন আমেরিকায়, বস্টনে, নিবেদিতার সঙ্গে সংঘর্ষমুখে। পাল এই সংঘর্ষের বিবরণ তখনি পত্রে লিখে পাঠিয়েছিলেন, যার উল্লেখ আবার জগদীশচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে (১৮ এপ্রিল, ১৯০০) করেছেন।[৪] পরবর্তীকালে পাল তাঁর 'মার্কিনে চারিমাস' গ্রন্থেও এই সংঘর্ষের বিবরণ দিয়েছেন। সংঘর্ষের অন্যতম কারণ—পাল বলতে চেয়েছিলেন, স্বামীজীকে হিন্দুরা ধর্মগুরুরূপে গ্রহণ করেনি, তিনি রামমোহন রায় প্রভৃতির মতো ধর্ম ও সমাজসংস্কারক আর নিবেদিতার মতে—না, স্বামীজীকে হিন্দুরা ধর্মগুরু বলে গ্রহণ করেছে।

এই তর্কের তথ্যবিচার ক'রে আমরা বলতে পারি, পালের অপেক্ষা ঐকালেও নিবেদিতার কথাই অধিক সত্য ছিল, যদি দক্ষিণভারতের, এমনকি তার রক্ষণশীল অংশেরও, হিসাব নেওয়া যায়। তবে তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের সম্বন্ধে ঐকথা প্রধানাংশে সত্য নয়।

আলোচ্য ঘটনার দু'বছর পরে যখন স্বামীজীর দেহান্ত হল, তখনো পালের বিবেকানন্দ-বিষয়ে ধারণার পরিবর্তন বিশেষ হয়নি। 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় যে-শোকসংবাদ বেরিয়েছিল, সেটি নিঃসন্দেহে সম্পাদক বিপিন পালেরই রচনা—তার মধ্যে সমাদরের ব্যাপারে যথেষ্ট কার্পণ্য দেখা যায়। সমাদরের মধ্যে ছিল: "বিরাট শক্তিতে সম্পন্ন, চূড়ান্ত বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিবেকানন্দ —যেখানেই গেছেন বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করেছেন।" ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে বিবেকানন্দের গায়ক ও অভিনেতা-রূপে সম্পর্ক ছিল, এবং "বিবেকানন্দের প্রদত্ত শিক্ষায় কদাপি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয় যে-যুক্তিশীলতা" তা যে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে প্রাপ্ত—একথা ঐ লেখায় পাই। তবে ওখানে একথাও স্বীকার করা হয়—রামকৃষ্ণের প্রভাবই বিবেকানন্দের উপর অধিক। বিবেকানন্দ যে "আমেরিকায় ভারতীয় জীবন ও চিন্তা বিষয়ে বৃহৎসংখ্যক মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার ব্যাপারে দৃঢ়ভিত্তিক প্রবর্তকের কার্য করেছেন," তাও স্বীকৃত হয়েছিল লেখাটিতে, এবং লেখাটি শেষ করা হয়েছিল এই বলে যে, "তাঁর দেশবাসী অচিরে তাঁকে [বিবেকানন্দকে] ভুলে যাবেন না। তাঁকে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করা হবে, কারণ তিনি সেইসকল মানুষের অন্যতম যিনি তাঁর স্বদেশ-বাসীকে সভ্যজগতের শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন—এবং তার দ্বারা কিছু পরিমাণে জাতীয় আত্ম-চৈতন্যের জাগরণ ঘটিয়েছেন। ও বস্তু বিহনে কোনো জাতিই তাদের ঈশ্বর-নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হয় না।"

এইসকল প্রশংসার অনেক অংশ হরণ করে নিয়েছিল অন্যতর মন্তব্যগুলি—"আচার্য হিসাবে বিবেকানন্দের শক্তি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা বা ধারণার প্রসারতা অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। বস্তুতঃপক্ষে দর্শনের শিক্ষক হিসাবে বিবেকানন্দ সুশৃঙ্খল রীতি-অনুসারী ছিলেন না। ঐ বস্তুটিই [রীতি অনুসরণ না করাই] তাঁকে, উভয় গোলার্ধের যেসব মানুষ চমকলাগানো বচনের দ্বারা চালিত হয়, তাদের মধ্যে তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল।" "বৃহৎসংখ্যক মানুষের মধ্যে অসাধারণ পরিমাণে উদ্দীপনা সঞ্চারে সমর্থ বিবেকানন্দ" কেশবচন্দ্র সেনের পরেই শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, [খাঁটি বাগ্মীর কিছু-কিছু গুণের অসদ্ভাব যে বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল, তা জানাতে পাল

৪ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম, ৫৯৪-৭৫।

তোলেননি, কিন্তু সেই অভাব কোন্‌গুলি, তা জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন], "কিন্তু তিনি চিন্তা-প্রণালী নির্মাণ করেননি।" বিবেকানন্দের নেতৃত্বগুণের কথা স্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী করার ঝুঁকি পাল নিতে চাননি।

আমরা কিছু কৌতুকের, অধিক আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করব—এই পর্বে যেসব বস্তুকে বিবেকানন্দের অভাব বলা হল, সেগুলিই পালের দৃষ্টিতে পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের সম্পদ বলে পরিগণিত হবে।

পালের পরবর্তী লেখাটি বেশ কয়েক বৎসর পরের—১৯১৩ সালে 'হিন্দু রিভিউ' পত্রিকায় বিবেকানন্দ-জীবনীর আলোচনাসূত্রে লিখিত।[৫] মধ্যবর্তীকালে পাল বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই লিখে থাকতে পারেন। লিখুন বা না-লিখুন—স্বদেশী আন্দোলনকালে তিনি দেখেছিলেন—বিবেকানন্দ বাংলাদেশে কেবল সংস্কারক, দেশ-প্রেমিক নন—ধর্মগুরু হয়ে উঠেছেন। অরবিন্দ প্রভৃতির মতো আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে পাল বিবেকানন্দের উচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চয় জেনেছিলেন—ভারতের সর্বত্র বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের পার্শ্ববর্তী হয়ে কিভাবে পূজিত হচ্ছেন তাও দেখেছিলেন ; ফলে তাঁকে তাঁর পূর্ব ধারণার পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছিল।

উল্লিখিত রচনাটিতে তরুণ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ ও রামকৃষ্ণের সম্পর্কই আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের কাছে নরেন্দ্রনাথ কী পেয়েছিলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে সেই প্রাপ্তির অসম্পূর্ণতা কিভাবে বুঝেছিলেন, তারপরে, তাঁর প্রয়োজন কিভাবে রামকৃষ্ণের চেতনা পূর্ণ ক'রে দিয়েছিল, তার বিবরণ উপযুক্ত মনস্বিতার সঙ্গে পাল দিয়েছেন। 'স্বাধীনতা' ব্যাপারটির কোন্ গভীর অর্থ রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে ও বাণীতে মূর্ত করেছিলেন, তাও এখানে পাই। পালের বক্তব্য এইপ্রকার :

"বিবেকানন্দ তাঁর প্রজন্মের অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত দেশবাসীর মতোই একসময়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন। অনেকের মতোই তিনি ব্রাহ্মসমাজের ধর্মজীবনের টানে যতটা না আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ততোধিক আকর্ষণ বোধ করেছিলেন ঐ সমাজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বোধ ও যুক্তি-পন্থিতার জন্য। সেকালে তরুণ নরেন্দ্রনাথকে যাঁরা জানতেন তাঁরা বলেন—তিনি ঐকালে অল্পবিস্তর মুক্তচিন্তার মানুষ। বস্তুতঃপক্ষে আমার মতে, তিনি তাঁর সমগ্র জীবনেই মুক্তচিন্তার মানুষ। এদেশের প্রতিটি বৈদান্তিকই অল্পবিস্তর তাই। তাঁর মনের এই যুক্তিপ্রবণতা, সেইসঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্বন্ধে তীব্র প্রীতি, যা তাঁর মধ্যে এমনকি উদ্ধত বিদ্রোহচেতনার সৃষ্টি করেছিল—আমার মতে, ব্রাহ্মসমাজের এইসব জিনিসই ব্রাহ্মসমাজের দিকে তাঁকে টান দিয়েছিল। কিন্তু মানুষটির প্রচণ্ড স্বাধীনতাবোধের কাছে শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের নবনির্মিত বিধিবন্ধন, প্রাচীন সমাজের ঐতিহ্যগত বন্ধনের মতোই বিরক্তিকর মনে হল ; ফলে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁর প্রীতি ও উৎসাহ ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল। অপরপক্ষে যখন তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এলেন—দেখলেন যে, ওঁর জীবনে ও শিক্ষায় এমন স্বাধীনতাচেতনা আছে যা আমাদের সর্বাধিক মুক্ত-প্রত্যয়ের ধর্মান্দোলনসমূহের মধ্যেও লক্ষিতব্য নয়। ব্রাহ্মসমাজ তার সদস্যদের উপরে বিশেষ মতবাদ চাপিয়ে দিয়েছিল। তা অতীব সহজ ও যুক্তিযুক্ত

৫ Bipin Chandra Pal: Writings and Speeches, Vol. I (Yugayatri, Calcutta, 1958), "Swami Vivekananda—The Man."

মতবাদ হতে পারে তথাপি ঐ সমাজের মতবদ্ধ চরিত্র অনস্বীকার্য। কিন্তু এখানে, পরমহংসের সান্নিধ্যে একেবারেই কোনো সীমাবন্ধন ছিল না। ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান, রক্ষণশীল হিন্দু, এমনকি মুসলমানগণও স্বাগত। পরমহংস—পরমহংস-জাতীয়ের অনুরূপভাবে—সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন সংশয়ে বা সংকটে পতিত মানুষের প্রশ্নের সমাধানে—কিন্তু কদাপি কাউকে উচিত অনুচিত পথের কথা বলতেন না। এখানে কেবল যে, মতাদর্শের বন্ধন বা সীমানির্দেশ ছিল না তা নয়, এমনকি তথাকথিত নীতিবন্ধনও ছিল না। কোনো মানুষকে প্রথমে পুণ্য-পবিত্র হবার পরে তবে আচার্যের পরিমণ্ডলের মধ্যে আসতে বলা হত না। ব্রাহ্মসমাজের নীতিনিয়ম ইতিমধ্যেই ইংরেজীতে যাকে বলে 'ননকন্‌ফরমিস্ট কনসেনস্', অনেকটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেসব মানুষকে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদ দেওয়া সম্ভব ছিল না তাদেরই মুক্তবাহুতে গ্রহণ করেছিলেন এই পুণ্যপুরুষ। এই সুগভীর মানবিকতায়, তৎসহ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে পূর্ণ ছিল আচার্যের পরিবেশ—সেই জিনিসই আমার ধারণা, ঐ তরুণকে আকর্ষণ করেছিল, কেননা সে ব্যাকুল ছিল পৃথিবীর মুক্ততম জীবনের জন্য।"

অ্যানী বেশান্ত সম্পাদিত 'কমনউইল' পত্রিকায় ১৮ অগস্ট, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬—এই দুই সংখ্যায়, বহির্বিশ্বে বিবেকানন্দের প্রয়োজন, মূল্য এবং ভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে তাঁর গুরুত্বের সম্পর্কে পাল এক প্রবন্ধ লেখেন।[৬] এই রচনায় আমরা লক্ষ্য করব, পাল তাঁর পূর্ব ধারণা ত্যাগ ক'রে বিবেকানন্দকে সর্বোচ্চ স্তরের ধর্মাচার্যরূপে উপস্থিত করেছেন।

জাতীয় জাগরণের সঙ্গে বৈদেশিক প্রচারের সম্পর্কই প্রবন্ধটির মুখ্য উপজীব্য। সূচনায় ভারতীয় জাতীয়তার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের চরিত্র-নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতের জাতীয়চেতনার সূত্রপাত হয় ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ও সংঘর্ষে। কিন্তু ঐ পর্বে জাতীয়তা যথার্থ শক্তি পায়নি—তা পেতে পারে না যতক্ষণ না সে 'বিজয়' অভিযানে অগ্রসর হয়। ঐ বিজয়-প্রয়াস কিছুটা রাজনৈতিক কিছুটা চিন্তাজগতে ঘটতে পারে। সামগ্রিক জাতীয়চেতনা পেতে হলে জাতিকে অগ্রসর হতে হবে—'সংঘর্ষ' পর্ব থেকে 'বিজয়' পর্বে—সেখান থেকে 'সমন্বয় ও স্বীকরণ' পর্বে। পাল বলেছেন: "আমাদের ক্ষেত্রে 'বিজয়ে'র আন্দোলন অবশ্যই হয়েছিল চিন্তাজগতে ও নৈতিকজগতে—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়। আর এই বিজয়-অভিযান স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে যুক্ত—বিবেকানন্দই আধুনিককালে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রথম হিন্দু মিশনারি। তাই এদেশের আধুনিক জাতীয়তার ইতিহাসে তাঁর অত্যুচ্চ স্থান।"

পাল অতঃপর ব্রাহ্মসমাজসহ অন্য সংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রয়াসের পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, ব্রাহ্মসমাজ থেকে আরম্ভ ক'রে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের সংস্কার-আন্দোলন—সকলই আত্মরক্ষাত্মক চরিত্রের। ব্রাহ্মসমাজ একধরনের সার্বভৌমিকতার আদর্শ এনেছিল কিন্তু সে-বস্তু উনিশ শতকের আদি ও মধ্যকালের ইউরোপীয় সার্বভৌমিকতার প্রভাবে সৃষ্ট বলে চরিত্রে সংকীর্ণ, যার থেকে ভারতবর্ষের বিশেষ কিছু পাবার ছিল না। ফরাসী ভাবালোকিত ইউরোপীয় যুক্তিবাদের উৎপাদন ব্রাহ্মসমাজ—তার সম্বন্ধে ব্যঙ্গমুখে বলা হলেও

৬ Bipin Chandra Pal, **Commonweal**, Aug. 18, Sept. 1, 1916. **Swami Vivekananda and Hindu Foreign Missions.**

সত্য যে, তা ছিল খ্রীস্ট ছাড়া খ্রীস্টানী—বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বৈদেশিক প্রচারবস্তু অনুযায়ী। "তাঁদের কেউই [পাল বলেছেন] বৃটিশ ও আমেরিকান শ্রোতাদের কাছে খাঁটি ভারতীয় বা হিন্দু ভাবাদর্শ উপস্থিত করতে পারেননি। বিবেকানন্দই প্রথম সেকাজ করলেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় পুনরুত্থানে নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে।"

ম্যাক্সমূলারসহ ইউরোপীয় ভারততাত্ত্বিকরা বিবেকানন্দের ক্ষেত্র কিছুটা প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ নিজ শক্তিতেই প্রধানতঃ নিজের পথ পরিষ্কার করেছিলেন। পাল লিখেছেন :

"বিবেকানন্দের কর্মসাফল্যের মূলে প্রধানতঃ ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সাহস। ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের উচ্চম্মন্যতার অহমিকায় তিনি সোজা আঘাত করেছিলেন—তাদের নির্ঘোষিত সভ্যতা-সংস্কৃতির সুস্থতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। আর নিজের ব্যক্তিজীবনে তিনি ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এবং ইসরায়েলের প্রফেটগণের মতো ক'রে পার্থিব সম্পদের শূন্যতা প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন। বিরাট শক্তিধর পুরুষ তিনি, সবিশেষ শিক্ষিত ; যদি পার্থিব ধনসম্পদ, পদমর্যাদা ইত্যাদি চাইতেন—সহজেই পেতেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছা-নিঃস্ব। জনগণ তাঁর মধ্যে দেখল খাঁটি খ্রীস্ট-চরিত্রের চিত্র। তারা গির্জার মধ্যে ঐ চিত্রের উপাসনা করে, কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করে স্বগৃহে, বাণিজ্যক্ষেত্রে, রাজনৈতিক পরামর্শসভায়, সর্বোপরি দূতাবাসে। আর এখানে দেখা গেল এমন একজন মানুষকে যাঁর সঞ্চয় বলতে কিছু নেই, দাবি নেই, নিজের জন্য প্রার্থনা নেই, যিনি আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার মধ্যে আত্মার স্বয়ংভর সর্বাত্মক অধিকারের প্রফেটরূপে দণ্ডায়মান। এমার্সন ঊর্ধ্বতর আত্মার তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতাদের বললেন (শ্রোতারা 'কেন-র কী এবং কী-র কেন' সম্বন্ধে আলোচনায় বড়ই আমোদিত ছিল)—ঐ ঊর্ধ্বতর আত্মা তোমাদের দৈনন্দিন কর্মক্লিষ্ট জীবনের থেকে বহুদূরে অবস্থিত কোনো বস্তু নয়—ও তোমাদেরই নিজ সত্তা ; ঊর্ধ্বতর আত্মা ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়ে কর্মরত, ঘর্মাক্ত, বেদনাক্রান্ত, পরিশেষে সংগ্রামে বিজয়ী। ফরাসী নবজন্মের আলোক-প্রাপ্ত দার্শনিকগণ, তাঁদেরও পূর্বে স্বয়ং যীশুখ্রীস্ট, তাঁরও পূর্বে রোমক ও গ্রীক আচার্যগণ—মানব-ভ্রাতৃত্বের কথা বলে গেছেন। 'Men, my brothers, men the workers, ever reaping something new, that which they have done but earnest of the things that they shall do'—এই ছিল আধুনিক খ্রীস্টান জগতের কাছে সর্বোচ্চ বাণী। বিবেকানন্দ বললেন, খ্রীস্টান ভ্রাতৃত্ববোধের এই মতবাদ হিন্দুদের দ্বারা প্রচারিত মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব-তত্ত্বের বহু-বহু নিম্নে অবস্থিত। বিবেকানন্দের মধ্যে তারা প্রথম সেই মানুষকে দেখতে পেল যিনি কেবল বেদান্তের কথা বলেন না, পরন্তু বেদান্তকে জীবনের সর্বোচ্চ সত্যরূপে যথার্থই বিশ্বাস করেছেন এবং তাকে নিজ জীবনে ও অপরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। হারভার্ডের এক সুপরিচিত অধ্যাপক আমাকে একবার বলেছিলেন, 'আমরা হিন্দু অদ্বৈতবাদের কথা আগে কেবল পড়েছিলাম, কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে প্রথম দেহধারী অদ্বৈত-বাদীকে দেখেছি। তিনি আমাদের কাছে অপরিচিত এক প্রজাতি-নমুনা—কিছু-কিছু বিলুপ্ত ভূতাত্ত্বিক নমুনার কথা আমরা বইয়ে পড়ি, কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে তাদের দেখা যায় না—তেমনি নমুনা।'" নববেদান্তের এই সাহসী প্রবক্তা

[মূর্তিপূজা ও জাতিপ্রথা]—এই দুটি জিনিসকে অস্বীকার করলেন না—চুণকাম করবার চেষ্টাও করলেন না। আমাদের জাতি আছে—তোমাদের কি শ্রেণী নেই? তোমাদের শ্রেণী আমাদের জাতির চেয়ে অধিক পরিমাণে সর্বনাশ ক'রে থাকে। আর ঐ উদ্ধত বস্তুটির থেকে চরম নিরাময়ের যে বিধান আছে আমাদের বৈদান্তিক দর্শন ও জীবননীতিতে, যা সার্বিক চৈতন্যের চিরলক্ষ্যে আমাদের পথপ্রদর্শন করে—সে-বস্তু কোথায় আছে তোমাদের মধ্যে? আমাদের মূর্তি আছে ঠিক, কিন্তু তোমাদের সম্পদ, বিশেষ শ্রেণী, পদ ইত্যাদির মূর্তি অপেক্ষা তা নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের। মূর্তি ইন্দ্রিয়-জগতের মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় জগতে আমাদের উত্তোলিত করতে চায়, কিন্তু তোমাদের মূর্তি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা-ভাবনাকে ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ রাখে, যার পরিণতি স্থূল ইন্দ্রিয়ালুতায়, নির্দেন বস্তুময়তায়। এইপ্রকার সাহসিকতা ও প্রত্যক্ষতায়, মানসিক বা অন্যবিধ সংকোচশূন্যতায় পূর্ণ ছিল গৃহহীন, কপর্দকহীন, গৈরিকবসন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর উক্তিসমূহ; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অনন্ত মহিমময় ব্যক্তিত্বের যাদু; ফলে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নূতন চাঞ্চল্য জেগেছিল, যা ভারতের জাগরণমুখী জাতীয় চৈতন্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে নূতন শক্তি ও প্রেরণা দান করেছিল।"

এই লেখাটির দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় বিপিনচন্দ্র বিশ্লেষণ ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেন—বৈদেশিক প্রচার জাতিকে কোন্-কোন্ বস্তু দান করে। তাঁর মতে জাতিকে তা (ক) নিজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে নব প্রত্যয় দান করে, (খ) বিশ্বের উদ্দেশ্যে তার প্রদেয় বাণী সম্বন্ধে তাকে অবহিত করে, যা অপর জাতির সঙ্গে তার সম্পর্ককে নিম্নস্তরের ঐহিকতা থেকে ঊর্ধ্বতর অধ্যাত্ম পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্রিয় থাকে, (গ) অপরের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে নিজের ধর্ম-ধারণায় প্রসারতা ও উদারতার সৃষ্টি করে। খ্রীস্টান জাতিসমূহের ক্ষেত্রে ঐসকল বস্তু কিভাবে ঘটেছে, তার দৃষ্টান্ত দেবার পরে পাল বলেন: "আমেরিকায় বিবেকানন্দের হিন্দু মিশন—আমাদের সদ্যোজাত জাতীয় জীবন ও চৈতন্যের ক্ষেত্রে একই জিনিস করেছিল।"

প্রবন্ধের শেষের দিকে বিপিনচন্দ্র বিস্তারিত-ভাবে ভারতের জাতীয় চৈতন্যের পুনর্জাগরণে বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা বলেছেন। অ্যানী বেশান্তের মতোই স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, বিবেকানন্দ জাতীয়তার জাগরণে প্রবলতম শক্তি। পালের মূল্যবান রচনার কিছু অংশ এই:

"[বৈদেশিক প্রচার] আমাদের মধ্যে কেবল দ্রুত নূতন শক্তিবোধ সঞ্চারিত করেনি, পরন্তু আমরা যা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলাম সেই ব্যাপক বিশ্বদৃষ্টিও দিয়েছে; আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে জীবন ও চিন্তার নবচেতনা, তা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। এর ফলে আমাদের মনশ্চক্ষে জেগে উঠেছে আমাদের সভ্যতার বিশ্বভূমিকার রূপ। অধিকন্তু আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার-আন্দোলন-সমূহকে নূতন তাৎপর্যদানও করেছে। ব্রাহ্ম-সমাজের উৎকট যুক্তিবাদী ও কালাপাহাড়ীদের কাছে বিবেকানন্দ অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর নিজস্ব-ভাবে যে-কোনো ব্রাহ্মের মতোই কালাপাহাড়। বস্তুতঃপক্ষে ইউরোপ-আমেরিকার আধুনিক খ্রীস্টান জনসমাজে হিন্দু মিশন—এ-বস্তু হিন্দু-ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতার প্রাচীন অচল দুর্গভঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।...

"ব্রাহ্মসমাজ মূলে বিদ্রোহের আন্দোলন। বিবেকানন্দের আন্দোলন, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে

যদিচ অনুরূপ কালাপাহাড়ী, কিন্তু মূলে সমন্বয়ী। ব্রাহ্মসমাজ—বিশেষ মতবন্ধন বা সামাজিক বিশেষাধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবুদ্ধি ও চৈতন্যে বিদ্রোহ। তারপরে হিন্দু পুনরুত্থানের যে-আন্দোলন হল [শশধর তর্কচূড়ামণি ইত্যাদি যার নেতা] তা মূলে প্রতিক্রিয়াশীল। তা ব্যক্তির উপরে জাতি ও শাস্ত্রের পূর্বতন আধিপত্য পুনঃস্থাপনে আকাঙ্ক্ষী ছিল। বিবেকানন্দ একদিকে ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্তিত ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করলেন, অপরদিকে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে যে-আতিশয্য ও যুক্তিহীনতা দেখা গেছে তার নিরাময়ের জন্য শাস্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন—সে শাস্ত্র অবশ্য মৃত ঐতিহ্যের শাস্ত্র নয়, জীবন্ত সাধু ও ঋষিগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত শাস্ত্র। তিনি সেই সকল শাস্ত্রকে উপস্থিত করেছিলেন যাদের সত্যতা তাঁর গুরু শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণের জীবন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়েছিল। বিবেকানন্দের জ্ঞানে ও প্রচারে ব্যক্তি তার সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ও পূর্ণতায় উপনীত হয়েছিল—বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে নয়—সর্বাত্মক ব্রহ্মের অদ্বৈতবোধে। আমাদের দর্শন ও ইতিহাসে ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে চিরন্তন সমস্যার এই মীমাংসা প্রাচীনকালেই হয়েছে—বিবেকানন্দ তাকে একালে এনে উপস্থিত করলেন—ব্রাহ্মসমাজের বিদ্রোহ এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে সামঞ্জস্য করবার জন্য।

"স্বামী বিবেকানন্দ এই-যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের আন্দোলন আরম্ভ করলেন, তা আধুনিককালের নূতন জাতীয়তার আদর্শের প্রচারে পরিণতিলাভ করল। কতকগুলি দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই দাবি করা যাবে —তিনি আমাদের জাতীয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রফেট। তিনিই প্রথম আমাদের দেশ ও তার সংস্কৃতির পক্ষে জ্বলন্ত বাসনার সুর তুলেছিলেন, তীব্র অনুভূতিময় সেই দেশপ্রেম, যা গত দশকের জাতীয়তাবাদী প্রচারের মধ্যে প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছিল।"

উচ্চাঙ্গের মনীষায় পূর্ণ রচনা, চিন্তা-উত্তেজক। রচনাটি চিন্তার উদ্রেক করেছিলও। এই প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশের উপর 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকায় অক্টোবর ১৯১৬ সংখ্যায় দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখা হয়। সেখানে প্রবন্ধটির প্রশংসার পরে কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি করা হয়, কিংবা সংযোজনী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। আপত্তির অন্যতম ছিল বিবেকানন্দকে ব্রাহ্মসমাজের মতোই কালাপাহাড় বলা। পত্রিকাটি জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাবের পূর্ণাত্মক বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছিল। বিবেকানন্দ জাতীয়তার প্রবর্তক, ঠিক কোন্ অর্থে, তা বোঝাবার চেষ্টাও সে করে। এসব ক্ষেত্রে বিপিন পালের বক্তব্যের মধ্যে আপত্তিকর কিছু ছিল, তা কিন্তু আমাদের মনে হয়নি। তবে সমষ্টিমুক্তি ছাড়া ব্যক্তিমুক্তি হবে না—স্বামীজী ঠিক এই কথাই বলেছেন কিনা সন্দেহজনক এবং এক্ষেত্রে 'বেদান্তকেশরী'র সংশোধনী মন্তব্য স্বীকার্য।

এরও পরে বিপিন পাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কথা লিখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণে[৭] বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বেশ খানিক লেখা আছে। এর মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বৈদেশিক প্রচারের সঙ্গে বিবেকানন্দের

৭ Bipin Chandra Pal, Memoirs of My Life and Times (Vols. One and Two), (Second revised edition, 1973), Pages 584-86.

তুলনা করে পাল বলেছিলেন, কেশব সুসংস্কৃত ইউনিটারিয়ান খ্রীস্টমত ছাড়া আর কিছু প্রচার করেননি, আর প্রতাপ পাশ্চাত্য শ্রোতাদের কাছে তাদের জানা জিনিসই উচ্চাঙ্গের ভাবে শুনিয়েছিলেন। এঁরা খ্রীস্টীয় শিক্ষার সৃষ্টি এবং এঁদের প্রদত্ত শিক্ষাও মূলে খ্রীস্টীয়। এই পটভূমিকায় বিবেকানন্দ এসেছিলেন দুর্ধর্ষ সাহস নিয়ে, স্বদেশের সত্যবাণী নিয়ে, অকুণ্ঠিত চিত্তে। এই রচনার ৩০ বছর আগে, আমরা দেখেছি, বিবেকানন্দের শোকসংবাদের মধ্যে বিপিন পাল লিখেছিলেন, বিবেকানন্দ কোনো চিন্তার কাঠামো নির্মাণ করেননি—তিনি কেবল চমকলাগানো বচনের দ্বারা মন জয় করেছিলেন—এখন বিবেকানন্দের সেই একই কাজ পালের কাছে প্রাচীন ভারতীয় বা হিব্রু ঋষির দিব্য উচ্চারণ বলে প্রতীয়মান। পালের মতে বিবেকানন্দ নামক সেই আধিকারিক পুরুষই ধর্মমহাসভায় জয়ী হয়েছিলেন।

জীবনের একেবারে শেষভাগে, ১৯৩২ ফেব্রুয়ারি মাসে, বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সভার জন্য বিপিনচন্দ্র একটি রচনা প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত হয়ে সেটি তাঁর পক্ষে পাঠ করা সম্ভব হয়নি। লেখাটি 'প্রবুদ্ধ ভারতে' জুলাই, ১৯৩২ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। রচনাটির নাম 'রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ'। জীবনপ্রান্তে বিপিনচন্দ্র আর জাতীয়তা ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে বেশি কথা বলতে ইচ্ছা করেননি, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ—এই দুই বিরাট চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সুগভীর রহস্যকথাই বলতে চেয়েছিলেন—এবং মানবসমাজের জন্য কোন্ মহাবাণী তাঁরা রেখে গেছেন, তারই কথা।

অনেক গভীরদর্শী মানুষের মতো বিপিনচন্দ্রও বলেছেন—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করা যাবে না। "আধুনিক মানুষ পরমহংসকে বুঝবে বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে যেমন বিবেকানন্দ কেবল উপলব্ধ হতে পারেন তাঁর গুরুর জীবনালোকেই।" "শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির আধার," তাই তাঁর ক'লের কাছে তিনি দুর্বোধ্য "রহস্য"। ঐকাল "যুক্তিবাদ নামক অর্ধপাচ্য শ্লোগানের দ্বারা অধিকৃত ছিল।" তাই বিবেকানন্দকে নিজ কালের পক্ষে বোধগম্য ভাষায় রামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণীকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বিশ্ববাণী কোন্ উৎস থেকে নির্গত সে-প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র বলেছেন :

"রামকৃষ্ণ পরমহংস কোনো বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের নন, কিংবা বলা চলে, তিনি ভারতীয় এবং অভারতীয় সকল দল বা সম্প্রদায়ের। যথার্থ বিশ্বজনীন পুরুষ তিনি, কিন্তু তাঁর বিশ্বজনীনতা বিদেহী তত্ত্বকথার বিশ্বজনীনতা নয়। বিভিন্ন ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে ছেঁটে ফেলে তিনি সর্বজনীন ধর্মদর্শন করতে চাননি। তাঁর কাছে 'সামান্য' ও 'বিশেষ'—সূর্য ও তার ছায়ার মতো একত্র অবস্থিত। তিনি জীবন ও চিন্তায় অগণ্য বিশিষ্টতার মধ্য দিয়েই সর্বজনীনতার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর এই উপলব্ধিকে আধুনিক মানবতার ভাষায় মণ্ডিত করেছিলেন।

"রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঈশ্বর যুক্তিতর্ক বা দর্শনের ঈশ্বর নন; সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত অন্তর্গত অভিজ্ঞতার ঈশ্বর তিনি।·· তিনি বৈদান্তিক···কিন্তু তাঁর বেদান্তকে শাঙ্কর বেদান্ত বলা যাবে কিনা সন্দেহ, যেমন, তাঁর উপর কোনো বৈষ্ণবীয় বেদান্তের ছাপও দেওয়া যাবে না।···রামকৃষ্ণ পরমহংস দার্শনিক নন, পণ্ডিত নন,···তিনি দ্রষ্টা; যা দেখেছেন তাকেই বিশ্বাস করেছেন। আর দ্রষ্টা সর্বদাই মিস্টিক। রামকৃষ্ণ পরমহংস মিস্টিক ছিলেন, যেমন ছিলেন যীশুখ্রীস্ট, যেমন মানবজাতির সকল অধ্যাত্ম-নেতৃগণ। জনতা তাদের বুঝতে পারে না, সমকালের পণ্ডিত ও দার্শনিকরা আরও

কম বুঝতে পারে। অথচ দর্শন যার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তাকেই তাঁরা উন্মোচন করেন। যীশু-খ্রীস্টের মতোই পরমহংস রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যাতার প্রয়োজন ছিল—যুগের কাছে তাঁর বাণীকে ব্যাখ্যা করার জন্য। সেন্ট পলের মধ্যে যীশু তাঁর ব্যাখ্যাতাকে পেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের মধ্যে। তাই বিবেকানন্দকে তাঁর গুরুর উপলব্ধির আলোকেই চিনে নিতে হবে।"

রামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দের 'ধর্মান্তর' প্রসঙ্গ বিপিনচন্দ্র উত্থাপন করেছেন। স্বীকার করেছেন দুর্জ্ঞেয় এই রহস্য। ব্রাহ্মসমাজের মানুষেরা রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকটে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বুদ্ধির ত্রিশিরা কাঁচের মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন বলে তাঁদের কাছে রামকৃষ্ণ তাঁর ঈশ্বররহস্যের গোপন কক্ষ উন্মোচন করেননি; তা করেছিলেন বিবেকানন্দের কাছে। তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন, দেহে-মনে এই হল সেই মানুষ যে তাঁর বার্তাকে বহন করতে পারবে। বিপিনচন্দ্র বলতে চেয়েছেন, এই হল বিবেকানন্দের ধর্মান্তরের "আসল কাহিনী"। "এ-কাহিনী আবার একই সঙ্গে আত্মার রূপান্তরেরও বটে।…কেন গুরুর দিকে তাঁর মন ধাবিত, বিবেকানন্দ পুরো বুঝতেন না। তা আত্মার নিগূঢ় আকর্ষণ। যখন এক আত্মা অপর আত্মাকে গভীর অধ্যাত্মস্তরে স্পর্শ করে, তখন উভয়ে অবিচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়—'দুই' তখন বস্তুতঃপক্ষে 'এক'—গুরু তখন শিষ্যের মধ্যে সক্রিয়; শিষ্য জানেনই না তিনি গুরুর ছন্দে নাচছেন। সাধারণে একেই বলে প্রেরণা। ধর্মান্তরের পরে বিবেকানন্দ গুরুর প্রেরণাতেই কাজ করে গেছেন।"

বিবেকানন্দের স্বাধীনতা-তত্ত্বকে বিপিনচন্দ্র আধুনিক মানবতার চরম বাণী বলে উপস্থিত করেছেন :

"মানুষকে তাঁর অন্তর্গত দেবত্বের উপলব্ধিতে সাহায্য করাই সকল ধর্মীয় সংস্কৃতির লক্ষ্য। বিবেকানন্দ যখন তাঁর স্বদেশবাসীকে 'মানুষ হও' বলেছিলেন—তখন তিনি ঐকথাটাই তুলে ধরেন।

"এই হল স্বাধীনতার বাণী, কোনো নেতিবাচক অর্থে নয়, সদর্থক ইতিবাচক অর্থে। স্বাধীনতা মানে বহির্গত সকল বন্ধনের অবসান। কিন্তু আমরা যে-অবস্থায় আছি তাতে বাইরের সকল সম্পর্ক ছেদন করা সম্ভব হয় না—সম্পর্ক স্বাভাবিক বা সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আছেই। তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু। তাই জীবনের নীতি হল সম্বন্ধ—বিচ্ছিন্নতা নয় : সহযোগ—অসহযোগ নয়। যথার্থ স্বাধীনতা মেলেনা যুদ্ধের মধ্যে, তা মেলে কেবল শান্তির মধ্যে।…আবার স্বাধীনতা এক অখণ্ড বস্তু। তার উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রথম স্তর—কামনা বাসনা ক্ষুধার আধিপত্য থেকে মুক্তি। পরবর্তী স্তর—মানবভ্রাতাদের বিষয়ে ভয় থেকে মুক্তি। তারপরেই আসে বহির্গত কর্তৃত্বের আধিপত্য থেকে মুক্তি। এইভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে, সামাজিক স্বাধীনতা, এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা—এইভাবে অগ্রসর হয়ে মানুষকে যথার্থ স্বাধীনতায় পৌঁছতে হবে। যখন মানুষ সেই অবস্থায় পৌঁছবে, তখনই সে আর তার ঈশ্বর অভেদ। বেদান্তের এই ব্যাখ্যাই বিবেকানন্দ করেছেন। আর এই হল তাঁর গুরুর বার্তা—আধুনিক পৃথিবীর জন্য।"

বিপিনচন্দ্র পালের এইসব রচনার সঙ্গে কিছু পরিচয়ের পরে আমাদের স্বীকার করতে হবে—তিনি বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা।

'শ্রীরামানুজ-চরিত' ও বাংলা নাটক

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১

১৯১৬ সাল। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় দেখতে এসেছেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ। নাটকের নাম 'রামানুজ'—নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানিয়ে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে এসেছেন রাজা মহারাজকে। একটির পর একটি দৃশ্য অভিনীত হয়ে চলেছে—স্বামীজী মুগ্ধ হয়ে দেখছেন।

অবশেষে এলো সেই তৃতীয় অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যটি।

রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে মন্ত্রগ্রহণের জন্য বার বার প্রার্থনা জানিয়েছেন কিন্তু প্রতিবারই ফিরেছেন ব্যর্থ হয়ে। আঠারো বার চেষ্টার পর সদয় হলেন গোষ্ঠীপূর্ণ—অষ্টাক্ষর সিদ্ধমন্ত্র তিনি দিতে পারেন একটি শর্তে। এ মন্ত্রের অধিকার সকলের নেই কারণ এ মন্ত্র কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার নিশ্চিত সিদ্ধি—মৃত্যুর পর তাঁর স্থান বৈকুণ্ঠলোকে। সুতরাং দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে রামানুজ এ মন্ত্র দান করবেন না, এই অঙ্গীকার করে লাভ করতে হবে সিদ্ধমন্ত্র। সেই অঙ্গীকারে মন্ত্রগ্রহণ করে এক অপার্থিব আনন্দে মগ্ন হয়ে রামানুজ ঘরে ফিরে দেখলেন প্রতিদিনের মত দরিদ্র, আতুর, অভাজনে তাঁর গৃহাঙ্গন পরিপূর্ণ। রামানুজের দাক্ষিণ্য লাভের আশায় তাঁরা এসে অপেক্ষা করে আছেন। সেই সঙ্গে বহুদিন পরে এসেছে তাঁর মাতৃস্বস্রেয় ভ্রাতা গোবিন্দ—যে একদিন তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল—ভ্রাতার কাছ থেকে বৈষ্ণবমন্ত্র লাভের ইচ্ছা নিয়ে এতদিন পরে উপস্থিত হয়েছে গোবিন্দ। তাকে দেখে রামানুজের হৃদয় পরিপূর্ণ হল আনন্দে—আজ যে বড় শুভদিন—তাঁর দীর্ঘদিনের আশা পূর্ণ হয়েছে আজ—সিদ্ধমন্ত্র লাভ করেছেন তিনি। গোবিন্দ সাগ্রহে বলল—"আমার কানেও একবার সে মন্ত্র শুনিয়ে দাও—আমি উদ্ধার হয়ে যাই।"

উদ্ধার! অকস্মাৎ রামানুজের প্রাণ উদ্বেল হয়ে উঠল—তিনি ভুলে গেলেন তাঁর অঙ্গীকার—বললেন, "হ্যাঁ ভাই, সিদ্ধমন্ত্র, তোমাকে দেব। শুধু তোমাকে কেন—যেখানে যত পতিততাপিত আছে—ডাক বা না-ডাক—এ মহামন্ত্র যখন গুরুর কৃপায় লাভ করেছি—সকলকে এ আনন্দের আস্বাদন করাব। এ আনন্দ একা ভোগ করে তৃপ্তি হচ্ছে না। ব্যথার সংসার—ব্যথিতকে এ অমৃত না দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিনি। এ কি! এ কি উত্তেজনা! গোবিন্দ ভাই ভাই! কে কোথায় তাপিত আছে—ডাক। কে কাঙাল আছ, এস! কে দীনের দীন হীনের হীন আছ, এস। আজ অমূল্য রত্ন তোমাদের দান করব—কল্পতরু গুরুর নিকট পেয়েছি। কাউকে বঞ্চিত করব না, এস। কে মরণভয়কাতর, অত্যাচার-নিপীড়িত, দুর্বল, সংসার-পরিত্যক্ত, চিরদরিদ্র আছ, এস। পরমনিধি গ্রহণ কর! এস এস! আনন্দসাগরের বাঁধ ভেঙেছে…।"

ছুটে আসছে দলে দলে নরনারী—দাও, দাও—আমরা বড় কাঙাল!

রামানুজের কৃপা-সাগরের বাঁধ ভেঙেছে—উন্মত্তের মত বিলোচ্ছেন তিনি সিদ্ধমন্ত্র :

"এস লহ গুরুদত্ত সিদ্ধমন্ত্র সবে করি দান
অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র মোহ নিবারণ—
শান্তি প্রস্রবণ—সর্বকল্যাণ আকর,
সর্বসুখের নিদান…
শোন সবে, বল সবে প্রণব সংযোগে
'নমো নারায়ণায়!'

উচ্চকণ্ঠে করহ চীৎকার
বায়ুভরে যাক নাম দেশদেশান্তরে
সাগরের পারে—নগরে কান্তারে…"

বসে বসে অভিনয় দেখতে দেখতে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের অশ্রুর বন্যা দুচোখ ছাপিয়ে গৈরিকবস্ত্র সিক্ত করে দিল—এ কী অহেতুক করুণা !

শর্তভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণে মঞ্চের ওপর ছুটে এসেছেন মন্ত্রদাতা গোষ্ঠীপূর্ণ—"নরাধম, গুরুদ্রোহী প্রবঞ্চক !…তুই আমার সঙ্গে বঞ্চনা করে মন্ত্রগ্রহণ করলি ! এর ফল কি জানিস ?

লক্ষ্মণ (রামানুজ)—কি ফল গুরুদেব ?

গোষ্ঠীপূর্ণ—গুরুদ্রোহী গুরুবাক্যহেলনকারীর শাস্তি কুম্ভীপাক নরকে বাস।

লক্ষ্মণ—কিন্তু এই সিদ্ধমন্ত্র যে শ্রবণ করবে তার মুক্তি তো সুনিশ্চিত ?

গোষ্ঠীপূর্ণ—নিশ্চিত তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোর নরকবাসও নিশ্চিত।"

লক্ষ্মণের আয়ত চোখ দুটি করুণার্দ্র হয়ে উঠল—নিরুদ্বেগ কণ্ঠে ফুটে উঠল প্রশান্তি :

"কি বা খেদ তাহে গুরু !
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এই
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী আমি—
যদি কোটী কোটী জীব
মুক্তি পায় মহাপাপ হতে
লভে শান্তি অশান্ত এ সংসার কান্তারে
পন্থাহারা ছোটে নর নিরন্তর যাহে…
যদি আমা হতে দেব তাদের উদ্ধার—
কোটীকলা বর্ষ
আমি হাস্যমুখে করিব হে নরক নিবাস
কুম্ভীপাক—নহে কুম্ভীপাক—
সেই মম স্বর্গের নিদান।…"

স্তব্ধ ব্রহ্মানন্দ ! কি এক ভাবতরঙ্গে তাঁর হৃদয় আন্দোলিত। অভিনয় এগিয়ে চলেছে—যথাসময়ে নেমে এসেছে যবনিকা, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের চিত্তলোকে যবনিকা উত্তোলিত। দর্শকরা একে একে ত্যাগ করল প্রেক্ষাগৃহ। সকলের সঙ্গে মঠে ফিরে এলেন মঠের রাজা, কিন্তু এ যেন এক অন্য মানুষ। দীক্ষা নেবার জন্যে কত মানুষ আসে—তাদের পরীক্ষা করে বেছে নিয়ে তবে তিনি দীক্ষা দেন কিন্তু 'রামানুজ' নাটক দেখে এসে তাঁর অভ্যস্ত রীতির পরিবর্তন ঘটল—রূপার ভাণ্ডার তিনি উজাড় করে দিলেন। কাউকে আর তিনি ফেরাবেন না—যে সম্পদ তিনি কল্পতরু গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের রত্নাগার থেকে পেয়েছেন তা দুহাতে বিলিয়ে দিতে শুরু করলেন।[১]

২

যে নাটকটি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অন্তলীন বেদনায় ও আনন্দে এক নতুন উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দিয়েছিল সেটি রচনার কিছু পটভূমিকা আছে।

১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাস থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয় 'শ্রীরামানুজ-চরিত'। লেখক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহের সন্তান—তৎকালীন মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ। রামানুজাচার্যের জীবন ও দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না কারণ এর আগে এ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এবং সকল তথ্য সঙ্কলন করে বাংলায় কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। রামানুজের নাম ও তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা কিছু কিছু জানলেও তাঁর সমগ্র পরিচয় সংস্কৃত, বিশেষ করে দক্ষিণীভাষার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল। মাদ্রাজে অবস্থানকালে রামকৃষ্ণানন্দ অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে সংস্কৃত পুঁথিগুলি থেকে স্বয়ং তথ্য-সংগ্রহ করেন এবং স্থানীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় তামিল পুঁথিগুলি থেকেও সংবাদ আহরণ করেন

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, (উদ্বোধন কার্যালয়), ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩০৬

১৩১৩ সালের কার্তিক মাসে 'উদ্বোধনে' রচনাটি শেষ হয় কিন্তু পুস্তকাকারে সেটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছিল নানাকারণে—তার মধ্যে প্রধান হল ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাসে লেখকের তিরোভাব। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের পর আবশ্যিক সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। সুতরাং সেটির গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশে আরও কয়েকমাস বিলম্ব ঘটে। তার আগেই অবশ্য শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী রচিত 'রামানুজ চরিত' ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়। শরচ্চন্দ্র তাঁর গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে (ভূমিকা) লিখেছেন, "এ পর্যন্ত বাঙ্গালাভাষায় রামানুজাচার্যের জীবনচরিত প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে রামানুজাচার্যের একখানি জীবনচরিত লিখিবার জন্য আমার মনে বাসনা জন্মে।…রামানুজ চরিতের পাণ্ডুলিপি প্রায় তিন বৎসর গত হইল মুদ্রাযন্ত্রে অর্পণ করি, অর্থাভাবে ধীরে ধীরে কাজ চলিতেছিল।" অর্থাৎ ১৩১৪ সালে শরচ্চন্দ্রের 'রামানুজ চরিত' রচনা-সমাপ্তির প্রায় এক বৎসর পূর্বেই 'উদ্বোধন' পত্রিকায় রামকৃষ্ণানন্দের রচনা শেষ হয়েছে- যদিও গ্রন্থাকারে সেটির প্রকাশকাল ১৩১৯ সাল। দুটি গ্রন্থ পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যাবে অন্যান্য পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও রামানুজাচার্যের দার্শনিক মতবাদের যত বিস্তারিত পরিচয় রামকৃষ্ণানন্দ দিয়েছেন শরচ্চন্দ্রের গ্রন্থে তা লভ্য নয়। শরচ্চন্দ্র জীবনকাহিনী রচনা করেছেন মাত্র—ভাবুক ও ভক্তিনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর গভীর উপলব্ধির সমকক্ষতা লাভ করতে পারেন নি। 'শ্রীরামানুজ-চরিতে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩১৯) লিখেছিলেন, "…বলা বাহুল্য যে আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই পুস্তক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করুক, ইহাই আমাদের কামনা।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সেই 'শ্রীরামানুজ-চরিত' বইটি একদিন নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিলেন মঠ-মিশনের এক বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল—উদ্দেশ্য, সেটি অবলম্বন করে অপরেশবাবু পেশাদার মঞ্চের জন্যে একটি নাটক লিখবেন।[২] অপরেশচন্দ্র তখন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক। কৈশোরে যে অপরেশচন্দ্র বিদেশ প্রত্যাগত বিবেকানন্দের অভ্যর্থনা মিছিলে ভিড়ের চাপে প্রাণ দিতে বসেছিলেন, যিনি পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানদের সেবায় তুষ্ট করে প্রখ্যাত অভিনেতা হবার স্বেচ্ছাবর লাভ করেছিলেন তিনিই মঠ-মিশনের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন থিয়েটারে যোগ দেবার পরে হীন-মন্যতাবোধে। এই শ্রীরামানুজ-চরিতকে কেন্দ্র করেই আবার সেই হারানো সম্পর্ককে খুঁজে পেয়েছিলেন অপরেশচন্দ্র। নাটক লেখার সূত্রে শ্রীশচন্দ্র তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন 'উদ্বোধনে', স্বামী সারদানন্দের কাছে। 'রামানুজ' নাটকটি স্বামী সারদানন্দকে উৎসর্গ করে নাট্যকার লিখেছেন, "দেব, আপনার আশীর্বাদেই 'রামানুজ' নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হই।" নাটকের এক একটি দৃশ্য কিংবা অঙ্ক রচনা শেষ হলেই তিনি ছুটে যেতেন সারদানন্দের কাছে, তাঁকে পড়ে শোনাতেন। তাঁর সংশোধন ও পরামর্শ গ্রহণ করেই শুরু হত পরবর্তী অংশ রচনা।[৩]

অপরেশচন্দ্রের 'রামানুজ' নাটক লেখার সংবাদ

২ শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামিজী মহারাজের স্মরণার্থ—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

৩ ঐ

একদিন গিয়ে পৌঁছল স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। শ্রীশচন্দ্রই সম্ভবত কথাটা জানিয়েছিলেন তাঁকে—শুনে কৌতূহলী ব্রহ্মানন্দ নাট্যকারের পরিচয় জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন 'আমাদের সেই অপরেশ ?' অপরেশ যখন স্বামীজীর এই প্রশ্নের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা। রাজা মহারাজ তাঁকে মনে রেখেছেন ? তাঁকে তিনি 'আমাদের' বলে উল্লেখ করেছেন এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কি আছে ? ভাগ্যবান নাট্যকার একদিন পাণ্ডুলিপি নিয়ে উপস্থিত হলেন মহারাজের কাছে—তখন তিনি ছিলেন বলরাম মন্দিরে। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ জানিয়েছেন, তখন তিনি থাকতেন ব্রহ্মানন্দের কাছে—অপরেশচন্দ্রের নাটক শুনে মহারাজ যে সব নতুন নির্দেশ দিতেন নাট্যকার সেগুলি মাথা পেতে নিয়েছেন—তাঁর উপদেশ-মত নাটক সংশোধন করে নিতেন। অপরেশবাবু লিখেছেন, নাটকে রামনামসঙ্গীতটি (চতুর্থ অঙ্ক, অষ্টম দৃশ্য) গৃহীত হয়েছিল মহারাজেরই নির্দেশে। তিনি নাটকে সুরসংযোজনার ব্যবস্থা করে দেন—টেলিগ্রাম করে নীরদ মহারাজকে বহরমপুর থেকে আনিয়ে—যা বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা।[৪]

অপরেশচন্দ্র রামকৃষ্ণানন্দের 'শ্রীরামানুজ-চরিত' গ্রন্থটির তৃতীয় থেকে পঞ্চদশ, সপ্তদশ থেকে উনবিংশ এবং অষ্টবিংশ অধ্যায় অবলম্বন করে নাটকের কাহিনী উপাদান সংগ্রহ করেছেন। একমাত্র নাটকীয়তা রক্ষার জন্য সামান্য কিছু কিছু পরিবর্তন ছাড়া মোটামুটি সমস্ত কাহিনীটিই পরিবেশন করেছেন মূল চরিত-গ্রন্থের অনুসরণে। নাটকীয় প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে যে সব সামান্য পরিবর্তন করেছেন তার কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে। লক্ষ্মণ (রামানুজ) যাদবপ্রকাশের কাছে শিক্ষাগ্রহণ কালে একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা নিয়ে গুরু-শিষ্যে প্রথম মতভেদ ঘটে। মূলকাহিনীতে দেখতে পাই এই মতভেদ গুরুর পক্ষে এত দুঃসহ হয়ে ওঠে যে তিনি রামানুজকে হত্যার চক্রান্ত করে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যান। পথে, এক অরণ্যে গভীর রাত্রে যখন তাঁকে হত্যার ব্যবস্থা চলছে যাদবপ্রকাশ ও তাঁর দুই শিষ্যের মধ্যে তখন রামানুজ-ভ্রাতা গোবিন্দ সেটি জানতে পারে। গোবিন্দ তখনই রামানুজকে সব সংবাদ জানিয়ে গভীর অরণ্যপথে পলায়নের ব্যবস্থা করে। যথাসময়ে রামানুজের অনুপস্থিতি যাদবপ্রকাশের কাছে প্রকাশিত হল কিন্তু এ ব্যাপারে গোবিন্দের ভূমিকা না জানায় তাঁর মধ্যে কোন অপরাধবোধ জাগে নি এবং পরে রামানুজের সঙ্গে তাঁর আবার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন ছদ্মস্নেহেই তাঁকে আবার শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। এই সময় কাঞ্চি-রাজকন্যার প্রেতাবেশ হওয়ার সংবাদ পেয়ে তার নিরাময়ার্থে যাদবপ্রকাশ কাঞ্চিরাজপুরীর উদ্দেশে যাত্রা করেন রামানুজকে নিয়ে। যাদবপ্রকাশের মন্ত্রতন্ত্র ব্যর্থ হলে রাজকুমারীর দেহ-আশ্রয়কারী ব্রহ্মদৈত্যই ব্যক্ত করে রাজকুমারীর আরোগ্যের উপায়। রাজকুমারীর মস্তকে রামানুজ পদস্পর্শ করালেই সে আরোগ্যলাভ করবে এবং ব্রহ্মদৈত্যও মুক্তি পাবে। যাদবের আদেশে রামানুজ রাজ-কন্যার মস্তকে পদস্পর্শ করে তাকে রোগ-মুক্ত করে। এই মূলকাহিনীকে নাট্যকার সামান্য পরিবর্তিত করেছেন। নাট্যকার রাজকন্যা সম্পর্কিত ঘটনাকে শ্লোকব্যাখ্যার পরবর্তী অংশরূপে স্থাপন করে যাদবপ্রকাশের ক্রোধ ও ঈর্ষাকে যুগপৎ জাগ্রত করেছেন এবং তারই পরিণতি হত্যার ষড়যন্ত্র। মূলগ্রন্থে দেখা যায় যাদবপ্রকাশ শঙ্করাচার্যের প্রতি ভক্তিপরায়ণ নিষ্ঠাবান পণ্ডিত। এই নিষ্ঠাই তাঁকে প্ররোচিত করেছিল শঙ্করাচার্যের প্রতি সংশয়বাদী

৪　স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রঙ্গভূমি—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'রূপ ও রঙ্গ', ১৮ মাঘ ১৩৩১

রামানুজকে হত্যা করতে। অদ্বৈতবাদের প্রতি যাদবের গভীর বিশ্বাসই রামানুজের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল—ব্যক্তিগত ঈর্ষা নয়। নাটকে রামানুজের বিরোধী শক্তিরূপে যাদবপ্রকাশ পরিকল্পিত—তাই নাট্যকার অদ্বৈতবাদের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঈর্ষাকে যুক্ত করে নাটকীয় সংঘাত তীব্রতর করে তুলতে চেয়েছেন। ব্যক্তিহিসাবে যাদবপ্রকাশের যে মানসিক দুর্বলতা মূল চরিত-গ্রন্থে আভাসিত নাট্যকার তাকে অবলম্বন করে হত্যার ষড়যন্ত্র দৃশ্যে এবং পরবর্তী কালে যাদবপ্রকাশের মধ্যে মানসিক সংঘাত সৃষ্টি করেছেন। যাদবপ্রকাশের পরিণতির দিক থেকে এই সংযোজনা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হয় নি।

রামানুজের পত্নীর চরিত্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। 'শ্রীরামানুজ-চরিতে' তার নাম 'জমাম্বা', নাটকে পরিবর্তিত হয়েছে 'চমম্বা'য়। (স্বামী বুধানন্দ কর্তৃক 'শ্রীরামানুজ-চরিতে'র ইংরেজি অনুবাদে রামানুজের স্ত্রীর নাম 'রক্ষাকম্বল'। এর কারণস্বরূপ বুধানন্দজী লিখেছেন, "In the original Bengali biography the name of Sri Ramanuja's wife is given as Jamamba, which obviously is an abbreviation of Tanjamambal, the Tamil name. In the translation we have used the Sankritized name Rakshakambal for the sake of uniformity." শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'রামানুজ চরিতে' 'রক্ষাম্বা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁর 'রামানুজ' নাটকে 'জমাম্বা' নামটিই গ্রহণ করেছেন।) মূল চরিত-গ্রন্থে রামানুজের স্ত্রী স্বামীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণা হলেও স্বামীর মানসিকতার বিরোধী এবং এই সূত্রে তার অন্তরে রয়েছে প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ। সেই নিরুদ্ধ ক্ষোভ সত্ত্বেও স্বামীর নির্দেশগুলি সে যথাযথ পালন করে। তার অন্তরস্থিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারও তাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তার পরিচয় প্রসঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখেছেন, "তিনি পরম রূপবতী ছিলেন। স্বাভাবিক পতিভক্তি থাকিলেও বাহ্য আচার প্রতিপালনে বা দেহের শৌচ ও সৌষ্ঠব বিধানে অধিকতর ভক্তি ছিল। আপনার স্বার্থে হস্ত না পড়িলে তিনি সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা পতিকে যথাসাধ্য প্রীত ও সন্তুষ্ট করিতে যত্নবতী হইতেন। কাঞ্চিপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি রামানুজের গৃহকর্মে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়া জমাম্বা অন্তরে তাদৃশ সুখী ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। হৃদয়ে রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইলেও বাহিরে তাহার কোন আকার প্রকাশ করিতেন না।" নাট্যকার প্রথম থেকেই চমম্বার চণ্ডমূর্তিকে দৃশ্য করে তুলেছেন—তার চরিত্রের ক্রমবিকাশ বা মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। পরবর্তী কালে রামানুজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তার অনুশোচনা ও অবশেষে মৃত্যু। মূল কাহিনীতে জমাম্বার মানসিক পরিচয়ের আভাস ও রামানুজের অন্যতম গুরু মহাপূর্ণ ও তাঁর স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারকেই নাট্যকার পুরোপুরি একটি কলহপরায়ণা নারীচরিত্র পরিকল্পনার কাজে লাগিয়েছেন। এর ফলে নাটকে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই।

যামুনাচার্য রচিত স্তোত্ররত্নের ৬৫টি শ্লোকের মধ্যে তিনটি (৫৭, ৬০ ও ২১) বেছে নিয়ে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার সঙ্গীতরূপে সংযোজন করেছেন। মূল জীবনী-গ্রন্থে দেখা যায়, যামুনের স্তোত্ররত্নের সঙ্গে পরিচিত হবার পরে রামানুজের যামুন-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়। নাটকে সেই ঘটনাটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—যার দ্বারা রামানুজের যামুনভক্তি

উজ্জীবিত করা হয়েছে এবং সাধারণ শ্রোতাকে স্তোত্ররত্নের সঙ্গেও পরিচিত করানো সম্ভব হয়েছে।

জীবনকাহিনী অবলম্বন করে নাটক-রচনার একটা বড় অসুবিধা হল, বহু বিচিত্র ঘটনাকে নাটকের অঙ্গীভূত করার জন্য নাটকে গতি-মন্থরতা দেখা দেয় অথচ বহু ঘটনার সমাবেশের ফলে নাটকের ঘাতপ্রতিঘাত লক্ষ্যচ্যুত হয়। তাই জীবনীনাটক-রচয়িতার প্রধান সমস্যা হল গ্রহণ-বর্জনের। কেবলমাত্র নায়কচরিত্রের ঐক্য বজায় রেখে নায়কের জীবনের ঘটনাপুঞ্জ পর পর বিন্যস্ত করলে স্বতই নাটকীয়তার অভাব ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রে পুনরুক্তি-দোষও দেখা দেয়। রামানুজের জীবন ঘটনাবহুল—নাট্যকার সার্থক নাটকীয়তা সৃষ্টির চেয়ে বহু ঘটনার উপস্থাপনার মাধ্যমে তাঁর জীবনকাহিনীর সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাকে পরিচিত করে তাদের অন্তরে ভক্তি উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। নাটকে আমরা রামানুজের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী পাই কিন্তু কাহিনীর গঠনদৌর্বল্য দেখা দিয়েছে। অবশ্য নাট্যকারের ঈপ্সিত ভক্তিরস উৎসারিত হয়েছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে অপরেশচন্দ্রের 'রামানুজ' স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'শ্রীরামানুজ-চরিতে'রই নাট্যরূপ।

৩

একটি চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকারের দক্ষতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি নাটকটি একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে

'শ্রীরামানুজ-চরিতে' কাঞ্চিপূর্ণ চরিত্রটির পরিচয় :

"বাল্য হইতেই শ্রীবরদরাজের [বিষ্ণু] সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। একমাত্র বরদরাজই তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার।…গ্রীষ্মকালে সর্বদাই সুশীতল-জলসিক্তব্যজনহস্তে তাঁহার প্রিয়তমকে মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল সেবা করাইতেছেন।…সাধারণ লোকে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিত না, বলিত ইনি শ্রীবরদরাজের নিত্যদাস, বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছেন।…তাঁহার স্বভাব বালকের মত। অভিমান কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। সর্বদাই হাস্যমুখ।…তাঁহার স্বভাব অধিকাংশ সময়েই অলৌকিক আকার ধারণ করিত। তাঁহার সহিত কোন অদৃশ্য পুরুষ অহরহ থাকিতেন। লোকের সহিত বাক্যালাপ-কালে, তিনি সকলকে ভুলিয়া গিয়া সেই পুরুষের কথা শুনিতেন, শুনিয়া কখন কখন হাসিতেন, কখন কখন কত কি বলিতেন।…অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর এবং যত্ন করিতেন,…কেবল কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য শাস্ত্র-ব্যবসায়ী তাঁহাকে উন্মত্ত বা ভণ্ড বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যাদবপ্রকাশ তাঁহাদের মধ্যে একজন।"[৫]

রামকৃষ্ণ-সংসারে এই কাঞ্চিপূর্ণ পুঁথির পাতার অচেনা ও কাল্পনিক চরিত্র নয়—সম্পূর্ণ পরিচিত ও বাস্তব চরিত্র। সুতরাং এই চরিত্ররূপায়ণে নাট্যকারকে কোনো কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি—সংলাপ-রচনায়ও 'কথামৃত' ব্যবহার করেছেন অবাধে। যে নাটক রামকৃষ্ণ-সন্তানদের আনুকূল্যে, নির্দেশনায় ও পরামর্শে রচিত হয়েছিল এবং যে নাট্যকার স্বয়ং রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলেই লালিত সেই নাটকে এহেন চরিত্রের রূপায়ণ অবশ্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নাটকে দেখতে পাই প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কাঞ্চিপূর্ণ মন্দিরে বরদরাজকে ব্যজন করছেন। কাঞ্চিপূর্ণ স্থির করেছেন মন্দির থেকে বরদরাজকে অপসারিত করে সেইস্থানে

৫ শ্রীরামানুজ-চরিত (৩য় সংস্করণ)—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, পৃঃ ৯৩-৯৪

প্রতিষ্ঠা করবেন শিবমূর্তি। বেদনার্ত কাঞ্চিপূর্ণের প্রশ্নের উত্তরে বরদরাজ স্বয়ং উত্তর দেন, শঙ্কর ও বিষ্ণুর মধ্যে কোনো ভেদ নেই—সুতরাং শিবের প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। এমনি সময়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু রামানুজ। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ সম্পর্কে তাঁর অন্তরে জেগেছে সংশয় :

"সত্য—সবই যদি মায়া
সৃজন তাহার কি বা প্রয়োজন ?
মায়া যদি দুঃখের আকর
কার শক্তিবলে এ প্রভাব জগতে তাহার ?
প্রয়োজনবিহীন সৃজন—নহে যুক্তিগ্রাহ্য কভু।
সমস্যা দারুণ! কে করিবে মীমাংসা ইহার ?"

"কাঞ্চিপূর্ণ—শাস্ত্র কি জান ? গ্রন্থ—গাঁঠ, যত ঘাঁটবে ততই জড়াবে। মীমাংসা মনে—সরল বিশ্বাসে।

লক্ষ্মণ—বলতে পারেন এ মায়ার হাত হতে কি করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ?

কাঞ্চিপূর্ণ—দরকার কি ? তোমার শাস্ত্রে বলে তো 'বিচার কর'। এ মায়া—ও মায়া—সে মায়া—বিচার কর। পরে মায়াকে মায়াজ্ঞান বলে বোধ হলে পরমজ্ঞান লাভ কর। জ্ঞান কি ? না ব্রহ্মকে জানা। তা বিচার করতে করতে শেষে না এগিয়ে শেষ থেকে ধরে বিচার কর না ?

লক্ষ্মণ—কিরূপ ?

কাঞ্চিপূর্ণ মায়া বাদ দিয়ে 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' না করে সোজা কথায় বল না, মায়াও তোমার, তুমিও তোমার। এত যোগবিয়োগে আবশ্যক কি ? মায়া তো স্ত্রীপুত্র পরিজন ? তা 'আমার' স্ত্রী, 'আমার' পুত্র না বলে—ধরে নিলেই তো হয় 'তাঁরই' স্ত্রী, 'তাঁরই' পুত্র। তাদের সেবা করছি, তাতে তাঁরই সেবা করছি।"

এই সহজ মীমাংসা এবং সহজ প্রকাশভঙ্গি কাঞ্চিপূর্ণ চরিত্রের বিশেষত্ব। যিনি সর্বদাই ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ, স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁর প্রতিদিনের আলাপচারী তিনি শাস্ত্রের জটিল গ্রন্থিকে এমনি সহজভাবেই মোচন করেছেন বার বার।

যাদবাচার্য লক্ষ্মণ-হত্যায় ব্যর্থ হয়েছেন। সাময়িক ক্রোধ ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে যে পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন তার জন্য তাঁর অনুশোচনা দেখা দিয়েছে কালক্রমে। সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে তিনি মানসিক ভারসাম্যও হারাতে চলেছেন যে কাঞ্চিপূর্ণকে তিনি উন্মাদ ও ভণ্ড বলে অপমান করেছেন আজ তাঁরই সহজ বিশ্বাস ও ভক্তির আন্তরিকতা যাদবের কাছে ঈর্ষণীয় কিন্তু তখনও তিনি কাঞ্চিপূর্ণকে উন্মাদ বলেই মনে করেন :

"বেশ আছে! উন্মাদ—কোন চিন্তা নাই সদানন্দ—। এ-ও বোধহয় শুনেছে [হত্যা ষড়যন্ত্রের কথা]...দেশ ছেড়ে পালাই—নইলে এ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারিনি।

কাঞ্চি—হাঁ হে, তুমি নাকি টোল তুলে দিয়েছ ?

যাদব—হাঁ।

কাঞ্চি—বেশ করেছ। শুকনো পুঁথি, নীরস পাঞ্জিতে লেখে বিশ আড়া জল, নেংড়ালে এক ফোঁটাও জল মেলে না। অক্ষর তো নয়—জমাট-বাঁধা অন্ধকার।

যাদব—(অন্যমনে) হাঁ অন্ধকার—কেউ জানতো না—আমি অম্বর আর শৌরী [যে দু'জন শিষ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল]—লক্ষ্মণ জানলে কেমন করে ? গোবিন্দ জানলে কেমন করে ? আশ্চর্য

কাঞ্চি—আশ্চর্য বলে আশ্চর্য। ইচ্ছা করলেই এই অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়া যায় কিন্তু যাবার তো যো নেই! মুখে বলি, 'অন্ধকার সইতে পারিনি, একটু আলো পেলে বাঁচি' কিন্তু চোখে সাতপুরু কাপড় জড়াচ্ছি! ছেলে, মেয়ে স্ত্রী, গরু, বাগান, বাড়ি—কি নয় বল—কেবল

চোখে জড়াচ্ছি, আর মুখে বলছি 'একটু আলো পেলে বাঁচি'। মজা দেখেছ!

যাদব—কি বলছ?

কাঞ্চি—আমি আর বলছি কৈ?…

যাদব—জানলে কেমন করে? অন্ধকার, খালি গাছ আর পাহাড়! বলতে পার? গাছ কথা কয়-পাহাড় শোনে—অন্ধকার অন্তরের ভাব বোঝে—নইলে জানবার কোন উপায় ছিল না!

কাঞ্চি—কয় না? খুব কয়। খুব শোনে। চৈতন্যময়ের জগৎ, সর্বভূতেই চেতনা! গাছ কথা কয়, পাহাড় শোনে, মাটী গান গায়! এই জড় আর চৈতন্যের তফাৎ করেই তো গোলে পড়েছ। সবই সেই হে, সবই সেই।…অত ভাবছ কেন? কি চাও?

যাদব—শান্তি।

কাঞ্চি—খুব সোজা। যে মুহূর্তে চাইবে, সেই মুহূর্তেই পাবে। তুমি চাইবার আগেই সে এগিয়ে রেখেছে। ভাবের ঘরে চুরি বলেই তো দেখতে পাইনি। মুখে বলছি, চাই 'শান্তি'—অন্তরে চাচ্ছি—এটা-ওটা-সেটা। মনে করছি বড় পণ্ডিত হলেই সুখ, ছেলেটা মানুষ হলেই সুখ, শরীরে ব্যাধি না থাকলেই শান্তি, নিজেই নিজের সুখ বিচার করে চাচ্ছি—আর অশান্তির আগুনে জলছি—আর মুখে কেবল বলছি 'শান্তি চাই', 'শান্তি চাই'। আরে ভাই যদি চাস—তবে এটা-ওটা-সেটায় হাত না বাড়িয়ে একেবারে শান্তিময়ের কাছে গিয়ে বলনা, 'তোমায় চাই আর কিছু চাই না!' না, কেবল বিচার করবে আর বলবে 'নেতি-নেতি-নেতি'। আম খাবি পেট ভরে আম খয়ে নে। তোর কোন্ দেশের আম—মাদ্রাজের কি লঙ্কার তার গাছে ক'টা ডাল—কতগুলো পাতা—তাতে তোর দরকার কি? তাতে তো আর পেট ভরবে না? কাজ কি আমার মায়ার বিচারে? কোন্‌টা মায়া, কোন্‌টা ব্রহ্ম বিচার করবে কে? পাথর দেখলেও গড় করি—সেই! মাটীর ঢিপি দেখলেও গড় করি—সেই! ছেলেও সেই, মেয়েও সেই সবই সেই—'মোর পুত্র মোর সখা, মোর প্রাণপতি।'

গান

মিছে সন্দ ত্যজ দ্বন্দ্ব, মাত লীলামৃত পানে
বিরাজিত বিশ্বরূপ বদ্ধ স্থান-কাল-মানে
নহে ভ্রান্তি নহে মায়া
নহে স্বপ্ন নহে ছায়া
চিন্ময় মৃন্ময় কায়া বহুরূপে বহুস্থানে।…"

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত ব্যবহার করতেন সংলাপের অংশরূপে—তাঁর সংলাপ ও সঙ্গীত গভীর সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। নাট্যকার শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন কাঞ্চিপূর্ণ চরিত্র চিত্রণে। গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' বা 'চিন্তামণি' ('কালাপাহাড়') চরিত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যে যে সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলেছিল আমরা তারই সার্থক প্রয়োগ দেখতে পাই অপরেশচন্দ্রের কাঞ্চিপূর্ণ চরিত্রে—এ চরিত্রের বাস্তবভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ।

৪

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'শ্রীরামানুজ-চরিত' প্রকাশের পর সেই গ্রন্থ অবলম্বনে তখনকার দুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার অপরেশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'রামানুজ' নাটক লিখেছেন প্রায় একই সঙ্গে এবং দু'জনেই যে রামকৃষ্ণ-সংঘ থেকে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে দুটি নাটকেরই উৎসর্গপত্রে। অপরেশচন্দ্র স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে কি বিপুল সাহায্য পেয়েছিলেন সেকথা আগেই বলেছি। তিনি বইটি উৎসর্গ করেছিলেন স্বামী সারদানন্দকে। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক উৎসর্গ করেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে—অনুমান করা যায়

তিনিও যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছিলেন সংঘাধ্যক্ষের কাছ থেকে। দুটি নাটকেরই প্রকাশকাল ১৩২৩। তবে 'রামানুজ' নাটকের ক্ষেত্রে অপরেশচন্দ্রই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন দুটি কারণে। প্রথম কারণ—স্বামী ব্রহ্মানন্দের মানসিক আলোড়নের কথা—প্রবন্ধের সূচনাতেই উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় কারণটি হল, অপরেশচন্দ্রের নাটক দেখতে এসেই সংঘ-জননী সারদাদেবী চমৎকার ভূমিকা-গ্রহণকারিণী এক পতিতা অভিনেত্রীকে সস্নেহে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করে তার অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন—সে ঘটনা অভিনয়-জগতে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।[৬]

[৬] ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ' দ্রষ্টব্য।

তোমারে স্মরণ করি

শ্রীমতী চিত্রা মিত্র

তোমারে স্মরিয়া মর্মে যখন সকরুণ বীণা বাজে
গৃহকাজ ছাড়ি সাজাই তোমায় অমল ফুলের সাজে।
ফের ফিরে আসি গৃহ-প্রাঙ্গণে, শতকর্মের মাঝে।
এমনি করিয়া তোমারে ঘিরিয়া আছি যে সকাল সাঁঝে।
কাঁদিতেছে শিশু, ও-যে মোর যীশু, তুলে নিই তারে কোলে।
কখনো গোপাল দু-হাত বাড়ায় 'ননী দাও মাগো', বলে।
ব্রজের দুলাল, শিশু গদাধর, এসেছ আমার কাছে,
কী দিব তোমার করপুটে বাছা, বল মোর কিবা আছে?

এমনি করিয়া প্রতিদিন মোর পুত্র-কন্যা মাঝে
আমার দেবতা, কৃপাময়ী মাতা, নিত্য সত্য রাজে
একবার তাই দেবতারে দিই পুষ্পবিল্বদল।
আর বার দিই শিশুদেবতার মুখেতে অন্নজল।
সংসার মোর শান্তিকুটির তব মন্দির-তল।
নিত্য তোমারে প্রণমিয়া প্রভু, ফেলি যে অশ্রুজল।

আধুনিক উন্নয়নের ধারণা ও স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আজকের অর্থনীতি-শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা আলোচিত শাখা হল 'উন্নয়নের অর্থনীতি'। এই 'উন্নয়নের অর্থনীতি' গড়ে উঠেছে একেবারে হাল আমলে। তবুও আমরা অতি দ্রুত এরই মধ্যে এর ধারণাসমূহকে বেশ পালটাতে দেখেছি। প্রথমদিকে উন্নয়নের মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হত একমাত্র মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধির পরিমাণ (Per Capita GNP growth)। ক্রমে সত্তরের দশকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দারিদ্র্যের পরিমাণ কমানো, বেকারত্ব হ্রাস করা, আয় বণ্টনে বৈষম্য যথা সম্ভব কমিয়ে আনা প্রভৃতি। অতি সম্প্রতি একথাও স্বীকৃত হয়েছে যে উন্নয়ন বলতে একমাত্র আর্থিক উন্নয়ন বোঝায় না, এবং আর্থিক উন্নতিও কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শক্তিগুলির উপর নির্ভর করে না। উন্নয়ন একটি সামগ্রিক ব্যাপার। আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানাদিকে, প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহে, মূল্যবোধে, দৃষ্টিভঙ্গীতে একই সঙ্গে একই সময়ে যে সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে তাকেই আজকের দিনে 'উন্নয়ন' বলে অভিহিত করা হয় :

'Development must be conceived of as a multi-dimensional process, involving changes in structures, attitudes and institutions as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality and eradication of absolute poverty.'—M. Todaro.

আরও প্রাঞ্জল করে Goulet ও Todaro বলেছেন ব্যক্তি ও সমাজের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সিদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এক অপূর্ণ অক্ষম ব্যবস্থা থেকে অধিকতর সন্তোষজনক বা 'উত্তম' ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার অপর নামই 'উন্নয়ন'।

অধ্যাপক Goulet এবং Todaro এখানে প্রশ্ন তুলেছেন 'ভাল' বা 'উত্তম' ব্যবস্থা বলতে কি বোঝা যায়? তাঁরা সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে 'উত্তম' বা 'ভাল'র ধারণা যুগে যুগে বদলায়। এক যুগের 'ভাল' অপর যুগে 'ভাল' বলে নাও বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু তাঁরা অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাসহায়ে এও দেখিয়েছেন যে 'উত্তম' বা 'ভাল'র ধারণা যুগে যুগে যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, তিনটি মূল বস্তু আছে যা সর্বকালে ও সর্বদেশে 'ভাল'র সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটির একটিকেও বাদ দিলে কোনকালেই মানুষের 'ভাল' বা কল্যাণ হতে পারে না। এই তিনটি বস্তুর কোন একটির অভাব ঘটলে 'উন্নয়ন'ও সম্পন্ন হয় না।

প্রথমত: যে কোনও সমাজব্যবস্থাকে 'উত্তম' বলে বিবেচিত হতে হলে প্রথমেই তাকে জীবন-ধারণের উপযোগী খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সমাজের সকলের জন্যই করতে হবে। সমাজে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজন হয় এই কারণেই। এগুলি করায়ত্ত না হলে মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তিসমূহের বিকাশ হতে পারে না :

'Without sustained and continuous economic progress at the individual and societal level the realisation of human potential would not be feasible.'—Todaro.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি,

দারিদ্র্য-দূরীকরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলি উন্নয়নের প্রথম ধাপ। এগুলিকে একত্র করে প্রাণরক্ষামূলক (self-sustenance) 'উন্নয়ন' বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

কিন্তু এগুলিই উন্নয়নের একমাত্র মানদণ্ড নয়। এগুলির ব্যবস্থা হলেই 'উত্তম' ও সর্বতোভাবে 'সন্তোষজনক' ব্যবস্থালাভ হয় না। বস্তুতপক্ষে এই প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করেই উন্নয়নের লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু হয়।

Goulet ও Todaro-র মতে মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতিলাভ (self-esteem) 'উত্তম' ব্যবস্থা বা উন্নয়নের অপর অপরিহার্য অঙ্গ। সত্যই প্রত্যেক মানুষের বাঁচার জন্য যেমন খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, কর্ম ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা চাই, ঠিক তেমনই প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের এই মর্যাদাবোধে জাগ্রত হওয়া যে 'আমারও একটি স্বতন্ত্র মূল্য' আছে। এ বোধে যখন মানুষ জাগ্রত হয় তখনই সে নিজেকে নিজে সম্মান করতে পারে এবং তখনই তার পক্ষে বাঁচা অর্থবহ হয়ে ওঠে। যার কোন সম্মান নেই—নিজের নিকট এবং অপরের নিকট—তার পক্ষে বেঁচে থাকা নিরর্থক, সে বাঁচতে পারে না।

একথা শুধু ব্যক্তির পক্ষেই সত্য নয়, গোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষেও একান্ত সত্য। প্রতিটি গোষ্ঠীর ও সমাজের কালক্রমে কিছু নিজস্ব মূল্য গড়ে ওঠে, এজন্য সব সমাজে সচেতন বা অচেতন ভাবে নিরন্তর প্রয়াস চলে, চলে বহু সাধনা, বহু ব্যক্তিগত ও যৌথ ত্যাগস্বীকার। এই যে নিজস্ব সম্পদ, সে সম্পদ সম্বন্ধে সচেতনতা, গৌরববোধ, তার জন্য কঠিন সাধনা ও ত্যাগস্বীকার—এর মধ্য দিয়েই তাদের স্বীকৃতি, তাদের পরিচয়। এজন্যই তারা স্বতন্ত্র ও শ্রদ্ধার্হ। এই যে তাদের অস্তিত্বের সারথি এই বস্তুটি, এর অপর নাম 'সংস্কৃতি'। এ সংস্কৃতি-সম্পদের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ, কিন্তু প্রত্যেকের নিকটই এর মূল্য অপরিসীম। তার স্বীকৃতি, তার পরিচয়, তার মূল্য, তার মর্যাদা—সব এরই উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু আজকের তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলি অর্থনৈতিক সম্পদসৃষ্টির ক্ষমতায় ও কলাকুশলতার জ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্পর্শে এসে এক মহাবিভ্রান্তির কবলিত হয়েছে। এই উন্নত দেশগুলির প্রভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-সম্পদের মূল্য সম্পর্কে গৌরববোধ হারিয়ে যাচ্ছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে হারাচ্ছে আত্মমর্যাদাবোধ (self-esteem), যা তার অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। এ বিভ্রান্তির কারণ আজকের উন্নত পাশ্চাত্যের ইন্দ্রিয়ানুগ সভ্যতার মানদণ্ডে আর্থিক সমৃদ্ধিই মর্যাদার একমাত্র উৎস। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বে ঐহিক সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েরও যথেষ্ট মর্যাদা ছিল, ততদিন পর্যন্ত এই সকল দেশের দারিদ্র্য সত্ত্বেও নিজেদের হীন মনে করবার কোন কারণ ছিল না। আজ তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলি নিজেদের বিচার করছে পাশ্চাত্যের দৃষ্টি দিয়ে, ঐহিক সমৃদ্ধির মূল্যমানে। ফলে নিজেদের তারা হীন মনে করছে। যে দেশে দারিদ্র্য আছে তার কোন সম্মান আজ বিশ্বে নেই। থাক না তার উন্নত ধর্ম-দর্শন-কাব্য-শিল্পকলা। সে সভ্যতা যদি বুদ্ধ বা কনফুসিয়াসকেও সৃষ্টি করে থাকে তাতেই বা কি? এবং এ দেশগুলি নিজেরাও 'বুদ্ধ' বা 'শঙ্করে'র দেশ বলে, কিংবা অনন্য জীবনসাধনা, ধর্ম-দর্শন-চিন্তা, শিল্পকলায় অসামান্য দক্ষতা সত্ত্বেও নিজেদের শ্রদ্ধা করতে পারছে না। কারণ তাদের প্রতি পূর্বোক্ত 'উন্নত' পাশ্চাত্য দেশগুলি নাসিকা কুঞ্চিত করেই দৃষ্টিপাত করে থাকে। সেজন্যই, অর্থাৎ এই দেশগুলির চোখে মর্যাদালাভের জন্যই আজ স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে যদি আর্থিক

উন্নতি লাভ করতে গিয়ে কোন জাতি তার সংস্কৃতি-সম্পদ হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে তার নিজস্ব মূল্য, তার গৌরব করার মত কোন সংস্কৃতি যদি নাই থাকে, বিশ্বের নিকট সে সম্মান পাবে কি ?

তৃতীয় ও শেষ বস্তু যা Todaro ও Goulet-এর মতে সর্বকালে সর্বদেশে সব 'ভাল' ব্যবস্থার ভিত্তিমূল বলে বিবেচিত, তা হল 'স্বাধীনতা'। 'স্বাধীনতা' বলতে এখানে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বা মতবাদের স্বাধীনতা বোঝেন নি এঁরা। এঁদের মতে এ স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তি—মানুষের নিকট মানুষের দাসত্ব, সমাজের নিকট দাসত্ব, অজ্ঞানতার দাসত্ব এমনকি প্রকৃতির নিকট দাসত্ব হতে যে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি তাকেই এঁরা 'স্বাধীনতা' নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন :

'Freedom here is not to be understood in the political sense, but in the more fundamental sense of freedom or emancipation from alienating material conditions of life and freedom from the social servitudes of men to nature, ignorance, other men, misery, institutions and dogmatic beliefs.'—Todaro.

অর্থাৎ এঁদের চিন্তায় স্বাধীনতাকে এক ব্যাপক ও মৌলিক অর্থে ধরা হয়েছে—সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তি যার মূল কথা। এ স্বাধীনতার ফল কিরূপ ? এর ফলে মানুষের স্বেচ্ছা-নির্বাচনের পরিধি বেড়ে যায়। দারিদ্র্য দূর হলে এ স্বাধীনতা অনেকাংশে লভ্য হয়। সম্পদ মানুষকে অধিক অবসরের সুযোগ করে দেয়, যার ফলে সে বেছে নিতে পারে জীবনের নিজস্ব পথ—ঐহিক ভোগের পথ কিংবা ভোগ পরিহার করে আধ্যাত্মিক চিন্তামগ্নতার জীবন। কিন্তু তার নির্বাচন করার অধিকারেরও স্বীকৃতি চাই, নতুবা সব বৃথা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের তিনটি মূল লক্ষ্য :

প্রথম, মানুষের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা (self-sustenance),

দ্বিতীয়, প্রতিটি মানুষ ও গোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা-লাভ (self-esteem),

তৃতীয়, প্রতিটি মানুষের সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তি ঘটানো (freedom from servitude)।

অর্থাৎ মানুষ যেন অভাবমুক্ত হয়ে, স্বকীয় মূল্য অনুভব করে, আপনার নির্বাচিত পথে নিজ সুপ্তশক্তিসমূহের বিকাশসাধন করতে পারে। সে যেন কোন মতেই অপরের ইচ্ছার বাহক, বা অপরের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত বা শোষিত না হয়। এই হল উন্নয়নের পূর্ণ তাৎপর্য।

মনে রাখতে হবে 'ভাল'র এই তিনটি উপাদানই সমান গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেকটিরই সমান প্রয়োজন যদি কোন সমাজব্যবস্থাকে সত্যসত্যই 'উত্তম' ব্যবস্থায় পরিণত হতে হয়। বাঁচতে হলে মানুষের যতখানি প্রয়োজন আহার, আশ্রয়, কর্ম ও নিরাপত্তা ঠিক ততখানিই প্রয়োজন তার স্বতন্ত্র মর্যাদার ও স্বাধীনতার। প্রথমটির জন্য বিনিময়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে হলে মানুষের 'ভাল' হয় না, মানুষ সে অবস্থাকে কাম্য মনে করে না।

সেজন্য অধ্যাপক Seers বলেছেন যে কোন সমাজের উন্নতি ঘটেছে কিনা এ বিচার করে দেখতে হলে সামনে তিনটি প্রশ্ন রাখতে হয় :

(১) মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটেছে কিনা সে সমাজে ?

(২) তার মর্যাদালাভ হয়েছে কিনা ?

(৩) তার সর্বপ্রকার দাসত্ব হতে মুক্তি ঘটেছে কিনা ?

যদি কোন দেশে কেবলমাত্র প্রথম প্রশ্নের

উত্তর ইতিবাচক হয়, বাকী দুটির উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহলে সে দেশ আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত হলেও, সে দেশ ঠিক ঠিক উন্নত দেশ নয়। Seers-এর মতে আজকের তথাকথিত অনেকগুলি উন্নত দেশের এদিক দিয়ে অনুন্নত বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত। সে দেশ যে পর্যায়ে পৌঁচেছে তাকে ঠিক ঠিক 'উন্নতি' বলা যায় না :

"...if the second and third of these central questions for all societies evoke a negative response i.e. if people feel less self-esteem, respect or dignity and if their freedom to choose has been constrained, then even if the provision of life-sustaining goods and improvements in levels of living are occurring, it would be misleading to call the result 'development'."—Todaro.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের তিনটি শর্ত : ১। আর্থিক নিরাপত্তা ২। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ৩। পূর্ণ স্বাধীনতা। এই তিনটি যে সমাজের করায়ত্ত হয়েছে একমাত্র সে সমাজই 'উন্নয়ন' লাভ করেছে। শুধু আর্থিক সম্পদসৃষ্টিতে দক্ষ দেশ ঠিক ঠিক 'উন্নত' দেশ নয়।

আশ্চর্যের বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দারিদ্র্য-অধ্যুষিত দেশগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে যে চিন্তা রেখে গিয়েছেন তা অনেকাংশে Todaro, Goulet ও Seers-এর চিন্তার অনুরূপ। অনেকেই একথা মানতে চাইবেন না। কারণ 'উন্নয়নের অর্থনীতি' বলে অর্থনীতি-শাস্ত্রের শাখাটি তখনও গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে উন্নয়নের অর্থনীতির জন্মসূত্র মার্কসীয় চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায়। যদি মার্কসের মধ্যে এ বিষয়ে আগাম চিন্তা পাওয়া যায়, বিবেকানন্দের মধ্যেই বা পাওয়া যাবে না কেন? বিবেকানন্দ মার্কসের পরে জন্মেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে আসল বাধা—প্রচলিত এই ধারণা যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 'উন্নয়ন-শাস্ত্র' সম্পর্কে কি করে কোন ধারণা থাকতে পারে?—তিনি তো ধর্মের ক্ষেত্রের লোক। কিন্তু সত্য এই যে বিবেকানন্দ নামক অনন্য প্রতিভার অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতন (দর্শন, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি) অর্থনীতি-শাস্ত্রে ও ইতিহাসে প্রচুর জ্ঞান ছিল। প্রমাণ—ধর্ম-মহাসভায় ভাষণ দিয়ে বিশ্বখ্যাতি অর্জনের পূর্বে আমেরিকাতে তিনি প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন আমেরিকার Social Science Convention-এ, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে অর্থ-বিষয়ক। এ সংবাদই বা ক-জন জানেন?

যাই হোক স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে Todaro, Goulet ও Seers-এর অনুরূপ অগ্রগামী চিন্তা এঁদের বহুপূর্বেই দিয়ে গিয়েছেন তিনি।

ভারতভ্রমণকালে (১৮৮৭-১৮৯৩) স্বামীজী প্রথম উপলব্ধি করেন যে ভারতের জনগণের ভয়াবহ দারিদ্র্য-দূরীকরণ ছাড়া তাদের কোনপ্রকার উন্নতি সম্ভব নয়। এ বিষয়ে একটি পত্রে তিনি লেখেন—'আমি সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি।... কিন্তু, ভাই আমি সর্বত্রই জনগণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে প্রথমে ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর না করিয়া ইহাদের ধর্মকথা শোনাইয়া কোন লাভ হইবে না—এই কারণেই জনসাধারণের মুক্তির অন্যতর উপায়ের সন্ধানেই আমি আমেরিকা চলিয়াছি।'

স্বামীজী যে শুধু দারিদ্র্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তা নয়। কিংবা দারিদ্র্য-দূরীকরণের

জন্য আবেগ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তাও নয়। আজকের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচয়িতাগণ যে বিষয়টি উপেক্ষা করে চলেছেন, তা হল এই যে তিনি 'দারিদ্র্য' নিয়ে নিপুণ অর্থনীতিবিদের মত আলোচনা করেছেন এবং বাস্তব সমাধান-সূত্রসমূহ দিয়েছিলেন। দাদাভাই নওরোজীর প্রথম হিসাব অনুযায়ী ভারতে মোট জাতীয় আয় (১৮৭০) ছিল ৩০০ কোটি টাকা, মাথা পিছু আয় ২০ টাকা। বিবেকানন্দের মতে ভারতে মাসিক গড় আয় ১৷৷০ থেকে ২ টাকা। দু'টো হিসেবে পার্থক্য খুবই কম। ভারতের দারিদ্র্যের আন্তর্জাতিক মানেও পরিমাপ দেবার চেষ্টা করেছেন বিবেকানন্দ—মাসে ৫০ সেণ্ট :

'India with an area much smaller than the United States, contains twenty three hundred millions of people, and of these three hundred millions earn wages averaging less than fifty cents per month.' (Burke)

স্বামীজীর মতে ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্যের মূল কারণ দুটি : ১। ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা শোষণ ২। অভিজাত ও পুরোহিতদের দ্বারা নির্মম শোষণ। এছাড়া ধনতান্ত্রিক শোষণের জন্যই যে উপনিবেশগুলিতে আর্থিক উন্নয়ন রুদ্ধ হয় এবং দারিদ্র্যের প্রসার ঘটে, এ সম্পর্কেও তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত রেখেছেন। এখানে মার্কসীয় চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার ঐক্য দৃষ্ট হয়। স্বামীজী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বলেছেন : 'ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে প্রতিবিন্দু রক্ত শোষণ করেছে নিজেদের সুখসমৃদ্ধির জন্য, আমাদের দেশ থেকে ক্রোর ক্রোর টাকা লুটে নিয়ে গিয়েছে, ওদিকে আমাদের গ্রামের পর গ্রামে, প্রদেশের পর প্রদেশে বিশাল জনগণ অনাহারে থেকেছে।' এখানে সুস্পষ্ট দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ ধনতান্ত্রিক শোষণ।

তাঁর বিভিন্ন রচনায় স্বামীজী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমান উন্নয়ন চেয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান চেয়েছেন, দারিদ্র্য-দূরীকরণের উপর জোর দিয়েছেন এবং এজন্য উন্নত দেশগুলির দায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভারতের দারিদ্র্য-দূরীকরণের জন্য আরও চেয়েছেন অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যের অবসান। অপর-দিকে চেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞান ও উন্নত কলাকুশলতার প্রয়োগে ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ, এজন্য চেয়েছেন কলাকুশলতার জ্ঞানের প্রসার। আর্থিক উন্নয়নের উপর শুধু তিনি জোর দিয়েই ক্ষান্ত হননি, ভারতের মত জনবহুল দেশে আর্থিক উন্নয়নের সঠিক পথ কোন্‌টি—তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজী ভারতের মত দেশে বড় বহরের শিল্পোদ্যোগ হলেই সব কিছু হয়ে যাবে মনে করেননি। এ জনবহুল দেশে যেখানে বেকার ও অর্ধ বেকারের সংখ্যা অগণিত, সেখানে ছোট বহরের শিল্পপ্রসার ও ছোট জোতের চাষের উন্নয়নের গুরুত্বও তিনি দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে ঠিক একই মত দিয়েছেন তাঁর দীর্ঘকাল পরে বর্তমান কালের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ Myrdal।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র দারিদ্র্য-দূরীকরণ ও আর্থিক উন্নয়নের কথাই বলেননি, পিছিয়ে-পড়া দেশগুলির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণের উপরও প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্পর্শে এসে বিভ্রান্ত ভারতকে তিরস্কার করে বলেছিলেন তিনি : 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, এই পরানুকরণ, এই পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ?' এখানে

সুস্পষ্ট তাঁর এই ইঙ্গিত যে অগ্রগতির অন্যতম শর্ত নিজস্ব সংস্কৃতি-সম্পদে গৌরব বোধ করা। প্রত্যেক জাতিরই কিছু নিজস্ব মূল্য আছে, তা উপলব্ধি করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলে সে আরও অগ্রসর হতে পারবে। ভারতের ক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন ভারতের স্বাতন্ত্র্য, ভারতের মহিমা ও গৌরব ভারতের অধ্যাত্মভিত্তিক সাংস্কৃতিক সম্পদে। সুতরাং কলাকুশলতায় উন্নত দেশগুলির নিকট মাথা নত করে নয়, মাথা উঁচু করেই ভারত তাদের কাছ থেকে কলা-কুশলতার জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে, কারণ তারও কিছু দেবার আছে—তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সুতরাং বিনিময় হবে সমানে সমানে। ফলে উভয় ভূখণ্ডই সমৃদ্ধ হবে, উন্নত হবে—এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তিনি পাশ্চাত্যের উদ্দেশে এ সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করে বলেন: 'আমাদের যন্ত্রবিদ্ প্রেরণ করুন, যাতে আমরা আমাদের হাতের ব্যবহার করতে পারি। আমরা আপনাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য প্রচারক পাঠাবো।'

কিন্তু শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর সকল উন্নত ও অনুন্নত জাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র মূল্য আছে একথা সর্বদা ঘোষণা করতেন। স্বামীজী ভারতভ্রমণকালে ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির মূলগত জাতীয় ঐক্যের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেন। উত্তরকালে বিশ্বপরিক্রমা-কালে সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরনের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি মানবের মূলগত দিব্য সত্তার বিচিত্র প্রকাশ দেখেছিলেন। নিবেদিতা 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে এ বিষয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একবার স্বামীজী তুর্কবংশীয় নাবিকদের কলাকুশলতার প্রশংসাকালে যে আবেগ প্রদর্শন করেন তা দেখে নিবেদিতা বিস্ময় প্রকাশ করলে স্বামীজী বলেন: 'আমি আমাদের মুসলমানদের ভালবাসি।' নিবেদিতা ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

'Thus a nationality, in the Swami's eyes, had all the sacredness of a church —a church whose inmost striving was to express its own conception of ideal manhood.'

অর্থাৎ একটি জাতি তাঁর নিকট একটি ধর্মমতের মত পবিত্র বস্তু, একটি ধর্মমতের ন্যায় একটি জাতি মানবতার আদর্শ সম্বন্ধে সে জাতির নিজস্ব ধারণার বাস্তব রূপায়ণ। নিবেদিতা আরও দেখিয়েছেন যে তিনি বিভিন্ন জাতিকে দেখতেন যেন ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের মত। প্রতিটি জাতির বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ্য করেছেন, যথাযথ মূল্য দিয়েছেন তাকে, কোন একটির দ্বারা তিনি অভিভূত হননি। তাঁর মতে 'স্বদেশপ্রেমের জন্য জাপানী, পবিত্রতার জন্য হিন্দু আর বীরত্বের জন্য ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ। ইংরেজদের অপেক্ষা মানবের মহিমা অন্য কোন জাতি অধিক অনুভব করেনি।' সকল জাতির নিজস্ব মূল্য আছে। 'আর্য ও তামিল' শীর্ষক রচনায় বিবেকানন্দ বিষয়টি আরও প্রাঞ্জল করে দেখিয়েছেন। তাতে তিনি বলছেন: 'আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত, এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত, মানব-জাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের জন্য আমরা গর্বিত।'

যেমন প্রতিটি মানবগোষ্ঠী—ছোট-বড় আর্য-অনার্য, আদিম, আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত-অনুন্নত, প্রত্যেকে—স্বতন্ত্র মূল্যভূষিত বলে মনে করতেন

স্বামীজী, ঠিক তেমনি প্রতিটি মানবের অপরিসীম মহিমা সম্পর্কে তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। তাঁর কথা: 'মানবাত্মার মহিমা ভুলিও না—আমরাই মহত্তম বিধাতা,...খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের দল অসীম সোঽহং সমুদ্রের তরঙ্গমাত্র।' তাঁর মতে সকলেই এই দিব্য সত্তাসম্পন্ন, কারও মধ্যে বিকাশ ঘটেছে, কারও মধ্যে তা সুপ্ত আছে। সেজন্য কোনও মানুষ অপরের দ্বারা শোষিত হবে বা চালিত হবে, অপরের দাসত্ব করবে—এ তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল। সেজন্য মানুষের তৈরী প্রতিটি শৃঙ্খল তিনি ভেঙে চুরমার করে দিতে চেয়েছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন: "মানুষের দুঃখবেদনা কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সকল গর্ব, উচ্চাশা, প্রেম, তাঁহার সকল বিশ্বাস, বিজ্ঞান, কর্ম, তাঁহার সকল শক্তি ও কামনা মানুষের সেবায় একই সঙ্গে নিয়োজিত হইল এবং সেগুলি একটিমাত্র অগ্নিশিখায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল: 'আমি এমন একটিমাত্র ধর্ম চাই, যাহা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাইবার, দরিদ্র জনসাধারণের অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের সকল দুঃখবেদনাকে দূর করিবার শক্তি আনিয়া দিবে।'"

শুধু ভারতের নয় বিশ্বের সর্বত্র শোষিত নরনারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য তাঁর হৃদয় অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল। সাম্প্রতিক এক গ্রন্থে চীনের হুয়াং কিম্ চুয়াং এ বিষয়ে লিখেছেন: 'বিবেকানন্দ আধুনিক চীনের কাছে ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক এবং সামাজিক ব্যক্তিত্বরূপে পরিগণিত। তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এবং তাঁর মহাকাব্যিক বিশালতা-যুক্ত দেশপ্রেম কেবল ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের বিকাশকে প্রেরণা দেয়নি—বহির্ভারতেও প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল।' রুশ দেশের শেলিসেভও অনুরূপ প্রতিবেদন রেখেছেন। সমগ্র শোষিত মানুষদের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর অগ্নিময় আহ্বান নিম্নোক্তরূপ:

'হ্যাঁ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অজ্ঞ, অশক্ত, নরনারী, শিশু সকলেই শুনুক ও শিখুক যে কি শক্তিমান, কি দুর্বল, কি উচ্চ, কি নীচ, প্রত্যেকের মধ্যেই অসীম আত্মা রহিয়াছেন। সুতরাং মহান ও বড় হইবার অসীম সম্ভাবনা ও অসীম শক্তি সকলেরই আছে। ওঠ, দাঁড়াও, নিজেকে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করো, তোমার মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁকে অস্বীকার করো না।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের যে ধারণা স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন সেখানে গোষ্ঠী ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, মূল্য ও মর্যাদা স্বীকৃতির একটি বড় স্থান আছে। দারিদ্র্য-দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ক্ষুদ্র বৃহৎ দেশ প্রত্যেকের সংস্কৃতির মূল্য সম্বন্ধে স্বীকৃতি আর ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি। এখানে বিবেকানন্দ Todaro, Goulet ও Seers-এর সঙ্গে একমত। তিনি আরও প্রাঞ্জল করে বুঝিয়েছেন যে গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মর্যাদাবৃদ্ধি উত্তম সমাজের ও উন্নয়নের অপরিহার্য অঙ্গ।

অনুরূপভাবে তিনি উন্নয়নের তৃতীয় মূল ভিত্তি 'স্বাধীনতা'র উপর তাঁর নিজস্বভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের কোন কল্যাণ সম্ভব নয়, কোনপ্রকার বিকাশ সম্ভব নয়—এই তাঁর সুদৃঢ় মত। অর্থাৎ Goulet, Todaro ও Seers যা অনেক পরে বলেছেন স্বামীজী তা বহুপূর্বেই বলে গিয়েছেন। চিন্তায় যে তিনি কতখানি অগ্রগামী এ তারই প্রমাণ। স্বাধীনতা বলতে তিনি যে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি বুঝিয়েছেন তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে উদ্ভাসিত: 'সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা পরম

পুরুষার্থ। যে-সকল সামাজিক নিয়ম এ স্বাধীনতা ব্যাহত করে তাহা শীঘ্রই নাশ করা উচিত। যে-সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।' সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যাহত হবার কারণ অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন: 'কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিমান হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্ব-কামনা পূর্ণ করে।' স্বাধীনতার ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে স্বাধীনতা নেতিবাচক কিছু নয়—ইতিবাচক। তাঁর ভাষায়: 'আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোন বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা সে প্রকার ব্যবহার করিতে পারিব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার; এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের—সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুযোগ যাহাতে থাকে তাহাও হওয়া উচিত।' এ সম্পর্কে তীব্র ভাষায় তিনি আরও বলেছেন: 'মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে !!!

'সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত !!!'

এ বিষয়ে তাঁর শেষ কথা: 'স্বাধীনতাই বিকাশের প্রথম শর্ত।' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে মানুষ কোন কল্যাণকে কল্যাণ বলে মনে করতে পারে না, স্বাধীনতা ব্যতীত তার এক মুহূর্তও সুখের নয়, স্বাধীনতা ছাড়া তার সেজন্য চলতে পারে না। স্বাধীনতা ব্যতীত উদ্ভাবনী বা সৃজনী শক্তিরও স্ফুরণ সম্ভব নয়, সুতরাং স্বাধীনতা ব্যতীত তার কোন বিকাশ সম্ভব নয়। সেজন্য অত্যন্ত জোর দিয়ে তিনি বলেছেন: 'বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যত পারো জীবের বন্ধন খোল।' এজন্যই তিনি সমাজের নিকট ব্যক্তির বলিদানের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর দৃঢ়মত: 'চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও ভাল।' এরকম সমাজে ব্যক্তির বিকাশ যে অবরুদ্ধ তার একটি চিত্র তুলে ধরে তিনি বলছেন: 'মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই,·· উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই।' 'আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মতো উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়?' এদিক দিয়ে প্রাচীন হিন্দুসমাজ ও আধুনিক সর্বাত্মক রাষ্ট্র (Totalitarian State) সমগোত্রীয়। বিবেকানন্দ কোনপ্রকারেই সমাজের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির বলিদানের পক্ষে ছিলেন না। শেষোক্ত উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ।

উন্নয়ন সম্পর্কে উপরি-উক্ত আলোচনান্তে আমরা দেখেছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের দেশের স্বামী বিবেকানন্দ যে চিন্তা রেখে গিয়েছেন মানবসমাজের উন্নয়ন সম্পর্কে তারই বহুলাংশে প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আজকের 'উন্নয়ন-শাস্ত্র'বিদ্‌দের চিন্তায়। বিবেকানন্দকে যাঁরা আজ সঠিক মূল্যায়ন করতে চান, আজ তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও সর্বধর্ম-সমন্বয় (তাত্ত্বিক পর্যালোচনা)। লেখক ও প্রকাশক: শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, ৮৯, অশোক রোড, গাঙ্গুলীবাগান, গড়িয়া, কলিকাতা ৭০০০৮৪। (১৯৮১), পৃষ্ঠা: ৭২, মূল্য: পাঁচ টাকা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত দুটি মূল বাণীর সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর পরিচয় মিলবে। রামকৃষ্ণ বলেছেন, সকল ধর্মই মানুষকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা রাখে; রুচিভেদে এবং অধিকারভেদে তাদের ভিন্নতা। অপর বাণীটি হল জীবকে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে সেবাই হওয়া উচিত সাধকের আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দ মূলত এই যুগ্ম বাণীর প্রচারক। লেখক রামকৃষ্ণের বাণী ও বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার সরল ভাষায় একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

বিষয়টির এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে আলোচনা গ্রন্থটিকে সার্থক করে তুলেছে। এই যুগ্ম তত্ত্বের একজন প্রবক্তা, অপরজন ভাষ্যকার; একজন উৎস, অপরজন তা হতে উদ্ভূত প্রবাহিণী। সুতরাং গ্রন্থখানিতে গঙ্গা ও গঙ্গোত্রীকে যুগপৎ একসঙ্গে পাই। তাই আমার আশা গ্রন্থখানি পাঠককে তৃপ্তি দেবে।

ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও বাংলা গীতিকবিতার ধারা: ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। প্রকাশক: শ্রীসত্যেন্দু চ্যাটার্জি, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯। (১৩৮৮), ৫+৩৩৮+১৩, মূল্য: ৩০ টাকা।

সাধারণ পাঠকদের কথা জানি না, একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের খুবই অসুবিধা হতো—বিহারীলালের কাব্য পড়তে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কোনো একটি পূর্ণাঙ্গ 'রেফারেন্স' বই (নির্দেশিকাগ্রন্থ) না থাকায়। এদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতায় বিহারীলালের কবিতা প্রায় সর্বত্র অবশ্য-পাঠ্য। পড়ুয়া ছাত্রদের দিক থেকে এবং তাদের শিক্ষকদের দিক দিয়েও বটে বিহারীলালের কাব্য-কীর্তির এমন একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বইয়ের প্রয়োজনের কথা আগেও মনে হতো। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে সে সত্য আরও বেশি করে বুঝতে পারছি। এতদিন পরে বাংলা আধুনিক গীতিকবিতার জনকের কাব্যকীর্তির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা, সম্মান, নিষ্ঠা ও যথোচিত বিচারসহ এই আলোচনাগ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তো বটেই, যাঁরা ছাত্র নন, সাধারণ পাঠকের কৌতূহল নিয়ে যাঁরা বিহারীলালের কাব্যকীর্তির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করতে চান, তাঁদেরও আশা পূরণ করবে। মঙ্গলাচরণে ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ যে জানিয়েছেন, 'বিহারীলালের কবিকৃতির একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম প্রকাশিত হলো'—তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ পাণ্ডা অবশ্যই সেজন্য 'সাহিত্যপাঠক বাঙালী-জাতির পক্ষ থেকে অভিনন্দনলাভের যোগ্য অধিকারী।'

'ভোরের পাখি'র উপমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গুরুর গৌরব দিলেন যাঁকে, সেই বিহারীলালের 'কবি-প্রতিভা সম্পর্কে নানাপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে'—ভূমিকায় ডঃ পাণ্ডা এই কথা জানিয়ে অগ্রসর হয়েছেন সেই সব প্রশ্নের জবাব দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরেও সঞ্চার করেছেন রবীন্দ্রগুরু বিহারীলালের নিজস্ব কাব্যসৌরভ।

প্রথম অধ্যায় 'প্রাক্‌কথন'-এ ডঃ পাণ্ডা বিহারীলাল সম্পর্কে এ পর্যন্ত সমালোচিত মতবাদগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও যে নিজস্ব 'যুক্তিনিষ্ঠ আর আত্মনির্ভরশীল বিশ্লেষণ ও

মূল্যায়নের মানসিকতাকে'-ই মূলধন করেছেন তাঁর এই আলোচনাগ্রন্থে, একথা জানিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। বিষয়টি হলো, বিহারীলালের সাহিত্যকৃতির যথার্থ কাব্য-মূল্য কতখানি আর তাঁর কাব্যপ্রতিভা পরবর্তীদেরও প্রভাবিত করেছে কিনা, করে থাকলে কতটা করেছে? আসলে, বিহারীলাল থেকেই বাংলা গীতিকবিতার ধারার প্রবর্তনা, এ স্বীকৃতি দিতে হলে, পরবর্তীদের উপর বিহারীলালের প্রভাবও স্বীকার করে নিতে হয়। ডঃ পাণ্ডা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশদ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার ধারা বিহারীলাল থেকে শুরু হয়ে রবীন্দ্রনাথে পরিপূর্ণতা পেয়ে আজ অবধি বহমান।

বিহারীলালকে কি Major Poet (প্রধান কবিদের অন্যতম) বলব, অথবা Minor Poet (অপ্রধান কবি)? এলিয়ট প্রমুখ কাব্য-সমালোচকদের মতামতের ভিত্তিতে ডঃ পাণ্ডা নিজস্ব বিচারপদ্ধতিও এখানে প্রয়োগ করেছেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে। কত বিচিত্র বিষয়ই না বিহারীলালের কাব্যে ধরা পড়েছে—শৈশব-সাথীর ব্যথায় কাতর কবি 'বন্ধুবিয়োগ', বন্ধুর পারিবারিক জীবনকথা নিয়ে 'প্রেমপ্রবাহিণী' যেমন লিখলেন, আর একদিকে সৃষ্টি করলেন 'সঙ্গীতশতক'। কবির কাব্যে যেমন এসেছে প্রকৃতি, তেমনি এসেছে মানুষের প্রতি তাঁর একান্তপ্রীতি, সেইসঙ্গে শোনা গেছে বাউলের একতারা, সরস্বতীর বীণার ঝংকার।

তাঁর সমকালীন কাব্যধারা ও কবিদের অবস্থার কথাও আমাদের এইজন্য জানা দরকার যে, তাহলে আমরা বাংলা গীতিকবিতার ধারায় বিহারীলালের স্থানটি কোথায় তা দেখতে পাব। ডঃ পাণ্ডা সেকথাও ভোলেন নি। কুড়ি পৃষ্ঠা ব্যয়িত হয়েছে এ প্রসঙ্গের আলোচনায়।

বিহারীলালের উপর স্বদেশী-বিদেশী কাব্য-কবির প্রভাব পড়েছে কিনা এবং বিহারীলাল তাঁর পরবর্তীদের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করলেন তার তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা পেয়ে যাই 'প্রভাব প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে। তারপরেই দেখানো হয়েছে কবির স্থান বাংলা কাব্যধারায়। ডঃ পাণ্ডা দীর্ঘ আলোচনার পর এ মত প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন যে, 'তিনি (বিহারীলাল) শুধুমাত্র রোমান্টিক কবিগণের অগ্রণীই নন, বাংলা কাব্য-ধারায় অন্যতম প্রথম সারির কবি।'

কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই-এর এই দুর্মূল্যের বাজারে প্রায় সাড়ে তিনশ পাতার বইয়ের ত্রিশ টাকা দাম খুব বেশি বলে মনে হবে না। খালেদ চৌধুরীর নয়নাভিরাম প্রচ্ছদটির স্নিগ্ধতা প্রশংসনীয়। বাঁধাই তো ভালই! একটি সম্পূর্ণ নির্ঘণ্টও উপরি-পাওনা।

সব মিলিয়ে বিহারীলালের তিরোধানের দীর্ঘদিন পরে তাঁর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার এই প্রথম আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এ গ্রন্থের জন্য লেখককে পি. এইচ. ডি. উপাধি দিয়েছেন। কিন্তু সবার উপরে এ গ্রন্থ প্রমাণ করেছে যে লেখক নিজেও যথার্থ কবিদৃষ্টির অধিকারী।

শিলাদিত্য ভট্টাচার্য

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে :

(ক) উড়িষ্যা (১৯৮০'র বংশধারা বন্যা): প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে চলখাম্বায় গৃহনির্মাণকার্য স্থগিত। উপজাতি-অধ্যুষিত অন্তর্ঝুলিতে গৃহ-নির্মাণকার্য শুরু হইয়াছে। এই স্থানটি কোরাপুট জেলার গুনুপুরে মিশনের চলখাম্বা শিবির হইতে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

(খ) অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯৮০'র বংশধারা বন্যা): শ্রীকাকুলাম জেলাস্থিত মদনপুরমে গৃহনির্মাণকার্য প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে মন্থরগতিতে চলিতেছে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ: (১) দিঘড়া (হুগলী জেলা): বালিকা বিদ্যালয়-ভবনের নির্মাণকার্য অব্যাহত।

(২) মালদা: ১৯৮০'র বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় গৃহনির্মাণ-প্রকল্পানুসারে প্রতিটি গৃহের জন্য টা. ১৫০০'০০ বরাদ্দের ভিত্তিতে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে ১৮০০টি গৃহের উপকরণাদির সরবরাহ-কার্য সংগঠিত।

বাংলাদেশে :

দুইটি কেন্দ্রে বস্ত্রবিতরণ, তিনটি কেন্দ্রে দুগ্ধ-বিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রে অ্যালোপ্যাথি ও দুইটি কেন্দ্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-ব্যবস্থা যথারীতি চলিতেছে।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

মহীশূর বিদ্যাশালার একজন ছাত্র ঐ রাজ্যের ১৯৮১-র SSLC পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং আর একজন ছাত্র দ্বিতীয়-বার্ষিক PUC পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

সারগাছি আশ্রমের তিনজন ছাত্র প্রতিভাবান ছাত্র হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র ১৯৮১-র উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম, অষ্টাদশ ও বিংশস্থান অধিকার করিয়াছে।

নরেন্দ্রপুর জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুলের দুইটি ছাত্র সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৯৮১'র শেষ পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

'জগদীশ বোস ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ' (জেবিএনএসটিএস) নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়টিকে ১৯৮০-৮১ সালের সর্বোত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গণ্য করিয়া শীল্ড দিয়াছে। ইহা ছাড়া উক্ত মহাবিদ্যালয় পুস্তক ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য টা. ৫০০০'০০ পাইয়াছে। আলোচ্য সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় তিনটি ছাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য মাসিক টা. ২৫০'০০ বৃত্তি এবং দুইটি ছাত্র সর্বোত্তম 'প্রকল্প-পুরস্কার' লাভ করিয়াছে।

উদ্বোধন সংবাদ

স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

২২শে সেপ্টেম্বর স্বামী অভেদানন্দজীর ও ২৮শে সেপ্টেম্বর স্বামী অখণ্ডানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর মহালয়া উপলক্ষে এবং ৫ই, ৬ই ও ৭ই অক্টোবর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ হয়। মহাষ্টমীতে (৬ই অক্টোবর) শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা হয়।

সদ্যপ্রকাশিত নবসংস্করণ গ্রন্থসমূহের বিবরণ:

Siva and Buddha—Sister Nivedita, 6th Edition, pp. 46, Price: Rs. 1'50; Thoughts on Vedanta—Swami Vivekananda, 7th Edition, pp. 62, Price: Rs. 2'25; Christ the Messenger—Swami Vivekananda, 8th Edition, pp. 28, Price: Rs. 1'25; সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, ১৪শ সংস্করণ, পৃঃ ১৪৪, মূল্য: ৪'০০ টাকা।

আবেদন

জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে সাধুসমাগমের আধিক্যহেতু আমরা এই আশ্রমে একটি সাধুনিবাস নির্মাণের প্রয়োজন সুদীর্ঘকাল অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। সম্প্রতি পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত সাধুনিবাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা ভক্তজনগণের উপর নির্ভর করিয়াই মাত্র দেড়লক্ষ টাকা হাতে লইয়া কাজ শুরু করিয়াছি। সংগৃহীত সমস্ত অর্থই ইতোমধ্যে খরচ হইয়া গিয়াছে। এইজন্য ভক্তজনসাধারণের নিকট তাঁহাদের সহৃদয় সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করিতেছি। এই সৎকার্যে সর্বপ্রকার দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম শাখাকেন্দ্র। সরকারী অনুমোদনক্রমে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে প্রদত্ত দান আয়করমুক্ত। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক/ড্রাফট্ "SRI SRI MATRI MANDIR"—এই নামে হইবে।

স্বামী প্রেমরূপানন্দ
অধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী
বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ
৭২২-১৪১

২৭ আশ্বিন, ১৩৮৮

বিবিধ সংবাদ

অভেদানন্দ-জন্মজয়ন্তী

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ২২শে সেপ্টেম্বর ৯৮১ তারিখে মঙ্গলারাত্রিক, বিশেষ পূজা, হোম ও ভজনাদি হয়। সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য ও সহশিল্পিগণ গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। এই দিন যথারীতি বেলুড় মঠ হইতে ফল, পুষ্প, মিষ্টান্ন ও বস্ত্রাদি বেদান্ত মঠে প্রেরিত হয়। বেলুড় মঠ ও উহার শাখাকেন্দ্রগুলি হইতে সাধুরা এই উৎসবে যোগদান করেন। পরদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় পূজ্যপাদ অভেদানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দ। 'ছন্দম' সংস্থা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পরলোকে

শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্যা **ইন্দুবালা ঘো** ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮১, রাত্রি ৯টা-৫ মিনি তাঁহার রাঁচির বাটীতে ৮৫ বৎসর বয়সে সজ্ঞা মাতৃনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য **মোহিনীমোহ মুখোপাধ্যায়** ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১, সকা ৮টা-১৫ মিনিটে ৮৫ বৎসর বয়সে সজ্ঞা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতে মাথা রাখি দেহত্যাগ করিয়াছেন। হুগলী জেলার জনাইএ মুখোপাধ্যায় বংশের কৃতী সন্তান, মোহিনীবা ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থ-উপদেষ্টা, লণ্ডনে ইনস্টিটিউট অফ কস্ট এণ্ড ওয়ার্কস এ্যাকাউণ্টেন্টসে প্রথম ভারতীয় স্নাতক, ঐ সংস্থার ভারতীয় শাখা অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং হাওড়া শাখার প্রথ সভাপতি ছিলেন। তিনি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ে বাড়ীতে ১৪ বৎসর বয়সে দীক্ষালাভ করেন।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—২০৲ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৯৫৲ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১[illegible]৲ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র
দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত
তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান
চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে
পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে
ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী
সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)
অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ
নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন
দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ— পৃঃ ১৪১, মূল্য ৫.০০
ভক্তিযোগ— পৃঃ ৯৬, মূল্য ৩.০০
ভক্তি-রহস্য— পৃঃ ৯৮, মূল্য ৩.৪৫
জ্ঞানযোগ— পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০.৫০
রাজযোগ— পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬.৫০
সন্ন্যাসীর গীতি— পৃঃ ২৩, মূল্য ০.৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট— পৃঃ ২৯, মূল্য ০.৮০
সরল রাজযোগ— পৃঃ ৩৬, মূল্য ১.২৫
পত্রাবলী—প্রথমার্ধ— পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০.০০
শেষার্ধ— পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০.৫০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)— মূল্য ২৭.০০
ভারতীয় নারী— পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩.৫০
পওহারী বাবা— পৃঃ ১৮, মূল্য ১.২৫
স্বামীজীর আহ্বান— পৃঃ ৮০, মূল্য ১.২৫
ধর্ম-সমীক্ষা— পৃঃ ১৩০, মূল্য ৫.০০
ধর্মবিজ্ঞান— পৃঃ ১০২, মূল্য ৫.৫০

বেদান্তের আলোকে—পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫.০০
ভারতে বিবেকানন্দ—পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০.০০
দেববাণী— পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬.৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ— পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪.০০
কথোপকথন— পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১.২৫
মদীয় আচার্যদেব— পৃঃ ৬২, মূল্য ২.২৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে — পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২.০০
চিকাগো বক্তৃতা— পৃঃ ৫২, মূল্য ১.৭৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ— পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬.০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক— পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩.০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— পৃঃ ১৩৬, মূল্য ৩.৫০
ভাববার কথা— পৃঃ ৬৪, মূল্য ২.৩০
বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭.০০
বর্তমান ভারত— পৃঃ ৪০, মূল্য ২.৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 OCTOBER 1981 Regd. No. WB/NC-19

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত
সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবো

অগ্রহায়ণ ১৩৮৮
৮৩তম বর্ষ
১১শ সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়, ৮৩তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৫৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৩৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য .৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন অন্যথা নিঃশুল্ক পাঠানো হইবে না, তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনাঃ—ধর্ম দর্শন ভ্রমণ ইতিহাস সমাজ উন্নয়ন শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** রচনা ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে কার্যালয়ে পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্য উল্লেখ করিবেন। ধনাদি মানি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় সকাল ৭টা হইতে ১১টা, বিকাল ২টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

কয়েকখানি নিত্যসঙ্গী বই:

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট [illegible] টাকা
প্রতি খণ্ড ২০.০০ টাকা সুলভ সংস্করণ সেট ৫৫.০০ টাকা, প্রতি খণ্ড ৮.০০ টাকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম খণ্ড) ১ম ভাগ ২৮.০০ টাকা ২য় ভাগ ২২.৫০ টাকা। সাধারণ: ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা ২য় খণ্ড ৭.৮০ টাকা, ৩য় খণ্ড ৮.২৫ টাকা ৪র্থ খণ্ড ৯.৫০ টাকা, ৫ম খণ্ড ১১.৫০ টাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—প্রথম ভাগ ৭.৫০ টাকা, ২য় ভাগ ১০.০০ টাকা।

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।
১ম ভাগ ১৫.০০ টাকা, ২য় ভাগ ১১.০০ টাকা, তৃতীয় ভাগ ১১.০০ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত। ৮.৪৫ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত।
১২.৫০ টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন, ৮৪তম বর্ষ, ১৩৮৮-৮৯

নি বে দ ন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮৩তম বর্ষ শেষ হইবে। আগামী মাঘ (১৩৮৮) মাসে পত্রিকা ৮৪তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের (১৯৮১) মধ্যে তাঁহাদের পুরা নাম ও ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ষিক চাঁদা ১৪.০০ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৪০.০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১২০.০০ টাকা) মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্বে কার্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া জানাইবেন—মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ২০ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে হইলে টা. ১৭.৮০ পয়সা লাগিবে। চেকে টাকা পাঠাইবেন না।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১৪.০০ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠানো হইবে। ভি. পি. পি ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়; সেজন্য সংলগ্ন কার্ডখানি অতি অবশ্যই অবিলম্বে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

সুদীর্ঘ ৮৩ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥—১১টা; বিকাল ১॥—৫টা।
[রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।]

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়

১ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ 28 DEC 1981

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

৮৩তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

যখন বাস্তবিক বাহ্য ও আন্তর—উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন শরীরের প্রতি অযত্ন আসে, কিসে উহা ভাল থাকিবে, কিসেই বা উহা সুন্দর দেখাইবে, এ সকল ভাব একেবারে চলিয়া যায়। অপরে যে মুখ অতি সুন্দর বলিবে, তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর নিকট তাহা পশুর মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জগতের লোক যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তাহার পশ্চাতে চৈতন্যের প্রকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বর্গীয় মনে করিবেন।...

এই শৌচ অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্বগুণ বর্ধিত হইবে, সুতরাং মনও একাগ্র ও প্রফুল্ল হইবে। তুমি যে ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছ, তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি বেশ প্রফুল্ল হইতেছ। বিষাদপূর্ণ ভাব অবশ্য অজীর্ণ রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম নয়। সুখই সত্ত্বের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, সাত্ত্বিক ব্যক্তির পক্ষে সবই সুখময় বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং যখন তোমার এই আনন্দের ভাব আসিতে থাকিবে, তখন তুমি বুঝিবে, তুমি যোগসাধনায় উন্নতি করিতেছ। যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা তমোগুণপ্রসূত, সুতরাং উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। বিষণ্ণতা তমোগুণের একটি লক্ষণ। সবল, দৃঢ়, সুস্থকায়, যুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই যোগী হইবার উপযুক্ত।· বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহা ভয়ঙ্কর। এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না, কখন এইরূপ হইলে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সারাদিন ঘরে কাটাইয়া দাও। সমাজে, সংসারে এই ব্যাধি সংক্রামিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে?

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় সং, ১৩৬৮-৬৯]

কথাপ্রসঙ্গে

মনুসংহিতায় চিরকালের ধর্ম : অস্তেয় ও শৌচ

মনুসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ের ৯২তম শ্লোকে ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটিকে ধর্মের লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চিরকালের ধর্মের এই দশবিধ লক্ষণের মধ্যে ধৃতি, ক্ষমা, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য—এই পাঁচটি সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা অস্তেয় ও শৌচ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অস্তেয় সম্বন্ধে ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন, 'অস্তেয়ং প্রসিদ্ধং।' অর্থাৎ, অস্তেয় প্রসিদ্ধ—উহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। টীকাকার কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন, 'অন্যায়েন পরধনাদিগ্রহণং স্তেয়ং, তদ্‌ভিন্নম্ অস্তেয়ম্।' অর্থাৎ, অন্যায় করিয়া অপরের ধনাদি গ্রহণ করাকে 'স্তেয়' বলে, অস্তেয় উহার বিপরীত। 'চিরপ্রভা'কার লিখিয়াছেন, 'অস্তেয়ং পরধনেষু অনভিলাষঃ, অদত্তাগ্রহণং চ।' অর্থাৎ, অপরের ধনসম্পত্তিতে লোভরাহিত্য এবং অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করাই অস্তেয়।

'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়'—ইহা বালকবালিকারাও জানে। চুরি-না-করার—অচৌর্যের—অপর নাম যে 'অস্তেয়', ইহাও অনেকেই জানেন, কিন্তু অনেকে যাহা জানেন না, তাহা এই যে, অপরের ধনসম্পত্তি দেখিয়া মনেও যদি লোভের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে 'অস্তেয়'রূপ চিরকালের ধর্মটি পালিত হয় না 'যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্' গ্রন্থে আছে :

> কর্মণা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিঃস্পৃহা।
> অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ (১।৫৩)

অর্থাৎ, পরদ্রব্যে কায়মনোবাক্যে নিঃস্পৃহতাকেই ঋষিগণ 'অস্তেয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যেও আছে, 'স্তেয়ম্ অশাস্ত্রপূর্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্, তৎপ্রতিষেধঃ পুনরস্পৃহারূপম্ অস্তেয়মিতি।' (২।৩০)। অর্থাৎ, অশাস্ত্রীয় উপায়ে অপরের দ্রব্য গ্রহণ করার নাম 'স্তেয়'—অস্পৃহারূপ উহার প্রতিষেধই অস্তেয়। ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন যে, যাবতীয় কায়িক ও বাচনিক ব্যাপার মানসব্যাপারপূর্বকই হইয়া থাকে—মনই প্রধান, এই কারণে ভাষ্যকার অস্তেয়কে অস্পৃহারূপ মনোব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের নিরন্তর স্মরণমননের উপায় হিসাবে শ্রীসম্প্রদায়ের মধ্যে 'সাধনসপ্তকে'র প্রসিদ্ধি আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'ভক্তিরহস্যে'র প্রারম্ভেই এই সাধনসপ্তকের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এই সাধনসপ্তকের পঞ্চম সাধনটির নাম 'কল্যাণ'। 'কল্যাণে'র ব্যাখ্যায় আচার্য রামানুজ লিখিয়াছেন, 'সত্যার্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যা কল্যাণানি ইতি।' (শ্রীভাষ্য, ১।১।১)। অর্থাৎ, সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা—এইগুলিই 'কল্যাণ'। এই ছয়টি 'কল্যাণে'র মধ্যে 'অনভিধ্যা' শব্দটির একাধিক অর্থ দেখা যায়। স্বামীজীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'অনভিধ্যা—পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ।' বলা বাহুল্য, প্রথম অর্থটির দ্বারা 'অস্তেয়' লক্ষিত হইয়াছে।

টীকাভাষ্যকারগণ নানাভাবে 'অস্তেয়' শব্দটি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া উহার নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট

ঋণী। কিন্তু 'অস্তেয়' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে অচৌর্য। কারণ, শব্দটির একেবারে মূলে গেলে আমরা 'স্তেন' ধাতু[১] পাই, যাহার অর্থ চুরি করা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের একটি ঘটনা স্মরণীয়। দক্ষিণেশ্বরে একবার তাঁহার পা ফুলিতে থাকায় কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল তাঁহাকে লেবু খাইতে বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য যোগীন (পরবর্তী কালে স্বামী যোগানন্দ) ঐকথা শুনিয়া তাঁহার এক আত্মীয়ের বাগান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য প্রত্যহ দুইটি লেবু আনিয়া দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা গ্রহণ করিতেন। একদিন কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পরে জানা গেল, ঐ বাগানটির যাবতীয় ফলাদির স্বত্ব সেই দিন হইতেই অন্য এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ লেবু গ্রহণ করিলে সরাসরি না হইলেও প্রকারান্তরে চুরি করা হইত। কিন্তু 'জগদম্বার বালক'কে জগদম্বা স্বয়ং সর্বদা রক্ষা করিতেছেন। তাই অস্তেয়াদিব্রতের পরাকাষ্ঠা তাঁহার জীবনে আমরা লক্ষ্য করি। বস্তুতঃ শাস্ত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেই পাই। স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

'শৌচ' শব্দের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন, 'শৌচম্ আহারাদিশুদ্ধিঃ।' অর্থাৎ, শৌচের অর্থ আহারাদির শুদ্ধি। কুল্লূক ভট্টের মতে 'যথাশাস্ত্রং মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং শৌচম্।' অর্থাৎ, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা দেহকে শুদ্ধ করাই শৌচ। 'চিরপ্রভা'-কারের মতে 'শৌচং মৃদ্বারিশুদ্ধিঃ আহারশুদ্ধিশ্চ।' অর্থাৎ, শৌচ হইতেছে (১) মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা দেহশুদ্ধি এবং (২) আহারশুদ্ধি। দেখা যাইতেছে, 'চিরপ্রভা'কার মেধাতিথি ও কুল্লূক ভট্ট উভয়েরই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন আহারশুদ্ধি বলিতে কী বুঝায়? ছান্দোগ্য উপনিষদের 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ' ইত্যাদি বাক্যে (৭।২৬।২) আচার্য রামানুজ 'আহার' বলিতে 'ভোজন' বুঝিয়াছেন, আচার্য শংকর 'ভোজন' অর্থটি বাদ দেন নাই, কিন্তু ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যাহা-কিছু আহরণ করিতেছি, তাহাই 'আহার'। এইজন্য চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা শুদ্ধ-পবিত্র বিষয়ই গ্রহণ করা উচিত—অশুদ্ধ-অপবিত্র বিষয় নহে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'ভক্তিরহস্যে'র প্রারম্ভেই এই ব্যাখ্যাদ্বয়ের আলোচনা করিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, "স্বভাবতই আপনারা সকলে বলিবেন যে, শংকরাচার্যকৃত এই ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্ট। তাহা হইলেও বলিতেছি, রামানুজকৃত ব্যাখ্যাটিকে অবহেলা করিলে চলিবে না।...আমাদিগকে রামানুজের মত অনুসরণ করিয়া পানাহার সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে 'মানসিক আহার'-এর দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

'যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্' গ্রন্থেও বলা হইয়াছে :

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥
(১।৬৭)

—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শৌচ দুই প্রকার—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা দেহের শুদ্ধিকে বাহ্য শৌচ এবং মনঃশুদ্ধিকে আন্তর শৌচ বলে।

পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যেও দ্বিবিধ

১ স্তেনয়তি, স্তেনয়তে (চুরাদিগণীয় উভয়পদী, সকর্মক)। এই ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'স্তেন' হয়, যাহার অর্থ চোর। এই 'স্তেন' শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'স্তেয়' হয়। পাণিনির 'স্তেনাদ্ যৎ নলোপশ্চ' (৫।১।১২৫) সূত্রানুসারে নকারের লোপ হয়।

শৌচের কথা বলা হইয়াছে। মৃত্তিকা, জল ইত্যাদির দ্বারা এবং পবিত্র ভোজনের দ্বারা বাহ্য শৌচ অনুষ্ঠিত হয়; মৈত্রী, করুণা ইত্যাদি ভাবনার দ্বারা চিত্তমলের প্রক্ষালনই আভ্যন্তর শৌচ।

শৌচ দ্বিবিধ বলিয়া শৌচানুষ্ঠানের ফলের উল্লেখ করিতে যাইয়া মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে দুইটি সূত্র রচনা করিয়াছেন: (১) 'শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ' (২।৪০) এবং (২) 'সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্ম-দর্শনযোগ্যত্বানি চ' (২।৪১)। প্রথম সূত্রটির তাৎপর্য এই যে, বাহ্য শৌচ অভ্যাস করিতে করিতে বুঝা যায় যে, শরীর অশুচি বস্তু—হাজার শৌচের দ্বারাও উহাকে শুচি করা যায় না—এবং তখনই নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণা জন্মে; ফলে অপরের শরীরের সহিত সম্পৃক্ত হইতে ইচ্ছা হয় না। এইভাবে বাহ্য শৌচের অনুষ্ঠানে পরিণামে ব্রহ্মচর্যব্রত পালিত হয়।

দ্বিতীয় সূত্রটির তাৎপর্য এই যে, আন্তর শৌচ হইতে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হয় না; সত্ত্বগুণ সুখাত্মক বলিয়া মন সুপ্রসন্ন থাকে; চিত্তের একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয়জয় সাধিত হয় এবং সাধক আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ করেন।

গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে 'শৌচ' শব্দটি বারংবার ব্যবহৃত দেখা যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম হইতে একাদশ পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে কুড়িটি গুণের কথা বলা হইয়াছে, যেগুলি জ্ঞানের সাধন। উহাদের মধ্যে 'শৌচ' অন্যতম। ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে ছাব্বিশটি গুণের কথা বলা হইয়াছে, যেগুলিকে শ্রীভগবান 'দৈবী সম্পদ্' বলিয়াছেন। শৌচ উহাদেরও অন্যতম। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ আটটি শ্লোকে উত্তম ভক্তের বর্ণনা আছে। সেখানেও 'শুচিঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাভাষ্যকারগণ দ্বিবিধ শৌচের কথা বলিয়াছেন। ১৮।২৭ শ্লোকে 'অশুচিঃ' শব্দটি আছে। উহার ব্যাখ্যায়ও শংকরাচার্য বাহ্য ও আন্তর শৌচের উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে, 'লক্ষ্মীছাড়া'দের শৌচাদি গুণ থাকে না। (১।৯।১২৭)। মহর্ষি মনু নিজেই তাঁহার সংহিতায় বহু স্থলে—শুধু ষষ্ঠাধ্যায়ের ৯২তম শ্লোকে নহে—শৌচাদি ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। দশম অধ্যায়ের ৬৩তম শ্লোকটি সবিশেষ লক্ষণীয়:

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥

—অহিংসা, সত্য-কথন, অস্তেয়, শৌচ ও ইন্দ্রিয়-সংযম—সংক্ষেপে এই পাঁচটি চারিবর্ণের অনুষ্ঠেয় ধর্ম। এইভাবে মহর্ষি দশটি হইতে পাঁচটিতে নামিয়াছেন, যাহাতে দুর্বল মানুষ আরও সহজে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে।

শুচি-অশুচি—এটি ভক্তি-ভক্তের পক্ষে। জ্ঞানীর পক্ষে নয়। বিজয়ের শাশুড়ি বললে, 'কই আমার কি হয়েছে? এখনও সকলের খেতে পারি না!' আমি বললাম, সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয়? কুকুর যা তা খায়, তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী?

পূর্ণজ্ঞানীর···খাওয়া-দাওয়ার বিচার নাই—শুচি-অশুচির বিচার নাই। পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমূর্খ, দুজনেরই বাহিরের লক্ষণ এক রকম!

—শ্রীরামকৃষ্ণ

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

(ভাদ্র, ১৩৮৮ সংখ্যার পর)

ব্রহ্মের সপ্তম প্রধান গুণ : 'সৌন্দর্য'

ব্রহ্মের সপ্তম প্রধান গুণ 'সৌন্দর্যে'র প্রথম অংশ 'মাধুর্য' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মানবিক জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের 'মাধুর্য' সম্বন্ধে প্রারম্ভিক কিছু আলোচনা করা হয়েছে (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৮৮ সংখ্যায় । বর্তমানে, ঐশ্বরিক জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের 'মাধুর্যে'র বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা হচ্ছে ।

ঐশ্বরিক জ্ঞানের 'মাধুর্য'

মানবের ক্ষেত্রে যেরূপ, ঠিক সেরূপই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও 'জ্ঞান'ই সর্বপ্রথম বলেই গৃহীত হয়। কারণ, প্রথমে 'জ্ঞান' না থাকলে 'ভক্তি' ও 'কর্মে'র সম্ভাবনা কোথায় ? পূর্বে জানব, পরে ভক্তি করব ; পুনরায়, পূর্বে জানব, পরে কর্ম করব—এই ত অলঙ্ঘনীয় ক্রম। সেজন্য 'জ্ঞান' সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এবং জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদীদের মধ্যে এ নিয়ে বহু বিবাদ-বিসংবাদ হলেও 'জ্ঞান'ই যে সর্বপ্রথম, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অবশ্য 'পূর্ব-পর' এরূপ ক্রমের কোনরূপ প্রশ্নই নেই, যেহেতু তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-রূপ সকল কালাতীত ; এবং 'প্রধান-অপ্রধানে'রও কোনরূপ অবকাশ নেই, যেহেতু তিনি অল্প-বহু-রূপ সকল পরিমাণাতীত। তাহলেও মানবিক দিক থেকে তাঁকে বুঝবার সুবিধার জন্য ক্রমভেদ ও পরিমাণভেদ আমরা ক'রে থাকি, অন্যান্য বহুক্ষেত্রেই যেরূপ মানবের চক্ষু দিয়েই আমরা শ্রীভগবানকে দেখতে প্রচেষ্টা করি। সেজন্যই শ্রীভগবানের ক্ষেত্রেও 'জ্ঞান'কেই সর্বপ্রথম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সম্প্রদায়।

বস্তুতঃ আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমুখ ভগবদ্-বিষয়ক সকল গ্রন্থই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের 'জ্ঞানে'র উপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং বারংবার উদাত্ত কণ্ঠে সে-কথা ঘোষণা করেছেন। অমৃত-গ্রন্থ উপনিষদ্ থেকে সামান্য দু একটি উদ্ধৃতি :

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।১।৩)

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।'

'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩।৯।২৮।৭)

'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ।'

'স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানু-বিলীয়েত ন হাস্যোদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূত-মনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৪।১২)

'যেমন একটি সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হ'লে জলেই বিলীন হয়ে যায় ; তাকে আর পৃথক্ বলে গ্রহণ করা যায় না—যে কোন স্থল থেকে জল গ্রহণ করলে তা লবণময়ই বোধ হয়, তেমনি অয়ি! এই মহাভূত অনন্ত অপার ও বিজ্ঞানঘন।'

'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।' (ঐতরেয়োপনিষদ্, ৩।১।৩) 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞান।'

'স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪।৫।১৩)

'যেমন একটি সৈন্ধবখণ্ড অন্তররহিত, বাহ্যরহিত—কেবলমাত্র রসঘন, তেমনি অগ্নি! এই আত্মাও অন্তররহিত, বাহ্যরহিত—কেবলমাত্র প্রজ্ঞানঘন।'

এই যে জ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁর সেই 'জ্ঞান' বা 'বিজ্ঞান' বা 'প্রজ্ঞানে'র 'মাধুর্য' কি? আমাদের মানবীয় দিক থেকে তা হ'ল এই যে, তিনি 'সত্যস্বরূপ' শাশ্বতকাল। অর্থাৎ, আমাদের মানবিক ভাষায় তাঁর মধ্যে 'অজ্ঞান-অবিদ্যা' বিন্দুমাত্রও নেই, মুহূর্তমাত্রও নেই। এই 'অজ্ঞান-অবিদ্যা' সম্বন্ধে বিবিধ-বিচিত্র-বিস্তৃত আলোচনা-প্রপঞ্চনা, বাদানুবাদ, তর্ক-বিচারে সমগ্র বেদান্তদর্শনই—বিশেষ ক'রে অদ্বৈত-বেদান্তদর্শন—পরিপূর্ণ ও মুখরিত। সে-সবের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ নয়। তবে এ-সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা চলে যে, অদ্বৈতবেদান্তমতে 'অজ্ঞান-অবিদ্যা' প্রধানতঃ দু-প্রকারের—ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত (Individual and Universal ; Personal and Cosmic)। যেমন ধরুন, দশ ব্যক্তি একটি চলন্ত ট্রেনে চড়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন জানলা দিয়ে। তখন সকলেই একইভাবে স্বচক্ষেই দেখছেন যে, বাইরের দূরের পর্বতশ্রেণী প্রভৃতি ধীরে ধীরে তাঁদের সঙ্গেই চলেছে একই দিকে; এবং নিকটের টেলিগ্রাফ-পোস্ট প্রভৃতি দ্রুতবেগে তাঁদের সঙ্গে চলেছে বিপরীত দিকে। এটি একটি ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'Illusion'। এস্থলে এই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষটি সমষ্টিগত বা সার্বজনীন 'অজ্ঞান-অবিদ্যা'র ফলই মাত্র—এবং এক্ষেত্রে এরূপ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ যে সত্য নয়, এরূপ জ্ঞান সকলের থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই এরূপ দেখতে বাধ্য। পুনরায় ধরুন, ঐ দশজনের মধ্যে একজন হঠাৎ 'সাপ সাপ' ব'লে ভীষণ চিৎকার ক'রে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে উঠলেন। অন্যরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'আপনি সাপ কোথায় পেলেন এই চলন্ত ট্রেনে?' তখন সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'কেন, ঐ ত বেঞ্চের তলায় রয়েছে একটা প্রকাণ্ড সাপ—নিজেদের চক্ষেই দেখুন না কেন।' অন্যরা ত হেসে কুটপাট: 'কোথায় সাপ মশায়, ওটা ত একটা দড়িই মাত্র।' এই শুনে সেই ভদ্রলোক আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'যত সব বাজে কথা—স্পষ্ট দেখছি চোখে সাপ, আর আপনারা বলছেন কিনা দড়ি; আচ্ছা, দেখছি কেমন আপনাদের দড়ি'—ব'লে সাহস ক'রে কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখেই ত একাধারে অপ্রস্তুত ও আশ্বস্ত—'হ্যাঁ, দেখছি এখন সত্যই ত একটা দড়িই মাত্র—আঃ বাঁচলাম'—ইত্যাদি। এটি হ'ল ব্যক্তিগত বা একজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ; এবং সেই প্রত্যক্ষটি যে সত্য প্রত্যক্ষ, এরূপ বিশ্বাস থাকে।

অদ্বৈতবেদান্তবাদিগণের মতে সার্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হ'ল ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম; অর্থাৎ, মিথ্যা জগৎকে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করা অহরহ সমগ্র মানবজাতি মিলে একত্রে। পুনরায়, এরূপ সার্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের মধ্যে ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষও মধ্যে মধ্যে ঘটে—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম।

সে যাহোক, জ্ঞানস্বরূপ বিজ্ঞানস্বরূপ প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানের অনন্ত অসীম অপরিমেয় অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় 'মাধুর্য' হ'ল এই যে, তাঁর জ্ঞান কোনদিন এরূপ ব্যক্তিগত অথবা সার্বজনীন ভ্রান্তির কবলগ্রস্ত হয় না, হতে পারে না। ব্যক্তিগত অজ্ঞানকে 'অবিদ্যা' এবং সমষ্টিগত অজ্ঞানকে 'অজ্ঞান' বলা হয় অনেকক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের এরূপ ব্যক্তিগত 'অবিদ্যা' এবং সমষ্টিগত 'অজ্ঞান' কণামাত্রও নেই, নিমেষমাত্রও নেই, কোন অবস্থাতেই নেই, কোন

পরিবেশেও নেই।

এজন্য ব্রহ্ম 'সত্য'—চিরসত্য ;—কোনদিনও তাঁকে 'না' করা যাবে না—আর করলেই বা কি, তিনি কোনদিনও 'না' হবেন না, হতে পারেন না কোনক্রমেই ; তাহলে আমরাও ত 'না' হয়ে যাব নিমেষেই একই সঙ্গে, নয় কি? নিশ্চয়ই। কি গভীর আবেগের সঙ্গে, সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন তৈত্তিরীয়োপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষি বলছেন—

'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৭)

'তিনিই একমাত্র রসস্বরূপ। এই রসকে লাভ ক'রেই জীব আনন্দ লাভ করেন। কারণ, কেই বা প্রাণধারণ করতেন, কেই বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতেন, যদি এই আকাশে সেই আনন্দ না থাকত?'

সেজন্য জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম একই সঙ্গে সত্যস্বরূপ। যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন, সাধনা ও আরাধনা, সিদ্ধি ও ঋদ্ধি, তৃপ্তি ও পূর্তি—এক কথায়, ভারতাত্মার মূর্ত প্রতিচ্ছবি এই 'সত্য'—একাধারে তার মূল ও ফুল, ভিত্তি ও স্ফূর্তি, প্রারম্ভ ও পরিশেষ। সেজন্য ভারতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, ভারতীয় আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ, ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক 'ব্রহ্ম'কেও ভারতীয় মনীষা, ভারতীয় শুভবুদ্ধি, ভারতীয় প্রাজ্ঞদৃষ্টি দেখেছে আদ্যন্তকাল 'সত্য'রূপে :

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।১।৩)

'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত।'

'স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।৮।৭, ৬।৯।৪, ৬।১০।৩, ৬।১১।৩, ৬।১২।৩, ৬।১৩।৩, ৬।১৪।৩, ৬।১৫।৩, ৬।১৬।৩ ['স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং' ইত্যাদি]—সর্বসমেত ন বার)

'এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, তাই হ'ল সমগ্র জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো, তিনিই তুমি।'

'অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৮।৩।৪)

'আবার এই যে সম্যক্‌ভাবে প্রসাদযুক্ত বিদ্বান্, যিনি শরীর থেকে উত্থিত হয়ে পরমজ্যোতিসম্পন্ন হয়ে স্বরূপে প্রকাশিত হন—ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম—এই ব্রহ্মের নামই 'সত্য'—আচার্য এই কথা বললেন।'

'স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।১।২০)

'যেমন উর্ণনাভি নিজের দেহের তন্তু দ্বারা সর্বত্র গমন ও বিচরণ করে; যেমন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দিকে নির্গত হয়, তেমনি এই আত্মা থেকে সমুদায় প্রাণ বা ইন্দ্রিয়, সমুদায় লোক, সমুদায় দেবতা, সমুদায় ভূত নির্গত হয়। "স ত্যস্য সত্যম্" অথবা "সত্যের সত্য"—এই সেই আত্মার উপনিষৎ বা গুহ্য তত্ত্ব। প্রাণসমূহই সত্য, এবং এই আত্মা সেই সকল প্রাণের সত্য।'

'অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৩।৬)

'এর পরে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ এই : "এ নয়, এ নয়"। এঁর অপেক্ষা শ্রেয়ঃ অন্য কিছুই নেই ; এঁর অপেক্ষা অন্য কিছুই শ্রেয়ঃ নয়। অনন্তর "সত্যস্য সত্যম্"—"সত্যের সত্য", এই এঁর নাম। প্রাণসমূহই সত্য ; এবং তিনি সেই সকল প্রাণের সত্য।'

'সত্যং ব্রহ্মেতি। সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম ॥'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৫।৪।১)

'সত্যই ব্রহ্ম। একমাত্র সত্যই ব্রহ্ম ॥'

'এষ হি খল্বাত্মা, স সত্যম্।'

(মৈত্রী উপনিষদ্, ৬।৮, ৭।৭)

'ইনি হলেন আত্মা, তিনি সত্য।'

'ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম।'

(মহানারায়ণ উপনিষদ্, ১২।১ ; নৃসিংহ-পূর্বতাপনী উপনিষদ্, ১।৬)

'ব্রহ্ম কল্যাণ, সত্য ও শ্রেষ্ঠ।'

এখন 'সত্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিষয়ে সামান্য আলোচনা।

'তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি তদ্ যৎ সত্তদমৃতমথ যত্তি তন্মর্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৮।৩।৫)

'"সত্যম্" এই শব্দের তিনটি অক্ষর—সৎ, তী ও যম্ [ৎ ও ঈ উচ্চারণের জন্য : স+ত্+যম্=সত্যম্]। এই যে "সৎ" অক্ষর, তা অমৃত। আর যে "তি"="তী" অক্ষর, তা মর্ত্য। "যম্" অক্ষর এই উভয়কে—অর্থাৎ, "সৎ" এবং "তী", অমৃত ও মর্ত্যকে সংযমিত করে। যেহেতু এর দ্বারা এতদুভয়কে সংযমিত বা নিয়মিত করা হয়, সেজন্য এর নাম "যম্"। যিনি এরূপ জানেন, তিনি অহরহ স্বর্গলোকে গমন করেন।'

বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই অর্থটি আরও সুপরিস্ফুট করা হয়েছে—

'তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈনং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৫।৫।১)

'এই "সত্য" তিনটি অক্ষরযুক্ত—"স" একটি অক্ষর, "তী" (বা "ত্") একটি অক্ষর, এবং "যম্" (বা "য") একটি অক্ষর। প্রথম ও শেষ অক্ষর সত্য, এবং মধ্যবর্তী অক্ষর অসত্য। অতএব এই অসত্য ("ত্" অক্ষর) উভয় দিকে সত্য দ্বারা বেষ্টিত। সেজন্য, তা অসত্য হলেও সত্যভাব প্রাপ্ত হয়েছে। যিনি এরূপ জানেন, অসত্য তাঁকে হিংসা করতে পারে না।'

তৈত্তিরীয়োপনিষদের মতবাদ হ'ল এরূপ—

'সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৬)

'তিনি বা পরমাত্মা ইচ্ছা করলেন—আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব। তিনি তপস্যা করলেন অথবা সৃজ্যমান জগৎরচনাদি বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি তপস্যা ক'রে এই যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করলেন। তা সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যেই অনুপ্রবেশ করলেন। তাতে অনুপ্রবেশ ক'রে তিনি "সৎ" ও "ত্যৎ" বা মূর্ত ও অমূর্ত বচনীয় ও অনির্বচনীয় বা সবিশেষ ও নির্বিশেষ, পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য—এই যা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই হলেন। এইজন্যই

তাঁকে বা ব্রহ্মকে "সত্য" বলা হয়।'

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন উপনিষদের মন্ত্র থেকেই 'সত্য'রূপী ব্রহ্মের জ্ঞানের 'মাধুর্য' সুন্দরভাবে প্রকটিত হয়।

প্রথমতঃ এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম 'সত্য'রূপে অজ্ঞান-অবিদ্যা-কলঙ্কমুক্তরূপে, শুদ্ধ ও পাপলেশশূন্যরূপে ['শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' (ঈশোপনিষদ্, ৮)] যে কেবলমাত্র স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ['স্বে মহিম্নি' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৭।২৪।১), 'স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি' (মৈত্রী উপনিষদ্, ২।৪, ৬।৮)] বিরাজ করছেন স্বীয় সু-উচ্চ ব্রহ্মলোকে, স্বীয় অমল-অভয়-অশোক-অজর-অমর-অরুণ হীরক-সিংহাসনে, স্বীয় ব্রহ্মানন্দে দিব্যানন্দে আত্মানন্দে ভূমানন্দে পূর্ণানন্দে বিভোর হয়ে, তা একেবারেই নয়। উপরন্তু, অনন্ত-অচিন্ত্য-জ্ঞানঘন হয়েও, পরিপূর্ণ সত্যরূপ হয়েও, তিনি তথাকথিত অজ্ঞানান্ধকারান্ধ, মিথ্যা-অনিত্য-অশুদ্ধ-অসুখী পৃথিবীতে নেমে এসেছেন সানুগ্রহে সাগ্রহে সানন্দে সাদরে তার প্রাণের প্রাণ, সত্যের সত্য হয়ে। সেজন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড 'সত্য', ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ 'সত্যের সত্য'। এস্থলে, বলদেবের ন্যায় পরিণাম-বাদী, জগৎসত্যত্ববাদী বৈদান্তিকদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপেই বেদোপনিষদসম্মত। কারণ, এস্থলে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, 'প্রাণ' অথবা প্রাণমূলক জগৎ 'সত্য', এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্ম সেই 'সত্যের সত্য' বা জগতের 'সত্য' বা ভিত্তি, মূল, প্রাণ, জীবন, আত্মা।

দ্বিতীয়তঃ 'সত্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, 'সত্য' বা ব্রহ্ম অমৃত ও মর্ত্য, ব্রহ্মধাম ও মর্ত্যভূমি, শিব ও জীবের সমন্বয়স্থল। এস্থলেও দুদিকে বিরাজিত দুটি সত্য—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, মধ্যে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধসূত্র। এই সম্বন্ধসূত্রটিকে অবশ্য বলা হয়েছে 'অসত্য' [বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, (৫।৫।১)]। তার কারণ হয়ত এই যে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রানু-সারে 'সম্বন্ধে'র কোন স্থির ভিত্তি নেই, সুষ্ঠু ফলও নেই। 'সম্বন্ধে'র কার্য হচ্ছে, দুটি সম্বন্ধহীন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে একটি সুদৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত করা। কিন্তু তা করতে কোনদিনও পারে না—ন্যায়ের কবলগ্রস্ত হয়ে। যেমন, 'ক' ও 'খ'য়ের মধ্যে সম্বন্ধ 'গ' একটি সুন্দর সম্বন্ধ স্থাপিত ক'রে দেবে এই ত তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। কিন্তু তা আর কি ক'রে হবে শেষ পর্যন্ত ? কারণ, 'ক'র সঙ্গে ও 'খ'রও সঙ্গে 'গ' পূর্বে নিজে সম্বন্ধ স্থাপন করবে, তবেই ত তা 'ক' ও 'খ'র মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু 'ক'র সঙ্গে 'গ'র সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলে আরেকটি সম্বন্ধ 'ঘ' লাগবে, তার জন্য আবার আরেকটি সম্বন্ধ 'ঙ' লাগবে—এইভাবে সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ বেড়েই যাবে, শেষ পর্যন্ত ফল কিছুই হবে না, কোন সম্বন্ধই স্থাপিত হবে না, কেবল হবে 'অনবস্থা' দোষের (Infinite Regress) উদ্ভব ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের দিক থেকে। ব্রহ্মসূত্রে ন্যায়-দর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনপ্রসঙ্গে, ঠিক এই অসুবিধার কথাই বলা হয়েছে সজোরে 'সমবায়' পদার্থপ্রসঙ্গে—

'সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।'

(ব্রহ্মসূত্র, ২।২।১৩)

ন্যায়বৈশেষিক-দর্শনশাস্ত্রানুসারে দুটি পরমাণু 'সমবায়' সম্বন্ধের দ্বারা যুক্ত হলে একটি 'দ্ব্যণুক' সৃষ্টি হয়। তিনটি দ্ব্যণুকে হয় একটি 'ত্র্যণুক' বা 'ত্রসরেণু', চারটি ত্র্যণুকে একটি 'চতুরণুক'; পাঁচটি চতুরণুকে একটি 'পঞ্চাণুক'; ছটি পঞ্চাণুকে একটি 'ষড়ণুক'। (এটি প্রচলিত বৈশেষিক মত; মতান্তরও আছে।) এই ক্রমানুসারে পঞ্চভূত ও স্থূল দ্রব্যাদি সৃষ্ট হয়। এস্থলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'সমবায়' সম্বন্ধের প্রয়োজন ব'লে বৈদান্তিকদের মতে

কারো মধ্যেই, পূর্বোক্ত অসুবিধাহেতু সম্বন্ধ স্থাপিতই হয় না শেষপর্যন্ত— এবং সেজন্য ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনশাস্ত্রানুসারী সৃষ্টিতত্ত্ব অসম্ভব ও অলীক।

সেজন্যই 'সম্বন্ধ'-তত্ত্বপ্রসঙ্গে ইউরোপীয় ন্যায়-শাস্ত্রে বলা হয়েছে উপহাসভরে—'A relation never relates.'—'সম্বন্ধ কখনই সম্বন্ধস্থাপন করে না।'

সে যাহোক, এক্ষেত্রে একদিকে ব্রহ্ম সত্য, অন্যদিকে ব্রহ্মাণ্ডও সত্য, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে নৈয়ায়িকেরা পারুন আর নাই পারুন —উভয়ে অংশি-অংশরূপে, দ্রব্য-গুণরূপে, শক্তিমান-শক্তিরূপে আত্যন্ত অচ্ছেদ্য প্রাণের বন্ধনে আবদ্ধ— এর আর ব্যত্যয় ঘটবে কিরূপে কেবল ন্যায়ের কচকচি দিয়ে ?

সুতরাং, জ্ঞানঘন, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানের 'মাধুর্যে'র কি আর তুলনা আছে ? সে 'মাধুর্য' নিজে জ্ঞানলাভ ক'রে অন্যকে জ্ঞানদানের 'মাধুর্য'; নিজে নিষ্কলঙ্ক হয়ে অন্যকে নিষ্কলঙ্ক করার 'মাধুর্য'; নিজে পূর্ণ হয়ে অন্যকে পূর্ণ করার 'মাধুর্য'—কি অপূর্ব এই অবস্থা !

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥'
(মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।১।৬

'কেবল সত্যেরই হয় জয়।
মিথ্যার নয় কোনদিন ॥
কেবল সত্যেরই দ্বারা হয় বিস্তৃত।
'দেবযান'-পন্থা সুকঠিন ॥
যে পথ দ্বারা অবিরত
আপ্তকাম ঋষিগণ।
সত্য ব্রহ্মের পরমধামে
করেন অনায়াসে গমন [ক্রমশঃ]

বিবেকানন্দের গদ্যশিল্প

ডক্টর উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চোখে একই সঙ্গে চিন্তানায়ক ও কর্মযোগী। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝতে পারি, চিন্তার সঙ্গে কর্মকে মেলানো কত দুঃসাধ্য। আর বুঝতে পারি বলেই অবাক্ হই যখন কোনো মানুষের জীবনে চিন্তা-কর্মের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখি। লেখক, শিল্পীদের দায়িত্ব চিন্তাকে ভাষায়, ছবিতে, মূর্তিতে রূপ দেওয়া। আর যিনি চিন্তানায়ক ও কর্মী তাঁর কাছে চিন্তাই হলো সৃষ্টির আবেগ আর কর্ম হলো একাধারে ভাষা, ছবি ও মূর্তি। অর্থাৎ, কর্মই তাঁর শিল্প। বিবেকানন্দ এমন একজন চিন্তানায়ক কর্মই যাঁর কাছে শিল্প—বুদ্ধ, কবীর, চৈতন্য, রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের মতোই তিনি একাধারে চিন্তা ও কর্মের পরিচালক। হয়তো শিল্পী ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর খানিকটা তুলনা চলে। কাজেই আমাদের দেশে বিবেকানন্দ অদ্বিতীয় না হতে পারেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট।

এই বিশিষ্টতা তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্যের ধ্যানে ও ব্যাখ্যায় এবং সমকালীন লোকজীবন-জাগরণের প্রেরণাদানে ও সংগঠনক্ষমতায়। তাঁর গদ্যশিল্পেও দেখি তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার দুটি রূপ। একদিকে 'বর্তমান ভারতে'র বিবেকানন্দ, অন্যদিকে 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও পত্রাবলীর বিবেকানন্দ। 'বর্তমান ভারতে'র

গদ্যরীতি সাধু, গম্ভীর নির্ঘোষে ছুটে চলেছে, কখনো ছোট ছোট বাক্যের নুড়িপাথর ঠেলে, কখনো বিরাট অধিত্যকার কিংবা অববাহিকার ব্যাপ্তি নিয়ে। অন্যদিকে 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও পত্রাবলীর বিবেকানন্দের গদ্যরীতি বিশুদ্ধ মুখের বুলিতে কখনো তীব্র ও ক্ষুরধার, কখনো হাস্যোচ্ছল। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' ছাড়া সমকালীন কোনো লেখকের চলতিরীতি 'স্ট্যাণ্ডার্ড কলোকিয়ালে'র এতটা কাছাকাছি আসতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। কিন্তু একটা লক্ষণীয় ব্যাপারের কথা এখানে বলে নিই। 'গদ্যশিল্প' কথাটা তাঁর রচনার সম্পর্কে ব্যবহার করছি বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি সাহিত্যচর্চা করতে আসেন নি, অন্যান্য বাঙালী লেখকের মতো অপরিণত গদ্যে রচনা শুরু করে ধীরে ধীরে গদ্যচর্চায় পরিণতি আনবার চেষ্টাও করেন নি। উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিতে মাত্র কয়েকটি বছর নিজের মনের চিন্তা-ভাবনা অভিজ্ঞতাকে শিষ্য ও সতীর্থদের কাছে জানাবার জন্যে বা বুঝিয়ে দেবার জন্যে চারটি মাত্র বই তিনি লিখেছেন, কিংবা চিঠিপত্রেও সে-সব ভাবনা-চিন্তার কথা বলে গেছেন। উদ্বোধন পত্রিকার ১৩০৫ সালের প্রথম সংখ্যা থেকে তিন বছরের মধ্যে 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ 'বর্তমান ভারতে'র লেখাগুলির সাধুরীতি এবং অন্য তিনটি বইএর দ্রুতগতির চলতিরীতি একই সঙ্গে ধারাবাহিক চলেছে। সমকালীন আর একজন লেখক, অবনীন্দ্রনাথ—তিনি চিত্রশিল্পী ছাড়াও গদ্যশিল্পী—তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলিতে—বিশেষ করে 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুলে' কথকতার ভঙ্গিকেই এক আশ্চর্য চলতি রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও 'রাজকাহিনী', 'নালক', 'ভূতপত্রীর দেশ' ইত্যাদি বইগুলিতে চলতিরীতিকে রীতিমতো নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠা দেবার আগে মাঝে মাঝে 'দেবীপ্রতিমা' কিংবা 'পথে বিপথে'র অন্তর্ভুক্ত 'গমনাগমন'-এর মতো রচনায় সাধুরীতি প্রয়োগ করেছেন। বিবেকানন্দের এই সব রচনার প্রায় তেরো-চোদ্দ বছর বাদে যে প্রমথ চৌধুরী চলতিরীতিকে সাহিত্যের বাহন করে 'সবুজপত্রে'র যৌবনিশান ওড়ালেন তিনিও স্বামীজীর বাঙলাচর্চার কালে সাধুভাষাতেই লেখা শুরু করেন। অর্থাৎ, এই সময়টিতে—গত শতকের শেষ দশক থেকে এই শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত—প্রায় কুড়ি বছর বাঙলা গদ্যচর্চায় সাধু ও চলতির সমান্তরাল ধারা চলেছে। অবনীন্দ্রনাথের মতো কেউ কেউ চলতিতে শুরু করে মাঝে মাঝে সাধুরূপে সরে এসে আবার চলতিতে ফিরে গেছেন, প্রমথ চৌধুরীর মতো লেখক সাধু থেকে চলতিতে বিবর্তিত হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, বিবেকানন্দ সাধু ও চলতি দুটি রূপেই সমান্তরালভাবে একই পত্রিকায় লিখছেন, রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলীতে স্ট্যাণ্ডার্ড চলতি ভাষাকে পেয়ে গেলেও (প্রমথ চৌধুরীও এই মান স্পর্শ করেছেন—সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত শ্রী ইন্দিরাদেবীকে লেখা তাঁর পত্রগুচ্ছই তার প্রমাণ) 'জীবনস্মৃতি' ও 'চতুরঙ্গ'—এই দুটিতে তিনি সাধুরীতির আলখাল্লায় চলতিরীতির তাপ্পি দিয়েছেন অসাধারণ শিল্পকৌশলে—সংস্কৃত-সাহিত্যের শেষ যুগের কবিদের চলতি প্রাকৃত ভাবভঙ্গি নেবার মতো তাঁর সাধুগদ্য সাধুচাল ছেড়ে চলতির সমস্ত প্রাণশক্তিকে আত্মসাৎ করে বাঁচতে চাইছে শেষবারের মতো। অন্যদিকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আমাদের দেশের মৌখিক লোককথা রূপকথাকে অবিস্মরণীয় ভঙ্গিতে ধরে রাখতে শুরু করেছেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে

(১৩১৪)। মুখের কথায় চলতিভঙ্গিতেই তিনি এইসব 'চিরকালের গল্প'কে লিখে রেখেছেন, কিন্তু লিখতে গিয়ে চলতিরীতির দ্রুত চাল এনেও ক্রিয়ার সাধুরূপকে বর্জন করতে পারেন নি। কাজেই বুঝতেই পারা যায়, চলতির অবধারিত আক্রমণে সাধুও দ্রুত চলতে শুরু করেছে, কিন্তু লেখক ও পাঠক দুপক্ষই তখন বলছেন, চলতি-রীতি চিঠিপত্র, ডায়ারি, ভ্রমণকাহিনী কিংবা বড়জোর গল্প-উপন্যাসে যতটা স্বাভাবিকভাবে মানিয়ে যায়, গুরুগম্ভীর চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ততটাই বেখাপ্পা লাগে। চলতিভাষার সম্পর্কে এ অভিযোগ সাম্প্রতিক কালেও শুনতে পাই, আধুনিক চলতিরীতির পরিপ্রেক্ষিতে সাধুগদ্যের দক্ষশিল্পীদের সম্পর্কে একটু প্রাচীন পাঠক ও সমালোচকদের এখনও আপসোস শুনি, এ জিনিস সাধুভাষাতেই সম্ভব ছিল, চলতিরীতিতে সম্ভব নয়।

কিন্তু আমার মনে হয়, দক্ষশিল্পীর হাতে ভাষা ও ভাব একাত্ম হয়ে যায় বলেই এমন ভ্রম ঘটে যে বিশেষ প্রকাশরীতি অনিবার্য মনে হতে থাকে। সাধুভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্যের যদি কোনো নমুনা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ, অবনীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে তুলে আনি তখন যেমন মনে হবে সে নমুনা সাধুভাষাতেই সম্ভব, তেমনি অবনীন্দ্র-নাথ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বিনয়কুমার সরকার কিংবা সৈয়দ মুজতবা আলির চলতিভাষার রচনারীতি থেকেও অনুরূপ নমুনা তুলে প্রমাণ করে দেওয়া যায় চলতিরীতির দ্রুতগামিতা, বিচিত্রগামিতা কিংবা অন্তরঙ্গতা সাধুভাষায় আনা যায় না। আসলে দক্ষশিল্পী প্রকাশের মাধ্যমকে অনিবার্য কিংবা অপরিহার্য করে তোলেন তাঁদের শব্দনির্বাচন, বাক্যগঠন কিংবা অনুভূতিপ্রকাশের তাড়নায়। উদাহরণ-স্বরূপ বিবেকানন্দের দু-রীতির গদ্য থেকেই কিছুটা উদ্ধার করছি।

প্রথমে 'বর্তমান ভারত' বইটির শেষ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ—যা সকলেরই পরিচিত :

> হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ে'র জন্য বলিপ্রদত্ত;

এই সাধুগদ্যের পাশাপাশি রাখছি 'পরিব্রাজক' বইটির 'ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' পরিচ্ছেদের কিছু অংশ :

> তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না;

এরা রক্ত-বীজের প্রাণসম্পন্ন।

এই দুটি গদ্যাংশের রূপ সাধু না চলতি—কে মনে রাখে? আসলে গণ-আহ্বানের এই তীব্রতা, এই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও আপামর-সহানুভূতি, আদর্শজনিত আবেগ ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি তীক্ষ্ণ দরদ কোনো সমাজতান্ত্রিক দর্শন পড়ে আসে নি, পড়া, শোনা এবং প্রত্যক্ষ দেখা এই তিনে মিলে এক প্রচণ্ড আবেগ টেনে এনেছে ভাষাকে।—কেউ যদি প্রথম উদাহরণটি পড়ে বলে সাধুভাষাতেই এমন সম্ভব তা তৎক্ষণাৎ মিথ্যা প্রমাণ করে দেবে দ্বিতীয় উদাহরণটি। দ্বিতীয় উদাহরণটি পড়ে যদি কেউ বলে চলতি-রীতিতেই এমন প্রচণ্ড আহ্বান সম্ভব সে ধারণাও নস্যাৎ করে দেবে প্রথম উদাহরণটি। সাধুভাষার পাশাপাশি চলতিরীতি সে সময়ে চিঠিপত্র ডায়ারি ও লিখিত সংলাপে আসতে শুরু করেছে এবং সাধুভাষা সেই মৌখিক রীতির সংক্ষিপ্ত স্বাভাবিক রূপটি অগ্রাহ্য করতে পারছে না। কাজেই যে বিষয়ের আবেগ গদ্যের সাধু-রীতিকে টেনে আনছে তা সাধুরূপেই লেখা হচ্ছে, চলতিরীতিকে টেনে আনলে চলতিরূপেই লেখা হচ্ছে। আবার সাধুই হোক বা চলতিই হোক—প্রয়োজনমতো দু-রীতিরই মিশ্রণ ঘটিয়ে ভাষায় প্রাণের স্পর্শ আনা হচ্ছে। এই মিশ্র প্রাণিত ভাষার উদাহরণ হিসেবে বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজকে'র একটি অংশ উদ্ধার করছি :

> অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি —ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।

কঙ্কালচয়, রত্নপেটিকা, কোটিজীমূতস্যন্দী, ত্রৈলোক্যকম্প কারী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সামনে, মানিকের আংটি, হাওয়া, ফেলে দাও, হয়ে যাও, কান খাড়া রেখো ইত্যাদি চলতিশব্দ ও ক্রিয়া এবং অন্য প্রাদেশিক বাক্যবন্ধ মিলে-মিশে একাধারে ত্যাগ ও সিদ্ধির জন্যে ব্যাকুল আহ্বানের আবেগটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে সঞ্চার করা হয়েছে।

২

'বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দের সাধুগদ্য দু-রকম গতিতে চলেছে। এক, সংস্কৃতশব্দবহুল দীর্ঘসমাসবদ্ধ বিলম্বিত গড়ানো গদ্য। দুই, ছোট ছোট সংস্কৃতশব্দপ্রধান বাক্য। প্রথম ভঙ্গিটি পরিবেশ-বর্ণনা বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ভঙ্গিটি বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই এসেছে। প্রথম ভঙ্গিটির উদাহরণ দিচ্ছি 'বৌদ্ধ-বিপ্লব ও তাহার ফল' নামের পরিচ্ছেদ থেকে :

> পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎকাষণ, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্যে ক্ষয়িতবীর্য এ নূতন শক্তিসঙ্গম নানাভাবে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল, শোণিত-শোষণ, বৈর-নির্যাতন, ধন-হরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া, পূর্ব রাজন্যবর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাতমাত্র করিয়া, ভাটচারণাদি-চাটুকার-শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগ্-জাল-জড়িত হইয়া পশ্চিমদেশাগত মুসলমান ব্যাধনিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।

দ্বিতীয় ভঙ্গিটির উদাহরণ দিচ্ছি 'শূদ্রের জাগরণ' পরিচ্ছেদ থেকে :

> স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক।

ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব।

এই রকম সামান্য অংশ তুলে সাধারণ মন্তব্য করা বিপদ্জনক। তবু বলছি, সাধারণভাবে একথাই সত্য যে, যেখানে পটভূমি, পরিবেশ ও অতীতের দিকে পাদপ্রদীপের মতো আলো ফেলছেন বিবেকানন্দ কিংবা তুলির একটানে কোনো বড় ছবিকে—সে ছবি অতীতের হোক বা বর্তমানের দুরবস্থার বৈষম্যজনিত যন্ত্রণাদায়ক প্রকাশই হোক—বিবেকানন্দ সংহত করছেন, সেখানেই কমা-সেমিকোলনের ধাপে এক একটা গোটা বাক্য অসম্ভব দীর্ঘ হলেও সমান ঋজুতায় বেরিয়ে এসেছে। এ সাধুরূপ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র মতো আঞ্চলিক স্ল্যাং-এ ভরা দ্রুত ধাবমান চলতিরীতির মধ্যেও মাঝে মাঝে এসেছে। সেখানে—অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদটাই চলতিরূপের, কিংবা ক্রিয়াপদ নেই। গোটা অংশটাকেই সাধুগদ্যের নমুনা হিসেবে ধরা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইএর সূচনার পাঁচটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা চলে। সেখানে বর্তমান ভারত, আমাদের জন্মভূমি, ইউরোপী পর্যটক, ইংরেজ রাজপুরুষ, এবং ভারতবাসীর চোখে ভারতবর্ষকে তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র মাতৃরূপের ত্রিমাত্রিক বর্ণনার পর তুলির এক-এক আঁচড়ে এমন পাঁচটি ছবির পঞ্চমাত্রিক বর্ণনা আমরা বাঙলাসাহিত্যে পাই নি। যতদূর মনে পড়ে, স্বদেশীযুগের লেখা রবীন্দ্রনাথের উজ্জীবিত গদ্যের মধ্যেও তুলির এক-এক টানে এমন সমন্বিত বহুমাত্রিক ছবি আমরা পাই নি।

তেমনি ছোট ছোট বাক্যের সিদ্ধান্ত—বা পর্যবেক্ষণ-মূলক সাধুগদ্যের এমন আত্মরূপও খুঁজতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সংকটকালীন সংলাপে কিংবা প্রবন্ধাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মধ্যেই খুঁজতে হয়। কিন্তু কী দীর্ঘ বাক্য কী ছোট বাক্য—সর্বত্রই পরিচ্ছন্ন শ্বাসপর্বে এমন স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতা আছে যা আবার বিদ্যাসাগরের common style-এর কথাই মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ, বিদ্যাসাগরের পরিচ্ছন্ন ঋজু গদ্যরীতির ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্কিমী ছোট-বড়ো বাক্যভঙ্গিকে বিবেকানন্দ অসাধারণ আত্মবিশ্বাসে আয়ত্ত করেছেন। যাকে আমরা বাঙলায় আদর্শ গদ্য বলি, যে গদ্যের লেখক ছন্দস্পন্দনে সজাগ শ্রুতিক্ষমতার পরিচয় দেন, নির্দিষ্ট ভাবপ্রকাশক শব্দগুচ্ছে বা phrasing-এর ক্ষেত্রে সাধারণ অমনস্ক লেখকের তুলনায় যে লেখক অনেক বেশি মনোযোগ ও উদ্ভাবন-শক্তির পরিচয় দেন, শব্দনির্বাচনে যিনি সতর্ক ও বৈজ্ঞানিক যথার্থতার পরিচয় দেন এবং বাক্যগঠনে যিনি ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে ছন্দ-স্পন্দের ও শব্দবিন্যাসের বদল ঘটিয়ে বৈচিত্র্য ঘটাতে পারেন সেই লেখকই common style-এর লেখক। 'বর্তমান ভারতে'র বিবেকানন্দ এই রকম সতর্ক মনোযোগী শব্দবিন্যাসদক্ষ, স্পন্দমান আকর্ষণীয় গদ্যের লেখক, বিদ্যাসাগর যে গদ্যের জনক, বঙ্কিমচন্দ্র যে গদ্যে নানা স্পন্দন-বৈচিত্র্য ঘটিয়ে প্রয়োজনমতো ছোট-বড়ো বাক্যব্যবহারে অত্যন্ত পারদর্শী। কেবল নিজস্ব আত্মবিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যটুকু ছাড়া 'বর্তমান ভারতে'র গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ মোটামুটি এই কমন স্টাইলেরই অনুসারী। একমাত্র 'স্বদেশমন্ত্র' অনুচ্ছেদের স্বকীয় উদ্দীপনটুকু ছাড়া এ গদ্যে বিবেকানন্দ ততটা individual নন।

৩

চলতিরীতিতে লেখা বিবেকানন্দের তিনটি বই

আছে : 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'ভাববার কথা'র কিছু রচনা। এ ছাড়া আছে বেশ কিছু চিঠিপত্র। উনিশ শতকের কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার ভাবের আদান-প্রদানে কলকাতা-অঞ্চলের এই বিশেষ কথ্যরূপ প্রাধান্য পায়। এই 'কলকাতাই বুলি' সমকালীন সাময়িক পত্রে, সমাজচিত্রে, প্রহসনে, নাটকে প্রথমে প্রকাশ পেতে শুরু করে। প্রহসন-নাটকে এই কলকাতার বুলি প্রায় crude ভাবেই প্রকাশ পেতে থাকে; উপন্যাস-গল্পে বোধহয় একটু মাজিত রূপেই প্রকাশ পেতে থাকে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' এই মার্জনা-অমার্জনার মিশ্ররূপের পরিচয় পাই। সমাজচিত্রমূলক কাহিনী বলেই হালকা ভঙ্গি আনতে গিয়ে কলকাতার আশেপাশের চলতি-বুলিকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কলকাতাই সর্বনাম-ক্রিয়াপদ এসেছে, কিন্তু সাধু-চলতি ক্রিয়াপদের মিশ্রণ ঘটেছে। সংলাপে সাধারণ লোকের মৌখিক রীতি এসে গেছে। অর্থাৎ, আদর্শ ব্যবহারযোগ্য চলতি-ভাষা তখনও সাহিত্যপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে নি। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'তে নক্‌শার জন্যেই কলকাতাই বুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু মননশীল রচনায় তিনি গম্ভীর রীতির সাধুভাষারই আশ্রয় নিয়েছেন। নক্‌শার মধ্যে কলকাতার পথচলতি মানুষের অমার্জিত কথা এমনকি বহু অশ্লীল শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু হুতোমের ভাষা সাহিত্যের বিশেষ রূপের ভাষারীতি, আদর্শ বাহন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও এই মত পোষণ করতেন। অতিরিক্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা কিংবা অমার্জিত টেকচাঁদি বা হুতোমি কোনোটাই তিনি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চান নি। তিনি কেবল প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে ভাষার সরলতা, স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য এই তিনটি গুণের কথা বলেছেন। এবং প্রয়োজন হলে যে 'অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না' এ কথাও বলেছেন। ভাবপ্রকাশে ইংরেজি, ফার্সী, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাকেই নিতে হবে। একেই তিনি উৎকৃষ্ট রীতি বলেছেন অর্থাৎ, ভাবপ্রকাশে ভাষার আত্মসাৎ-ক্ষমতার ওপরেই জোর দিয়েছেন, কোনো সংস্কারকেই তিনি স্থান দিতে চান নি। ক্রিয়াপদে চলতিরূপ তিনি আনেন নি বটে কিন্তু চলতিরীতিতে লভ্য সবরকম গ্রহণক্ষমতার পক্ষেই তিনি রায় দিয়ে বলেছেন 'ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গত শতকের সত্তরের দশকের শেষদিকে (১২৮৫ অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৭৮-৭৯ সাল নাগাত) বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের পর প্রায় বাইশ বছর কেটেছে যখন বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ১৯০০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লিখে 'বাঙ্গালা ভাষা'র সম্ভাব্য রূপ নিয়ে চিন্তা করছেন।* চিন্তার রূপটা পালটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কার বর্জন করেছিলেন; কিন্তু কী ভিত্তিতে আদর্শ লিখিত ভাষা গড়ে উঠবে তার কোনো ইশারা দেন নি। বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেই যেন ভাষার গ্রহণক্ষমতার ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত হতে বললেন: 'ভাষাকে করতে

---

* এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৬ সালের বৈশাখমাসের সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে চলতি-ভাষার সমর্থন করে যে মন্তব্য করেন সেই ভাষণের সমর্থনসূচক মন্তব্য পাওয়া যায়, উদ্বোধন পত্রিকার ১৩০৬ সালের পৌষ সংখ্যায়। বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি খুব সম্ভব এই সূত্রেই লেখা। দ্রষ্টব্য: বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য। প্রণবরঞ্জন ঘোষ। তৃতীয় সং। পৃষ্ঠা ২৮৪; ৪১৪-৪১৫।

হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছা কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-ব্যবহারের কোন্ রূপটিকে ভিত্তি করতে হবে তাও বলে দিলেন যা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিতে পাই না। বললেন, 'চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? …ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ‥বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।' যতদূর মনে হয়, বিবেকানন্দ যখন এই কথা বলছেন তখন চিঠিপত্র, ডায়ারি ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে চলতি-রীতির ব্যবহার রীতিমতো চালু হয়ে গেলেও সব বিষয়ে চলতিরীতির প্রয়োগকে আর কোনো লেখক এমন প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করেন নি। ঐ লেখাটির মধ্যেই বিবেকানন্দ বলছেন: 'যে ভাষায় ঘরের কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?…স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে।' পরে, প্রায় চোদ্দ বছর বাদে প্রমথ চৌধুরী বিবেকানন্দের সেই 'কলকেতা'র ভাষাকে একটু বেশি মাজিত করে লেখার মান হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে সহযোগী সমর্থক হিসেবে পেয়ে গেলেন। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র'কেই (১৩২১ চলতিভাষা ব্যবহারের বাহন করলেও এর অন্ততঃ দশ বছর আগে থেকেই তিনি চলতিভাষায় প্রবন্ধ লিখছেন এবং তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের দু-একটি 'কথার কথা' এবং 'আমরা ও তোমরা' ভারতী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ, ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এবং 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধটিও সবুজপত্র প্রকাশের আগেই ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে (চৈত্র, ১৩১৯)। আর 'বঙ্গভাষা বনাম বাবুবাংলা ওরফে সাধুভাষা' নামের প্রবন্ধটিও একটু আগে (পৌষ মাসে) বেরিয়েছে। এই প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে প্রমথ চৌধুরী বলছেন, 'আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে।' অর্থাৎ ১৩০৭ সালে বিবেকানন্দ সাহিত্যের ভাষা হিসেবে 'কলকেতার ভাষা'র হয়ে যে ওকালতি করেছিলেন এ তারই পুনরাবৃত্তি। এমন কি ওই লেখাটিতে সাধুভাষার বিরুদ্ধে তাঁর যে আক্রমণ: 'আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে।'—সেই একই আক্রমণাত্মক ভাষাও বারো বছর বাদে প্রমথ চৌধুরী ব্যবহার করেছেন। তিনি বলছেন, 'বাংলা সাহিত্যের সাধারণ লেখকের গদ্য গদাই-লস্কর ভাবে চলে, এবং কুলেখকদের হাতের লেখা একটা জড়পদার্থের স্তূপমাত্র হয়ে থাকে।' কিন্তু বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ একবারও তোলেন নি। এই কারণেই মনে হয়, বাঙলাগদ্যের চলতিরীতির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনাগুলি একটু উপেক্ষিতই হয়েছে যেহেতু তিনি পেশাদারী লেখক ছিলেন না এবং চিঠিপত্র বাদ দিলে ১৩০৫ থেকে ১৩০৮—এই চার বছর তিনি বাঙলাভাষায় চচা

করতে পেরেছেন। তাও 'বর্তমান ভারত' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বই দুটিই প্রবন্ধাকারে বেরিয়েছিল। কিন্তু 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজক'—প্রথমটি চিন্তা বা গল্পকণিকার সংকলন; দ্বিতীয়টি ভ্রমণকাহিনী। মনে হয় আরও বেশ কিছুদিন ধরে বাঙলায় মননশীলতার চর্চা করলে বিবেকানন্দের ছড়ানো কিন্তু পাইওনীয়ারিং বা প্রবর্তনী চিন্তাগুলি অনেক আগেই মূল্য পেতো। তবু আক্ষেপ, প্রমথ চৌধুরীর মতো বিবেকানন্দের সমকালীন সাময়িক পত্রিকার লেখক উদ্বোধন পত্রিকাকে উপেক্ষা করেছেন।

এখন বিবেকানন্দের চলতিরীতির স্বভাব-ধর্মের কথায় ফিরে আসা যাক। সবরকম ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে চলতিরীতির পক্ষপাতী বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বই দুটিতে বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন এবং কলকাতা অঞ্চলে সংলাপী ধরন-ধারণ, রীতিনীতি ও মুদ্রাদোষগুলিও তিনি ছাড়েন নি। 'পরিব্রাজকে'র যে কোনো পাতা খুললেই এই ধরন-ধারণ চোখে পড়বে। যেমন: 'পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে—আজন্ম। ফল, ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ—খেতেই পায় না।' (জাহাজের কথা, পরিব্রাজক)

কিংবা 'আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে?'

কিংবা সেই আলাসিঙ্গা-র বিচিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গ।

মাথা-কামানো, ঝুঁট বাঁধা, শুধু-পায়, ধুতি-পরা মান্দ্রাজী ফার্স্ট'ক্লাসে উঠল; বেড়াচ্চে-চেড়াচ্চে, খিদে পেলে মুড়ি-মটর চিবুচ্চে!...তবে আমাদের সঙ্গে পড়ে ওর জাতের দফা ঘোলা হচ্চে—চাকররা বলছে। বাস্তবিক কথা—তোমাদের পাল্লায় পড়ে মান্দ্রাজীদের জাতের দফা অনেকটা ঘোলা কেন, থকৃথকিয়ে এসেছে! (দক্ষিণী সভ্যতা, পরিব্রাজক)

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র থেকেও এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায় যেখানে ভাবপ্রকাশে স্বামীজী সব-সংস্কারমুক্ত। যেমন,

> অবিবাহিতা মেয়ে এদেশে আমাদের দেশের মতো সুরক্ষিতা, তারা সমাজে প্রায় মিশতে পায় না। বে'র পর তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশে; বে-থা মায়ে বাপে দেয়, আমাদের মতো।

লক্ষ্য করবার মতো, একেবারেই মুখের ভাষা কলকাতাই বুলি শুধু নয়, মৌখিক টানটা পর্যন্ত বরাবর এই দুটি বইতে বজায় রাখবার চেষ্টা করে গেছেন। আর তার মধ্যে আবার রঙ্গ-রসিকতা আর চলতি লৌকিক গল্পে এই দুটি বই-ই ঠাসা। 'পরিব্রাজক' চলতিরীতিতে লেখা, চিঠির ভাষা বলে বোধহয় একটু বেশি ঘরোয়া কিন্তু রঙ্গ-রসিকতা ও কলকাতার মৌখিক শব্দ-প্রয়োগও বেশি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র চলতি-রীতিকে কেউ কেউ আদর্শ চলিতভাষা বলছেন। আদর্শ মানে অনুসরণযোগ্য পরিচ্ছন্ন ঋজু স্পন্দমান সতর্ক রীতি। হতে পারে পরিব্রাজকের তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক, কিন্তু এখানেও individua-litya প্রকাশ কিছু কম নয়। যেমন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র 'উভয় সভ্যতার তুলনা' নামক পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধার করছি:

> হ'তে পারে দু-এক জায়গায় আর্য বা বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হ'তে পারে দু-একটা ধূর্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসেরা ঢিলঢেলা হাড়গোড় ছোড়ে। যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকিকান্না ধ'রে রাজাদের কাছে গমন। রাজারা লোহার জামাপরা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র

নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন ; বুনো হাড়পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে ? রাজারা মেরে ধ'রে চ'লে গেল।

কিংবা পরিশিষ্টের কিছু অংশ :

নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা ব'লে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি ? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি !!

তবে এটা ঠিক, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র অধিকাংশ অংশই অনুসরণযোগ্য ঋজুভঙ্গিতে লেখা ; common style-এর নমুনা হিসেবে নেওয়া যায়। কিন্তু 'পরিব্রাজক' ভীষণভাবে individual, গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের যুগের মানুষকে যাঁরা দেখেছেন বা যাঁদের কথা শুনে তাঁদের মুখের বুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাঁরাই 'পরিব্রাজকে'র লেখকের ভাষার কলকাত্তাই রসটিকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করবেন। তাই বলে কিন্তু সর্বত্রই এই কলকাত্তাই বুলি নেই—প্রয়োজন মতো সংস্কৃত, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দকেও বসিয়ে দিয়েছেন একেবারেই চলতি ক্রিয়া বা অসমাপিকা ক্রিয়ার পাশে, কখনো মুগ্ধদৃষ্টিতে ছোট ছোট বাক্যে, কমা, সেমিকোলন দিয়ে একেবারেই খাঁটি শিল্পীর মতো ছবি এঁকে যান :

সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-লিচু-জাম-কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড়ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানী তুর্কিস্তানি গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায় ! সেই ঘাস, যতদূর চাও, সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক ক'রে রেখেছে ;…।

একজন সমালোচক বলেছেন, চলতিগদ্যে এমন সার্থক বর্ণ-ধ্বনিময় বর্ণনা কোথায় আছে ? আছে কিন্তু বিবেকানন্দের পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে—সেই তুলির লেখার প্রথম নমুনা বিবেকানন্দেরই 'পরিব্রাজকে'। আর আছে সৈয়দ মুজতবা আলির রচনায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠিক একই তুলির দক্ষটানে প্রকৃতির রস থেকে পুরাণ, রূপকথার বা উপকথার রস নিয়ে আসেন—কিংবা নেহাতই শুধু ছবি—তাতে একটু মানবিক বেদনার রঙ লেগে থাকে—

তারপর মেঘ আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রি শেষের সঙ্গে রূপোর মতো শাদা আলো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে ক'রে ভোরের একটি ছোট্ট পাখির গানের সঙ্গে-সঙ্গেই ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল ; ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের সকাল বেলায় ফুটন্ত কচি আলোর মাঝখানে একখানি জলে ভরা মেঘ। (চণ্ড, রাজকাহিনী)

ঠিক এমনি চলতিভাষার তুলিতে মুজতবা আলি প্রাকৃতিক রূপের ছদ্মবেশ খামিয়ে দেন—রঙ আলো আর ধ্বনির সঙ্গমে প্রকৃতি যেন গানের মাইফেল বসিয়ে দেয়—

এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগলো, ওদিকে গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরীষ রঙের আমেজ দিতে আরম্ভ করলো। মাঝখানের আকাশেতে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিনস্বর নিয়ে খেলা। আর তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ

যদি দ্রুতলয়ে রঙ বদলান তবে পূর্বও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জন যেন তানপুরোর আমেজ। (অবিশ্বাস্য)

এই দুটি রচনাংশ তুলছি এই কারণে যে গৈরিকের অন্তরাল থেকে বিবেকানন্দ যেমন সত্যিকারের রঙের শিল্পী হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই রঙের তুলি পরবর্তীকালে অন্ততঃ আরো দুটি শিল্পী সমান দক্ষতায় ধরে বিবেকানন্দের প্রাথমিক প্রবর্তনাকে সম্মান জানিয়ে গেছেন। কিন্তু কেউ কারুর নকল নয়, প্রত্যেকেই individual আর্টিস্ট। বিবেকানন্দের স্বাতন্ত্র্য এই দুই শিল্পীকে স্বতন্ত্র হবার সাহস দিয়েছে।

আর দুটি কথা। বিশেষ করে প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রেই বলা হয়, চলতিরীতি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। বিদ্রূপ-শ্লেষ তাঁর চলতি-রীতিকে একটু ঘোরালোও করেছে। স্বামীজীর চলতিগদ্যে তার আগেই কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রসন্ন কৌতুক যথেষ্ট পরিমাণে নাড়া দেয়। 'পরিব্রাজকে'র 'ইওরোপী সভ্যতা' নামের পরিচ্ছেদ থেকে একটুখানি অংশ তুলে দিই :

> পণ্ডিতরা তো এই সব বলছেন, তবে অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে—যেমন সাঁ ক'রে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে তা বললে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম 'হায়ার ক্রিটিসিজম্'।

তেমনি প্রসন্ন কৌতুক যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে—চলতি-সাধু সব রকম ইডিয়ম মিলে মিশেও আছে। নইলে প্রাণবন্ত চলতিরূপ গড়ে উঠবে কী করে? 'ভাববার কথা'র গল্প চিঠিপত্র, এবং প্রবন্ধ—সর্বত্রই তাঁর পর্যবেক্ষণের মৌলিক জাদু। আর্যামির নিন্দা করে 'পরিব্রাজকে'র এক জায়গায় বলেছেন: "একটা ডোম ব'লত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্!'"

শেষ কথা হলো, বিবেকানন্দ গদ্যে—সাধু-গদ্যেও বটে চলতিগদ্যেও বটে—সংলাপের ভঙ্গিটিকেই প্রায়শঃই আনতে চেয়েছেন। চিঠিপত্র বা পত্রাকারে লেখা চিন্তাবলির মধ্যে তো থাকা স্বাভাবিক, অন্য প্রবন্ধের মধ্যেও এসে পড়েছে। কখনো প্রশ্নের আকারে, আত্মকথনে, কখনো অনুপস্থিত অর কয়েকজন শ্রোতাকে সামনে রেখে, কখনো বা কোটি কোটি মানুষকে সামনে রেখে। মার্টিন বুবার বলেছিলেন যে-কোনো আকর্ষণীয় চিন্তাশীল রচনাই মূলতঃ thou and I-এর সংলাপ। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এই thou কখনো নিজেরই আর এক সত্তা, কখনো একজন শ্রোতা বা পাঠক, কখনো জনতা। এই ভঙ্গিই তাঁর সাধু ও চলতি—দু'রূপের রচনাকেই আকর্ষণীয় করে রাখে। মানুষের পাপ ও তার প্রাকৃতিক অভ্যাসাদি থেকে শুরু করে ঈশ্বরকে নিয়ে তার ছলনা পর্যন্ত—আপাদ-মস্তক সমস্ত মানুষটাকেই তাঁর লেখায় তিনি ধরে রাখতে চান। তাই তাঁর উচ্চাশা, বিষণ্ণতা এবং কৌতুক। একই দেহে জুডাস ও জিসাস। এমন মানুষের গদ্য কখনো নিছক সাধু কিংবা নিছক বুলি হতে পারে না। তাঁর ভাষা আমাদেরই চরম যন্ত্রণা ও পরম আনন্দের ভাষা।*

* ১৭ই মে ১৯৮[illegible] উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের সারদানন্দ হলে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ। –সং

পূজা-বিজ্ঞান

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

(এক)

'পূজা-বিজ্ঞান' শব্দটি কোন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হিসাবে এখানে ব্যবহার করা হয়নি, বা বৈজ্ঞানিক কোন গূঢ় তত্ত্বের বিচার বা ব্যাখ্যাও এই আলোচনার বিষয় নয়। পূজা একটি বিজ্ঞান-সম্মত সাধনা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞান-সম্মত বিচার-বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে গবেষণা করলে দেখা যাবে তার প্রতিটি স্তরই যুক্তিপূর্ণ ও সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত। শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে পূজার দ্বারা সাধক বাঞ্ছিত ফললাভ করে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন—এটি বোঝাবার জন্যই এখানে 'পূজা-বিজ্ঞান' শব্দটির ব্যবহার।

স্বামী সারদানন্দজীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে পূজা-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বটি অল্প কয়েকটি কথায় অতি সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কথাগুলি সূত্রাকারে হলেও এত সুস্পষ্ট যে, কোনরূপ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সেখানে আছে, 'তুমি কোনও দেবতার পূজা করিতে বসিলে অগ্রেই কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তকস্থ সহস্রারে উঠাইয়া ঈশ্বরের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চিন্তা তোমায় করিতে হইবে; পরে পুনরায় তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া জীবভাব ধারণ করিলে এবং ঈশ্বরজ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার পূজ্য দেবতারূপে প্রকাশিত হইলেন এবং তুমি তাঁহাকে তোমার ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া পূজা করিতে বসিলে—ইহাই চিন্তা করিতে হইবে।' (১৩৫৮, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৬)।

কুলার্ণবতন্ত্রে পূজার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সেই ক্রিয়াকেই পূজা বলে, যা 'পূর্বজন্মানুশমনাজ্জন্ম-মৃত্যুনিবারণাৎ / সম্পূর্ণফলদানাচ্চ পূজেতি কথিতা প্রিয়ে।' (১৭।৭০)। অর্থাৎ, যে ক্রিয়া পূর্বজন্মকৃত কর্মপ্রবাহ শান্ত করে, জন্মমৃত্যু নিবারিত করে এবং সম্পূর্ণফলদান করে, তাকেই পূজা বলে। সম্পূর্ণ-ফলদান অর্থে বাঞ্ছিতফলদান—ভগবানের কাছে ভক্তের, উপাস্যের কাছে উপাসকের পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। পূজ্যের মধ্যে পূজকের আত্মলয়েই পূজার সম্পূর্ণ অর্থাৎ বাঞ্ছিত ফল, পূজার পরি-সমাপ্তি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বলি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-যজ্ঞের সমাপ্তি অধ্যায়ে অনুষ্ঠিত তাঁর ষোড়শী-পূজার ঘটনা। তাঁর জীবনী-পাঠকরা সকলেই জানেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী বিচিত্র সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবীর দেহাবলম্বনে আদ্যাশক্তিকে ষোড়শীরূপে পূজা করে। তাঁর সেই বিচিত্র পূজার পরিসমাপ্তির বর্ণনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে আছে, 'সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।' (১৩৫৮, সাধকভাব, পৃঃ ৩৫৫)। এখানেই পূজা-বিজ্ঞানের সার্থকতা। ঠাকুরের এই সাধনা পূজা-বিজ্ঞানের নবসমর্থন ও জয়যাত্রার শুভ ইঙ্গিত, সন্দেহ নেই।

পূজার অপর একটি সংজ্ঞাতে পূজার লক্ষ্যের কথা সুস্পষ্ট। সেখানে আছে, সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্যই পূজা। (যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।—মহানির্বাণ-তন্ত্রম্, ১৪।১২৩)। উপাস্য ও উপাসকের এই ঐক্যবোধের চরম পরিণতিই আত্মস্বরূপের অবগতি বা ব্রহ্মোপলব্ধি। আর পূজা সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অন্যতম সোপান। পূজাদি সকল কর্মের চরম পরিণতি যে আত্মস্বরূপের অবগতি বা ব্রহ্মোপলব্ধি, গীতাতেও তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সেখানে

আছে, দ্রব্যসাধ্য-যজ্ঞ অর্থাৎ পূজাদি যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কেননা, যজ্ঞোপাসনাদি সকল কর্মেরই পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে। (শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ / সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥—গীতা, ৪।৩৩)। বলা বাহুল্য, পূর্ণজ্ঞান ও ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে কোন ভেদ নেই।

দেবীভাগবতে উক্ত হয়েছে, পূজা দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্যপূজার আবার দুই ভাগ—বৈদিক ও তান্ত্রিক। (দ্বিবিধা মম পূজা স্যাদ্বাহ্যা চাভ্যন্তরাপি চ / বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা।—দেবীভাগবতম্, ৭।৩৯।৩)। ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যের সুনিয়ন্ত্রণে বৈদিক ও তান্ত্রিক—এই দুটি ধারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত। বস্তুতঃ বেদের যজ্ঞ এবং তন্ত্রের পূজা সমার্থক এবং যজ্ঞ ও পূজা উভয়ের মূল উদ্দেশ্যও একই। 'সুপ্রাচীন কাল হইতে বেদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত-সকল তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করিতেছে। কোন কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যজ্ঞ ও পূজা উভয়ই অপরিহার্য। যজ্ঞ বেদের দান, আর পূজা তন্ত্রের। বেদ ও তন্ত্র পরস্পর পরিপূরক।' (চণ্ডীচিন্তা, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, পৃঃ ৯)। বৈদিক ধারার ভিত্তি বেদ-উপনিষদ্, অপরপক্ষে অগণিত তন্ত্রগ্রন্থ তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি। বলা নিষ্প্রয়োজন, বেদের চরমতত্ত্ব ব্রহ্ম এবং তন্ত্রের চরমতত্ত্ব শক্তির মধ্যে পারমার্থিক কোন ভেদ নেই। তন্ত্রের নির্দেশানুযায়ী যেসব পূজাদি করা হয় সেগুলি তান্ত্রিক পূজা এবং বেদের অনুশাসনানুযায়ী যেসব পূজাদি করা হয় সেগুলি বৈদিক পূজা বলে অভিহিত। পূজার সাধারণ এই ভাগ-বিভাগ ছাড়াও সাধারা, নিরাধারা, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, সাত্ত্বিক, রাজসিক, স্বাভাবিক ইত্যাদি নানা প্রকার ভেদ আছে। পূজার মুখ্য দুটি দিক্—বাহ্য ও আভ্যন্তরই আমাদের বর্তমান নিবন্ধের আলোচনার বিষয়।

মহানির্বাণতন্ত্রে বাহ্যপূজাকে 'অধমাধম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যান-ভাবস্তু মধ্যমঃ / স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃ-পূজাঽধমাধমা।—মহানির্বাণ-তন্ত্রম্, ১৪।১২২)। 'অধমাধম' শব্দটি কিন্তু এখানে হেয় বা নিন্দার্থক নয়। পরন্তু অধিকারিভেদে বাহ্যপূজা যে সাধনার লক্ষ্যে পৌঁছুবার একটি সুনির্দিষ্ট সোপান, সাধনের অবলম্বন—তারই স্বীকৃতি। মহানির্বাণতন্ত্রে উল্লিখিত 'উত্তমা'দি বিষয়ক এই শাস্ত্রবচনের তাৎপর্য ঠিকমত বুঝতে না পারলে অর্থবিষয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। 'পূজার বাহ্য ও আন্তর দুইটি দিক্। উভয়েরই মূল্য সমান। কাহারও কাহারও ধারণা, বাহ্যপূজা হইতে মানসপূজা শ্রেষ্ঠ এবং নিম্নাধিকারীই বাহ্যপূজা করিবে। এই ধারণা ঠিক নহে।...বস্তুতঃ অন্তর বাহির দুই মিলিয়াই সমগ্র পূজা।' (চণ্ডীচিন্তা, পৃঃ ১২৫-২৬)।

সাধনায় অধিকারিভেদ অনস্বীকার্য, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে। সাধকের রুচি, বোধসামর্থ্য ও যোগ্যতানুযায়ী শাস্ত্রে সাধনার বিধানও বিভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'রুচিভেদ আর অধিকারিভেদ আছে।' 'বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা যার পেটে যা সয় তাই রান্না করছেন।' ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধি সাধনায় চরম পরিণতি, শেষ কথা হলেও অধিকারিভেদে ক্রমমুক্তির উপায়স্বরূপ পূজা ও উপাসনাদির বিধান শাস্ত্রসম্মত। 'ধর্মসাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহে ক্রমশঃ মন নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,

১ম সং, ৫।২৬৩)। পূজায় যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই সাধকের 'চিত্তের মলিনতা দিন দিন দূরীভূত হইতে থাকে। কি একটা স্বর্গীয় শান্তি, কি এক অপূর্ব আনন্দ ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁদের হৃদয়ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।...তখন সে সত্যে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উচ্চারিত মন্ত্রসমূহ চৈতন্যময় হইয়া উঠে, মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিরূপ আয়তন পরিবর্তিত হইতে থাকে, তখন সে পরমেশ্বরের পূজা করিয়া পূজার যাহা যথার্থ ফল, সেই অপূর্ব আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।' (পূজাতত্ত্ব, ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব, পৃঃ ১৩-১৪) সাধকের কাছে সে অবস্থায় পূজা বলে পৃথক্ আর কোন উপাসনা থাকে না। সমগ্র জীবনটাই তাঁর কাছে তখন পূজা—'যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্'—দিবারাত্র আমি যে কর্ম করি, সবই তোমার আরাধনা বৈ আর কিছু নয়। একেই বলে স্বাভাবিক পূজা'। স্বাভাবিক পূজার এই ভাবটি শংকরাচার্য-রচিত 'সৌন্দর্যলহরী' স্তোত্রের একটি শ্লোকে (টীকাকার লক্ষ্মীধরের মতে ২৭-সংখ্যক শ্লোক, অন্যমতে ২৮-সংখ্যক) খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'দেবী, আমার যদৃচ্ছা সংলাপ তোমার জপ হোক, হস্তবিন্যাসাদি ক্রিয়া তোমার উদ্দেশ্যে হোক মুদ্রাবিরচন, আমার যদৃচ্ছা গমন তোমার প্রদক্ষিণ হোক, ভোজনাদি হোক তোমার উদ্দেশ্যে আহুতি, যদৃচ্ছা শয়ন হোক তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আত্মস্বরূপিণী তোমাতে সমর্পণবুদ্ধিতে রূপরসগন্ধ-স্পর্শাদি সমস্ত সুখকর বস্তুগ্রহণ এবং আমার সমস্ত চেষ্টা তোমার পূজা হোক।' (জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং / গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমশনাদ্যাহুতবিধিঃ / প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদৃশা / সপর্যাপর্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্)। সাধক রামপ্রসাদেরও অনুরূপভাবের একটি গানে আছে, 'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, / আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে ॥ / যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে, / কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥ / আনন্দে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্বঘটে / নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥'

পূজার দুটি দিক্—বাহ্য ও মানস। একটি বাইরের এবং অপরটি অন্তরের। বাহ্যপূজার মানস অনুষ্ঠানই আন্তর বা মানসপূজা। আর এই আন্তর বাহির দুই মিলিয়েই সমগ্র পূজা। শাস্ত্রেরও এই কথা—'সর্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে'—বাহ্যপূজার সঙ্গে সঙ্গে আন্তরপূজাও করতে হবে। মহানির্বাণতন্ত্রে আদ্যাকালীর আন্তরপূজা সম্পর্কে যে বিধান দেওয়া আছে, তা থেকে আন্তরপূজার সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে আছে, 'দেবীকে আসন দেবে হৃৎপদ্ম, চরণপ্রক্ষালনের জন্য পাদ্য দেবে সহস্রারচ্যুত অমৃত, অর্ঘ্য দেবে মন। সেই সহস্রারচ্যুত অমৃতকেই করবে দেবীর স্নানীয় ও পানীয়। আকাশতত্ত্ব হবে দেবীর বস্ত্র, গন্ধতত্ত্ব হবে গন্ধ। চিত্তকে পুষ্প কল্পনা করবে, প্রাণকে ধূপ, তেজ-তত্ত্বকে দীপ এবং অমৃতসমুদ্রকে নৈবেদ্য কল্পনা করবে। অনাহত ধ্বনি হবে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্ব চামর। যাবতীয় ইন্দ্রিয়কর্ম এবং মনের চাঞ্চল্য হবে নৃত্য। নিজের অভিপ্রেত ভাবসিদ্ধির জন্য দেবীকে নানাবিধ পুষ্প দিতে হয়। অমায়া অনহংকার অরাগ অর্থাৎ অনাসক্তি অমদ অমোহ অদম্ভ অদ্বেষ অক্ষোভ অমাৎসর্য অলোভ এই দশটি পুষ্পের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া আছে অহিংসা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দয়া ক্ষমা এবং জ্ঞান এই পাঁচটি পুষ্প। এই পঞ্চদশ ভাবপুষ্পের দ্বারা দেবীর পূজা করতে হবে।' (মহানির্বাণ-তন্ত্রম্, ৫।১৪৩-৪৯ : শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা

—উপেন্দ্রনাথ দাস, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮১৭)।

পূজার ফল অবশ্যম্ভাবী। 'তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা-বিরহিত হইলে পূজার সম্পূর্ণ ফললাভ অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে। যে পূজায় যে যে উপকরণ আবশ্যক, তাহা আয়াসসাধ্য হইলেও একত্র করিতে হইবে; যে কারণসমূহের সংযোগে যে বিশেষ ফলের উৎপত্তি, সে সমূহের একত্র সংযোগ চাই।' (ভারতে শক্তিপূজা- স্বামী সারদানন্দ, ১১শ সং, পৃঃ ৭৬)। বাঞ্ছিত ফললাভ না করার দোষ পূজা-বিজ্ঞানের নয়, পূজাবিধির ব্যতিক্রমে। 'রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবে বলিয়া যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন এবং নির্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকে, তাহার ফল-প্রত্যাশা কোথায়?…কথায় বলে, 'যে বিবাহের যে মন্ত্র' তাহার উচ্চারণ চাই।…শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পূজা করিয়া বলিব, 'পূজার ফল ত পাইলাম না।'" (ঐ, পৃঃ ৬-৭)। কাজেই যে পূজায় যেভাবে অনুষ্ঠানাদি করবার নির্দেশ তা ঠিক সেভাবেই করা অবশ্য কর্তব্য।

অনুষ্ঠানের শাস্ত্রনির্দেশ ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেরই এক-একটি তাৎপর্য আছে এবং সেই সেই তাৎপর্য জেনে পূজা করলে পূজার আকর্ষণও বেশী হয়। শাস্ত্রে আছে, 'অর্থজ্ঞানস্য কর্মানুষ্ঠানাঙ্গত্বং, নহ্যর্থজ্ঞান-মন্তরেণ [illegible] নং সম্ভবতি' (মীমাংসা ন্যায়-প্রকাশ)। অর্থজ্ঞান কর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ, অর্থজ্ঞান ব্যতিরেকে প্রকৃত কর্মানুষ্ঠান সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বুঝে অনুষ্ঠানাদি করলে সেই সেই অনুষ্ঠানের প্রতি পূজকের শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় স্বভাবতই দৃঢ় হয়। অনুষ্ঠানকে তখন যন্ত্র-পরিচালিতবৎ শুষ্ক কতকগুলি ক্রিয়া মনে না হয়ে সিদ্ধিলাভের অবলম্বন বলে নিশ্চিত ধারণা হয়। অনুষ্ঠানের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করতে পারলে পূজকও সেই সেই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ও সার্থকতা বুঝতে পারেন। তখন পূজার মন্ত্র, নৈবেদ্যাদি যাবতীয় উপকরণের, ন্যাস, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, ধ্যান প্রভৃতি পূজার বিভিন্ন অঙ্গের সার্থকতা তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয় এবং ঐ সকলের চরম লক্ষ্য যে ঈশ্বরানুভূতি তা তিনি তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অভীষ্ট ফল পেতে হলে অনুষ্ঠানের যেমন অর্থজ্ঞানের প্রয়োজন, মন্ত্রার্থ-জ্ঞানের আবশ্যকতাও সমতুল্য। যিনি অর্থজ্ঞান-পূর্বক মন্ত্রপাঠ করেন, তিনি সম্পূর্ণ ফললাভ করেন। এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, মন্ত্রটির অর্থ অনুধাবন করলে উপাসক সেই মন্ত্রের দ্বারা দেবতার কাছে কি চাইছেন তা বুঝতে পারবেন —বিশেষ করে অনুভব করতে পারবেন মন্ত্রের অর্থ কত গভীর, ব্যাপক ও হৃদয়গ্রাহী। কাজেই সার্থক পূজায় উপাসকের মন্ত্র এবং অনুষ্ঠান উভয়েরই অর্থজ্ঞান থাকা একান্ত দরকার, সন্দেহ নেই।

পূজায় সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রপাঠ ও অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে সঙ্গে কর্মাঙ্গানুরূপ অনুভূতির বিকাশও একান্ত আবশ্যক। পূজার মর্মগত যা লক্ষ্য পূজার প্রথম থেকেই পূজককে সেইভাবে ভাবিত হতে হয়। শাস্ত্রেরও নির্দেশ—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'—নিজেকে দেবস্বরূপ ভাবনা করে দেবপূজা করবে। যার ভাবনা যেরূপ, সফলতাও তার তদ্রূপ হয়—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে সাধক ঈশ্বরত্ব লাভ করেন।

বস্তুমাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হলেও নানা সংস্কারের আবরণে বস্তুর সে স্বরূপ আবৃত থাকে, বাইরে প্রতিভাত হতে পারে না। বস্তুর স্বরূপচিন্তা তার বাহ্য আবরণ ভেদ করে সাধকের মনকে বস্তুস্বরূপে নিবিষ্ট করতে সক্ষম। তাই পূজার সময়ে আপনার চিন্ময়স্বরূপের ভাবনায়

মন নিবিষ্ট করবার নির্দেশ। শুধু পূজকের কেন, সমস্ত পূজোপকরণেরই দেবত্ব ভাবনা করবার নির্দেশ শাস্ত্রে আছে। পূজোপকরণকে দেবতা-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে, দেখলে পূজোপকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়, দেবত্ব প্রাপ্ত হয়—'সর্বেষাং দেবতাদৃষ্ট্যা জায়তে শুদ্ধতাপি চ।' (গন্ধর্বতন্ত্র, ১৩।৩-৫)।

আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময়ই পূজার বিভিন্ন ক্রিয়া ও অঙ্গকে অবান্তর, নিরর্থক বলে মনে হয়। কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, পূজককে বিশুদ্ধভাবে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করার নির্দেশ থেকে আরম্ভ করে নির্দিষ্টমুখী হয়ে পূজাসনে বসা, আচমন, বিভিন্ন শুদ্ধি, ন্যাস, উপচার-নিবেদন ও প্রণাম পর্যন্ত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ও সার্থকতা আছে। সার্থকতার দিক দিয়ে পূজার কোন অঙ্গই অবান্তর বা নিরর্থক নয়। অনুষ্ঠানগুলি এমন সুপরিকল্পিত ও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বিন্যস্ত যে, পর্যায়ক্রমে ঐগুলি সাধককে পূজার চরম লক্ষ্যে —পূজ্য ও পূজকের ঐক্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

যদিও সাধারণভাবে পূজাতত্ত্বই আমাদের আলোচনার বিষয় এবং সেই সূত্রে পূজার শাস্ত্রীয় দিক্‌টির কথাই এ পর্যন্ত একটু বেশী করে বলা হল, তবুও মনে রাখতে হবে পূজা একটি সাধনা এবং সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য প্রতিটি অঙ্গ যেমন নিখুঁত হবে সেরূপ সমস্ত অনুষ্ঠানটি ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও ভালবাসা-মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ শেষোক্তভাবের দিক্‌টাই পূজার প্রধান উপকরণ। গীতাতেও আছে, 'ভক্তিপূর্বক যে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তার সেই ভক্তি-উপহার প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করি।' (পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি / তদহং ভক্ত্যু-পহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।—৯।২৬)। জনৈক বৈষ্ণব-সাধকের একটি গানে এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ঐ গানে আছে, 'মন-তুলসী ভক্তি-চন্দন যেজন তাঁরে দিতে পারে, শিলার পৃষ্ঠে কাঠের চন্দন ঘস্‌তে হয় না বারে বারে। সাজিভরা বনফুলে পূজা হয় না কোন-কালে, ফুলের পূজা সবাই করে মধু লুটে নেয় মধুকরে॥' ইষ্টদেবতার চরণে 'মন-তুলসী' 'ভক্তি-চন্দন' অর্পণেই পূজার সার্থকতা।

[ক্রমশঃ]

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় শ্রীরামকৃষ্ণবাণী

সঙ্কলক : ডক্টর জলধিকুমার সরকার

[চৈত্র ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

৬৯। "মা (শ্রীশ্রীমায়ের মা) দুঃখ করতেন, 'এমন পাগল জামায়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম, আহা! ঘর-সংসারও করলে না, ছেলে-পিলেও হ'ল না, মা বলাও শুনলে না!' একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বলছেন, 'শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না— আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা ডাকের জালায় আবার অস্থির হ'য়ে উঠবে।' তা যা ব'লে গেছেন ত' ঠিক হয়েছে মা।" ১।১২৪

৭০। শ্রীশ্রীমা একজন উন্মাদগ্রস্ত ভক্তকে বুঝাচ্ছেন, "ঠাকুর বলতেন, 'যারা আমাকে ডাকবে তাদের জন্য আমাকে অন্তিমে দাঁড়াতে হবে।' এটি তাঁর নিজ মুখের কথা।…কে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখছে বল না? এক, নরেন দেখেছিল। সেও যখন তার খুব ব্যাকুলতা—

ঐ সব দেশে (আমেরিকায়) ।" ২।১৭৩

১১। "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন, 'ওরে হৃদু, আমার বড় ভাবনা ছিল যে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কে জানে—এখানে কোথায় শৌচে যাবে, আর লোকে নিন্দে করবে, তখন লজ্জা পেতে হবে। তা, ও কিন্তু এমন যে কখন কি করে কেউ টেরই পায় না, বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলুম না।' তাঁর ঐ কথা শুনে আমার এমন ভাবনা হ'ল যে কি বলব। ভাবলুম—ওমা, উনি তো যা চান তাই 'মা' ওঁকে দেখিয়ে দেন, এইবার বাইরে গেলেই ওঁর চোখে পড়তে হবে দেখছি। ব্যাকুল হ'য়ে জগদম্বাকে ডাকতে লাগলুম, 'হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা কর।' তা আমার এমনি মা-টি যেন দুই পাখা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতেন।" ১।১৪৫

১২। যোগেন-মা বলছেন, "বৃন্দাবনে মা প্রথম প্রথম খুব কাঁদিতেন। একদিন ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ গা, তোমরা এত কাঁদছ কেন? এই তো আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? এই যেমন এ ঘর, আর ও ঘর'।" ১।৩১২

১৩। "ঠাকুরের সাধন-অবস্থায় কত রকম প্রলোভনের জিনিস দেখে, তিনি জড়সড় হতেন এবং সে-সব প্রলোভনের জিনিস তিনি চাইতেন না। একদিন তিনি পঞ্চবটীতে হঠাৎ দেখলেন, একটি ছেলে তাঁর নিকটে এল তিনি তাতে চিন্তা করতে লাগলেন, এ আবার কি হল? তখন মা বুঝিয়ে দিলেন, মানসপুত্ররূপে ব্রজের রাখাল আসবে। যখন রাখাল এলো তখন তিনি বললেন, 'এই আমার সেই রাখাল এসেছে। তোমার নামটি কি বল দেখি?'—'রাখাল।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক।' ঠাকুর যেমন পঞ্চবটীতে দেখে-ছিলেন ঠিক তেমনি।" ১।৩২৬

১৪। শ্রীশ্রীমার মা স্বপ্নাদেশ পেয়ে জগদ্ধাত্রী পূজা করবেন; তার আয়োজন বর্ণনা করে মা বলছেন, "কাঠ জেলে সেঁকে সেঁকে মূর্তি শুকনো ক'রে রং দেওয়া হল। প্রসন্ন তাঁকে (ঠাকুরকে) দক্ষিণেশ্বরে খবর দিতে গেল। তিনি শুনে বললেন, 'মা আসবেন, মা আসবেন, বেশ, বেশ। তোদের বড় খারাপ অবস্থা ছিল যে রে।' প্রসন্ন বললে, 'আপনি যাবেন, আপনাকে নিতে এলুম।' তিনি বললেন, 'এই আমার যাওয়া হল; যা, বেশ, পূজা করগে। বেশ, বেশ, তোদের ভাল হবে।' জগদ্ধাত্রীপূজা হল।" ২।১৮৬

১৫। "একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধসুদ্ধ একটা বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ তো গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন, বাবুরাম এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলছেন, 'তাই তো, বাবুরাম, এখন কি হবে? কে আমায় খাওয়াবে?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি তখন মণ্ড তৈরি ক'রে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম। আমি তখন নথ পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে বলছেন, 'ও বাবুরাম, ওই যে ওকে ঝুড়ি ক'রে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস?' ঠাকুরের কথা শুনে নরেন, বাবুরাম তো হেসে খুন! এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন!" ১।৯৬

১৬। "ঠাকুরকে হাজরা বলেছিল, 'আপনি কেন নরেন্দ্র, রাখাল, এ সবের জন্যে এত ভাবেন? সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকুন না।' ঠাকুর বললেন, 'এই দ্যাখ, ঈশ্বরের ভাবে থাকি।' এই বলে তাঁর সমাধি হ'ল। দাড়ি, চুল, লোম সব খাড়া হ'য়ে উঠলো এই অবস্থাতে তিনি ঘণ্টাখানেক ছিলেন রামলাল তখন নানারূপ ঠাকুরদের নাম শুনাতে লাগল। নাম শুনাতে শুনাতে তবে তাঁর চৈতন্য হয়। সমাধিভঙ্গের পর তিনি রামলালকে বললেন, 'দেখলি, ঈশ্বরের ভাবে থাকতে গেলে এই অবস্থা। তাই নরেন্দ্র, এদের নিয়ে মনকে নিচে নামিয়ে রাখি।' রামলাল বললে, 'না, আপনি আপনার ভাবেই থাকুন'।" ১।৩২৬ [সমাপ্ত]

নাইজেরিয়ায় তিন বৎসর

শ্রীসচ্চিদানন্দ কর

১৯৭২ সনের প্রথম দিকে নাইজেরিয়ায় যাই। নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের যে বহুমুখী সহযোগিতার প্রকল্প আছে, তার ব্যবস্থা ও তদারকির কাজে আমাকে ইরাক থেকে নাইজেরিয়ায় বদলি করা হয়। ইরাক এবং কুয়াইত[১] মিলিয়ে প্রায় দশ বৎসর আরব দেশে কাটিয়ে নতুন মহাদেশ আফ্রিকাতে এলাম।

সেটা ছিল মার্চ মাস। স্ত্রী ও কন্যাসহ বাগদাদ থেকে সোজা নাইজেরিয়ার রাজধানী 'লাগসে' এসে যখন পৌঁছাই তখন বিকেল। বিমান বন্দরে রাষ্ট্রসংঘের ওখানকার অধ্যক্ষ আমাদের অভ্যর্থনা করতে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। ইনি ইংরেজ; এঁরই সহকারী হিসেবে আমাকে কাজ করতে হবে। বিমান থেকে নেমেই কিন্তু মনে একটা ধাক্কা খেলাম। যদিও জানতাম নাইজেরিয়া গরম দেশ, তবু এতটা অসহ্য গরম ভাবিনি। আরব দেশের মরু অঞ্চল থেকে এসে গরমের বিরুদ্ধে নালিশ করা অদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু কেন জানি না সেদিন লাগসের ভ্যাপসা গরমটা খুবই অসহ্য মনে হয়েছিল। পরে জানলাম মার্চ মাসটাই ওখানকার সবচেয়ে গরমের সময়, লাগসে তখন প্রচণ্ড জলাভাব চলছিল। অধ্যক্ষের স্ত্রী জানালেন আমাদের জন্য যে বাড়ীটি ঠিক করা হয়েছে তাতে কলে একেবারে জল নেই, শেষরাত্রে বাগানের কলে সামান্য জল পাওয়া যাবে, তাতেই সমস্ত দিনের কাজ চালাতে হবে। এসব সুখবর শুনে লাগস তথা নাইজেরিয়ার প্রতি আমাদের মনোভাব আর যাই হোক প্রেমপূর্ণ হ'ল না।

তখন আরব দেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে তুলনামূলক তফাতটা খুব বেশী ক'রে মনে হচ্ছিল। ওখানে মরুভূমির উজ্জ্বল আলো আর এখানে চারিদিকে ঘনসবুজ বনের কালো অন্ধকার— মানুষজনও তাই। ওখানে দেখেছি সুশ্রী শ্বেতবর্ণ আরব নরনারী আর এখানে ঘনকৃষ্ণ বিরাটকায় আফ্রিকাবাসী—এ যেন দিন আর রাত্রি। তবে এটাও সত্যি যে, অন্ধকারতম রজনীতেও সুন্দরতম গোলাপ ফোটে। এই কালোর মধ্যেও যে কত সৌন্দর্য আছে সেটা পরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। উন্নয়নশীল দেশে কাজ করতে এসে নানা রকম অভিজ্ঞতা হওয়া—এটাও কম লাভ নয়।

আফ্রিকার মানচিত্রে নাইজেরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। আয়তনে না হ'লেও লোকসংখ্যার ও ধনসম্পদে এ দেশটি মহাদেশের শীর্ষস্থানীয়। এর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৮ কোটি এবং জনসংখ্যা হিসেবে এর ঠিক পরের দেশ মিশরের লোকসংখ্যা এর অর্ধেকেরও কম। এবং খনিজ তেল (পেট্রোলিয়াম) উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারক হিসেবে জগতে এ দেশ গুরুত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। এদেশের অর্থনীতি ও সমৃদ্ধি বিশেষ করে এই তেলের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

তেলের যুগের আগেও নাইজেরিয়া আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল, প্রধানতঃ তার লোকসংখ্যার জন্য। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের নিয়ে লাভজনক ক্রীতদাসের ব্যবসাতে যখন পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সব দেশই মেতে উঠেছিল তখন তাদের কাছে নাইজেরিয়ার জনসম্পদ একটা প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান নিগ্রো বাসিন্দাদের গোড়ার ইতিহাস যদি খুঁজে বের করা যায়, দেখা যাবে অনেকেরই পূর্বপুরুষ নাইজেরিয়া থেকে এসেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই লাভজনক

১ উদ্বোধন, মাঘ ১৩৮৬ সংখ্যায় লেখকের 'রাষ্ট্রসংঘের কাজে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশ কুয়াইত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ক্রীতদাস-ব্যবসা যখন আইন ক'রে এবং জোর ক'রে বন্ধ করা হয় তখন এদের ব্যবসা শুরু হ'ল কোকো, পাম অয়েল, রবার এবং চীনাবাদামের রপ্তানীতে। এখন খনিজ তেলের দৌলতে এগুলোর গুরুত্ব কমে গেছে।

শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নাইজেরিয়া কালো আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। কারণ, অনেক ব্যাপারেই নাইজেরিয়াকে কালো আফ্রিকার দেশগুলির মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। এদের ধনসম্পদ ও লোকসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্বাভাবিক। এ ছাড়া নাইজেরিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রকম আত্মপ্রত্যয় ও মতের পরিপক্কতা দেখেছি, তা সাধারণতঃ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না বা আশা করা যায় না।

ভৌগোলিকভাবে নাইজেরিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—দক্ষিণে বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চল, মাঝখানে পার্বত্য মালভূমি আর উত্তরে অর্ধমরু শুষ্ক অঞ্চল, যা সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্ত স্পর্শ করেছে। দক্ষিণে আতলান্টিক সমুদ্রের তীরে এদের রাজধানী লাগস। বিষুবরেখার খুব কাছে ব'লে এখানে দুটি মাত্র ঋতু—শুষ্ক এবং আর্দ্র। আর সমস্ত বছর ধরে দিনরাতের ব্যবধান প্রায় সমপরিমাণ। নভেম্বর থেকে এপ্রিল শুষ্ক সময়, বৃষ্টির অভাবে আবহাওয়া গরম থাকে; উত্তরের সাহারা মরুভূমি থেকে শুকনো ধূলিপূর্ণ গরম হাওয়া খুব উঁচু দিয়ে বয়ে যায় আর নীচের আর্দ্রতাকে শুষে নেয়। একে বলে হারমাটন (Harmatton)। এতে হাওয়া এত শুকিয়ে যায় যে ঘরের কাঠের আসবাবপত্র ফাটতে আরম্ভ করে। মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকাল। বছরে গড়ে ৭৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, তবে ওখানকার বর্ষা কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের মত নয়। যখন বৃষ্টি হয় তখন একেবারে মুষলধারে হয়। বৃষ্টির পরই আবার বেশ পরিষ্কার। রাস্তাঘাটেও কাদা হয় না। তাই বর্ষাকালটা ওখানে বেশ ভাল। এই দেশটির উত্তরে ও পূবে শুষ্কতা ও পাহাড়ের উচ্চতার জন্য অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়া। লাগস শহরটি চারটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। সমুদ্রের জল ফালি হয়ে প্রবেশ করেছে এদের পাশ দিয়ে। সে জলে ঢেউ নেই—তাকে বলা হয় 'লেগুন' (Lagoon)। এই দ্বীপগুলোর মধ্যেও আবহাওয়ার অল্পবিস্তর তফাত আছে—কোনটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, কোনটা গরম।

নাইজেরিয়ার অধিবাসীদের প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়: উত্তরে 'হাউসা' এবং দক্ষিণে বিভিন্ন উপজাতি। উত্তরে অর্ধমরু সুদান সাভানা অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের বলে 'হাউসা'। এরা মুসলমান। এদের ভুট্টা, চীনাবাদাম, আলু ইত্যাদির চাষবাস ও পশুপালন করাই প্রধান কাজ। প্রায় হাজার বছর আগে আরব ব্যবসায়ীরা উত্তরের ভূমধ্য অঞ্চল থেকে সাহারা মরু পার হয়ে এসে এদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করে। সেই থেকে এদের মধ্যে মুসলমানধর্মের ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহিত। তবে তাদের মধ্যে গোঁড়ামি নেই কিন্তু স্থানীয় উপজাতিগত নানা আচার ও কুসংস্কার আছে। সেইজন্যই মাঝে মাঝে উত্তরের ভূমধ্য অঞ্চল থেকে 'বারবার' (Berber)-জাতীয় ফুলানীরা তরবারি হস্তে এদের মধ্যে গোঁড়া ইসলামধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছে এবং রাজ্যস্থাপন করেছে। ফুলানীসম্প্রদায়ের দেশে দেশে ঘুরে পশুচারণ করাই কাজ। ওরা দেখতে সুশ্রী—রঙ বা চেহারা নিগ্রোদের মত নয়। উত্তর নাইজেরিয়ার শাসকগোষ্ঠী প্রায় সবাই আদিতে ফুলানী ছিল।

দক্ষিণ ও মধ্য নাইজেরিয়াতে বহুসংখ্যক উপজাতিদের বাস। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে পশ্চিমে ইওরোবা এবং পূর্বে ইবো উপজাতি। এই

উপজাতিদের প্রত্যেকের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা, যদিও এ সবই কথিত ভাষা, লেখার প্রচলন নেই। সাহিত্য বলতে একমাত্র ইওরোবাদের সামান্য আছে, তাও ইংরেজী হরফে লেখা। তাই সারা নাইজেরিয়াতে ইংরেজীই একমাত্র ভাষা যার মাধ্যমে সব কাজ চলে। তা সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য নেই, কারণ উপজাতিগত স্বার্থ এবং তার সংঘাত ওখানে জাতীয় ঐক্য ও শান্তিকে বার বার আঘাত করেছে। এই সংঘাতের চরম পরিণতির ফলে ইবোদের স্বতন্ত্র 'বিয়াফ্রা' রাজ্যের স্থাপনা হয় ১৯৬৭ সনে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বেশ কিছু রক্তপাতের পর ১৯৭০ সনে নাইজেরিয়া আবার একরাষ্ট্রে পরিণত হয়।

রাজধানী লাগস ইওরোবা অঞ্চলে অবস্থিত। বোধ হয় সেইজন্যই ইওরোবারা পড়াশুনায়, সরকারী চাকুরী ও ব্যবসাবাণিজ্যে অন্যদের থেকে এগিয়ে আছে। এরা বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ। নাইজেরিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে এদের শিল্প ও কৃষ্টির সুনাম আছে। পশ্চিমী জগতে এদের হাতের তৈরী শিল্পের প্রচুর চাহিদা। শুধু তাই নয় পশ্চিমী সঙ্গীতে এদের অবদানও যথেষ্ট। বিশেষ উল্লেখ্য ড্রাম। সঙ্গীতের লয় ও ছন্দ নিয়েই যেন এদের জন্ম। ছোট্ট ছোট্ট শিশুদেরও ছন্দে লয়ে এত সুন্দর নাচতে দেখেছি যে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ইওরোবাদের অর্ধেক মুসলমান ও অর্ধেক খৃষ্টান। তবে মুসলমানই হোক আর খৃষ্টানই হোক উপজাতিগত আচার ও প্রথারই প্রাধান্য। ধর্ম নিয়ে এদের মধ্যে কোন বিভেদ ঘটে না, এমনকি অন্তর্ধর্মীয় বিবাহও বেশ প্রচলিত।

অন্যদিকে পূর্বের ইবোরা প্রায় সবই খৃষ্টান। এরা আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে একটু পরে এসেছে তবু পাদরীদের সহায়তায় দ্রুত উন্নতি করেছে। ইবোরা পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল। সেইজন্য সব জায়গাতেই নিজেদের আধিপত্য সহজেই বিস্তার করে। এমনকি ১৯৬৭ সনে সৈন্য-অভ্যুত্থানের মারফত সমগ্র নাইজেরিয়ার কর্তৃত্ব দখলে আনার চেষ্টাও করেছিল। তাতে বিফল হ'লে স্বতন্ত্র 'বিয়াফ্রা' রাজ্য সৃষ্টি ক'রে নাইজেরিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়াসী হয়। এই প্রচেষ্টায় পাদরীদের মারফত পশ্চিমী জগতে এদের জন্য যথেষ্ট সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। কোন কোন রাষ্ট্র যেমন সুইডেন বেসরকারীভাবেও এদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন ইবোদের সকল প্রচেষ্টা বিফল হয় এবং ১৯৭০ সনের শেষে গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন পরাজিত ইবোদের উপর বিজয়ী সৈন্যদের নানা প্রকার অত্যাচারের কাহিনী অতিরঞ্জিত হয়ে বিদেশী খবরের কাগজে প্রচারিত হয়েছিল। আমি এই গৃহযুদ্ধের বছর খানেক পরে নাইজেরিয়ায় যাই কিন্তু সেখানে সেরকম অত্যাচারের কোন নিদর্শন পাইনি অথবা হাজার হাজার ইবো শিশুর অনাহারে মৃত্যুর কাহিনীও অতিরঞ্জিত ব'লে আমার মনে হয়েছিল; বর্তমানকালে প্রচার-মাধ্যমে যে কতখানি 'সংবাদ' সৃষ্টি করতে পারা যায় এটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

এবার নাইজেরিয়া এবং তার অধিবাসীদের সম্পর্কে আমার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার কথা বলব। আমার যাবার মাত্র এগার বছর আগে ইংরেজ-রাজত্ব থেকে দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। যদিও এর আগে এরা আশি বছর ইংরেজ-শাসনে ছিল কিন্তু সমগ্র নাইজেরিয়াতে পুরো ইংরেজ-শাসন চালু ছিল না। উত্তরাংশের হাউসাফুলানী অঞ্চলে ইংরেজরা দেশীয় আমীরদের শাসন-ব্যবস্থা মোটামুটি চালু রেখে খালি উপরকার সামগ্রিক কর্তৃত্বটা নিজেদের হাতে রেখেছিল। হয়ত যথেষ্টসংখ্যক ইংরেজ অথবা ইংরেজী-শিক্ষিত রাজকর্মচারীর অভাবের দরুনই তারা এটা করতে বাধ্য হয়েছিল।

কার্যতঃ উত্তর নাইজেরিয়া অনেকটা আমাদের দেশের সামন্তরাজশাসিত অঞ্চলের মত ছিল।

সুতরাং নাইজেরিয়া ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক কম বছর ইংরেজদের শাসনাধীনে ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ওদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির মান আমাদের চাইতে অনেক নীচুস্তরের হবে। তাছাড়া আফ্রিকা সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা যে ওটা বর্বর অনুন্নত অঞ্চল। কিন্তু নাইজেরিয়াকে আমার ঠিক সেরকম মনে হয়নি। সত্য কথা বলতে কি আমাদের দুই দেশের মধ্যে আমি সাধারণভাবে সেরকম পার্থক্য দেখিনি। ওদেশের সাধারণ লোকেদের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং উচ্চতর জীবনযাপনের প্রচেষ্টা কম নয়। এমনকি গ্রামেও দেখেছি ওদের জীবনযাত্রার মান আমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের নয় বরং ওদের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও পোশাক আমাদের দেশের গ্রামবাসীদের তুলনায় ভালই মনে হয়েছে। উচ্চস্তরের শিক্ষিত লোকেদের সংখ্যা অবশ্য আমাদের চাইতে অনেক কম, কিন্তু তাদের শিক্ষার মান আমাদের চেয়ে কম নয়।

নাইজেরিয়দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা আমাকে মুগ্ধ করেছে তা হ'ল তাদের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ। এমনকি বাড়ীর চাকর এবং তাদের ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া শেখে, নিজেদের পয়সা খরচ ক'রে সংবাদপত্র কিনে পড়ে। শুনেছি ইবোদের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে গ্রামের লোকেরা চাঁদা ক'রে ওদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলেকে পড়াশুনা করায় এবং সে যখন বড় হয়ে ভাল কাজ করে তখন গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের তার মত উচ্চশিক্ষিত করতে চেষ্টা করে। এখানকার সরকারও শিক্ষাকে তাঁদের কর্মসূচির মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দেশরক্ষা বাদ দিলে তাঁদের বাজেটের সব চেয়ে বড় অংশ খরচ হয় শিক্ষার খাতে। ১৯৭৪ সনে আমার থাকাকালীন ওখানে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। এবং এর জন্য প্রচুর শিক্ষক বাইরে থেকে আমদানী করা হয়—এঁদের মধ্যে অনেক ভারতীয়ও ছিলেন। আমার মনে হয় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নাইজেরিয়া অতি শীঘ্র ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে যাবে, যদিও আমরা তাদের ১৪ বৎসর আগে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম এবং সেই সময় তাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়েও ছিলাম। আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের অবহেলার ফল আজ আমরা চারদিকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রাথমিক শিক্ষাই শুধু নয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও নাইজেরিয়া দ্রুত অগ্রগতির পথে। দেশ স্বাধীন হবার পর ওখানে অনেকগুলো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। এর মধ্যে ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয় সব চাইতে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। এর পরেই বলা যায় জারিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। এটি উত্তরে জারিয়া শহরে। এছাড়া আছে লাগস, ইফো এবং ইবো অঞ্চলে 'এনসুক্কা' বিশ্ববিদ্যালয়। সবগুলোতেই বহু ভারতীয় শিক্ষক ও অধ্যাপক আছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং U. N. E. S. C. O. এদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করেছে ও করছে। এদেশে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি—সেটা হচ্ছে এদের সুষ্ঠু পরিচালনা। কোন কাজে এরা তাড়াহুড়ো করে না, অনেক সময় নিয়ে একটা কাজ সমাপ্ত করে কিন্তু সেটা হয় সুপরিচালিত।

নাইজেরিয়দের স্বাস্থ্য এবং পেশীবহুল দেহসৌষ্ঠব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য এবং সুগঠিত পেশীবহুল দেহ বোধ হয় ওদের জন্মাধিকার ও উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া। কারণ, ওখানকার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া এবং নানাপ্রকার সংক্রামক রোগ যেমন—ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর (yellow

fever), মূত্রাশয়ে সংক্রমণজনিত রক্তক্ষরণ রোগ (bilharziasis), সংক্রমণজনিত নিদ্রাকাতরতা (sleeping sickness) ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও ওদের সুগঠিত দেহ রক্ষা পেয়েছে। অবশ্য এখন এসবের জন্য রোগপ্রতিষেধক নানা প্রকার ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। আগে নাইজেরিয়াকে বলা হতো শ্বেতাঙ্গদের সমাধিভূমি (white man's grave)। এখনও বিদেশীদের ওখানে নিয়মিত ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেতে হয় এবং ওখানে যেতে হ'লে yellow fever-এর জন্য ইন্‌জেকশন্‌ নিতে হয়।

রাজধানী লাগস বেশ বড় শহর। জনসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। প্রচুর বিদেশী ওখানে বাস করে, বেশীর ভাগই ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে। ভারতীয়েরাও অনেক আছেন, এর মধ্যে সিন্ধীরা প্রায় সবাই ব্যবসা করেন। আবার কেউ কেউ কারখানা খুলে নানা প্রকার জিনিসও তৈরী করছেন। বাঙ্গালীরা বেশীর ভাগই চাকুরী করেন—ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি। ইংরেজ আমলে তৈরী একটা ক্লাবও রয়েছে। সামাজিক জীবনে যথেষ্ট মেলামেশা আছে, আবার কিছুটা বিবাদ-বিসংবাদ, দলাদলিও আছে, যেমন সর্বত্রই হয়ে থাকে। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, নাইজেরিয়রা সামাজিক ব্যাপারে বিদেশীদের সঙ্গে একটা দূরত্ব রেখে চলে। পুরুষরা নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে এলে বেশীর ভাগ সময়ে স্ত্রীদের সঙ্গে আনে না। এদের খাওয়াদাওয়াও বিদেশীদের মত নয়, একেবারে আলাদা। সামাজিক ব্যাপারে দূরত্ব বজায় রাখার এটাও একটা কারণ।

জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে মাতামাতি পৃথিবীর সর্বত্রই কিছু-না-কিছু নজরে পড়েছে। এটা কিন্তু নাইজেরিয়াতে দেখিনি, তবে সাধারণ লোকেরা বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে যারা থাকে তারা ভীষণ কুসংস্কারে বিশ্বাসী। এরা নানা প্রকার ভূতপ্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে; এবং ভূততাড়ানোর ওঝাদের প্রতিপত্তি এখনও গ্রামাঞ্চলে খুব বেশী। মজার ব্যাপার, ওদের বিশ্বাস ভারতীয়দের ভূতপ্রেতের ওপর অধিকার ওদের চেয়েও বেশী। এ সম্পর্কে আমাদের বাড়ীতে একটা ঘটনার কথা বলি—

একবার কোজাগরী ৺লক্ষ্মীপুজোর সময় আমার স্ত্রী বাড়ীতে লক্ষ্মীপুজো করেন। সেই উপলক্ষে স্থানীয় বাঙ্গালীরাও পুজোয় যোগদান করেন। নিয়ম অনুসারে সমস্ত বাড়ীর দরজায় দরজায় আলপনা দেওয়া হ'ল এবং জোড়া জোড়া ৺লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা হ'ল। নানা রকম রান্না ক'রে ভোগও দেওয়া হ'ল। আমাদের যে দু'জন নাইজেরিয় ভৃত্য ছিল তাদের তো এসব দেখে চক্ষু ছানাবড়া। ওরা ভাবল আমরা বোধ হয় কোন ভূতপ্রেত আমদানী করছি। পুজোর শেষে সবাই প্রসাদ খেল, ওরা দু'জন কিন্তু খেল না। অথচ এমনিতে ওরা খেতে খুব ভালবাসে—যে কোন খাবার পেলেই উদরসাৎ করে, এমনকি সুযোগ পেলে চুরি ক'রেও খেতে ছাড়ে না। ওখানকার স্থানীয় কয়েকজন বাঙ্গালী আমার স্ত্রীকে এর রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে বললেন, 'আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন, এই পায়ের ছাপ কখনও তুলবেন না। এরা বুঝেছে আপনি একজন প্রেতসিদ্ধা। দেখবেন আপনার বাড়ীতে কখনও চুরি হবে না।' এটা সত্যি আমাদের বাড়ীতে কখনও চুরি হয়নি অথচ চুরি ডাকাতি ইত্যাদি ওখানে বেশ হয়। বিশেষতঃ গৃহযুদ্ধ-সমাপ্তির পর এখানে বহু সশস্ত্র ডাকাতি হচ্ছিল। এটা কমাবার জন্য ডাকাত ধরা পড়লে ওদের সমুদ্রের পারে নিয়ে জনসাধারণের সামনে গুলি ক'রে মারা হ'ত। যদিও বর্তমানে এরকম শাস্তিদান সভ্যসমাজে অনুমোদিত নয় তবু এতে অনেকটা ফল হয়েছিল সন্দেহ নেই।

নাইজেরিয়ায় মেয়েদের স্বাধীনতা ও অধিকার ছেলেদের সমান ব'লে আমার মনে হয়েছে। ওখানকার মেয়েরা খুব কর্মক্ষম এবং স্বামীর মুখাপেক্ষী নয়। সব মেয়েরাই কিছু-না-কিছু উপায়ে স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করে এবং তাদের অর্থের উপর স্বামীর কোন অধিকার থাকে না। দোকানে বাজারে মেয়েদের প্রাধান্যই বেশী। এমনকি দূরদূরান্তর অঞ্চলে গিয়ে পাইকারী হারে জিনিসপত্র খরিদ ক'রে শহরে চালান দেবার কাজও মেয়েদের করতে দেখেছি। উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরের অথবা মন্ত্রীদের স্ত্রীকেও সাধারণ বাজারে দোকান চালাতে দেখা যায়। বাইরে কাজ করলেও ওদেশের মেয়েরা সন্তানদের অবহেলা করে না। শিশুকে কাপড় দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে এরা হাটে বাজারে অফিসে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় অবলীলাক্রমে কাজ করে আর শিশু সর্বক্ষণ মায়ের স্পর্শ পেয়ে নিশ্চিন্তমনে ঘুমায় অথবা জেগেও চুপ ক'রে থাকে। আমাদের দেশে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীরাও এভাবে শিশুকে পিঠে বেঁধে কাজকর্ম করে। কিন্তু নাইজেরিয়ায় শহরের অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের মধ্যেও এ প্রথা দেখেছি। ওদের সন্তানপ্রীতি খুব বেশী। এমনও শুনেছি বিয়ের আগে যদি কারো সন্তান হয়, মা সেই সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সমাজেও তাঁর থাকবার কোন অসুবিধে হয় না। অথবা পরে বিয়ে হ'তেও কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। বরং মেয়েটি যে বন্ধ্যা নয় এই প্রমাণ পেয়ে পুরুষপক্ষ সানন্দেই তাকে বিয়ে করে। এতেই বোঝা যায় নাইজেরিয়দের কাছে সন্তান কত প্রিয়।

নাইজেরিয়ার প্রধান সমস্যা হ'ল উপজাতিগত বিভেদ-বিসংবাদ। এই কারণেই ওখানে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের অভাব। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র ছ বছরের মধ্যে ওখানে প্রথম সৈন্য-অভ্যুত্থান ঘটে যার নেতা ছিল কয়েকজন ইবো সামরিক অফিসার। তারা দেশের প্রধানমন্ত্রী ও আরও কয়েকজন উত্তরাঞ্চলের নেতাদের হত্যা ক'রে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত করে। এর কয়েকমাস পরেই দেশের সাধারণ সৈন্যদল যাদের মধ্যে উত্তর অঞ্চলের হাউসারাই প্রধান, তারা বিদ্রোহ করে, এবং ইবোদের হত্যা করতে আরম্ভ করে। এভাবেই সংঘর্ষ চলে। এরপর ইবোরা বিয়াফ্রা রাষ্ট্র তৈরী ক'রে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করে। তখন জেনারেল গাওয়ান (Gowan) যিনি উত্তরেরও নন, দক্ষিণেরও নন অথবা হাউসা ইওরোবা বা ইবো নন, মধ্য অঞ্চলের ছোট্ট একটি উপজাতির লোক, তাঁকে দেশের নেতা করা হয়। তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে দেশকে গৃহযুদ্ধ থেকে উদ্ধার ক'রে ধীরে ধীরে স্থায়িত্বের দিকে নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে নানাপ্রকার দুর্নীতি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পঙ্কিল ক'রে তোলে। জেঃ গাওয়ান লোক ভাল ছিলেন কিন্তু তিনি এসব দুর্নীতি দূর করতে পারেননি, যার ফলে তাঁকে সৈন্যরা গদিচ্যুত করে। এই ঘটনা আমরা নাইজেরিয়া ছাড়ার কিছুদিন পরে ঘটেছিল। বর্তমানে অবশ্য সৈন্যরা দেশের কর্তৃত্ব নির্বাচন মারফত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক স্থায়িত্বহীনতার অবসান হয়েছে কিনা এত শীঘ্র তা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীম-স্মৃতি

শ্রীশান্তিকুমার মিত্র

১

১৯২৫ সাল। জনৈক ভক্ত ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে স্কুলবাড়ীতে চারতলার ছাতে 'শ্রীম'কে উপবিষ্ট দেখিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। সন্ধ্যা প্রায় ৭টা।

শ্রীম। আজ, এইদিনে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাই মাকে মনে পড়ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ পেয়েছি তো মাত্র ৫ বৎসর, কিন্তু মা ৩৫ বৎসর ধরে বিপদে আপদে রক্ষা করেছেন। মা তো জগতের মা। জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় আসছি, মা ভাত দিয়েছেন—যদিও কম দেখাচ্ছে, কিন্তু চেপে চেপে অনেক ভাত দিয়েছেন। বললুম, 'মা, এত ভাত কি খেতে পারব?' মা বললেন, 'ও বেশী নয়, ও দুটি খেয়ে নাও, বাবা; আবার কখন দুটি জুটবে!' মার স্নেহ যে একবার পেয়েছে, সে আর তাঁকে ভুলতে পারবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখেছি, চেষ্টা করেও ভাবসমাধি ইত্যাদি চেপে রাখতে পারতেন না। কিন্তু মা মহাশক্তি। ভক্ত ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন, হেঁসেলে রান্না করছেন, 'রাধু রাধু' কচ্ছেন, আবার ওরই মধ্যে হয়তো পা দুটি মেলে বসে আছেন, বাইরের কোনও হুঁশ নেই—সমাধিস্থ। ফল্গু নদী। উপরে বালির স্তর, নীচে যে জল আছে, বোঝবার যো নেই। মাকে বুঝবে কার সাধ্য!

জনৈক ভক্ত আত্মীয়বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করেন। কিন্তু মঠে গেলে তাঁকে বড় নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তিনি শ্রীমকে বলিতেছেন, 'হয় আমাকে শেষ করে দিন, নয়তো মনে যাতে শান্তি পাই তাই করে দিন। জন্মান্তরে কি মহাপাপ করেছিলাম জানি না, তাই এই সব সহ্য করতে হচ্ছে।' শ্রীম তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া বলিতেছেন, "যেখানে থাকবে, তাঁদের দু-একটা কাজ করে দেবে, তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। তা বলে মঠে গেলে, কি জপতপে বাধা দিলে, সেকথা কি করে শুনবে! তবে তাঁরা, যাই বলুন, কোনও কথার উত্তর দিও না, শুধু সহ্য করে যাও। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'যে সয়, সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়।' সংসারী লোকের সবই অন্য রকম। ছেলে যদি কুচরিত্র হয়, তাও হাসিমুখে সহ্য করবে, কিন্তু যদি সাধু হতে চায়, তো একেবারে অসহ্য। তবে কি জান? দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন—এসব না এলে কি মানুষ তৈরী হয়? এসব বাধা যত আসবে মন তাঁকে পাওয়ার জন্য আরও দৃঢ় হবে। মহাভক্ত প্রহ্লাদ তাঁকে পাওয়ার জন্য কি কষ্ট ভোগ করেছেন! মহাভাগা গোপীরা, যাঁরা কিনা তাঁকে ছাড়া কিছু জানতেন না—তাঁদেরও কত কষ্ট! ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'Good comes out of evil.' (অমঙ্গল থেকে মঙ্গল আসে)। জন্মান্তরের কুকর্মের ফলেই হক, আর যে কোনও কারণেই হক, কষ্ট পাচ্ছ সত্য; আবার তাঁর পার্ষদদের সঙ্গ, সাধুসঙ্গ—এসবও তো পাচ্ছ। হয়তো দুঃখ-কষ্ট দিয়ে, সংসারের যা স্বরূপ, দেখিয়ে দিয়ে তিনিই তাঁর পার্ষদদের কাছে টেনে নিচ্ছেন। তাহলে দেখ, যেটা কিনা দুঃখ-কষ্ট বলে মনে হচ্ছে, সেটাই আবার শ্রীভগবান যিনি কিনা অনন্ত সুখের আধার, তাঁর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দুঃখই আসুক আর কষ্টই আসুক, তাঁর মুখ চেয়ে, তাঁর উপর নির্ভর করে পড়ে থাকতে হয়। তিনি যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মা ছেলেকে মারছে, ছেলে কাঁদছে, তবুও সেই মায়েরই আঁচল ধরে, মায়ের কাছেই যাবে। আর শান্তি পাওয়া, তাঁর দিকে যত এগুবে ততই শান্তি পাবে, তাঁকে পেলে, তবে সম্পূর্ণ শান্তি পাওয়া যায়। পশ্চিমে সাধুরা কোনও প্রাচীন সাধু দেখলে

জিজ্ঞাসা করেন, 'আপ শান্ত হুয়ে হ্যায়?' অর্থাৎ আপনি শান্ত হয়েছেন কি? মানে তাঁকে পেয়েছেন কি? দুঃখ-কষ্ট এ সবই তো মনের। এমন একটা অবস্থা আছে, যেখানে ও-সব পৌঁছুতে পারে না, যেখানে শুধু আনন্দ।"

ইতিমধ্যে ডাঃ কার্তিক বক্সী ও জিতেনবাবু (বড়) আসিয়াছেন।

বড় জিতেনবাবু। আপনি তো সহজে কথাগুলি বলে গেলেন, কিন্তু ও-অবস্থা তো সহজলভ্য নয়। ও তো একেবারে শেষের কথা, সমাধিস্থ অবস্থার কথা।

শ্রীম। তা বটে, ঠাকুর বলতেন, 'ওখান থেকে অনেকটা নেমে এলে তবে দেহবুদ্ধি আসে।' ক্ষুধা-তৃষ্ণা, heart, lungs-এর কাজ আবার চলতে থাকে।

বড় জিতেনবাবু। আজ Court থেকে বাড়ীতে এসে দেখি জলখাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই চাকরটাকে তাড়াতাড়ি কিছু আনতে বললুম—পেটে কিছু না পড়লে যদি রাগ হয়ে যায়।

শ্রীম। ঐ দেখুন, দেহ-যন্ত্রটাকে আবার সময়-মত কিছু খেতে দিতে হবে, তবে সব টুক টুক করে চলবে। আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য হাওয়াও দরকার। এমন করে নির্ভরশীল করে আমাদের রেখেছে—তবুও 'আমি কর্তা'—এ বোধ যায় না।

ডাঃ বক্সী। শ্বাস-প্রশ্বাস আর heart-এর কাজ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বন্ধ হয় না।

শ্রীম। তাও হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের যখন গভীর সমাধি হত, ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেছেন heart, lungs-এর কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যেত। আর সেইজন্যই যেদিন সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর শরীর যায়, আমরা কেউই প্রথমটা বুঝতে পারিনি। গভীর সমাধি তো তাঁর প্রায়ই হত। কি করেই বা বুঝবো!

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে শ্রীমর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। কথা কহিতে পারিতেছেন না। কণ্ঠ যেন রুদ্ধ। ভৃত্য রামলাল খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল। রাত প্রায় ৯।৷০ টা। ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২

১৯২৫ সাল। জনৈক ভক্ত ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে চার তলার ছাতে আসিয়া দেখেন শ্রীম একটি কিশোরের সহিত কথা কহিতেছেন। বৈকাল প্রায় ৫টা। ছেলেটির কি কারণে যেন রাগ হইয়াছে—বাড়িতে থাকিবে না, যদি থাকার জন্য বেশী বলা হয়, তো আত্মহত্যা করিবে ইত্যাদি বলিতেছে।

শ্রীম। কি হয়েছে বল? আমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করব।

ছেলেটি কিন্তু একই কথা বার বার বলিতে লাগিল।

তখন শ্রীম বলিতেছেন, 'কথা যখন শুনবে না তখন আর কি করা যাবে! তা তুমি তো ভাল এসরাজ বাজাতে পার, এসরাজটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে তো? বেশী রাগ হলে এক এক বার বাজাবে।' এবার ছেলেটি হাসিতে লাগিল।

শ্রীম। আত্মহত্যা মহাপাপ। আমাদের এখানে একজন প্রায়ই বলতেন যে, তিনি আত্মহত্যা করবেন। তাই ঠাকুর তাঁকে বলে-ছিলেন, 'অমন কর্মও কোরো না, প্রেতযোনি হবে। সে বড় কষ্ট।'

জনৈক ভক্ত। কর্মফল ভোগ না করে উপায় নেই। আচ্ছা, সব রকম কর্মের ফলই কি ভোগ করতে হয়?

শ্রীম। তুমি পরীক্ষায় পাস করবে বলে পড়ছ। পাস করলে, ফলটা পেলে, চোর চুরি করলে, জেলে গেল। আবার আছে—জন্মান্তরে যেসব কাজ করেছ, অথচ তার ফলভোগ হয়নি, সেসব

যেন ভাঁড়ারে তোলা আছে। তারই কিছু কিছু হয়তো এজন্মে ভোগ হচ্ছে, কষ্টও খুব পাচ্ছ। কিন্তু জপতপ শ্রীগুরুর উপদিষ্ট কর্ম করলে সেকষ্টও কমে যায়। কেমন জান? খুব কড়া রোদের মধ্য দিয়ে তোমায় যেতে হচ্ছে। মাথায় ছাতা নেই, গরমে যেন মাথার চাঁদি ফাটছে, গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে, জলতেষ্টায় বুকের ছাতি ফাটছে, পায়ে যেন ফোস্কা পড়ছে। এমন সময় একজন তোমায় মাথায় একটা ছাতা, একজোড়া জুতো, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ও একখানি হাতপাখা দিলে। তুমি পাখার হাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হয়ে, জলটা খেয়ে নিয়ে, জুতো পরে, মাথায় ছাতা দিয়ে চলতে লাগলে। রোদ কিন্তু তেমনি কড়া, তবু তোমার কষ্ট আর তত বেশী হচ্ছে না। তাই শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'জপতপেতে কুকর্মের ফল সব নষ্ট হয়ে যায়, বিধিলিপি—তাঁর নিজের লেখা—নিজের কলমে কাটতে হয়।' আরও বলতেন, 'তবে যেখানে ফাল গজাত সেখানে হয়তো ছুঁচ ঢুকচে।' এসবের জন্য ভেবনা অত, শুধু তাঁর শরণাগত হও। 'সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

এইবার ছেলেটি বিদায় গ্রহণ করিল। ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন গান গাহিতেছেন—'আমার মন যদি যায় ভুলে / তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।' গান শেষ হইলে শ্রীম বলিতেছেন, "মৃত্যুচিন্তা। মৃত্যুর তো কোন কালাকাল নেই। এই দেখ না train disaster-এ (রেলগাড়ীর সংঘর্ষে) কতগুলি লোক মারা গেল। আবার হৃষীকেশে গঙ্গার বন্যায় কতগুলি সাধুর ধ্যানস্থ অবস্থায় শরীর চলে গেল। তাই শরীর থাকতে থাকতে তাঁকে ডেকে নিতে হয়। আর অনবরত প্রার্থনা করতে হয়। ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন, 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' কিনা মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতে নিয়ে যাও। কিন্তু তাঁকে না পেলে অমৃতত্ব লাভ হয় না। কিনা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না—'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি।' দেহ তো যাবেই, তবে তাঁকে লাভ করলে—দেহী আর দেহ আলাদা বোধ হয়—এই হাড়মাসের খাঁচা, জড় দেহটাকে আর 'আমি' বলে মনে হয় না।"

বড় জিতেনবাবু। কিন্তু ও তো P. R. S.-দের (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীদের) জন্য, আমাদের মত Infant class-এর ছাত্রদের কি ব্যবস্থা?

শ্রীম। সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম, আর শরণাগতি। সাধুসঙ্গ করতে করতে তাঁর নামে রুচি হয়, আর তাঁর নাম করতে করতে তাঁর উপর নির্ভরতা আসে। এটি এলে আর ভয় নেই। তখন শুধু তাঁর নামটি নিয়ে শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে পারলেই হল। বেরাল-ছানা, হয়তো চোখও ফোটেনি, 'মিউ মিউ' করে শুধু মাকে ডাকে, মা মা করে। মা কখনও হেঁসেলে, কখনও আঁস্তাকুড়ে, কখনও বা বাবুর বিছানায় রাখছে—মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। মাধুকরীই বল, আর যা কিছু বল—এই নির্ভরতাটুকু আনার জন্যই তো!

জনৈক ভক্ত। তাঁর নাম করতে মন বসে না, কি করব?

শ্রীম। প্রথম প্রথম জপ করা হয়ত নীরস বোধ হয়। তবে মন না বসলেও জপ করা দরকার—জপাৎ সিদ্ধিঃ। আর মন কি এক দিনেই বসবে? তাঁকে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে হয়—তাঁর কৃপাতে মন স্থির আপনিই হবে। তখন আবার জপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হবে না। মাংসের হাড় চিবুতে চিবুতে কুকুরের হয়তো মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে, তবুও হাড় চিবুনো ছাড়ে না। কিন্তু হাড় ভেঙে গিয়ে, মজ্জার স্বাদ যদি একবার পায় তো আনন্দে সব কষ্ট ভুলে যায়। নামজপের স্বাদ একবার যদি কেউ পায়, আর কিছু ভাল লাগে না। বাধা পড়লে বিরক্ত হয়। তিনি আর তাঁর নাম

তো আলাদা নয়—এক। এই নামের চাকায় সংসারের সব বন্ধন, জন্মান্তরের খারাপ সংস্কার, পাপ-তাপ সব কেটে যায়—দেহমন পবিত্র হয়। তাঁর নামেতে মৃত্যুভয় থাকে না—শুধু আনন্দ। মৃত্যুটা আর কি? একটা অবস্থা বৈ তো নয়—কৌমার, যৌবন, জরা যেমন—মৃত্যুও তো তাই।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি)। কিগো, সকালে প্রথম ষ্টীমারে মঠে গিয়ে সাধুদের ধ্যানমূর্তি দর্শন হল? কেমন লাগল?

ভক্ত। হ্যাঁ, চমৎকার স্থান, পাশেই গঙ্গা, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা ধ্যান করছেন, দেখলাম। আমি রোজ ভোরে যেতে চেষ্টা করব।

শ্রীম। দেখ, ধ্যান-অবস্থা হচ্ছে মানুষের সব চাইতে উচ্চ অবস্থা। আর এঁরা প্রকৃতই সাধু। থিয়েটারের সাজা সাধু নয়। তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে ওখানে পড়ে আছেন। তাঁকে ডাকছেন, তাঁকে নিজের দুর্বলতা জানাচ্ছেন, তিনি অন্তর্যামী, প্রার্থনাও শুনছেন।

ভক্ত। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে কোনও কথাবার্তা হল না।

শ্রীম। কথা নাই বা হল! ওঁদের হাওয়া গায়ে লাগলে চৈতন্য হবে। মহাপ্রভু ধোপার গাধার উপর গেরুয়া দেখে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন, কিনা সন্ন্যাস আশ্রম মনে পড়েছে। সাধুসঙ্গ করলে—সাধুরা কি করছেন, আর আমরা কি করছি, এটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—যেমন wrong ঘড়ি, right ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়। অন্য সময় মঠে গেলে সাধুদের স্বরূপ বোঝা যায় না কিন্তু ভোরবেলায় ঐ সুযোগটি পাওয়া যায়।

ভক্ত। আমরা আপনাদের কাছে আসি, প্রাণে শান্তি পাই। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য দুঃখ-কষ্ট আর যেন বোধ করতে পারি না। কিন্তু আপনাদের তো বয়স হয়েছে। শরীরও ভাল না। এরপর এতবড় সঙ্ঘ কি করে চলবে? আমাদের মত যারা, সংসারে জ্বলেপুড়ে মরছে, তাদেরই বা কি উপায় হবে?

শ্রীম। কেন? তিনিই একমাত্র উপায়। আর যতদিন এই সঙ্ঘে একটিমাত্র খাঁটি সাধু থাকবেন ততদিন 'তিনি'ই এই সঙ্ঘশরীরে থেকে সঙ্ঘ চালাবেন। এখনও তো তাঁর পার্ষদরা অনেকে রয়েছেন—এঁদের সঙ্গ যতটা পার করে নাও, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার বদলে যাবে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ৩০ বৎসর বাস করে গেলেন। বেলুড় মঠে স্বামীজী দেহ রাখলেন। ওখানে কত সাধনভজন হয়েছে। ওসব মহা তীর্থস্থান। ওসব স্থানে মন সহজেই ভগবন্মুখী হয়। আর অবতার কি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ—এঁদের শরীরটাই তো সব নয়, শরীর চলে গেলেই কি সব গেল? অনেক সময় এঁরা সূক্ষ্মভাবে লোককল্যাণ করেন।

আজ মঠ থেকে তিন জন সাধু এসেছিলেন—দুজনই মালাবারের লোক। একজন বড় গোলমালে পড়েছেন। তাই প্রশ্ন করলেন—'ঠাকুরের তো উপদেশ যুগধর্ম ভক্তিযোগ। স্বামীজী বলেছেন কর্মযোগ, এখন কোন্ পথে যেতে হবে?' আমরা বললুম, স্বামীজীর কর্মযোগ পড়েছেন, তাঁর ভক্তিযোগও আছে। সেটা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। যখন কর্মের কথা বলেছেন, তখন তার উপরই জোর দিয়েছেন। মানে অধিকারিভেদে বলেছেন এ কথা।…আমাদের মিশনের যে কাজ, এতো চিত্তশুদ্ধির জন্য। ভগবৎ-বুদ্ধিতে সেবা করলে চিত্তশুদ্ধি হয়, তারপর তাঁতে ভক্তি হয়। এ সব altruistic কাজ—এই হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি নিষ্কাম হয়ে করলে এ সব মুক্তির সহায় হয়।

শ্রীম

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[ভাদ্র, ১৩৮৮ সংখ্যার পর]

ষোড়শীপূজার অন্তে ঠাকুর মায়ের শ্রীচরণে তাঁর সকল সাধনসিদ্ধি, জপমালা ও নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে, সবকিছু শ্রীমায়ের সুরক্ষায় রেখে, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে, "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়। তোদের ছাড়া আমি যে থাকতে পারিনে", অন্তরের এই ঈশ-আহ্বানে অন্তরিক্ষ আলোড়িত করে তাঁর নূতন ইষ্টপথে অভিযান শুরু করেছিলেন।

যাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন: "ওকি যে সে, ও আমার শক্তি!", সেই মহাশক্তির পূর্ণ পোষকতায় সমৃদ্ধ হয়ে তিনি মহোৎসাহে ধর্মসংস্থাপন ও জীবোদ্ধারের কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন।

আত্মভোলা আলুথালু ব্যক্তি হলেও ঠাকুরের ধর্মসংস্থাপনের অভিযানের সূচনাটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে পুনরায় 'শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে' এই অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপৃতি প্রথম থেকেই ছিল অতি কুশলী সৈনাপত্যপূর্ণ। এটি ভবতারিণীর চাতুরী না রামকৃষ্ণের বাহাদুরী, এ নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন নেই। কারণ, 'যেমন করাও তেমনি করি,' ঠাকুরের এই ভাবের ঘরে তো আর কোন চুরি ছিল না। কাজেই সিদ্ধান্ত অতি সহজ।

পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসার কিছুদিন পরেই তাঁর অপার্থিব তাৎক্ষণিক ত্যাগের শক্তিতে রামকৃষ্ণজয়দায়িনীর ভূমিকায় নিজের অজ্ঞাতে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন।

এর পর থেকে শুধু জয়, রামকৃষ্ণের জয়। কালের তরঙ্গের শিরে শিরে হালকা চরণের নৃত্য-রঙ্গে আগুয়ান। রামকৃষ্ণের শুধু জয়, আর জয়।

এটি সম্ভব হওয়ার পেছনে ছিল ভবতারিণীর ইচ্ছাশক্তি ও সারদার সেবাশক্তি।

স্বামীজীর ভাষায়, '...কালী নিজলক্ষ্য সাধনার্থ রামকৃষ্ণের দেহযন্ত্র নির্মাণ ও পরিচালনা করে-ছিলেন।' কালীর নিজ লক্ষ্য ও ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-কথিত (৪।৬-৮) অবতারের অবতরণের হেতু-বিস্তার একই কথা।

কালীর ইচ্ছাশক্তি কার্যকরী হয়েছিল শ্রীমায়ের সেবাশক্তির সুদক্ষ নিয়োগে। শ্রীমায়ের সদাজাগ্রত, চির অকুণ্ঠ ও অতন্দ্র সেবাপরায়ণতা যদি ঠাকুরকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত না করত, আর শ্রীমা যদি না হতেন তাঁর মহাকুশলী ও অফুরন্ত সরবরাহ-আধান, ঠাকুরের ধর্মসংস্থাপনের ও জীবোদ্ধারের ঈশ-কর্ম এত সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারত না।

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর অনুপস্থিতির দরুন বা অন্য কোন কারণে শ্রীমায়ের নিশ্চিন্তকারিণী সেবা যখনই ব্যাহত হয়েছে, ঠাকুরের আর্তি তখনই অনুরণিত হয়েছে, যেমন করে অসহায় শিশুর হৃদয়ের আবেদন ক্রন্দিত হয় আশেপাশে মায়ের অভয়ভরা আকাশ-জোড়া উপস্থিতির অভাববোধে। ঠাকুরের এ অসহায় আর্তি এত করুণ যে গভীরভাবে ভাবলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সর্বশক্তিমান অথচ একের অভাবে এত অসহায়! আর ঠাকুরের এই অসহায়তার দিব্য শুচিতায় শ্রীমায়ের মহা-শক্তিকান্ত 'রাষ্ট্রী বসূনাং সংগমনী'—বয়ানের একখানি মহিমোজ্জ্বল পরিলেখ প্রতিভাত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা সারদার এই যে ভাব-আবির্ভাব, এর গাম্ভীর্যের ভাষা-বর্ণনা অসম্ভব।

শ্রীত্রৈলোক্যবাবুর কন্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কুমারীরূপে পূজা করার অপরাধে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তাঁর

স্থলে রামলালদাদা কালীর পূজারী নিযুক্ত হলেন। অচিরে এই গৌরবের অহঙ্কারে তিনি ভাবলেন : 'আর কি, এবার মা কালীর পূজারী হয়েছি!' সুতরাং তিনি আর ঠাকুরের দেখাশুনা তেমন করতেন না। অন্য কেউ দেখবারও নেই। আর তখন তাঁর মুহুর্মুহুঃ সমাধি হত। অনেক সময় বাহ্যচৈতন্য-রহিত অবস্থায় থাকতেন। কেউ যত্ন করে ধরে না খাওয়ালে কালীর প্রসাদ শুকনো হয়ে পড়ে থাকত।

খাওয়াদাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হতে থাকায়, যে কেউ কামারপুকুর অঞ্চলে দেশে যেতেন শ্রীঠাকুর তাঁকে দিয়ে শ্রীমাকে পুনঃ পুনঃ বলে পাঠাতেন দক্ষিণেশ্বরে আসবার জন্য। কামার-পুকুরের লক্ষ্মণ পাইনকে দিয়ে সংবাদ পাঠালেন, 'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে, রামলাল মা-কালীর পূজারী হয়ে বামুনদের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর অত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে, ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক; দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।'[৩৬]

ঠাকুরের এত জরুরী তাগিদ পেয়ে শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এলেন। এক বছর আসেননি।

শ্রীমায়ের এক বছরের অনুপস্থিতি-কালে ঠাকুর নিজেকে কতটা অসহায় বোধ করেছিলেন তার পরিমাপ এই নির্দেশিকায় করা চলে, মা-কে দক্ষিণেশ্বরে আনাবার জন্যে ঠাকুর তাঁর জীবনে একটি মাত্র আর্থিক প্রতিশ্রুতি করতেও বাধ্য হলেন! যখন তাঁর সাত টাকা মাইনের হিসেব নিয়ে গোল হচ্ছিল, মা তখন খাজাঞ্চিকে বলতে পরামর্শ দেওয়ায় ঠাকুর বলে উঠেছিলেন, 'ছি! ছি! হিসাব করব?'[৩৭] কিন্তু এখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের উপস্থিতি এতই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল নিজের প্রাণ ও ব্রত ধারণের জন্যে যে তিনি বললেন, '...তুমি অবশ্য আসবে, ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক; দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।'

শ্রীমায়ের উপর ঠাকুরের যে অপরিমেয় নির্ভরতা তার কয়েকটি কারণ তাঁদের যুগ্মজীবনে ইতিপূর্বেই সূচিত হয়েছে। ঠাকুর তাঁর নিজেকে সুদ্ধ সর্বস্ব —সাধন-সিদ্ধি-জপমালা মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করে একান্তভাবে রিক্ত হয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি কি জানতেন না যে তাঁর নিজ জীবনব্রতে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে শ্রীমায়ের কেন্দ্রীয় স্থানও সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে?

যিনি ঠাকুরকে তাঁর ইষ্টপথে সাহায্য করতেই বিশেষ করে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী দ্বারা আনীতা হয়েছিলেন, তাঁর সাহায্য-ধারাটি কিন্তু হল এক অভিনব তপস্যা। সারদার তপস্যার যজ্ঞভূমি দক্ষিণেশ্বরেই এখন ঠাকুরের নূতন ইষ্টপথের অভিযান শুরু হল। সে এক দিব্য লীলাপ্রচুর কাহিনী।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির-উদ্যানের নহবত নামক সে ছোট্ট ঘরটিতে[৩৮] শ্রীমা দীর্ঘ তের বছর ধরে যে অত্যাশ্চর্য তপস্যা করেন, তারই সুধৃতি-শক্তির

৩৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৫, পৃঃ ১১৯

৩৭ তদেব, পৃঃ ৭৭

৩৮ ছোট্ট বলতে যে কত ছোট, সে ঘরটি যাঁরা দেখেননি তাঁদের ধারণা করার জন্য বলা হচ্ছে: "নহবতের ঘরখানি অষ্টভুজ। উহার সমদীর্ঘ প্রত্যেক দেওয়ালের ভিতরের মাপ ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি; এক দেওয়াল হইতে অপর দেওয়ালের সর্বাধিক দূরত্ব ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি, মেজের মাপ কিঞ্চিন্ন্যূন ৫০ বর্গ ফুট। ঘরের চারিদিকে কম-বেশী ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া বারান্দা। ঘরের উচ্চতা ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি। দক্ষিণের একমাত্র দরজা উচ্চে ৪ ফুট ২ ইঞ্চি, প্রস্থে ২ ফুট ২ ইঞ্চি। বারান্দার পূর্ব ভাগে দোতলায় যাইবার সিঁড়ি; উহার নীচে রান্নার জায়গা।" (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৪৪)

চক্রদণ্ডে আহিত হয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের উত্তরার্ধের জগদ্ধিতায়, ধর্মসংস্থাপনার্থায়, জীবোদ্ধারায় সকল সাধন নিয়মিত ও বিবর্তিত হয়

রামকৃষ্ণজীবনের পরতে-পরতে তাঁর সাধন-সিদ্ধির জন্যে যখন-যা প্রয়োজন হয়েছে ভবতারিণী অবলীলায় তা সব জুগিয়ে এসেছেন এতদিন। মহামায়ার নিয়মন-প্রভাবেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন।

যখন আপাতদৃষ্টিতে ঠাকুরের সকল সাধনা সমাপ্ত, তখন ভবতারিণী চলার পথে এগিয়ে গিয়ে সারদাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। আপন 'নিয়োগে' ষোড়শী পূজা করিয়ে সারদার দেবীত্বকে প্রকট করে ও তাঁতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সকল আহৃত অধ্যাত্ম সম্পদ আহিত করে ও সুরক্ষিত রেখে ভবতারিণী এখন রামকৃষ্ণকে অবতারের আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত করলেন।

মুক্ত-দুবাহু ঠাকুর অতিনিশ্চিন্ত না হলে অত নৃত্য করতে পারতেন না!

যাঁর সাধন-শক্তিবলে ঠাকুর এমন অতিনিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন তাঁরই নাম সারদা। জগদম্বার উপর যে নির্ভরতা ঠাকুরের বরাবর ছিল, সেই একইরূপ নির্ভরতা ঠাকুরের জীবনের উত্তরার্ধে সারদার উপর হল এখন সারদা বিনা তাঁর কিছুতেই চলত না চলবে কি করে? তোমার বাহুতে যে শক্তি সে শক্তি যদি কেউ কেড়ে নেয়, তুমি বোঝা উঠাবে কি করে?

তাই সারদার সম্বন্ধে ঠাকুরের একটি সার্থক উক্তি: 'ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!'[৩৯] শক্তি না হলে কার কি করে চলে?

প্রাকৃত জনের মনে হতে পারে শ্রীমা বিনা ঠাকুর এত অসহায় কেন বোধ করতেন? কারণটি অতি সরল। যাঁর যতবড় শক্তি ও দায়িত্ব, আপন শক্তি বিনা তিনি তত অসহায়। অন্য দিক থেকে এটিই হল ঠাকুরের মাতৃ-সাধনার পরাকাষ্ঠা মা-ই সব, আমি কিছুই নই।

সহধর্মচারিণী শ্রীমাকে এই তাৎপর্যপূর্ণ গানটি ঠাকুর কখনো কখনো গেয়ে শোনাতেন:

'এসে পড়েছি যে দায়
সে দায় বলবো কায়
যার দায় সে আপনি জানে
পর কি জানে পরের দায়।
হয়ে বিদেশিনী নারী,
লাজে মুখ দেখাতে নারি
বলতে নারি, কইতে নারি,
নারী হওয়া একি দায়॥'[৪০]

সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে মাকে বলতেনও 'শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।'[৪১]

এ শেষ পর্যায়ের কথা হলেও এই হল তাঁদের যুগ্মজীবনের কেন্দ্রীয় মর্ম-কথাটি।

শ্রীমায়ের জীবন-সাধনাটিতে রামকৃষ্ণ-কথিত 'আগে ফল, পরে ফুল'-এর একটি অপূর্ব নিদর্শন পাই। পূর্ব-সংস্কারাদি অজ্ঞাত কথা ছেড়ে দিলে আমরা দেখতে পাই যে জয়রামবাটীর পল্লীতরুণী সারদা দক্ষিণেশ্বরে এসেই কিছুকালের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অশ্রুতপূর্ব সকল সাধনার নিবেদিত সকল ফল এবং স্বয়ং ঠাকুরকে তাঁর শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত অর্ঘ্যরূপে পেলেন। তাঁর অন্তর্ভেদী যোগদৃষ্টিবলে ঠাকুর যদি না জানতেন যে সারদা এই গুরুভার বইতে সমর্থা হবেন, তবে কি তিনি তাঁতে এ অমূল্য সম্পদ ন্যস্ত করতেন?

ঐ অজ্ঞাত পল্লীর কুটোবাঁধা কনেটি যে তেরটি বছর পেরিয়ে এসে দেবীর আসনে অধিষ্ঠাতা হলেন এমন নজির জগতের ধর্ম-ইতিহাসে আর

৩৯ তদেব, পৃঃ ১২৭
৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৩২১
৪১ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৩৪

একটিও আছে কি ?

শ্রীমা যে অবলীলায় ঠাকুরের সকল পূজা-নৈবেদ্য গ্রহণ করে সাধারণ মানবীর মতই দৃশ্যমানা ও সেবাপরায়ণা হয়েই থাকলেন, এটি যে তাঁর অন্তর্নিহিত ও অধুনা-প্রকটিত মহাশক্তিবলেই সম্ভব হয়েছিল, এ নিয়ে শ্রীমায়ের আত্মসচেতন কোন ভাবনা ছিল না। বরং এ বিষয়ে কেউ তাঁর সমক্ষে কোন উক্তি করলে অতি মধুর বিনয়ের সঙ্গে বলতেন : 'বাবা, ঠাকুর দয়া করে তাঁর পায়ে স্থান দিয়েছিলেন বলে বর্তে গেছি।' এমন বিভূতিহীন মহাশক্তি ! তবে জীবনের প্রারম্ভেই যে ঠাকুরের সাধন-সিদ্ধি ফল তাঁর আয়ত্তে এল, তার অতিকুশলী ধারিকা-বাহিকা-পরিবেশিকা হতে-থাকতে তাঁকে কঠোর তপস্যা জীবনব্যাপী অতি নিজস্ব মৌলিক ভাবে করতে হয়েছিল, 'আগে ফল, পরে ফুল'-এর ব্যতিক্রান্ত নিয়মে।

শ্রীমায়ের তের বছরের নহবতের জীবন হল তাঁর মুখ্য সাধনার প্রথম পর্ব। অবস্থাধীনে যদিও তিনি অবগুণ্ঠিতা অন্তরালবাসিনী হয়ে থাকলেন, চক্ষুষ্মানদের কাছে এ সময়েও তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রকাশ হতে থাকল আচার্য শংকরের ভাষায়, 'নানাচ্ছিদ্র-ঘটোদরস্থিত-মহাদীপ-প্রভাভাস্বরম্'। বহুছিদ্র ঘটের অভ্যন্তরে স্থাপিত একটি মহাদ্যুতি প্রদীপের ভাস্বর প্রভা যেমন করে ছিদ্রপথে বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি করে নহবতবাসিনী তপস্বিনী শ্রীমায়ের প্রোজ্জ্বল মহিমা তাঁর ঐ সাধনপীঠের দরমার বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসত।

দক্ষিণেশ্বরে নহবতপীঠে শ্রীমায়ের তপস্যার অভিব্যক্তিটি মানুষের ধর্মের ইতিহাসে একটি অত্যুজ্জ্বল মৌলিক অধ্যায়। মায়ের তপস্যা কোন গতানুগতিক অনুশাসন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়নি। সবটাই হয়েছিল অবতীর্ণ ভগবানের লীলাসঙ্গিনীর ঘর সামলানোর ও সরবরাহ-আধানটির অনলস, সদাজাগ্রত, একান্ত নিঃস্বার্থ, স্বতঃপ্রণোদিত কুশলতার সমুত্থানে। আর এটি করতে গিয়ে সারদা যখন ঘরকন্নায় ব্যস্ত, তৎসঙ্গে তাঁর অজ্ঞাতেই যেন তাঁর চরিত্রে ঝলমল করে উঠল শাস্ত্রোক্ত শুদ্ধাতিশুদ্ধ সব দৈবী সম্পদ :

> চিত্তপ্রসন্নতা, ঈশ্বরলাভে পরিনিষ্ঠা, অন্নাদি-দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, যজ্ঞ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, জীবে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, লজ্জা, চপলতাশূন্য ভাব, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, ও লোক-মান্যাকাঙ্ক্ষাশূন্যতা।[৪২]

এমনি কত মণি যে পড়েছিল ঐ চিন্তামণির নাচদুয়ারে !

যুগাবতারের চাপরাস পাওয়া আচার্য স্বামীজী তাঁর সকল ধর্মবাণী ও শিক্ষার সার এই একটি অতি সংক্ষিপ্ত মহাবাক্যে প্রকাশ করেছেন :

> "'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—এ দুটি বিষয়ে উহাতে প্রগাঢ়তা আনয়ন করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা হইতেই উন্নত হইবে।"[৪৩]

মহানিশার নিঃসঙ্গ তমিস্রায় আজকের বহু সমস্যাপর্যুদস্ত মানবসভ্যতার প্রাণের অসহায় ক্রন্দন যিনিই হৃদয় পেতে শুনে ধ্যানস্থ হয়েছেন তিনিই জানেন 'ত্যাগ ও সেবা' শুধু যে ভারতেরই জাতীয় আদর্শ তা নয়, এটি জিজীবিষা-কাতর সকল মানবজাতির আদর্শের আগামী তরঙ্গ। মানুষের সামূহিক সভ্যতার রক্ষণ, পোষণ, পরিবর্ধন, বিবর্তন একমাত্র ত্যাগ ও সেবার

৪২ দ্রষ্টব্য : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১৬।১-৩

৪৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, নবম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৪৭৮ (উদ্ধৃতির ভাষা লেখক কর্তৃক কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত)।

আদর্শের ভিত্তিতেই সম্ভব। পরস্পর বিরোধী নানাদর্শের সংগ্রাম ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে মানবজাতি হয়ত বা এই আবিষ্কারের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

উন্মুক্ত মৃত্যুতোরণে সবেগে প্রবেশোন্মুখ মানবজাতি আত্মহত্যার সর্বনাশা নেশাকর্ষণ থেকে নিজের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিয়ে, যদি অন্য দিকে তার প্রসন্ন ভদ্রদৃষ্টিকে একাগ্র নিবদ্ধ করতে পারে, দেখতে পাবে অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছেন সুধাপাত্র হাতে উদয়নের নবানুরঞ্জিতা ত্যাগ ও সেবাদর্শের মূর্তিমতী শ্রীমা। তিনি যে শুধু জগতের সকলকে নিজের অঙ্গনে আপন করে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি সকলের পরম পুরুষার্থের পরমান্ন রেঁধে বসে আছেন।

এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শটি যে সনাতন বৈদিকধর্মের প্রাণকেন্দ্র থেকে ব্যুত্থিত হয়েছিল এ তথ্য ও তত্ত্বটি গবেষক পরিবেশন করেছেন। কিন্তু এই আদর্শকে যুগোপযোগী ভাবায় জাতির সম্মুখে নূতন উদ্দীপনায় উপস্থাপিত করবার পূর্বে স্বামীজী দেখেছিলেন, ঐ প্রত্ন আদর্শ কি নিখুঁত সম্পূর্ণতা ও সুষমা-মণ্ডিত হয়ে মায়ের জীবনে প্রতিভাত হয়ে আছে।

ত্যাগ ও সেবার আদর্শের মূর্ত বিগ্রহটি হয়েই যেন শ্রীমা এলেন মানুষের আসরে, জগৎ-হিতায়। কারো দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে বা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করে এ আদর্শ তাঁকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে হয়নি। আশ্চর্য হয়ে আমরা ভাবি এ অভাবনীয় মহত্ত্ব শ্রীমা কখন কি করে অর্জন করলেন! [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

শ্রীভগবল্লীলাচিন্তামণিঃ: শ্রীকমললোচন শর্মা। সম্পাদক: ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। প্রকাশক: মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মাণিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা-৫৪। পৃঃ ৩০২, মূল্য: সাত টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে ভাবের বৈচিত্র্যে পুষ্ট সে সকল গ্রন্থের মধ্যে শ্রীভগবল্লীলাচিন্তামণিঃ গ্রন্থখানি কিন্তু অপূর্বতায় সংস্কৃতশাস্ত্রাভিজ্ঞ পাঠকগণের মহা কৌতুহল উৎপাদন করার সামর্থ্য রাখে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটি মাত্র এই গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে এবং ঐ শ্লোকটির সাতাশি প্রকারের ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটিতে অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চতম তত্ত্বকে সন্নিহিত করে শ্রীভগবল্লীলার গভীরতা প্রকাশ করেছেন। সাধক পণ্ডিত কমললোচন আধ্যাত্মিক-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে মহর্ষির আশীর্বাদে ঐ শ্লোকটিতে সন্ধান পেয়েছেন সমগ্র ভাগবতের ব্যাপকতার। লেখক তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন শ্লোকের ব্যাখ্যাগুলির মাধ্যমে যেখানে তিনি উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন ভাগবতের প্রধান প্রধান লীলাকাহিনী, ভক্তমহিমা-প্রসঙ্গ এবং অবতারের সাক্ষাৎস্বরূপলীলা পৃথক্ পৃথক্ প্রসঙ্গ ও প্রক্রম রক্ষা করে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বর্তমানরূপ পেয়েছে ব্যাখ্যাগুলির বঙ্গানুবাদ ও যোগসূত্র সংযোজনের ফলে। এই সংযোজনের দ্বারা ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ভক্তসাধারণের জন্য অপূর্ব গ্রন্থখানির রসাস্বাদন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দুরূহ ব্যাখ্যাগুলির সহজ স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাখ্যায় বর্ণিত লীলাকাহিনী-সকলের মধ্যবর্তী যোগসূত্র গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্যের সাথে উপাদেয়তাও বৃদ্ধি করেছে। ভক্তপাঠকগণ এই অল্পপরিসর গ্রন্থ পাঠ করে সমগ্র ভাগবতের

রসাস্বাদন করতে পারবেন।

সুধী ব্যাখ্যাকার যিনি লোকলোচনের অন্তরালে থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হৃদয়নিস্যন্দী ভক্তির ফল্গুধারা উৎসারিত করে লীলা-ব্যাখ্যার অবসরে আপন মনীষা প্রকাশ করেছেন, তাঁর পরিচয় পেতেন শুধু সংস্কৃত-ভাষানুরাগী পাঠক যদি না ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ সকলের গ্রহণযোগ্য করে সেই অমূল্য ব্যাখ্যাগুলির অনুবাদ ও যোগসূত্রসহ গ্রন্থখানি পুনঃপ্রকাশ করতেন। শ্রীহট্টের সেই বৈষ্ণব সাধক পণ্ডিত কমললোচন আপন পরিচয় অল্পমাত্রই উল্লেখ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের তাঁর এই মৌলিক ব্যাখ্যা-সংযোজন ভগবদ্ভক্ত পাঠকগণের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

পুস্তকটির আকার এবং মুদ্রণের আয়াস বিচার করলে মনে হবে পাঠকের যাতে সহজলভ্য হয় সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে পুস্তকের মূল্য খুব অল্প ধার্য করা হয়েছে। **স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ**

চক্রবাল : জ্যোতির্ময়ী দেবী। প্রকাশিকা : শ্রীমতী শেফালী গুপ্ত, সিস্টেম লাইব্রেরী, ২৪:-সি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৪। (১৩৮৬), পৃঃ ৭০ । ১১ ; মূল্য : আট টাকা।

বছর চারেক আগে 'উদ্বোধনে' জ্যোতির্ময়ী দেবীর একটি কবিতা পড়েছিলাম। কবিতাটির নাম 'আহ্নিক কৃত্য'। তার প্রথম লাইনটি— 'রাত্রি কথা কয়ে যায় চিরকাল তারার অক্ষরে'— পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বুঝেছিলাম, জ্যোতির্ময়ী দেবী শুধু ঔপন্যাসিক বা গল্পলেখিকাই নন, যথার্থ কবিমনের অধিকারিণী। 'উদ্বোধনে' তাঁর আরও অনেক কবিতাই পড়েছি এবং পড়ি, ভাল লাগে। অন্তরকে স্পর্শ করে তাঁর কবিতাগুলি। অনেক মাথা ঘামিয়ে যে কবিতার মর্ম উদ্ধার করতে হয় —আমার বুদ্ধিতে—তাকে কবিতা বলা চলে না। কবিতা হৃদয়ের ব্যাপার, মস্তিষ্কের নয়। এই নিরিখে জ্যোতির্ময়ী দেবীর কবিতাগুলি সার্থক কবিতা—রসোত্তীর্ণ কবিতা।

তাই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত জ্যোতির্ময়ী দেবীর কিছু কবিতার গ্রন্থরূপ দেখে তৃপ্তি পেলাম। তাঁর সমস্ত কবিতাই যদি গ্রন্থায়িত হত, তাহলে আরও সুখী হতাম।

প্রথম কবিতাটির নামানুসারে গ্রন্থটির নাম রাখা হয়েছে 'চক্রবাল'। এতে সত্তরটি কবিতা সঙ্কলিত। 'উদ্বোধনে' তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে মাত্র নয়টি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'বিদ্যাসাগর' কবিতাটি (পৃঃ ৩৯-৪০) ১৩৭১ সালে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত, লেখা আছে। এটি ছাপার ভুল মনে হয়। ১৩৭১ সালে তো নয়ই, আদৌ 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। ছাপার ভুল আরও আছে। যেমন 'নিবেদিতা' কবিতাটির 'উদ্বোধনে' প্রকাশ-কাল ১৩৭৬-এর আষাঢ় লেখা আছে; হবে ১৩৭৬-এর আশ্বিন। পরবর্তী সংস্করণে এই সামান্য ত্রুটিগুলি সংশোধিত হবে, আশা করি।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর কবিতা'—এই শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অতি হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা লিখেছেন গ্রন্থটির। সুন্দর মূল্যায়ন করেছেন তিনি জ্যোতির্ময়ী দেবীর কবিতার। আমার এবং আমার মতো আরও অনেকেরই মনের কথা তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত লেখায় রূপ পেয়েছে। তাই তাঁরই মন্তব্য উদ্ধৃত করে শেষ করছি : 'কবিতাগুলি পড়ে মনে হয় কবিযশঃ-প্রার্থিনী হয়ে এগুলি রচিতও হয়নি। এ লেখা তো মনের বাহন, না লিখে মুক্তি নেই। যখন যেভাব মনে এসেছে সাবলীলভাবে এবং অবলীলা-ক্রমে কবিতাগুলি লেখনীমুখে এসে গেছে। কবির সেই খুশীর ফসল আজ গোলাজাত হ'ল। এই অভিনব নবান্নর উৎসবে পাঠকদের আবাহন করে বিদায় নিই।' **শ্রীগঙ্গানন্দ দাস**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে :

গৃহ ও বিদ্যালয়-ভবনের নির্মাণকার্য বন্যাবিধ্বস্ত **উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ,** গুজরাত এবং পশ্চিমবঙ্গে যথারীতি অব্যাহত।

বাংলাদেশে :

দুইটি কেন্দ্রে বস্ত্র-বিতরণ, তিনটি কেন্দ্রে দুগ্ধ-বিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রে অ্যালোপ্যাথি ও দুইটি কেন্দ্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা যথারীতি চলিতেছে।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা এই বৎসরও যথোচিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজার কয়দিনই আবহাওয়া ভাল ছিল এবং প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। পূজার তিনদিনই খিচুড়ি প্রসাদ সবাইকে হাতে হাতে বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত ২৪টি শাখাকেন্দ্রেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় : আসানসোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাক, গৌহাটি, জলপাইগুড়ি, **জামসেদপুর,** জয়রামবাটি, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখ্‌নৌ, মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র কলকাতার 'বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম' পরিচালিত আন্তঃরাজ্য আলোচনায় যুগ্ম-প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছে।

মাদ্রাজ সারদা বিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রী ১৯৮১-র মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত তামিলনাড়ু রাজ্যের এস. এস. এল. সি. পরীক্ষায় ষষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

উদ্বোধন সংবাদ

গত ১০ই কার্তিক, মঙ্গলবার (২৭শে নভেম্বর, ১৯৮১) রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে প্রতিমায় **শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা** যথারীতি ভজনকীর্তনসহ সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। পূজায় তন্ত্রধারক ছিলেন স্বামী [illegible]ানন্দ এবং পূজারী ছিলেন ব্রহ্মচারী [illegible]চৈতন্য।

দেহত্যাগ

স্বামী সত্যানন্দ ([illegible] মহারাজ) গত ২৫শে অক্টোবর ১৯৮১, বেলা ৩-১০ মিনিটে হৃৎপিণ্ডের অংশবিশেষে রক্ত-সরবরাহ সহসা বন্ধ হওয়ায় [illegible] বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ডায়াবেটিসে এবং কিছুদিন যাবৎ পাকস্থলী সংক্রান্ত অসুখেও ভুগিতেছিলেন। গত ২রা অক্টোবর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে বেলুড় মঠ হইতে সেবা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়।

তিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তমলুক আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তমলুক কেন্দ্র ব্যতীত বেলুড় মঠ, কনখল এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান কেন্দ্রে কাজ করেন। সরল ও মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

আবেদন

এলাহাবাদে অর্ধকুম্ভ মেলা শিবির, ১৯৮২

আগামী ৯ই জানুআরি থেকে ৯ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত প্রাচীন ত্রিবেণী সঙ্গমতটে বিখ্যাত অর্ধকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসী ভারতের প্রায় সমস্ত প্রান্ত হতে ত্রিবেণীতে অবগাহন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে উপস্থিত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এবারের অর্ধকুম্ভের বিশেষত্ব সোমবতী অমাবস্যা যা সাধারণতঃ বহু বৎসর অন্তর উপস্থিত হয়ে থাকে। সমবেত সাধু ও তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনবোধে চিকিৎসার সুযোগের জন্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের তরফ থেকে মেলাস্থানে একটি সাময়িক শিবির খোলা হবে। এই সাময়িক শিবিরের অন্তর্গত এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়ে সমাগত সাধু ও তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজের জন্যে প্রয়োজন যোগ্য ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও স্বেচ্ছা-সেবকের ঐকান্তিক সহায়তা। প্রায় চারশত ভক্তের ও একশত সাধুর মেলাস্থলে বাস করার ব্যবস্থা করা হবে। সৎসঙ্গ-ভবন স্থাপনের প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে। এই সব করতে আন্দাজ ১ লক্ষ টাকার মতো ব্যয় হবে। তাই রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সকলের কাছে আবেদন করছেন এই কাজে যথাসাধ্য সাহায্যের জন্যে। আর্থিক বা অন্য যে কোন দান সাদরে গৃহীত হবে নিম্নলিখিত যে-কোন ঠিকানায় :

১। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ-২১১-০০৩

২। জেনারেল সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ অঃ বেলুড় মঠ, জিঃ হাওড়া,
পঃ বঙ্গ-৭১১-২০২

চেক্ বা ড্রাফট্ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদের নামে রেজিস্টার্ড পোস্টের দ্বারা পাঠাতে হবে।

স্বামী তত্ত্ববোধানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম,
মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ-২১১-০০৩

২৫ কার্তিক, ১৩৮৮

বিবিধ সংবাদ

শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর : শ্রীসারদামন্দিরের উদ্বোধন

১৯৫৪ সালের ২রা ডিসেম্বর 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত মেয়েদের জন্য যে শ্রীসারদামঠ দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত ৬ই নভেম্বর, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা-দিবসে সেই মঠে দিব্য পরিবেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে সারদামঠে পাঁচদিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৫ই নভেম্বর বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা মঠ-প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে নির্মিত যজ্ঞমণ্ডপে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩-৩০ মিনিট পর্যন্ত বাস্তুযাগ বহু দর্শনার্থীর সম্মুখে সুসম্পন্ন হয়। ৬ই নভেম্বর সকাল ৬-৪৫ মিনিটে সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীগণ সবৎসা গাভীকে পুরোভাগে রেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পূত ভস্মাধার, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি এবং নানাবিধ মাঙ্গলিক উপচার ও গৈরিকপতাকাসহ তিনবার মন্দির পরিক্রমা করেন। এই বর্ণাঢ্য, ভাবগম্ভীর শোভাযাত্রার সময় তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল বেদমন্ত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে রচিত অপূর্ব ভজন-কীর্তন। তখন বিরাট মঠ-প্রাঙ্গণ শত শত ভক্তের দ্বারা পরিপূর্ণ। মন্দির-পরিক্রমা শেষ হলে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং সারদামঠাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা তাঁর হাতে ভস্মাধারটি সমর্পণ করেন। তিনি যখন মন্দিরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর অনুগমন করেন স্বামী অভয়ানন্দ, সহাধ্যক্ষদ্বয় স্বামী ভূতেশানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দ, সারদামঠাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা, সহাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা দয়াপ্রাণা, সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা প্রমুখ সকল সন্ন্যাসিনীগণ এবং বেলুড়-মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসিবৃন্দ।

গর্ভমন্দিরে শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত বেদীর মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীমায়ের, দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং বামপার্শ্বে স্বামী বিবেকানন্দের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি বিরাজমান। পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ভস্মাধারটি যথাস্থানে স্থাপন করে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হন, পরে প্রত্যেক প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, কর্পূর-আরতি ও চামরব্যজন করেন। প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ এবং প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণাসহ প্রবীণ সন্ন্যাসিনীগণও একে একে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। এই সময় সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীদের কণ্ঠে গীত হতে থাকে বেদগান ও সাধনসঙ্গীত। সন্ন্যাসিনীগণের কণ্ঠে সমবেতভাবে উচ্চারিত, 'শ্রীগুরুমহারাজজীকী জয়', 'মহামাঈকী জয়', 'স্বামীজীমহারাজজীকী জয়' ধ্বনি মন্দিরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

অতঃপর সুনির্মিত ও সুশোভিত মণ্ডপের মধ্যে একপার্শ্বের মঞ্চে—যার মধ্যস্থলে উচ্চবেদীতে সুসজ্জিতা, অপরূপা শ্রীশ্রীমা আসীনা ছিলেন, সেখানে পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ উপবিষ্ট হন। ভক্তগণের দ্বারা পরিপূর্ণ মণ্ডপে পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক-পত্রিকাটির উদ্বোধন করেন এবং ইংরেজীতে যে আশীর্বাণী দেন সন্ন্যাসিনীগণ একে একে বাংলা, হিন্দী, মালয়ালম্, কানাড়া, তামিল ও তেলেগু ভাষায় তার অনুবাদ পাঠ করেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী তাঁর আশীর্ভাষণে বলেন :

আজ এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করে আমি আনন্দিত। এখানে মন্দিরবেদীতে শ্রীশ্রীমার

প্রতিকৃতি মাঝখানে রেখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতি সংস্থাপিত হল।

এই উপলক্ষে মুদ্রিত স্মরণিকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত করেও আমি আনন্দিত।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেদিন যে প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ এখানে রয়েছেন। সেই শুভক্ষণে নিজের ও প্রাচীন সাধুদের পক্ষ থেকে একটি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম যে, মন্দিরটির নির্মাণকার্য যেন শীঘ্র সমাপ্ত হয়, যাতে আমাদের জীবনে মন্দিরটি দেখে যেতে পারি। সারদামঠের কর্তৃপক্ষ আমাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করায় আমি আনন্দিত। তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রদ্ধাপ্রাণার সঙ্গে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের এক বিবরণ পড়লাম। তাতে শ্রদ্ধাপ্রাণা বলেছে যে, এই মন্দির-নির্মাণ নিয়ে বহু বিচিত্র মতামত শুনতে হয়েছে। যেমন একটা হল: যে টাকা মন্দির-নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হল, তার আরও সদ্‌ব্যবহার হত, যদি তাই দিয়ে একটা হাসপাতাল বা একটা কারখানা তৈরী করা যেত।

এই সুরে কথা বলা এ-যুগের একটা ফ্যাশন। আমার মনে পড়ে রাজকোটে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যখন যাই, তখন সেখানে অনুরূপ একটি মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেই প্রশ্নকর্তার কিন্তু চৌদ্দ লক্ষ টাকা দিয়ে বাতানুকূল সিনেমাভবন নির্মাণের বিরুদ্ধে ছিল না কোন প্রতিকূল অভিমত। সম্ভবতঃ তিনি ভেবেছিলেন, ওটার একটা সামাজিক প্রয়োজন আছে,—প্রয়োজন আছে আমোদপ্রমোদের জন্যেও,—যদিও তার ফলে তরুণদের নৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মন্দির নির্মিত হয় মানুষের প্রয়োজনে। মানুষ চিরদিন অনন্ত শ্রীভগবানকে তাঁর সান্ত সাকার রূপে, কোন একটি বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছে, যেখানে তাঁর উপস্থিতির সাক্ষাৎ উপলব্ধি হবে। মানুষের এই প্রয়োজন মেটাতেই মন্দির, মসজিদ্, গির্জা গড়ে ওঠে।

স্বামীজী বলেছেন, ধর্ম হল জাতির মেরুদণ্ড; সেটি ঠিক থাকলে আর সবই ঠিক থাকে। বিগত শতকে ধর্মের এক ভয়ানক গ্লানি উপস্থিত হয়েছিল এবং চতুর্দিকে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। সেই গ্লানি ও অবক্ষয় দূর করতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর মত তিনজন বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা এসেছিলেন ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে।

শ্রীশ্রীমায়ের একটি দর্শনের কথা। তিনি দেখলেন, একটি মেয়ে একটি কলসী ও ঝাঁটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে গো?' সে বললে—'আমি সব ঝেঁটিয়ে যাব।' মা বললেন—'তারপর কি হবে?' সে বললে—'অমৃতের কলসী ছড়িয়ে যাব।'

বহু বৎসর আগে মা যা দেখেছিলেন, আমরা ঠিক তাই প্রত্যক্ষ করছি এখন—সর্বত্র আবর্জনা অপসারণের কাজ চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবরাশির অভ্যুত্থান ঘটছে যাদের অন্তর্নিহিত শক্তি এত প্রবল যে, তারা একটা নতুন যুগের সূচনা করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উপদেশকে ভিত্তি করে নতুন যুগের আবির্ভাব হচ্ছে।

প্রার্থনা করি, তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করুন—আমরা যেন এই পরিস্থিতির যোগ্য হতে পারি, আমরা যেন নতুন ভাবাদর্শ জীবনে অনুসরণ করতে পারি এবং তার দ্বারা নিজের ও জগতের হিতের জন্য নতুন যুগের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করতে পারি।

এই অনুষ্ঠানের শেষে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীসহ

সন্ন্যাসিগণ যজ্ঞবেদীর সম্মুখে উপস্থিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদবিদ্ পণ্ডিত শ্রীপীতাম্বর ঝা বৈদিকমন্ত্রে বীরেশ্বরানন্দ মহারাজজীকে অভিষিক্ত করার পর তিনি বেদীতে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রণাম করেন।

মন্দিরের অপর পার্শ্বে মণ্ডপের মঞ্চে তখন পরবর্তী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রথমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী, শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের সুমধুর তিনটি স্তবগান করেন জনৈকা ব্রহ্মচারিণী। পরে কঠোপনিষদ্-আবৃত্তি এবং কথামৃত, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, স্বামীজীর বাণী প্রভৃতি বাংলা ও ইংরেজীতে পাঠ করেন সন্ন্যাসিনীগণ। ভক্তমহিলাগণের ভক্তিভাবোদ্দীপক ভজনগানে অনুরণিত হয় সভামণ্ডপ। এরই মধ্যে এক সময়ে কলিকাতা ডাকবিভাগের পোস্টমাস্টার জেনারেল Sri Ramakrishna Sarada Temple inauguration special cover উদ্বোধন করেন মঠাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণার হাতে প্রথম 'বিশেষ আবরণটি' (Album) সমর্পণ করে।

সকাল ৮টা থেকে যজ্ঞবেদীতে বিশেষপূজা ও সপ্তশতী হোম এবং মন্দিরে বিশেষপূজা আরম্ভ হয়, শেষ হয় বেলা ৩টায়। ১২-৩০ মিঃ প্রসাদ-বিতরণ হয়। মধ্যাহ্নে তিন হাজারের অধিক মহিলা ও পুরুষভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। তাছাড়াও বহু নরনারীকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সারদামঠ-প্রাঙ্গণে ও দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকাল ৪টায় শ্রীরামনামসঙ্কীর্তনের পর নবনির্মিত মন্দিরে প্রথম সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজন হয়। সন্ধ্যা ৬টা –৭টা সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীগণ কালীকীর্তন করেন। রাত্রে ৺কালীপূজা শেষ করে মন্দির-প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এই পাঁচদিনব্যাপী উৎসবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ছয়শত মহিলা এবং অল্পসংখ্যক বিদেশিনীও যোগ দিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের স্কুল, কলেজ, গৃহস্থের বাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তাঁদের বাসস্থান ঠিক করা হয় এবং প্রতিদিন আহারের ব্যবস্থা হয় সারদামঠে।

৭ই থেকে ৯ই নভেম্বর প্রতিদিন সকাল ৯—৯-৩০ মিঃ জনৈকা সন্ন্যাসিনীর পরিচালনায় ভক্তমহিলাগণ সমবেতভাবে গীতা পাঠ করেন, ৯-৩০—১০টা সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীগণের অপূর্ব ভজনগানে সকলেই মুগ্ধ, ১০—১১-৩০ ইংরেজী ও বাংলায় সন্ন্যাসিনীগণের ধর্মপ্রসঙ্গ। ৭ই নভেম্বর অজয়প্রাণা (ইং) ও প্রদীপ্তপ্রাণা (বাং) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ৮ই নভেম্বর অমলপ্রাণা (ইং) ও ভাস্বরপ্রাণা (বাং) ভাগবত ও ভক্তি বিষয়ে এবং ৯ই নভেম্বর (সারদামঠ, হলিউডের সন্ন্যাসিনী) আনন্দপ্রাণা (ইং) পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচার ও বিশুদ্ধপ্রাণা (বাং) উপনিষদ্ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৮ই নভেম্বর মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বরবাসী দুই হাজারের অধিক মহিলা ও বালক-বালিকা বসে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করে।

বিকাল ৪টা—৫টা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ভক্তমহিলাবৃন্দের ভজন: ৭ই নভেম্বর অখিলানারায়ণ স্বামী ও পার্টি (ত্রিচি), ৮ই নভেম্বর মঞ্জুদেবী ও পার্টি (দিল্লী), ৯ই নভেম্বর মীনাক্ষী শিবরামকৃষ্ণণ ও পার্টি (ব্যাঙ্গালোর), গীতা ঘটক ও ইলা গাঙ্গুলী।

৮ই নভেম্বর ভজনের পর মহিলাবৃন্দ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। বিষয়: (১) 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন' (২) 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোকে ভারতীয় নারীর আধ্যাত্মিক জাগরণ'। বক্তা: ইন্দু রামচন্দানী (ইং), কণা ব্যানার্জী (বাং); ভবানী বালওয়াডি (ইং), গীতা ঘোষ (বাং)

সন্ধ্যা ৬টা—৭-৩০ মিঃ আনন্দানুষ্ঠান—৭ই নভেম্বর চলচ্চিত্র-প্রদর্শন—বিষয়: সারদামঠের উদ্বোধন, মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন, কামারপুকুরে মন্দির-প্রতিষ্ঠা, স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উৎসব, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী। ৮ই নভেম্বর শ্রীযুক্তা মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ৯ই নভেম্বর 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল'-এর ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত হয় সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্যকার 'ভাসে'র 'প্রতিমানাটকম্'-এর নির্বাচিত দৃশ্যবিশেষ। এর পর 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন শিক্ষামন্দির'-এর শিশুদের নৃত্যানুষ্ঠান 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা' উপস্থিত দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে।

পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে সবশেষে যাঁরা নানাবিধ কাজে সাগ্রহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন করেছেন শ্রীসারদামঠের পক্ষ থেকে প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান এবং প্রার্থনা করেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের শুভাশিস্ তাঁদের উপর বর্ষিত হোক।

পরলোকে উইল ও আরিএল ডুরাণ্ট

জ্ঞানতাপস ডক্টর উইল ডুরাণ্ট ৭ই নভেম্বর ১৯৮১, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এনজেলিসে একটি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আরিএল (এ্যাডা কাউফমান) অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এগার খণ্ডে 'সভ্যতার কাহিনী' (The Story of Civilization) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমতী আরিএল ২৫শে অক্টোবর ১৯৮১ তারিখে নিজেদের গৃহেই পরলোকগমন করেন। দুই সপ্তাহ পূর্ণ হইতে না হইতেই ডক্টর ডুরাণ্টের দেহান্ত হয়। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ তাঁহাকে জানানো হয় নাই।

উইলিয়ম জেমস ডুরাণ্টের জন্ম ১৮৮৫ সালে। ১৯০৮ সালে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতা করেন। ১৯১৩ সালে এ্যাডা কাউফমানের সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ইনিই পরবর্তী কালে 'আরিএল' ছদ্মনামে উইল ডুরাণ্টের যাবতীয় রচনায় আমরণ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৭ সালে উইল ডুরাণ্ট কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএচ্.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তাঁহার দর্শন-বিষয়ক বক্তৃতাগুলি সংকলিত করিয়া তিনি 'দর্শনের কাহিনী' (The Story of Philosophy) প্রকাশ করেন। এই জনপ্রিয় গ্রন্থটি বারোটি ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯৩৫ সালে তাঁহারা লস এনজেলিসে গিয়া বসবাস শুরু করেন। ঐ বৎসরই 'সভ্যতার কাহিনী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড—'আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ' প্রকাশিত হয়। ডুরাণ্ট-দম্পতি কোন প্রকার সামাজিক আমোদপ্রমোদে যোগদান করিতেন না। ঐ মহাগ্রন্থটি রচনাতেই একান্তে তাঁহাদের সমস্ত সময় ব্যয়িত করিতেন। ডক্টর ডুরাণ্টের 'ম্যানসনস অব ফিলজফি', 'লেসনস অব হিস্ট্রি' প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও আছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্মের সহায়তা ব্যতীত নৈতিক জীবন সুরক্ষিত রাখিতে পারিয়াছে, এরূপ কোনও সমাজের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দেখা যায় না; প্রতি দেশে প্রতি যুগে ধর্মের সংক্রমণকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত সন্দেহবাদী ঐতিহাসিকেরও মনেও ধর্ম সম্বন্ধে বিনম্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়; প্রকৃত বিপ্লব চরিত্রের উন্নয়নে, জ্ঞানালোকে মনের উদ্ভাসনে—দার্শনিকগণ ও সাধুসন্তরাই প্রকৃত বিপ্লবী।

নেতাজী-স্মরণে

কলিকাতা মিলন মন্দিরে (ফেডারেশন হল) ২১শে অক্টোবর ১৯৮১, আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নেতাজীর স্মৃতির প্রতি

শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ও বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন নেতাজীর সহকর্মী ডাঃ পবিত্রমোহন রায়। কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় ও 'গীতিমালা'র শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক আজাদ হিন্দ্ সরকারের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। 'গীতিমালা'র পক্ষ থেকে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের একটি প্রতিকৃতি ও আজাদ হিন্দ্ সরকারের ঘোষণাপত্র অর্পণ করেন যথাক্রমে রণজিৎ চক্রবর্তী ও সুনীলকুমার ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অভিযান প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অতঃপর 'গীতি-মালা'র শিল্পীগোষ্ঠী রণজিৎ চক্রবর্তী ও কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্মরণে

১৭ই অক্টোবর ১৯৮১, ফেডারেশন হলের ৭৬তম প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসবটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অশোককুমার মজুমদার। কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতঃপর ডঃ মজুমদার স্বাধীনতা-আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লববাদের অবদান প্রসঙ্গে একটি মনোগ্রাহী তথ্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ভাষণান্তে ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মাধুরী মুখোপাধ্যায় যুগ্মকণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সাক্ষরতা-দিবস উদ্‌যাপন

ভদ্রেশ্বর সারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরিচালনায় ১৮ই অক্টোবর ১৯৮১, সাক্ষরতা-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত নিরক্ষরতা-দূরীকরণ কেন্দ্রের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক সমবেতকণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সর্বদেবানন্দ নিরক্ষরতা-দূরীকরণ কেন্দ্রের ছাত্রীদের মধ্যে জামাকাপড় বিতরণ করেন এবং সভাপতির অভিভাষণ দেন। সঙ্ঘ-সম্পাদক বলেন যে, সঙ্ঘের নিজস্ব গৃহের নির্মাণকার্য অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। উহা সম্পূর্ণ হইলে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ কেন্দ্রটি ও হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়টি ঐ গৃহে স্থাপিত হইবে। নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার আবেদন জানান। অধ্যাপক শিশিরকুমার দত্ত সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বস্ত্র-বিতরণ

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের (কসবা) উদ্যোগে ২রা অক্টোবর ১৯৮১, ৺শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সোমেশ্বরানন্দের পৌরোহিত্যে আনুমানিক দু-হাজার টাকা ব্যয়ে ৭১ জন দুঃস্থ নরনারীকে বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে।

সংশোধনী

কার্তিক, ১৩৮৮ সংখ্যায় পৃঃ ৫১৯, ২য় কলম, ৬ষ্ঠ লাইনে 'ন্যাশনাল ট্যালেন্ট' স্থলে 'ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট' পড়িতে হইবে।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—২০ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৯৫ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১৬ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র
দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত
তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান
চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে
পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে
ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী
সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)
অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ
নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন
দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ— পৃঃ ১৪১, মূল্য ৫.০০
ভক্তিযোগ— পৃঃ ৯৬, মূল্য ৩.০০
ভক্তি-রহস্য— পৃঃ ৯৮, মূল্য ৩.৪৫
জ্ঞানযোগ— পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০.৫০
রাজযোগ— পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬.৫০
সন্ন্যাসীর গীতি— পৃঃ ২৩, মূল্য ০.৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট— পৃঃ ২৯, মূল্য ০.৮০
সরল রাজযোগ— পৃঃ ৩৬, মূল্য ১.২৫
পত্রাবলী—প্রথমার্ধ— পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০.০০
শেষার্ধ— পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০.৫০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)— মূল্য ২৭.০০
ভারতীয় নারী— পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩.৫০
পওহারী বাবা— পৃঃ ১৮, মূল্য ১.২৫
স্বামীজীর আহ্বান— পৃঃ ৮০, মূল্য ১.২৫
ধর্ম-সমীক্ষা— পৃঃ ১৩০, মূল্য ৫.০০
ধর্মবিজ্ঞান— পৃঃ ১০২, মূল্য ৫.৫০

বেদান্তের আলোকে—পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫.০০
ভারতে বিবেকানন্দ—পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০.০০
দেববাণী— পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬.৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ— পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪.০০
কথোপকথন— পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১.২৫
মদীয় আচার্যদেব— পৃঃ ৬২, মূল্য ২.২৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে— পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২.০০
চিকাগো বক্তৃতা— পৃঃ ৫২, মূল্য ১.৭৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ— পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬.০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক— পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩.০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— পৃঃ ১৩৬, মূল্য ৩.৫০
ভাববার কথা— পৃঃ ৬৪, মূল্য ২.০০
বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭.০০
বর্তমান ভারত— পৃঃ ৪০, মূল্য ২.৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮.০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, মূল্য ২২.৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫.২৫ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭.৮০ ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ মূল্য ৮.২৫ ; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯.৫০ ; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১.৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ১.৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাঁধাই ৬.০০ ; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ১.৭৫

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৫.২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪.২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ (সাধারণ বাঁধাই) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২.২৫
,, (কাপড়ে বাঁধাই) পৃঃ ,, মূল্য ২.৭৫

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭.৫০, ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১০.০০

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ২০.০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬.০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৬.০০ (২য় সংস্করণ)

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১৬.০০ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬.০০ ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮.০০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭.৫০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩০৬, মূল্য ৮.০০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়—পৃঃ ৪৪, মূল্য ০'২৫

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা—স্বামী দেবানন্দ। পৃঃ ৭৬, মূল্য ১'২৫

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২'৫০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪'০০

ধ্যান—স্বামী ধ্যানানন্দ। পৃঃ ১০২, মূল্য ৩'৫০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪'০০

সংস্কৃত

স্তবকুসুমাঞ্জলি—পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২'৫০

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮'০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত :

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮'৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ১২'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ৪র্থ খণ্ড ৩'০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩'০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ—স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ৩'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮'০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য (সাধারণ বাঁধাই) ৩'৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

পৌষ, ১৩৮৮
৮৩তম বর্ষ, ১২শ

উদ্বোধন, ৮৪তম বর্ষ, ১৩৮৮-৮৯

নিবেদন

এই সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৮৮) উদ্বোধন পত্রিকার ৮৩তম বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ মাসে পত্রিকা ৮৪তম বর্ষে পদার্পণ করিবে।

আমরা পূর্বে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন কার্তিক সংখ্যার সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া অবিলম্বে আমাদের জানান তাঁহারা কিভাবে—১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা পাঠাইয়া সাধারণভাবে যেমন পাইতেছেন সেভাবে, অথবা ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা পাইতে চান।

অধিকাংশ গ্রাহকই ইতিমধ্যে টাকা পাঠাইয়াছেন বা জানাইয়া দিয়াছেন, কিভাবে তাঁহারা পত্রিকা লইবেন। অনিবার্য কারণে গ্রাহক থাকা সম্ভব হইবে না, তাহাও কেহ কেহ জানাইয়াছেন। কিন্তু অনেকেই এখনো কিছুই জানান নাই, বা টাকা পাঠান নাই; তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন অবিলম্বে কার্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানিতে ২০ পয়সার ডাকটিকিট লাগাইয়া জানাইয়া দেন:—

১। তাঁহারা কি ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা লইতে চান? ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা লইলে অনর্থক বেশী খরচ লাগিবে, ১৪·০০ টাকার জায়গায় ১৭·৮০ টাকা খরচ পড়িবে।

২। অথবা, তাঁহারা কি শীঘ্রই টাকা পাঠাইতেছেন?

৩। অথবা, অনিবার্য কারণে তাঁহাদের পক্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব নয়?

দয়া করিয়া পত্রে জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ খবর না পাইলে তাঁহাদের নামে মাঘ মাসের পত্রিকা পাঠানো হইবে। ভি. পি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অযথা লোকসান হয়।

আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদের অসুবিধা বুঝিবেন এবং যাঁহারা এখনো কিছুই জানান নাই, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদের ইচ্ছা পত্রে জানাইয়া দিবেন। সুদীর্ঘ ৮৩ বৎসর ধরিয়া সকলের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিয়াছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

তেল মাখা কি
ছেড়েই দিলি?

উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৮৮

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত
জনৈক ভক্ত

৮৩তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হ'লে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে!

···দাদা, রাগ ক'রো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।···ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ ক'রে পগার পার, এই বুঝ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭।৪৫-৪৬]

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তিরূপা শ্রীশ্রীমা

যুগান্তকারী সাধনা দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ এক নূতন যুগের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। সাধনার অর্থ অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা, বহুজন-হিতায় তাহাকে নিয়োজিত করা। কালক্রমে সঞ্চিত অর্থের মতো সঞ্চিত শক্তিও ব্যয়িত হইয়া যায়—ব্যক্তির মতো একটি জাতিও সর্বতোভাবে দরিদ্র দুর্বল হইয়া পড়ে—ইহাকেই বলে 'ধর্মগ্লানি'; তখনই কোন শক্তিধর পুরুষ সমাজ-জঠর হইতে আবির্ভূত হইয়া দেশকে সমাজকে তথা সমগ্র জাতিকে আবার স্বধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন—ইহারই অপর নাম 'ধর্মস্থাপন'।

বর্তমান যুগে আমরা এইরূপই এক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিতেছি! শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব সাধনার দ্বারা এই লোককল্যাণকর মহাশক্তি জাগ্রতা হইয়াছেন সত্য, কিন্তু যথার্থ কল্যাণ নির্ভর করে এই শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত করার উপর এবং প্রয়োজনবোধে পরিচালিত করার উপর। আকাশের বিদ্যুৎ মহাশক্তিশালী, কিন্তু মানুষ তাহাকে কাজে লাগাইতে পারে না। কাজের জন্য প্রয়োজন পৃথিবীর মাটির উপর স্থাপিত একটি বিদ্যুদাধার। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের জন্য এমনই বিদ্যুৎপ্রকল্প চালু করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা সারদাই এই কল্যাণ-প্রকল্পের বিদ্যুদাধার। সংক্ষিপ্ত ভাষায় শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত কল্যাণশক্তির মূর্তিময় রূপ। শক্তি ব্রহ্মেরই মতো অতীন্দ্রিয় অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, কিন্তু শক্তির প্রকাশ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অনুভবগম্য। সমগ্র সমুদ্র কে ধারণা করিতে পারে? কিন্তু তরঙ্গ আমরা দেখি, স্পর্শ করি, তরঙ্গে স্নান করিয়াই বলি—সমুদ্রে স্নান করিলাম।

তত্বতঃ এ-কথা ঠিক যে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—আবার এ-কথাও ঠিক যে ব্রহ্ম 'অব্যবহার্য', আমাদের ব্যাপার শক্তিকে লইয়া, এই শক্তি জগৎকে লইয়া। জগতের ভালমন্দ, সুখদুঃখ, হাসিকান্না, জন্মমৃত্যু, বন্ধনমুক্তি—সবই এই শক্তির খেলা, ইহাকেই বলি জগৎলীলা, জীবন-লীলা। অবতারলীলাও শক্তির 'আওতারে'।

মানুষ, জীব-জগৎ—এই শক্তির খেলার পুতুল। তিনি ভাঙিতেছেন, তিনি গড়িতেছেন, তিনিই সকলকে নানাভাবে নানারূপে সাজাইতেছেন, আমরা সেই মহাজননীর সন্তান। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই বোধ দিয়া গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া গিয়াছেন একটি মধুর মাতৃমূর্তি, যার সাহায্যে মানুষ ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিবে তাঁহার আচরিত প্রচারিত—তথা পুনরাবিষ্কৃত মহাসত্য: ঈশ্বরদর্শন হয়, ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য, সব ধর্মই এক-একটি পথ।

দেহবিসর্জনের পূর্বে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদাদেবীকে একান্তে বলিতেছেন: দেখ গো—আমার শরীরটা চলে গেলে তুমিও যেন শরীর ছেড়ে দিও না—দুজনে এক কাজ করতে এসেছিলাম—আমি আর কতটুকু করেছি—তোমাকেই সব করতে হবে। এ যুগের মানুষ ভগবানকে ভুলে দুঃখকষ্ট পাচ্ছে, তুমি তাদের শেখাবে—কি ক'রে ভগবানকে ডাকতে হয়, কি ক'রে ভক্ত-ভগবানের সংসার করতে হয়।

এই স্বল্প আলাপের মাধ্যমেই দিব্যদম্পতীর শেষ আলাপ শেষ হইল; আর শুরু হইল এক বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের—অত্যন্ত নীরবে নিভৃতে, মানুষের হৃদয়কন্দরে। এইভাবে মূল ধরিয়া নাড়া দেওয়ার নামই 'বিপ্লব'—এক নূতন ভাবের প্লাবন। পুরাতন জঞ্জাল অনেক ভাসিয়া যাইবে, নূতন ভাবের উদ্গম হইবে। পুরাতনের মাঝে নূতন, আর নূতনের মাঝে পুরাতন, এই তো চলিয়াছে চিরন্তনের খেলা, মহামায়ার লীলা। তাই তো মাতৃমূর্তিকে কেন্দ্র করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনার আরম্ভ ও শেষ। মন্দিরে

পাষাণময়ী মৃন্ময়ীকে 'মা মা' বলিয়া ডাকিয়া যাহার আরম্ভ, চিন্ময়ীর পদতলে সর্বসাধনার ফলরাশি অঞ্জলি দিয়া তাহার শেষ। শিশু যেন ঘুমন্ত মাকে জাগাইতেছে, অথবা নিদ্রার ছলে মা সন্তানের ব্যাকুল আহ্বান উপভোগ করিতেছেন। পরিশেষে পাই—সেই মা চিন্ময়ীরূপে মানবী হইতে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বব্যাপী সন্তানের জন্য কোল পাতিয়া বসিয়া আছেন, ডাকিতেছেন—কে কোথায় আমার তাপিত সন্তান। এস, এস, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের জন্য শান্তির মঙ্গলঘট লইয়া বসিয়া আছি, আর কতদিন তোমরা সংসারের দুঃখজালায় কষ্ট পাইবে, কত আর কাঁদিবে। মাতৃস্নেহধারা পান করিয়া অমর হও, মাতৃসান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হও, তোমাদের জন্যই তো আমি আসিয়াছি। তোমরা কি আমার জন্য আসিতে পার না, এতটুকু সময় দিতে পার না, এত কি কাজ? আর এ-কাজের পরিণতিই বা কি?

এই মাতৃ-আহ্বান যুগ হইতে যুগান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে প্রসারিত হইতেছে—এ আহ্বান দেশ জাতি ভাষার কোন বিভেদ জানে না, এ আহ্বান ধর্মাধর্মের মতামতের বিরোধ মানে না, এখানে মানুষের একটি পরিচয়—সে মানুষ, সে মায়ের সন্তান, আর ঈশ্বরশক্তিরও একটি পরিচয়—তিনি মা!

শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের সিদ্ধান্ত দিয়াছেন—তাঁহার সাধনালব্ধ সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন, "তুমি যাকে ব্রহ্ম বলো, আমি তাঁকেই 'মা' বলি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।" শ্রীশ্রীমাও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন তাঁহার পরিণত জীবনের উপলব্ধি, 'আমি ও ঠাকুর কি আলাদা? আমরা এক, অভেদ।' তাই তো মাতৃসাধক স্বামী সারদানন্দ—শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী লিখিতে স্বীয় অক্ষমতা বা অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া একটি সুন্দর মধুর জ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম-মন্ত্রে শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন:

যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥

দাহিকা-শক্তি অগ্নিতে থাকে অভিন্নভাবে, অগ্নি ও তাহার শক্তি পৃথক্ করা যায় না। অধিকন্তু এই পাপতাপঘ্নী অগ্নিশক্তির শুধু দাহিকা-শক্তি নয়—আরও আছে প্রকাশিকা-শক্তি, তাই 'সারদা' সর্ববিদ্যাস্বরূপা।

মাতৃক্রোড়ে শোভমান শিশু জানে না—মা কে, মা কেমন, মা কত বড়, মা কি কি করেন, মায়ের কত শক্তি! তাহার জ্ঞান না থাকুক, তাহার বোধ আছে: আমি মার, মা আমার। ঈশ্বরে বা অভিন্ন ঈশ্বর-শক্তিতে এই যে মমত্ববোধ—ইহাই এ-যুগের মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আগাইয়া দিবে। শুষ্ক দার্শনিক বিচারে বা কঠিন কঠোর শারীর তপস্যায় যা দুরধিগম্য, 'মা ও শিশু'র মধুর প্রতীক-সাধনায় তাহা সহজেই করায়ত্ত। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনলব্ধ সত্য অত্যন্ত সহজভাবে প্রকাশ করিয়া গেলেন: একবার তাঁকে 'মা' বলে ডেকেই দেখ না। ব্যাকুলতা তীব্র হইলে সাধক তাঁহাকে তেমনি নিবিড়ভাবে পাইবে, যেমন তিনি পাইয়াছিলেন! দশভুজা চতুর্ভুজা অস্ত্রশস্ত্রধারিণী মূর্তি দেখিয়া পাছে এ-যুগের সাধক ভয় পায় বা আকৃষ্ট না হয়, তাই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ রাখিয়া গেলেন একটি শুদ্ধ মধুর মাতৃমূর্তি—দ্বিভুজা মানবী! যে মা সন্তানের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকেন, আবার সন্তান চলিয়া যাইবার সময়-দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পথপানে চাহিয়া চোখের জল মুছিতে থাকেন! শ্রীরামকৃষ্ণ রাখিয়া গেলেন এমন এক সিদ্ধসাধিকা মাতৃমূর্তি, যিনি প্রয়োজনবোধে সন্তানকে সংসারজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, আবার নিজ হাতে গৈরিকবস্ত্র দিয়া কাহারো বা সংসারবন্ধন ছিন্ন করিতেছেন। মায়া ও মহামায়ার এমন যুগপৎ লীলা—কেহ কখনও দেখে নাই, দেখিবে বলিয়া ভাবে নাই। এ মা একাধারে স্নেহময়ী জননী, গুরু ও ইষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার পুঞ্জীভূত শক্তির চাক্ষুষ প্রতিমা শ্রীশ্রীমা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন তাঁর বয়েস আঠারো। ঠাকুরের বয়েস তখন ছত্রিশ; তিনি তখন সকল সাধনায় সিদ্ধ, 'সিদ্ধের সিদ্ধ' মহাপুরুষ। উপরন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারা তিনি ইতিমধ্যে অবতারপুরুষ রূপেও স্বীকৃত, পূজিত ও প্রচারিত হয়েছেন। শ্রীমায়ের মহত্ত্ব এই যে, এই পল্লীতরুণী দক্ষিণেশ্বরে এসেই এই অতিমহান্ রামকৃষ্ণের জীবনের ছন্দে নিজের জীবনের ছন্দ মিলিয়ে অবলীলায় পুষ্ট ক'রে চললেন স্বামীর জীবন-ব্রত ও মহিমাকে। শুধু তাই নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যখনই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনধারার সঙ্গে শ্রীমায়ের স্বকীয় জীবনধারার অণুমাত্র সংঘাত হয়েছে, তার সব ক্ষেত্রেই আখেরে ঠাকুর শ্রীমায়ের ভাবের অনবদ্য উৎকর্ষ লক্ষ্য ক'রে প্রসন্ন হয়েছেন। কোন কোন সময়ে জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীমা হয়তো নিজের অজ্ঞাতে, দু-একটি মূল্যবান্ শিক্ষাও দিয়েছেন।

এই সব দেখে তখনই আমরা অতি আশ্চর্য হই, যখন ভুলে যাই শ্রীমায়ের সম্বন্ধে ঠাকুরের বিস্ময়কর প্রকাশটি: 'ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।'[৪৪]

ঠাকুরের দেহের রূপ একসময়ে এত আকর্ষণী-শক্তিবন্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল যে তাঁকে জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করে নিজের রূপকে অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করাতে হয়েছিল। শ্রীমাকে তা করতে হয়নি। রূপ আচ্ছাদিত করেই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু যে রূপ ঢেকে এসেছিলেন, সে রূপ তাঁর অন্তরেই সন্নিহিত হয়ে ছিল। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন; বল দেখি এই পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর বস্তু তুমি কি দেখেছ? দ্বিধাহীন সুনিশ্চয়তায় বলতে পারব: আমাদের শ্রীমায়ের মনখানি। এর চেয়ে সুন্দরতর আর কোন বস্তু পৃথিবীতে দেখিনি। শুধু যে গীতায় কৃষ্ণ-কথিত সকল দৈবী সম্পদ পরস্পর দ্যুতিতে সমৃদ্ধতর হয়ে শ্রীমায়ের মনে সর্বক্ষণ বিরাজ করছিল তাই নয়, শ্রীমায়ের মনের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের দু-এক ছটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি লেখকের অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে:

প্রভু সঙ্গে এইবার, জগমাতা অবতার,
সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।
কৃপাময়ী কলেবরে, করুণার ধারা ঝরে,
শান্তিমূর্তি মঙ্গলরূপিণী॥
শ্যামা নহে শ্যামাসুতা, উগ্রভাব বিবর্জিতা,
মাতৃস্নেহে পূর্ণিত আধার।
হিতে রতা মাতৃরীত, পরতত্ত্ব সুবিদিত,
শিক্ষাহেতু গার্হস্থ্য আচার॥[৪৫]

যিনি জ্ঞান দিতে এসেছেন, যিনি জ্ঞানদায়িনী, তাঁকে তো আর লিখে পড়ে কিছু শিখতে হয় না। জ্ঞান ও পূর্ণতা যে তাঁর স্ব-ভাব। তাই শ্রীমায়ের জীবনে অনুক্ষণের জন্যও আমরা অজ্ঞান-আবিষ্টতা দেখতে পাই না। সব সময়ে তিনি অতি স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানাবিষ্টা থেকে সকল কর্ম ও উক্তি করেছেন। সেজন্য সারদার জীবন-কাব্যে কোন ছন্দপতন নেই। সত্য কথাটি এই, শ্রীমায়ে যদি এই স্বভাব-প্রকাশ মহত্ত্বটি না থাকত, তবেই আশ্চর্যান্বিত হবার হেতু থাকত।

দক্ষিণেশ্বরে নহবতপীঠে শ্রীমায়ের যে পরিপ্রকাশটি দৃষ্ট হ'ল, তা তাঁর দেবীত্বের মহত্ত্ব নয়, মানবীত্বের মহত্ত্ব। এই মানবী-মা'র দৈনন্দিন

৪৪ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১২৭

৪৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ১৮২

জীবন-সাধনাটিতে আচরিত ধর্মের ত্যাগ-সেবা-আদর্শানুগ যে বিকাশ শ্রীঠাকুরের জীবনাঙ্গনে হ'ল, সেটিই হ'ল যুগধর্মের প্রয়োগ-বিস্তার ও ভাব-প্রকাশ। এই প্রকাশটি ঠাকুরের জীবনকে আলম্বন ক'রে হলেও এটি কিন্তু শ্রীমায়ের একান্ত নিজস্ব স্বকীয় মহিমায় মহিমান্বিত।

তবে কথা আছে। ঠাকুর ও শ্রীমা উভয়েই তাঁদের তাত্ত্বিক একাত্মতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বিধা বা অগ্রাহ্য করতে নিষেধ করেছেন।

সনাতন বৈদিক ধর্মের মুখ্য আন্তর সংবেদটি হচ্ছে যজ্ঞ। কিন্তু যজ্ঞ কোন অপরিবর্তনীয় ধর্মধারণা নয়। যজ্ঞ বিবর্তনশীল ঊর্ধ্বমুখী আদর্শের প্রগতিশীল একটি ধর্মপ্রকাশ। পূর্ব মীমাংসার, উপনিষদের বা ভগবদ্গীতার যজ্ঞ-ভাবনা এক নয়। তবু অবিচ্ছেদ্যভাবে যুগ যুগ ধরে সনাতন ধর্মের প্রাণস্রোতের মতো যজ্ঞ-ভাবনা বয়ে এসেছে সকল কালের ভেতর দিয়ে। সনাতন ধর্মের এই যজ্ঞধারাটি শ্রীমায়ের জীবনে যুগধর্মের যে রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল, তা যজ্ঞরূপা শ্রীমার দক্ষিণেশ্বরের দৈনন্দিন জীবনের ঘরোয়া বর্ণনা থেকে, তাঁর নিজের মুখ থেকেই আমরা শুনতে পাব। এ সব কথা তিনি অতি আত্মসচেতন আত্মচরিতের মত প্রকাশ করেননি। ঘরের খুঁটিনাটি কাজ করতে করতে সময়ে-সময়ে কথাচ্ছলে কখনো কখনো বলেছিলেন। সে সব কথা সংযুক্ত করেই এই কাহিনী।

শ্রীমায়ের কোন উপদেশ দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত না হলেও তাঁর জীবনধারাটিতেই আমরা সনাতন ধর্মের নির্যাস, অতি সরল সুস্বাদু ভাষায় ও সুবিমল আচরণে পাই। স্বামীজী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যাত ধর্মের বহুল প্রচার তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় করার পূর্বে, শ্রীমা ঐ ধর্মকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের জীবিত চরিত্রের মাধ্যমে। রামকৃষ্ণ-বিভাসিতা সারদাকে আমরা এখানে শ্রীমায়ের নিজের কথার আলেখ্যে দেখতে পাই :

"ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন নহবত-খানায় ছিলুম, তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে থাকতে হ'ত। তারই ভিতর কত সব জিনিসপত্র। কখনও কখনও একাও ছিলুম।...মধ্যে মধ্যে গোলাপ, গৌর-দাসী, এরা সব থাকত। ঐটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হ'ত—প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল কিনা, কালীর ভোগ সহ্য হ'ত না। অপর সব ভক্তদের রান্না হ'ত। লাটু ছিল; রাম দত্তের সঙ্গে রাগারাগি করে এল। ঠাকুর বললেন, 'এ ছেলেটি বেশ, ও তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।' দিন রাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রাম দত্ত এল; গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।' আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের ময়দার রুটি হ'ত। রাখাল থাকত; তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হ'ত।...প্রথম প্রথম নহবতের ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যেস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা থেকে সব মোটা-সোটা মেয়ে-লোকেরা দেখতে যেত, আর দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা কি ঘরেই আমাদের সতীলক্ষ্মী আছেন গো —যেন বনবাস গো!' রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাতেই চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। (নহবতের) নীচের একটু খানি ঘর, তা আবার

জিনিসপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করছে—ঠাকুরের জন্য শিঙি মাছের ঝোল হ'ত কিনা। শৌচের আর নাওয়ার জন্যই যা কষ্ট হ'ত। বেগ ধারণ ক'রে ক'রে শেষে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল। দিনের বেলায় দরকার হ'লে রাত্রে যেতে পারতুম—গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে। কেবল বলতুম 'হরি, হরি, একবার শৌচে যেতে পারতুম!'"[৪৬]

শ্রীমা নহবতের নীচের ঘরে থাকতেন এবং সিঁড়ির নীচে রান্না করতেন। অবতারবরিষ্ঠের ও ভক্তগোষ্ঠীর জন্য পরমাপ্রকৃতির সিঁড়ির নীচে রান্না! একদিনের কৌতুক-চকিত চড়ুইভাতি নয়। তের বছরের দিবারাত্রির কাঠ-কয়লার রান্না। নানা জনের নানা রুচি অনুযায়ী হরেক রকম রান্না। আর দিনে তিন চার সের ময়দার রুটি। আর কত পান সাজা!

শ্রীমা যে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে সাতদিন পঞ্চতপা করেছিলেন তা যত খ্যাতি লাভ করেছে, সে তুলনায় তাঁর নহবতের তের বছর তপস্যার যে তত খ্যাতি হয়নি, তার কারণ এই যে দৈনন্দিন জীবনের ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠিত ত্যাগসেবা-বিদগ্ধ তাঁর এই তপস্যার গভীরতা সম্বন্ধে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত নই। মাথার উপর প্রখর সূর্য, চারদিকে প্রজ্বলিত অগ্নি, শ্রীমা ও ভক্তিমতী যোগীন-মা মধ্যে সমাসীনা—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত জপ—কঠিন তপস্যা বটে। কিন্তু নহবতের ঐটুকু সাধনঘরে, মাথার উপরে কলকলায়মান মাছের হাঁড়ি, আর চারদিকে ঘরভরা জিনিস নিয়ে, একটি ফলের ভেতর বীজের মতো তের বছরের যে যোগসাধনা, সে যে এক কি সার্থক তপস্যা শ্রীমা করেছিলেন, গভীরভাবে ভাবলে আমরা অবহিত হব যে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-ব্যাখ্যাত শারীর তপস্, মানস্ তপস্ ও বাঙ্ময় তপসের এমন সমুজ্জ্বল উদাহরণ আধুনিক কালের তপস্যার ইতিহাসে অতি বিরল।

ফলে এই তপোভূমি থেকে শ্রীমা যখন যথাসময়ে অভিনিষ্ক্রান্তা হলেন তখন জগৎ পেল এমন একটি রশ্মিদীপ্ত দেবী-মানবী-চরিত্র যার তুলনা মানুষের ইতিহাসে নেই। ঠাকুর যে মাকে বলতেন: 'তুমি কি কিছু করবে না, আমাকেই সব করতে হবে?', মায়ের দিক থেকে এ অনুজ্ঞার প্রত্যর্পণ লক্ষণীয় তাঁর এই দিব্য হওয়াটিতে। উপনিষদে বর্ণিত উমা হৈমবতীর আবির্ভাবের পরে, শ্রীমায়ের যে এই আবির্ভাব, এতে এ সত্যটি প্রমাণিত হল যে বৈদিক ধর্মের মহতী সৃজনী-শক্তি শুধু অব্যাহতই নেই, সে শক্তির আশিসধন্য মানুষের ভবিষ্যৎও যদি উজ্জ্বলতর হয়, আশ্চর্যান্বিত হবার কারণ নেই।

এটি যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা সারদার একটি অতি শক্তি-সমৃদ্ধ মৌলিক অভিব্যক্তি, এ যখন আমাদের ধারণা হয়, তখন আমরা এই ভেবে অভিভূত হই: সত্যি ঠাকুর আমাদের জন্যে কি ক'রে রেখে গেলেন; কি পুণ্যবলে আমরা এত সৌভাগ্যের অধিকারী হলুম!

এই বিচারধারায় আর একটি পারম্পরিক মনোজ্ঞ সত্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। ছাদ থেকে শিকে ঝুলছে, চারদিকে হাঁড়ি-কুড়ি, আরও কত কি বোঝাই ঘরে যেখানে নড়বার-চড়বার বিশেষ জায়গা নেই—সে ঘরে মায়ের তপস্যার আসন। অথচ ঠাকুরের ঘরে নৃত্য করবার জায়গা ছিল! আর ঠাকুরের এ নৃত্য-নিপুণতাও বিধৃত ছিল শ্রীমায়ের সেবা-সৌকর্যে।

[ক্রমশঃ]

৪৬ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৮৪

মাতৃচরণে

'বল্লভ'

তুমি বলেছিলে সন্তান তব
ধূলায় মলিন হ'লে
মুছে দেবে তার সকল কালিমা
টেনে নিয়ে নিজ কোলে।
দিনে দিনে মোর জীবন জুড়িয়া
ধূলি কর্দম উঠেছে জমিয়া
এখন যদি না ঘোচে মালিন্য
সবই যাবে নিষ্ফলে।
দাও মুছে দাও সব মলিনতা
তোমার স্নেহাঞ্চলে।

ঘুচে যাক্ ভয়, দূরে যাক্ মোহ
স্মরি তব শ্রীচরণ,
আমার মনেরে নাহি বাঁধে যেন
কাম আর কাঞ্চন।
তোমার কৃপার অমৃত পরশে
প্রাণ মম ভরে উঠুক হরষে
হৃদয়ে আমার ভক্তির দীপ
যেন নিশিদিন জ্বলে।
নিবেদন করি আপনারে আজ
তব পূজা-বেদীতলে।

দৃশ্য ও দৃশ্যান্তর

শ্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য

ঘুমচুরি পাখির গানে
গ্রামটা জেগে উঠবে ধারণা ছিল।
খবরে প্রকাশ, পাখ-পাখালি এখন থাকে না এখানে,
অরণ্য-গহনে নিস্তরঙ্গ ঝিলের গায়ে বাসা বেঁধেছে ওরা—
কেননা, সভ্যতার পদসঞ্চার বুকে ওদের বিপন্নতা জাগায়,
অস্থির হয় প্রাত্যহিক আতঙ্কে।

শিশির-ভেজা ঘাস-জাজিমে পা মেলে
এগিয়ে এলাম গ্রাম-প্রান্তে;
নীলাকাশের তলায় প্রাচীন এক বট-বৃক্ষ
সম্মুখে সাগরে ধাবমানা পয়োধি গঙ্গা।
অগণিত ঝুরিমূলগুলো একসঙ্গে দাঁড়িয়ে
বড় প্রয়োজনে যেন—
পূর্ব-পুরুষকে ধরে রেখেছে সুতীব্র ইচ্ছায়!

সেই সুনির্মল ছায়ায় একদিন এক আত্মস্থ মানুষ ছিল;
সমৃদ্ধি-বৃত্তি-সম্পদ নিত্য যা আমাদের কাম্য,
কোনটি তাঁর কাম্য ছিল না।
অপার আগ্রহে আর আত্মনিবেদনে
সে মানুষ শান্তি খুঁজেছিল
মর্ত্যলোকের মানুষের জন্য॥

পদ্মবিনোদের উক্তি

শ্রীশেফালিকা দেবী

দোস্ত্,* ও দোস্ত্, শুনিতে কি পাও
এ ঘোর নিশীথ অন্ধকার,
আমি পথহারা একাকী পথিক
খুলিবে না কিগো রুদ্ধদ্বার!
জেগে আছ, তবু সাড়া নাহি দিবে,
বুঝি মোর সনে কবে না কথা,
তুমি সন্ন্যাসী, পূত নিরমল
তুমি কি বুঝিবে পাপীর ব্যথা!
জীবনের পথে চলিতে চলিতে
কিবা বিভ্রম ঘটিল মোর,
সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে এনু
টানিয়া আনিল করম-ডোর।
পঙ্কিল পথে গভীর আঁধারে
কতবার পড়ি কত যে উঠি,
ঘোর তমোমাঝে কে দেখাবে আলো
কে তুলিবে ধরি হস্ত দুটি!
ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিগো জননী
আছ কি শ্রবণ বন্ধ করে!

সন্তান তব ধূলায় লুটায়
তুমি নিদ যাও শয্যা 'পরে!
শুচি ও শুদ্ধ ত্যাগব্রতধারী
শুধু কি তারাই তোমার ছেলে!
ধূলা-কাদা-মাখা তনয়ে তোমার
লবে না কি কোলে দুহাত মেলে!
এই সংসারে দুর্বল সুতে
দেখি জননীর অধিক প্রীতি,
তুমি কি জননী সংসার-ছাড়া
তোমার কিগো মা অন্য নীতি!
ওই বাতায়ন খুলেছে দ্বিতলে
আঁধারে ও কার আনন হেরি!
কি প্রেম করুণা ঝরিছে নয়ানে
কি জ্যোতি রয়েছে ললাট ঘেরি
উঠেছ মা যদি লহ এ প্রণাম
ও ছবি লইনু হৃদয়ে এঁকে
বিরলে বসিয়া দেখিব একাকী
যেন নাহি তাহা দোস্ত্ দেখে।

[* স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে পদ্মবিনোদ 'দোস্ত্' বলিয়া ডাকিতেন।]

প্রকৃতি ও পরিবেশ

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ

ফুল বলে, এ সমাজে ফুটিব না আর,
সমাজের বিষবাষ্প করে ছারখার।
নির্মল বাতাস সে-ও হয় যে দূষিত,
কেমনে দেবতা-পদে হই নিবেদিত?

*

লোকালয় হ'তে দূরে থাকি' বনমাঝে,
নিঃসংশয়ে দেবতার শ্রীচরণ পূজে।
পরিবেশ মনোমাঝে তুলি' আলোড়ন
ফুলের এ মর্মসত্য করে উদ্ঘাটন।

কনখলের স্মৃতি

স্বামী দেবানন্দ

১৯১৭ সালের অগস্ট মাসে প্রথম হরিদ্বারে যাই তপস্যা ক'রে ভগবান লাভ ক'রব—এই আশা নিয়ে—অনেক দুঃখ-বিপদের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে ভগবানের আশীর্বাদে। বয়স তখন উনিশ। হরিদ্বারে বিল্বকেশ্বর পাহাড়ের উপর আস্তানা করি। পথের কষ্টে শরীর দুর্বল ও অসুস্থ, আহার-নিদ্রা নেই। কাতরভাবে শুধু ভগবানকেই ডাকতে থাকি, যাতে তাঁর কৃপালাভ করতে পারি। হঠাৎ একদিন শেষরাতে দেখি এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমার কাছে এসে বলছেন হিন্দী ভাষায়, 'কেন তুমি এভাবে কষ্ট ক'রছ? এস, তোমাকে আমি ভালো স্থানের সন্ধান দিচ্ছি। সেখানে থেকে সেবা-পূজাদি ক'রে জীবন ধন্য করতে পারবে।' এই বলে আমাকে নিয়ে কিছুদূর গিয়ে কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পথ দেখিয়ে দিয়ে হঠাৎ তিনি অন্তর্হিত হলেন। কপর্দকশূন্য, তাই হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। অসুস্থ, দুর্বল শরীর নিয়ে খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকলাম কনখলের পথ ধরে। পথে বহুবার বিশ্রাম নিতে হ'ল, চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল বলে।

সাধু হবার ইচ্ছায় ১৯১৫ সালে বেলুড় মঠে কিছুদিন বাস করলেও কনখল সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। সেবাশ্রমে গিয়ে জানলাম, বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের দুজন সন্ন্যাসী শিষ্য এই সেবাশ্রমে আছেন কার্যভার নিয়ে। তাঁদের নাম স্বামী কল্যাণানন্দ (বড় স্বামীজী) ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ (ছোট স্বামীজী)। আশ্রমের জনৈক সেবক বললেন, 'ঐ বাড়ির বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা কর। ওখানেই অধ্যক্ষ মহারাজ (বড় স্বামীজী) আসবেন।' তিনি এসে বসলে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম। দু-চারটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর শুনে বললেন, 'তুমি খুব ক্লান্ত ও অসুস্থ দেখছি। স্নানাদি ক'রে কিছু খেয়ে তুমি সারাদিন বিশ্রাম কর। সুস্থ হলে পরে সব শোনা যাবে।'

বড় স্বামীজীর প্রীতি-মধুর ব্যবহার ও আশীর্বাদ পেয়ে নিজেকে ধন্য বোধ করলাম। পরে একজন সেবক এসে আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাদি ক'রে দিলেন। আহারাদির পর নির্দিষ্ট ঘরটিতে বিশ্রাম নিলাম। পরদিন বড় স্বামীজী আমাকে ডেকে নিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সরলভাবেই আমি তাঁর সব কথার উত্তর দেওয়ায় বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, 'তুমি এখন ৫।৭ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নাও। কত কষ্ট করে হাজার মাইলের উপর একলা এসেছ ঘরবাড়ি ছেড়ে এই অল্প বয়সে। তোমার মহাসৌভাগ্য, উত্তরাখণ্ডের এই মহাতীর্থে ঠাকুর-স্বামীজীর আশ্রমে আসতে পেরেছ এই বয়সে আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে।'

কনখলের এই আশ্রমটির সুন্দর পরিবেশ তখন খুবই ভালো লেগেছিল। সে সৌন্দর্য ও মাধুর্য আমি ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। মনে হয়েছিল শ্রীভগবানের অপার করুণায় হিংসা-দ্বেষ ও মায়ামোহে পূর্ণ এই পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে এক বরণীয় দিব্যধামে উপনীত হয়েছি—আজীবন এখানেই থেকে যাবো, জগৎপিতার চরণকমলে মনপ্রাণ উৎসর্গ করে ধন্য হবো। কি শান্তিপূর্ণ মনোরম স্থান! চতুর্দিকে কি শান্ত নীরবতা! মিশনের এই সুন্দর পরিবেশে এসে যেন নবজীবন লাভ করলাম। তুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গের অপূর্ব দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। স্বভাব-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এরূপ রমণীয় স্থান আর আছে কিনা জানি না। আকাশ-বাতাস সবই যেন ত্যাগের হাওয়ায় পরিপূর্ণ! জানলাম, প্রাচীন তীর্থ এই কনখল একটি পীঠস্থান। সতী এই কনখলেই দক্ষযজ্ঞে

দেহত্যাগ করেছিলেন। নিকটেই হরিদ্বার। পনের মাইল উত্তরে হৃষীকেশ। আরও তিন মাইল গেলে লছমনঝোলা ও স্বর্গাশ্রম।

কয়েকদিন পর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হলে কল্যাণানন্দ মহারাজ বললেন, 'তুমি এখন ঠাকুর-সেবার ভারটুকু নাও। পূজা-আরতি ছাড়া অন্য কোন কাজ তোমাকে এখন করতে হবে না।' পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বড় স্বামীজীর কাছে জানলাম, মঠ যখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়িতে তখন তিনি মঠে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৯৮ সালে। তিনি আরও বললেন, তাঁর গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক জীবনে হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে এসে দেখেছিলেন, সাধু-সন্ন্যাসীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের দেখাশুনা বা সেবা-শুশ্রূষা করার কেউ নেই, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। তাঁদের দুঃখ-কষ্টে বিশ্বপ্রেমিক স্বামীজীর প্রাণ বিচলিত। উত্তরাখণ্ডের সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবার জন্য ব্রতী হতে আদেশ দিলেন। বললেন, 'দেখ্ কল্যাণ, হৃষীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ রুগ্ন সাধুদের জন্য কিছু করতে পারিস? তাঁদের দেখার কেউ নেই। তুই গিয়ে তাঁদের সেবায় লেগে যা।'

গুরুবাক্য শিরোধার্য ক'রে কল্যাণানন্দ মহারাজ উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করলেন—আর্ত নর-নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে। হরিদ্বারের নিকট প্রাচীন তীর্থ কনখলেই সেবাশ্রম গড়ে তোলেন ১৯০১ সালের জুন মাসে, মাত্র তিন টাকা ভাড়ায় দুটি ছোট ঘর নিয়ে। ১৯০৩ সালে প্রায় পনের বিঘা জমি দেড় হাজার টাকায় সংগ্রহ ক'রে সেবাশ্রমের কাজ শুরু করলেন ভালোভাবে। নিজ হাতে ঔষধ-পথ্যাদি তৈরী ক'রে নিয়ে সাধুদের কুটিয়াতে গিয়ে তাঁদের সেবা করতেন। স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য স্বামী নিশ্চয়ানন্দ মহারাজ ১৯০৩ সালের কুম্ভমেলায় হরিদ্বার এসে মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে সাধনভজনাদিতে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। স্বামী কল্যাণানন্দজীকে এ-সময় ওখানে দেখে তিনি পরমানন্দ লাভ করলেন এবং তখন তাঁর মনে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমূল্য বাণীটি যা তাঁকে স্বামীজী একদিন বলেছিলেন—'যদি বড় কাজ কিছু না-ও করতে পারো, ভিক্ষে ক'রে একটি পয়সা সংগ্রহ ক'রে তা দিয়ে একটি মাটির কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণার্ত পথিকদের জল দিও। তাতেও মহৎ কাজ হবে।' গুরুভাই কল্যাণানন্দ মহারাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় স্বামীজীর দেওয়া ঐ মন্ত্রবাণী জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য নিশ্চয়ানন্দজী কনখল সেবাশ্রমে এসে গুরুভাইএর আরব্ধ কাজে সহযোগী হলেন ১৯০৩ সালেই। দীনদুঃখী, অস্পৃশ্যদের বস্তীতে গিয়ে দুই গুরুভাই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের সেবা-শুশ্রূষাদি করতেন প্রাণ ঢেলে নানাভাবে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সবারই সেবা করতেন তাঁরা—এমন কি মলমূত্রাদিও নিজহাতে পরিষ্কার করতেন। ছোট স্বামীজী—নিশ্চয়ানন্দ মহারাজ—নিত্য ভোরে উঠে ঔষধ-পথ্যাদির ঝোলা কাঁধে নিয়ে সুদীর্ঘ পথ হেঁটে গিয়ে হৃষীকেশের ঝাড়িতে ও অন্যান্য কুটিয়াতে সাধুদের সেবা করতেন নিজে ছত্রে খেয়ে বা মাধুকরী ক'রে। আবার সন্ধ্যার পর কনখল রওনা হতেন। নিত্য ছত্রিশ মাইল যাতায়াত করতেন রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। তখন রাস্তাও দুর্গম ছিল। কখনও দুই গুরুভাই-ই একসঙ্গে যেতেন। কোন সাধু দেহ রাখলে শত কষ্ট বরণ ক'রেও এঁরা তাঁকে বহন ক'রে গঙ্গা বা নীলধারায় সলিল-সমাধি দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। অনাথ, দীনদুঃখী, মুচি, মেথর, চামার প্রভৃতিকেও শ্রদ্ধা-প্রীতির সঙ্গে নিজহাতে সেবা করতেন নরনারায়ণজ্ঞানে। কনখলে ওদের জন্য কূপ-খনন, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি সেবাযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেছিলেন দুজনে একত্রে। মেথরদের বস্তিতে অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় করেছিলেন, তাতে ছাত্রসংখ্যা ১৪০ জন পর্যন্ত হয়েছিল। ১৯১৭ সালে গিয়ে আমিও ঐ স্কুল দেখেছি। ঐ সময় আমি কনখল থেকে হেঁটে হৃষীকেশ লছমনঝোলা যাই দর্শনাদি করতে। তখন ট্রেন হয়নি হৃষীকেশের। হিংস্রজন্তুসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম পথে কি ক'রে যে ওঁরা নিত্য হেঁটে যাতায়াত করতেন, তা ভেবে আমরা বিস্মিত হতাম!

আমি কনখলে এসে বড় ও ছোট স্বামীজীর মুখে শুনলাম, ১৯১২ সালের মার্চ মাসে ওঁদেরই বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী ও শিবানন্দজী কনখল আশ্রমে এসেছিলেন এবং প্রায় সাতমাস ছিলেন। ঐ সময় আশ্রমে সর্বদাই অভূতপূর্ব আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হ'ত। মহারাজদের পুণ্যসঙ্গলাভে সবাই পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর আগ্রহে ঐ-বছরেই কলকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং এক বিরাট সমষ্টি-ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয় সব সাধুদের জন্য। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের এইসব অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সান্নিধ্যে এসে সাধু-ভক্ত সবাই পরম আনন্দ লাভ করতেন। সাধু-ভক্ত, জ্ঞানী-মূর্খ—সবারই জন্য মহারাজদের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। গীতা, ভাগবত ও বেদ-বেদান্তের কথা এবং ঠাকুর-স্বামীজীর অমৃতময়ী বাণী এঁদের মুখে শোনার জন্য নিত্য বহু সাধু ও ভক্ত আকৃষ্ট হতেন এবং ওঁদের গভীর ভাব ও ধ্যানমগ্ন উচ্চাবস্থা দেখে মুগ্ধ হতেন! স্বামী তুরীয়ানন্দজী ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে কয়েক মাস কনখল সেবাশ্রমেই ছিলেন। ১৯০৩ সালে ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এই সেবাশ্রমের একটি পর্ণকুটীরে একমাস ছিলেন শুনেছি। এই স্থান ও বৃন্দাবন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এঁদের হৃদয়স্পর্শী বাণী ও ত্যাগ-বৈরাগ্যময় জীবন আজও অনেকের অন্তরের অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯২২ সালের ২১শে জুলাই, সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দজী কাশী সেবাশ্রমে মহাসমাধিতে দেহত্যাগ করেন। পরদিন তাঁর পূতদেহ মণি-কর্ণিকার গঙ্গাজলে বিসর্জন দেওয়া হয়। তখন আমি কাশী সেবাশ্রমেই ছিলাম। তাঁর মতো ত্যাগী, পণ্ডিত, কঠোর-তপস্বী সাধু অতি দুর্লভ। আমি তাঁকে প্রথম পাই ১৯১৯ সালের অগস্টে কাশী সেবাশ্রমে গিয়ে। পরে ১৯২২ সালের মে মাসে কাশী গিয়ে তাঁর কাছে দুমাস থাকি। তাঁর মধুর স্মৃতি ও আকর্ষণ জীবনে ভুলবার নয়।

পূজ্যপাদ কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দ মহারাজের জীবন দেখে আমার মনে হ'ত, কত ত্যাগ-তপস্যা-বৈরাগ্য ওঁদের ভেতর। বিলাসিতা বা আরাম-প্রিয়তা কখনো দেখিনি, আহার-বিহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ খুবই সাধারণ ছিল। একটা তুলার জামা ও কম দামের জুতো ব্যবহার করতেন। বিছানা-মশারী প্রায়ই ব্যবহার করতেন না। ত্যাগ-তিতিক্ষার যেন পরাকাষ্ঠা! এরূপ কঠোরতাময় জীবন যাপন করতে দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম! স্বামী কল্যাণানন্দজী আমৃত্যু প্রায় ছত্রিশ বছর এই সেবাশ্রমে থেকে আর্ত নরনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দজীও দীর্ঘ তিরিশ বছরের মধ্যে একদিনও নরনারায়ণের সেবা থেকে বিশ্রাম নেননি শুনেছি। এত উদ্যম-অধ্যবসায় ও সেবা-শুশ্রূষার ভাব গুরুবলে বলীয়ান না হলে মনে হয় কখনই সম্ভব হ'ত না। অদম্য উৎসাহ, অসীম ধৈর্য ও শক্তি-সাহস যেন শ্রীগুরুর আশীর্বাদেই এঁরা লাভ করেছিলেন। তাঁদের অদ্ভুত মনোবলের পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি! ত্যাগ-তপস্যা, তিতিক্ষা ও অক্লান্ত সেবা-সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দের এই দুই প্রিয়

শিষ্য এক নূতন আলোকের সন্ধান এনে দিয়েছিলেন। এঁদের গুরুভক্তি অতুলনীয় এবং সমগ্র জীবন ছিল স্বামীজীর আদর্শের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ। এঁরা সেবাশ্রমকে মনে করতেন ভগবদ্-উপাসনার একটি শ্রেষ্ঠ স্থান। এই দুই স্বামীজীর অসাধারণ চরিত্র-মাধুর্যে অনেকেই অভিভূত হয়েছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এভাবে সেবা-শুশ্রূষা করা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

একসময় কল্যাণানন্দ মহারাজ তাঁর অসুস্থ গুরুদেবের সেবার জন্য প্রায় আধ মন বরফ হাতে ক'রে কলকাতা থেকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসেন পদব্রজে। স্বামীজী তাঁর এই শ্রদ্ধা-ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে কল্যাণানন্দ পরমহংসত্ব লাভ ক'রে ধন্য হবে।'

স্বামীজীর এই দুই শিষ্যকে উত্তরাখণ্ডের মঠধারী গোঁড়া সাধুরা 'ভাঙ্গী সাধু' বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেও হৃষীকেশ কৈলাস-মঠের বিখ্যাত মণ্ডলীশ্বর স্বামী ধনরাজ গিরিজী মহারাজ এই দুই স্বামীজীর সেবাময় অপূর্ব জীবন দেখে মহা উন্নত সাধু বলেই বুঝেছিলেন এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমাদর করতেন। ঐ সময় সাধুদের ভাণ্ডারাতেও প্রথম দিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের নিমন্ত্রণ হ'ত না। 'ভাঙ্গী সাধু'দের সঙ্গে একত্র খেতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করতেন। আর্ত-নারায়ণের সেবা-শুশ্রূষার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনাও হ'ত। ঐ সব সাধুদের মতে মলমূত্র পরিষ্কার করা ভাঙ্গী বা মেথরের কাজ। সর্বকর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর কর্ম নয় এভাবে অস্পৃশ্য নীচজাতির সেবা-শুশ্রূষা করা। 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ', সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা ওঁরা শুধু মুখেই বলতেন। 'যত্র জীব তত্র শিব' —এই তত্ত্বকথা কাজে ফলানো ওঁদের ধারণারও অতীত ছিল। ওঁরা বলতেন, 'মায়া অবিদ্যামেঁ সাধুকো নহীঁ ফাঁসনা চাহিয়ে। করমফল সবকো ভোগ্‌নে দো। সেবা কী ক্যা জরুরৎ হ্যায়?' এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই স্বামীজীরা নিঃস্বার্থভাবে আজীবন নরনারায়ণজ্ঞানে সবারই সেবা করেছেন দেহমনপ্রাণ দিয়ে। গুরুর আদেশ একটুও লঙ্ঘন করেননি। অসময়ে রোগী এলেও কষ্ট বা বিরক্তির ভাব আমরা দেখিনি। সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানেই এঁরা সেবা করতেন সকলের।

আমি যখন প্রথম কনখল মিশনে যাই, তখন দেখি আত্মপ্রকাশের ছত্রের পাশে আমাদের মিশনের একটিমাত্র গেট যাতায়াতের জন্য। ঐ গেটের পাশে একটি ছোট চালাঘরে কয়েকটি গরু, মোষ রয়েছে। উত্তরদিকে আমাদের থাকার জন্য লম্বা একতলা একটি বাড়ি। তারই দুটি ঘরে বড় স্বামীজী ও ছোট স্বামীজী পাশাপাশি থাকতেন। অন্যান্য সাধুরা বিভিন্ন ঘরে। পশ্চিমদিকের শেষ ঘরটি ছিল ঠাকুরঘর। সুরেন মহারাজ, নগেন মহারাজ, জীবন মহারাজ এবং ভবানন্দ মহারাজ প্রভৃতিকে গিয়ে দেখি। রোগী রাখার জন্য ছোট দুটি পাকাবাড়ি ছিল। ডিসপেন্‌সারিটিও ছিল ছোট একটি পাকাবাড়িতে। তখন ইন্‌ডোর ও আউটডোরে রোগী বেশী হ'ত না। অবশ্য বর্ষাকালে রোগীদের সংখ্যা বাড়ত। শীতকালে খুব কমই রোগী থাকত। কখনও দেখেছি একটিও রোগী নেই বড় স্বামীজী ইন্‌ডোর ও বাইরের রোগী দেখতে যেতেন, টাঙ্গা বা এক্কাতে করে। রোগীর জন্য সর্বদাই সেবাশ্রমের দ্বার উন্মুক্ত থাকত। কেউ নিরাশ হয়ে ফিরত না। চিকিৎসারও সুনাম ছিল। ছোট স্বামীজী দুবেলাই আউটডোরে বসতেন। কখন বাইরেও যেতেন রোগী দেখতে। জীবন মহারাজ ঔষধ দিতেন। এঁর সরল-মধুর ব্যবহারে ও সেবাযত্নে সবাই তৃপ্তিলাভ করতেন। যক্ষ্মা ও কলেরা রোগীর সেবাও আমাদের করতে হ'ত পরে। নিকটে ভালো ডাক্তার না পেয়ে বহু দূর থেকেও সেবাশ্রমে রোগীরা আসতেন। সবাইকেই

বিনামূল্যে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হ'ত।

স্বামীজীদের এই সেবার ভাব ও মধুর ব্যবহারের পরিচয় পেয়ে পরে অনেক মঠাধীশ প্রাচীন সাধুরাও সেবাশ্রমে আসতেন একটু অসুস্থ হলেই। আবশ্যক হলে ইনডোরে তাঁদের ভর্তি করেও নেওয়া হত। ঔষধপত্র ও সেবাযত্নের ফলে তাঁরা সুস্থ হয়ে আবার নিজেদের আশ্রমে ফিরে যেতেন। লাইব্রেরী থেকে ঠাকুর-স্বামীজীর হিন্দী বই নিয়ে নিয়মিত পড়তেন পরে। কোথাও ভাণ্ডারা হ'লে আগেই সেবাশ্রমের সাধুদের আমন্ত্রণ আসত। তাঁরা না যাওয়া পর্যন্ত সব সাধুরাই প্রতীক্ষা করতেন। সিদ্ধযোগী মথুরাদাস ও বড় বড় উন্নত সাধুদেরও আমরা দেখেছি সেবাশ্রমে এসে দীর্ঘ সময় থাকতে উভয় স্বামীজীর কাছে। গুরুদাস মহারাজ (স্বামী অতুলানন্দ), জগদানন্দ মহারাজ, রাঘবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি মাঝে মাঝে এসে এই সেবাশ্রমে থাকতেন। পাঠ ও ধর্মালোচনাও করতেন আমাদের নিয়ে। স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহিমবাবুও মাঝে মাঝে এসে দুই-তিনমাস থাকতেন ও আমাদের নিয়ে সৎপ্রসঙ্গাদি করতেন। স্বামী অচলানন্দও (কেদার বাবা) ১৯১২ সালের মার্চ মাসে এখানে এসে কিছুদিন ছিলেন, আমরা শুনেছি। ছোট স্বামীজী ও বড় স্বামীজীকে আমরা দেখেছি ঠাকুরের সেবা-পূজা ও ভোগরাগের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে। মাঝে মাঝে ভাণ্ডারাও দিতেন। পূজা, উৎসবাদিও নিয়মিত হ'ত। পরিতোষ-সহকারে সবাই প্রসাদ পেতেন। আমরাও গিয়ে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা ঘটে-পটে করেছি ওঁদের নির্দেশে।

একসময় ভাণ্ডার দেখাশোনা ও বাজার করার ভার আমাকে নিতে হয়েছিল। হিসাবপত্র ছোট স্বামীজী লিখে রাখতেন পাকা খাতায় আমার কাছ থেকে নিয়ে নিত্য রাতে। তখন ইলেক্‌ট্রিক আলো আসেনি। হ্যারিকেন জেলেই সব কাজকর্ম করতেন। একদিনের কথা আমার মনে পড়ছে, একটা পয়সা হিসাবে না মেলায় নিশ্চয়ানন্দ স্বামীজী সন্ধ্যা হতে রাত এগারোটা পর্যন্ত শীতের রাতে প্রবল ঠাণ্ডার ভেতরে খেটে খেটে তাঁর ঐ ভুলটি বের করলেন। বার বার ডাকা সত্ত্বেও হিসাব না মেলা পর্যন্ত তিনি খেতে এলেন না। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় এসে ঐ ঠাণ্ডা ডালরুটি খেলেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সত্যের প্রতি আঁট দেখে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি।

মাতৃপিতৃহীন দুটি গরীব ছেলে কুন্দন ও জমাদারকে কত আদর-যত্নে রেখে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা স্বামীজী মহারাজদের করতে দেখেছি দীর্ঘকাল ধরে। বাগানের মুসলমান মালী মুরাদ আলীকেও কত স্নেহ-প্রীতির চোখে স্বামীজীরা দেখতেন। কত ভালো ভালো আম, লিচু, লেবু প্রভৃতির চারা এনে ওকে দিয়ে লাগাতেন নিজেরা কাছে দাঁড়িয়ে থেকে। কত ফলফুল তরিতরকারীও ওকে দিয়ে করাতেন। অবশ্য ঐ সময় শাক-সবজী ফলমূলের দামও বাজারে কম ছিল। প্রচুর আমদানীও হ'ত।

আমি কনখলে থাকতে হঠাৎ 'সোঽহং স্বামী' (বিখ্যাত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর আলমোড়া-নৈনিতাল আশ্রমে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন খবর আসে। আশ্রম থেকে দুজন সাধুকে সেবার জন্য পাঠানো হয়। অল্প কদিনের মধ্যেই তিনি দেহ রাখায় সাধুরা আশ্রমে ফিরে আসেন।

ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদে কনখল সেবাশ্রম বর্তমানে একটি গৌরবজনক বৃহৎ সেবায়তনে পরিণত হয়েছে। ১৯২৩ সালের ফেব্রুআরি মাসে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ কনখলে আসেন কল্যাণানন্দ স্বামীজীর বিশেষ অনুরোধে। আমি তখন কনখলে। এই সময় তিনি কয়েকজন আশ্রমিককে ব্রহ্মচর্য ও

সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং সাত-আট দিন পরে কাশী ফিরে যান। যাবার আগে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের বলেছিলেন, 'উত্তরাখণ্ড মহাপবিত্র দেবদুর্লভ স্থান। কত সাধু-মহাত্মা তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তোমরা সাধন-ভজন করতে ভুলবে না, যতই কাজের চাপ থাকুক না কেন। তোমরা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, জ্ঞান-ভক্তি লাভ ক'রে মানবজীবন সার্থক কর—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।'

আমি কনখল সেবাশ্রমে থেকে কয়েক বছর যথাশক্তি সেবাধর্ম পালন করি। তারপর তপস্যার তীব্র ইচ্ছা হওয়ায় হিমালয়ে যাই গুরুদেবের আদেশ নিয়ে। অবশ্য এর পূর্বে হৃষীকেশ, স্বর্গাশ্রমে থেকেও কিছুকাল সাধনভজন করি। চিরসৌন্দর্যময় ত্যাগের লীলাভূমি গিরিরাজ হিমালয়ে মহা-আনন্দেই কাটানো গেল দীর্ঘদিন তাঁরই আশীর্বাদে। চিরতুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের রমণীয় দৃশ্য আজও ভুলতে পারিনি।

ইং ১৯৩৪ সালের ২২শে অক্টোবর কনখল মিশনে ছোট স্বামীজী নিশ্চয়ানন্দ মহারাজ ধ্যানাসনে বসে দেহ রাখেন। দেহ রাখার কদিন পূর্বেও ঠাকুর-মা-স্বামীজীর দর্শন তিনি বহুবার পান আমরা শুনেছি। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে স্বামী কল্যাণানন্দ মহারাজ স্বাস্থ্যের জন্য মুসৌরী পাহাড়ে যান। ২০শে অক্টোবর রাত এগারোটার পর সেখানেই মহাসমাধি লাভ করেন। পরের দিন তাঁর পূতদেহ কনখলে এনে গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করা হয়। বড় স্বামীজী ও ছোট স্বামীজীর দেহত্যাগের সময় আমি সাধন-ভজনের জন্য দূরে অন্যত্র ছিলাম। সুদীর্ঘ ৬৪ বছর পূর্বের হরিদ্বার, কনখল ও হৃষীকেশের সেই শান্ত-নির্জন গম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশটির কথা স্মরণ করলে আমি আজও আনন্দে অভিভূত হই।

ইং ১৭. ১০. ২৭ তারিখে কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে পূজনীয় কল্যাণানন্দজী মহারাজ এক পত্রে আমাকে কনখল আশ্রমে লেখেন—

প্রিয় দেবানন্দ,

তোমার ৺বিজয়ার প্রণামপত্র আচ্ছাবল হইয়া শ্রীনগরে আসিয়াছে।...তুমি আমার ৺বিজয়ার আলিঙ্গন, প্রীতি-সম্ভাষণ ও ভালবাসাদি জানিবে। আমরা আচ্ছাবলেও ৺পূজার তিনদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভোগ, চণ্ডী ও গীতাপাঠ প্রভৃতি দিয়াছিলাম। এবারে কনখল সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া আমরা অতীব আনন্দিত হইলাম। তোমাদের সকলের অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নে যে ঐ কার্য হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। শুধু কর্মদ্বারা লোক ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। তার সঙ্গে সঙ্গে উপাসনাও বিশেষ প্রয়োজন। একথা স্বামীজী অনেকবার বলেছেন। যেমন পাখি একটা ডানা দিয়ে উড়তে পারে না, সেইরূপ শুধু কর্মদ্বারা লোক অগ্রসর হইতে পারে না। তুমি সকলকে নিয়া যে আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করিয়াছ, তাহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, এবং তোমাদেরও মায়ের আরাধনা করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি নিশ্চয়ই হইয়াছে ও হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুত নিশ্চয়ানন্দ যে পরিশ্রম করিয়া তোমাদের ঐ কার্যে সহায়তা করিয়াছে এবং উৎসাহ দিয়াছে তাহাতে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে এবং তোমাদেরও শ্রীশ্রীমায়ের উপাসনায় সহায়তা হইয়াছে।

তুমি আমাদের আন্তরিক ভালবাসাদি জানিবে।

সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
কল্যাণানন্দ

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

সঙ্কলক : ডক্টর জলধিকুমার সরকার

[পৃষ্ঠাসংখ্যা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ১ম ভাগ, দশম সংস্করণ ও দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চম সংস্করণ অনুযায়ী]

১। মায়ের কাছে ঠাকুরের যে ফটো ছিল, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় মা বলছেন, "এটি খুব ঠিক ঠিক। ওখানি এক ব্রাহ্মণের ছিল। প্রথম কখানি যেমন উঠান হয়। একখানি সে ব্রাহ্মণটি নিয়েছিল। আগে এখানি খুব কাল (deep) ছিল—ঠিক যেন কালীমূর্তিটি, তাই ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়েছিল। সে ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কোথায় যাবার সময় ওখানি আমার কাছে রেখে যায়। আমি এখানি অন্যান্য ঠাকুরদেবতার ছবির সঙ্গে রেখে দিয়েছিলুম—পূজা করতুম। নহবতের নীচের ঘরে থাকতুম। একদিন ঠাকুর গিয়েছেন। ছবি দেখে বলছেন, 'ওগো, তোমাদের আবার এসব কি?' আমরা (বোধহয় মা ও লক্ষ্মী দিদি) ওপাশে সিঁড়ির নীচে রাঁধছি। তারপর দেখলুম, বিল্বপত্র আর কি কি, যা পূজার জন্য ছিল, একবার না দুবার ঐ ছবিতে দিলেন—পূজা করলেন। সেই ছবিই এই। সে ব্রাহ্মণ আর ফিরে এল না। এখানি আমারই রইল।"

প্রশ্ন—মা, ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের মুখ কখনও ম্লান দেখেছ কি?

মা—কই, আমি তো কখনও দেখি নি। সমাধি অবস্থায় মুখে হাসিই দেখেছি।

প্রশ্ন—ভাবসমাধিতে মুখে হাসি থাকতে পারে। কিন্তু বসা ছবির সম্বন্ধে ঠাকুরও বলেছেন, 'এ অতি উচ্চ অবস্থার ছবি।' এতেও কি হাসি থাকে?

মা—আমি তো সব সমাধির অবস্থায়ই হাসিমুখ দেখেছি।

প্রশ্ন—রঙ কি রকম ছিল?

মা—তাঁর গায়ের রঙ যেন হরিতালের মত ছিল—সোনার ইষ্ট-কবচের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে। কালীবাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরের একজনদের জামাই এসেছিল—খুব গৌরবর্ণ। ঠাকুর আমায় বলছেন, 'আমরা দুজনে পাশাপাশি পঞ্চবটীতে বেড়াব, তুমি দেখবে কার রঙ ফরসা।' তাঁরা বেড়াতে লাগলেন, দেখলুম ঠাকুরের চেয়ে তার রঙ একটু ফরসা—উনিশ-বিশ হবে।

যখনই কালীবাড়ীতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে দেখত, বলত, 'ঐ তিনি যাচ্ছেন।' বেশ মোটাসোটা ছিলেন। মথুরবাবু একখানা বড় পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন তাতেও বসতে কুলাত না। ছোট তেলধুতিটি পরে যখন থস থস করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, লোকে অবাক হয়ে দেখত।

কামারপুকুরে যখন যেতেন, ঘরের বার হলেই মেয়ে-মদ্দ হাঁ করে চেয়ে থাকত। একদিন ভূতির খালের দিকে বেরিয়েছেন, চারদিকের মেয়েগুলো—যারা জল আনতে গেছে—হাঁ করে দেখছে আর বলছে, 'ঐ ঠাকুর যাচ্ছেন।'

ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন, 'ও হৃদু, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—দে, দে, নইলে আমি এখুনি ন্যাংটা হব।' হৃদয় বললে, 'না, মামা, এখানে ন্যাংটা হয়ো না, এখানে ন্যাংটা হয়ো না, লোকে কি বলবে?' ন্যাংটা হলে মেয়েগুলো পালাবে কিনা। হৃদয় তাড়াতাড়ি গায়ের চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দিলে।

তাঁকে কখনও নিরানন্দ দেখি নি। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর

সঙ্গেই বা কি, সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। ২।৫০-৫৩

২। কেদার মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এবার কি ঠাকুর একটা নতুন জিনিস দিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলেন যে সর্বধর্মসমন্বয় করে গেলেন?" মা বলিলেন, "দেখ, বাবা, তিনি যে সমন্বয়-ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্‌ভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীষ্টানরা, মুসলমানরা, বৈষ্ণবরা যে যে ভাবে তাঁকে ভজনা ক'রে বস্তুলাভ করে, তিনি সেইভাবে সাধনা ক'রে নানা লীলা আস্বাদ করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোনও হুঁস থাকত না। তবে কি জান, বাবা, এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ও রকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনও কেউ দেখেছে? সর্ব-সমন্বয়-ভাবটী যা বললে, ওটিও ঠিক। অন্যান্য বারে একটা ভাবকেই বড় করায় অন্য সব ভাব চাপা পড়েছিল।" ২।২৪২-৪৩

৩। জনৈক ভক্তের প্রাণটা মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়েছে এবং 'মায়ের ভালবাসা পেলুম না' এই সব বারে বারে বলাতে, মা বিরক্ত হয়েছিলেন। সেই সূত্রে মা বললেন, "কোন ছেলে এল, খেলে দেলে, চলে গেল। মায়া কি? হাজরা ঠাকুরকে বলেছিল, 'আপনি নরেন-টরেন ওদের জন্য অত ভাবেন কেন? তারা আপনার মনে খাচ্ছে দাচ্ছে, আছে। আপনি ভগবানের চিন্তায় মন স্থির করুন। আপনার আবার মায়া কেন?' ঠাকুর তার কথামত সব মায়া কাটিয়ে ভগবানে মন লীন করলেন। দাড়ির চুল, মাথার চুল এমনি (দেখাইয়া) সোজা হয়ে কাঁটা দিলে, কদমফুলের মত। একবার ভাব দেখি, সে লোকটি কি ছিলেন। ঠাকুর তখন বাহ্যে গিয়েছিলেন। রামলাল আর শৌচ করাতে পারলে না। কাকে শৌচ করাবে? সব শরীর জড়, কাঠ—শক্ত! তখন রামলাল বলতে লাগল, 'যেমনটি ছিলে তেমনটি হও, যেমনটি ছিলে তেমনটি হও।' বলতে বলতে শেষে দেহে মন এল। দয়ায় মনকে নামিয়ে রাখতেন।" ২।৭৫-৭৬

৪। মা পূজার ঘরে বসিয়া আছেন—পূজা শেষ হইয়াছে। একজন ভক্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখেন?' মা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'সন্তানের মত দেখি।' ২।৩৬৫

৫। "তাঁর ত্যাগই ছিল ঐশ্বর্য। তিনি ত্যাগ করেছিলেন বলে আমরা সব তাঁর নামে খাচ্ছি দাচ্ছি। লোকে ভাবে, তিনি এত বড় ত্যাগী ছিলেন, তাঁর ভক্ত এঁরা না জানি কত বড় হবে।

আহা একদিন খেয়ে নবতের ঘরে গেছেন। বেটুয়ায় মসলা ছিল না। দুটি যোয়ান মৌরি খেতে দিলুম, আর দুটি কাগজে মুড়ে হাতে দিলুম, বললুম 'নিয়ে যাও।' তিনি নবতের ঘর থেকে ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে না গিয়ে সোজা দক্ষিণ-দিকের নবতের কাছে গঙ্গার ধারের পোস্তায় চলে গেছেন—পথ দেখতে পান নি, হুঁশও নেই। বলছেন, 'মা ডুবি? মা, ডুবি?' আমি এদিকে ছটফট করছি—ভরতি গঙ্গা। বউ মানুষ, বেরুই না, কোথাও কাউকে দেখিও না। কাকে পাঠাই? শেষে মা কালীর একটি বামুন এদিকে এল। তাকে দিয়ে হৃদয়কে ডাকালুম। হৃদয় খেতে বসেছিল, তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই দৌড়ে একেবারে ধরে তুলে নিয়ে এল। আর একটু হলেই গঙ্গায় পড়ে যেতেন।…সাধুর সঞ্চয় করতে নেই, তাই পথ দেখতে পান নি। তাঁর যে ষোল আনা ত্যাগ।" ২।১০০-১০১ [ক্রমশঃ]

পূজা-বিজ্ঞান

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

(দুই)

'অর্থজ্ঞানস্য কর্মানুষ্ঠানাঙ্গত্বং নহ্যর্থজ্ঞানমন্তরেণ অনুষ্ঠানং সম্ভবতি'—অর্থজ্ঞান কর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ, অর্থজ্ঞানব্যতিরেকে প্রকৃত কর্মানুষ্ঠান সম্ভব নয় —এই শাস্ত্রবচনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ পূজার অনুষ্ঠেয় কয়েকটি অনুষ্ঠানের তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টাই এই আলোচনার বিষয়। পূজক এবং জিজ্ঞাসু, যাঁদের এই সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, তাঁদের জন্য প্রচলিত কয়েকটি অনুষ্ঠানের তাৎপর্য অতি সংক্ষেপে এখানে দেওয়া হল।

'অর্থজ্ঞান' বলতে এখানে অনুষ্ঠান এবং মন্ত্র উভয়ের কথাই বলা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের মর্মগত অর্থ পূজকের যেমন জানা থাকবে, পূজার কোন্ মন্ত্রের কি অর্থ, তাও তাঁর জানা একান্ত প্রয়োজন। সম্পূর্ণ ফললাভের জন্য উভয়েরই সমান প্রয়োজন। যাই হোক, তাৎপর্য-বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে গোড়াতেই এই সম্পর্কে দু-একটি সাধারণ কথা বলে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করি। তাতে আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। পূজার অঙ্গ বা অনুষ্ঠানের কোন একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে পৃথক্ ক'রে দেখলে তার যথার্থ তাৎপর্য বোঝা যাবে না। বরং বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সার্থকতা, এটি মনে রাখতে হবে। পূজার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াই এক সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। পূজায় যে-সব বিধি-অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে, কেন এবং কি অভিপ্রায়ে এইগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে, তার কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা অল্পবুদ্ধি মানুষের পক্ষে সব সময় সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলে কিন্তু অনুষ্ঠানের গূঢ় তাৎপর্য ও সার্থকতার তাতে কোন হানি হয় না। এ-সব ক্ষেত্রে শাস্ত্র-বিধানই চূড়ান্ত এবং অবশ্য-গ্রহণীয়। শাস্ত্রেরও পরিষ্কার নির্দেশ—'যে শাস্ত্রবিধি না মেনে নিজের ইচ্ছামত চলে, সে কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। ইহলোকে সে যেমন সুখলাভ করতে পারে না, পরলোকেও তার শ্রেষ্ঠগতি হয় না।' (যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ / ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥—গীতা ১৬।২৩)।

অনুষ্ঠানের সার্থকতা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অনুভূত কয়েকটি উপলব্ধির কথা উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উপলব্ধিগুলি তাঁর সাধক-জীবনের বিভিন্ন সময়ে ঘটে থাকলেও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় এবং বলবার সুবিধার জন্য একসঙ্গেই বলে রাখছি।

"ঠাকুর বলিতেন, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গসকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ নিজদেহে উজ্জ্বলবর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক দেখিতে পাইতেন।··· পূজাপদ্ধতির বিধানানুসারে যখন 'রং ইতি জলধারয়া বহ্নি-প্রাকারং বিচিন্ত্য'—অর্থাৎ রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ-পূর্বক পূজক আপনার চতুর্দিকে জল ছড়াইয়া ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিঘ্নবাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি কথা উচ্চারণ করিতেন, তখন দেখিতে পাইতেন, তাঁহার চতুর্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অনুল্লঙ্ঘনীয় অগ্নির প্রাচীর সত্য-সত্যই বিদ্যমান থাকিয়া পূজাস্থানকে সর্ববিধ বিঘ্নের হস্ত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৫৮, সাধকভাব, পৃঃ ৯৭)।

"সন্ধ্যা-পূজাদি করিবার সময় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যখন ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম, তখন কে জানিত, শরীরে সত্য-সত্যই পাপপুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায়!…একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া আছি, সহসা দেখছি কি মিস্‌কালো রঙ, আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল। পরক্ষণে দেখি কি—আর একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া ঐরূপে (শরীরের) ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্বোক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণপূর্বক নিহত করিল।" (ঐ, পৃঃ ১২৪-২৫)।

"…মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, 'মা'র নয়ন হইতে অপূর্ব জ্যোতিঃরশ্মি লক্ লক্ করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্যসমুদয় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে!" (ঐ, পৃঃ ১১৬)। এরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বাহুল্য-ভয়ে এই কয়েকটির উল্লেখ করেই আমরা বিরত থাকলাম।

এবার আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। পূজার প্রথম নির্দেশ, স্নান ও আহ্নিকাদি নিত্যকর্ম সেরে পূজক শুদ্ধভাবে পূজামণ্ডপে প্রবেশ ক'রে দেবতাকে প্রণামপূর্বক উত্তর বা পূর্বমুখী হয়ে পূজাসনে উপবেশন করবেন।

এই নির্দিষ্টমুখী, অর্থাৎ উত্তর বা পূর্বমুখী হয়ে পূজাসনে বসবারও একটি তাৎপর্য আছে। প্রতীক বা সংকেত অর্থেই এই দিক্‌গুলি চিহ্নিত হয়েছে। সূর্য জ্ঞানের প্রতীক, সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। কাজেই পূর্বদিকের কথা মনে হলে জ্ঞানসূর্য উদিত হওয়ার ভাব স্বভাবতই মনকে উদ্দীপিত করে। কম্পাসের কাঁটা সর্বদা যেরূপ উত্তরমুখী থাকে, মানুষের মন সর্বদা সেরূপ ঈশ্বরমুখী রাখবার কথা। উত্তরদিকের কথা বললেই ঈশ্বরমুখী মন রাখবার কথা সহজেই মনে আসে। তাই অনুমান হয়, জপধ্যান ও পূজানুষ্ঠানাদিতে উত্তর বা পূর্বমুখী হয়ে বসবার নির্দেশ।

আচমন: দেহমন শুদ্ধ না থাকলে আধ্যাত্মিক সাধনের যোগ্যতা হয় না। অন্যভাবে, দেহমন শুদ্ধ ক'রে নিয়ে তবে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হতে হয়। আচমনের মুখ্য উদ্দেশ্য দেহমন শুদ্ধ করা। বিষ্ণুস্মরণ সেই দেহমন শুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় 'যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর-শুচিঃ'—পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ বিষ্ণুস্মরণে সাধকের বাহ্যাভ্যন্তর সম্যক্ বিশুদ্ধ হয়। তন্ত্রেও বলা হয়েছে আচমন দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ দেহেরই শোধন হয়। (আত্মতত্ত্বেন স্থূলদেহং শোধয়ামি স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বেন সূক্ষ্মদেহং শোধয়ামি স্বাহা, শিবতত্ত্বেন পরদেহং শোধয়ামি স্বাহা।—তারাভক্তিসুধার্ণব, পৃঃ ১২৯)। আবার আচমনে পূজককে পূজার লক্ষ্য সর্ব-ব্যাপক অখণ্ড-চৈতন্য পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হওয়ার কথাও পরোক্ষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। আচমনের প্রার্থনার 'ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি যে মন্ত্র (ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ / দিবীব চক্ষুরাততম্।—ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১।২২।২০) আবৃত্ত করা হয় তার অর্থ: অনাবৃত আকাশে সূর্যালোকের সাহায্যে চক্ষু যেমন বিশ্বকে দেখে, জ্ঞানীরাও ব্রহ্মকে সেভাবে দর্শন করেন। কর্মারম্ভের সূচনায় সাধকও প্রার্থনা করছেন—জ্ঞাননেত্রে তিনি যেন বিষ্ণুকে দর্শন করতে পারেন, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। কর্মের উদ্দেশ্য-সাধনে তিনি যেন সক্ষম হন।

স্বস্তিবাচন: অভীষ্ট কর্মের সফলতা এবং সর্বভূতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনাই স্বস্তিবাচনের

মূলকথা। স্বস্তিবাচনের মন্ত্রের মধ্যেও উহা সুস্পষ্ট। স্বরূপতঃ জীব পরস্পর একাত্ম। সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টির কল্যাণ, আবার ব্যষ্টির কল্যাণে সমষ্টির কল্যাণ—স্বস্তিবাচনের মন্ত্রে এই ভাবটি পরিস্ফুট। আমার সাধনার ফল সকলে সমান-ভাবে উপভোগ করুক, সকলের কল্যাণ হোক। স্বস্তিবাচনের এই বিশ্বজনীন ভাবটি হৃদয়স্পর্শী।

সংকল্প : যে উদ্দেশ্যে পূজা, সাধকের মনে তা দৃঢ়মূল ক'রে দেওয়ার জন্যই সংকল্প। পূজার প্রধান উদ্দেশ্য দেবতাকে প্রসন্ন করা, তাঁর প্রীতিকামনা। পূজ্য দেবতার প্রীতিলাভ করতে পারলে সাধকের আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে না। সংকল্পের মন্ত্রেও আছে—'অমুক-দেবতা প্রীতি-কামঃ' ইত্যাদি। উক্ত সংকল্প-বাক্যে উল্লিখিত মাস, পক্ষ, তিথি ইত্যাদি বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পূজকের নিত্যসম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—মহাবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক-ভাবনা পূজককে মহান্ ভাবে ভাবিত করতে সাহায্য করে।

ঘটস্থাপন : ঘটস্থাপন পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ। প্রায় যাবতীয় মূর্তিপূজাতেই একটি ঘট স্থাপন করা হয় এবং ঐ ঘটে দেবতাকে আহ্বান-পূর্বক পূজার্চনা করা হয়। ঘট দেবতার প্রতীক। যে স্থলে কোন মূর্তি থাকে না, সেখানে ঘটই দেবতার প্রধান প্রতীক বা প্রতিরূপ।

ঘটস্থাপনের আরও একটি তাৎপর্য আছে। ঘট হৃদয়গুহার অনুকল্প। হৃদয়ই আত্মার কেল্লা। 'আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্'—আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। ঘট সেই হৃদয়েরই অনুকল্প। ঘটমধ্যস্থিত জল—ভাবের, ফল—বুদ্ধি বা জ্ঞানের, পঞ্চপল্লব—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের, পঞ্চরত্ন—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চশস্য—পঞ্চ-তন্মাত্রার অনুকল্প। ঘটগাত্রস্থিত সিন্দুরমূর্তিটি সূক্ষ্মদেহের প্রতিরূপ। "ঘটস্থাপনকালে যে সকল মন্ত্রপাঠের উপদেশ আছে, অর্থজ্ঞান ও তদাত্মক অনুভূতি সহকারে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারিত হইলে, সম্মুখস্থ ঘটটী যে স্বকীয় হৃদয়েরই যথার্থ প্রতিরূপ-মাত্র, তাহা অনুভূত হইতে থাকে এবং ঐ স্থান হইতেই যে সমস্ত দেবশক্তির আবির্ভাব হয়, ইহাও প্রত্যক্ষ হইতে থাকে।" (পূজাতত্ত্ব—ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব, পৃঃ ১৩৩)।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা : প্রতিমাপূজায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা একটি অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান। সাধকের নিজের আত্মসত্তাকে সম্মুখস্থিত প্রতিমায় আরোপিত করাই প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূলকথা। প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রগুলিতেও এই ভাব সুস্পষ্ট। দেবতা আমারই আত্মা। নিজেকে দেবতা ভেবে, নিজের দিব্যত্ব কল্পনা ক'রে যথানির্দিষ্ট মুদ্রায় পুষ্পাদি গ্রহণ ক'রে নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে সর্বগত চৈতন্যময় দেবতাকে আরাধ্য মূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে করতে আত্মার দিব্যত্ব সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত হয়।

বস্তুমাত্রই চৈতন্যময়ী প্রাণময়ী মহাশক্তির রূপ। উপলব্ধিমূলক এই জ্ঞানই সাধনার অন্যতম চরম লক্ষ্য। কাজেই মূর্তিতে সাধকের শাস্ত্র-বিহিত উপায়ে চৈতন্যময় দেবতার প্রতিষ্ঠা করাই প্রাণপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।

দ্বারদেবতাপূজা : পূজানুষ্ঠান নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করবার জন্য দ্বারদেবতাগণের প্রসন্নতা ও আশীর্বাদলাভের জন্যই দ্বারদেবতাপূজা। দ্বার-দেবতাদের প্রসন্নতা লাভ করে, তাঁদের অনুমতি-ক্রমে পূজাগৃহে প্রবেশ করলে পূজায় বিঘ্নকারী অবাঞ্ছিত কোন ভূতাদি পূজাগৃহে প্রবেশ করতে পারে না। তাই পূজাগৃহে প্রবেশ করবার আগেই দ্বারদেবতাপূজার বিধান।

শুদ্ধি বা শোধন পূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যে বস্তু স্বরূপতঃ যা, তাকে তার সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার নামই শুদ্ধি বা শোধন। বস্তু-মাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। তাঁর বাইরের যে রূপ আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, তা আরোপিত

রূপ। শোধন বা শুদ্ধি বস্তুর এই আরোপিত রূপকে অনাবৃত করে তার স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

পঞ্চশুদ্ধি: পূজার প্রারম্ভেই পঞ্চশুদ্ধির বিধান। আত্মা (পূজক), স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা—এই পঞ্চপদার্থের শুদ্ধিকে পঞ্চশুদ্ধি বলে। পঞ্চশুদ্ধি ব্যতিরেকে কোন পূজাই সিদ্ধ হয় না। (আত্ম-স্থান-মন্ত্র-দ্রব্য-দেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী / যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চনং কুতঃ ॥—কুলার্ণবতন্ত্রম্ ৬।১৬)। পূজা একটি দিব্য ব্যাপার। পূজায় প্রত্যেকটি বস্তুর দিব্যরূপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়; বস্তুর দিব্যরূপটিই গ্রহণীয়। মন্ত্রশক্তিবলে সাধারণ বস্তুকে আধ্যাত্মিক সাধনার উপযোগী করে তোলাই শোধনের তাৎপর্য। সাধকের চিন্তায় শোধিত দ্রব্যের দিব্যরূপটিরই প্রাধান্য থাকে। তাই শাস্ত্রেরও নির্দেশ—পূজ্য, পূজক, পূজাদ্রব্য, পূজার স্থান, মন্ত্র, সবই দেবতা হবে।

শাস্ত্রবিহিত স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ন্যাসাদি আত্মশুদ্ধির; পূজাস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে চিত্রিত করা, ফুল মালা ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে ধূপ-দীপ ইত্যাদি জ্বালিয়ে দেওয়া স্থানশুদ্ধির; যথানির্দেশিত নিয়মে মূলমন্ত্র অনুলোম-বিলোম ক্রমে দুবার আবৃত্তি করা মন্ত্রশুদ্ধির, নির্দিষ্ট মন্ত্রে পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ ও মুদ্রাপ্রদর্শন দ্রব্যশুদ্ধির, এবং পূজাপীঠের উপর দেবতাকে নির্দিষ্ট মন্ত্রে প্রোক্ষণ দেবশুদ্ধির অন্তর্গত। এই পঞ্চশুদ্ধির দ্বারা পূজ্য, পূজক, পূজাদ্রব্য, মন্ত্র, পূজার স্থান সবই দিব্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভূতাপসারণ বা বিঘ্নাপসারণ: পূজার যাবতীয় অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করবার জন্য পাঞ্চভৌতিক জীবজগৎ যাতে পূজাকার্যে কোন প্রকার বিঘ্নসৃষ্টি না করতে পারে, তার জন্য পূজার প্রারম্ভেই ভূতাধিপতি শিবের আজ্ঞায় সমস্ত ভূত বিনাশপ্রাপ্ত হোক, পিশাচেরা দূরে সরে যাক—এরূপ প্রার্থনা করা হয়। পূজায় সিদ্ধিলাভের জন্য ভূতনাথের কৃপা-প্রার্থনাও এই অনুষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। ভূতাপসারণের মন্ত্রগুলিও এই ভাবের উদ্দীপক।

আসনশুদ্ধি: যে বস্তু স্বরূপতঃ যা, তাকে তার সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার নামই শোধন বা শুদ্ধি এবং সাধকের চিন্তায় শোধিত দ্রব্যের দিব্যরূপই প্রাধান্য পায়—পঞ্চশুদ্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে একথার উল্লেখ করা হয়েছে। 'ওঁ পৃথি, ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ' ইত্যাদি আসনশুদ্ধির মন্ত্রে ধরিত্রীর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে—হে ধরিত্রী-দেবী, তুমি সর্বলোককে ধারণ ক'রে আছ; আবার তোমাকে স্বয়ং বিষ্ণু ধারণ ক'রে আছেন। তুমি নিয়ত আমাকে ধারণ ক'রে থাক, আমি যেন কখনও তোমার কোল থেকে বিচ্যুত না হই। তুমি আমার আসনকে পবিত্র কর, দৃঢ় কর। তুমি আমার হৃদয়াসন শুদ্ধ ক'রে দাও।

আসন-প্রসঙ্গে আর একটি কথা এসে পড়ে—সাধকদের মতে সাধন-ভজনের সময় শরীরে অনেক সময় বিদ্যুতের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পূজাদিতে ব্যবহারের জন্য 'চৈলাজিনকুশোত্তরম্'—কুশাসন, মৃগচর্মাসন ও তদুপরি নরম বস্ত্র অথবা তদনুরূপ বিভিন্ন আসন ব্যবহারের বিধান আছে। মেরুদণ্ড সোজা করে ঐসব আসনে বসলে দেহস্থ বিদ্যুতের যাতায়াত সহজ হয়, বিদ্যুৎপ্রবাহ ভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধকের ক্ষতি করতে পারে না। ঐসব আসনের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি সহজে যাতায়াত করতে পারে না।

করশুদ্ধি: দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পূজায় করের (হাতের) ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তাই অনুমান হয়, পৃথক্‌ভাবে করশুদ্ধির বিধান। নতুবা করশুদ্ধি আত্মশুদ্ধিরই অন্তর্গত। উভয় করতল দিয়ে সচন্দন পুষ্প মর্দিত ক'রে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই পুষ্পকে ঈশানকোণে নিক্ষেপ

করলে করশুদ্ধি হয়। করযুগলকে সাধনের উপযোগী ক'রে তোলাই করশুদ্ধির উদ্দেশ্য।

মেরুতন্ত্রে করশুদ্ধির আরও একটি তাৎপর্যের কথা পাওয়া যায়। তাতে আছে পুষ্পকে মর্দন ও আঘ্রাণ করে 'ওঁ হৌঁ, তে সর্বে বিলয়ং যান্তু যে মাং হিংসন্তি হিংসকাঃ / মৃত্যুরোগভয়ক্লেশাঃ পতন্তু রিপুমস্তকে'—এই মন্ত্র পাঠপূর্বক পুষ্প ঈশানকোণে নিক্ষেপ করবার নির্দেশ। তাৎপর্য এই যে, যারা আমার এই সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করবে, সেইসব বিঘ্নকারী শত্রুর মস্তকে এই ফুল পতিত হোক, তারা বিনাশপ্রাপ্ত হোক। এর একটা আন্তর দিকও আছে। সাধকের নিজ অন্তরে সাধনের বিঘ্নকারী রিপু-আদি যে-সব শত্রু আছে, তাদেরও বিনাশ প্রার্থনা এইসঙ্গে করা হচ্ছে।

দিব্যবিঘ্ন নিবারণ ও দিগ্বন্ধন : আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক—কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন পূজায় না ঘটে, তারই ব্যবস্থা। পূজাস্থানের চারদিকে জলের ছিটা দিয়ে দিগ্বন্ধন করে সুরক্ষিত দুর্গ রচনা করাই উদ্দেশ্য। সুরক্ষিত দুর্গে যেরূপ কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন প্রবেশ করতে পারে না, এই দুর্গও পূজককে সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নের হাত থেকে রক্ষা করে।

বহ্নিপ্রাকার-চিন্তা : "তীক্ষ্ণাকল্পে ও তারার্ণবে আছে—'রক্তং রেফজ-বালার্কমণ্ডলোর্দ্ধগ-কূর্চজং। বিভাব্য বজ্রমেতেন প্রাকারং দশদিগ্-গতং ত্রিলোকীব্যাপিকিরণং দলিতাখিলবিঘ্নকং॥ কৃত্বা বজ্রময়ং জ্যোতির্ভবনোদরমধ্যগং। চিন্তয়েদ বিমলং শুদ্ধমাত্মানং দেবতাময়ম্॥' ইহার তাৎপর্য এই যে, মস্তকোপরি শূন্যে রক্তবর্ণ 'রং' এ বহ্নিবীজ হইতে উর্দ্ধে 'হুঁ'কার-বীজ-বিভূষিত তরুণ রবিমণ্ডল উদ্ভূত হইয়াছে চিন্তা করিতে হইবে। পরে এই হুঁ-কার-বীজযুক্ত মণ্ডল যেন দশদিগ্-ব্যাপী বজ্রপ্রাকারে পরিণত হইল। ঐ প্রাকারের তেজে বা কিরণে যেন ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ, সকল বিঘ্ন-নাশকারী বজ্রময় জ্যোতির্ভবন অর্থাৎ জ্যোতির্ময় একটি গৃহ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে আপনাকে নির্মলচিত্ত বিশুদ্ধ ও দেবতাময় চিন্তা করিতে হইবে।" (তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজাপদ্ধতি—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৪৩)। সহজ কথায়, সাধক নিজেকে নির্মলচিত্ত, বিশুদ্ধ ও দেবতাময়—এরূপ কল্পনা করবেন; কল্পনা করবেন বহ্নিপ্রাকারের বেষ্টনীতে তিনি সুরক্ষিত, কোন অশুভ শক্তির ক্ষমতা নেই, এই প্রাচীর ভেদ ক'রে তাঁর সাধনে বিঘ্নসৃষ্টি করতে পারে।

প্রাণায়াম : প্রাণায়ামের সহজ অর্থ প্রাণের (বায়ুর) নিরোধ। প্রাণ অর্থাৎ বায়ু এবং আয়াম অর্থাৎ তার নিরোধ। (প্রাণো বায়ুরিতি খ্যাত আয়ামস্তন্নিরোধনম্।—গন্ধর্বতন্ত্র)। "প্রাণ জগদুৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। প্রাণচাঞ্চল্য হইতে সমুদয় শক্তির বিকাশ। যে শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে, জড়দেহ মধ্যে থাকিয়া দেহকে গতিশীল, মনকে চিন্তাশীল, বুদ্ধিকে বিচারশীল করে, তাহাই প্রাণের শক্তি। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র যাবতীয় পদার্থই প্রাণশক্তির বিভিন্ন স্পন্দন মাত্র। এই সর্বশক্তিমান্ প্রাণের সংযমকে প্রকৃত প্রাণায়াম বলে।" (মন্ত্রার্থ-দীপিকা—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ, ১৩৭৪, পৃঃ ২১)। উপনিষদ্‌ও বলেন—সর্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্মই প্রাণ, তিনিই আবার বাক্ ও মন। (তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ।—মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।২।২)। প্রকৃত প্রাণায়ামের দ্বারা এই সর্বশক্তিমান্ প্রাণকে সংযত বা আয়ত্তীভূত করা যায়। প্রাণায়ামের ফলে চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়ে চিত্তস্থৈর্যে অবস্থিতি হয়। (চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ / যোগীস্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥—হঠযোগ-

প্রদীপিকা, ২।২)।

ভূতশুদ্ধি : ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—এই পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত শরীরের শুদ্ধিই ভূতশুদ্ধি। শরীরাকারে পরিণত এই পঞ্চভূতের যে শোধন, তার দ্বারা পঞ্চভূত অব্যয় ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হন। তার অর্থ এই যে, পঞ্চভূতকে জড়পদার্থ মনে না ক'রে ব্রহ্ম মনে করা। 'সর্বং তদ্ ব্রহ্ম'—এ সমস্তই ব্রহ্ম। ভূতশুদ্ধির দ্বারা পাপপুরুষ বা পাপদেহ দগ্ধ হয়, শুদ্ধ নবীন দেহ রচনা হয়। এই নবীন দেহকেই সাধনদেহ বলে।

ন্যাস : পূজায় ন্যাস একটি অপরিহার্য অঙ্গ। 'নি' পূর্বক 'অস্' ধাতু থেকে ন্যাস শব্দের ব্যুৎপত্তি। (নি+অস্+ঘঞ্)। 'অস্ ক্ষেপণে স্থাপনে চ'—অস্ ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ করা এবং স্থাপন করা। দেহ সম্পর্কে সাধকের কর্তৃত্বাভিমান বা মমত্ববুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ ক'রে সেই স্থলে দেবত্ব-ভাবনা বা ভগবদ্‌বুদ্ধির সংস্থাপনই ন্যাসের তাৎপর্য। শাস্ত্রেও আছে—'ন্যাসো নাম তত্তদ্দে-বতানাং তত্তদবয়বেষবস্থাপনম্। অবস্থিতত্বেন ভাবনেতি যাবৎ।' (ললিতাসহস্রনাম ১১৪-এর 'সৌভাগ্যভাস্কর' ব্যাখ্যা)। অর্থাৎ, সাধকের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে তাঁর ইষ্টদেবতার সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতিভাবনা। এরূপ ভাবনা যত দৃঢ় হয়, দেহের উপর মিথ্যা মমত্ববুদ্ধিও তত দূর হতে থাকে।

মাতৃকান্যাস : "মাতৃকা অর্থ বর্ণমালা—অ, আ, ক, খ ইত্যাদি এবং ইহাদের প্রতিপাদ্য দেবতাসকল। ন্যাস শব্দের অর্থ সংরক্ষণ। অ-কারাদি বর্ণমালার শক্তি অচিন্ত্য। এই শক্তির জঠরে অন্য সর্ববিধ শক্তি জাত হয় বলিয়া ইহাকে মাতৃকা বলে।...আমাদের শরীর এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে ও দেবতাধীনে পরিচালিত। পার্থক্য কেবল পরিমাণ-গত—গুণগত নয়। একটি ক্ষুদ্র, অপরটি বিরাট ; একটি ব্যষ্টি, অপরটি সমষ্টি। এই স্থূলদেহে দেবতাদের ন্যাস বা সংরক্ষণ বা পূজাকরণের নাম মাতৃকান্যাস। উদ্দেশ্য—বিরাটদেহ ও হিরণ্যগর্ভের সহিত পূজকের ঐক্যবোধ।" (মন্ত্রার্থ-দীপিকা—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ, ১৩৭৪, পৃঃ ২৪)।

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ'—তাহাই মন্ত্র যা স্মরণ করলে ত্রাণ করে অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা দূর করে। মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়কে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করলে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের পরিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা দূর হয়।

করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, ব্যাপকন্যাস ইত্যাদি : জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যেকটির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। আবাহন ক'রে তাঁদের যথোপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করাই এইসব ন্যাসের উদ্দেশ্য। তাতে দেহের উপর সাধকের বৃথা আমিত্ব অভিমান দূর হয়। ব্যাপকন্যাসের দ্বারা সর্বভূতে সর্বব্যাপী ভগবৎসত্তার উপলব্ধি হয়।

ধ্যান : ন্যাসাদির পর ধ্যানের বিধান। ধ্যান পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ। ধ্যানের সাধারণ অর্থ চিন্তা। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—সমস্ত ইন্দ্রিয়সন্তাপ মনের দ্বারা সংযত করে মনের মধ্যে ইষ্টদেবতার চিন্তাকে ধ্যান বলে। (যাবদিন্দ্রিয়সন্তাপং মনসা সংনিয়ম্য চ / স্বান্তেনাভীষ্টদেবস্য চিন্তনং ধ্যান-মুচ্যতে।—কুলার্ণবতন্ত্রম্, ১৭।৩৬)। ধ্যান দ্বিবিধ—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। (ধ্যানং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মপ্রভেদতঃ / সাকারং স্থূলমিত্যাহুর্নিরাকারং তু সূক্ষ্মকম্।—কুলার্ণবতন্ত্রম্, উঃ ৯)। বাহ্যপূজায় দেবতার স্থূলরূপেরই ধ্যান বিহিত। যথাবিহিত স্থূলরূপের ধ্যান করতে করতে দেবতার সূক্ষ্মরূপ, সূক্ষ্মভাব, দেবত্বের তত্ত্ব পূজকের কাছে প্রতিভাত হয়। ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে মানসপূজার বিধান আছে। ধ্যানে দেবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তারপর সম্মুখস্থিত দেবতায় সংস্থাপন করত

বাহ্যপূজা। মানসপূজা বাহ্যপূজারই মানস অভিব্যক্তি। দেবতার নিরাকার ভাবের ধ্যান সূক্ষ্মধ্যান বলে অভিহিত হয়।

উপচার : ধ্যান ও মানসপূজার পরবর্তী অনুষ্ঠান দেবতাকে উপচার সমর্পণ। উপচার সামর্থ্যানুযায়ী পঞ্চবিধ, দশবিধ বা ষোড়শবিধ হতে পারে। তবে পূজা ও ফলভেদে সপ্তবিধ, দ্বাদশ-বিধ, অষ্টাদশবিধ প্রভৃতি নানাবিধ উপচারের বিধানও আছে। অতি প্রীতির পাত্র, শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন ব্যক্তি বাড়ীতে এলে যেভাবে সাদর অভ্যর্থনা ও সেবা-যত্ন করা হয়, দেবতা সম্পর্কেও সেই একই ভাব লক্ষ্য করা যায়। উপচারের তালিকা এবং সমর্পণের মন্ত্রে এই ভাবটি সুস্পষ্ট। তবে এগুলি সব বাহ্য উপচার। "ভক্তিসহকারে এই-সব অর্থাৎ উপচার দ্রব্য দেবতাকে সমর্পণ করলে এই-সব সাধককে দেবসন্নিধানে নিয়ে যায় বলে এই-সবকে উপচার বলা হয়। অথবা এই-সব বাঞ্ছিত ফলকে নিকটে এনে দেয় বলে এই-সবকে উপচার বলা হয়।" (শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা—উপেন্দ্রকুমার দাস, ২য় খণ্ড, ১৩৭৩, পৃঃ ৯০৫)। উপচারের মূলগত অর্থও তাই—'উপ চারয়তি ইতি উপচারঃ'।

"সৃষ্টির যেমন স্থূলসূক্ষ্মাদি ভেদ আছে উপচারেরও তেমনি ভেদ আছে। সৃষ্টিক্রমে ব্রহ্মবস্তুর স্থূলতম পরিণতি পঞ্চমহাভূত। বাহ্যপূজায় নিম্নাধিকারী ব্যক্তিরা যে গন্ধাদি পঞ্চোপচার দিয়ে পূজা করেন, তা এই পঞ্চমহাভূতেরই প্রতীক। গন্ধ ক্ষিতির, পুষ্প ব্যোমের, ধূপ মরুতের, দীপ তেজের এবং নৈবেদ্য অপের প্রতীক।…সাধন-মর্মজ্ঞ মহাত্মারা বলেন, দেহাদির প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থই স্থূল উপচার; এইগুলি স্থূল অধিকারীর জন্য বিহিত। চিত্তের সমস্ত বৃত্তি সূক্ষ্ম উপচার; এইগুলি সূক্ষ্ম অধিকারীর জন্য বিহিত। সর্বোচ্চকোটির অধিকারীর একমাত্র উপচার তাঁর আত্মা।" (ঐ, পৃঃ ৯০৬)।

উপচার-সমর্পণ প্রসঙ্গে আর একটি কথা এসে পড়ে; তা হ'ল অর্চনা। "পূজার প্রত্যেকটি উপচারকে শুদ্ধ করত অর্চনা করিয়া ঈশ্বরময় করিয়া লইতে হয়। এমন কি, যে পুষ্প দ্বারা অর্চনা হইবে, তাহাকেও অর্চনা করিতে হয়। পুষ্পকে অর্চনা করিয়া 'এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া ফুলগুলি তাহার অধীশ্বর বিষ্ণুময় এইরূপ চিন্তা করিতে হয়।" (চণ্ডীচিন্তা—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, পৃঃ ১০৩)। সাধকের মনে এই ভাবটি সঞ্চারিত ক'রে দেওয়াই উপচার-পূজার অন্যতম তাৎপর্য।

হোম : তান্ত্রিক পূজা ও বৈদিক যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্যে হোম একটি প্রধান ও অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। দেবতার উদ্দেশ্যে হব্যাদি যে কোন অর্ঘ্য দিতে গেলে, দেবতাকে কোন দ্রব্য অর্পণ করতে গেলে, অগ্নিতেই সমর্পণ করতে হয়—এ-বিশ্বাস ও রীতি অতি প্রাচীন। তার প্রমাণ বেদেও আছে। সেখানে আছে, 'অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাম্'—অগ্নিই দেবতার মুখ। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।১।৪)। 'অগ্নির্দেবানাং জঠরম্'—অগ্নিই দেবগণের জঠর। (ঐ, ২।৭।২২।৩)। এই-জাতীয় আরও অনেক বাক্য আছে। লক্ষণীয় যে, অনুষ্ঠানগত পার্থক্য থাকলেও বৈদিক হোম ও তান্ত্রিক হোমে মূলগত কোন ভেদ নেই।

হোম সাধারণভাবে ত্রিবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর। (তন্ত্ররত্ন তন্ত্র)। এই ত্রিধাবিভক্ত হোমকে আবার বাহ্য ও আন্তর—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্থূলহোম বাহ্য এবং সূক্ষ্ম ও পরহোম আন্তর। হোম ত্রিবিধ বা দ্বিবিধই হোক, সকলের লক্ষ্য এক—সর্বপ্রকার ভেদ-বিলোপ। সমিধ, পুষ্প, ফলাদি বিভিন্ন হোমদ্রব্য অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিলে দগ্ধ হওয়ার জন্য অগ্নিময় হয়ে যায়। এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অভিন্ন হয়ে

যাওয়াই হোমের উদ্দেশ্য। তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে "ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয়, তাহা জীবাত্মারূপ পরমশিবে আহুতি-প্রদানমাত্র, আত্মসুখের জন্য নহে, এরূপ সর্বদা ভাবনা করিতে হইবে।" (শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা—উপেন্দ্রকুমার দাস, ২য় খণ্ড, ১৩৭৪, পৃঃ ৯২৪)। শাস্ত্রীয় হোমানুষ্ঠানে এই ভাবনা দৃঢ় হয়। অগ্নিমুখে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য অর্পণ করলে হোমকর্তার নিকট তখন সবই ব্রহ্মময় বলে অনুভব হয়। কারণ, তখন তাঁর কাছে অর্পণ, ঘৃত, হোমাগ্নি, হোমক্রিয়া, হোমকর্তা নিজে—সবই ব্রহ্ম। (ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ / ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা গীতা, ৪।২৪)।

বিসর্জন: বাহ্য প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে সাধক এতক্ষণ যাঁকে পূজা করছিলেন, সেই ইষ্টদেবতাকে এখন তাঁর নিজের হৃদয়ে এনে পুনঃস্থাপনই বিসর্জন। পূজাবিধির নির্দেশও তাই। (ক্ষমস্বেতি বিসর্জনং কৃত্বা সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ সার্দ্ধমাত্রায় হৃদয়মানয়েৎ। - বৃহৎতন্ত্রসার)। সংহারমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করে আঘ্রাণপূর্বক সেই পুষ্পের সঙ্গে দেবতার তেজ সাধকের স্বীয় হৃদয়ে এনে সংস্থাপন। বিসর্জনের আর একটি তাৎপর্য আছে। জাগ্রতরূপে বিরাজমান চিন্ময়-দেবতার চিন্তা থেকে সাধকের নিবৃত্তি। যিনি এতক্ষণ বাইরে ছিলেন তাঁকে অন্তরের জ্ঞানগঙ্গায় নিমজ্জিত করে তন্ময় হয়ে যাওয়া। বাইরের বিসর্জন এই আন্তর-বিসর্জনের প্রতীকমাত্র দেবতার আসা-যাওয়া সাধকের মনের ব্যাপার আসলে বিসর্জন সূচিত হয় সাধকের মনোবৃত্তিতে

মুদ্রা: তান্ত্রিক পূজানুষ্ঠানে মুদ্রা অপরিহার্য। মুদ্রার সংজ্ঞায় আছে 'মোদনাৎ সর্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।' (জ্ঞানার্ণবতন্ত্র)। অর্থাৎ যা দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন করে, এবং পাপ-সমূহ দূর করে, তাকেই মুদ্রা বলে। পূজার্চনা, দেবতাপ্রতিষ্ঠা, নৈবেদ্য-প্রদান ইত্যাদি অন্যান্য অনুষ্ঠানে শাস্ত্রনির্দিষ্ট সেই সেই মুদ্রা রচনা ক'রে প্রদর্শন করতে হয়। তাতে সেই সেই দেবতা আমোদিত হন, উৎফুল্ল হন। বলা নিষ্প্রয়োজন, পূজার অন্যতম লক্ষ্যই দেবতার প্রীতি-উৎপাদন।

জপসমর্পণ ও প্রণাম: জপসমর্পণ ও প্রণাম পূজার শেষ অনুষ্ঠান। বস্তুতঃ এই অনুষ্ঠান পূজার সমাপ্তি সূচনা করে। মূলমন্ত্র যথাসাধ্য জপ করে—হে দেব, তুমি কৃপা ক'রে আমার এই জপ গ্রহণ কর, তোমার প্রসাদে যেন আমি সিদ্ধিলাভ করতে পারি—এই প্রার্থনা ক'রে জপের ফল ইষ্টচরণে অর্পণ করার বিধান। জপসমর্পণের পর সাধকের নিজের বলতে আর কিছুই থাকে না। যথাসর্বস্ব তনু-মন-প্রাণ ইষ্টচরণে নিবেদন করতে পেরে সাধক পরম তৃপ্তিলাভ করেন। তারপরেই প্রণাম। "তত্ত্বজ্ঞরা বলেন, প্রণাম কথাটার অর্থ পূর্ণরূপে নত হওয়া, সব প্রকারের অহংভাব, নিজের সুখস্পৃহা, নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে প্রণম্যের চরণে আত্মনিবেদন করা।" (পূজাতত্ত্ব—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, পৃঃ ৯৯, নিজের সর্বপ্রকার অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে ইষ্টদেবতার চরণে পূর্ণ আত্মসমর্পণেই প্রণামের সার্থকতা।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

(পূর্বানুবৃত্তি)

ঐশ্বরিক ভক্তি-প্রীতির মাধুর্য

বলদেব-মতানুযায়ী ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রধান সপ্তগুণের শেষ গুণ 'সৌন্দর্য' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তার প্রথম অংশ 'মাধুর্য' বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে পূর্বসংখ্যায়—যেস্থলে সংক্ষেপে ঐশ্বরিক জ্ঞানের (thinking or knowledge-এর) 'মাধুর্যে'র উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে ঐশ্বরিক অনুভূতি অথবা ভক্তি-প্রীতির (feeling or emotion-এর) 'মাধুর্য' সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা হচ্ছে।

অবশ্য, হয়তো অনেকেই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর বা পরম দেবতার 'ভক্তি-প্রীতি'র কথা শুনলেই পরমাশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবেন। কারণ, তিনিই তো স্বয়ং সকলের ভক্তি-প্রীতির পাত্র। সেজন্য তাঁরই পুনরায় 'ভক্তি-প্রীতি'র পাত্র আর কে হ'তে পারেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে? বস্তুতঃ, 'ভক্তি' করা যায় উচ্চতর জনকে; 'প্রীতি' করা যায় সমস্তরীয় অথবা নিম্নস্তরীয় জনকে। বলাই বাহুল্য যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চতর আর কোন কিছুই নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—তিনিই উচ্চতম, মহত্তম, বৃহত্তম, পূর্ণতম, সুখিতম সত্তা, বা সত্য বা তত্ত্ব বিশ্বভুবনে। তাহলে তিনিই পুনরায়, কাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবেন? তা তো অতি হাস্যকর কথা! পুনরায়, তিনি অবশ্য তাঁর অপেক্ষা নিম্নস্তরীয় জীব-জগৎকে প্রীতি করতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি তা করতে যাবেন অকারণে? কারণ, তিনি তো নিজেকে নিয়ে নিজেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ—নিজেরই মহিমায়, নিজেরই গরিমায়, নিজেরই মধুরিমায়—এক কথায়, নিজেরই আনন্দে নিজেই ভরপুর শাশ্বত কাল। অন্য কাউকে প্রীতি করার কোন আবশ্যকতাই নেই তাঁর। তাহলে ঐশ্বরিক ভক্তির ন্যায় ঐশ্বরিক প্রীতিও অসঙ্গত অসম্ভব ব্যাপার।

এর উত্তরে বলদেব-প্রমুখ বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ একবাক্যে, বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে ভক্তি-প্রীতি অসঙ্গত অযৌক্তিক তো নয় একেবারেই, উপরন্তু ভক্তি-প্রীতিই হ'ল তাঁর দিব্যস্বরূপের একটি প্রধানতম দিক 'জ্ঞানে'র ন্যায়ই। কারণ, তিনি পরমপ্রেমময়, পরম-করুণাময়, ভক্তবৎসল, দীনতারণ; এবং এই সবকে বাদ দিলে, তাঁর স্বরূপেরও আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, সব কিছুই বাদ পড়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গেই। এই বিষয়ে, পূর্বে কিছু বলা হয়েছে (ভাদ্র ১৩৮৬, পৃঃ ৩৯৯-৪০১)। পুনরায়, এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মের স্বরূপের স্বরূপ যে 'আনন্দ' সে কথাও এসে পড়ে অনিবার্যভাবেই; এবং এই বিষয়েও পূর্বে কিছু বলা হয়েছে (আষাঢ় ১৩৮৭, পৃঃ ২৮৬-২৮৭)। এই দুই বিষয়েই পুনরায় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে বর্তমান সংখ্যায়।

ব্রহ্মের রসস্বরূপত্ব

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম রসস্বরূপ (শ্রাবণ ১৩৮৭, পৃঃ ৩৪৭)

'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৭)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে বৈষ্ণব-বেদান্তের প্রাণস্বরূপ 'রস' এই সুমধুর শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দুটি—

'রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ।' এবং 'রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ।' অর্থাৎ যা আস্বাদন করা যায়, বা আস্বাদ্য—তা-ই হ'ল 'রস'; এবং যে আস্বাদন করে, বা আস্বাদক,—সেও হ'ল 'রস'।

সাধারণতঃ অবশ্য আস্বাদ্য ও আস্বাদক বিভিন্ন হয়। যেমন, মধু এবং মধুপায়ী। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, এস্থলে, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম একাধারে আস্বাদ্য ও আস্বাদক—অর্থাৎ তিনি একাধারে আস্বাদ্য রস, এবং সেই রসের আস্বাদক।

আরেকটি কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য। সেটি হ'ল এই যে, যে কোন আস্বাদ্যকেই 'রস' বলা হয় না; যে কোন আস্বাদককেও না। যেমন, ভ্রমর যখন মধুপান করে, তখন মধু নিশ্চয়ই আস্বাদ্য; এবং ভ্রমর নিশ্চয়ই আস্বাদক। তাহলেও, মধু বা ভ্রমরকে নিশ্চয়ই 'রস' বলা হবে না, ভ্রমরকেও বিশেষভাবে 'রসিক' বলা হবে না। অতএব, কেবলমাত্র একটি বিশেষ অর্থেই কোন একটি আস্বাদ্যকে 'রস', এবং তার আস্বাদককেও 'রস' বা 'রসিক' বলা যাবে।

কি সেই অর্থ? তা হ'ল সংক্ষেপে এই:

আস্বাদ্য এবং আস্বাদকের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হ'লে যদি আস্বাদ্যের ক্ষেত্রে থাকে 'চমৎকারিত্ব' এবং আস্বাদকের ক্ষেত্রে 'তন্ময়তা', তাহলেই কেবল আস্বাদ্য বস্তুকেও 'রস' এবং আস্বাদন-কর্তাকেও 'রস' বা 'রসিক' বলা যাবে, অন্যথায় নয়। এরূপে, প্রথমে আস্বাদ্যের দিক থেকে সুন্দরভাবে বলা হচ্ছে—

'রসে সারশ্চমৎকারঃ যং বিনা ন রসো রসঃ।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥'

(বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতকৃত অলঙ্কার-কৌস্তুভ, ৬।৫।৭)

অর্থাৎ রসের সার হ'ল চমৎকারিত্ব, যা ব্যতীত রস রসই নয়। এরূপ চমৎকারসারত্ব আছে বলেই রস সর্বত্রই অদ্ভুত।

এরূপ 'চমৎকারিত্বে'র অর্থ হ'ল এই যে, কোন অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য, অনুপম বস্তুর দর্শনে মনে যে একটি নিবিড়, নিগূঢ় বিস্ময়-ভাবের আকস্মিক উদয় হয়, তা-ই হ'ল 'চমৎকারিত্ব'। এই বিস্ময়-ভাব কিন্তু ভয় থেকে উদ্ভূত নয়, সম্পূর্ণরূপেই গভীরতম শ্রদ্ধা থেকে উদ্ভূত, নিবিড়তম কৃতজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত, প্রগাঢ়তম শান্তি থেকে উদ্ভূত। যেমন, হঠাৎ এক বিশাল সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনে তাকালেই কি এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ে সমগ্র মন ভরে ওঠে—কি মহৎ বৃহৎ ব্যাপক এই বস্তু! উত্তুঙ্গ হিমাচল দর্শনেও, দিগন্তব্যাপী আকাশ দর্শনেও, অতি উচ্চ থেকে পতনশীল জলপ্রপাত দর্শনেও সেই একই শ্রদ্ধামিশ্রিত, কৃতজ্ঞতা-মিশ্রিত, শান্তিমিশ্রিত এক বিস্ময়ের উদয় হয়—সমগ্র মন একনিমেষেই বলে উঠে—'আঃ! কি অত্যাদ্ভুত কি অত্যাশ্চর্য, কি অতি চমৎকার, কি অনুপম এই বস্তু—এরকমটি তো আর পূর্বে দেখিনি—এখন হঠাৎ দেখে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আনন্দে আবেগে একেবারে হতবাক্ হয়ে পড়েছি, স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি মুগ্ধ হয়ে পড়েছি।' এই হ'ল 'রস'। পিপীলিকা যখন গুড় আস্বাদন করে, তখন তো এরূপ বিস্ময়ের ভাব তার মনে উদিত হ'তে পারে না; এমন কি, আমাদের মনেও, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন আমাদের মনেও এরূপ 'রসে'র সঞ্চার হয় না যখন আমরা কোন মিষ্টান্ন আস্বাদন করি—তা কেবল একটি মধু-আস্বাদনেই পর্যবসিত হয় মাত্র—তাতে এরূপ বিশাল বিরাট ভূমা মহান্ ভাব এবং তজ্জনিত নির্মল নিবিড় নিগূঢ় নিখাদ বিস্ময়ের কোন প্রশ্ন বা অবকাশই থাকে না বিন্দুমাত্রও। সেজন্যই রসশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যেস্থলে এরূপ চিত্ত-চমৎকৃতি আছে, সেস্থলেই কেবল প্রকৃত 'রস'ও আছে।

পুনরায়, আস্বাদকের দিক থেকে 'রসে'র দ্বিতীয় বিশেষ লক্ষণ হ'ল এই যে, আস্বাদক সেই চমৎকারিত্বগুণযুক্ত অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য, অনুপম বস্তুটিতে যদি একেবারে তন্ময় হয়ে যান, নিবিষ্ট হয়ে যান, একমনা হয়ে যান, অনন্যমনা হয়ে যান, এমনভাবে যে, তাঁর সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ, চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং অন্তঃকরণ বা মন স্ব স্ব কার্য পরিত্যাগ ক'রে স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং একমাত্র আস্বাদ্য বস্তুটিতেই কেবল নিবদ্ধ হয়ে থাকে, অন্য কোন বস্তুতেই মুহূর্তমাত্রও বিন্দুমাত্রও ইন্দ্রিয় ও মন সংযোগ না করে—তাহলেই তিনি পান করেন, আস্বাদন করেন প্রকৃত 'রস'।

'বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তর-রোধকম্।
স্ব-কারণাদি-সংশ্লেষি-চমৎকারি সুখং রসম্ ॥'
(ঐ, ৬।৫।৫)

অর্থাৎ নঞর্থক (negative) দিক থেকে বহিরিন্দ্রিয় (চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং অন্তরিন্দ্রিয় (মন) যখন রুদ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে যায়, অন্য কোন বস্তুকেই বিন্দুমাত্রও, মুহূর্তের জন্যও দর্শন-স্পর্শনাদি ও তার সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনাদি না করে এবং তৎসঙ্গে সদর্থক (positive) দিক থেকে যখন কেবলমাত্র সেই আস্বাদ্য বস্তুটিকেই সর্বদা, তন্ময় হয়ে, একাগ্র হয়ে, সমাহিত হয়ে দর্শন-স্পর্শনাদি ও তার সম্বন্ধে—চিন্তাভাবনাদি করা হয় তখনই হয় প্রকৃত 'রসে'র সৃষ্টি।

অতএব, সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে—যখন চমৎকারিত্ব-যুক্ত আস্বাদ্য এবং তন্ময়তা-গুণযুক্ত আস্বাদকের মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়, তখন স্বতঃই উৎসারিত হয়ে ওঠে 'রসে'র আনন্দনির্ঝর, অমৃত-নির্ঝর শতসহস্রধারায় অহরহ।

এই তো হ'ল ব্রহ্মের 'রস', 'আনন্দ', 'অমৃত'। সর্বব্যাপী তিনি, সচ্চিদানন্দস্বরূপ তিনি, আনন্দ-সুধা-মধু-অমৃতঘন তিনি নিজেরই মধ্যে নিজেরই বিস্ময়ে, নিজেরই প্রীতিতে, নিজেরই শ্রদ্ধায়, নিজেরই ভক্তিতে, সর্বোপরি নিজেরই আনন্দে নিজেরই অমৃতে নিজেই 'মশগুল' হয়ে আছেন, তন্ময় হয়ে আছেন, একাগ্রচিত্ত হয়ে আছেন, গদ্‌গদ হয়ে আছেন আদ্যন্তকাল।—কি রোমাঞ্চকর এই ব্যাপার! এবং একথা বোঝা অতি সহজ যে, এইটিই হ'ল শ্রীভগবানের 'ভক্তি-প্রীতি'র মাধুর্য, যে প্রসঙ্গ নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

কিন্তু না, সমগ্র ব্যাপারটি অত সোজা নয়; এর মধ্যে আরো অনেক কথা আছে, চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে, বুদ্ধিবিচারের অত্যাবশ্যকতা আছে। তা হ'ল এই:

ব্রহ্মের দ্বিবিধ আনন্দ

বৈষ্ণব-দর্শনানুসারে ব্রহ্মের আস্বাদ্য রস বা আনন্দের প্রকারভেদ আছে। যেমন, সুবিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীজীবগোস্বামীর মতে ব্রহ্মানন্দ দ্বিবিধ —'স্বরূপানন্দ' এবং 'স্বরূপশক্ত্যানন্দ'।

'ভগবদানন্দঃ খলু দ্বিধা। স্বরূপানন্দঃ স্বরূপ-শক্ত্যানন্দশ্চ।' (প্রীতিসন্দর্ভ, ৬২ অনুচ্ছেদ)

স্বরূপানন্দ

'স্বরূপানন্দে'র কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এস্থলে, ব্রহ্ম স্বয়ং আদ্যন্তকাল আনন্দস্বরূপ হয়েও পুনরায় নিজেরই সেই অনাদি-অনন্ত আনন্দ নিজেই অনাদি অনন্তকাল ধ'রে আস্বাদন করেন 'রসিকশেখর' অথবা 'রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি'রূপে। 'সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ২।২৮।১২১)

স্বরূপশক্ত্যানন্দ

বস্তুতঃ, স্বীয় স্বরূপের শাশ্বত আনন্দ স্বয়ং শাশ্বত কাল আস্বাদন করার অপেক্ষা আর শ্রেয়ঃ কি হ'তে পারে? সত্য; তা সত্ত্বেও, মানব-বিশ্বাসী, মানবপ্রেমিক, মানবপূজারী, সাহসী বৈষ্ণববৃন্দ এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ব্রহ্মের আনন্দ এক অর্থে সর্বত্রই সর্বদাই সর্বাবস্থাতেও একেবারে

সমান হ'লেও, অন্য অর্থে ব্রহ্মানন্দের প্রকারভেদের আনন্দকে যেন একটু উচ্চেই স্থান দিয়েছেন সপ্রেমে সশ্রদ্ধায় সভক্তিতে। ব্রহ্মের এরূপ প্রকারভেদযুক্ত আনন্দের নামই 'স্বরূপশক্ত্যানন্দ', যেহেতু স্বরূপের দিক থেকে ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।২।১), হ'লেও, তাঁর শক্তি প্রকারভেদে বিভিন্ন।

দ্বিবিধ স্বরূপশক্ত্যানন্দ

এস্থলে, ব্রহ্মের 'স্বরূপশক্ত্যানন্দে'র দুটি প্রকারভেদের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। যথা—ঐশ্বর্যানন্দ ও মানসানন্দ।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে—ব্রহ্মের দুটি প্রধান রূপ—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য (শ্রাবণ ১৩৮৬, পৃ: ৩৩৯ ; ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ: ৩৯৭)। সেজন্য তাঁর ঐশ্বর্যের দিক থেকে নিঃসৃত আনন্দকে 'ঐশ্বর্যানন্দ', এবং মাধুর্যের দিক থেকে নিঃসৃত আনন্দকে 'মানসানন্দ' বলা হয়েছে। এই দ্বিবিধ আনন্দের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, 'স্বরূপানন্দে'র ন্যায় এই আনন্দ ব্রহ্ম কেবল নিজেই নিজের মধ্যে আস্বাদন করেন না। বরং তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের মাধ্যমেও তা আস্বাদন করেন বিশেষভাবে। এর কারণ হ'ল এই যে, বেদান্ত-দর্শনানুসারে, জীব-জগৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত আনন্দেরই লীলা বা খেলার মাধ্যমে প্রকাশ। ঐ সম্বন্ধে পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, পৃ: ২৫১-৫২)। এরূপে জীব শ্রীভগবানের লীলার সঙ্গী, জগৎ তাঁর লীলার ক্ষেত্র। পাত্রভেদে, মুমুক্ষু জীব পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য অথবা মাধুর্য, এই দুই দিককেই উপলব্ধি করেন, বিভিন্নভাবে ; এবং তজ্জনিত হয় 'ঐশ্বর্যানন্দ', নয় 'মানসানন্দ' আস্বাদন করেন যথাক্রমে। এই অনুসারে ঐশ্বর্যানন্দপ্রাপক সাধকের হৃদয়ে শ্রীভগবানের জন্য থাকে প্রধানতঃ শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-ভীতি ; এবং মাধুর্য-প্রাপক সাধকদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের জন্য থাকে প্রধানতঃ ভক্তি-প্রীতি-মৈত্রী।

রসিকশেখর, রসিকচূড়ামণি, পরমরসাস্বাদক পরমদেবতা এই সকল বিভিন্ন সাধকের অন্তরের এই সকল বিভিন্ন ভাব—শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, ভীতি এবং ভক্তি, প্রীতি, মৈত্রী প্রভৃতি নিজে আস্বাদন করেন এবং সেইভাবে পরমানন্দ লাভ করেন—এই হ'ল তাঁর 'স্বরূপশক্ত্যানন্দ'।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, এইভাবে ঘুরিয়ে, অন্যের মাধ্যমে, চিরাশ্রিত জীবের বিবিধ-বিচিত্র ভাব-লহরীর পরিপ্রেক্ষিতে এইভাবে আনন্দ আস্বাদন ক'রে শ্রীভগবানের লাভ কি? তিনি যেরূপ সাক্ষাৎভাবে স্বীয় স্বরূপানন্দ আস্বাদন করেন, ঠিক সেরূপই সাক্ষাৎভাবে স্বীয় স্বরূপশক্ত্যানন্দও অনুভব করুন না কেন? তাহলেই তো তা সর্বদিক থেকেই সুষ্ঠু-শোভন হয়।

এর উত্তর হ'ল এই যে, বৈষ্ণব-দর্শনানুসারে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে এরূপ সুদৃঢ়, অঙ্গাঙ্গী, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে যে, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে জীবের উপর নির্ভর করতে হয়ই হয়—জীবকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের চলেই না। বৈষ্ণব-ধর্মদর্শনের এই মূলীভূত তত্ত্বটি বোঝাবার জন্যই এই বিষয়ের অবতারণা। [ক্রমশঃ]

সংঘজননী

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'উদ্বোধন' পত্রিকার এ-বছরের শারদীয়া সংখ্যায় 'শ্রীশ্রীমায়ের শাশ্বত অভয়-আশ্বাস' প্রবন্ধটির ভূমিকায় পড়লাম :

'রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন আজ যে গগনস্পর্শী প্রাসাদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং যা এখনও ক্রমবর্ধমান, তার আদি-ইতিহাস আলোচনা করলে প্রথমেই মনে পড়বে স্বামী বিবেকানন্দের কথা, যিনি ভারতের যুগযুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞানরাশির দ্বার উন্মোচন ক'রে সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীদের আকৃষ্ট করেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই শ্রীশ্রীমাকে, যিনি এর প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু যে ঐকান্তিক কামনা করেছিলেন তা নয়, এর রক্ষণাবেক্ষণে সজাগ দৃষ্টি এবং প্রয়োজনে যথোপযোগী উপদেশ দিয়ে এর বর্ধনে সাহায্য করেছিলেন।' (উদ্বোধন, ৮৩।৪।১১)

কথাগুলির অন্তর্নিহিত সত্য অন্তরকে শুধু স্পর্শ ই করল না, প্রকৃতপক্ষে নাড়া দিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের কথা :

"বোধগয়ায় মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই—দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হত!' তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হ'ল।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ৫ম সং, ২।৪৮-৪৯)

"ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসারত্যাগ ক'রে কয়েক দিন একটা আশ্রয় ক'রে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হ'ল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা ক'রে আনন্দ ক'রে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট ক'রে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা ক'রে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম ক'রে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ান দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে।"

(ঐ, পৃঃ ২৪০-৪১)

শ্রীশ্রীমায়ের উপরি-উক্ত কথাগুলি স্মরণ ক'রেই ৮ই জানুআরি ১৯৭৮, পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে বলেছিলেন ;

'ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর ত্যাগী সন্তানরা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছেন, তখন মা ঠাকুরের কাছে তাঁদের অন্ন আর আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

বলছেন যে, ঠাকুরের সন্তানরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে তাঁর ভাবকে ধ'রে রাখবে কে আর ঠাকুরের আসার সার্থকতাই বা কোথায়। মা বুঝেছিলেন যে, ঠাকুর এসেছিলেন শুধু দু-চার জনের জন্যে নয়, তিনি এসেছিলেন সমগ্র জগতের জন্য এবং তাঁর কাজ জগতে প্রসারিত করার জন্য তাঁর সন্তানদের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই ভাবে সংঘজননী সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর প্রার্থনার দ্বারা।

'তারপর যতদিন মা স্থূলদেহে ছিলেন, তাঁর সন্তানরা সংঘ পরিচালনার কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে অবাধে মায়ের শরণাপন্ন হতেন। আর মা অতি সহজ সরল ভাবে সমস্যার সমাধান ক'রে দিতেন। মনে রাখতে হবে তাঁর এই ত্যাগী সন্তানরা এক একজন দিগ্বিজয়ী। সেই দিগ্বিজয়ী সন্তানরাও যখন দিগ্‌ভ্রান্ত হতেন, তখন মায়ের কাছে এসে দিকের সন্ধান নিয়ে যেতেন। মায়ের কথা তাঁদের কাছে চরম কথা—শেষ সিদ্ধান্ত।' (উদ্বোধন, ৮০।৬৪৭)

পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজ শেষোক্ত অনুচ্ছেদটির সমর্থনে কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের একটি চিঠিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধু উল্লেখ নয়, চিঠিটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিই দিতে হচ্ছে, কারণ তা না হ'লে আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট হবে না। চিঠিটি এই:

জয়রামবাটী
১৩২৪।৫ই চৈত্র।

আশীঃপর সমাচার—

বাবাজীবন, তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমাদের বাড়ীর জন্য ৪৲ চারি টাকা চৌকিদারী টেক্স ধার্য্য আছে। ইহা অত্যন্ত বেশী বোধ হওয়ায় গতকল্য একখানা পত্রসহ শ্রীমান্ গোপেশকে শ্রীযুক্ত শম্ভুবাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলাম, পত্রে লিখিয়াছিলাম, এই বাড়ীটি দেবোত্তর করিয়া দেওয়ায় আমার সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। আমি এখানের স্থায়ী অধিবাসী নই। বাড়ীর কিছু মাত্র আয় নাই। যে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবক থাকিবে, তাহার ভরণপোষণ এই সংসার হইতে চলিবে না। এমতাবস্থায় স্থায়ী এই গুরুভার বহন করা অসম্ভব। আমার নিজের ও ভক্তেরা যখন যাহা দেয়, ভগবান-ইচ্ছায় তাহাতে কোনও রকম চলিয়া যায় মাত্র। সংসারে কিছু মাত্র আয় নাই ইত্যাদি।

শম্ভুবাবু তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, তিনি এবিষয়ে পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলেন, ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একখানা দরখাস্ত করিবার জন্য। এ সম্বন্ধে তুমি কিছু করিয়াছ কিনা জানি না। আশা করি পত্রপাঠ মনযোগী হইবে, এবং যাহা ভাল মনে কর তাহা করিবে। শম্ভু রায় বলিয়া দিয়াছেন, দরখাস্তে যেন উল্লেখ থাকে যে ইহা একটি Religious Institution—আয় কিছু মাত্র নাই। সহৃদয় জনগণের প্রদত্ত সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। এখানকার কুশল সমাচার সহ আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীঃ তোমার মাতাঠাকুরাণী

চিঠিটি উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছে (৮০।২২৮)। শ্রীশ্রীমা চিঠিটি লিখেছিলেন তাঁর মন্ত্রশিষ্য প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে, যিনি বদনগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। চিঠিতে উল্লেখিত 'শম্ভুবাবু' ছিলেন জয়রামবাটীর সন্নিহিত জিবটা গ্রামের জমিদার। চিঠিতে শ্রীশ্রীমা প্রথমে লিখেছেন, 'আমাদের বাড়ীর জন্য'; পরে আছে, 'বাড়ীটি দেবোত্তর করিয়া দেওয়ায়' ইত্যাদি। বলা প্রয়োজন, উল্লেখিত বাড়ীটি একটি নূতন বাড়ী। এই নূতন বাড়ীটি এবং কিছু জমি ৺জগদ্ধাত্রীর নামে অর্পণ ক'রে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে ২৩শে আষাঢ়, ১৩২৩ রেজিস্ট্রি করান পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ। লক্ষণীয় যে, উদ্ধৃত চিঠিটির তারিখ ৫ই চৈত্র ১৩২৪ এবং এতে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী সেবকের কথাও আছে। সুতরাং বাড়ীটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যখন আইনতঃ বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের উপর ন্যস্ত, তখন শ্রীশ্রীমা ট্যাক্স মকুবের ব্যাপারটা তাঁদেরই উপর ছেড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। সংঘজননী হিসাবে তিনি প্রবোধবাবু ও শম্ভুবাবুর সহায়তায় যাতে ঐকাজটি নিষ্পন্ন হয়ে যায়, তার জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এটা সবিশেষ লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উক্ত চিঠিখানির অপরদিকে গোপেশ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়েরই নির্দেশে প্রবোধবাবুকে যা লিখেছিলেন, তা সঙ্গত কারণেই—অর্থাৎ 'শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র', এই শিরোনামে চিঠিটি প্রকাশিত হওয়ায়, 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ছাপা হয়নি। আমি সেই পরিত্যক্ত অংশটুকুর সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি উদ্বোধনের পাঠকবর্গকে উপহার দিচ্ছি।

নমস্কারান্তে নিবেদন।

পত্রখানা লিখিয়া মাকে শুনাইবামাত্র বলিলেন—"টেক্স যাহাতে উঠিয়া যায় তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।"

আমার শরীর একপ্রকার চলনসই রকমে আছে। আপনাদের কুশল বাঞ্ছনীয়।

প্রণতঃ

গোপেশ

সংঘজননী শ্রীশ্রীমা সংঘের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য কতটা চেষ্টা করতেন, 'টেক্স যাহাতে উঠিয়া যায় তাহা তোমাকে করিতেই হইবে'—এই উক্তির মধ্যেই তার স্পষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট।

হাসির ভগীরথ পরশুরাম

শ্রীশংকর ঘোষ

হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসের দৃষ্টান্ত বাংলাতে প্রচুর—এ-কথা বলা যায় না। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রায় সমস্ত মুখ্য চরিত্রই কৌতুককর হাস্যরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত। উপন্যাসে প্যারীচাঁদ মিত্র এবং নাটকে দীনবন্ধু মিত্র হাস্যরসসৃষ্টিতে সাফল্য অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যে উদ্ভট কল্পনা, ভৌতিক ও বাস্তব ঘটনার যদৃচ্ছ সংমিশ্রণে কৌতুককর কাহিনী প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান হলেন রাজশেখর বসু, যিনি 'পরশুরাম' নামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন রসরচনার

ক্ষেত্রে। পরশুরামের সঙ্গে আরেকজনের আশ্চর্য রকমের মিল আছে। তিনি হ'লেন ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যের মতো পরশুরামও একটি আড্ডাধারী পরিবেশ অবলম্বন ক'রে পশ্চাৎক্ষেপণী (ফ্ল্যাশ-ব্যাক) রীতিতে কোন চরিত্রের মুখ দিয়ে তার কোন অতীত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুধর' ও 'মহাদেব-বাবু'র আড্ডার মতো পরশুরামের 'বংশলোচনবাবু' ও 'কেদার চাটুজ্যে'র আড্ডা উজ্জ্বল রেখায় আমাদের মনে অবিস্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসু এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর জীবন ছিল কর্মবহুল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি 'বেঙ্গল কেমিক্যালে'র মতো প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন উচ্চপদে আসীন ছিলেন। সেখানে তিনি বৈজ্ঞানিক। তারই পাশাপাশি তাঁর বিচিত্র সাহিত্যজীবন। সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে তিনি নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। তবু তাঁর প্রথমতম পরিচয় জীবনের রূপকার হিসাবে; সেখানে জলদেবতার দেওয়া সোনার কুঠার নিয়ে তিনি আবির্ভূত।

ব্যঙ্গ গল্পগুলি তিনি লিখেছেন 'পরশুরাম' ছদ্মনামের আড়ালে। হাস্যরস দিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্যকে উজ্জ্বল করেছেন, আকর্ষণীয় করেছেন। তাঁর হাস্যরসসৃষ্টির প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর প্রধান ভঙ্গী হচ্ছে, সৃজনীশক্তির আবেশময়তার সঙ্গে সমালোচনাশক্তির অতন্দ্রিত বিচারবুদ্ধির সংমিশ্রণে এক প্রকারের অদ্ভুত হাস্যকর পরিবেশন। পরশুরামের পরিমিতিবোধ সূক্ষ্ম এবং তাঁর অলৌকিক জগতে পদক্ষেপ যদৃচ্ছ নয়; বরং বলা চলে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত। তার প্রমাণ রয়েছে 'ধুস্তরীমায়া', 'বিরিঞ্চিবাবা', 'চমৎকুমারী', 'রামধনের বৈরাগ্য', 'রেবতীর পতিলাভ', 'লক্ষ্মীর বাহন' 'যদু ডাক্তারের পেসেণ্ট' প্রভৃতি গল্পগুলিতে।

পরশুরামের কৌতুকরস এত অবারিত ও উতরোল হয়েও এত সাবলীল ও অনায়াসজাত, উদ্ভাবনী-শক্তি এত মৌলিক ও অভাবনীয়, চরিত্র-সৃষ্টি এত বাস্তব ও জীবন্ত যে তাঁর গল্পগুলি প্রত্যেক পাঠককেই অফুরন্ত আমোদে উত্তেজিত ক'রে থাকে। কচি ও বুড়ো, সেকেলে ও একেলে —সকলকে নিয়েই তিনি একটু হাস্য পরিহাস করেছেন। সেজন্য সকলেই একটু-আধটু ঘা ও খোঁচা খেয়েছেন বটে, কিন্তু কারো আপত্তি বা অভিযোগ করার কোন কারণ ঘটেনি। মূলত রাজশেখর বসুর হাস্যরসের প্রধান উপাদান হাস্য-জনক পরিস্থিতির উদ্ভাবননৈপুণ্য। তার প্রমাণ রয়েছে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'গুরুবিদায়', 'উপেক্ষিতা', 'দক্ষিণ রায়', 'ষষ্ঠীর কৃপা', 'জাবালি', 'কচি-সংসদ', 'গন্ধ-মাদন বৈঠক' প্রভৃতি গল্প-গুলিতে। নির্বাচনে কারচুপির দিকটি 'দক্ষিণ রায়' গল্পটিতে ফুটে উঠেছে, নারীমুক্তির আন্দোলনের রূপটি 'ষষ্ঠীর কৃপা'য় উদ্ভাসিত, উপদেষ্টার আসল রূপ কেমন হয় 'সাত লাখ' গল্পে তা স্পষ্ট প্রতিভাত। 'বিরিঞ্চিবাবা'র ভণ্ডামি অতি নিখুঁত ও নিপুণ কৌশলপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি স্বনামধন্য লেখকের কাহিনীতে লেখকের নিজস্ব একটি প্রতিভূ চরিত্র থাকে। পরশুরামের ক্ষেত্রেও তা বাদ যায়নি। পরশুরামের এই রকম প্রতিভূ চরিত্রের নাম 'কেদার চাটুজ্যে' আর গল্পের নাম 'স্বয়ম্বরা'।

পরশুরামের গল্পসংগ্রহ দুটির নাম 'গড্ডলিকা' এবং 'কজ্জলী', যা বাংলার হাস্যরস-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী'তে লেখক পাঠকের মন জয় করেছেন। কোন লেখকের প্রথম দুখানি বইকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্য-মহলে এত প্রচণ্ড আন্দোলনের সূত্রপাত খুব কমই হয়েছে। এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রায় গল্পগুলিই নিছক হাসির গল্প—তাতে না আছে বেদনার তিক্ততা, না আছে ক্ষোভের জ্বালা। সমাজের নানারকম

অসঙ্গতির প্রতি হয়তো গল্পগুলিতে কটাক্ষ রয়েছে কিন্তু তাতে বিদ্বেষ নেই এবং প্রকাশনৈপুণ্য-গুণে তিনি সহজেই পাঠকের হৃদয় জয় ক'রে নেন। এখানে পরশুরামের পাশাপাশি আরেকজনের নামের উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের সমাজের প্রাণখোলা, মজলিসী ও দিলদরিয়া লোকের প্রতিনিধি হলেন কেদারনাথ। তিনি বিগত দিনের সর্বজনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, আলাপচারী ব্যক্তি—পলিতকেশ, চলিতকলম দাদামহাশয়। পরশুরামের মতো কেদারনাথের হাস্যরসও জমে উঠেছে তাঁর কথায় রকমারি সাজগোজ ও ভাবভঙ্গীতে।

পরশুরামের 'ভূশণ্ডীর মাঠে'র তুলনা নেই। আশ্চর্য রকম 'রিয়ালিস্টিক' এই গল্পে হিন্দী ভাষার প্রয়োগ-নৈপুণ্য লক্ষ্য করার মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শৈশবে রাজশেখর হিন্দী ছাড়া বলতেন না। অনেকে বলতেন, এ ছেলে কখনোই বাংলা শিখবে না; বাপ-মার সঙ্গেও হিন্দীতেই কথা বলতেন। গল্পটিতে যক্ষের দুটি গান আছে, যা অতিরিক্ত রসের সৃষ্টি করেছে। বিশেষত শেষ গানটি—

'ধনী, শুনছ কি বা আনমনে
ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশী
　　ডাকছে তোমায় বাঁশ বনে।
ওটা যে খ্যাঁক-শেয়ালী,
দিও না কুলে কালি
রাতবিরেতে শ্যাল কুকুরের
　　ছুঁচো-প্যাঁচার ডাক শুনে।'

রাজশেখরের বিভিন্ন গল্পের মধ্যে যে সমস্ত সরস মন্তব্য ও ইঙ্গিত ইতস্তত হাসির অবতারণা করেছে, তার একটু উল্লেখ না ক'রে পারছি না। 'একগুঁয়ে বার্থা' গল্পে নরেশ মুখার্জী যখন বলেন—'খাসা গল্পটি মাখনবাবু, কিন্তু বড্ড তড়বড় ক'রে বলেছেন। যদি বেশ ফেনিয়ে আর রসিয়ে পাঁচশ পাতার একটি উপন্যাস লিখতে পারেন, তবে আপনার রবীন্দ্র-পুরস্কার মারে কে?'—তখন চকিত হাসির দীপ্তিতে সমগ্র আবহাওয়া যেন মুহূর্তের অবসরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে ফেনিয়ে আর রসিয়ে পাঁচশ পাতার একটি উপন্যাস না লিখলেও 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্পে'র এগারোটি গল্পের অন্যতম 'একগুঁয়ে বার্থা'র লেখক পরশুরাম এই বইটির ওপরেই কিন্তু রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছিলেন।

রাজশেখর বসু ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি হাসতেন কম, কিন্তু এই রাশভারি লোকটির সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা হালকা হাসির আমেজ ছিল। দুঃখবেদনা যাঁদের গল্পের মূল উপজীব্য, তাঁরা যেমন কাঁদেন না বলে আক্ষেপ করা অর্থহীন, তেমনি হাস্যরসস্রষ্টাকে সর্বদা হাসতে হবে, তারও কোন মানে নেই। যেহেতু রাজশেখরের মন ছিল সদাহাস্যময় ও প্রফুল্ল, তাই তিনি নিজে কম কথা বললেও আড্ডা ভালবাসতেন।

হাস্যরসের পাশাপাশি তাঁর অনুবাদমূলক রচনাগুলিতে তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের নতুন দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। সরলীকৃত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বরসের আধার 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র অনুবাদে তিনি যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য 'মেঘদূতে'র সরস ভাষ্য রচনায়ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গভীর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার সাধারণ পাঠকের কাছে পরশুরাম এক অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজালিক—হাসির ছটায়, গল্পের ঠাসবুনানিতে, বুদ্ধি আর সরসতার শোভন সংমিশ্রণে দ্বিতীয়-রহিত পরশুরাম আধুনিক সাহিত্য-পাঠকের কাছে প্রায় অলৌকিক বিস্ময়ের মতো, সম্মোহনের মতো। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের

বিকাশের ধারা' গ্রন্থে পরশুরাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, 'পরশুরামের হাস্যরসের প্রাণ হইতেছে তাঁহার পরিকল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা এবং তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি এই পরিকল্পনার প্রতিবেশলীন।'

রাজশেখর বসু জীবিতকালে প্রচুর পরিমাণে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন। কর্মস্থল থেকে ১৯৩২ সালে অবসর গ্রহণ ক'রে আট বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিভাষা ও বানান সংস্কার সমিতি'র সভাপতিত্ব করেন এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সরকারী কার্যের পরিভাষা সমিতি'র সভাপতির পদে বৃত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪০ সালে 'জগত্তারিণী পদক' এবং ১৯৪৫ সালে 'সরোজিনী পদক' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। দশ বছর পরে ইনি 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্পে'র জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার পান। এক বছর পরেই ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে যথাক্রমে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৫৮ সালেই 'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্পে'র জন্য তিনি 'সাহিত্য আকাডেমী'র পুরস্কার পান। তারপর মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই রাজশেখরের লেখনী চিরকালের মতো স্তব্ধ হ'ল—যখন তাঁকে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল পথ-নির্দেশক ও সাহিত্যের অভিভাবক হিসাবে, ঠিক তখনই তিনি ছুটি নিলেন। কেদার চাটুজ্যের বানানো গল্প আর জটাধর বকসীর নতুন জুয়াচুরির সঙ্গে আমাদের আর কোনদিন পরিচয় হবে না—রাজশেখরের মৃত্যুতে এই ক্ষতি অসামান্য।

পরশুরাম 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'কে কেন্দ্র ক'রে যে 'আনলিমিটেড' রসের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, তা পরবর্তী কালের লেখকদের প্রেরণার বস্তু। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী পরশুরাম গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা করতে গিয়ে পরশুরামকে 'হাসির ভগীরথ' নামে চিহ্নিত করেছেন। ভগীরথের মতোই তিনি রসপ্রবাহে সাহিত্যের শুষ্ক প্রান্তর সরস ক'রে দিয়ে গেছেন। সেই রসধারায় অবগাহনের সৌভাগ্য লাভ করেছে বাঙালী পাঠক-সমাজ।

সমালোচনা

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত, তৃতীয় খণ্ড : রামপদ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : শ্রীঅনির্লহরি চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২। (১৯৮০), পৃষ্ঠা ৩৫১+১৭৬; মূল্য : পঞ্চাশ টাকা।

একাধারে প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ এবং ভক্তপ্রবর ৺রামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বিরচিত সমন্বয়গ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে'র তৃতীয় এবং শেষ খণ্ডটির জন্য সকলেই এতদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম দুখণ্ডে তাঁরা সাম্য-ঐক্য-সমন্বয়-সামঞ্জস্যের একটি পুণ্যপূত ছবি দেখেছিলেন। তাই তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ এবং বরেণ্য বিকাশ তাঁরা শেষ খণ্ডে দেখবেন বলে অনেক আশা নিয়ে বসেছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, সেই সর্বশেষ খণ্ডটি সকলের সেই মনোগত আশা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবত সত্যই একটি অভিনব গ্রন্থ, এবং সাম্য-ঐক্য-সমন্বয়-সামঞ্জস্যের পূর্ণ প্রতীক। বৈষ্ণববেদান্ত-মতানুসারে ভক্তিই হ'ল সাম্য-ঐক্য-

সমন্বয়-সামঞ্জস্যের মধুরতম, সুন্দরতম, পবিত্রতম রূপ। কারণ, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ তো নেই-ই, উপরন্তু অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধই রয়েছে আত্যন্তকাল। যাঁকে আমরা প্রাণমনভরে ভক্তি ক'রব, তাঁর সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান তো আমার থাকবেই থাকবে; সেই সঙ্গে থাকবে তাঁকে সেবা করবারও তুল্য পরিপূর্ণ প্রবৃত্তি। সেজন্য যাঁরা বলেন যে ভক্তি কেবলই আবেগোচ্ছ্বাস, কেবলই উন্মাদনা-উত্তেজনা, কেবলই আকুলতা-ব্যাকুলতা —তাতে নেই জ্ঞানের স্থিরতা, নেই কর্মের দৃঢ়তা, আছে কেবল অত্যধিক ভাবপ্রবাহের অস্থিরতা, চঞ্চলতা, উদ্দামতা, তাঁরা সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত। সেজন্য বহু জ্ঞানিগুণিজনই নানাভাবে, নানাদিক থেকে ভক্তিবাদের সম্বন্ধে এই অসত্য ধারণার নিরসনের প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু অশেষশ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহোদয় এই প্রসঙ্গে যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন, তা সত্যই সর্বদিক থেকেই অভিনব ও অভিনন্দনযোগ্য। কারণ, তিনি অতুল সাহসভরে ভক্তিকে এনে ফেলেছেন একেবারে জ্ঞানের সুদৃঢ় দুর্গে, এবং সেখানেই স্থিরভাবে ভক্তিকে স্থাপিত করেছেন জ্ঞানেরই পার্শ্বে, তুল্য মর্যাদায়, তুল্য পূর্ণতায়, তুল্য সার্থকতায়। অর্থাৎ সাধারণ মতানুসারে ব্রহ্মসূত্র-সমূহ, বিশেষ ক'রে জ্ঞানেরই লীলাভূমি, জ্ঞানেরই শক্তিতে প্রাণবান্, জ্ঞানেরই চরমোৎকর্ষ। সেই জ্ঞানসূর্যদীপ্ত ব্রহ্মসূত্রসমূহকে ভক্তির স্নিগ্ধশীতল, কোমলবিমল চন্দ্রালোকে পুনরায় উদ্দীপিত করা, অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। জ্ঞানসূর্য ও ভক্তিচন্দ্রের এই অপূর্ব মিলন সংঘটিত ক'রে একাধারে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও ভক্তশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার মহোদয় সত্যই একটি অত্যাশ্চর্য অপরূপ অনুপম কার্য সাধন করেছেন। তাঁর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ সত্যই অপরিশোধ্য।

শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায় এই অপূর্ব তিনখণ্ডসংবলিত গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রে একদিকে যেমন পিতৃঋণ স্বীকার করেছেন, অন্যদিকে ঠিক তেমনি আমাদেরও তাঁর নিকট অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ করেছেন।

ডক্টর রমা চৌধুরী

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র-উপদেশামৃত (প্রথম পর্ব)। সংকলক : শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : শ্রীমৎ অনন্তপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২বি, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯। (১৯৭৮), পৃষ্ঠা : ৬৪+৩২০, মূল্য : ষোল টাকা।

প্রেম ও ত্যাগের আদর্শের সমন্বয়ে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে ভারতের শাশ্বত জীবনবোধ। দৈনন্দিন ভারতীয় জীবনধারায় আজও ঘটছে এই মহাবোধের প্রতিফলন। নিজ নিজ জীবন ও কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে মানবসমাজে এই মহাদর্শটির প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে বহু মানবের জীবনদর্শন,—সংসারবিমুখ ঈশ্বর-সাধনা যার উদ্দেশ্য নয়। অন্যদিকে ঈশ্বরীয় গুণ—প্রেম ও ত্যাগের স্বষ্ঠু প্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক সত্তায় ঈশ্বরত্ব-প্রতিষ্ঠাই হ'ল এই জীবন-দর্শন ও জীবনসাধনার একমাত্র লক্ষ্য।

মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ছিলেন এই ধরনের একজন জীবনসাধক, যাঁর চিন্তায় ও কর্মে ভারতের সমন্বয়মুখী জীবনাদর্শটি প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানাভাবে। ১২৫৩ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ তাঁর আবির্ভাব এবং ১৩৩৩-এর ১৫ই কার্তিক তাঁর মহাপ্রয়াণ। প্রায় আশি বৎসর ব্যাপ্ত তাঁর জীবনচেতনা ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শে সমৃদ্ধ ভারতীয় জীবনধারাটিকে প্রকাশ করেছে বিভিন্নভাবে। সমাজে এই আদর্শটি প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রকাশ করেছেন মাসিক পত্রিকা 'সত্যপ্রদীপ' এবং জীবনে এই আদর্শের সার্থক

রূপায়ণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন 'সনাতন ধর্মপ্রচারিণী সভা'। এই দুই প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে সনাতন ধর্মের আদর্শটি প্রচার করেছেন তিনি। ঈশ্বরীয় প্রেমের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে স্বার্থশূন্যভাবে মানবপ্রেম ও মানবকল্যাণে নিজেকে যুক্ত ক'রে ক্ষুদ্রস্বার্থত্যাগ ও স্বার্থসংঘাতকে অতিক্রম ক'রে মানুষ প্রকাশ করে তার শাশ্বত মানব-ধর্মটিকে, যার মধ্য দিয়েই ঘটবে মানুষের সমস্ত অভাবের পূর্ণতা। নগেন্দ্রনাথের মতে, 'ভগবান যেমন যারপরনাই এক অদ্ভুত বস্তু, তেমনি জীবাত্মাও এক অদ্ভুত বস্তু। এই অদ্ভুত বস্তুর অদ্ভুত অভাব। পশুপক্ষীর মধ্যে তত অসন্তোষ দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহারা অন্নজল পাইলে সহজেই সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু মানবের কি বিচিত্র অভাব। এই বিচিত্র অভাবের জন্য এমনকি ব্রহ্মাণ্ড দিলেও তাহা দূর হয় না। এই বিচিত্র অভাব ও অসন্তোষ আছে বলিয়াই মানুষের গৌরব। এই বিচিত্র অভাবের জন্যই মানুষ শ্রীগোবিন্দের দিকে আকৃষ্ট হয়। মানুষ একে একে দেখে দেখে যখন আর কোনস্থানে বা কোনবস্তুতে শান্তি পায় না, তখন ভগবৎসমুদ্রে ঝাঁপ দেয়।' (পৃঃ ১১২)

শ্রীনগেন্দ্রনাথের চিন্তা, উপদেশ ও কর্মসাধনায় প্রকাশিত হয়েছে মানবধর্মের স্বরূপ এবং মানুষের চিরন্তন আকৃতির নানা বিশ্লেষণ। আজকের মানুষের কাছে নতুন ক'রে তাঁর চিন্তা ও আদর্শ প্রচারের জন্য সংকলিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটি। সহজভাবে সরল ভাষায় প্রকাশিত তাঁর কথা ও উপদেশগুলি মানুষের কাছে জীবন সম্পর্কে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। জীবনই ধর্ম, সমাজ-কল্যাণেই এই জীবনধর্মের সার্থকতা। যথার্থ মানবকল্যাণে নিয়োজিত জীবনপ্রেমিককেই বলা হয় 'সাধু'। নগেন্দ্রনাথের কথায়, 'ঈশ্বর তাঁহাদের মনে সত্যের প্রেরণা দেন, তাই তাঁহারা সেই সকল সত্য নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া জগতের হিতার্থে বিতরণ করেন।' (পৃঃ ১৯২)। কিন্তু ধর্মাচরণের ভান ক'রে জীবনকে সংঘাতমুখর ক'রে তোলে অনেক 'সাধু' বা ভণ্ড। তাই সংসারে থেকে সংসার-জীবনের নানা সংঘাত ও সকল রকম ভণ্ডতা এবং অসত্যকে অতিক্রম করাই হবে সংসারীর একমাত্র উদ্দেশ্য। এজন্যই নগেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সংসারী সাজিও, সংসারী হইও না।' আবার অন্যদিকে সত্য-সন্ধান এবং সত্য-আচরণের মধ্য দিয়ে সাধুজীবন প্রাপ্তিই হবে এ-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নগেন্দ্রনাথের কথায় 'সাধু হইও, সাধু সাজিও না।' এই সাধুজীবনের মূল উদ্দেশ্য হ'ল প্রেম ও কল্যাণকর কর্মে যুক্ত হয়ে জীবনে ও সমাজে পরম কল্যাণের প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম, ঈশ্বর, মানুষ ও সমাজজীবন সম্পর্কে এই ধরনের অসংখ্য উপদেশ ও কথার সংকলন 'শ্রীশ্রীনগেন্দ্র-উপদেশামৃত'। এ-পুস্তক পাঠ করলেই বিশেষ উৎসাহবোধ করবেন অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু মানুষ। 'নগেন্দ্র-চরিতামৃত ও নগেন্দ্র-জীবনদর্শন' শীর্ষক সুলিখিত দীর্ঘ মুখবন্ধটি অভিনন্দন-যোগ্য। সমন্বয়মুখী ভারতীয় জীবনধারার প্রচারে ও প্রকাশে 'শ্রীশ্রীনগেন্দ্র-উপদেশামৃত' সাধারণ পাঠক ও নগেন্দ্র-অনুরাগীদের কাছে 'অমৃতসমান' হয়ে উঠবে—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের দিব্য মিলনের বর্তমান শতবর্ষপূর্তি-বৎসরে, এই আশা-আকাঙ্ক্ষাই করি।

অধ্যাপক শ্রীশান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়
দর্শন বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ, কনখল : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা

স্বামী বিবেকানন্দের আদেশ শিরোধার্য করিয়া তাঁহার শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ সালে কনখলে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। (এই সংখ্যার পৃঃ ৫৭৮ দ্রষ্টব্য)। প্রায় ৮১ বৎসর যাবৎ এই সেবাশ্রমটি রোগিনারায়ণগণের সেবা করিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, এই সুদীর্ঘ কালে ইহার কর্মের পরিধি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রায় এক বৎসর হইল কনখলে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৮১, উক্ত শাখাকেন্দ্রে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে ২৪.১১.৮১ হইতে ৫.১২.৮১ অবধি দ্বাদশদিবসব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

২৪শে নভেম্বর, পূর্বাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পুরোভাগে ভাগবত-বেদী-রচনা, ঘট-স্থাপন ও বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুবৃহৎ পট-শোভিত সুসজ্জিত সভামণ্ডপে ডঃ বিষ্ণুদত্ত রাকেশ কর্তৃক ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়।

২৫শে নভেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর অবধি 'ভাগবত-সপ্তাহ' পালিত হয়। প্রতিদিন সকাল ৯টা হইতে ১১-৩০ মিঃ পর্যন্ত ভাগবত পাঠ করেন পণ্ডিত হরিরাম পাণ্ডে এবং বিকাল ৩টা হইতে ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত ভাগবত-প্রবচন করেন ডঃ বিষ্ণুদত্ত রাকেশ। পাঠ ও প্রবচনের পূর্বে ও পরে যথারীতি পূজা ও আরতি করা হয়।

২রা ডিসেম্বর ভাগবত-সপ্তাহের সমাপ্তিসূচক হোম ও পূর্ণাহুতি অনুষ্ঠিত হয় সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। ইহা এক দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি করে। বহু সাধুসন্ত ও ভক্ত নরনারীর হৃদয় ভগবদ্‌ভাবে উদ্দীপিত হয়। এই দিন অপরাহ্ণ ৪টায় ধর্মসভা হয়। বিষয় ছিল: 'বেদান্ত ও প্রাত্যহিক জীবনে উহার ব্যাবহারিক প্রয়োগ'। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী ইজ্যানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী বরেশানন্দ। স্বামী ব্যোমরূপানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও সভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ভাষণ দেন। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী তপনানন্দ। শ্রীধর্মবীরজী সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে অধিবাস-কৃত্য সম্পন্ন হয়।

৩রা ডিসেম্বর প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর বৈদিক স্তবস্তুতি, প্রার্থনা ও ভজন হয়। সকাল ৭টায় শোভাযাত্রায়—স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ পুরাতন পূজাকক্ষ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পূতাস্থি বহন করিয়া মঠ পরিক্রমা করেন। বেদমন্ত্র-মুখরিত, ভজন-কীর্তনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এই শোভাযাত্রায় মাঙ্গলিক উপচার এবং গৈরিক পতাকাসহ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ যোগদান করেন। পথের দুই পার্শ্বে শত শত ভক্ত নরনারী এই দিব্য দৃশ্য দর্শন করেন। পরিক্রমান্তে স্বামী ভূতেশানন্দজী পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের হস্তে পূত ভস্মাধারটি অর্পণ করিলে তিনি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। তাঁহার অনুগমন করেন স্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, স্বামী গহনানন্দজী, স্বামী গীতানন্দজী প্রমুখ অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ এবং ভক্তবৃন্দ।

গর্ভমন্দিরে শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত বেদীতে সমাসীন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরবিগ্রহের যথাস্থানে ভস্মাধারটি স্থাপন করেন বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। বিগ্রহের সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান করেন। ধ্যানান্তে বিগ্রহে পুষ্পার্ঘ্য-নিবেদন করিয়া তিনি কর্পূর-আরতি ও চামর-ব্যজন করেন। এই সময়ে শ্রীমন্দির জয়ধ্বনিতে ও বেদমন্ত্রে মুখরিত হইতে থাকে। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ এবং ভক্তমণ্ডলীও যথাসময়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

ইহার পর সকাল ৮-৩০ মিনিটে গর্ভমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও সপ্তশতী হোম এবং ভজনসঙ্গীত হয়। পূজক ছিলেন স্বামী সুলভানন্দ, তন্ত্রধারক স্বামী হিতানন্দজী। ঐ সময়ে মন্দির-সম্মুখে প্রায় ৩০ মিনিট জ্বালাপুর, হরিদ্বারের 'মিলন ব্যাণ্ড পার্টি'র ঐকতান বাদ্যের মাধ্যমে ভজনসঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হয়। মধ্যাহ্নে পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গর্ভমন্দিরে পুনরায় আসেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রায় ৮৫ জন সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধুরাও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। হোম শেষ হয় বিকাল ৩-৩০ মিনিটে।

অপরাহ্ণ ৪টায় ধর্মসভা হয়। বিষয় ছিল: 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও বর্তমান যুগে উহার প্রাসঙ্গিকতা'। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী তপনানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী বরেশানন্দ। স্বামী শ্রীধরানন্দ, স্বামী ব্যোমানন্দ ও সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ ভাষণ দেন। শ্রীরাম পানজ্ঞানীজী সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী বীতভয়ানন্দ। সভার শেষে ভি. ডি. ও. টেপে রেকর্ড-করা কনখল সেবাশ্রম ও লক্ষ্ণৌ সেবাশ্রমের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের প্রতিবেদন ও দৃশ্য টি. ভি.তে দেখানো হয়।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের ঘণ্টাধ্বনিতে ও সমবেত কণ্ঠের ভজনসঙ্গীতে শ্রীমন্দিরে এক দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ১০টায় জনসভার প্রারম্ভে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ বৈদিক স্তব পাঠ করেন। জনসভার বিষয় ছিল: 'বর্তমান যুগে সন্ন্যাসজীবন ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্য'। সভাপতি পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের ইংরাজী আশীর্বাদী ভাষণের হিন্দী-অনুবাদ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীকে শোনান স্বামী আত্মানন্দ। ১০০৮ শ্রীশ্রীহরমিলাপ মুনিজী মহারাজ (হরমিলাপ ভবন, হরিদ্বার), ১০০৮ মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশ্বরানন্দজী মহারাজ (শঙ্কর মঠ, আবু পাহাড়), ১০০৮ মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী রামস্বরূপজী মহারাজ (পীঠাধীশ্বর, গুরুমণ্ডল, হরিদ্বার; ভারত-সাধু সমাজের সভাপতি), ১০০৮ মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ (কৃষ্ণ-নিবাস আশ্রম, কনখল) এবং স্বামী আত্মানন্দ – ইঁহারা সকলেই হিন্দীতে ভাষণ দেন। সভার শেষে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সেবাশ্রমের 'স্মারকগ্রন্থ'টি আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রকাশ করেন। স্বামী শ্যামসুন্দর দাস (গরীব-দাসী উদাসী আশ্রম) প্রত্যেক বক্তাকে বক্তৃতার প্রারম্ভে সভায় পরিচয় করাইয়া দেন এবং সভান্তে বক্তাদিগকে ও সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নানা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উপস্থিত বক্তাগণ কনখল সেবাশ্রমকে অর্থ ও অন্যান্য নানাপ্রকার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন।

মধ্যাহ্নে সাধুদের 'সবস্ত্র-ভাণ্ডারা' হয়। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিগণ-সহ নানা সম্প্রদায়ের নিমন্ত্রিত ৬৩৭ জন সাধু বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সেই

সময় প্রত্যেক সাধুকে একটি করিয়া নূতন বস্ত্র দেওয়া হয়। সাধুসম্মেলনের সমগ্র দৃশ্যটি ভক্তদের মনে এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করে।

অপরাহ্ন ৪টার সময় এক আনন্দানুষ্ঠানে শ্রীবৃন্দাবনের দল 'রাসলীলা' পরিবেশন করিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

৫ই ডিসেম্বর 'ভক্তনারায়ণসেবা' হয়। কয়েক হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে :

(ক) বন্যাবিধ্বস্ত উড়িষ্যা (১৯৮০) এবং অন্ধ্রপ্রদেশে (১৯৮০) গৃহনির্মাণকার্য এবং পশ্চিমবঙ্গে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত (১৯৭৮) একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়-ভবনের নির্মাণকার্য যথারীতি সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ—১৯৮০-র বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মালদা জেলার ৮,৪১৪টি পরিবারের পুনর্বাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনোদ্দেশে মালদা শহর হইতে ২০ কিলোমিটার দূরে কালিয়াচকে একটি শিবির স্থাপন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গৃহনির্মাণ-প্রকল্পানুসারে প্রতিটি গৃহের জন্য টা. ১৫০০'০০ বরাদ্দের ভিত্তিতে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে ১৮০০টি গৃহের উপকরণাদির সরবরাহ-কার্য ইতঃপূর্বে সংগঠিত।

উদ্বোধন সংবাদ

স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন সারদানন্দ হলে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে।

৯ই নভেম্বর স্বামী সুবোধানন্দজীর ও ১১ই নভেম্বর স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়।

সদ্যপ্রকাশিত নবসংস্করণ গ্রন্থসমূহের বিবরণ :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ,
১৫শ সং, পৃঃ ৫১৯, মূল্য ঃ ১২'৫০ টাকা

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা—স্বামী দেবানন্দ,
২য় সং, পৃঃ ৭৬, মূল্য ঃ ১'২৫ টাকা

বিবিধ সংবাদ

জন্মজয়ন্তী উৎসব

পূর্ব সিঁথি (দমদম) শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ পাঠ-চক্রের উদ্যোগে ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিক, স্তোত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ, ভক্তিগীতি এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগারাত্রিক হয়। তিন শতাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া ও দুই শতাধিক ভক্ত হাতে-হাতে প্রসাদ পান। ভক্ত-সমাবেশে স্বামী নিরাময়ানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া ধর্মের মূল তত্ত্ব তুলিয়া ধরেন এবং ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেন স্বামীজীর 'জ্ঞান ও কর্মের সামঞ্জস্য' বিষয়ে।

বৈকালে মহিলা-আসরে প্রব্রাজিকা অমলা-প্রাণা ও প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শের আলোচনার মাধ্যমে তাঁহাদের জীবন ও বাণী বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পথনির্দেশক বলিয়া মন্তব্য করেন। বৈদিক স্তোত্র পাঠ, ভজন-গান ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু ২২শে নভেম্বর ১৯৮১, রাত্রি ৯-৩৫ মিনিটে তাঁহার টালিগঞ্জের বাটীতে ৮৪ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে মাতৃনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে তিনি ১৭।১৮ বৎসর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে ময়মনসিংহ শহরে তাঁহার জন্ম। তিনি ১৯৫০ সাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন

আবেদন

ঘূর্ণিবাত্যাবিধ্বস্ত সুন্দরবনে পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, কম্পাউণ্ডার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত মেডিক্যাল টীমের সহায়তায় সেবাকার্য পরিচালনা করছে।

অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের জন্য বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন : প্রচুর ঔষধ, পথ্য, কম্বল, ধুতি, শাড়ী, জামা-কাপড় ইত্যাদি।

আমরা সহৃদয় জনসাধারণের নিকট মুক্তহস্তে, নিম্নলিখিত ঠিকানায়, দান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি : রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া।

স্বামী বন্দনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮১
বেলুড় মঠ, হাওড়া

৮৩তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৭ হইতে পৌষ, ১৩৮৮ ; ইংরেজী : ১৯৮১)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ (মাঘ, ১৩৮৭—আষাঢ়, ১৩৮৮)

স্বামী নিরাময়ানন্দ (শ্রাবণ, ১৩৮৮—পৌষ, ১৩৮৮)

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

বার্ষিক মূল্য ১৪·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৮৩তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৭ হইতে পৌষ, ১৩৮৮)

ভাষ

চিত্রসূচী

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই: ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮'০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, মূল্য ২২'৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫'২৫; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭'৮০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ মূল্য ৮'২৫; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯'৫০; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ১'৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাঁধাই ৬'০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ১'৬৫

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৫'২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪'২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ (সাধারণ বাঁধাই) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২'২৫
,, (কাপড়ে বাঁধাই) পৃঃ ,, মূল্য ২'৭৫

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭'৫০, ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১০'০০

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ২০'০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬'০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৬'০০ (২য় সংস্করণ)

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১৬'০০; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬'০০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮'০০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭'০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ: স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩০৬, মূল্য ৮'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৫৮, মূল্য ২'৫০

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ২৭, মূল্য ৪'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩'২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত।
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫'০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

আরতি-স্তব—ছাপা নাই

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ২'৫০

দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ৩'৭৫

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬'২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩'৫০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪·০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১·৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী — পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪·৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—স্বামী বুধানন্দ। ছাপা নাই

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়—পৃঃ ৪৪, মূল্য ০·২৫

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা — স্বামী দেবানন্দ। পৃঃ ৭৬, মূল্য ১·২৫

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩·৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬·০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২·৫০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪·০০

ধ্যান — স্বামী ধ্যানানন্দ। পৃঃ ১০২, মূল্য ৩·৫০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪·০০

সংস্কৃত

স্তবকুসুমাঞ্জলি— স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২·৫০

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮·০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত :

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫·০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১·০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ২·২৫

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮·৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ১২·৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ৪র্থ খণ্ড ৩·০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩·০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯·০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২·০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ— স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২·০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০·০০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ৩·০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮·০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৬·০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য (সাধারণ বাঁধাই) ৩·৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪·০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Re. 0·85

MY MASTER
Price : Re. 0·60

THOUGHTS ON VEDANTA
(Seventeenth Edition)
Price : Rs. 2.25

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3·80

CHRIST THE MESSENGER
(Eighth Edition)
Price : Rs. 1.25

RELIGION OF LOVE
Price : Rs. 3.50

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4·25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 3·00

VEDANTA PHILOSOPHY
Price : Rs. 2·50

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 1·80

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price : Rs. 12·00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price : Rs. 7·00

SIVA AND BUDDHA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6·00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1·10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7·50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
(Cloth) Price : Rs. 2·30

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 6·25

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 1·00